অপূর্ব চট্টোপাধ্যায়

ত্রৈলঙ্গস্বামী সমগ্র



ত্রৈলঙ্গস্বামী সমগ্র

ত্রৈলঙ্গস্বামী সমগ্র

জীবনী ও সংকলন

অপূর্ব চট্টোপাধ্যায়

ভূমিকা

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

পত্রভারতী

www.bookspatrabharati.com

পত্রভারতী

প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৬
দ্বিতীয় মুদ্রণ আগস্ট ২০১৬ তৃতীয় মুদ্রণ আগস্ট ২০১৭
চতুর্থ মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ২০১৮ পঞ্চম মুদ্রণ মার্চ ২০২০

ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক পত্রভারতী, ৩/১ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯
থেকে প্রকাশিত এবং হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস, ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন,
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত।

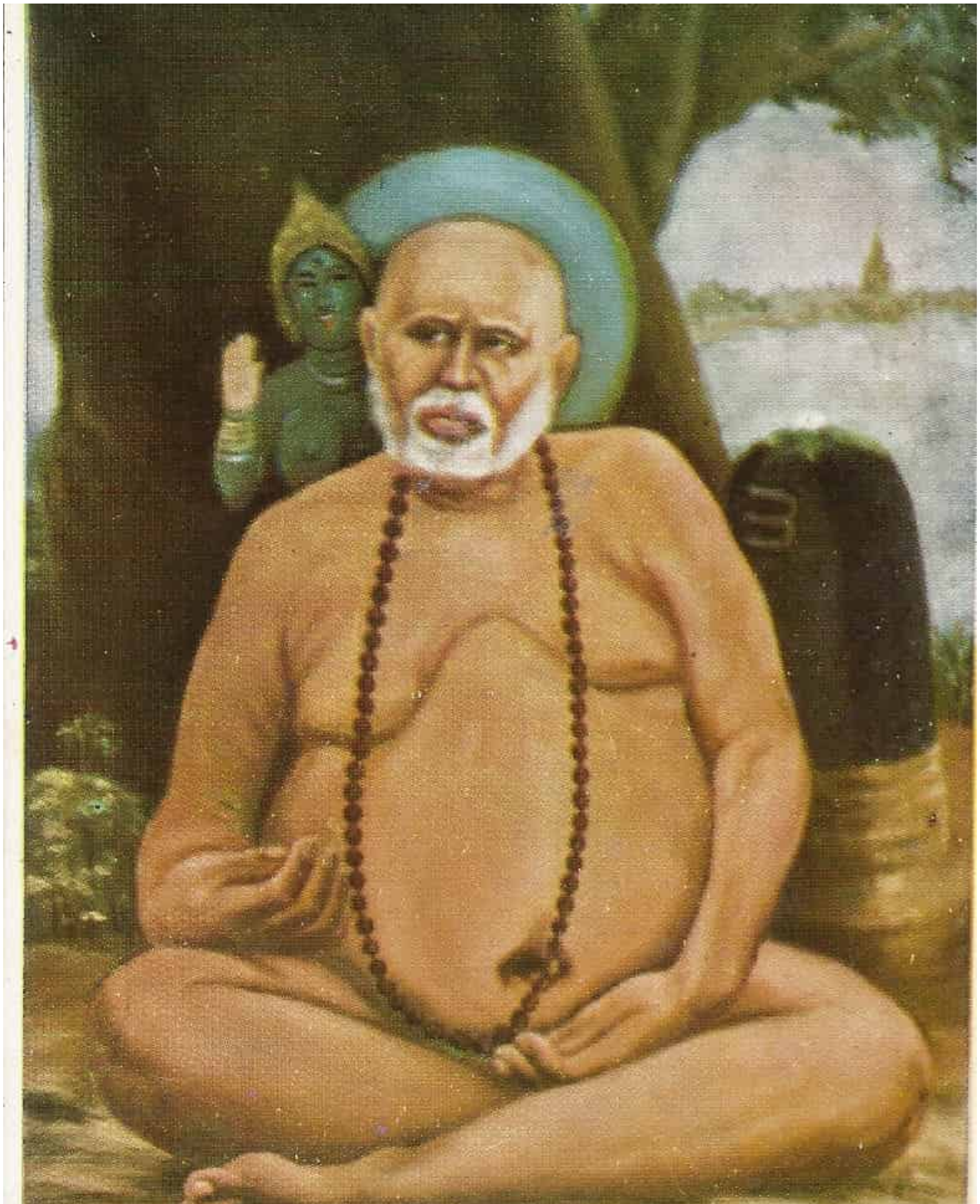
প্রচ্ছদ সুব্রত চৌধুরী

TROILONGOSWAMI SOMOGRO
Biography & Compilation *by* Apurba Chattopadhyay
Published by PATRABHARATI 3/1 College Row, Kolkata 700009
Phones +91-33-22411175, 9433075550, 9830806799
E-mail patrabharati@gmail.com
visit at www.facebook.com/Patra-Bharati-521504074559888

ISBN 978-81-8374-360-0

যাঁরা আমায় ছেড়ে চিরতরে চলে গেছেন।

সূচিপত্র



ত্রৈলঙ্গস্বামীজি

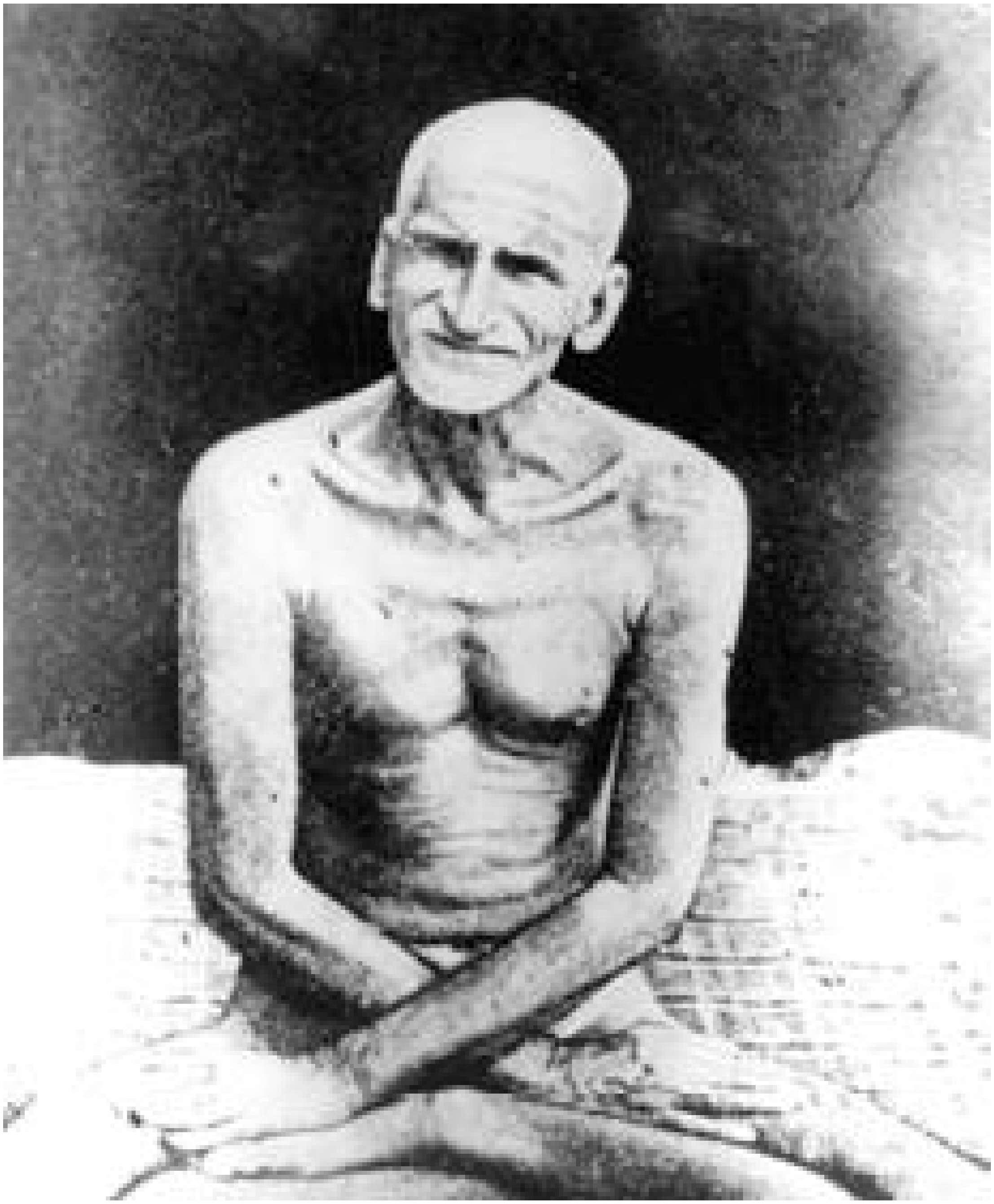




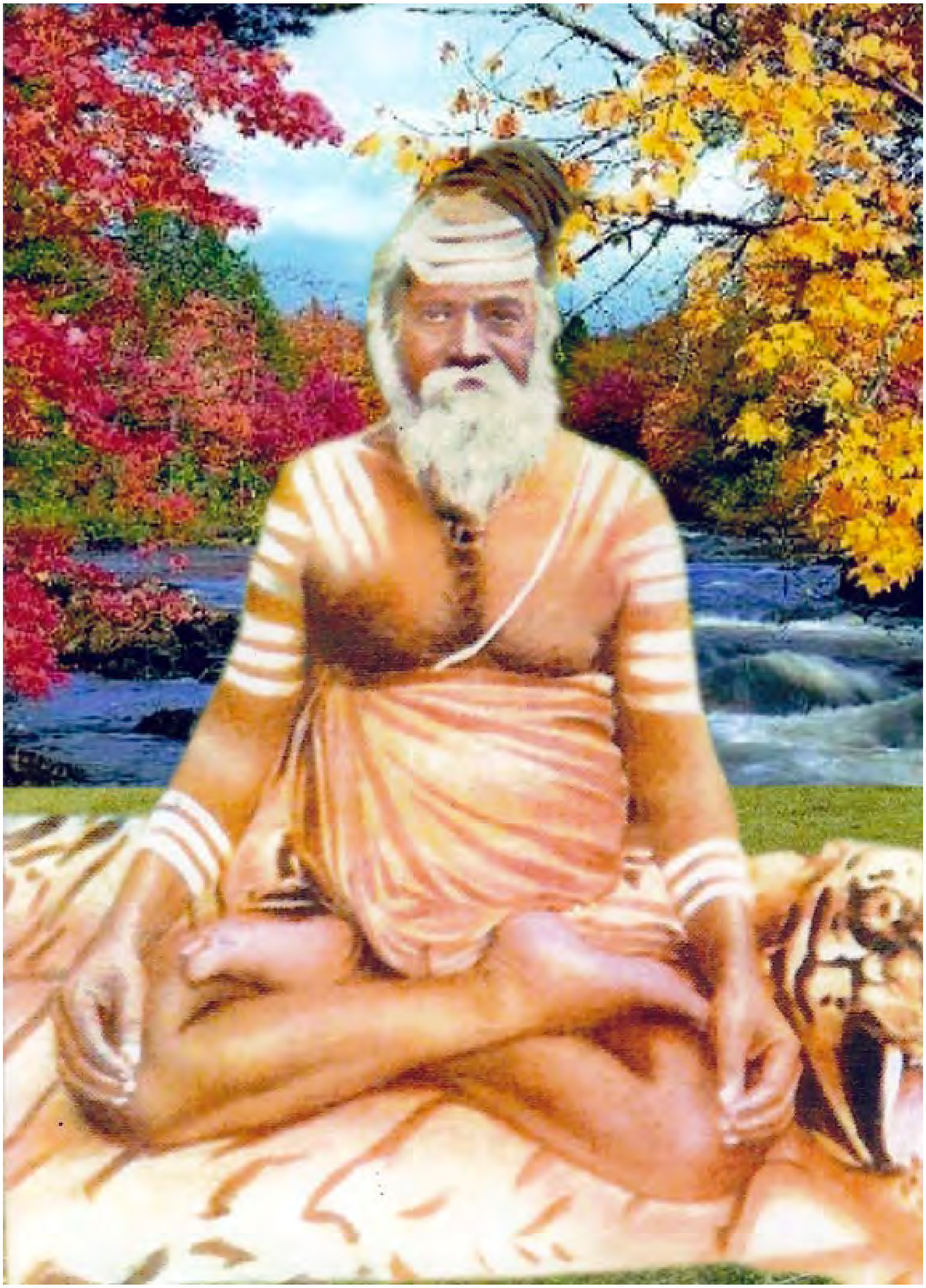
অল্প বয়সে শ্রীমদ্ তৈলঙ্গ স্বামী



ঠাকুর শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব

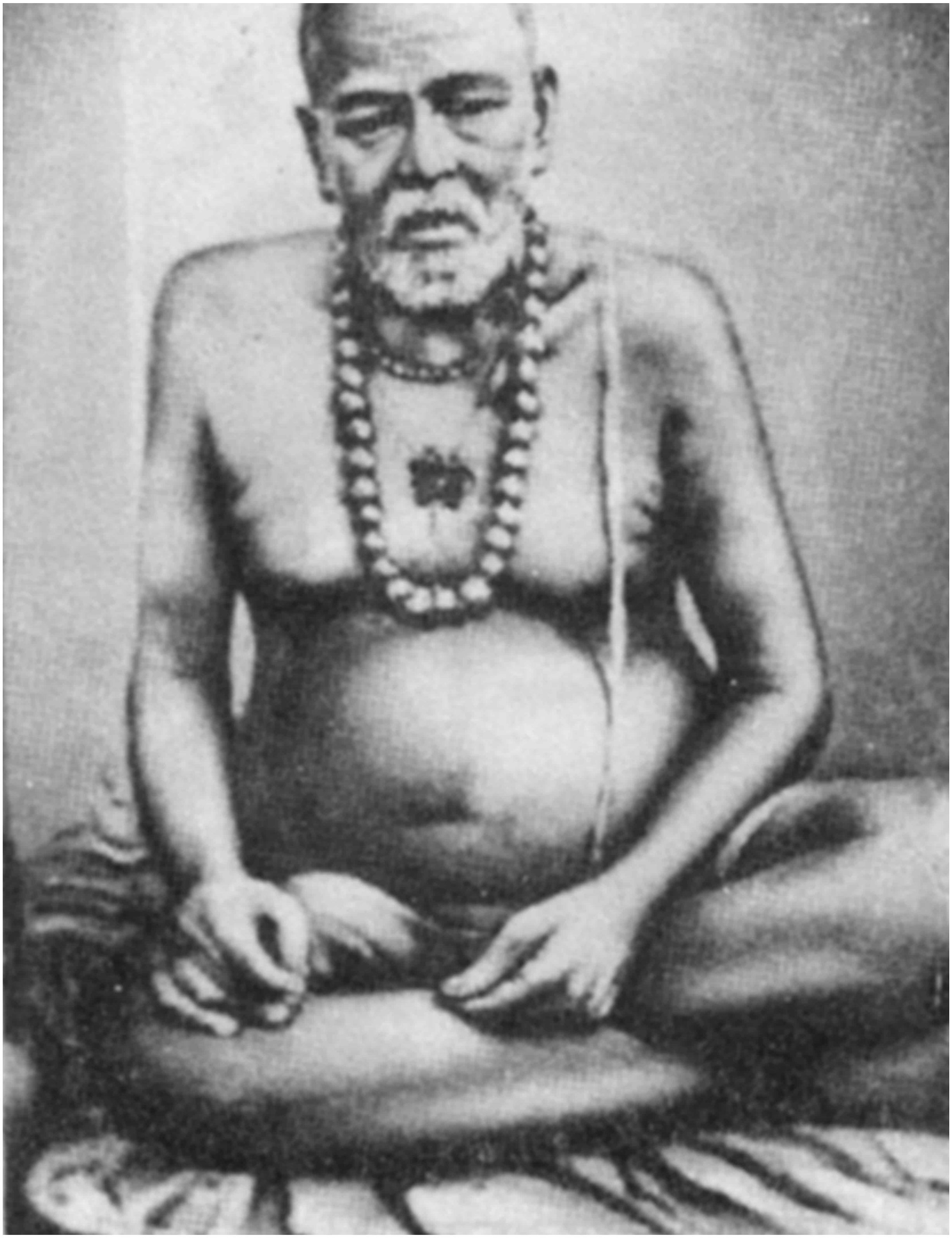


স্বামী ভাস্করানন্দ সরস্বতী



বালানন্দ ব্রহ্মচারী





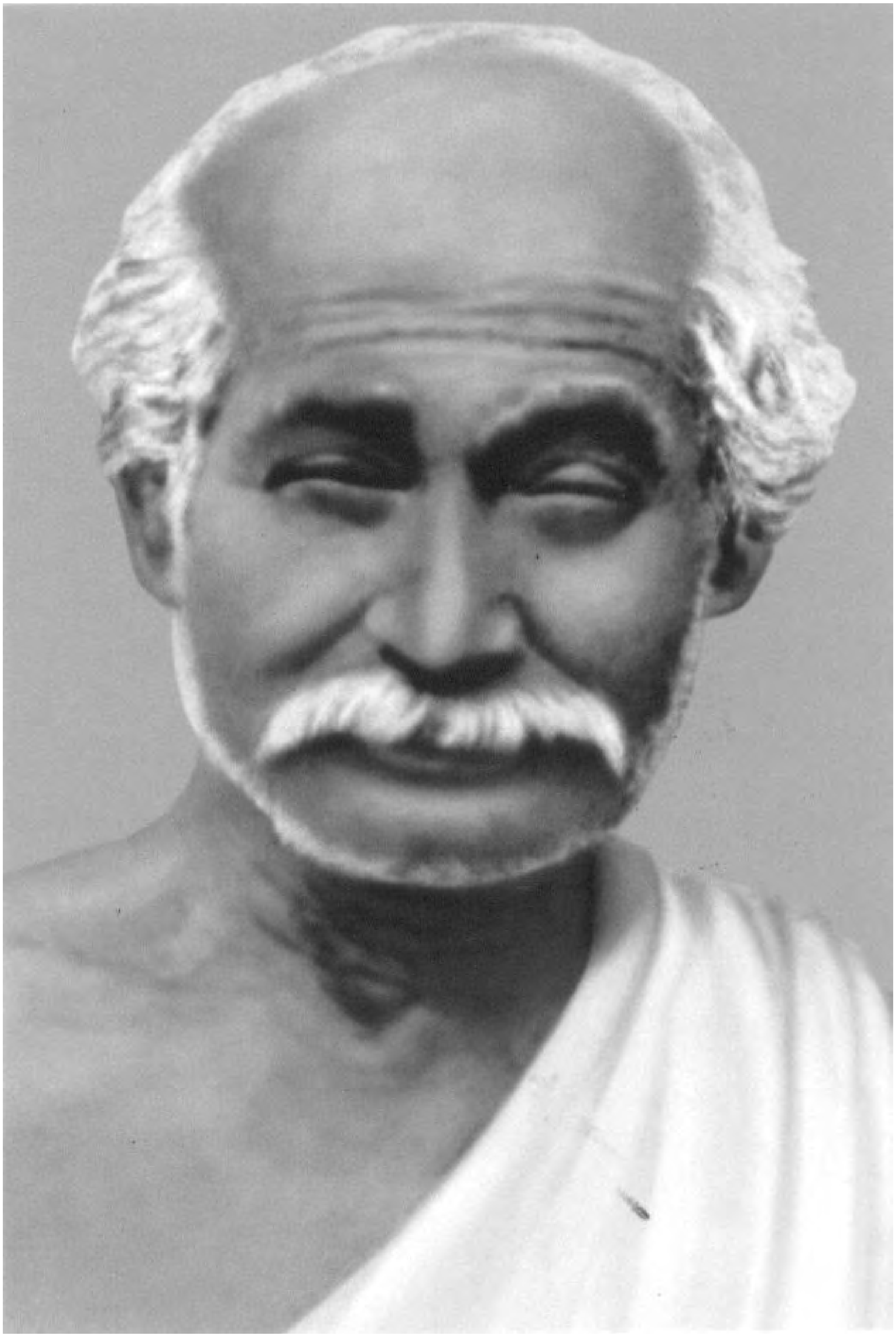
বামাক্ষ্যাপা



শ্রীমথুরানাথ বিশ্বাস

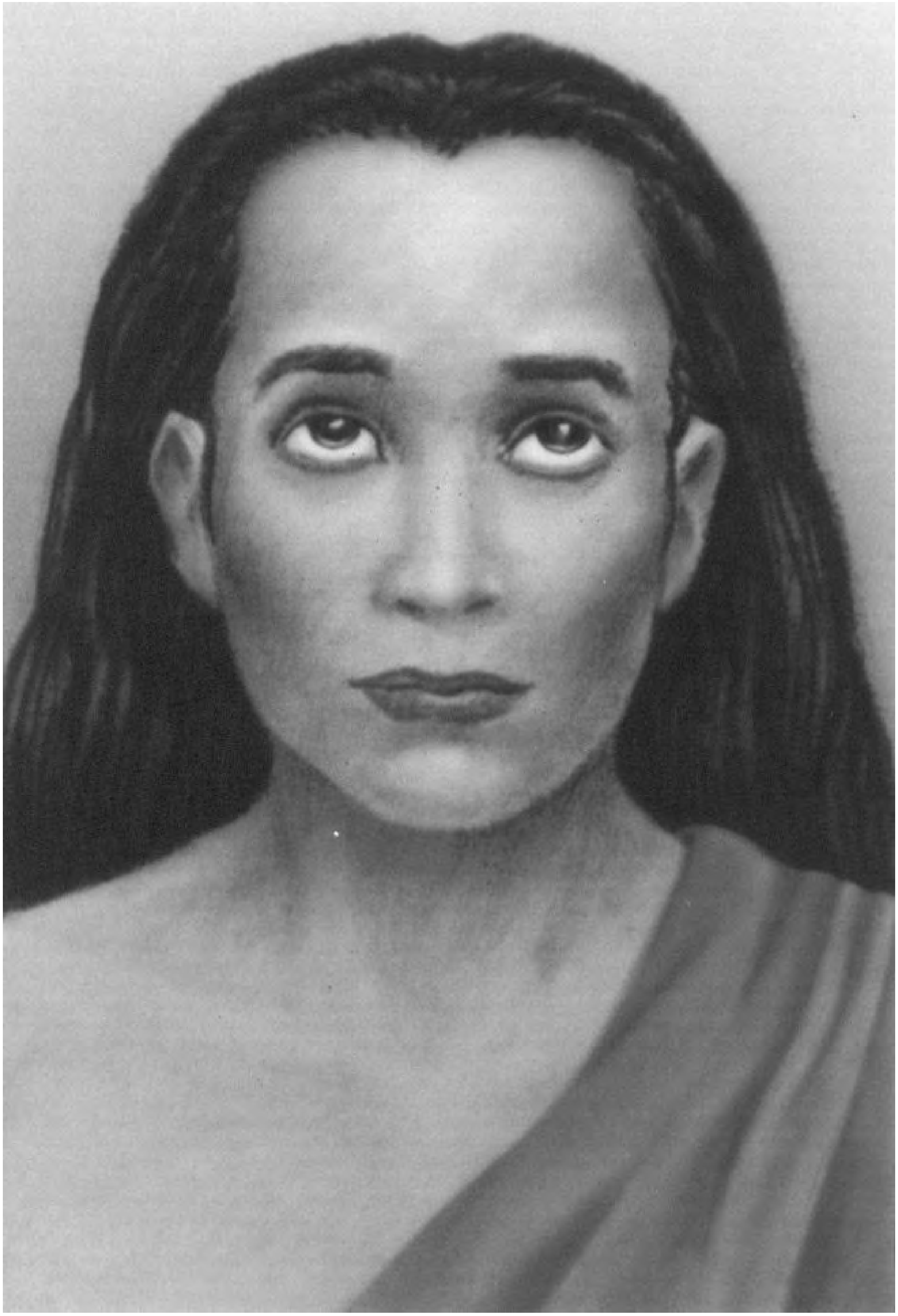


বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

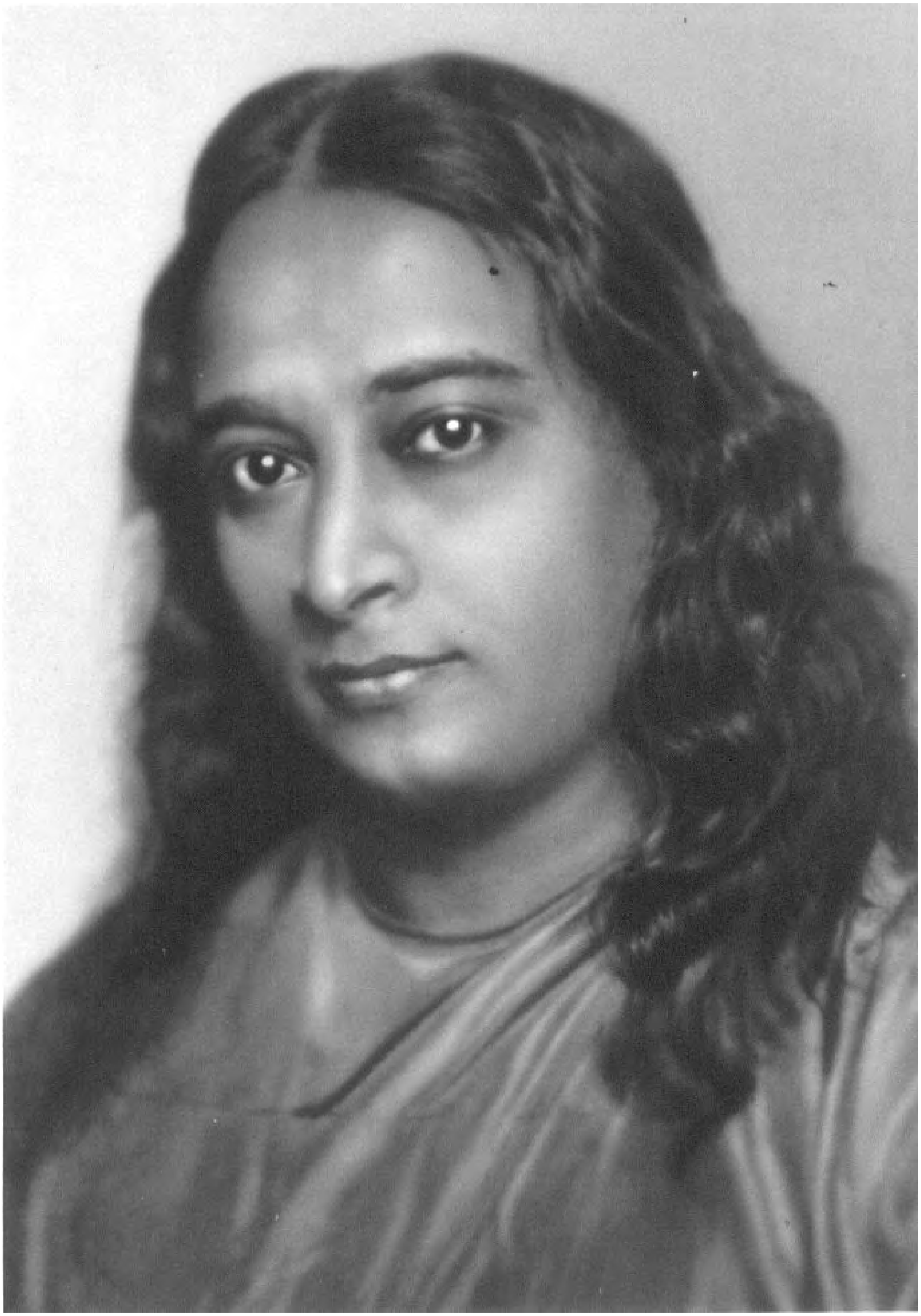


যোগীরাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ি মহাশয়

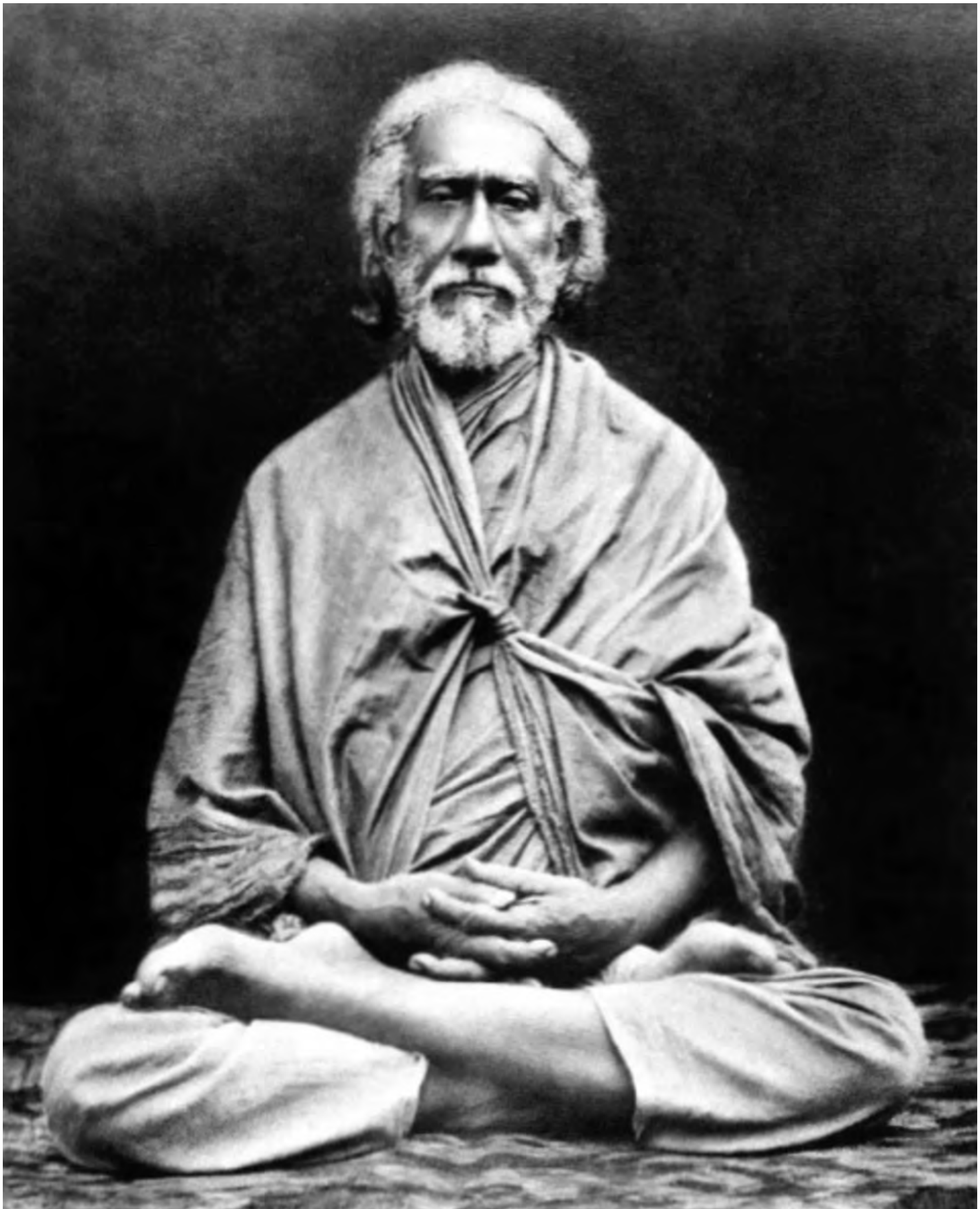
শ্রীশ্রী মহাবতার বাবাজি



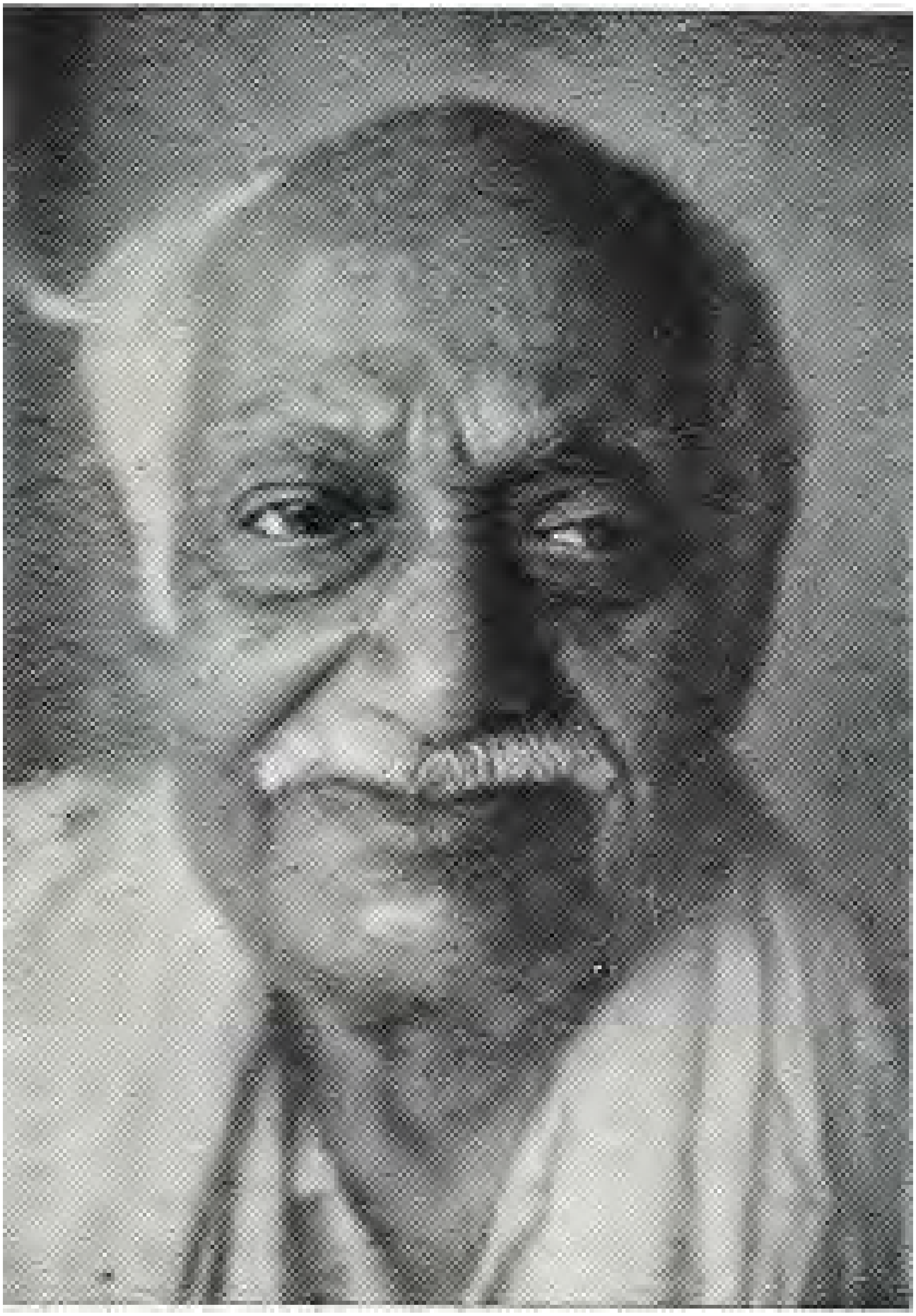
শ্রীশ্রী মহাবতার বাবাজি



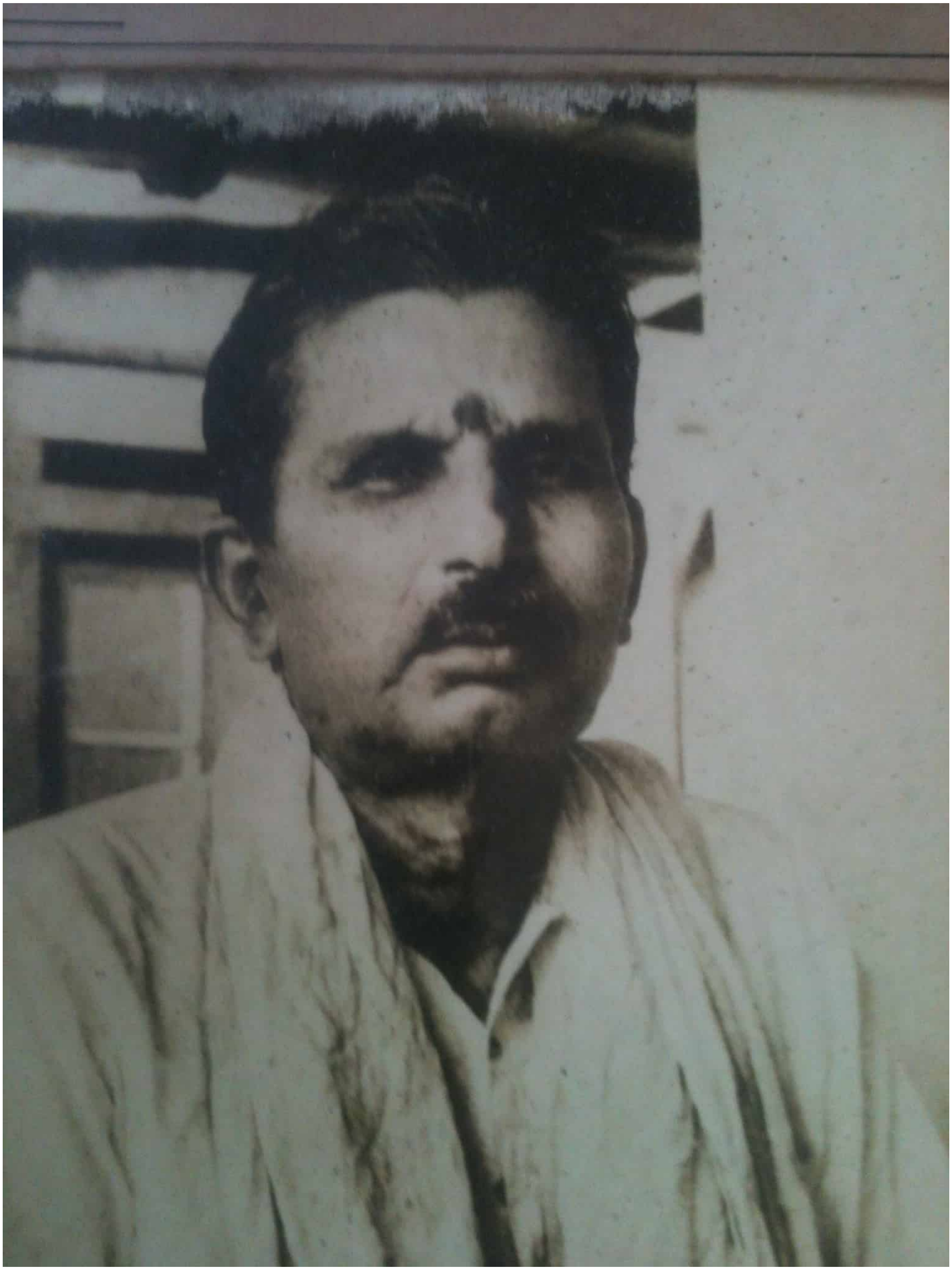
শ্রীশ্রী পরমহংস যোগানন্দ



স্বামী যুক্তেশ্বর গিরি মহারাজ



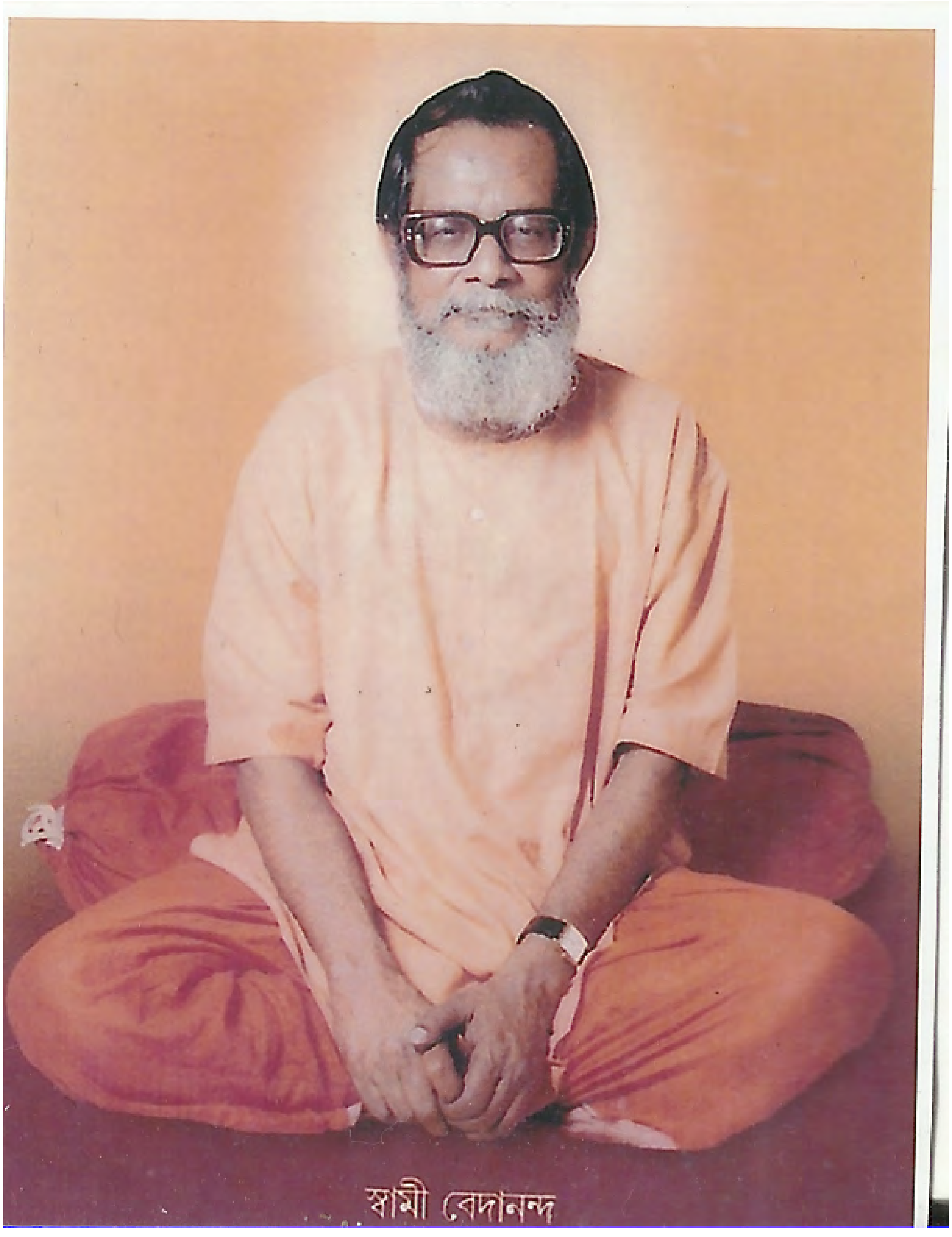
মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ



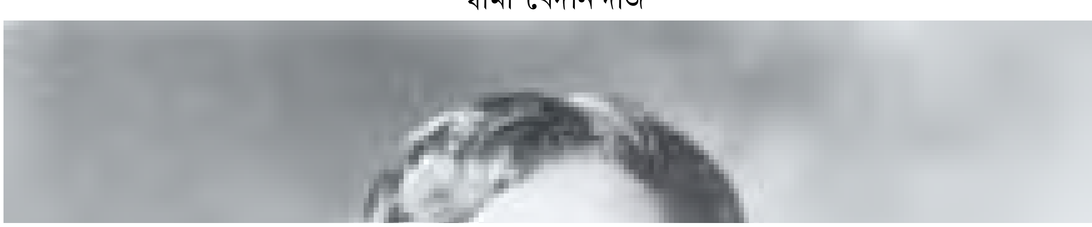
বহেরা বাবা



স্বামী অদ্ভুতানন্দ



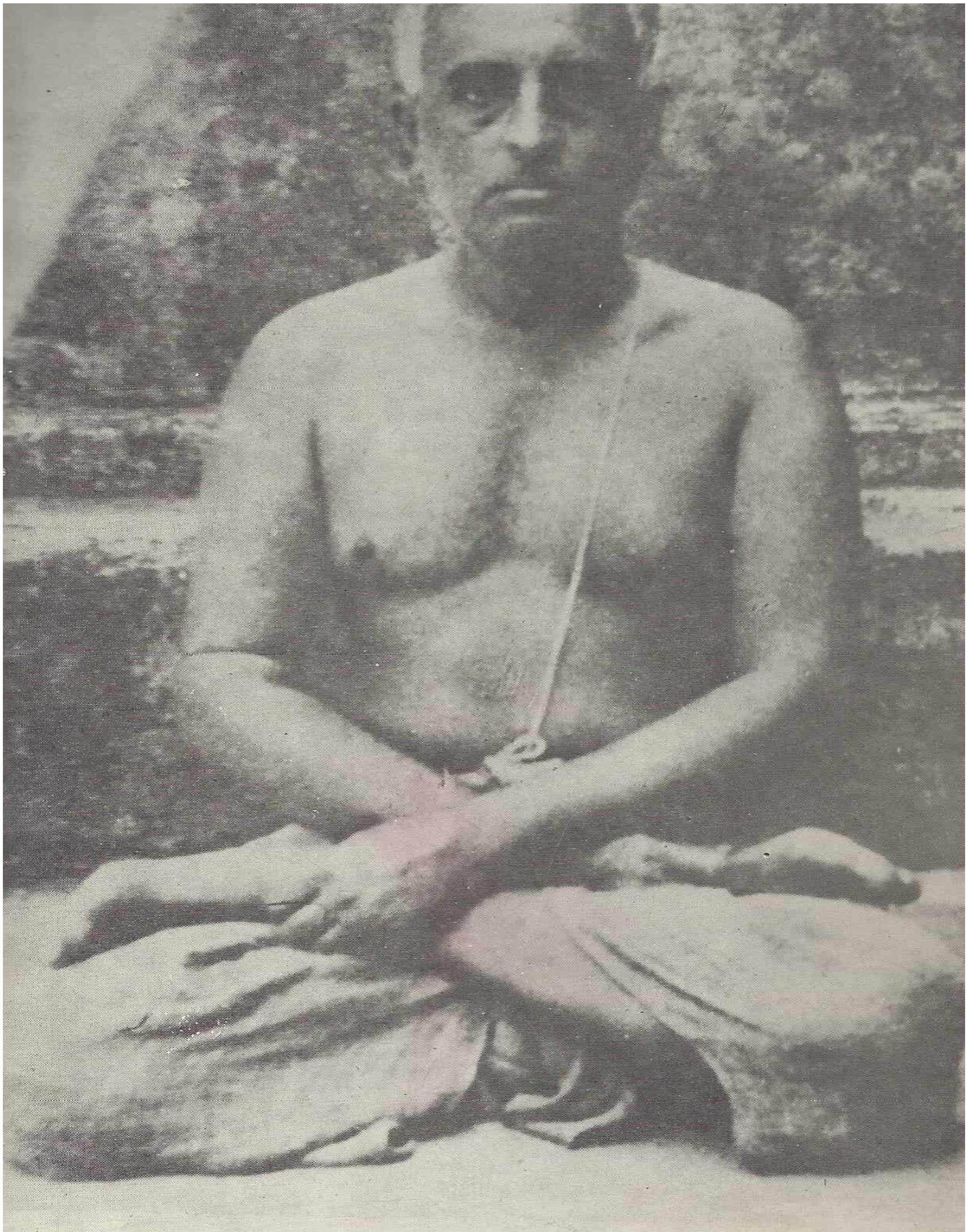
স্বামী বেদানন্দজি



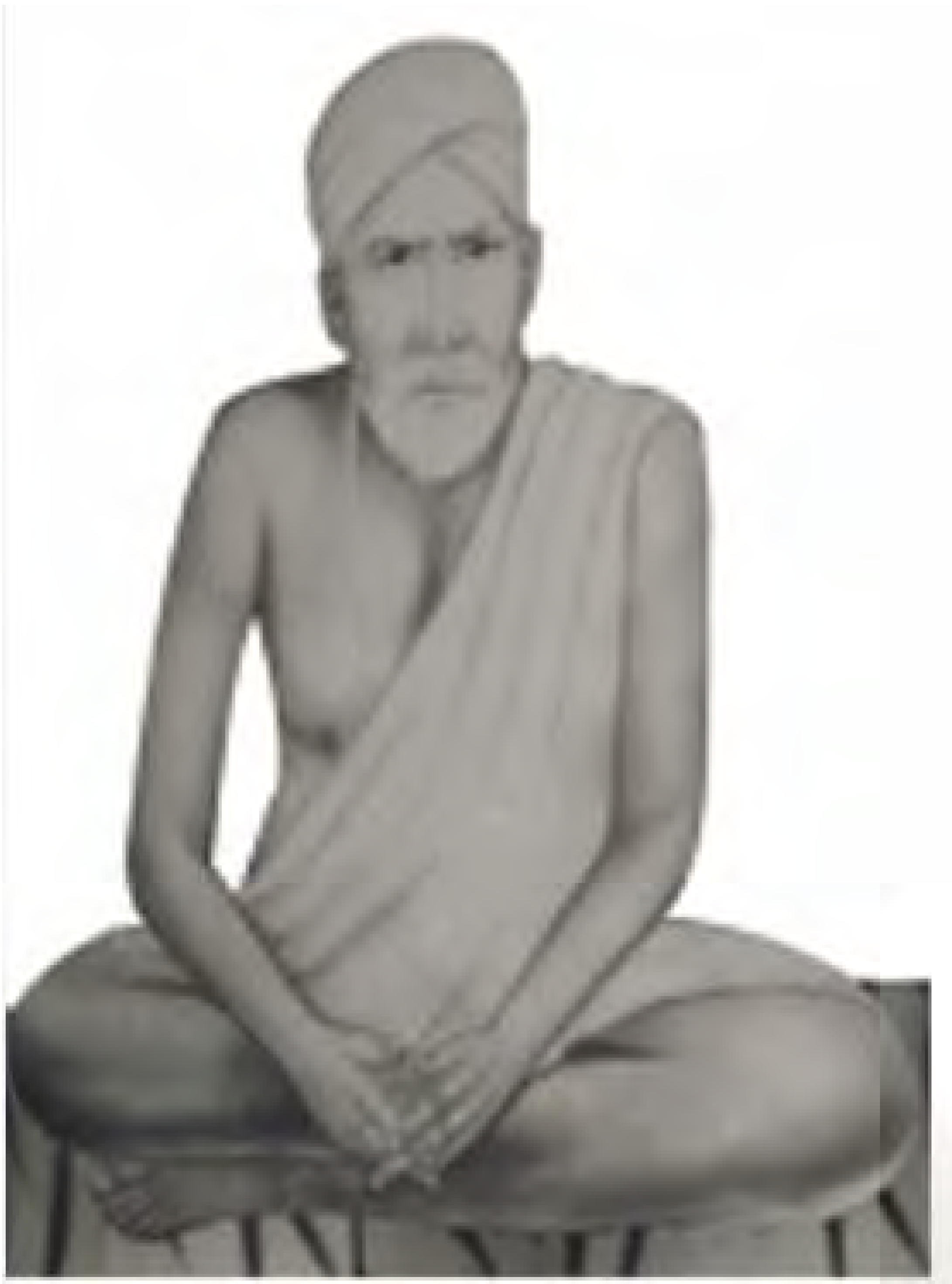


স্বামী অভেদানন্দ

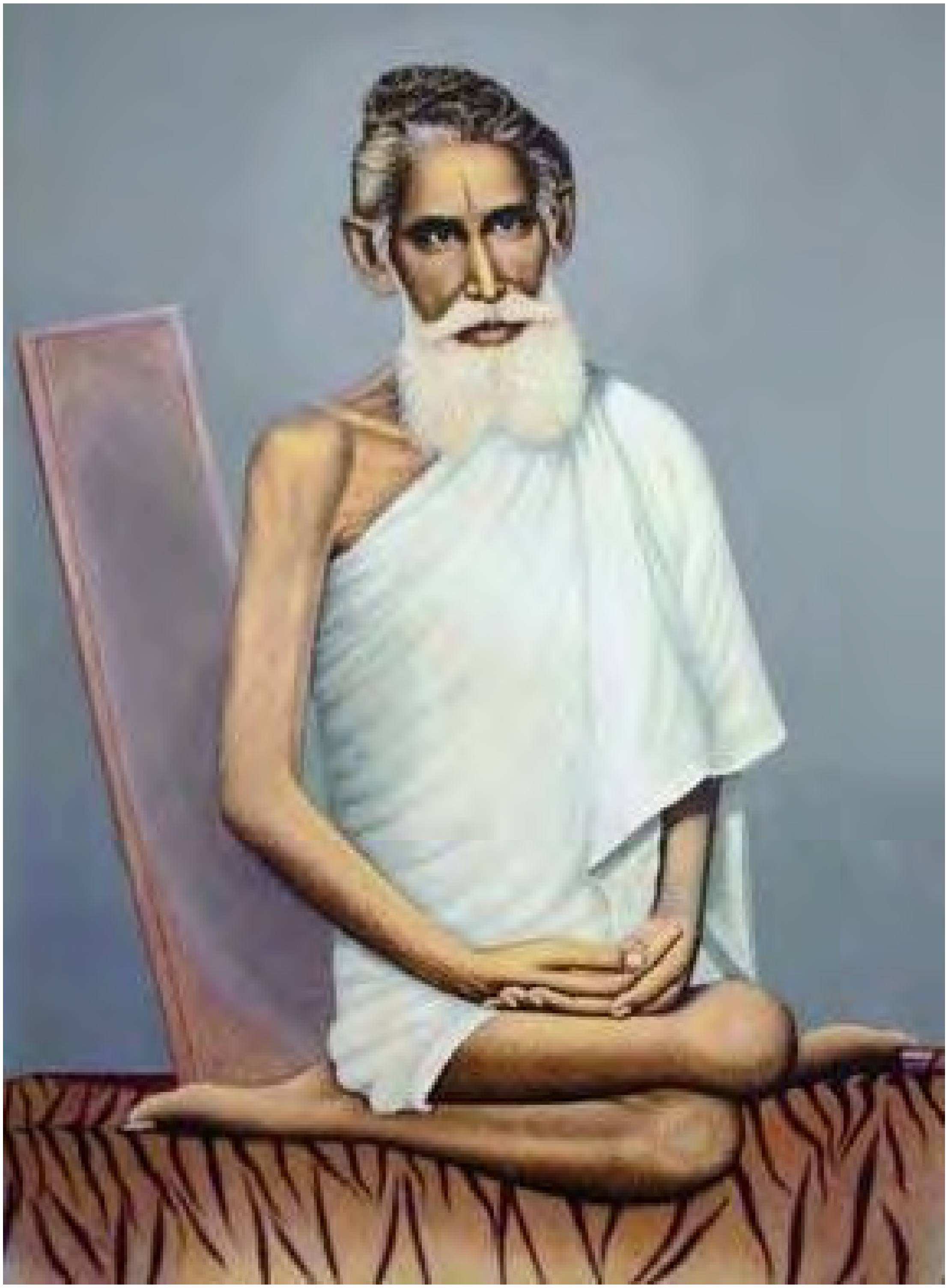




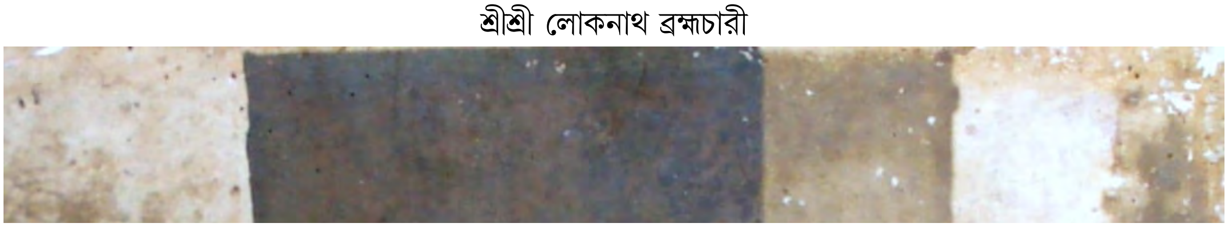
লেখক—মহাত্মন্ শ্রীসুশীল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়



মহাযোগী শ্রীবেণীমাধব



শ্রীশ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারী





স্বামীজির মানসকন্যা সন্ন্যাসিনী শঙ্করী মাতাজি

[redacted]



সারদা মা



স্বামী বিবেকানন্দ

ত্রৈলঙ্গস্বামী

কাশীর সচল বিশ্বনাথ

ভূমিকা

কোনও মহাপুরুষের জীবনী যখনই লেখা হয় তখন খুঁজে খুঁজে বের করা হয়, তাঁর জীবন ঘিরে কী কী অলৌকিক ঘটনা আছে! যত বেশি অলৌকিক ঘটনা ততই তিনি বিরাট মহাপুরুষ। যাঁরা সাধনভজন করেন তাঁদের একটি মাত্র উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ। এই ঈশ্বর কোথায় আছেন? আত্মস্বরূপকেই বলা হয় ভগবান। সব মানুষের মধ্যেই তিনি আছেন। এটিকে প্রত্যক্ষ করার চেষ্টাকেই বলা হয় সাধনা বা তপস্যা। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম প্রধান শিষ্য রামচন্দ্র দত্ত ঠাকুরের দেহাবসানের পর রঙমহল থিয়েটারটি ভাড়া নিয়ে পরপর কয়েকটি ভাষণ দিয়েছিলেন। তিনি বলতেন, অলৌকিক ঘটনা না থাকলে কোনও সাধককে অবতার বলা যায় না, তিনি খুঁজে খুঁজে—সম্ভব-অসম্ভব অনেক অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ ঠাকুরের জীবন ঘিরে ঘটেছিল, সেই কথাই তাঁর ভাষণে প্রকাশ করেছিলেন। বিরূপ সমালোচনা হয়েছিল, কারণ যুক্তিবাদী আধুনিক মানুষের ঈশ্বর দর্শন সম্পর্কে ধারণা অন্যরকম। স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণও সিদ্ধাই-এর ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। জাদুবিদ্যা দেখানোর নামই সিদ্ধমহাপুরুষের সংজ্ঞা তা কিন্তু নয়!

ত্রৈলঙ্গ মহারাজ বারাণসীর ভৈরব। দীর্ঘ সাধনজীবন তিনি এই তীর্থভূমিতে অতিবাহিত করেছিলেন। তাঁর সম্পর্কে যা লেখা হয়েছে সব লেখাতেই তাঁর অলৌকিকত্বই প্রাধান্য পেয়েছে। প্রথম হল, তাঁর অবিশ্বাস্য দীর্ঘ জীবন। তিনি দেহে ছিলেন দুশো আশি বছর। এটি একটি অকল্পনীয় ব্যাপার। প্রাণায়াম সিদ্ধ যোগীদের আয়ু দীর্ঘ হয়, কারণ তাঁদের শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়মিত। যাঁরা কুম্ভকে দীর্ঘক্ষণ থাকেন, মৌনাবলম্বন করেন তাঁদের পরমায়ু স্বাভাবিকভাবেই দীর্ঘ হয়। যুক্তি বা বিজ্ঞান হল—বারে বারে শ্বাস নিলে আয়ু খরচ হয়ে যায়। একজন মানুষ কতবছর বাঁচবেন তা নির্ভর করে তাঁর শ্বাসের নিয়ন্ত্রণের ওপর। আয়ু বছরে নয়, শ্বাসপ্রশ্বাসের অঙ্কে নির্ধারিত। ত্রৈলঙ্গস্বামী কুম্ভকে থাকতেন এবং মৌনী। যাঁরা ব্রহ্ম সাধন করেন তাঁদের পদ্ধতি এইরকমই।

এই জীবনীতে অপূর্ব অনেক পরিশ্রম করে ত্রৈলঙ্গ মহারাজের সাধনার দিকটি দেখাবার চেষ্টা করেছেন। তিনি কি সাধন করেছিলেন? সচল বিশ্বনাথ এই বিশেষণটি দিয়ে কিস্তিমাত করা যায় না। দুশো আশি বছরের একটি জীবন, তাঁর বার্ধক্য না থাকলেও শৈশব, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব—স্বাভাবিকভাবেই ছিল। দেহ ধারণ করলে এই স্তরগুলি টপকে যাওয়া যায় না, ত্রৈলঙ্গস্বামী বৈষ্ণব, শাক্ত না শৈব, না অঘোরী, কিংবা তান্ত্রিক এটি জানা দরকার। প্রায় সব জীবনীতেই তাঁর কাশী পর্বটি প্রাধান্য পেয়েছে। আগে কী হয়েছে এই অনুসন্ধান তেমনভাবে হয়নি। অপূর্ব সেই কাজটি করেছেন। তাঁর পারিবারিক জীবনের কথা বলেছেন। পরিবার ছাড়া মানুষ কোথায় আসবে। বিভিন্ন জীবনীতে সংক্ষেপে এইসব কথা বলা হয়েছে। অপূর্বর লেখায় সেটি বেশ বিস্তারিত। কারণ তিনি অনেক অনুসন্ধানে বেশ কিছু নতুন তথ্য সংগ্রহ করেছেন। ত্রৈলঙ্গ মহারাজের বর্তমান উত্তরাধিকারদের কাছ থেকে। তাঁর পরিবারের সদস্যরা সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হননি। পূর্বের জীবনীকাররা এই তথ্যভাণ্ডারের দিকে হাত বাড়াননি, কারণ তাঁরা ত্রৈলঙ্গস্বামীর জীবনের অলৌকিক ঘটনাগুলিকেই গুরুত্ব দিতে চেয়েছেন। তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব বোঝাবার জন্য এই প্রয়াস। কিন্তু প্রশ্ন হল, ত্রৈলঙ্গ মহারাজ কোন গুরুর আশ্রয়ে কী সাধন করে এমন অলৌকিক সিদ্ধমহাপুরুষ হয়েছিলেন। তিনি যে প্রায় তিন শতাব্দী ধরে স্বমহিমায় বিরাট ও স্বরাট—সে বিষয়ে কোনও বিতর্ক নেই। তিনি তিনিই, তুলনাহীন, দ্বিতীয় কেউ নেই।

প্রথম জীবনে পরিব্রাজক, প্রথম জীবন বলার কারণ বাহান্ন বছর বয়েসে তাঁর প্রব্রজ্যা শুরু হয়। যাঁর পরমায়ু দুশো আশি, বাহান্ন বছর তো তাঁর শৈশব। ভারতবর্ষের সমস্ত তীর্থ তিনি পরিভ্রমণ করেছিলেন। তারপর গিয়েছিলেন তিব্বতে। শুধু তিব্বত নয়, চলে গিয়েছিলেন উত্তর মেরুতে। সম্পূর্ণ নগ্ন, মৌনী এবং নিঃসঙ্গ। এই জীবনীতে সেই বর্ণনা আছে। যখন তিনি পরিব্রাজক তখন তিনি ব্রহ্মজ্ঞ, ব্রহ্ম লাভ করেছেন এবং বলার অধিকার অর্জন করেছেন—আমিই ব্রহ্ম। যাবতীয় সিদ্ধাই করতলগত, সমাহিত, স্থির মনস্ক, প্রকৃতি তাঁর শাসনে। ফলে পৃথিবীর যে-কোনও জায়গায় অনায়াসে, অক্লেশে পৌঁছে যাওয়া তাঁর কাছে শ্বাস-

প্রশ্বাসের মতোই সহজ ব্যাপার। এর মধ্যে অলৌকিকত্ব থাকলেও অনেক সিদ্ধ মহাপুরুষেরই এই ক্ষমতা ছিল। ত্রৈলঙ্গ মহারাজের বিশেষত্ব তিনি তাঁর এই অতিপ্রাকৃত শক্তিটিকে অস্বাভাবিক মনে করতেন না। এই শক্তি প্রদর্শন করে অনেক শিষ্য করার আকাঙ্ক্ষা তাঁর একেবারেই ছিল না। তাঁর কোনও আশ্রম ছিল না। বারাণসীর ঘাট থেকে ঘাটে তিনি অবস্থান করতেন। জীবনের অন্তিম পর্বে তিনি একটি জায়গায় স্থিত হয়েছিলেন। এবং আদিষ্ট হয়ে তিনি শিবলিঙ্গ ও মঙ্গলা গৌরী মায়ের মূর্তি স্থাপন করেন তাঁর এক ভক্ত শিষ্য মঙ্গল ভট্টের গৃহে। মঙ্গলা গৌরী আমাদের মা কালী, শুধু দুটি পার্থক্য—তাঁর পদতলে শিব শায়িত নন, ফলে মায়ের জিহ্বা অনুপ্রবিষ্ট।

তাঁর জীবন ঈশ্বর পরিচালিত। তিনি কিন্তু মা গঙ্গার পুত্র। এই গঙ্গাবক্ষে ছিল তাঁর লীলা প্রসারিত। কখনও কাষ্ঠখণ্ডের মতো ভাসছেন, কখনও তলিয়ে যাচ্ছেন। তিনি কী সাধন করেছিলেন তা জানতে হলে তাঁর প্রিয় শিষ্য উমাচরণ মুখোপাধ্যায়কে যে শাস্ত্রটি তৈরি করে দিয়ে গিয়েছিলেন, যার নাম 'মহাবাক্য রত্নাবলী', পড়তে হবে। নিরাকার ব্রহ্মের সাধনা। ত্রৈলঙ্গস্বামী জ্ঞানমার্গী, অষ্টসিদ্ধির অধিকারী। আমিই ব্রহ্ম—এই বাক্যটির সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি।

এই জীবনীটি সর্ব অর্থে ব্যতিক্রমী। লেখক কতটা পরিশ্রম করেছেন তা পাঠ করলেই পাঠকগণ বুঝতে পারবেন। ভারতবর্ষের সাধন ঐতিহ্যের হিমালয় ত্রৈলঙ্গস্বামী। অপূর্ব চট্টোপাধ্যায়ের এই প্রয়াস শুধু সাহিত্য নয়, সাধনা, আমি প্রত্যক্ষ করেছি। মাসের পর মাস ত্রৈলঙ্গ ভাবনায় ভাবিত হয়ে নিবিড় এক তপস্যার কাল অতিবাহিত করেছে। আগে হৃদয়ে ধারণ, পরে উদগিরণ। এমন সমাবেশ এক তপস্যা।

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

বরানগর

১৬/১১/২০১৫

মঙ্গলবার

সংক্ষিপ্ত নিবেদন

ঋণ স্বীকার, এই ঘোর কলিতে ঋণ করে তা পরিশোধ না করাটাই ধর্ম। কিন্তু ত্রৈলঙ্গস্বামীর মতো মহামানবের জীবনী লেখার পর এইরকম আচরণ করতে মন সায় দিল না। অগত্যা ধর্মচ্যুত হলাম। প্রথমেই, কাশীর সচল বিশ্বনাথ ত্রৈলঙ্গ স্বামীজির চরণে শতকোটি প্রণাম। তাঁর ইচ্ছা না থাকলে কিছুতেই এই বই লেখা সম্ভব হত না। আমরা তো তাঁর হাতের ক্রীড়নক মাত্র। প্রণাম জানাই মহর্ষি উমাচরণ মুখোপাধ্যায় ও সন্ন্যাসিনী শঙ্করী মাতাজিকে।

বর্তমান পত্রিকার সম্পাদিকা শ্রীমতী শুভা দত্ত মহাশয়াকে শ্রদ্ধা ও বন্ধুবর জয়ন্ত দেকে ভালোবাসা জানাই। বর্তমান পত্রিকার মহালয়ার সাপ্লিমেন্টে তারাই স্বামীজিকে নিয়ে আমায় লিখতে বলেছিলেন।

আমার দাদা ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে আমি চিরঋণী। আমার প্রথম লেখা 'বাঘবন্দী খেলা' প্রকাশিত হয়েছিল বর্তমান পুজো সংখ্যায়। তৎকালীন পুজো সংখ্যার সম্পাদক শ্রদ্ধেয়া কাকলি চক্রবর্তী (মিলুদি)-র নির্দেশে। সেই পুজোর লেখাটি পড়েই আমার দাদা সেটিকে বাড়ানোর নির্দেশ দেন। পত্র ভারতী থেকে প্রকাশিত হয় 'বাঘবন্দী খেলা'। এক্ষেত্রেও তাই হল। কোনও নামী প্রকাশক কোনও নগণ্য লেখককে 'লেখো' 'লেখো' করে এরকম তাগাদা কখনও দিয়েছেন বলে শুনিনি।

আমার কাকা, অমরনাথ পোদ্দার মহাশয় আমাকে ত্রৈলঙ্গ স্বামীজি সম্পর্কিত নানা বই, তথ্য ও ছবি দিয়ে সাহায্য করেছেন। সহ্য করেছেন অসহ্য অত্যাচার। তিনিই শঙ্করী মাতাজির গ্রন্থটির প্রকাশক।

আমার বাবাকে জানাই আমার প্রণাম। তিনি আমাকে অসংখ্য বই সরবরাহ করেছেন। তাঁর বিশাল লাইব্রেরি। সেখান থেকে আমার প্রয়োজন মতো বই তিনি প্রতিমুহূর্তে বের করে দিয়েছেন। এই জীবনীগ্রন্থ তাঁর সাহায্য ছাড়া লিখতে পারতাম না। প্রণাম জানাই আদ্যাপীঠ আশ্রমের প্রয়াত সন্ন্যাসিনী আমার বেলাদিদাকে।

আমার বড়দি শ্রীমতী ছন্দবাণী মুখোপাধ্যায়কে প্রণাম। তিনি এই লেখার ব্যাপারে সবসময় উৎসাহ জুগিয়েছেন। তাঁর দেওয়া কলম দিয়েই এই লেখা শুরু করি।

আমার স্ত্রী সুস্মিতা, দুই কন্যা পূজা ও শুদ্ধা লেখো, লেখো করে উত্যক্ত করে মারত। ওরা কাবুলিওয়ালা না হলে আমার শীত-ঘুম ভাঙত না। সুস্মিতা ও টুটুন প্রুফ দেখার কাজে ভীষণভাবে সাহায্য করেছেন।

দাদা ডাঃ সত্যপ্রিয় দে সরকার, তাঁর শত ব্যস্ততার মাঝে কতটা লেখা এগোল, আজ কোন জায়গায় আছ তা নিয়মিত জেনে উৎসাহ দিতেন।

আমার দুই ভাই ও এক বন্ধু—সুব্রত, শান্তনু ও পুলকেশ সান্যাল কলেজ স্ট্রিট থেকে আমার প্রয়োজন মতো প্রচুর বই এনে বহুবার সাহায্য করেছেন। ধন্যবাদ জানাই পত্র ভারতীর মানসদাকে।

আমার মামা শ্রীসুনীল দাস ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের লাইব্রেরিয়ান ঝুমা মহান্তির কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। মহর্ষি উমাচরণ মুখোপাধ্যায়ের তত্ত্ববোধ গ্রন্থটি তাঁরাই আমাকে পড়ার সুযোগ করে দেন।

শ্রীশ্রীপরমহংস যোগানন্দজি প্রতিষ্ঠিত যোগদা সৎসঙ্গ-এর স্বামী নিগমানন্দজি ও শৈলেশ মহারাজজিকে আমার কৃতজ্ঞতা ও প্রণাম জানাই।

রাঁচি ইউনিয়ন ক্লাব ও লাইব্রেরির শ্রীসুবীর (দা) লাহিড়ি, শ্রীমতী রীতা দে ও শ্রীকুণাল বাসু তাঁদের লাইব্রেরি যথেচ্ছ ভাবে ব্যবহার করতে দিয়েছেন। আমি কৃতজ্ঞ।

রাঁচির শ্রীমতী সবর্ণা চক্রবর্তী। শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে বহু কথা শুনিয়েছেন। মহর্ষি শ্রীউমাচরণ মুখোপাধ্যায়ের পৌত্র শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর গুরুদেব। সবর্ণার ভাই দেবজ্যোতি চট্টোপাধ্যায় মহাত্মা বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের ছবি দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন।

শ্রদ্ধেয় দাদু প্রয়াত শ্রী রামকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের একমাত্র পুত্র প্রখ্যাত সংগীত শিল্পী শ্রীকুমার কাকা (চট্টোপাধ্যায়) তাঁর তোলা স্বামীজি ও মায়ের ছবি দিয়ে আমাকে কৃতার্থ করেছেন।

আমি প্রত্যেকের কাছে কৃতজ্ঞ, চিরকৃতজ্ঞ।

অপূর্ব চট্টোপাধ্যায়

২২/০২/২০১৫
রবিবার

১

দুশো আশি বছরের এক সুদীর্ঘ সুন্দর জীবন, না, জীবন নয়! অপূর্ব অদ্ভুত এক মহাপুরুষের মহা অলৌকিক মহাজীবন। সেই মহাপুরুষ তাঁর অদ্ভুত মহাজীবনের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়েছিলেন মা গঙ্গাকে। ঠিক যেন মাতা-পুত্রের অচ্ছেদ্য বন্ধন। জীবনের প্রতিটি ভাঁজে, প্রতিটি খাঁজে তিনি গ্রহণ করেছিলেন মা গঙ্গাকে। অর্ধ অঙ্গ থাকবে জলে অর্ধ অঙ্গ স্থলে—তা কিন্তু নয়। চিত্রটা ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। মায়ের বুকে, মায়ের কোলেই তিনি কাটাতেন দিনের বেশির ভাগ সময়। সেই সময়কার সৌভাগ্যবান মানুষ সেই অলৌকিক ঘটনা দেখে ধন্য হয়েছিলেন। হঠাৎই তিনি নেমে গেলেন গঙ্গাবক্ষে। শুরু হল জলকেলি। কখনও চিত সাঁতারে ভেসে বেড়াচ্ছেন এদিক থেকে ওদিক। আবার নিমেষের মধ্যে তিনি অদৃশ্য। তিনি তখন ডুব দিয়েছেন মায়ের শীতল বক্ষে। বাবা! কিন্তু সে যে মহাপুরুষের মহা ডুব। দীর্ঘসময় বাদে তিনি উঠে এলেন জলের ওপরে। কিন্তু এতক্ষণ তিনি কীভাবে, কোথায় ছিলেন!

কাশীর চলমান শিব, মহাযোগেশ্বর বাবা ত্রৈলঙ্গ স্বামীজির মানসকন্যা, শিষ্যা শ্রীশ্রী শঙ্করী মাতাজি আমাদের এই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে গেছেন। শঙ্করী মাতাজির তখন আট-দশ বছর বয়স। বাবাজি গঙ্গায় স্নান করতে যাওয়ার সময় একদিন তাঁকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। তাঁকে পঞ্চগঙ্গার ঘাটে বসিয়ে স্বামীজি স্নানে নামলেন। সে এক ভয়ংকর স্নান। হঠাৎ তিনি একটা ডুব দিলেন। ব্যস, স্বামীজি উধাও! কেটে গেল দীর্ঘ সময়। মাতাজির তখন ভয়ভয় করছে। এক সময় ত্রৈলঙ্গজি আবার দৃশ্যমান হলেন। তিনি মাতাজির দিকে তাকিয়ে ইশারায় তাঁকে জলে নামতে বললেন। ভীত মাতাজি ততোধিক ভীতকণ্ঠে বললেন, 'বাবা, আমি তো সাঁতার কাটতে পারি না। জলে যে ডুবে যাব।' স্মিত হেসে স্বামীজি বললেন, 'ভয় নেই মা, তোমার কিছু হবে না। তুমি আমার কাছে এসো।' পিতা, গুরুর কথা অমান্য করতে পারলেন না মাতাজি। তিনি ধীরে ধীরে জলে নামলেন। স্বামীজি তাঁকে তুলে নিলেন পিঠের ওপর। ছোট্ট মাতাজি তাঁর ছোট্ট দুটি হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলেন চলমান শিবের গলা। স্বামীজি তাঁকে নিয়ে ডুব দিলেন জলের তলায়।

সেই ছোট্ট বালিকা শঙ্করী মাতাজির জন্য অপেক্ষা করে ছিল অপার বিস্ময়। সেদিন দিব্যস্পর্শে তিনি দিব্যদৃষ্টি লাভ করেছিলেন। তিনি কী দেখেছিলেন! দেখলেন, জলের তলায় একটি দিব্যঘরে স্বয়ং ত্রৈলঙ্গ স্বামীজি বসে আছেন। তাঁর সামনে বসে আছেন তিনিও। স্বামীজি মাকে জিগ্যেস করলেন, 'তুমি মা কোথায় এসেছ, বলতে পারবে?' মা বলেছিলেন, 'এ তো একটা নতুন ধরনের বাড়ি।' তাঁদের সামনে পাটের শাড়ি পরিহিতা আট-দশ বছরের বালিকাও দাঁড়িয়েছিলেন। মাতাজি বাবার কাছে তাঁর পরিচয় জানতে চেয়েছিলেন। ত্রৈলঙ্গজি উত্তরে বলেছিলেন, 'ইনি ভগবতী শঙ্করী মা। তুমি প্রণাম করো।' স্বামীজির নির্দেশে মাতাজি ভগবতী শঙ্করী মাকে প্রণামও করেছিলেন।

স্বামীজি এরপর মায়ের কাছে জানতে চেয়েছিলেন, 'এখন তুমি কোথায় আছ বলো তো মা! আমরা তো গঙ্গাগর্ভের ভিতরেই আছি, এটা কি ঠিক!' উত্তরে মাতাজি বলেছিলেন, 'এখানে তো অনেক দিব্য বাড়ি-ঘর দেখছি। মা গঙ্গা কই?' স্মিত হেসে স্বামীজি সেদিন বলেছিলেন, 'হাত দিয়ে স্পর্শ করে দেখো মা।' স্বামীজির আদেশে মাতাজি হাত বাড়ালেন, চমকে উঠলেন তিনি। বললেন, 'এ যে সবই জল।' পরক্ষণেই পালটে গেল দৃশ্যপট। জল অদৃশ্য। তিনি আগের মতোই বসে আছেন সেই দিব্যঘরের মেঝেতে। আবার পরক্ষণেই তিনি দেখলেন, তিনি বসে আছেন পঞ্চগঙ্গার ঘাটে। যেখানে তাঁকে বসিয়ে স্বামীজি স্নান করতে নেমেছিলেন। আর অদূরেই তখনও স্নান করছেন কাশীর চলমান শিব স্বামী ত্রৈলঙ্গজি।

সেদিন স্নান সেরে দুজনেই ফিরে এলেন আশ্রমে। একসময় সবাই যখন চলে গিয়েছেন সেইসময় মাতাজি বাবার পাশে বসে জিজ্ঞেস করলেন, 'বাবা আজ আমরা কোন জায়গায় গিয়েছিলাম?' উত্তরে বাবা বলেছিলেন, 'মা ওটা হল নিষ্কামধাম, নিষ্কাম কর্ম করলে ওখানে যাওয়া যায়। তুমি নিষ্পাপ শিশু। তোমার

কোনও কামনা, বাসনা নেই। তাই তো তুমি ওখানে যেতে পেরেছ। এবং দিব্যদৃষ্টিতে আত্মস্বরূপ দর্শন করতে পারলে।'

ছোট্ট মাতাজি সেদিন স্বামীজির সব কথা সম্পূর্ণরূপে বুঝতে পারেননি। তবে এটুকু বুঝেছিলেন, স্বামীজির দিব্যস্পর্শে তিনি আজ এক অন্য জগতে যেতে পেরেছিলেন। শুধু তাই নয়, সেদিন থেকে মাতাজির দিব্যচক্ষু বা তৃতীয় নয়ন উন্মোচিত হয়েছিল। তিনি লতা, পাতা, বৃক্ষাদিতে জীবন্ত প্রাণশক্তি দেখতে পেতেন।

আমাদের দেশে নদীগুলির মধ্যে মা গঙ্গাকে সবথেকে উচ্চস্থানে বসানো হয়। তাই তো আমরা বলি—

'পুষ্পেষু জাতি নগরেষু কাঞ্চি।'
'নদীষু গঙ্গা ''নৃপতৌ চ রামঃ।।'''

সেই মা গঙ্গার সঙ্গে ত্রৈলঙ্গ স্বামীজির এক অনাবিল মধুর সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। আর সেই সম্পর্ক বজায় ছিল আজীবন। স্বামীজির গঙ্গাপ্রীতির এক অদ্ভুত বর্ণনা দিয়ে গেছেন আর এক বিশিষ্ট সাধক মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী। তাঁর প্রাথমিক দীক্ষা ও দেহশুদ্ধি স্বয়ং ত্রৈলঙ্গ স্বামীজিই করে দিয়েছিলেন। মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী তাঁর জীবনীগ্রন্থে লিখছেন, 'আমি তখন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে ছিলাম। তখন একবার কাশীধামের বিখ্যাত ত্রৈলঙ্গ স্বামীজির সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়।'

''আমি প্রাতে উঠিয়া বাহির হইতাম এবং প্রায়ই ত্রৈলঙ্গ স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে থাকিতাম। কোন কোন দিন একটু বেলা হইলে, স্বামীজী ইঙ্গিতে আমার ক্ষুধা লাগিয়াছে কিনা জিজ্ঞাসা করিতেন। ক্ষুধা লাগিয়াছে বলিলে, রাস্তাতে সুবিধামত কাহাকেও বলিতেন,—'উহার জন্য কিছু খাবার আন।' অমনি তাহারা ৫/৭ জনের খাবার নিয়া আসিত। আমি বলিতাম, 'এত খাইতে পারিব না, আপনি খাবেন কি?' তাহাতে তিনি স্বীকৃত হইয়া তাঁহার মুখের ভিতর খাবার দেওয়ার জন্য বলিতেন। স্বামীজী খুব খাইতে পারিতেন। খাইতে খাইতে যখন প্রায় সমস্তই নিঃশেষ হইবার উপক্রম হইত তখন আমি নিজের অংশ উহার ভিতর হইতে সরাইয়া রাখিতাম এবং বলিতাম—'আমারটা ত আমি আগে রাখিয়া দেই।' ইহাতে তিনি একটু হাসিয়া মাটিতে লিখিয়া দেখাইতেন—'বাচ্চা সাচ্চা হ্যায়।' কোন সময়ে হয়ত স্বামীজী নদীতে পড়িয়া ভোঁস করিয়া ডুব দিতেন এবং মণিকর্ণিকার ঘাটে গিয়া উঠিতেন। আমি তখন গঙ্গার পার দিয়া দৌড়াইয়া যাইতাম।''

মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণকে স্বামীজি অত্যন্ত স্নেহ করতেন। কাশীর সচল বিশ্বনাথ তাঁর অত্যন্ত স্নেহের পাত্রটিকে একবার মারাত্মক বিপদের হাত থেকে অলৌকিকভাবে বাঁচিয়েছিলেন। 'প্রয়াগের কুম্ভমেলায় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী একদিন বিশেষ অপ্রীতিকর অবস্থার মধ্যে পড়েছিলেন। সেইসময় এক 'বালক সন্ন্যাসী' এসে তাঁকে উদ্ধার করেন। ওই বালক সাধু চলে যাওয়ার পর গোস্বামীজি উপস্থিত শিষ্য ও ভক্তবৃন্দকে বলেছিলেন, 'তিনি আর কেহ নহেন, স্বয়ং ত্রৈলঙ্গস্বামী বালকরূপে আসিয়া বিপদে তাঁহাকে সাহায্য করে গেলেন।'

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী রচিত 'আশাবতীর উপাখ্যান' নামক গ্রন্থ যাঁরা পড়েছেন তাঁরা জানেন মহাত্মা গোস্বামীজি ত্রৈলঙ্গ স্বামীজিকে কী অপরিসীম শ্রদ্ধাভক্তি করতেন। তাঁর সঙ্গে স্বামীজির এক অদ্ভুত ও মজার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। আবার ফিরে যাই কাশীতে। বিজয়কৃষ্ণের লেখা থেকে জানা যায়—''একদিন এক কালীমন্দিরে গিয়া স্বামীজী প্রস্রাব করিয়া ছিটাইয়া কালীর অঙ্গে দিতে লাগিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম —'প্রস্রাব গায়ে দেন কেন?' তিনি মাটিতে লিখিয়া দিলেন,—'গঙ্গোদকং।' আমি বলিলাম—'কালীর গায়ে ছিটাইয়া দিলেন কেন?' তিনি উত্তর দিলেন—'পূজা'।''

সে সময়ে ওই দেবালয়ে লোক ছিল না। পরে লোক আসিলে বলিলাম—'উনি প্রস্রাব করিয়া কালীর গায়ে ছিটাইয়া দিয়াছেন এবং বলেন যে উহা ''গঙ্গোদকং (গঙ্গাজল)''। তাঁহারা উহা শুনিয়া বলিলেন, 'ইনি তো সাক্ষাৎ বিশ্বেশ্বর, ইহাকে এমন বলিতে নাই, ইহার প্রস্রাব যে গঙ্গোদক তাহা ঠিকই।'

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রসঙ্গ যখন এসেই পড়েছে তখন সেই অলৌকিক কৃপার কথাটি এখানেই বলে নেওয়া উচিত। আবার ফিরে যাব বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর কাছে। তিনি লিখছেন, 'একদিন স্বামীজি ও আমি দশাশ্বমেধ

ঘাটের উপর দিয়া ভ্রমণ করিতেছি, এমন সময়ে তিনি আমার হাত ধরিয়া মৌনভঙ্গ করতঃ বলিলেন, —'তোকে দীক্ষা দিব।' আমি বলিলাম—'হ্যাঁ, তোমার কাছে আবার আমি দীক্ষা নিব। তুমি কখনও শিবপূজা করো, কখনও প্রস্রাব করিয়া কালীর গায়ে ছিটাইয়া দাও এবং বলো যে গঙ্গোদকং, আমি তোমার নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিব না। বিশেষত আমি ব্রহ্মজ্ঞানী, আমি গুরুবাদ মানি না।' তিনি হাসিয়া বলিলেন, —'বাচ্চা সাচ্চা হ্যায়।' পরে হিন্দি ভাষায় বলিলেন,—'তোকে দীক্ষা দিবার আমার বিশেষ কোনও গূঢ় কারণ আছে। রীতিমতো দীক্ষা দিব না। গুরু গ্রহণ না করিলে শরীর শুদ্ধ হয় না, তোর গুরু আমি নই, অন্য একজন। সময়ে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইবে। তবে আমি এখন তোর শরীর শুদ্ধ করিয়া দিব। ইহার পরে তিনি আমাকে ত্রিবিধ মন্ত্র প্রদান করিয়া বলিলেন—'আমার উপর ভগবানের যে আদেশ ছিল তাহাই পালন করিলাম মাত্র।'

এরপর একদিন গোস্বামীজিকে সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করবার জন্য কাশীধামে যেতে হয়। সেইসময় ত্রৈলঙ্গস্বামী তাঁকে বলেছিলেন, 'কেয়া ইয়াদ হ্যায়।' উত্তরে গোস্বামীজি হাতজোড় করে বলেছিলেন, 'হ্যাঁ মহারাজ।'

'আশাবতীর উপাখ্যান' গ্রন্থে বিজয়কৃষ্ণজি স্বামীজি সম্পর্কে একটা জায়গায় খুব সুন্দর কথা লিখেছেন। স্বামীজির অপূর্ব বাণী। মহৎ চিন্তার ছাপ রয়েছে তার প্রতিটি অক্ষরে। আশাবতী ছদ্মনামে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী লিখেছেন,—''আশাবতী ত্রৈলঙ্গস্বামীর চরণে প্রণাম করিয়া পদধূলি গ্রহণ করিলেন, 'প্রভো। আমি স্ত্রীলোক, অতি অজ্ঞান, কিছু জানি না; আমার অপরাধ লইবেন না। আপনি মহাপুরুষ, জ্ঞানের সাগর, আপনাকে পাইয়া আমার কত কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইতেছে।' আমার প্রশ্ন এই যে—'জগতে উপাস্য দেবতা কত জন এবং তাঁহারা কে?'''

ত্রৈলঙ্গস্বামীজি প্রস্তর খণ্ড দিয়ে দেবনাগরী অক্ষরে লিখলেন, 'উপাস্য দেবতা এক। যে ব্যক্তি, যে-কোনও নামে, যেভাবে পূজা করুক। সেই একেরই পূজা করে, কারণ দেবতা একমাত্র অদ্বিতীয়। দ্বিতীয় নাই। তিনি শিবম।'

আশাবতী : 'পার্বতী পতি শিব কী?'

স্বামীজি : 'মঙ্গলম।'

আশাবতী : 'তাঁহার রূপ কী?'

স্বামীজি : 'তিনি সচ্চিদানন্দ ঘন বিগ্রহ যোগীজনের হৃদয় রঞ্জন।'

আশাবতী : 'তবে প্রতিমা পূজা কেন?'

স্বামীজি : 'পূজা দুই প্রকার, ১) স্বাবলম্বন আর ২) নিরবলম্বন। ১) দারুময়ী প্রস্তরময়ী, মৃন্ময়ী বা প্রতিমাদি, ঘট, পট, জল, স্থল, চন্দ্র, বৃক্ষ, লতা, নদী, পর্ব্বত; এইরূপ ভগবত সৃষ্ট বস্তুকে অবলম্বন করিয়া যে পূজা, তাহাই স্বাবলম্বন এবং নিকৃষ্ট। যতদিন ব্রহ্মসাক্ষাৎ না হয়, ততদিন স্বাবলম্বনের কোনও একটা অবলম্বন না করিয়া পূজা হয় না। ব্রহ্মদর্শন হইলে আর কিছুই অবলম্বন করিতে হয় না।' ২) স্বাবলম্বন পূজার মন্ত্র—'যে দেবতা ঘটে, প্রতিমায়, জলে, অগ্নিতে, সর্ব্বভূতে, বিশ্বসংসারে, সেই দেবতাকে নমস্কার। কিন্তু নিরবলম্বন পূজার মন্ত্র, কেবল 'ত্বহি! ত্বংহি! ত্বহিং'! স্বাবলম্বন পূজা হল সোপান, উহার কোনওটিতে বদ্ধ থাকিলে প্রকৃত অবস্থা লাভে বিলম্ব হয়।'

আশাবতী, 'প্রকৃত অবস্থা লাভের উপায় কী?'

স্বামীজি কোনও উত্তর না দিয়ে যোগাসনে বসে শুধুমাত্র 'সাধন' প্রণামী দেখালেন। আশাবতীর সঙ্গে সেদিন স্বামীজির কাছে এক যোগীও গিয়েছিলেন। স্বামীজিকে ওই রকম অবস্থায় দেখে তিনি মুগ্ধ হয়ে আশাবতীকে বলেছিলেন, 'দেখ, দেখ কী অপরূপ শোভা! যেন পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইয়াছে! আহা! কি উচ্চ হাস, যেন রাজঘাটে হাসির তরঙ্গ আঘাত করিতেছে।' ত্রৈলঙ্গ স্বামীজি এরপর ভাব সম্বরণ করে স্থির হলেন। আশাবতী ও যোগী তাঁকে প্রণাম করে আশ্রম ত্যাগ করলেন।'

অপূর্ব অলৌকিক এক মহাজীবন। এবার কাশী থেকে একবার প্রয়াগে ঘুরে আসি। সেখানেও নদীর ধারে এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর মিলনস্থল ত্রিবেণী ঘাটে স্বামীজি যোগাসনে বসে আছেন। হঠাৎ শুরু হল প্রবল দুর্যোগ। প্রবল ঝড়, সঙ্গে বৃষ্টি। ঘাটের সব যাত্রীই ঝড়-জলের হাত থেকে বাঁচার জন্য একে একে বিদায় নিলেন। কিন্তু ওই ঝড়-জল স্বামীজিকে বিন্দুমাত্র কাবু করতে পারল না। তিনি স্থিরভাবে তাঁর আসনে বসে রইলেন। রামতারণ ভট্টাচার্য নামে এক ভদ্রলোকও সেই সময় ওইখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি স্বামীজিকে আগে থেকেই চিনতেন। স্বামীজিকে ওইখানে ওই অবস্থায় বসে থাকতে দেখে তিনি ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। স্বামীজির কষ্ট হচ্ছে ভেবে তিনি বারে বারে তাঁকে ওখান থেকে চলে যাওয়ার জন্যে অনুরোধ করতে শুরু করলেন। সেই সময় একখানি নৌকো প্রচুর যাত্রীসহ সবে মাঝনদী পার হয়েছে। স্বামীজি একসময় ভট্টাচার্য মহাশয়কে বললেন,—'বাবা, আমার জন্য তুমি ব্যস্ত হইও না। আমার বিশেষ কোন কষ্ট বোধ হইতেছে না। আমি এখন এখান হইতে যাইতে পারি না ঐ যে নৌকোখানি আসিতেছে দেখিতেছ উহা শীঘ্রই জলমগ্ন হইবে, ঐ নৌকোর যাত্রীগণকে বাঁচাইতে হইবে।' কথা শেষ হতে না হতেই ঝড়ের প্রবল দাপটে নৌকোখানি মোচার খোলার মতো উলটে গেল। বাঙালি ব্রাহ্মণ রামতারণ ভট্টাচার্য মহাশয় সেদিন কী দেখেছিলেন! নৌকোটি ডুবে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ত্রৈলঙ্গ স্বামীজিও সেখান থেকে অদৃশ্য হলেন। বিস্মিত রামতারণবাবু নদীর দিকে তাকিয়ে রইলেন। অল্পক্ষণ পরেই দেখা গেল নৌকোটি ভেসে উঠল, এবং একসময় সেটি তীরে পৌঁছাল। ভট্টাচার্য মহাশয়ের জন্য তখন আরও একখানি বিস্ময় অপেক্ষা করেছিল, নৌকো থেকে অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে স্বামীজিও ঘাটে এসে নামলেন। সবাই প্রচণ্ড অবাক! কারণ যখন নৌকো ছেড়েছিল তখন তো এই উলঙ্গ সন্ন্যাসী তাঁদের সঙ্গে ছিলেন না! তিনি কখন নৌকোয় উঠলেন। নৌকোডুবির ধাক্কা, মৃত্যুভয় সামলে ওঠার পর যাত্রীগণ বুঝতে পারলেন, স্বয়ং ঈশ্বররূপী এই সন্ন্যাসীই আজ তাঁদের প্রাণ বাঁচিয়েছেন। তাঁরা সকলেই স্বামীজিকে প্রণাম করার জন্য হুড়োহুড়ি শুরু করলেন। একসময় সাঙ্গ হল প্রণাম। নির্বাক হতবুদ্ধি রামতারণবাবু তখনও স্বামীজির পাশে চুপ করে দাঁড়িয়েছিলেন। সবাই চলে যাওয়ার পর তিনি স্বামীজির পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়লেন। স্মিত হেসে স্বামীজি তাঁকে বললেন, 'বাবা, এই ঘটনায় তুমি বিস্মিত হইয়াছ, কিন্তু ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছু নাই, অনন্ত শক্তির আধার শ্রীভগবান এই মানবদেহ সৃষ্টি করিয়া তাহার ভিতরে বিরাজমান রহিয়াছেন। প্রত্যেক মানবের মধ্যেই ঐশী-শক্তি বর্তমান আছে, কিন্তু সে অনিত্য সংসার সুখে মজিয়া প্রকৃত আত্মোন্নতির দিকে লক্ষ্য করে না। মানুষ যদি তাঁহার অন্তর্নিহিত শক্তি বিকাশের চেষ্টা করে তাহা হইলে জগতে তাহার অসাধ্য কিছুই থাকে না। ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। তুমি আর ঝড়-জলে বৃথা কষ্ট পাইও না, গৃহে ফিরিয়া যাও।' এই ছিল প্রয়াগে বোধ হয় তাঁর শেষ কথা। এরপর তিনি প্রয়াগ ত্যাগ করেন।

২

অন্ধ্রপ্রদেশের ভিজিয়ানা গ্রামের হোলিয়া নগরে নরসিংহ রাও (মতান্তরে নরসিংহ ধর) নামে এক ধনী ব্রাহ্মণ জমিদার বাস করতেন। স্ত্রী বিদ্যাবতীকে নিয়ে তাঁর সুখের সংসার। স্ত্রীও ছিলেন স্বামীর সুযোগ্য সহধর্মিণী। দেবদ্বিজে তাঁদের ভক্তি ছিল অপরিসীম। প্রচুর ধনসম্পত্তি থাকা সত্বেও তাঁরা সদা ঈশ্বরচিন্তায় ডুবে থাকতেন। দান-ধ্যানেও তাঁদের কোনও অনাগ্রহ ছিল না। তাঁদের দরজা থেকে কোনও প্রার্থী কখনও নিরাশ হয়ে ফিরতেন না। ফলে রাও দম্পতির গুণগানে এলাকার মানুষজন সবসময় মুখর থাকতেন।

এত কিছু থাকা সত্বেও এই দম্পতির মনে একটা কষ্ট সবসময় চোরাস্রোতের মতো বয়ে যেত। তাঁদের কোনও সন্তানসন্ততি ছিল না। সন্তানশূন্য গৃহ তাঁদের কিছুতেই শান্তি দিত না। অনেকদিন এইভাবে কাটার পর নরসিংহ রাও আবার বিয়ে করবেন বলে ঠিক করলেন। মতান্তরে স্ত্রী বিদ্যাবতীই তাঁকে দ্বিতীয় বিয়ে করতে বাধ্য করেছিলেন।

অবশেষে ঘরে সতিন এল। কিন্তু নরসিংহ রাওয়ের প্রথমা স্ত্রী বিদ্যাবতী কখনও সতিনের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেননি। ফলে সংসারে কোনও অশান্তিও ছিল না। কিন্তু বিদ্যাবতীর মনে কি কোনও কষ্ট ছিল না? স্বামীকে ভাগ করে নেওয়ার যন্ত্রণায় কি তিনি কোনওদিন দগ্ধ হননি? থাক সেকথা! তবে বিদ্যাবতী এক মনে ভোলা মহেশ্বরের কাছে সন্তান কামনার প্রার্থনা জানাতেন। সে প্রার্থনার জোর এতটাই প্রবল ছিল যে স্বয়ং মহাদেবও তাঁর সজল প্রার্থনায় সাড়া না দিয়ে থাকতে পারেননি। বাংলা ১০১৪ সন, ইংরেজি ১৬০৭ খ্রিস্টাব্দের পৌষ মাসের শুক্লা একাদশী তিথিতে, রোহিণী নক্ষত্রের শুভলগ্নে বিদ্যাবতী পুত্রসন্তানের জন্ম দিলেন। পৃথিবীর বুকে এক মহাবিপ্লব, এক প্রলয় ঘটাবার জন্যেই সেই শিশু ভূমিষ্ঠ হলেন। সেই শিশুর অবিস্মরণীয়, মহা অলৌকিক বিস্ফোরণের ছটায় আমরা পরবর্তীকালে মুগ্ধ হব। ভারতের সাধকসমাজের শীর্ষবেদিতে তাঁকে আমরা বসাব। পৃথিবী যতদিন তার অস্তিত্ব বজায় রাখবে ততদিন মানুষ তাঁকে কোনও না কোনও ভাবে বা সময়ে স্মরণ করবেন। ধন্য নরসিংহ, ধন্য বিদ্যাবতী।

যে বাড়িতে এতদিন কোনও শিশু ছিল না, সেই বাড়ি শিশুর কলরবে মেতে উঠবে—এর থেকে বড় আনন্দ আর কী হতে পারে! নরসিংহ রাওয়ের ক্ষেত্রেও তাই ঘটল। তাঁর বাড়ি আনন্দ কলরবে মেতে উঠল। শিশুর কল্যাণ কামনায় পিতা নরসিংহ দীনদরিদ্রকে মুক্ত হস্তে অর্থ ও অন্যান্য সামগ্রী দান করতে লাগলেন।

সন্তান জন্মগ্রহণের পর কেটে গেল একুশটা দিন। শুভ অশৌচান্তে মহাদেবের কাছে চিরকৃতজ্ঞ বিদ্যাবতী সন্তানকে বুকে জড়িয়ে প্রথমেই গিয়েছিলেন শিবমন্দিরে। তিনি পুত্রকে বারান্দায় শুইয়ে শিবপূজা শুরু করলেন, পূজা যখন শেষ লগ্নে ঠিক তখনই ঘটল সেই অলৌকিক ঘটনাটি। শিবমন্দিরের ভিতর থেকে এক অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছিটকে বাইরে বেরিয়ে এল, তারপর মন্দিরকে আলোকিত করে তা মিলিয়ে গেল শিশুর দেহে। এই ঘটনায় অত্যন্ত ভয় পেয়েছিলেন মা বিদ্যাবতী। শিশুকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে ছুটে নিজের ঘরে ফিরে এসেছিলেন। স্বামীকেও সব কথা বললেন। ভীত স্ত্রীকে নরসিংহ মৃদু হেসে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন, 'অহেতুক কেন ভয় পাচ্ছ! এই সন্তান তোমার শিবপূজার ফল। শিবের বরে তুমি এই সন্তান লাভ করেছ। তাই স্বয়ং মহাদেব সেটা তোমায় বুঝিয়ে দিলেন। তুমি ভয় পেও না। ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই।'

মা বিদ্যাবতী সন্তানের নাম রাখলেন শিবরাম। বাবা নরসিংহ রাও যথাসময়ে ধর্মীয় অনুষ্ঠান করে পুত্রের নামকরণ করলেন। তিনি রাখলেন ত্রৈলঙ্গধর। সময় তো কখনওই থেমে থাকে না। সময়ের ঘোড়া আপনা খেয়ালে দৌড়ে চলে। দিন আসে রাত হয়, আবার দিন। এরই মধ্যে কেউ ঝরে যান, নতুন পাতায় ভরে যায় বৃক্ষ। এই হল জগতের নিয়ম। সেই কালচক্রের নিয়মকে ভাঙা তো অসম্ভব। দেখতে দেখতে শিবরাম ক্রমশ বড় হতে শুরু করলেন। নরসিংহ রাও পুত্রের চূড়াকরণ ও উপনয়ন করালেন।

যে-কোনও জীবনী, তা কোনও মহাপুরুষের হতে পারে, হতে পারে কোনও বিখ্যাত মানুষের। সেই জীবনী লেখার সবচেয়ে বড় সমস্যা হল মতান্তর। এই বস্তুটি যে-কোনও লেখককে প্রবল আতান্তরে ফেলে দিতে পারে। কারণ প্রামাণ্য তথ্য ছাড়া কোনও জীবনী লেখা কখনওই সম্ভব নয়। কল্পনার সাহায্য নেওয়াও অনুচিত। ত্রৈলঙ্গ স্বামীজির ক্ষেত্রেও এই মতান্তর সত্যিই আতান্তরে ফেলে দিয়েছে। যেমন শ্রীশ্রী শঙ্করী মাতাজির 'মহাযোগেশ্বর বাবা ত্রৈলঙ্গ স্বামীজির জীবনী' গ্রন্থে ত্রৈলঙ্গস্বামী অর্থাৎ শিবরামের পিতা নরসিংহ রাও, আবার 'কাশীর সচল বিশ্বনাথ (মহাযোগেশ্বর ত্রৈলঙ্গস্বামী)' গ্রন্থে পিতার নাম নরসিংহধর। উমাচরণ মুখোপাধ্যায়ের 'মহাত্মা ত্রৈলঙ্গ স্বামীর জীবনচরিত ও তত্ত্বোপদেশ' গ্রন্থে তিনি হয়েছেন নৃসিংহ ধর। শেকসপিয়র অবশ্য আমাদের বলেই গিয়েছেন, 'নামে কী বা আসে যায়।' কিন্তু সঠিক নামটি কী তা তো অবশ্যই জানা উচিত। এ তো গেল নাম বিভ্রাট। এবার দেখুন পুত্রের জন্ম নিয়েও কী সমস্যা। শঙ্করী মাতাজি লিখছেন, মাতা বিদ্যাবতী শিবপূজা করেই এই সন্তান লাভ করেছিলেন। সেখানে কোনও স্বপ্নের ব্যাপার নেই। কিন্তু 'কাশীর সচল বিশ্বনাথ' গ্রন্থে একটি স্বপ্নের কথা বলা হয়েছে। এই গ্রন্থে রয়েছে, 'বিদ্যাবতীদেবী পুত্র কামনায় ভক্তিভাবে গৌরীশঙ্করের পূজা আরাধনা করিতেন। সেই সময় তিনি নিষ্ঠা সহকারে বারোজন ব্রাহ্মণকে সেবা ও পূজা করিয়াছিলেন। একদিন বিদ্যাবতীদেবী রাত্রে স্বপ্নে দেখিলেন, একটা শ্বেত হস্তী তাঁহার কাছে আসিয়া ধীরে ধীরে শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া গেল।' অতএব এই আতান্তর থেকে একমাত্র ত্রৈলঙ্গস্বামীজি ছাড়া আর কেউই যে উদ্ধার করতে পারবেন না তা বেশ ভালোই বুঝতে পেরেছি।

ধর্মীয় ও সামাজিক বিধি মেনে সব কাজ সম্পন্ন হল। মা বিদ্যাবতী অত্যন্ত খুশি। কিন্তু বাবা ততটা খুশি নন। বহু সাধ্য-সাধনার পর পাওয়া গিয়েছে প্রথম সন্তান। বংশের প্রদীপ। কিন্তু সেই ছেলে আর পাঁচটা ছেলের মতো স্বাভাবিক নয়। অসম্ভব গম্ভীর, খেলাধুলা, হইচই করতেই চায় না। ইতিমধ্যে নরসিংহ রাওয়ের দ্বিতীয় স্ত্রী একটি পুত্রসন্তানের জন্ম দিলেন। তার নাম রাখা হল শ্রীধর।

ঘরে দুটি পুত্রসন্তান। রাও পরিবারের সবাই খুব আনন্দিত। কিন্তু বাবা সব সময় শিবরামের ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখছেন। শিবরামের কৈশোরকাল কেটে গেছে। এখন তিনি যথেষ্ট বড়। অথচ তাঁর মধ্যে স্বাভাবিক প্রফুল্লতার ছিটেফোঁটা খুঁজে পাওয়া যায় না। সারাক্ষণই কিছু একটা খুঁজে বেড়াচ্ছেন। বিমর্ষ একটা ভাব তাঁকে সবসময় ঘিরে থাকত, কিন্তু ভাবে বিভোর শিবরাম যখন নির্জনে, একা বসে থাকতেন তখন তাঁর শরীর জুড়ে খেলা করত এক দিব্যচ্ছটা। তাঁর সেই সৌম্যমূর্তি সকলকেই আকর্ষণ করত।

শিবরাম যে সাধারণ আর পাঁচটা ছেলের মতো নয় তা কিন্তু প্রথমেই বুঝতে পেরেছিলেন মা বিদ্যাবতী। আর এইসব দেখে আরও ভীত হয়ে পড়লেন বাবা নরসিংহ রাও। বংশের প্রথম সন্তান, সে যদি সংসার ত্যাগ করে চলে যায় তাহলে কী হবে! বাবাও চাইলেন সেই পুরোনো, অতি পুরোনো ফর্মুলা প্রয়োগ করতে। সংসারের নাগপাশে পুত্র শিবরামকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলার ফন্দি আঁটলেন। কিন্তু কীভাবে আটকাবেন। একমাত্র সহজ পথ হচ্ছে বিবাহ। তিনি পুত্রের বিয়ে দিয়ে সংসারী করতে চাইলেন।

একদিন সকালে পিতা মুখোমুখি হলেন পুত্রের। তিনি তাঁর ইচ্ছার কথা শিবরামকে জানালেন। পুত্র এই প্রথম পিতার কোনও আদেশ অমান্য করলেন। তিনি বিয়ে করতে কিছুতেই রাজি হলেন না। তবে পিতাও হাল ছাড়লেন না। তিনিও চেষ্টা চালিয়ে গেলেন। তিনি মনে করেছিলেন, পুত্রের বয়স হয়েছে। আমোদ-প্রমোদকে পরিত্যাগ করে সে কিছুতেই বেশিদিন থাকতে পারবে না। মোহিনী মায়া তাকে অবশ্যই ধরাশায়ী করবে। কিন্তু ছেলে তো অন্য নিরানব্বইজনের মতো নয়। তাঁর আধারটা যে অন্যরকম। সাধু, দরিদ্র ও অনাথদের দেখলে তাঁর মন কেঁদে ওঠে। মুক্ত হস্তে দান করেন। একদিন নরসিংহ রাও আবার মুখোমুখি হলেন পুত্রের। হল দীর্ঘ বৈঠক। তিনি বিয়ে করার জন্য ছেলেকে বারবার অনুরোধ করলেন। কিন্তু তাতে কোনও ফল হল না। তিনি পিতাকে বললেন, 'এই ক্ষণভঙ্গুর নশ্বর জীবনেরই যখন কিছুমাত্র স্থিরতা নাই তখন অনর্থক ইহাকে মায়াজালে আবদ্ধ করিবার প্রয়োজন কি? যাহা অবিনশ্বর চিরস্থায়ী তাহারই অনুসন্ধান

প্রয়োজন, আমি তাহারই অনুসন্ধান করিব।' ছেলের মুখে এ ধরনের কথা শুনে তিনি অত্যন্ত দুঃখ পেয়েছিলেন। অনেক বুঝিয়েও ছেলের মন কিছুতেই পালটাতে পারলেন না।

এরকম ঘটনা যে ঘটবে তা বোধহয় শিবরাম-মাতা বিদ্যাবতী প্রথম থেকেই জানতেন। তিনি ছিলেন পরম বুদ্ধিমতী ও ধার্মিক প্রকৃতির মহিলা। তাঁর সরল কথাবার্তা, স্নেহমাখা মধুর ব্যবহারে সংসারের সকলেই মুগ্ধ ছিলেন। বাড়ির কাজের লোকজনদের তিনি পুত্র বা কন্যা বলেই মনে করতেন। তাদের না খাইয়ে তিনি খেতে বসতেন না। তাদের বেশিরভাগ কাজই তিনি নিজে করে দিতেন। ফলে তারাও তাঁকে মা রূপেই শ্রদ্ধা করত। উদয়াস্ত পরিশ্রম করা সত্বেও নিয়মিত পূজা করতে তাঁর কোনও ভুল হত না। তিনি যখন পূজায় বসতেন সেইসময় তাঁর মুখমণ্ডলে এক স্বর্গীয় আভা ফুটে উঠত। একমনে, একাগ্রচিত্তে তিনি তাঁর ইষ্টের সেবা করতেন। সেই সময় তাঁকে কেউ বিরক্ত করতে সাহস পেত না। একমাত্র শিবরামই মায়ের কাছে যেতে পারতেন। কারণ ছোট থেকেই যে তিনিও পূজা করতে ভালোবাসেন। পরবর্তীকালে তিনি যে এক ইতিহাস সৃষ্টি করবেন।

বুদ্ধিমতী বিদ্যাবতী শিবরামের দিকে সবসময় লক্ষ রাখতেন। পুত্রের আচরণ, মতিগতি ও লক্ষণ দেখে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, তাঁর এই পুত্র কখনওই সংসারের নাগপাশে আবদ্ধ হবে না। সে একদিন ধর্মপথের মহাপথিক হবে। ছেলে ভবিষ্যতে সংসার ত্যাগ করবে, সন্ন্যাসী হয়ে যাবে—একথা ভেবে তিনি কোনওদিনই দুঃখ পাননি। বরঞ্চ আনন্দিত হয়েছিলেন। স্মৃতির আড়াল থেকে উঠে এসেছিল সেই দিনটির ছবি। পরদার বুকে ভেসে উঠেছিল সেই ক্ষণটি। মন্দির আলোকিত করে সেই আলোর ছটা প্রবেশ করল শিশু শিবরামের শরীরে। অত্যন্ত পুলকিত হয়েছিল তিনি। মহেশ্বরের উদ্দেশে তিনি হাতজোড় করে প্রণাম জানিয়েছিলেন।

শিবরামের কাছ থেকে নিরাশ হয়ে ফিরে স্বামী নরসিংহ রাও তাঁর প্রথমা স্ত্রীকে সব কিছু জানালেন। মৃদু হাসি ফুটে উঠল মায়ের ওষ্ঠে। তিনি তো জানতেন এইরকম ঘটনাই ঘটবে। তিনি এতটুকু দুঃখ পেলেন না। কারণ এসবই তো পূর্বনির্ধারিত। বিমর্ষ স্বামীকে তিনি সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'ত্রৈলঙ্গধর বিয়ে করতে রাজি হচ্ছে না বলে তুমি এত দুঃখ পাচ্ছ কেন? তোমার তো হতাশ হওয়ার কোনও কারণ নেই! বিয়ের উদ্দেশ্য কী? বংশরক্ষাই যদি বিয়ের প্রধান উদ্দেশ্য হয় তাহলে শ্রীধরের বিয়ে দিলেই তো হয়। শ্রীধরের মাধ্যমেই সেই কাজ হবে। কিন্তু অনিচ্ছুক ত্রৈলঙ্গধরের জোর করে বিয়ে দিলে হিতে বিপরীত হবে। মানসিক প্রফুল্লতা তো আসবেই না, বরং ত্রৈলঙ্গধরের জীবন বিষময় হয়ে উঠবে। ও যে পথের পথিক হতে চাইছে তাতে কোনও বাধা দিও না। একদিন ত্রৈলঙ্গধর শুধু বংশ নয়, সমগ্র ভারতের মুখ উজ্জ্বল করবে। তাকে প্রত্যেকেই শ্রদ্ধা, ভক্তি করবে। অবতার রূপে মানুষ তার পূজা করবে। পিতা-মাতার কাছে এটা কত গর্বের বিষয় হবে বলো তো! তাই ওর কোনও কাজে আমাদের বাধা দেওয়া ঠিক হবে না। তার চেয়ে ও যাতে সঠিকভাবে, ঠিক পথে চলতে পারে সেদিকেই নজর রাখা উচিত। বিদ্যাবতী স্বামীকে নানাভাবে বুঝিয়ে অনেকটাই শান্ত করতে পেরেছিলেন। তিনিও বুঝতে পেরেছিলেন, স্ত্রী যা বলছেন, যেভাবে চলতে বলছেন তা না করলে ত্রৈলঙ্গধরের বড় রকম কোনও ক্ষতি হতে পারে। তিনি তাঁর মনের দুঃখকষ্ট ঝেড়ে ফেলে বড় পুত্রের সাধনপথের অংশীদার হবেন বলে মনস্থ করলেন।

সাধনপথের অংশীদার মানে পুত্রের সঙ্গে তিনিও সন্ন্যাসী হবেন না। তিনি ও তাঁর স্ত্রী বিদ্যাবতী পুত্রের চলার পথে কোনওরকম বাধা যাতে না আসে সে ব্যাপারে সেদিন থেকে আরও সতর্ক হলেন। বাবা নরসিংহ মনের যত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সব ঝেড়ে পুছে ঈশ্বরের পায়ে সমর্পণ করে দিলেন।

এই ঘটনাটি ঘটার কিছুদিন পর থেকেই শ্রীধরের বিয়ের তোড়জোড় শুরু হল। পাত্রীও পছন্দ হল। মহাধুমধাম করে শ্রীধরের বিয়ের কাজ মিটে গেল। এই বিয়েতে ভীষণই খুশি হয়েছিলেন বিদ্যাবতী ও ত্রৈলঙ্গধর। ঈশ্বরচিন্তার পাশাপাশি দাদা ত্রৈলঙ্গ ভাইয়ের বিয়ের ব্যাপারে যথেষ্ট সহযোগিতা করলেন। সংসার এখন পরিপূর্ণ। আর তো কোনও অভাব বা সমস্যা নেই। তবু ত্রৈলঙ্গের মনে কোনও শান্তি নেই। কী যেন

হারানোর বেদনা তাঁকে সর্বদাই কষ্ট দিয়ে যাচ্ছে। যত দিন যাচ্ছে ততই সেই কষ্ট বাড়ছে। মা বিদ্যাবতী ছেলে শিবরামের অস্থিরতার প্রতি কড়া নজর রাখছিলেন। ধর্মপিপাসায় যে তাঁর পুত্র প্রবল পিপাসার্ত তা তিনি খুব ভালোই বুঝতে পারছিলেন। পুত্রের এই অস্থিরতা কমাবার দায়িত্ব তিনি তাঁর কাঁধে তুলে নিলেন।

বলা যেতে পারে মা বিদ্যাবতীই ছিলেন পুত্র শিবরামের প্রথম গুরু। মা ছেলেকে নিয়ে রোজই বসতে শুরু করলেন। পুত্রকে শান্ত করার জন্য তিনি তাঁর সঙ্গে ধর্ম বিষয়ে নানা আলোচনা করতেন। মায়ের মুখনিঃসৃত সেই উপদেশবাণী অশান্ত শিবরামের জীবনে অদ্ভুত এক প্রশান্তি এনে দিল। আরও জানতে হবে, আরও শুনতে হবে! জীবনে জানার শেষ নেই। এই প্রসঙ্গে ত্রৈলঙ্গ স্বামীজির অন্যতম শিষ্য উমাচরণ মুখোপাধ্যায় তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন, 'বিদ্যাবতীর উপদেশবাক্যসমূহ যেন তাঁহার কর্ণে সুধা বর্ষণ করিত। মাতার উপদেশবাক্য শ্রবণকালে ত্রৈলঙ্গধর এক অনির্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিতেন। এতদিনে যেন তাঁহার হৃদয়ের গভীর ব্যাকুলতা ভেদ করিয়া বিদ্যুম্মাল্য চমকিয়া উঠিল। মাতার উপদিষ্ট পথ অনুসরণ করিয়া যতই তিনি অগ্রসর হইতে লাগিলেন ততই তাহার হৃদয়ে নূতন আলোক সঞ্চারিত হইতে লাগিল। তাঁহার মনোবৃত্তিসমূহও সঙ্গে সঙ্গে যেন স্বর্গীয় উচ্চ মঞ্চে উন্নীত হইতে লাগিল। ক্রমশ ভগবৎপ্রেম হিল্লোলে ত্রৈলঙ্গধরের হৃদয় নৃত্য করিয়া উঠিল। ভগবৎ-প্রেমামৃত পানে তাঁহার ভক্তিভাব প্রস্ফুরিত হইতে লাগল।'

দেখতে দেখতে কেটে গেল অনেকগুলো বছর। শিবরাম চল্লিশে পা দিলেন। ভগবৎ চিন্তা, পিতা-মাতার সেবা করেই তাঁর দিন কেটে যায়। আর রাত নামলেই মজা। শিবরাম তখন ফিরে যান তাঁর শৈশবে। মায়ের কোল ঘেঁষে বসে তিনি মনোযোগ দিয়ে শুনে যান মায়ের অমৃত বচন। প্রতিদিন নতুন নতুন উপদেশ, নতুন নতুন জ্ঞান। এইভাবেই দিনগুলো বেশ কেটে যাচ্ছিল। কিন্তু সুখের দিন বেশিদিন স্থায়ী যে হয় না! সবই ঠিক ছিল, হঠাৎই একদিন খুবই অসুস্থ হয়ে পড়লেন বাবা নরসিংহ রাও। প্রত্যেকেই খুব চিন্তায় পড়ে গেলেন। চিকিৎসার কোনও ত্রুটি রইল না। কিন্তু যাঁর জীবনপ্রদীপ এবার নিভবে বলে পূর্বনির্ধারিত রয়েছে তাঁকে কোনও চিকিৎসকই বাঁচাতে পারেন না। এক্ষেত্রেও তাই হল, অসুস্থ হওয়ার পাঁচদিনের মাথায় সন্ধ্যার কিছু আগে নরসিংহ রাও পৃথিবীর সব মায়া ছিন্ন করে পাড়ি দিলেন অন্য এক লোকে, অন্য এক জগতে। এই পৃথিবীর মাটিতে পড়ে রইল তাঁর নশ্বর শরীরটি।

শোকের হাত থেকে ভগবানও বোধহয় রেহাই পান না। গৃহকর্তার মৃত্যুতে পরিবারের সবাই খুব ভেঙে পড়লেন। আর সেটাই তো স্বাভাবিক ব্যাপার। স্বামীর মৃত্যুতে সবথেকে ভেঙে পড়লেন বিদ্যাবতী। তাঁর মনের সব প্রফুল্লতা স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বিদায় নিল। সাংসারিক কাজকর্মে কোনও মন আর রইল না। তখন ঈশ্বরচিন্তাই হল তাঁর ধ্যানজ্ঞান। শিবরাম বা ত্রৈলঙ্গধরও পিতার মৃত্যুতে বড় আঘাত পেলেন। তবে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি নিজেকে শান্ত করলেন। মায়ের পাশে থেকে তিনি মায়ের দুঃখকষ্ট দূর করতে চেষ্টা করলেন। আর সাধন-ভজন? দ্বিগুণ বেড়ে গেল। তখন একটাই পথ, সে পথের শেষ হয়েছে ঈশ্বরের বৈঠকখানায়। আর এই কাজে তাঁকে অবিরাম সাহায্য করে চললেন তাঁর মা বিদ্যাবতী। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি প্রায় নিজেকে দেবীতে রূপান্তরিত করেছিলেন।

কেটে গেল বারোটা বছর। ত্রৈলঙ্গধরের সাংসারিক শেষ বন্ধনটি বোধহয় এবার ছিঁড়বে। তিনি তখন বাহান্ন। মা বিদ্যাবতী শিবরামকে চিরতরে ছেড়ে এবার বিদায় নেবেন। তাই ঘটল। হঠাৎই মারা গেলেন বিদ্যাবতী। পটাং করে ছিঁড়ে গেল সেই অদৃশ্য সুতোটি। সংসার তখন শিবরামের কাছে বিষময় মনে হতে লাগল। মাতৃশোক যে কী কষ্টের তা তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলেন। তিনি সংসার পরিত্যাগ করবেন বলে ঠিক করলেন।

মায়ের সৎকার প্রায় শেষের মুখে। আগুন প্রায় নিভু নিভু। আর একটু বাদে সবাই চিতায় জল ঢেলে ফিরে যাবেন নিজের নিজের বাড়িতে। শিবরামের কাছে সেই মুহূর্তে সেই শ্মশানভূমি অত্যন্ত প্রিয় ও পবিত্র বলে মনে হল। সৎকার শেষ, সবাই বাড়ি যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। শিবরাম চিতার ছাই কপালে লেপন করে সবাইকে বললেন, আমি আর বাড়িতে ফিরে যাব না। আজ থেকে এই শ্মশানই আমার আবাসস্থল। আমি

এখানেই বসবাস করব। দাদার এইরকম সিদ্ধান্ত শ্রীধর কিছুতেই মন থেকে মেনে নিতে পারলেন না। দাদাকে বারবার বাড়িতে ফিরে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। ত্রৈলঙ্গধর তখন অন্য এক জগতের সন্ধান পেয়েছেন। ঈশ্বর নামক ফুলের মধু আহরণের জন্য তখন তিনি মধুকর হতে প্রস্তুত। বিষণ্ণ মনে বাড়ি ফিরে এলেন শ্রীধর ও তাঁর সঙ্গীরা।

দাদা শ্মশানে বাস করবেন—এটা কিছুতেই মন থেকে মেনে নিতে পারেননি শ্রীধর। পরের দিন অন্যান্য আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুদের নিয়ে শ্মশানে আবার দাদার মুখোমুখি হলেন। 'পিতার বিপুল সম্পত্তি তুমি ছাড়া কে রক্ষা করবে দাদা! চল বাড়ি ফিরে চল, এখানে এভাবে পড়ে থেকো না। আমি তোমার এই কষ্ট সহ্য করতে পারছি না।' শ্রীধরের সঙ্গীরাও বারবার ত্রৈলঙ্গধরকে একই অনুরোধ করলেন। উমাচরণ মুখোপাধ্যায় খুব সুন্দর বর্ণনা করেছেন এই ক্ষণটির। তিনি লিখছেন, 'ভগবৎপ্রেমরূপ প্রফুল্ল কমলের মধুপান করিবার জন্য যাঁহার মন-মধুকর উন্মত্ত, ভগবৎ-ধ্যানরূপ সুধাসিন্ধুতে যিনি নিমজ্জিত, ভগবৎ-নামরূপ কল্পতরু হৃদয়ক্ষেত্রে রোপণ করিয়া তাঁহার প্রেমামৃতময় ফলাস্বাদনে যিনি মোহিত, বহির্জগৎ পরিত্যাগ করত যিনি অন্তর্জগতে প্রবেশ করিতে অগ্রসর, যিনি ভগবৎ ভাণ্ডারের অমূল্য রত্নের অধিকারী হইতে চলিয়াছেন, পৃথিবীর সামান্য ধনরত্নে কি তাঁহার তৃপ্তিসুখ সম্ভব? নশ্বর পার্থিব পদার্থ সমূহে কি তাঁহার হৃদয় আকৃষ্ট হয়? সংসারের প্রলোভন তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে অসমর্থ হইল।'

শিবরাম আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীদের বাড়ি ফিরে যেতে অনুরোধ করলেন। ভাই শ্রীধরকে আরও কিছুক্ষণ সেখানে থাকতে বললেন। আত্মীয়স্বজন ও অন্যান্যরা চলে যাওয়ার পর তিনি ভাইকে পাশে বসিয়ে বললেন, 'ভাই আর কেন এখানে থাকিয়া বৃথা কষ্ট পাও, গৃহে গমন করিয়া যাহা কিছু পৈতৃক সম্পত্তি আছে তাহা তুমিই ভোগদখল কর, আমার ঐ সকল বিষয়ে বা ধনসম্পত্তিতে বিন্দুমাত্র আবশ্যক নাই। আমি আর গৃহে ফিরিব না, এ পাপ সংসারে থাকিব না। মায়াময় সংসার আমার নিকট কণ্টকাকীর্ণ বলিয়া বোধ হইতেছে। এই ক্ষণভঙ্গুর দেহ লইয়া সংসারে আর অনিত্য সুখে বৃথা মজিব না। যাহা নিত্য ও অবিনশ্বর এবং যে সুখের আদি অন্ত নাই, যাঁহাকে পাইলে আর কিছু পাইবার আশা থাকে না, অশান্তি যাঁহার নিকটস্থ হইতে অক্ষম, আমি তাঁহারই শরণ লইয়াছি। আমাকে আর বাড়ি ফিরিবার জন্য অনুরোধ করিয়ো না।'

আধুনিক কাল হলে কী হত? দাদা সব সম্পত্তি ত্যাগ করে আর বাড়ি ফিরবে না, কথাটা শোনা মাত্রই ভাই নাচতে নাচতে বাড়ি ফিরত। তারপর আনন্দে, অট্টহাস্যে নমঃ নমঃ করে মাতৃশ্রাদ্ধ চুকিয়েই আবার দৌড়ত দাদার কাছে। আইনমাফিক সব কিছু দাদার কাছ থেকে নিজের নামে করিয়েই তবে শান্ত হত। কিন্তু শ্রীধর ছিলেন কলিযুগের ভরত। দাদা শ্মশানে, প্রবল কষ্টের মধ্যে বাস করছেন, আর সে সুখে শুয়ে আছে বিলাসবহুল অট্টালিকায়—মর্মপীড়ায় তিনি অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। এবার তিনি মিস্ত্রি-মজুর নিয়ে শ্মশানে দৌড়লেন। দাদার বসবাসের জন্য একটি বাড়ি তৈরি করে দিলেন। শুধু তাই নয়, দাদার যাতে খাওয়া-পরার কোনও কষ্ট না হয় তারও ব্যবস্থা করেছিলেন।

৩

মাতৃশ্মশানে, ভাইয়ের তৈরি করে দেওয়া বাড়িতেই ত্রৈলঙ্গধর বসবাস করতে রাজি হলেন। ওই জায়গায়, ওই বাড়িতে তিনি টানা কুড়ি বছর বাস করেছিলেন। এরপর একদিন তাঁর মধ্যে তীর্থভ্রমণ ও গুরুলাভের বাসনা তীব্র হয়ে উঠল। গুরুলাভ ও অন্যান্য প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে একটি বিষয় নিয়ে একটু আলোচনা করা দরকার। প্রায় সব মহাপুরুষের ক্ষেত্রেই গল্পের মতো ঘটনা ঘটে। তাঁকে ঘিরে নানা গল্পকথা তৈরি হয়। যার বহুলাংশই অসত্য। কারণ কোনও মহাপুরুষ অপ্রয়োজনে তাঁর ক্ষমতার অপব্যবহার করেন না। শ্রীমদ ত্রৈলঙ্গস্বামীর ক্ষেত্রেও আমরা অনেক গল্পকথা তৈরি করেছি। ছোট্ট একটি উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়ে যাবে। 'মহাত্মা ত্রৈলঙ্গস্বামীর জীবন-চরিত ও তাঁহার উপদেশ' গ্রন্থের প্রণেতা স্বামী কৃষ্ণানন্দ সরস্বতী তাঁর গ্রন্থে লিখছেন, ''শিবরামের সঙ্কল্প ছিল মাতা পরলোকগতা হইলে সন্ন্যাস করিব, কিন্তু বিদ্যাবতী একদিন শিবরামকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, 'আমার যখন পুত্র হইল না, তখন গৌরীশঙ্করের আরাধনা এবং নিয়ম করিয়া দ্বাদশটি ব্রাহ্মণ সেবা করিয়াছিলাম, কিন্তু দ্বাদশ ব্রাহ্মণ সেবার যে কি ফল তাহা আমি জানি না! শিবরাম, তুমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার পূর্বে তাহা জানিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিও এবং তুমি জানিলেই আমার ফল হইবে। আমার এই অনুরোধ রইল।'

''দশ বৎসর মাতৃশ্মশানে বাস করিবার পর মাতৃবাক্য স্মরণ হইলে পর, ছল করিয়া তীর্থ পর্য্যটনে বাহির হইয়া শিবরাম বারাণসী যাত্রা করিলেন। কাশীতে যাইয়া নানাদেশীয় বড় বড় পণ্ডিতমণ্ডলীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আমার মাতাঠাকুরাণী দ্বাদশটি ব্রাহ্মণ সেবা করিয়াছিলেন, তাহার ফল কি?' কিন্তু কেহই কিছু বলিতে পারিলেন না, তথাকার এক পণ্ডিত তাঁহাকে বলেন, 'বর্দ্ধমানের অন্তর্গত কাটোয়ার সন্নিকটে উদ্ধারণপুর গঙ্গাতীরে ত্রিধারাতে স্মার্ত্ত পণ্ডিত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য নব্যস্মৃতি রচনা করিতেছেন, তাঁহার নিকট যাও, তিনি তোমার প্রশ্নের উত্তর দিবেন।' শিবরাম মাতৃ আজ্ঞা পালনের জন্য তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন তিনি ঐকান্তিকভাবে পুস্তক লিখিতেছেন। শিবরাম প্রণাম করিয়া রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মহাশয় দ্বাদশ ব্রাহ্মণের সেবার কি ফল?' রঘুনন্দন বলিলেন, 'একটি ব্রাহ্মণের সেবার ফল বলা যায় না দ্বাদশটির ফল যে কি তাহা কিরূপে বলিব। তবে তুমি নর্ম্মদা তীরে যাইয়া সপ্তাহ কাল মার্কণ্ডেয় চণ্ডীসম্পুট কর, দেখিবে এক মহাপুরুষ আসিয়া তোমার জিজ্ঞাস্য বিষয়ের উত্তর দিবেন।'

''শিবরাম সেই মহাপুরুষের বাক্যে নর্ম্মদার তীরে আসিয়া কোন নির্জন স্থানে ঐকান্তিকভাবে সূর্য্যোদয় না হইতে চণ্ডীসম্পুট আরম্ভ করিলেন। ২/৩ দিবস গত হইলে বৃক্ষে পক্ষীসকল এবং ভূমিতে সর্পসকল ও শিবাসকল সম্মুখে আসিয়া কর্ণ পাতিয়া পাঠ শ্রবণ করিতে লাগিল। পঞ্চম দিবস গত হইলে জটাজূটধারী বাঘাম্বর পরিহিত ত্রিশূলধারী এক মহাপুরুষ আবির্ভূত হইলেন। কিছুক্ষণ পরে গৈরিক বসনা এক গৌরী উন্মুক্ত বেণী মহাযোগিনী বেশে অক্ষমালা ত্রিশূলধারী মহাপুরুষের পার্শ্বে আসিয়া বসিলেন। প্রায় সপ্তাহ শেষ হইল দিনমণি অস্তাচলে গত, সম্পুট সাঙ্গ হইলে শিবরাম সেই আগত মহাপুরুষকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে মহাত্মন আমার মাতা ঠাকুরাণী দ্বাদশটী ব্রাহ্মণের সেবা করিয়াছিলেন তাহার ফল কি?' সেই মহাপুরুষ শিবরামের কথা শুনিয়া মহাযোগিনীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'হে দেবি, তোমার ঝুলিতে তিনটী বটিকা আছে—তাহা এই লোকটীকে দাও। এক পার্বতীয় রাজার সন্তান হয় নাই, এই বটিকা সেবনে তাঁহার মহিষীর যে পুত্র হইবে, সেই নবজাত শিশু দ্বাদশ ব্রাহ্মণের সেবার ফল বলিবে।' এই বলিয়া মহাপুরুষ অন্তর্ধান হইলেন।

''শিবরাম সেই রাজধানী কোথায় এই ভাবিতে ভাবিতে ইতস্ততঃ কতদূর যাইয়া নর্ম্মদার তীরে একটী বণিকের দোকানে জলযোগ করিলেন। সপ্তাহ উপবাসে পরিশ্রান্ত শিবরাম এক বৃক্ষতলে শয়ন করিতে উদ্যোগ করিলেন, এমন সময় একজন ঘাসুড়িয়া ঘাসের বোঝা নামাইয়া ঐ স্থানে শয়ন করিল। শিবরাম ঘাসওয়ালাকে

জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ওহে বাছা তুমি কি জাতি?' ঘাসওয়ালা বলিল, 'ঠাকুর আমি জাতিতে গোয়ালা। রাতে এইখানে শয়ন করিব, প্রাতে ঐ রাজধানী যাইব।' শিবরাম বলিলেন, 'বাছা আমিও রাজবাটী যাইব এবং এক সঙ্গেই যাইব।'

''সপ্তাহ পরিশ্রমের পর শিবরাম অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছিলেন ও ঘাসওয়ালা গোয়ালাকে বলিলেন, 'তুমি আমার একটু পা টিপিয়া দাও।' সেই গোয়ালার ছেলে প্রায় অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত অঙ্গমর্দন করিয়া পরিশ্রান্ত হইল ও ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল। রাত্রিশেষে শিবরাম উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন, 'ওহে গোয়ালার ছেলে উঠ।' কিন্তু সে ঘাসওয়ালা আর উঠিল না। তাহাকে সজোরে ধাক্কা মারিলেন, তবু উঠিল না। শিবরাম দেখিলেন, গোয়ালা পরলোকগত হইয়াছে। বানিয়া দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ওহে বানিয়া, তুমি কি এই লোকটীকে চিন?' বানিয়া বলিল, 'না মহাশয়। ইহাকে চিনি না এবং জানি না।' ত্রৈলঙ্গধর অতিশয় ভাবিত হইলেন। সারারাত্রি যে আমার সেবা করিয়াছে তাহাকে ত সৎকার করিতেই হইবে। এই বলিয়া বানিয়ার দোকান হইতে কাষ্ঠ ক্রয় করিয়া নর্ম্মদার তীরে শব লইলেন ও অগ্নি জ্বালিয়া সৎকার সাঙ্গ করিয়া স্নান করিয়া ঐ পার্ব্বত্য রাজধানীতে গমন করিলেন। সহরে প্রবেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'এই মহারাজার পুত্রসন্ততি হয় নাই, আমার নিকট একটী দৈব ঔষধ আছে তাহা খাওয়াইলে মহারাণী নিশ্চয়ই অন্তঃসত্বা হইবেন।' শিবরামের এই ঘোষণা শুনিয়া, রাজমন্ত্রী এই অদ্ভুত ব্যাপার মহারাজের নিকট নিবেদন করিলেন। মহারাজ, কিন্তু বহুবার নানা প্রকার দৈব চিকিৎসাতে বিফল মনোরথ হওয়াতে এবারেও মন্ত্রীর কথাতে বিশ্বাস করিলেন না। মন্ত্রী পুনরায় বলিলেন যে, 'মহারাজ ব্রাহ্মণ বলিতেছেন যতদিন পর্য্যন্ত পুত্র না হয় ততদিন তিনি এখানে বন্দি হইয়া থাকিতেও সম্মত আছেন।' তাহাতে মহারাজ শিবরামকে ডাকাইয়া আনিয়া তাঁহার সেই ঔষধ চাহিলেন। শিবরাম মহারাজকে সেই শিবদত্ত ঔষধ দিয়া বলিলেন, 'মহারাজ আমি অর্থপ্রত্যাশী নই, কিন্তু আমার একমাত্র প্রার্থনা এই যে আপনার পুত্রসন্তান হইবামাত্র আমাকে সূতিকাগৃহে লইয়া যাইয়া সেই নবজাত শিশুকে দেখিতে দিতে হইবে।'

''প্রায় পূর্ণ দশমাসে শুভদিনে, প্রাতঃকালে নবকুমার ভূমিষ্ঠ হইল কিন্তু ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র বালক পদ্মাসনে উপবেশন করিয়া পরমানন্দে খলবল করিয়া হাসিতে লাগিল, তখন অন্তঃপুরে মহা কোলাহল উত্থিত হইল এবং সকলেই সেই ঔষধদাতা ব্রাহ্মণকে আনিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল।''

''তখন প্রতিহারী ত্রৈলঙ্গধরকে বলিতে লাগিলেন, 'মহাশয়, মহারাণী সুকুমার শিশু প্রসব করিয়াছেন কিন্তু ব্যাপার বড় ভয়ানক, আপনি সত্বর চলুন।' শিবরাম অন্তঃপুরে যাইয়া দেখেন নবপ্রসূত বালক হাস্যবদনে পদ্মাসনে উপবেশন করিয়া আছে। তখন শিবরাম সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া বলিলেন, 'রাজকুমার আমার মাতাঠাকুরাণী দ্বাদশটী ব্রাহ্মণ সেবা করিয়াছিলেন, তাঁহার ফল কি?' তখন নবপ্রসূত বালক উত্তর করিল যে, 'আমি ক্ষণকাল মাত্র একটী ব্রাহ্মণের সেবা করিয়াছিলাম, সেই ব্রাহ্মণসেবার ফলে অদ্য গোপকূল হইতে রাজকুমার হইয়াছি, অতএব দ্বাদশ ব্রাহ্মণসেবার ফল যে কত তাহা ভাবিয়া দেখুন। এই বলিতেই শিবরাম নবপ্রসূত বালককে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিলেন।''

এখানেই শেষ নয় এরপর তিনি আরও একটি বিস্ফোরণ ঘটিয়েছেন, তিনি লিখছেন, মানে ত্রৈলঙ্গ স্বামীজি তাঁকে বলছেন, ''জননীর স্নেহাধীন হইয়া পাণিগ্রহণ করিয়াছিলাম এবং পিতৃঋণও শোধ করিয়াছি, এক পুত্র ও এক কন্যা হইয়াছিল এবং সেই সকল সাংসারিক ব্যবহার সমস্তই দাদা শ্রীধরকে সমর্পণ করিয়া পরমাত্মা পরমব্রহ্ম উদ্দেশ্যে এই সংসার হইতে বাহির হইয়াছিলাম, আমার জীবনচরিত তোমাকে সমস্তই ব্যক্ত করিলাম। আমার দেহান্তে প্রকাশ করিও।''

স্বামী কৃষ্ণানন্দ সরস্বতীর লেখা ছাড়া আর কোথাও অর্থাৎ শঙ্করী মাতাজি বা উমাচরণ মুখোপাধ্যায় এই ব্যাপারে কোনও আলোকপাত করেননি। প্রশ্ন হল, কৃষ্ণানন্দ সরস্বতী এই কাহিনি দুটি কোথায় পেলেন? এগুলি কি তাঁর কল্পনাপ্রসূত গপ্পো? স্বামী কৃষ্ণানন্দ সরস্বতী তাঁর গ্রন্থের উপক্রমণিকায় লিখছেন, ''আমি প্রায় একাদিক্রমে ৬২ বৎসর মানস সরোবরে স্বামীজীর চরণকমল সেবায় নিরত ছিলাম। ঐ সময়ে একদিন তাঁহার

জীবন-চরিত লিখিবার ইচ্ছা তাঁহাকে জ্ঞাপন করিয়াছিলাম। তাহাতে তিনি প্রসন্নচিত্তে আমাকে বাধা দিয়া উত্তর করিলেন, 'তুমি আমার সমাধি অন্তে ব্রহ্মে লীন হইলে আমার জীবনচরিত প্রকাশ করিও।' লোকের প্রশংসায় পাছে অহঙ্কার আসে সেইজন্যেই তিনি তাঁহার জীবন-চরিত লেখায় অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু আমি তাঁহাকে অনেক অনুনয় বিনয় করায় তাঁহার পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত আমাকে বলিয়া তিনি আমাকে তাঁহার জীবন-চরিত তাঁহার জীবিত অবস্থায় লিখিতে বারণ করিয়াছিলেন।''

আবার তিনি তাঁর গ্রন্থের এক জায়গায় লিখছেন, ''স্বামী ত্রৈলঙ্গ সরস্বতী পুনরায় যখন মানস সরোবর গমন করেন তখন আমি উত্তর কাশীতে ছিলাম। আমি উত্তর কাশী হইতে মানস সরোবরে তাঁহার সহিত একাদিক্রমে ৩২ বৎসর থাকিয়া হঠবিদ্যা, রাজযোগ ও নানা বিভূতি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম।''

খুবই সমস্যার ব্যাপার! ত্রৈলঙ্গ স্বামীজির সঙ্গে তিনি বাষট্টি বছর না বত্রিশ বছর—কত বছর কাটিয়েছিলেন? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করা বড়ই কঠিন। তবে এ ব্যাপারে উমাচরণ মুখোপাধ্যায় বোধহয় কিছুটা সাহায্য করতে পারেন। তিনি তাঁর গ্রন্থে স্বামী কৃষ্ণানন্দ সরস্বতী সম্পর্কে লিখছেন, ''মুঙ্গেরে প্রত্যাগমন করিয়া সকলের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম এবং শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ বাগচী মহাশয়কে ও পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন মহাশয়কে (মুঙ্গেরে আর্যধর্ম প্রচারিণী সভার প্রতিষ্ঠাতা) আমি স্বামীজির অলৌকিক ক্ষমতার কথা সমস্ত বলিলাম ও আমার বিষয়ও কিছু কিছু বলিলাম এবং দুইখানি খাতায় কিছু উপদেশ লিখাইয়া দিয়াছেন তাহাও দেখাইলাম। এই সমস্ত বিষয় শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন মহাশয় ও বাগচী মহাশয় অতিশয় আশ্চর্যান্বিত হইয়া তাঁহারা উভয়ে আমার সহিত কাশীধামে যাইয়া স্বামীজির সহিত সাক্ষাৎকরণাভিলাষে বিশেষ জেদ করিয়া ধরেন। এই সকল কথা প্রকাশ করিতে স্বামীজি আমাকে নিষেধ করা সত্বেও ইঁহাদিগকে না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। কারণ ইঁহারা আমাকে বড় ভালোবাসিতেন ও স্নেহ করিতেন। ক্রমে ক্রমে কথাটা একটু প্রচার হইয়া পড়িল। তাহাতে আমি বিশেষ ভীত হইলাম। এক বৎসর পরে আমি এবং শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন মহাশয় উভয়ে কাশীধাম গমন করিলাম। আমার জানা ছিল সন্ধ্যার পর নির্জন না হইলে স্বামীজির সহিত কোনো কথাই হইবে না। সেজন্য আমরা সন্ধ্যার পর আশ্রমে যাইয়া দেবতাগণকে ও গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া তাঁহার নিকট বসিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে স্বামীজি আমাদিগের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, ''দেখ, শ্রীকৃষ্ণ! তোমার মনে মনে বড় অহংকার হইয়াছে। তুমি মনে স্থির করিয়াছ পূর্বকালে যেমন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অবতার রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তুমিও সেই শ্রীকৃষ্ণ অবতার হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছ। সকলে পূজা করে এই তোমার ইচ্ছা। তোমার পায়ের ধূলা লইতে ব্রাহ্মণ তনয়কেও পা বাড়াইয়া দিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠা বা লজ্জাবোধ হয় না। তোমার ভবিষ্যৎকাল বড় শোচনীয়। তুমি একজন সামান্য মনুষ্যমাত্র, তবে কিছু বক্তৃতা-শক্তি আছে। দেখ যখন লোক লুচি ভাজে, প্রথমে লুচি বেলিয়া ঘৃতে ছাড়িয়া দেয়, যতক্ষণ কাঁচা থাকে ততক্ষণ কল কল করিয়া শব্দ হইতে থাকে, তাহার পর যখন পাকে তখন স্থির হইয়া ঘৃতের উপর ভাসিতে থাকে। এক্ষণে তোমার অতিশয় কলকলানি হইয়াছে, অগ্রে তোমার কলকলানি থামুক, তারপর যদি ধর্মের নিকট যাইতে পার। উপস্থিত ধর্ম হইতে অনেক দূরে আছ।'' এই সকল কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন মহাশয় কোনো উত্তর দিলেন না অথবা কিছু জিজ্ঞাসাও করিলেন না।''

শঙ্করনাথ রায় রচিত 'ভারতের সাধক' পুস্তকে পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দের প্রসঙ্গ এসেছে। এই কৃষ্ণানন্দই যদি শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন বা স্বামী কৃষ্ণানন্দ সরস্বতী হন তাহলে তাঁর অন্তিমকাল সত্যিই ভয়াবহ হয়েছিল। 'ভারতের সাধক' গ্রন্থে কী রয়েছে—''স্বামীজীর কর্মবহুল জীবনের কোণে এবার কোথা হইতে ঘনাইয়া আসে এক কালো মেঘ। একদল দুরাত্মার ষড়যন্ত্রে সর্বজনশ্রদ্ধেয় আচার্য হঠাৎ মহাবিপন্ন হইয়া পড়েন। সমগ্র উত্তর ভারতে তখন তাঁহার বিরাট প্রতিষ্ঠা। কিন্তু এ প্রতিষ্ঠা একদল পরশ্রীকাতর মানুষের সহ্য হয় নাই। তা ছাড়া নিজে অব্রাহ্মণ হইয়া বহু ব্রাহ্মণকে তিনি দীক্ষা ও সাধন দিতেছেন, এজন্যও কিছু সংখ্যক গোঁড়া সনাতনী তাঁহার উপর মারমুখী হইয়া উঠে। বিরোধীদের হীন ষড়যন্ত্র ও মিথ্যা মামলার ফলে স্বামীজীর জীবনে নামিয়া আসে চরম লাঞ্ছনা।''

পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ জন্মেছিলেন ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে। বাংলা ১২৪২ সন, আর তিনি লোকান্তরিত হন ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে, বাংলা ১৩৩৯ সনে। অর্থাৎ তিনি তিপ্পান্ন বছর বয়েসে মারা যান। আর এটাই বড় সমস্যার ব্যাপার। যাঁর আয়ুষ্কাল মাত্র তিপ্পান্ন বছর, তিনি তাহলে কী করে বাষট্টি বছর ত্রৈলঙ্গ স্বামীজির সঙ্গে কাটালেন? এই প্রশ্নের উত্তর কেবলমাত্র দুজনই দিতে পারেন। প্রথমজন হলেন শ্রীমদ ত্রৈলঙ্গস্বামী, আর দ্বিতীয়জন স্বামী কৃষ্ণানন্দ সরস্বতী স্বয়ং।

৪

১০৮৬ সাল, পাতিয়ালা রাজ্যের বাস্তুর গ্রামের সুপ্রসিদ্ধ যোগী ভগীরথ স্বামী হঠাৎই ত্রৈলঙ্গধরের আশ্রমে এসে উপস্থিত হলেন, দুজনেরই দুজনকে খুব ভালো লেগে গেল। প্রতিদিনই তাঁরা নানা বিষয়ে আলোচনা করতেন। ঈশ্বর-চিন্তায় তাঁরা মাঝে মাঝে এতই মগ্ন হতেন যে সময় কীভাবে কোথা দিয়ে কেটে যেত কেউই বুঝতে পারতেন না। ভগীরথ স্বামী বেশ কিছুদিন ওই আশ্রমেই থেকে গেলেন। ইতিমধ্যে ত্রৈলঙ্গধরের মনে তীর্থ ভ্রমণ ও গুরুলাভের বাসনা আরও প্রবল হয়েছে। এই সুযোগ! ত্রৈলঙ্গধর ও ভগীরথ স্বামী বেরিয়ে পড়লেন পুষ্করতীর্থের উদ্দেশে। ওইস্থানে দুই সাধক তাঁদের জীবনের বেশ কিছুকাল কাটিয়েছিলেন।

শঙ্করী মাতাজি তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন, "সদগুরু পূর্ব্বাপর নির্দিষ্ট রহিয়াছেন, সময় ঠিক হইলেই তিনি আসেন। অবশেষে শিবরাম ভগীরথ স্বামীজীর সহিত হোলিয়া নগর পরিত্যাগ করলেন। প্রায় ছয় বৎসর কাল নানা দেশ ঘুরিয়া রাজপুতানার অন্তর্গত পুষ্কর তীর্থে আসিলেন।" এইখানেই বাংলা ১০৯২ সনে আটাত্তর বছর বয়েসে শিবরাম ভগীরথানন্দ বা ভগীরথ স্বামীর কাছে দীক্ষা নিলেন। শুরু হল যোগশিক্ষা। দীক্ষাগ্রহণের পর শিবরাম বা ত্রৈলঙ্গধরের সন্ন্যাসনাম হল স্বামী গজানন্দ সরস্বতী বা গণপতি সরস্বতী।

গণপতি সরস্বতীর জন্ম যেহেতু অন্ধ্রপ্রদেশে, তাঁদের মাতৃভাষা তেলগু। তাই তিনি জনসমাজে পরবর্তীকালে ত্রৈলঙ্গস্বামী বা তৈলঙ্গস্বামী নামেই পরিচিত হন। আবার তিনি ত্রিলিঙ্গের অতীত ভাবরাজ্যে বিচরণ করতেন বলে ত্রৈলিঙ্গস্বামী নামেও অভিহিত হন।

শাস্ত্রে গুরুসেবাকে সাধনার একটি বিশিষ্ট অঙ্গ বলা হয়। জ্ঞান সাধনার লক্ষণ বর্ণনা প্রসঙ্গে গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন, 'তদবিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া' অর্থাৎ, ১) প্রণিপাত, ২) পরিপ্রশ্ন, ৩) সেবাশুশ্রূষা দ্বারা গুরুকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহার নিকট হইতে তত্বজ্ঞান আহরণ করিতে হইবে। শ্রীমদ্ভাগবতে বলা আছে—'আচার্যাং মাং বিজানীয়াৎ' অর্থাৎ গুরু ও ভগবান এক এবং অভিন্ন। বেদান্ত মতেও জ্ঞান সাধনার দুটি প্রধান অঙ্গ, ১) তত্ব বিচার, ২) গুরু সেবা। আদর্শ শিষ্য শিবরামও তাই মনপ্রাণ দিয়ে গুরু সেবা করতে লাগলেন। গুরুর নির্দেশিত পথেই শুরু হল তাঁর সাধনভজন। গুরু ভগীরথস্বামী তাঁকে হঠযোগ ও রাজযোগ শেখাতে লাগলেন। দশ বছর কঠোর তপস্যার পর ত্রৈলঙ্গস্বামী যোগসাধনায় সিদ্ধি লাভ করেন। কৃপা করে গুরু তাঁর সাধনালব্ধ সব বিদ্যা উজাড় করে ঢেলে দেন তাঁর প্রিয় ও সুযোগ্য শিষ্য শিবরামকে। তিনি এক যোগসিদ্ধ মহাপুরুষে পরিণত হলেন।

দেখতে দেখতে কেটে গেল দশটা বছর। ১১০২ সনে ভগীরথস্বামী পুষ্করতীর্থেই দেহত্যাগ করলেন। পুষ্করে আর মন টিকল না ত্রৈলঙ্গস্বামীর। তিনিও পুষ্কর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন তীর্থভ্রমণে। তখন তাঁর বয়স অষ্টআশি বছর। এই তীর্থভ্রমণে বেরিয়েই তিনি পরিত্যাগ করলেন তাঁর পরিধেয় বস্ত্র। সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়েই এরপর তিনি বাকি জীবন কাটিয়েছেন। বয়েসে বৃদ্ধ হলেও ত্রৈলঙ্গস্বামীকে জরা তখনও স্পর্শ করতে পারেনি। তাঁর স্বাস্থ্য দেখে মানুষজন আশ্চর্য হয়ে যেতেন।

টানা দু-বছর ভারতের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে তিনি ভারতবর্ষের দক্ষিণপ্রান্ত সেতুবন্ধ-রামেশ্বর ধামে উপস্থিত হন। তখন তাঁর বয়স নব্বই। কার্তিক মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে সেতুবন্ধ-রামেশ্বরে পূজা ও বিশাল মেলা বসে। সেই উপলক্ষে সেখানে বহু মানুষ, সাধু ও সন্ন্যাসীরা এসে উপস্থিত হতেন। তখন ত্রৈলঙ্গস্বামী সেখানে আছেন। মেলায় ঘুরতে ঘুরতে তাঁর সঙ্গে গ্রামের কয়েকজনের দেখাও হয়। তাঁরা তো ঘরের ছেলেকে হাতের কাছে পেয়ে নিজেদের বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্য জোর করতে লাগলেন। কিন্তু শিবরাম ফিরে যেতে রাজি হলেন না। হতাশ গ্রামবাসীগণ এরপর আর অনুরোধ করার সাহস পেলেন না। শিবরামকে বিদায় জানিয়ে তাঁরা নিজের নিজের গন্তব্যে চলে গেলেন।

মেলার দ্বিতীয় দিন এক মহা অলৌকিক কাণ্ড ঘটল। এক ব্রাহ্মণ যুবক তাঁর আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে মেলা দেখতে এসেছিলেন। তিনি অনেকদিন থেকেই নানা রোগে ভুগছিলেন। মেলার ধকলে, পথশ্রমের ক্লান্তিতে তাঁর রোগের উপসর্গগুলি আরও বেড়ে গেল। কোনওভাবেই সেই যুবকটিকে বাঁচানো গেল না। মেলার মধ্যেই তিনি মারা গেলেন। মৃত্যুর খবর আগুনের থেকেও দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ে। এক্ষেত্রেও তাই ঘটল। মৃতদেহকে ঘিরে প্রচুর মানুষ জড় হলেন। আত্মীয়স্বজনদের শোক, বুক ফাটা কান্না মেলার পরিবেশকে কেমন থমথমে করে তুলল। প্রবল গোলযোগ শুরু হল। ইতিমধ্যে প্রায় দু-ঘণ্টা কেটে গেছে। আত্মীয়স্বজনরাও মৃতদেহ সৎকারের তোড়জোড় শুরু করলেন। এমন সময় গণপতি স্বামী সেখানে উপস্থিত হলেন। তিনি মৃত ব্যক্তির দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে জিগ্যেস করলেন, আপনারা এই ব্যক্তিকে দাহ করছেন কেন? উপস্থিত এক ভদ্রলোক স্বামীজিকে সব কথা জানালেন। তিনি সব শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। তখন তিনি কী ভাবছিলেন! সুধাংশুরঞ্জন ঘোষের লেখা 'ভারতের সাধক ও সাধিকা' গ্রন্থে সুন্দর একটি বর্ণনা রয়েছে। ''শিবরামস্বামীর মনে সঙ্গে সঙ্গে একটি প্রশ্ন জাগল—ধর্মের সত্য বা পরমার্থ শুধু কি মোক্ষলাভের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে? সুদীর্ঘ কালের সাধনায় যে যোগবিভূতি তিনি অর্জন করেছেন তা যদি কোনও জনকল্যাণমূলক কাজে নিয়োজিত না হয় তাহলে তার সার্থকতা কোথায়? তিনি যদি তাঁর সেই যোগবিভূতির বলে এই মৃত যুবকটির মধ্যে প্রাণসঞ্চার করতে পারেন তাহলে একটি দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবার বেঁচে যাবে। হাসি ফুটে উঠবে তার মা ও স্ত্রীর মুখে। এই ভেবে তাঁর কমণ্ডলু হতে কিছুটা জল নিয়ে মন্ত্র উচ্চারণ করে চার-পাঁচবার ছিটিয়ে দিলেন সেই মৃত ব্যক্তির মুখে ও শরীরে। অবাক কাণ্ড। উপস্থিত জনতা নিজের চোখকে তখন বিশ্বাস করতে পারছেন না। মৃতদেহের মধ্যে ধীরে ধীরে প্রাণের সঞ্চার হল। চোখ মেলে তাকাল সেই যুবকটি।''

ব্যস! যা সর্বনাশ হওয়ার তা ঘটে গেল সেই মুহূর্তে। মৃত ব্যক্তি আবার প্রাণ ফিরে পেয়েছে। এক সাধুর অলৌকিক কৃপায় সে এখন আবার সুস্থ হয়ে উঠেছে, ঘুরে বেড়াচ্ছে মেলাপ্রাঙ্গণে—দাবানলের মতো এই খবরটি মেলাপ্রাঙ্গণ ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ল সেতুবন্ধ-রামেশ্বরের বিভিন্ন প্রান্তে। সংসারের নাগপাশে আষ্টেপৃষ্ঠে আবদ্ধ মানুষের তো সমস্যার কোনও শেষ নেই। হাতের কাছে এইরকম সমস্যা মোচন সাধু রয়েছেন। চল, তাঁর শরণাপন্ন হওয়া যাক। দলে দলে মানুষ ছুটে চললেন গণপতিস্বামীর খোঁজে। সবাই তাঁকে দেখতে চান, জানতে চান তাঁর পরিচয়। বাঁচতে চান সমস্যার হাত থেকে।

মেলায় উপস্থিত বেশ কয়েকজন সাধু তাঁকে চিনতে পেরেছিলেন। তাঁদের মাধ্যমেও ত্রৈলঙ্গস্বামীর খবর আরও প্রচারিত হল। এই অসহ্য ভিড়ের চাপ তিনি বেশিদিন সহ্য করতে পারলেন না। তিনি একদিন সেতুবন্ধ-রামেশ্বর থেকে কর্পূরের মতো অদৃশ্য হয়ে গেলেন। কেউ আর তাঁকে সেখানে খুঁজে পেলেন না।

১১০৬ সালে ত্রৈলঙ্গস্বামী দক্ষিণে সুদামাপুরীতে এলেন। সেখানকার এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ সেতুবন্ধ-রামেশ্বরে স্বামীজির অলৌকিক কীর্তি স্বচক্ষে দেখেছিলেন। তিনি স্বামীজিকে দেখে হাতে চাঁদ পেলেন। তিনি সাধুসেবা করতে চান, অতএব আপনাকে আমার গৃহে অবস্থান করতে হবে। বারবার একই অনুরোধ। ত্রৈলঙ্গজি তাঁর সেবা গ্রহণ করতে রাজি হলেন। সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণও সাধ্যমতো স্বামীজির সেবা ও পরিচর্যা করতেন। গণপতি স্বামী তাঁর সেবা, যত্ন ও শ্রদ্ধায় অতিশয় সন্তুষ্ট হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি আমার কাছে কী চাও? দরিদ্র ব্রাহ্মণ তাঁর মনের কথাটি স্বামীজির কাছে বললেন। তিনি ধন ও পুত্র লাভ করতে চান। ত্রৈলঙ্গস্বামী মৃদু হেসে বললেন, তোমার মনোবাঞ্ছা অবশ্যই পূর্ণ হবে।

বছর ঘোরার আগেই দরিদ্র ব্রাহ্মণের গা থেকে দরিদ্র তকমাটি খুলে পড়ে গেল। তিনি তখন এলাকার যথেষ্ট ধনী ব্যক্তি। শুধু তাই নয়, তিনি এক পুত্র সন্তানেরও পিতাও বটে। এ খবরও চাপা রইল না। চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। আবার পালাতে হবে স্বামীজিকে। মানুষের চাওয়ার কোনও শেষ নেই। ঝুড়ি ঝুড়ি প্রার্থনা নিয়ে দলে দলে মানুষ আসছেন তাঁর কাছে। স্বামীজি সুদামাপুরীতে আর থাকবেন না বলে ঠিক করলেন। আবার ভেসে পড়লেন স্বামীজি।

ত্রৈলঙ্গস্বামী এবার যাবেন নেপাল। লোকালয়ের কোলাহল মানুষের অত্যাচারে স্বামীজি তখন অতিষ্ঠ। সুদামাপুরীতে আর থাকা যাবে না। স্বামীজি বেরিয়ে পড়লেন নেপালের উদ্দেশে। চাই নির্জন স্থান। যেখানে বসে শুধুই ঈশ্বরের ভজনা করা যাবে। দীর্ঘ পথ, দুর্গম রাস্তা। ইতিহাস পথের পথিক, ঈশ্বরের পুত্র চললেন নতুন ইতিহাস গড়তে।

১১০৮ সাল, ত্রৈলঙ্গস্বামী নেপাল অভিযানে বেরোলেন, বস্ত্রহীন, নিরস্ত্র এক ঈশ্বরমুখী সাধক। তখন তাঁর বয়স চুরানব্বই। কল্পনার অতীত এক ঘটনা। এই বয়েসে যে-কোনও মানুষ তাঁর সমস্ত কর্মক্ষমতা হারিয়ে অপেক্ষা করে থাকেন সেই চরম ক্ষণটির। মৃত্যু আসবে, তিনি চলে যাবেন এই পৃথিবী ছেড়ে। কিন্তু চুরানব্বই বছর বয়েসেও স্বামীজি তরুণ, সজীব, প্রাণচঞ্চল। যোগসাধনার চরম সীমায় যে তিনি কবেই পৌঁছে গেছেন। তাঁর কাছে পরাজিত হয়েছে কালের নিয়ম। জরাকে তিনি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়েছেন। করায়ত্ত হয়েছে ইচ্ছামৃত্যুর কৌশল। মৃত্যু তাঁর কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারবে না। তিনি চাইলে তবেই মৃত্যু তাঁর হাত স্পর্শ করবে।

স্বামী ত্রৈলঙ্গ, গণপতি সরস্বতী নেপালের গভীর জঙ্গলকে বেছে নিলেন নিজের সাধনস্থল হিসেবে। গভীর অরণ্য, হিংস্র জন্তু, অজানা সরীসৃপ, বিষাক্ত নানা কীট-পতঙ্গ। কে তাঁর ক্ষতি করবে! বেশ জমিয়েই তিনি বসলেন। পাশ দিয়ে বাঘ ঘুরে যায়। দু-চারবার ল্যাজ নেড়ে তাঁর চারপাশে পাকও মারে। কখনও গভীর রাতে পাশ দিয়ে সরসর করে শিকার ধরতে বেরোয় সর্পদম্পতি। স্বামীজি সবই দেখেন আর মৃদু মৃদু হাসেন। সস্নেহে তাঁদের দিকে তাকান।

পশুপতিনাথ, স্বয়ম্ভুনাথ সহ অসংখ্য দেবতার আবাসস্থল নেপাল। ভগবান গৌতম বুদ্ধের জন্মভূমি। চতুর্দিকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে সুউচ্চ পর্বতশ্রেণি। অদ্ভুত মায়াময় পরিবেশ। ঈশ্বর, প্রকৃতি মিলেমিশে তৈরি করেছে এক স্বর্গরাজ্য। অপূর্ব মনোরম এক স্থান। Continental Drift। সৃষ্টির আদিতে, পৃথিবী যখন গঠিত হচ্ছে, এশিয়া মাইনর তৈরি হয়ে গেছে। এরপর সৃষ্টিকর্তা নামছেন নীচে দক্ষিণের দিকে। তখনও সেখানে বিরাট সমুদ্র। যার নাম টেথিস। এই সমুদ্রের তলদেশেও তৈরি হয়ে আছে বিশাল এক মহাদেশ। হঠাৎ নীচের ওই বিশাল, বিরাট ভূখণ্ড ওপর দিকে ধীরে ধীরে উঠতে লাগল। একসময় সেটি ধাক্কা মারল ওই মেনল্যান্ড এশিয়াকে। তখনই ওই অঞ্চলে তৈরি হল সৃষ্টির বিরাট, বিপুল রহস্য। তৈরি হল বিশ্বের বৃহত্তম পর্বত, পর্বতমালা এবং উপত্যকা। আর সেইখানেই আমাদের এই নেপাল।

এই দেশটির গঠন ভারি সুন্দর। নেপালকে বলা হয় আভূমি দেশ (Horizontal country)। এশিয়ায় ধাক্কা খেয়ে অজস্র ভাঁজ তৈরি করে একটি তীর্থভূমি। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে বারো হাজার ফিট উচ্চতায়, এরই মাথার ওপর তিব্বত।

চতুর্দিকে যখন মুসলিম আধিপত্য, নেপালে তখন হিন্দু রাজারা সগৌরবে ধরে রেখেছেন এই শিবভূমিকে। হিমালয়ের মেরুদণ্ড ধরে এই দেশটি পূর্ব এবং পশ্চিমে বিস্তৃত। পৃথিবীর সর্বোচ্চ আটটি পর্বত এখানে অবস্থিত। যার একটি হল এভারেস্ট। কোথাও সমতল, কোথাও উচ্চতল, কোথাও নিম্নতল—এই হল ভূমিবিন্যাস। নেপালের এই পর্বতমালা ভারতবর্ষের সুরক্ষা। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই পর্বত দেওয়াল দাঁড়িয়ে আছে। এপাশে নেপাল, যা চিরস্বাধীন, ওপাশে বিশ্বের অন্যান্য দেশ। এই ঘেরাটোপ থাকার ফলে নেপাল যেন একটি সময়ের ক্যাপসুল।

নেপালের অতীত বর্তমানের কাঁধে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে। তেরো থেকে আঠারো শতক পর্যন্ত কাঠমাণ্ডু উপত্যকায় রাজত্ব করেছেন মল্লরাজারা (Malla Dynasty)। পর্বত দেওয়াল অতিক্রম করে অতীতে এখানে যাঁরা এসেছেন তাঁরা কেউ লড়াই করতে আসেননি। তিব্বত থেকে এসেছেন বণিকরা, আবার চিন এবং ভারত থেকে গিয়েছেন চৈনিক ও মুঘল ব্যবসায়ীরা।

আক্রমণ যে হয়নি তা নয়। বাংলার মুসলমান সুলতানরা ১৩৪৬ সালে কাঠমাণ্ডুর স্বয়ম্ভুনাথ মন্দির ধ্বংস করেছে। তবে ওই পর্যন্তই। পাহাড় ভেদ করতে পারেনি। মুঘলদের তাড়া খেয়ে পলাতক রাজপুতরা নেপালের নিরাপত্তায় আশ্রয় খুঁজেছেন। এই উদ্বাস্তু রাজপুতরাই নেপালের রাজনীতিতে পরিবর্তন

এনেছিলেন। ঊনবিংশ শতকে ইংরেজরা এই পর্বত ঘেরা দেশটিকে আক্রমণ করেছিল। কিন্তু তারাও ব্যর্থ। কারণ নেপালের চিরবন্ধু দেবসম পর্বতশৃঙ্গ। যেদিকেই চোখ ফেরানো যায় সেদিকেই যেন ত্রিশূলধারী মহাদেব। নেপালের মানুষরা অত্যন্ত সাহসী। গোর্খা উপজাতিরা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা, অস্ত্র—ভোজালি, কুকরি।

শেষ পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজরা তৈরি করল গোর্খাবাহিনী। যাঁদের গৌরব গাঁথা আজও অম্লান। পর্বতের দ্বারা সুরক্ষিত হলেও নেপাল কিন্তু প্রাচীন গ্রিসের মতো বিচ্ছিন্ন ছিল না। বিভিন্ন উপজাতি শাসনে টুকরো টুকরো নেপালকে সুগঠিত একটি রাজ্যের আকার দিয়েছিলেন পৃথ্বীনারায়ণ শা। তিনি গোর্খা রাজ্যের নৃপতি ছিলেন। ১৭৬৮ সালে তিনি কাঠমাণ্ডু দখল করেন। তিনিই নেপালের জাতীয় ভাষার জনক। যার নাম গোর্খালি। সেই ভাষাই আজকের নেপালি ভাষা।

এই অপূর্ব পাহাড়ি রাজ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব থাকলেও বহির্শত্রুরা ঘেরাটোপ এখনও ভাঙতে পারেনি। নেপালের সিংহাসনে যে রাজারাই এসেছেন তাঁরা এই সুরক্ষাটি ক্রমশই জোরদার করেছেন। সর্বশেষে রানারা এসে এই দেশটিকে একটি দুর্ভেদ্য, স্বকীয়, স্বাধীন, স্বতন্ত্র, ভৌগোলিক অস্তিত্বে মহিমান্বিত করেছেন। রাজা ত্রিভুবনের নাম ইতিহাস হয়ে থাকবে। একটি জাতি তাঁদের বীরত্ব, ধর্ম ও পার্বত্য পবিত্রতা নিয়ে পৃথিবীতে এক অনন্য উদাহরণের গৌরব অর্জন করেছে। নেপালের সংস্কৃতি খাঁটি, সেখানে মিশ্রণ ঘটেনি।

ধর্মের ওপরে, জনপদের বুকে, মানুষের শরীরে, সংস্কৃতির বেদিতে—কোনও না কোনও সময়, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ঘৃণ্য আঘাত নেমে এসেছে। মানুষের দ্বারা লাঞ্ছিত হয়েছে মানুষ। ভাইয়ের রক্তে হাত রেঙেছে অন্য ভাইয়ের। ইতিহাস তার নীরব সাক্ষী। নেপালের ওপরেও সেই আঘাত হানা হয়েছে। ধর্মের কাঠামোকে ভেঙে নড়বড়ে করে দাও, তাহলে গোটা জনজীবন অশান্ত হয়ে উঠবে। নেপালের সেই দুঃসময়ে ত্রাতারূপে সেদিন অবতীর্ণ হয়েছিলেন আচার্য শঙ্করাচার্য।

আচার্য শঙ্কর খবর পেলেন, নেপালে পশুপতিনাথের পূজা প্রায় বন্ধের মুখে। বৌদ্ধগণ মন্দিরে বসেই খাওয়া-দাওয়া করছে। এবং সেই উচ্ছিষ্টে মন্দির প্রায় পরিপূর্ণ। নেপালের সবাই এখন বৌদ্ধ। তারা তান্ত্রিক আচারের আশ্রয়ে থেকে অনাচারের ঢোল পেটাচ্ছে। কদর্য সেই তান্ত্রিক আচার। বৈদিক ধর্ম সম্পর্কে সেখানকার মানুষ এখন আর কিছুই জানে না। সব কিছু ভুলে মেরে দিয়েছে। বর্ণাশ্রমধর্মকে সমাজ থেকে সুকৌশলে দূরে সরিয়ে রেখে নেপাল এখন ভিক্ষু, শ্রাবক, তান্ত্রিক বা আচার্য এবং গৃহস্থ—এই চারটি শ্রেণিতে নিজেদের সমাজকে বিভক্ত করে নিয়েছে। ইতিমধ্যে সেখানে গোরক্ষনাথের যোগী সম্প্রদায়ের দাপাদাপি শুরু হয়েছে। শাস্ত্রকে কুলুঙ্গিতে তুলে রাখা হয়েছে।

আচার্য শঙ্কর সব শুনলেন। সেদিন তাঁর সঙ্গে ওইখানে বহু শিষ্য ও ভক্তগণও ছিলেন। শিষ্যরা গুরুকে বললেন, ভগবান, একবার কি আমাদের নেপাল যাওয়া উচিত নয়? সেখানে পশুপতিনাথ অবহেলায় একপাশে পড়ে আছেন। তাঁর পূজার্চনা বন্ধ হয়ে আছে? ভারতের সর্বত্র আপনার চেষ্টায় পুনরায় বৈদিকধর্মের শুভসূচনা হয়েছে, নেপাল কেন বঞ্চিত হবে?

আচার্যের ওষ্ঠে মৃদু হাসির বিদ্যুৎ ঝিলিক মেরে গেল। তিনি তো পশুপতিনাথের অমর্যাদা হচ্ছে শুনেই নেপাল যাবেন বলে মনে মনে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। তিনি তাঁর বিরাট বাহিনী নিয়ে নেপাল অভিযানে বেরোলেন। এই সময় নেপালে ঠাকুরী বা রাজপুতবংশীয় নরেন্দ্রদেব বর্মার পুত্র শিবদেব বা বরদেব রাজত্ব করছেন। চীন সম্রাট নরেন্দ্রদেবকে রাজা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। ফলে ভারতের বিভিন্ন রাজা তাঁকে আর ঘাঁটাতে সাহস পেতেন না। সবকিছুই তাঁরা মুখ বুজে মেনে নিতে বাধ্য হতেন। এই নরেন্দ্রদেবের সময়েই মৎস্যেন্দ্রনাথ ও গোরক্ষনাথের (৩৬২৩ কলাব্দ) রমরমা শুরু হয়। পরবর্তীকালে তাদের প্রতিপত্তি ক্রমশ বাড়তে থাকে। ফলে বরদেব বৌদ্ধ হলেও মৎস্যেন্দ্রনাথের পুজো করতেন। তখন তাঁদের রাজধানী ছিল পাটনা।

আচার্য শঙ্কর ও তাঁর শিষ্যগণকে যথোচিত অভ্যর্থনা জানাতে দ্বিধা করেননি বরদেব। রাজার সঙ্গে কিছু কথা সেরেই আচার্য তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে পশুপতিনাথের মন্দিরের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। মন্দিরে প্রবেশ

করেই তাঁরা মন্দির পরিষ্কারের কাজ শুরু করলেন। মন্দিরকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনার পরই শঙ্করের নির্দেশে পূজা শুরু হল। 'আচার্য শঙ্কর ও রামানুজ' গ্রন্থের প্রণেতা রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ (স্বামী চিদঘনানন্দ পুরী) তাঁর গ্রন্থে লিখছেন, 'স্বয়ং আচার্য চিন্মাত্রস্বরূপে অবস্থিত হইলেও একটি মনোজ্ঞ স্তোত্র রচনা করিয়া তাঁহার পূজা করিলেন। তদনন্তর শিষ্যবর্গ একে একে পরমেশ্বরের যথাবিধি পূজা করিলেন। রাজা, আচার্য ও তাঁহার শিষ্যবর্গের আচারব্যবহার ও সৌম্যভাব দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। তিনি আচার্যের উপদেশাদি শ্রবণ করিয়া আচার্যের শিষ্য হইলেন।'

ঘোর সমস্যা। স্বয়ং রাজা দলবদল করে আচার্যের শিষ্য হয়েছেন। রাষ্ট্রক্ষমতাকে তো আর নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করা যাবে না। অতএব নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে পালানোই একমাত্র বুদ্ধিমানের কাজ। নেপালে যাঁরা সেই সময় নিজেদের পণ্ডিত বলে লাফালাফি করতেন তাঁরা আর আচার্যের সঙ্গে শাস্ত্রীয় আলোচনা বা তর্কযুদ্ধে নামার সাহস দেখালেন না, সোজা তিব্বতের দিকে পালালেন।

বৌদ্ধগণ অবশ্য ক্ষীণ একটা বাধাদানের চেষ্টা চালিয়েছিলেন। মন্ত্রশক্তি, দৈব শক্তির সাহায্যও তাঁরা নিয়েছিলেন। কিন্তু রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে বেশিদিন তাঁরা লড়াই চালাতে পারেননি। রণে ভঙ্গ দিয়ে তাঁরাও দেশ ছাড়লেন। পশুপতিনাথের পূজা শুরু করা গেলেও বৈদিক ধর্মের পুনরুত্থানের তেমন কোনও আশা স্বয়ং আচার্য শঙ্করও সেদিন দেখতে পাননি। কারণ সাধারণ মানুষ বেদান্তের আদর্শ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ছিল। কেউ কেউ বৈদিক ধর্মের উপযোগিতা হৃদয়ঙ্গম করতে পারল না। কিছু মানুষ বৈদিক ধর্মানুষ্ঠানের ইচ্ছা প্রকাশ করল। আচার্য তাদের মধ্যে পঞ্চমহাযজ্ঞ ও পঞ্চদেবতার পূজাদির প্রচার করলেন।

নেপালের বহু ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী বিয়ে করে আবার গৃহস্থ হলেন। অনেকে নেপাল থেকে পালিয়ে আরও দূর দেশে চলে গেলেন। রাজা আচার্যকে এতটাই শ্রদ্ধা করতেন, তিনি যখন পুত্রের পিতা হলেন তখন সেই সদ্যোজাত পুত্রের নাম রেখেছিলেন 'শঙ্করদেব'। আচার্যের নির্দেশে রাজা পশুপতিনাথের পূজার জন্য সদাচারী দক্ষিণদেশীয় এক ব্রাহ্মণকে পূজারীরূপে নিযুক্ত করেন। এরপর বেশ কিছু দিনের মধ্যে নেপালে আবার বৈদিক ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হল। শুরু হল বেদ-বেদান্তের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা।

ধান ভানতে কেন শিবের গীত! কারণ হল যেখানে ত্রৈলঙ্গ স্বামীজি গেলেন সেই দেশটি সম্পর্কেও তো কিছু জানা প্রয়োজন। আমরা হলাম ইতিহাসবিমুখ জাতি। কোনও কিছু লিখে রাখতে বড়ই অনীহা। প্রতিটি বিষয়েই মতান্তর। আচার্য শঙ্করও এ ব্যাপারে রেহাই পাননি। কোন শঙ্কর নেপালে গিয়েছিলেন তা নিয়ে নানা মতভেদ আছে। বলা হচ্ছে বহু শঙ্করাচার্য বিভিন্ন সময়ে নেপালে গিয়ে ধর্মপ্রচার করেছেন। তাঁদের সঙ্গে বৌদ্ধগণের বহুবার সংঘর্ষও হয়েছে। যেহেতু সবকিছু সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়নি তাই নানা রকম গল্প, কাহিনি ছড়িয়ে আছে নেপালের চতুর্দিকে। ১) আদি শঙ্কর সূর্যবংশীয় বৃষদেব বর্মার সময় নেপালে যান। এই তথ্য যদি সঠিক হয় তাহলে শঙ্করের সময়কাল তার বহু পূর্বে। সূর্যবংশীয় একত্রিশ জন রাজার মধ্যে বৃষদেব আঠারোতম রাজা। এই বংশের পর ঠাকুরীবংশীয় আশুবর্মার রাজ্য আরম্ভ হয়। তখন কলিগতাব্দ-৩০০০ বৎসর মাত্র। প্রবাদ এই যে, বৃষদেবের মৃত্যুকালে রানি গর্ভবতী ছিলেন। বৃষদেবের ভাই বালার্চনদেব রাজা হলেন। এই সময় শঙ্কর নেপালে যান এবং রানির ওই পুত্রের নাম শঙ্করদেব রাখা হয়। বালার্চন বৌদ্ধ ছিলেন। আচার্য তাঁকে বৈদিক ধর্ম গ্রহণ করতে বলেন। কিন্তু রাজা রাজি হননি। তখন আচার্য বলপূর্বক তাঁর মস্তক মুণ্ডন করে উপবীত কেড়ে নেন। ক্রোধিত আচার্য এরপর তাঁকে ভিক্ষু সাজিয়ে এক ভিক্ষুণীর সঙ্গে বিয়ে দেন। বুদ্ধের উপাসনা করতে তিনি জনসাধারণকে বাধা দেন বলেও কথিত আছে।

আচার্য নাকি কয়েকটি বৌদ্ধমন্দিরে কয়েকজনকে পুজো করার অনুমতি দিয়েছিলেন। বহু বৌদ্ধ পালিয়ে যান। অনেক ভিক্ষুকে গৃহস্থ করেন। যেসব ব্রাহ্মণ সন্তান পৈতে পরে বৌদ্ধধর্ম পালন করতেন তাঁদের পৈতে কেড়ে নেন। বহু বৌদ্ধ তাঁর কোপানলে পড়ে মারা যান। প্রায় চুরাশি হাজার বৌদ্ধগ্রন্থ নষ্ট করেন তিনি। এরপর তিনি মণিচুর পর্বতে বৌদ্ধবিনাশের জন্য অভিযান করেন। তখন আসরে অবতীর্ণ হন দেবী মণিযোগিনী। তিনি আচার্যকে নিরস্ত করার জন্য ছ'বার প্রবল ঝড় তৈরি করেন। ছ'বার বাধাপ্রাপ্ত হলেও

সাতবারের বার তিনি সফল হন ও দেবীকে বজ্রযোগিনী বলে প্রচার করেন। তিনি মহাকালের সামনে বলির বিধান দেন ও শৈবধর্মের প্রবর্তন করেন।

প্রথম গল্পের গরু গাছে উঠে বসে আছে। দেখা যাক পরবর্তী কাহিনিতে গল্পের গরু কোথায় ওঠে। ২) শঙ্কর ছয় জন্ম ধরে নেপালে বৌদ্ধগণের সঙ্গে সংগ্রাম করেন। শেষকালে সপ্তমজন্মে কৃতকার্য হন। এই সময় ষোলো জন বোধিসত্ব উত্তরদিকে পালিয়ে যান। অর্থাৎ পুনর্জন্মের গপ্পো। ৩) যেসব বৌদ্ধ পশুপতিনাথের মন্দিরে উচ্ছিষ্ট ফেলতেন তাঁদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য শঙ্কর এক অদ্ভুত পন্থা অবলম্বন করলেন। তিনি তাঁদের ভৃত্য হতে রাজি হন। এবং সুযোগ পাওয়া মাত্র তিনি ওই বৌদ্ধদের সুবর্ণময় বৃষটি (মৃগথুচা) নষ্ট করে দেন। এই সুবর্ণময় বৃষই ওই বৌদ্ধদের খাবার দিত। এর ফলে তাঁরা ভয় পেয়ে পালিয়ে যান। এখানে প্রথমে অলৌকিক ক্ষমতা ও পরে চুরির সাহায্য নিয়ে প্রবাদকর্তা প্রবাদটি বাজারে ছেড়েছিলেন। ৪) শঙ্কর ব্রাহ্মণবেশে ভোট অর্থাৎ তিব্বতের খাসা নগরে যান এবং লামার কাছে পরাজিত হন। ৫) শঙ্কর একটি তৈলকটাহ নিয়ে দিগ্বিজয় করতেন। তিব্বত হঙ্করকটাহ নামের একটি জায়গায় তিনি লামার কাছে পরাজিত হয়ে নিজের কটাহে নিজ প্রাণ ত্যাগ করেন।

অত্যন্ত সুকৌশলে শঙ্করবিরোধী মানুষজন এই গল্পগুলি বাজারে চালু করেছিলেন। কোনও প্রাচীন বইতে এ সম্পর্কে কিছু খুঁজে পাওয়া না গেলেও রাইট সাহেবের নেপালের ইতিহাস এবং রায়বাহাদুর শরচ্চন্দ্র দাসের তিব্বত ভ্রমণ-এ এইসব গল্প বেশ ফলাও করে বলা হয়েছে। অর্থাৎ আচার্য শঙ্করাচার্যকে যে-কোনওভাবে কালিমালিপ্ত করতে হবে। পরবর্তীকালে ত্রৈলঙ্গস্বামীর ক্ষেত্রেও অনুরূপ ঘটনা আরও প্রবলভাবে ঘটেছে। কারণ মানুষ তখন আরও আধুনিক। বিভিন্ন বদমাইশি আরও ভালোভাবে করায়ত্ত হয়েছে। ফলে নানারকম অসভ্যতাকে সভ্যতার মোড়কে ঢেকে স্বামীজিকে বিব্রত করার কাজে নামা খুব সহজ হয়েছিল।

'সৌরাষ্ট্রে সোমনাথঞ্চ শ্রীশৈলে মল্লিকার্জুনম।
উজ্জয়িন্যাং মহাকালমোঙ্কারমমলেশ্বরম।
পরল্যাং বৈদ্যনাথঞ্চ ডাকিন্যাং ভীমশঙ্করম।
সেতুবন্ধে তু রামেশং নাগেশং দারুকাবনে।
বারাণস্যাং তু বিশ্বেশং ত্র্যম্বকং গৌতমীতটে।
হিমালয়ে তু কেদারং ঘৃষ্ণেশঞ্চ শিবালয়ে।
এতানি জ্যোতির্লিঙ্গানি সায়ং প্রাতঃ পঠেন্নরঃ।
সপ্তজন্মকৃতং পাপং স্মরণেন বিনশ্যতি।'

নেপালের পশুপতিনাথ কি দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ নন? এই স্তব থেকে বোঝা যাচ্ছে, পশুপতিনাথ দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের মধ্যে স্থান পাননি। তা হলেও নেপালের পশুপতিনাথের মাহাত্ম্য বিন্দুমাত্র কমেনি। তা ছাড়া এই দেবালয়ের সঙ্গে জড়িয়ে আছে অদ্ভুত সুন্দর এক পৌরাণিক কাহিনি। সদ্য সমাপ্ত হয়েছে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ। রক্তের স্রোত তখনও বয়ে চলেছে কুরুক্ষেত্রের প্রাঙ্গণে। স্বজন হারানোর বেদনায় আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে আছে। হারানো রাজ্য ফিরে পেয়েও পাণ্ডবদের মনে কোনও শান্তি নেই। মনকে শান্ত করার জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞও সম্পন্ন হল। তবু মনে সুখ নেই, শান্তি নেই। জ্ঞাতিহত্যা পাপ—সেই পাপকাজে আমরা লিপ্ত হয়েছিলাম। সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত কীভাবে করা যাবে!

পাণ্ডবরা শরণাপন্ন হলেন মহর্ষি ব্যাসদেবের। তিনি সব শুনে বললেন, তোমরা কেদারখণ্ডে গিয়ে তপস্যা করো। মহাদেবের আশীর্বাদে তোমরা গোত্র হত্যার পাপ থেকে মুক্ত হবে। পাণ্ডবরা রাজ্যপাট অভিমন্যুপুত্র পরীক্ষিৎকে দিয়ে কেদারখণ্ডের দিকে চললেন। সেখানে পৌঁছে শুরু হল কঠোর তপস্যা। ভক্তদের অবশ্য মহাদেব খুব কষ্ট দেন না। এক্ষেত্রেও তাই ঘটল। তিনি মহিষরূপে পাণ্ডবদের দর্শন দিলেন। মহাদেবের এই

ছলনা একমাত্র বুঝতে পেরেছিলেন যুধিষ্ঠির। তিনি ভাইদের কাছে ডেকে বললেন, শোনো, এই মহিষ আসলে স্বয়ং মহাদেব। ভীম দাদার কাছ থেকে মহিষের আসল পরিচয় জানা মাত্রই তাকে ধরতে ছুটলেন। শুরু হল লুকোচুরি। একসময় মহিষরূপী শিবকে তিনি পিছন থেকে ধরেও ফেললেন। তুমুল টানাটানি। প্রবল টানে মহিষের শরীর দু-টুকরো হয়ে গেল। মহিষের অগ্রভাগ গিয়ে পড়ল নেপালে। এবং ভীম যে অংশটি ধরেছিলেন সেই অংশটিই আজকের কেদারনাথ, এবং নেপালের অংশটি পশুপতিনাথ। জীবের পাশববৃত্তি, অজ্ঞানতা দূর করে যিনি দেববৃত্তি জাগরিত করেন তিনিই হলেন পশুপতিনাথ।

নেপালে বেশ অনেকদিনই কাটিয়েছিলেন স্বামী ত্রৈলঙ্গ মহারাজ। প্রায় ছ'বছর। তিনি নিশ্চয়ই পশুপতিনাথকে দর্শন করতে গিয়েছিলেন। সেই মুহূর্তে, সেই ক্ষণে গর্ভগৃহে কোনও অদ্ভুত ঘটনা কি ঘটেছিল! কারণ সেদিন যে কাশীর সচল বিশ্বনাথ মুখোমুখি হয়েছিলেন পশু ও জীবগণের পতি পশুপতিনাথের।

যাঁরা নেপালে গিয়ে পশুপতি নাথকে দর্শন করেছেন তাঁরা জানেন এখনও ওই স্থানে আচার্য শঙ্কর সশিষ্য অধিষ্ঠান করছেন। মন্দিরের বাইরে তাঁর মূর্তি ও শিবলিঙ্গ বিরাজমান। আর অদূরেই 'শ্রীশঙ্করাচার্য মঠ।'

সাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় তাঁর এক গবেষণামূলক লেখায় আচার্য শঙ্কর ও ত্রৈলঙ্গস্বামীর অদ্ভুত, সুন্দর এক তুলনা করেছেন। তিনি লিখছেন, "শঙ্করাচার্য এবং তাঁর অনেক পরে বারাণসীর চলমান বিশ্বনাথ ত্রৈলঙ্গস্বামী—মাঝখানে সময়ের দীর্ঘ ব্যবধান—এইরকমই মনে হতে পারে। আসলে অবিচ্ছিন্ন মহাকালে দুটি স্ফুট। একটির সঙ্গে আর একটি জড়িত। শঙ্করাচার্য নিরাকারবাদী, কিন্তু লিঙ্গ উপাসনায় তাঁর আপত্তি ছিল না। ত্রৈলঙ্গস্বামী নিরাকারবাদী হলেও তিনি মা কালীর পূজা করতেন। এই হল মজা। ভারতের ধর্ম মানুষের দ্বারা পরিচালিত নয়। ধর্মই মানুষকে চালনা করেন। ধর্মের উত্তরাধিকার। সেই কারণে শঙ্করাচার্যের পরেই ত্রৈলঙ্গস্বামীকে নেপালে আসতে হল। আর এই পথেই তিনি যাবেন রহস্যময় তিব্বতে।"

নেপালের গভীর অরণ্যে স্বামীজি একা। চলছে প্রবল যোগসাধনা। নেই তেমন কোনও উপদ্রব। ঈশ্বর আর ত্রৈলঙ্গধর, সেখানে আর কারও প্রবেশের অধিকার নেই। কিন্তু একদিন সেই শান্তিও ভঙ্গ হল। সেকালের রাজাদের একটা অদ্ভুত ব্যাপার ছিল। বড়রানির সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে, মন ভালো করার জন্য মৃগয়ায় চল। ছোটপুত্র কেমন দুর্বল, শীর্ণ। ভবিষ্যতে তার কী হবে! এই চিন্তায় কাতর ও ব্যথিত রাজা চিন্তা দূর করতে মৃগয়ায় বেরোতেন। যেমন আমাদের হিন্দুশাস্ত্রের ভুল ব্যাখ্যা আমরা প্রতিনিয়ত করে চলেছি। বিভিন্ন পূজায় যেভাবে পশুবলি হয় তার কোনও স্বীকৃতি আমাদের শাস্ত্রে নেই। সেখানে মনের পশুশক্তিকে বলি দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু চতুর আমরা মায়ের নামে, মায়ের ভয় দেখিয়ে মাংস ভক্ষণের কাজটি সুচতুরভাবে করে যাচ্ছি। এই বিশ্বসংসারের প্রতিটি জীব মায়ের সন্তান। তাহলে মা কীভাবে সন্তানদের রক্ত পান করতে পারেন! ভারতের যাঁরা প্রকৃত তন্ত্রসাধক, বা পরম সাধক, যেমন বামদেব, রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত বা ঠাকুর পরমহংসদেব তাঁরা তো কোনও দিন মায়ের রাঙা পায়ের দর্শন পাওয়ার জন্য পশুবলি দিতে যাননি। রামকৃষ্ণদেব মায়ের দেখা পাওয়ার জন্য খড়গ তুলে নিজের প্রাণ সংহার করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু অবলা জীব নৈব নৈব চ। কালীপুজোর দিন তিনি বলি দেখবেন না বলে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে বসে থাকতেন।

আমার বাংলাদেশের এক দাদা খোদা বক্স শানুর সঙ্গে কথা হচ্ছিল, ঈদ উপলক্ষ্যে তাঁকে শুভেচ্ছা জানানো মাত্র তিনি বলেছিলেন, শোনো ভাই, এই ঈদ হল মনের পশুত্বকে বর্জন আর ত্যাগ। যাঁরা বোঝে না তাঁদের বোঝানো যায়, কিন্তু যাঁরা বুঝেও বোঝে না তাঁদের তুমি কী করবে ভাই! প্রয়াত সাহিত্যিক সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের ভাইপো শানুদা কী সুন্দর কথাগুলি বলেছিলেন। তিনি আজ আমাদের মধ্যে নেই। তবু তাঁকে, তাঁর কথা ও গানকে শানুর গুণমুগ্ধ মানুষজন চিরকাল মনে রাখবেন।

সাধনায় মগ্ন ত্রৈলঙ্গস্বামী। তৎকালীন রাজা তাঁর মনের কোনও কষ্ট দূর করার জন্য পাত্র-মিত্র-সেনাপতি-সৈন্য-বন্ধু সহ মৃগয়ায় বেরিয়েছেন। প্রবল চিৎকার, চতুর্দিক ধুলোয় ঢেকে গেছে। প্রাণভয়ে জীবজন্তু এদিক

থেকে ওদিকে দৌড়চ্ছে। সে এক বিশ্রী নারকীয় অবস্থা। একসময় রাজার প্রধান সেনাপতি এক বাঘের দর্শন পেলেন। তিনি অস্ত্র প্রয়োগ করলেন। কিন্তু সেটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। প্রাণভয়ে বাঘ ছুটে চলল নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে। পিছনে সেই সেনাপতি। বাঘটি বোধহয় জানত তাঁকে ওই সাধু ছাড়া আজ আর কেউ বাঁচাতে পারবে না। ঈশ্বরে মগ্ন ত্রৈলঙ্গজির পাশে গিয়ে চুপ করে শুয়ে পড়ল বাঘটি। প্রবল উল্লাস করতে করতে তার কিছুক্ষণ বাদেই সেই স্থানে উপস্থিত হলেন সেনাপতি। মুখে বিজয়ীর হাসি। এদিকে এই গোলযোগে ত্রৈলঙ্গজির ধ্যান ভঙ্গ হয়েছে। তিনি তাঁর পাশে শুয়ে থাকা বাঘটির দিকে একবার তাকিয়েই বুঝতে পেরেছিলেন কী ঘটেছে এবং এখন কী ঘটনা ঘটবে! তিনি পরম সাধক। তিনি বাঘটির গায়ে হাত বুলিয়ে তাকে আশ্বস্ত করলেন। এই দৃশ্য দেখে সেনাপতির আর নড়াচড়া করার মতো অবস্থা নেই। সমস্ত বীরত্ব শেষ। তাঁকে এই অবস্থায় দেখে স্বামীজির নিশ্চয়ই প্রচণ্ড হাসি পেয়েছিল। হেসেওছিলেন বোধহয়। তিনি সেই সেনাপতিকে ইশারায় নিজের কাছে ডাকলেন। বীরত্ব চলে গেলে ভয় এসে গ্রাস করে মানুষকে। মৃত্যুভয়! সামনে শুয়ে আছে বিশাল বাঘ। একটু এদিক-ওদিক হলেই প্রাণটা যাবে। অস্ত্র ব্যবহার করারও উপায় নেই। সেনাপতি স্বামীজির চরণে নিজেকে সঁপে দিলেন। স্বামীজিকে প্রণাম করলেন। তিনি মৃদু হেসে বললেন, বাবা, এই ঘটনা দেখে তুমি আশ্চর্য ও ভীত হচ্ছ কেন? তুমি নিজে যদি হিংসা পরিত্যাগ করো তবে কোনও হিংস্র প্রাণীই তোমার ওপর হিংসা করবে না, তার প্রমাণ তো তুমি নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছ। হিংস্র বাঘ কেমন চুপটি করে আমার পাশে শুয়ে আছে। তুমি এই বাঘটিকে এতক্ষণ ধরে হত্যা করতে চাইছিলে। কিন্তু এখন এই মুহূর্তে তুমি যে অবস্থাতে আছ তাতে এই বাঘটি ইচ্ছা করলেই তোমাকে হত্যা করতে পারে। তুমি এখন প্রাণভয়ে ভীত হয়ে পড়েছ। দেখ বাবা! কেউ কাউকে নিজের ইচ্ছায় বিনাশ করতে পারে না। যদি পারত তাহলে তোমার হাতে এই বাঘটি বহু পূর্বেই মারা যেত। কিন্তু তা তো হয়নি। এই বিশ্বসংসারে প্রত্যেকেরই বাঁচার অধিকার আছে। কারোরই হিংসা করা উচিত নয়। তোমার আর কোনও ভয় নেই। তুমি নির্ভয়ে তোমার অনুচরবর্গের কাছে ফিরে যাও। আর পারলে হিংসাবৃত্তি ত্যাগ করার চেষ্টা কোরো।

সেনাপতি স্বামীজির আশ্বাসবাণীতে এতক্ষণে প্রকৃতিস্থ হলেন। এরকম অলৌকিক ঘটনা তিনি আগে কখনও দেখেননি এবং শোনেননি। তিনি স্বামীজিকে প্রণাম করে সেখান থেকে বিদায় নিলেন। বাঘটিও একসময় বুঝতে পারল আর কোনও ভয় নেই। সেও স্বামীজির পাশ থেকে উঠে নিজের গন্তব্যে চলে গেল।

বিস্মিত সেনাপতি রাজপ্রাসাদে ফিরে রাজার সঙ্গে দেখা করে সমস্ত ঘটনা তাঁকে সবিস্তারে জানালেন। রাজা ও উপস্থিত পারিষদবর্গ সব শুনে একেবারে হতবুদ্ধি। ধর্মপরায়ণ রাজার মন মহাত্মাকে দর্শন করার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল। তিনি সেই সেনাপতি ও কয়েকজন পার্ষদকে নিয়ে স্বামীজিকে দর্শন করার জন্য বেরিয়ে পড়লেন। পথপ্রদর্শক সেনাপতি। কিছুক্ষণের মধ্যে তাঁরা পৌঁছে গেলেন স্বামীজির কাছে। রাজা স্বামীজিকে প্রণাম করলেন। তাঁর নির্দেশে ত্রৈলঙ্গ স্বামীজির সামনে রাখা হল নানা মূল্যবান দ্রব্য ও রত্নরাশি। স্বামীজি ওইসব বস্তুর দিকে একবার দৃষ্টিপাতও করলেন না। ঈশ্বরের রত্নভাণ্ডারের অমূল্য রত্নরাশি যিনি ভোগ করতে পারেন তাঁর কাছে এই অকিঞ্চিৎকর পার্থিব দ্রব্যের কোনও মূল্য ও আকর্ষণ কি থাকে? তিনি রাজাকে ওইসব জিনিস ফিরিয়ে নিতে বললেন। রাজা স্বামীজির আদেশ মাথা পেতে মানলেন। সেদিন ত্রৈলঙ্গস্বামী রাজাকে নানা উপদেশ দিয়েছিলেন। তৃপ্ত রাজা একসময় ফিরে গেলেন আপন আলয়ে। তবে স্বামীজির এই অলৌকিক ঘটনার কথা খুব তাড়াতাড়ি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। ফলে যা হওয়ার তাই ঘটল। তিনি নেপাল থেকে বেরিয়ে পড়লেন। গেলেন গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী, কেদার, বদরিনাথ প্রভৃতি স্থানে। এরপর তিনি যাবেন তিব্বতে।

৫

শিব-পার্বতীর আবাসভূমি, চিররহস্যময়, চিরতুষারের দেশ তিব্বত। স্বামীজি যাচ্ছেন তিব্বতে। দীর্ঘ উনিশ বছর তিনি কাটাবেন চিররহস্যময় এই দেশে। ঘটবে নানা ঘটনা। তিব্বতকে বলা হয় 'Roof of the world'। এর চীনে নাম 'Xizang zizhiqu'। 'সর্বনিম্ন ভূখণ্ডের সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা ৩৬০০ মিটার। তিব্বত একটি আধা মরুভূমি। বৌদ্ধধর্মের পীঠস্থান। বৌদ্ধতন্ত্রের জন্মও এইখানে। রহস্যময় একটি অঞ্চল। এখানকার দেবীরা সব তান্ত্রিক। রহস্যময় সাধন পদ্ধতি। বৌদ্ধ লামারা যোগমার্গী। ধর্মই এখানকার প্রধান বিষয়। তবে পাহাড়ি চাষবাস, পশুপালন ও ব্যবসা-বাণিজ্য এই দেশের মানুষ অলস নন। শুধুই ধর্ম নয়, অর্থও যুক্ত আছে। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় সন্তান স্বামী বিবেকানন্দের ভ্রমণসঙ্গী স্বামী অখণ্ডানন্দজি তিব্বতের আকর্ষণে সমস্ত বিপদ তুচ্ছ করে এখানে দুবার (সম্ভবত তিনবার) এসেছিলেন।

স্বামী অখণ্ডানন্দজি এক দুঃসাহসী পরিব্রাজক। তিনি বিভিন্ন দিক দিয়ে তিব্বতে প্রবেশ করেছেন। যেদিক দিয়েই যান না কেন, পথ দুর্গম। চোর-ডাকাতের উপদ্রব, আর সেইরকম ঠান্ডা। অখণ্ডানন্দজি প্রথমে তিব্বতে প্রবেশ করেছিলেন 'মানা গিরিবর্ত্ম' দিয়ে। এই পথেই রাজা রামমোহনও তিব্বতে ঢুকেছিলেন। বণিকরা এই পথেই যাতায়াত করেন। মানার মধ্যভাগে পার্বতীদেবীর জন্মস্থান ও পিত্রালয়। অখণ্ডানন্দজি প্রথমবার তিন মাস তিব্বতে ছিলেন। বেরিয়ে এসেছিলেন নীতিঘাটের পথে, তিব্বতি ব্যবসায়ীদের সঙ্গে। এই ব্যবসায়ীরা তাঁকে খুব ভালোবাসতেন। এবং একটি ঘটনায় স্বামী অখণ্ডানন্দজির জীবন সংশয় হয়েছিল। এই বন্ধু ব্যবসায়ীরাই তাঁকে রক্ষা করেন।

দ্বিতীয়বার তিনি তিব্বতে যান বদরিকা আশ্রমের পথে 'ছিপছিলাম' গিরিবর্ত্ম দিয়ে। এবার ছিলেন পাঁচমাস। এই সময় তিনি কৈলাস ও মানস সরোবর দর্শন করেন। তিব্বত সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা ভালোয় এবং মন্দয় মেশানো। প্রথমবার তিনি থুলিং মঠে থেকে তিব্বতি ভাষা শিখতে আরম্ভ করেন। কিন্তু লামাদের ঐশ্বর্য, বিলাসিতা ও দরিদ্র পীড়নে প্রতিবাদ করার ফলে তাঁর কাঁধে খাপ সমেত তরোয়ালের আঘাত পড়ে। এ ছাড়াও পাহাড়িরা মত্ত অবস্থায় লামাদের কাছে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানালে লামারা বলেছিলেন, 'ওর গাল বাড়িয়ে দাও।' অর্থাৎ গাল দুটো কেটে দাও, তাহলে আর কথা বলতে পারবে না। জনৈকা বৃদ্ধার সাহায্যে তিনি পালাতে পেরেছিলেন।

দ্বিতীয়বার তিনি লাসা যেতে গিয়ে পুলিশের হাতে বন্দি হন। পরিচিত তিব্বতি ব্যবসায়ীরা জামিন দিয়ে তাঁকে ছাড়ান। তিব্বতি পুলিশরা অত্যন্ত অত্যাচারী ছিল। কৈলাস ও মানসসরোবর দর্শনের কালে তিনি ডাকাতদের হাতে পড়েন। গুড় আর চাল ভাজা দিয়ে কোনওরকমে তিনি রক্ষা পান। তৃতীয়বার তিনি লাসা যেতে চেয়েছিলেন, বন্ধুরা বাধা দেওয়ায় তিনি নিরস্ত হন। স্বামী অখণ্ডানন্দজি লামাদের কাছ থেকে অনেক যৌগিক ক্রিয়া শিখেছিলেন। তার মধ্যে একটি, কানের পাশের বিশেষ একটি গ্রন্থিতে চাপ দিলে যত শীত-ই হোক শীত করবে না।

তিব্বত আজও রসহ্যময়। এপাশ-ওপাশ-চারপাশ-ঢাল বেয়ে নেমে গেলে কোন রহস্যে মানুষ পৌঁছোবে তা আজও জানা নেই। কিছুদিন আগে এক বিদেশি চ্যানেলের সাহসী টিম এই অঞ্চলের একটি স্থান খুঁজে পেয়েছিলেন। সেই স্থানটির কাছে তাঁরা যেতে পারেননি। দূর থেকে ছবি তুলেছিলেন। তাঁদের বক্তব্য, 'সেই জায়গাটি যেন জগতের বাইরের একটি জগৎ। ভূমি, আকাশ এবং প্রাণী—সবই কেমন যেন আলাদা।' তবে কি সেটাই চিররহস্যময় জ্ঞানগঞ্জ। আমার মনে হয় তাঁরা জ্ঞানগঞ্জের সন্ধান পেয়েছিলেন।

জ্ঞানগঞ্জ কী? কোথায় এর অবস্থান? এটি একটি অলৌকিক স্থান। এই স্থানটির ভৌগোলিক অবস্থান ঠিক কোথায় বলা গেলেও বলা হয়নি। যাঁরা এখানে কোনও অলৌকিকভাবে এসেছিলেন, সাধন ভজন করে সিদ্ধমহাপুরুষ হয়েছিলেন, তাঁরা আমাদের লৌকিক জগতে ফিরে এসে স্থানটিকে চিহ্নিত না করে

রহস্যাবৃতই রেখেছেন। বলেছেন, সাধারণ উপায়ে যাওয়া সম্ভব নয়। জ্ঞানগঞ্জে অবস্থানকারী কোনও সাধক কৃপা করে উক্ত স্থানে নিয়ে না গেলে যাওয়া যায় না। এই যে রহস্য, এর কী সমাধান তা আমাদের জানা নেই। বিজ্ঞানসম্মত একটি কথা বলা যেতে পারে যথা এই বিশাল বিশ্বের এমন একটি স্থান আছে যা সময়ের বাইরে। সময় বলতে বিজ্ঞানের ভাষায় টাইম জোন। একটু ব্যাখ্যা করা যাক, সময় কাকে বলে! আমরা যে বহমান সময়ের কথা বলি—সেটা কী? একটি ক্ষয়িষ্ণু পদার্থ না থাকলে সময়ের চলন বোঝা যায় কি? মানুষ শিশু থেকে বৃদ্ধ হন, তারপর তিনি আর থাকেন না। তাঁর জীবনকে দিয়ে সময়ের একটি পরিমাপ করা গেল, ক্যালেন্ডার তৈরি হল। বলা হল—এত সাল থেকে এত সাল পর্যন্ত সেই মানুষটি ছিলেন। সময় কিন্তু তার আগেও ছিল, পরেও থাকবে। মানুষটি যেন দর্জির ফিতে। পৃথিবীতে এমন জায়গা আছে যেখানে সময়ের সাক্ষী হতে পারে এমন কোনও নশ্বর জীব নেই।

সেই স্থানটি তাহলে সময়ের বাইরের একটি এলাকা। একেই আমরা বলতে পারি ব্রহ্ম। বলা হচ্ছে জ্ঞানগঞ্জ সেইরকম একটি জায়গা যেখানে পৃথিবীর স্থান, কাল, পাত্র—এই তিনটি বস্তু ঘটিত কোনও নিয়ম নেই। এখানে যেসব সাধক আছেন তাঁদের বয়স অবিশ্বাস্য রকমের—তিন হাজার, চার হাজার বছর হতে পারে। জাগতিক নিয়মের বন্ধন মুক্ত। ইচ্ছা-ভ্রমণ, ইচ্ছা-অবসান, মৃত্যু বলা যাবে না। কারণ, এটি জন্ম-মৃত্যুর বাইরে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীরা পৃথিবীকে তিনটি স্তরে রেখেছেন। এই স্থানটি আছে চতুর্থ স্তরে, ফোর্থ ডাইমেনশন। এই সম্পর্কে বিখ্যাত এক ইংরেজ লেখক কলিন উইলসনের গবেষণা আছে। এই অঞ্চলে যেসব ঘটনা ঘটে পৃথিবীর নিয়মে তার ব্যাখ্যা করা যায় না। সেই কারণেই অলৌকিক।

মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজজি তাঁর 'জ্ঞানগঞ্জ' গ্রন্থে লিখছেন,—

''সিদ্ধভূমি অনেক আছে—শাস্ত্র পাঠে তাদের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং কোন কোন শক্তিশালী মহাত্মা নিজের জীবনে ঐ সম্বন্ধে কিছু কিছু প্রত্যক্ষ অনুভবও প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কথিত আছে, যে জ্ঞানগঞ্জ আমাদের এই পরিচিত পৃথিবীর একটি গুপ্ত স্থান বিশেষ—কিন্তু উহা এমন গুপ্ত যে, বিশিষ্ট শক্তির বিকাশ না হইলে এবং ঐ স্থানের অধিষ্ঠাতার অনুজ্ঞা না হইলে এই মর্ত্য জীবের দৃষ্টিগোচর হয় না। সিদ্ধভূমি মাত্রেরই ইহাই বৈশিষ্ট্য। সিদ্ধভূমি স্বয়ংপ্রকাশ হইলেও যে সকল জীব ঐ স্থান হইতে কোন প্রকার শক্তির আনুকূল্য প্রাপ্ত না হয় তাহাদের পক্ষে উহার দুর্ভেদ্য রহস্য ভেদ করা অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বিভিন্ন সিদ্ধভূমির স্বরূপ পরিস্থিতি ও ক্রিয়া বিভিন্ন প্রয়োজন সাধনের জন্য বিভিন্ন ভূমি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে সিদ্ধভূমি, দিব্যভূমি প্রভৃতি অলৌকিক জীব-নিবাস-স্থান সকলকে এক বর্গেরই অন্তর্গত বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইল। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে উহাদের পরস্পর ভেদ ও প্রত্যেকটির নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান আছে। গোলকধাম, নিত্য বৃন্দাবন, কৈলাস, নিত্য সাকেত প্রভৃতি স্থানের মহত্ব বিভিন্ন প্রকার। এই জাতীয় বিশিষ্ট স্থান মায়িক জগতে বিভিন্ন স্তরে বহু আছে। মায়ার ঊর্ধ্বেও আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, কেদারেশ্বর জল্লেশ্বর, মহাকাল এবং শ্রীশৈল—এই সকল ভুবন তেজতত্বে বিদ্যমান আছে। উহারই অংশ অবলম্বন করিয়া যোগীগণ পৃথিবীতে অর্থাৎ ভারতবর্ষে ঐ সকল নাম দিয়া তীর্থ স্থাপন করিয়াছেন। তদ্রূপ অট্টহাস কনখল, কুরুক্ষেত্র ও গয়া—এইগুলি বায়ুতত্বের ভুবন। অবিমুক্ত, গোকর্ণ স্থাণু—আকাশ তত্বের ভুবন। এইরূপ সর্বত্রই বুঝিতে হইবে। মলিন মায়ার ঊর্ধ্বে বিশুদ্ধ মায়া-রাজ্যেও অনেক ভুবন আছে, যাহাদের প্রতিরূপক পৃথিবীতে স্থাপিত হইয়াছে। বৌদ্ধশাস্ত্র অনুসারে অনাস্রব ধাতুতেও বিভিন্ন বুদ্ধ-ক্ষেত্র ও দিব্য ধাম বর্তমান রহিয়াছে। পৃথিবীতে ঊর্ধ্বলোকের প্রায় সমস্ত স্থানই আংশিকভাবে অবতীর্ণ ও প্রকট রহিয়াছে—এই সকল অংশকে অবলম্বন করিয়া অল্প আয়াসেই মূল স্থানকে প্রকাশ করা যায়। এই জন্য আমাদের এই সুপরিচিত বৃন্দাবন হইতেও নিত্য বৃন্দাবনের সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং এই জাগতিক দৃষ্টি গোচর কাশী হইতেও সুবর্ণময় শঙ্করের ত্রিশূলে প্রতিষ্ঠিত নিত্য কাশীর দর্শন লাভ করা যায়। সর্বত্রই অচ্ছিন্ন যোগসূত্র রহিয়াছে।

জ্ঞানগঞ্জের আলোচনাকালে স্মরণ রাখা উচিত যে, এই স্থান সাধারণ ভৌগোলিক স্থানের ন্যায় নহে। ইহা যদিও গুপ্ত ভাবে ভূ-পৃষ্ঠে বিদ্যমান আছে তথাপি ইহার প্রকৃত স্বরূপ বহুদূরে। প্রকৃত যোগী ভিন্ন এই স্থানের সন্ধান কেহ পাইতে পারে না, ইহাতে প্রবেশ লাভ করা তো দূরের কথা। তবে অধিকারীগণের অনুগ্রহ হইলে এই জগতের সাধারণ মানুষও সেখানে যাইতে সমর্থ হয়। ভৌম জ্ঞানগঞ্জ কৈলাসের পরে এবং ঊর্ধ্বে অবস্থিত। কিন্তু তাহা হইলেও উহা সাধারণ পর্য্যটকের গতিবিধির অতীত। জ্ঞানগঞ্জ, রাজরাজেশ্বরী মঠ, এবং পরম গুরুদেবের শ্রীমন্দির স্তর-বিন্যাসের দৃষ্টিতে বিভিন্ন স্তরে অবস্থিত। জ্ঞানগঞ্জই সকলের নিম্নস্তর, রাজরাজেশ্বরী মঠ মধ্য স্তর এবং পরম গুরু মহাতপার স্থান সর্বোচ্চ। এই স্থানটি যোগী নির্মিত। ইহা সৃষ্টির আদিতে লোকস্রষ্টার সৃষ্টিরূপে প্রকট হয় নাই। ধ্রুবলোক যেমন সাধক বিশেষের তপস্যার ফলে কাল বিশেষে প্রকট হইয়াছে, গোলোক যেমন শ্রীকৃষ্ণের ভূ-পৃষ্ঠে অবতরণের সঙ্গে সংসৃষ্ট উচ্চতম নিত্য ধাম, সুখাবতী যেমন অনাস্রব ধাতুতে অমিতাভ বুদ্ধের বিশুদ্ধ শক্তির প্রভাবে প্রতিষ্ঠিত, জ্ঞানগঞ্জও তেমনি যোগী বিশেষের তীব্রতম যোগসাধনার প্রভাবে বিশ্বকল্যাণের মহালক্ষ্য পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছে। বস্তুতঃ নিত্য হইয়াও উহা নিমিত্তযোগে প্রকট হইয়াছে।''

গোপীনাথ কবিরাজজির সৌভাগ্য হয়েছিল—তিনি এমন গুরু লাভ করেছিলেন যাঁর কোনও দ্বিতীয় হয় না। তাঁর সমকক্ষ অল্প কয়েকজনই ছিলেন। যেমন শ্রীশ্রী রামঠাকুর, শ্রীশ্রী শ্যামাচরণ লাহিড়ী, শ্রীশ্রী রামদাস কাঠিয়াবাবা, শ্রীশ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রী ত্রৈলঙ্গস্বামী আর শ্রীশ্রী কালীপদ গুহরায়। এই সারিতে শ্রীশ্রী ত্রৈলঙ্গ স্বামীজির নাম সর্বপ্রথম থাকা উচিত।

জ্ঞানগঞ্জ বিশেষ জ্ঞান সাধনের পীঠস্থান, অতএব জ্ঞানপীঠ। এবং এই জ্ঞান বিশেষ জ্ঞান। অর্থাৎ বিজ্ঞান। সূর্যসাধন। সে যাই হোক, এই স্থানটি অষ্টপাশ মুক্ত। ভৌগোলিকভাবে একটি মানচিত্র তৈরি করা যেতে পারে। যেমন হিমালয়ের বিভিন্ন অংশ, দক্ষিণ ভারতের কিছু কিছু পর্বতের শীর্ষে, পূর্বভারতের কামাখ্যা, তিব্বতের বিভিন্ন অংশ, পাঞ্জাব ও কাশ্মীরের কোনও কোনও অঞ্চল, নৈনিতাল ও নেপালের মধ্যবর্তী পূর্ণগিরি, বিন্ধ্যাচল, গিরনার, ভৈরবঘাট, শ্রীশৈলম ইত্যাদি স্থানের সঙ্গে জ্ঞানগঞ্জ বা জ্ঞানপীঠের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। অর্থাৎ এ এক বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো।

জ্ঞানগঞ্জের প্রধান কার্যালয় যেখানে সেই জায়গাটির নাম 'মনোহর তীর্থ'। অত্যন্ত দুর্গম একটি স্থান, কিন্তু অতি রমণীয়। জ্ঞানগঞ্জের অন্যান্য পরমহংসদেবের গুরুদেব ব্রহ্মর্ষি 'মহাতপা'-র আসন এই তীর্থে। এখানে সিদ্ধ-মহাপুরুষরা যেমন থাকেন সেইরকম সিদ্ধ-ভৈরবীদেরও স্থান। শ্রীশ্রী বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেব কয়েকজনের নাম করতেন, যেমন উমা ভৈরবী, ত্রিপুরা ভৈরবী, খ্যাপা ভৈরবী। তিনি যখন দেহে ছিলেন তখন খ্যাপা ভৈরবীর বয়স বারোশো বছর। এই যে মনোহর তীর্থের সঙ্গে অন্যান্য জ্ঞানগঞ্জের যোগাযোগ তা হত আকাশপথে, যোগবিভূতি মার্গে। এখানে রোগ-শোকের কোনও অস্তিত্ব নেই। ফলে মৃত্যুও নেই। বিশুদ্ধানন্দজি জ্ঞানগঞ্জের যে শাখার কথা প্রায়ই বলতেন সেটি পাঞ্জাবের জলন্ধর থেকে গোগা পর্যন্ত বিস্তৃত।

এই রহস্যময় স্থান সম্পর্কে এক যোগী নতুন কিছু তথ্য দিয়েছেন। অবশ্য নিজের নাম গোপন করে ছদ্মনামে—দেবদীপ। তিনি তাঁর 'তিব্বতের রহস্যময় যোগ ও তন্ত্র' গ্রন্থে লিখছেন—

''দেখলাম, লামাজী আমাদের দিকে আসছেন। উঠে দাঁড়ালাম আমরা। কি জানি কোন কাজে গিয়েছিলেন লামাজী। প্রায় মিনিট দশেক লাগল তাঁর ফিরে আসতে। কাছে এসে সোফায় বসে বললেন, স্বামী দিব্যাসনার সঙ্গে একটু কথা বলছিলাম। এরপর শঙ্কর মহারাজের দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমিই তো শঙ্করস্বামী? দিব্যাসনা বলেছে তোমার কথা। তোমার সাধক জীবন সার্থক হতে চলেছে। জ্ঞানগঞ্জে ঘুরে এসো। মহাগুরুর দর্শন পাবে সেখানে। জীবনদর্শনই বদলে যাবে তোমার। সমাধির স্বাদ পাবে। খাঁটি আর নিষ্কাম ঈশ্বর প্রেমের, ঈশ্বর সমর্পিত জীবনের একটা প্রচ্ছন্ন প্রভাব, সূক্ষ্ম স্তরে আত্মিক লোকে থেকেই যায়। জ্ঞানগঞ্জে তুমি মুক্তির স্বাদ পাবে। সেই জগতের আলোই আগামী দিনে তোমাকে মুক্তির পথ দেখাবে। নিজেকে তুমি আগে সূক্ষ্ম ধ্যান জপে মগ্ন রাখো। আরো সঙ্কুচিত করো নিজেকে। লোকালয় এড়িয়ে চলো। ঈশ্বর আর তোমার মাঝে

অন্য কোনো বাধা আসতে দিও না। পথনির্দেশ যথাসময়েই তুমি পেয়ে যাবে। সেবাধর্ম ভাল, যদি সেটা ঈশ্বরে উৎসর্গীকৃত হয়। কিন্তু নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য যে সেবা, সে সেবা মূল্যহীন। শুধুমাত্র ঈশ্বর সেবাতেই নিজেকে নিয়োজিত করো। স্বর্গারোহিণীতে তোমরা দেখতে পাবে রাবণ রাজার সেই স্বর্গে ওঠার সোনার সিঁড়ি। অসম্পূর্ণই থেকে গেছে সেটা। যদিও এটা ভাবজগতের সম্পদ। যোগীরা এই থেকে শিক্ষাগ্রহণ করেন যে, রাবণ রাজার মত অত শক্তিশালী, সম্পদশালী সাধকেরও কাজ অসম্পূর্ণ থেকে গিয়েছিল আজ হবে, কাল হবে বলে। হাতের কাজ ফেলে রেখো না। জীবনের সময় বড় কম, বড় অনিশ্চিত। সময়ের স্রোত কখন কাকে কোনদিকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, তার কোনো ঠিক নেই। আশা করি আমার কথার অর্থ বুঝবে তুমি। অশেষের জন্য যাত্রা শুরু করো তুমি।

এরপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন য়ুৎসুং লামা : জ্ঞানগঞ্জ থেকে ১১ কিলোমিটার দূরে তিব্বত সীমান্ত। যদি তুমি আমাদের মঠে যেতে আগ্রহী থাকো, তাহলে আমি নিয়ে যাবার সব ব্যবস্থা করতে পারি। তোমার কোনো খরচ লাগবে না। দু-মাস থাকবে আমার কাছে। মেডিটেশনের স্তরগুলো দেখবে। বিভিন্ন যোগসাধন প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি দেখবে। ওখানে ভাল লাগবে, আরো কিছুদিন থেকে আশেপাশের মঠগুলোও দেখে আসতে পারো। সে ব্যবস্থাও মঠের থেকেই হয়ে যাবে। পুরোনো অনেক গ্রন্থ আছে। সংস্কৃত আর তিব্বতি ভাষায় লেখা। সেগুলোও দেখতে পাবে। একটা অন্য আলোকময় জীবনের স্বাদ পাবে। তা ছাড়াও, ওখানে থাককালীন আর যা যা দেখতে পাবে, যা যা উপলব্ধি হবে, যে নতুন দর্শন শিখবে, আমার মনে হয় সে সব কথা এক জীবনে লিখে শেষ করতে পারবে না। তুমি সেখানে যেতে চাও কিনা সেটা তোমার ওপরেই নির্ভর করবে। আমি যেটুকু জেনেছি, তাতে তোমার কোনো দীক্ষাও হয়নি। তোমার পক্ষে খোলা মনে সবকিছু দেখা সম্ভব হবে। আগামীকাল সকালে তোমাদের কাছে আমার কোনো লোক যাবে। তার হাতে দুটো ফর্ম থাকবে। সেগুলো Fill up করে দিও। তোমার পাঁচটা পাসপোর্ট ফটোও তার হাতে দিয়ে দিও। এদিককার কাজ সব এগিয়ে থাকবে। কি ধরনের প্রস্তুতির প্রয়োজন হবে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশও তুমি পেয়ে যাবে।

আমি তোমাকে একটা তিন অক্ষরের বীজমন্ত্র দিচ্ছি। যদি তুমি তিব্বতে যাবার সিদ্ধান্ত নাও তাহলে, সূর্য উদয়ের আগে স্নান করে, পরিষ্কার বস্ত্র পরে, ঘরের সব দরজা জানলা বন্ধ করে, মেঝেতে আসন পেতে বসে, উত্তরদিকে মুখ করে তুমি ১০০১ বার এটা জপ করবে। জপের মধ্যে কোনোভাবেই আসন ছেড়ে ওঠা যাবে না। পদ্মাসনে বসবে। জপ শেষ হয়ে গেলে, তুমি আমাকে যা জানাতে চাও, মনে মনে বলবে। সেটা আমি যেখানেই থাকি না কেন জেনে যাব। তারপর তোমাকে যা নির্দেশ পাঠাবার তা আমি পাঠাব। আর সেটা তুমি সেখানে বসেই জেনে যাবে। তবে সত্যিকারের প্রয়োজন ছাড়া বীজ কখনও ব্যবহার করবে না।

আমি তাঁকে সবিনয়ে জানালাম, এ কথা আমার মনে থাকবে।

এইসময় দুজন লামা ঘরে ঢুকলেন। তাঁদের হাতে তিনটে ফ্লাস্ক। একটা ট্রে। ট্রেতে মোটা মোটা এক ধরনের বিস্কুট, প্রচুর মাখন আর ফ্লাস্কে কফি। টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে যেমন নীরবে তাঁরা এসেছিলেন তেমনিই নীরবে ফিরে গেলেন। লামাজী মৃদুস্বরে তাঁদের কিছু বললেন, তারপর আবার সোফায় এসে বসলেন। আমাদের জন্য সময় নির্দ্ধারিত ছিল সকাল ৯টা থেকে ১১টা। দেখলাম, এখনো অনেক সময়ই হাতে রয়েছে। মনে হলো, এইবার স্বামী শঙ্কর ভারতীর প্রসঙ্গটা একবার তুলেই দেখি না, যদি তাওয়াং মঠ সম্পর্কে নতুন কিছু জানা যায়। তা ছাড়া পরপর দুবার উনি বলেছেন সাংগ্রীলা ঘাঁটির কথা। এই নামটাই কখনো শুনিনি। এ বিষয়ে যদি তিনি আমাদের কিছু বলেন তাহলে নতুন অনেক তথ্যই জানা যাবে।

অতি সাবধানে আমি বললাম, যোগীবর, একটু আগেই আপনি বলছিলেন সাংগ্রীলা ঘাঁটির কথা। সেখান থেকেই আপনি এসেছেন। এই নামটা আমরা আগে কখনো শুনিনি। এটা ঠিক কোন জায়গায়, যদি দয়া করে একটু বলেন। এ ছাড়াও গতকালই শঙ্কর ভারতীজী বলছিলেন তাওয়াং মঠের কথা। সেই প্রসঙ্গেই তিনি

বলছিলেন যে, তাওয়াং সম্বন্ধে আপনার অসাধারণ জ্ঞান। সেখানকার বিষয়েও যদি দু-একটা কথা বলেন। আমরা সত্যিই জানতে খুব আগ্রহী।

এইবার সত্যি সত্যিই হাসলেন য়ুৎসুং লামা। বললেন, সুন্দর, অতি সুন্দর। প্রথমে জানলাম অরুণকুমার শর্মা আমার কথা প্রথম বলেছেন তোমাদের। তারপর জানলাম স্বামী দিব্যাসনা তোমাদের পাঠিয়েছেন। এবার শুনছি শঙ্করভারতী তোমাদের তাওয়াং মঠের কথা বলেছেন। তিনি তো বিগত বারো বছর ধরেই তাওয়াং মঠে আছেন। সেখানকার সবই তাঁর জানা। নতুন কথা আমি আর কি বলবো? শুধু এটুকুই বলতে পারি, তোমরা দুজন খুব ভালই চরে বেড়াচ্ছো। অরুণকুমার শর্মা, স্বামী দিব্যাসনা, স্বামী শঙ্করভারতী। তোমরা তো দেখছি তোমাদের অজান্তেই সাংগ্রীলা ঘাঁটির এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে বিচরণ করছ। শঙ্কর ভারতীজীর সাথে আমার পরিচয় সম্ভবতঃ ১৯৬১ সালে। আর তাঁর সঙ্গে আমার পরের দেখা ১৯৬২ সালে, এই তাওয়াং মঠেই। সে কথা তাঁর কাছে তোমরা অবশ্যই শুনেছো বলেই আমি ধরে নিচ্ছি। আমার গুরুদেব 'লামা লাম্পাছেন'। এখনও তাওয়াং মঠেই আছেন তিনি। ৫০০ বছর তাঁর অনেক আগেই পেরিয়ে গেছে। সঠিক কত বয়স তা বলা সম্ভব নয়। যদি তোমরা কখনো তাওয়াং মঠে যেতে চাও তাহলে আমি তোমাদের সাহায্য করতে পারি। তার আগে তোমরা জ্ঞানগঞ্জ ঘুরে এসো। তাহলে তোমাদের দৃষ্টি অনেক স্বচ্ছ হয়ে যাবে। দৃষ্টি বলতে আমি অবশ্য চোখের দৃষ্টির কথা বলছি না, বলছি অন্তরের দৃষ্টির কথা। আর তারপর চলো সিয়াং মঠে। যেখানে আমি থাকি। অন্তত মাস দুই তিন সেখানে থাকো। এরপর ফিরে এসে তাওয়াং এর কথা ভাবা যাবে। ছ'মাস সময়ের মধ্যেই সব ঘোরা হয়ে যাবে। হ্যাঁ, তোমরা জানতে চাইছিলে সাংগ্রীলা ঘাঁটির কথা।

শোনো তাহলে। তিব্বত আর অরুণাচলের সীমা থেকেই শুরু হয়েছে এই সাংগ্রীলা ঘাঁটি। কিন্তু ব্যাপক ভূ-হীনতা এবং চতুর্থ আয়াম, যেটাকে তোমরা ফোর্থ ডায়ামেনশন বলে থাকো, তার দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার দরুন এই সাংগ্রীলা ঘাঁটি আজও অগম্য, অদৃশ্য আর রহস্যময়। এইটুকুই সকলে জানে, অন্তরীক্ষের অন্য কোনো এক লোকের সঙ্গে এই সাংগ্রীলা মঠের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ রয়েছে।

শুনে অবাক হয়ে গেলাম। কৌতূহলভরে জানতে চাইলাম, আপনি যে এই চতুর্থ আয়াম অথবা ফোর্থ ডায়ামেনশনের কথা আর ভূমিহীনতার কথা বলছেন, এটা কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলাম না। এর তাৎপর্য কি যোগীবর?

য়ুৎসুং লামা বেশ সহজ হয়ে গেলেন। বললেন, এই বিষয়টা অবশ্য একটু জটিল। চতুর্থ আয়াম অথবা ভূ-হীনতার তথ্যগত সিদ্ধান্তের সঠিক ব্যাখ্যা করা, আর সঠিক বিবেচনা করা, সকলের আয়ত্তের মধ্যে নয়। বিগত পঁচিশ বছর ধরে আমি এই ফোর্থ ডায়ামেনশনের বিষয়ে অনুসন্ধান করছি। কিন্তু এখনো আমি পুরোপুরি সফল হয়েছি, একথা বলতে পারবো না। যদি আমি নিজে এই সাংগ্রীলা ঘাঁটির রহস্যময় প্রদেশে না যেতাম আর না বসবাস করতাম, তাহলে কখনোই এই দুটো বিষয়ের ওপর এত ব্যাপক অনুসন্ধান করতে পারতাম না।

লামা য়ুৎসুং বললেন, বায়ুমণ্ডলে যেমন এরকম অনেক জায়গা আছে যেখানে বায়ুশূন্যতা বিরাজ করছে, সেইরকমই বিশ্বে এমন অনেক জায়গা আছে যেগুলো ভূ-হীন। এইরকম বায়ুশূন্যতা আর ভূ-শূন্যতায় সম্পৃক্ত জায়গাগুলো ফোর্থ ডায়ামেনশন অথবা চতুর্থ আয়াম দ্বারা প্রভাবিত। আর এইরকম প্রভাবিত স্থানগুলো দেশ, কাল, নিমিত্তের অনেক ঊর্ধ্বে থাকে। কোনো বস্তু বা প্রাণী, নিজের অজান্তেও যদি ঐরকম প্রভাবিত ক্ষেত্রে একবার প্রবেশ করে, তাহলে এই তিন ডায়ামেনশন জগতের দৃষ্টিতে তার সত্তা অদৃশ্য অথবা লুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু সেখানে তার অস্তিত্ব যেমন ছিল তেমনিই থাকে। এটা নিশ্চিতভাবে কখনোই বলা যায় না যে, ভবিষ্যতে কবে তাদের অস্তিত্ব এই জগতে আবার প্রকট হবে অথবা আদৌ প্রকট হবে কিনা আর কোনোদিন।

এই বিষয় সম্বন্ধীয় যে সব প্রাচীন বই আছে, তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বইয়ের নাম 'কাল বিজ্ঞান'। তিব্বতী ভাষায় লেখা এই বই তাওয়াং মঠের পুস্তকালয়ের এক অমূল্য সম্পদ। কাল বিজ্ঞান বইটি আমি

কয়েকবার গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছি। আর অবশেষে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, থ্রি ডায়ামেনশনে বাঁধা এই সংসারে প্রতিটি জিনিস দেশ, কাল ও নিমিত্ত দিয়ে বাঁধা। আমাদের এই বিশ্বের যে ভূমি তা বক্র। যদি কোনো বস্তু অথবা প্রাণী স্থানহীনতা বা শূন্যতা প্রভাবিত ক্ষেত্রে চলে যায়, তবে সেই বক্রতার পরিসমাপ্তি ঘটে। সবচেয়ে মজার কথা এটাই যে, যদি কোনো ব্যক্তি এইরকম ভূ-হীনতা প্রভাবিত ক্ষেত্রে চলে যায়, তাহলেও তার কোনো ধারণাই থাকবে না যে, সে এক বিচিত্র আর রহস্যময় সংসারের নতুন বাতাবরণে প্রবেশ করেছে, যেখানে কালের প্রভাব অতি নগণ্য। শুধুমাত্র তাই নয়, মনের, প্রাণের আর বিচারের শক্তি সেখানে একটা বিশেষ সীমা পর্যন্ত বেড়ে যায়। শারীরিক ক্ষমতা, জীবনীশক্তি আর মানসিক চেতনাও আশাতীতভাবে বেড়ে যায়। সে সব সময়ই নিজেকে প্রফুল্ল আর তরতাজা অনুভব করতে থাকে।

এইসব কথা যত শুনছিলাম ততই হতবাক হচ্ছিলাম। অন্তত আমার কাছে এই বিষয়গুলো একেবারেই নতুন, আর অবশ্যই কৌতূহলোদ্দীপক। নানান প্রশ্নের তুফান বয়ে যাচ্ছিল আমার মনে। শঙ্কর মহারাজের মনে কী হচ্ছিল তা অবশ্য আমার জানা নেই।

একটু থেমে যুৎসুং লামা বলতে থাকলেন : সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা এটাই যে, সময়ের প্রভাব সেখানে এতই নগণ্য যে শরীরের ওপর কালের প্রভাব অতি ধীর গতিতে পড়ে। যদি কেউ পঁচিশ বছর বয়সে চতুর্থ আয়াম প্রভাবিত ক্ষেত্রে প্রবেশ করে, তাহলে তার শরীর বহু বছর ধরে ঐ পঁচিশ বছর বয়সের যুবকের মতো হয়ে থাকবে, বয়সের বা কালের কোনো ছাপ তার শরীরে পড়বে না। এই কারণেই, চতুর্থ আয়াম প্রভাবিত ক্ষেত্রে যে সব যোগীরা থাকেন, পাঁচশো-ছশো বছর বেঁচে থাকা তাঁদের পক্ষে কোনো সমস্যাই নয়। শরীর একইরকম থেকে যায়, যদিও আয়ু তার বাড়তেই থাকে। কিন্তু সেই বৃদ্ধির প্রভাব শরীরের ওপর পড়ে না। বিশেষত্ব এটাই, সম্বন্ধিত ব্যক্তির কোনো ধারণাই থাকে না এ বিষয়ে। সে এটাই মনে করে যে, সে এখনো পঁচিশ বছরের যুবকই আছে। আবার সংযোগবশত যদি কোনোভাবে ঐ ব্যক্তি ঐ প্রভাবিত ক্ষেত্রের বাইরে চলে আসে, তাহলে সেই বৃদ্ধি হওয়া আয়ুর প্রভাব তৎক্ষণাৎ তার শরীরের ওপর পড়তে শুরু করে। তার জীবনীশক্তি ক্ষীণ হয়ে যায়। এমনকি সে মারাও যেতে পারে। সে যাই হোক, এই রকমই হলো সাংগ্রীলা ঘাঁটি আর এই রকমই হলো তার রহস্যময় অবিশ্বাস্য বাতাবরণ। এটা আদপে কত পুরোনো, তা বলা সম্ভব নয়। কথিত আছে, এটা পৌরাণিক ঘাঁটি। পুরাণে এর নাম আছে 'শাংগ্রিলা' ঘাঁটি। পরে সেটা সাংগ্রীলাতে পরিণত হয়েছে। স্বর্গীয় বাতাবরণে ডুবে থাকা এই সাংগ্রীলা ঘাঁটি এক অদ্ভুত আলোর আভায় পরিপূর্ণ। এই ঘাঁটি কত বড় তাও বলা সম্ভব নয়। কিন্তু এখানে গুপ্তভাবে অনেক যোগাশ্রম, সিদ্ধাশ্রম আর তান্ত্রিক মঠ রয়েছে। সেইসব মঠ ও আশ্রমে শতশত, হাজার হাজার, উচ্চকোটির ক্ষমতাসম্পন্ন কালজয়ী সাধক আর যোগীদের নিবাস। সেখানকার বেশিরভাগ যোগীই দিব্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত। তাঁরা সরাসরি সূক্ষ্ম দেহে আকাশপথে বিচরণ করেন। ইচ্ছেমতো তাঁরা তাঁদের ভক্ত আর শিষ্যদের দর্শনও দেন। কয়েকজন এমন অসাধারণ যোগীও রয়েছেন, যাঁরা মহাভারতের সময় থেকেই সেখানে রয়েছেন ও সাধনা করে চলেছেন। তাঁদের যোগবলের কাছে অসম্ভব বলে কোনো শব্দ নেই। শঙ্করাচার্যের যুগ, যীশুখৃষ্টের যুগ, বৌদ্ধযুগ, সবই তাঁদের চোখের সামনে দিয়ে পার হয়েছে। দেবলোকেও সরাসরিই তাঁদের আসা যাওয়া। চতুর্থ আয়ামের প্রভাবে তাঁদের শরীর আলোকময়, অবিনশ্বর।

যাঁরা সাংগ্রীলা ঘাঁটির সঙ্গে ভালোভাবে পরিচিত, সেইরকম মহাযোগীদের কাছেই জেনেছিলাম, যোগীরাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ীর গুরুদেব মহাগুরু বাবাজি মহারাজ যিনি নিজে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আর আদি শঙ্করাচার্যকে দীক্ষা দিয়েছিলেন, তিনি আজও সাংগ্রীলা ঘাঁটিরই কোনো সিদ্ধাশ্রমে বাস করেন। কখনো কখনো আকাশপথে গমন করে নিজের প্রিয় শিষ্যদের দর্শনও দেন। ১৯৬৫ সালে, চকোরী মঠে আমি তাঁর প্রথম দর্শন পেয়েছিলাম। তখন তাঁকে দেখে মনে হয়েছিল, বয়স কোনোমতেই তিরিশের বেশি হবে না। চক্রাকার আলোকপুঞ্জের মতো ঘুরে ঘুরে তিনি আকাশপথ দিয়ে মঠে এসে নেমেছিলেন।

সাংগ্রীলা ঘাঁটির তিনটি সাধনাকেন্দ্র জগৎ প্রসিদ্ধ। প্রথম হল জ্ঞানগঞ্জ মঠ, দ্বিতীয় হল সিদ্ধবিজ্ঞান আশ্রম, আর তৃতীয় হল যোগসিদ্ধাশ্রম। এই তিনটে আশ্রমই অতি বিশাল। অনেক অনেক বিভাগ আছে তাদের। প্রত্যেক বিভাগের জন্য আলাদা আলাদা আচার্য এবং আলাদা আলাদা নির্দেশক আছেন। এইসব আচার্য এবং নির্দেশকরা সকলেই ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত এবং সকলেই উচ্চকোটির জ্ঞানযোগী। তাঁরা সকলেই দীর্ঘজীবী ও কালজয়ী। বেশিরভাগ সময়েই তাঁরা আত্ম শরীরে থাকেন। তাঁদের ভৌতিক শরীর ও সূক্ষ্ম শরীর আলাদা আলাদা ভাবে থাকে। অর্থাৎ তাঁরা আত্ম শরীরে সাধনা করেন আর সূক্ষ্ম শরীরে বিচরণ করেন। কখনো কখনো প্রয়োজন পড়লে তাঁরা নিজেদের ভৌতিক শরীরেরও উপযোগ করেন। অন্যথায় সেই শরীর নিষ্ক্রিয়ভাবে পড়ে থাকে। তাঁদের সূক্ষ্ম শরীর অতি প্রখর শক্তিশালী। যার ফলস্বরূপ তাঁরা সূক্ষ্ম শরীরে মুহূর্তের মধ্যে হাজার মাইল রাস্তা অতিক্রম করতে পারেন। আবার গন্তব্যস্থানে পৌঁছে নিজেদের ভৌতিক শরীর ধারণ করতে পারেন।

আশা করি তোমরা স্বামী বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেবের নাম শুনেছ। মহামহোপাধ্যায় ডঃ গোপীনাথ কবিরাজের গুরু ছিলেন তিনি। 'গন্ধবাবা' নামেই ছিল তাঁর প্রসিদ্ধি। তিনি জ্ঞানগঞ্জ মঠের সঙ্গেই যুক্ত ছিলেন। সেই মঠের এক আচার্য নিমানন্দ তাঁকে যোগদীক্ষা দিয়েছিলেন। সূর্যবিজ্ঞানেও সুদক্ষ করে তুলেছিলেন তাঁকে। শিক্ষাগ্রহণের পর অবশ্য তিনি আবার কাশীতেই ফিরে এসেছিলেন, লোককল্যাণের জন্য।

জ্ঞানগঞ্জ মঠের আচার্য আকাশমার্গে ঘুরে ঘুরে যোগানুকূল আর দিব্য সংস্কারসম্পন্ন শিষ্যের খোঁজ করতে থাকেন। এরকম কোনো শিষ্যের খোঁজ পেলে তিনি তাঁকে নিজের মঠে নিয়ে চলে যান। সেখানেই দীর্ঘসময় ধরে চলতে থাকে শিক্ষাদীক্ষা। এই শিক্ষা সম্পূর্ণ হলে যোগের প্রচার ও প্রসারের জন্য তাঁকে সংসারে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয়। স্বামী বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেব এই রকমই একজন শিষ্য ছিলেন। মঠের আচার্য এইভাবেই তাঁকে জ্ঞানগঞ্জ মঠে নিয়ে গিয়েছিলেন।

তোমরা যেখানে যাবে, সেই জ্ঞানগঞ্জ মঠের প্রধানত দুটি বিভাগ। প্রথম বিভাগটি বিশুদ্ধ জ্ঞানযোগের সঙ্গে সম্বন্ধিত। দ্বিতীয় বিভাগ হলো যোগবিজ্ঞান। যোগবিজ্ঞানের অন্তর্গত ষোলোটি বিভাগ আছে, যার মধ্যে রয়েছে সৌরবিজ্ঞান, সূর্যবিজ্ঞান, নক্ষত্রবিজ্ঞান, কালবিজ্ঞান, ক্ষণবিজ্ঞান, বায়ুবিজ্ঞান এবং চন্দ্রবিজ্ঞান। প্রত্যেক বিভাগের শিক্ষা আলাদা আলাদাভাবে দেওয়া হয়। সংসারে যার যে বিজ্ঞান শেখার যোগ্যতা আছে, তাকে খুঁজে নিয়ে গিয়ে সেই বিষয়েই শিক্ষা দেওয়া হয়।

এই কয়েকটা বিশেষ আশ্রম ছাড়াও সেখানে কয়েকটি তান্ত্রিক মঠও রয়েছে। সেগুলোর আকার বিশাল। এই মঠগুলোতে থাকেন উচ্চকোটির শাক্ত সাধকেরা। এই সাধকেরাও অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন, কালজয়ী আর আকাশচারী। তাঁরাও যোগ্য পাত্রের সন্ধানে ভ্রমণ করতে থাকেন। ঠিক এইরকমই, সিদ্ধ তান্ত্রিক লামাদেরও অনেক মঠ আর আশ্রম আছে। সেগুলোর সঙ্গে বাইরের দুনিয়ার সরাসরি সম্বন্ধ আছে। কিন্তু সেইসব সাধকেরা ভৌতিক জগতের সামনে নিজেদের বাস্তব পরিচয় সম্পূর্ণ গোপন রাখেন।

একবার এইরকমই এক তান্ত্রিক লামার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। তখন আমি পরকায়া প্রবেশের মাধ্যমে আমার এই চতুর্থ শরীর ধারণ করেছি। সে প্রায় ৯০ বছর আগেকার কথা। কিছু অদ্ভুত রকমের অলৌকিক সিদ্ধি ছিল তাঁর। নিজস্ব বিশেষ কোনো একটা সিদ্ধির জন্য তিনি একটা উপযুক্ত মৃতদেহের সন্ধান করছিলেন। তাওয়াং মঠেই এসেছিলেন তিনি। নাম তাঁর ইউছেন লামা। প্রথম পরিচয়েই প্রভাবিত হয়ে গিয়েছিলাম। তিনি থাকতেন সিয়াং মঠে। শত শত বছর ধরে কাপালিক সম্প্রদায় আর অঘোরীদের ভয়ঙ্কর তামসিক সাধনার কেন্দ্রবিন্দু এই সিয়াং মঠ। ইউছেন লামাই আমাকে জানিয়েছিলেন, বহু শত বছর আয়ুর অনেক কালজয়ী কাপালিক, জানি না কবে থেকে ঐ মঠে বাস করছেন। সকলেই প্রায় অমানুষিক শক্তি সম্পন্ন। নিজেদের ভয়ঙ্কর তমোগুণী তান্ত্রিক শক্তির বলে নানারকম অসম্ভব কাজকে সম্ভব করে তোলায় তাঁরা পারদর্শী। বীভৎস বীভৎস এবং অকল্পনীয় আতঙ্কের নানান দৃশ্য সৃষ্টি করতেও তাঁরা সিদ্ধহস্ত।

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন যুৎসুং লামা। হয়তো মনে মনে ঠিক করে নিচ্ছিলেন এই বিষয়ে কতটুকু আমাদের কাছে বলা যেতে পারে। তারপর তিনি বললেন : বহু বহু বছর আগে আমার গুরুদেবের সঙ্গে প্রথমবার আমি সাংগ্রীলা ঘাঁটিতে যাই। সেটা ছিল একটা বুদ্ধপূর্ণিমার দিন। তখনো আমি চতুর্থ শরীরে আসিনি। সেই সময়ে কীভাবে যে আমি এই থার্ড ডায়ামেনশনের জগতের সীমা পার হয়ে ফোর্থ ডায়ামেনশনের জগতে ঢুকে পড়েছিলাম, তা আমার জানা নেই। গুরুদেবের কৃপাতেই এটা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু একটা কথা সম্পূর্ণ সত্যি যে, সেখানে প্রবেশ করতেই এই সংসারের অস্তিত্ব আমার কাছে বায়বীয় হয়ে গেল। তার জায়গায় একটা সদা নবীন, সদা আনন্দময় আর আলোকময় সংসার আমার চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। আশ্চর্যের কথা এটাই যে, সেখানে না ছিল সূর্যের আলো, না ছিল চাঁদনী। চারদিকের বাতাবরণে একটা দুধসাদা আলোর আভা প্রতিফলিত হচ্ছিল। সেইসময়, অসম্ভব রকমের একটা নীরবতা চারদিকে ছেয়ে ছিল। সেই আলোয় আমি দেখতে পেলাম, একদিকে মঠ, আশ্রম আর নানান ধরনের নানান প্রকৃতির মন্দির, আর অন্যদিকে দিগন্ত বিস্তৃত ধু-ধু করা সাংগ্রীলা ঘাঁটি। অতি সুন্দর আর আকর্ষণীয়। এক অনির্বচনীয় শান্তির সাম্রাজ্য। যার রূপ বর্ণনা করা অসম্ভব।

সেই মঠে পৌঁছে গুরুদেব আমাকে একজন লামার হেফাজতে দিয়ে কি কি যেন নির্দেশ দিলেন তাঁকে। তারপর ধীর পায়ে ভেতরে ঢুকে গেলেন। এরপর সেই লামা, জানি না কখন আর কীভাবে, আমাকে নিয়ে এমন একটা জায়গায় পৌঁছোলেন, যেখানে জমি ছিল স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ। লামা আমার কানে ফিসফিস করে বললেন, জানো, এই জমি, যার ওপর তুমি দাঁড়িয়ে রয়েছ, এটা একজন মহান যোগীর প্রবল ইচ্ছাশক্তি প্রসূত। শুধু তাই নয়, অনেক লোক-লোকান্তরের সঙ্গেও এই জমির অদৃশ্য সম্পর্ক রয়েছে। এর নিচে কিছুই নেই। আমি হতবাক হয়ে গেলাম। বললাম, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। লামা একবার চারদিকে তাকিয়ে নিলেন। তারপর বললেন, এখন অবশ্য তুমি বুঝবে না কিছুই। একটু সময় অপেক্ষা করো। সবই বুঝতে পারবে।

সত্যি সত্যিই একটু পরে এক আজব দৃশ্য আমার চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগলো। ঐ স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ জমি হঠাৎই অনেকদূর পর্যন্ত লাল রঙের হয়ে গেলো। আর সেই জমি থেকে রঙবেরঙের আলোকরশ্মি বেরোতে শুরু করল। পরিষ্কার দেখলাম সেই আলোকরশ্মিরা মাঝেমাঝেই নিজেদের মধ্যে ধাক্কা খাচ্ছে, আর তখন নানারঙের ফুলকি বেরিয়ে আকাশে অনেকদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে যাচ্ছে। অদ্ভুত সেই দৃশ্য দেখে আমি বাক্যহীন হয়ে গেলাম। অপলক নয়নে, প্রাণভরে এই অলৌকিক দৃশ্য আমি দেখছিলাম। হঠাৎই সেই রশ্মিগুলোর নিজেদের মধ্যে ধাক্কা খাওয়া আর ফুলকি ছড়ানো বন্ধ হয়ে গেলো। এবার ধীরে ধীরে রশ্মিগুলো ঘনীভূত হতে থাকলো। তারপর মাঝখান থেকে এক বিশেষ আকার প্রকট হতে লাগলো। সেই আকার ক্রমেই বাড়তে শুরু করলো। এরপর সেটা বিশাল একটা মহলের রূপ ধারণ করে নিলো।

পুরো মহলটাই চকচকে আর সাদা আলোয় ভরা। মনে হচ্ছিল পুরো মহলটাই যেন কাচের তৈরি। সামনেই, ওপরে ওঠবার জন্য যথেষ্ট লম্বা চওড়া স্বচ্ছ সিঁড়ি ছিল। তার পরেই মহলের বিশাল তোরণ, তার দুদিকে দুটো বিশাল হাতি শুঁড় ওপরদিকে তুলে দাঁড়িয়ে আছে। দুটো হাতিই চকচকে কালো পাথরের তৈরি। কার মহল এটা? জানতে চাইলাম আমি। লামা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, এটা মহল নয়। আশ্রম। ঐ মহান যোগীরই ইচ্ছাসৃষ্টি। নিজের প্রবল ইচ্ছাশক্তি দিয়েই উনি সৃষ্টি করেছেন। সূক্ষ্ম জগতে থেকেও ঐ যোগী কখনো কখনো এখানে এই ধরনের সৃষ্টি করেন। এর পেছনে তাঁর কী উদ্দেশ্য আছে, অথবা ঐ পরম মহাযোগীর কি পরিচয়, তা বলা যায় না। আসলে তাঁর বিষয়ে কেউই সঠিক কিছু জানেন না। সবকিছুই ঘোর রহস্যময়। এই লামার কথাও আমার কেমন রহস্যময় লাগলো। মনে হলো তিনি যেন কিছু একটা লুকোতে চাইছেন। লামা বললেন, যোগবিজ্ঞান হলো প্রকৃষ্ট বিজ্ঞান। কার্য আর জ্ঞানের মিলিত অভ্যাস ছাড়া প্রকৃষ্ট বিজ্ঞানে অধিকার প্রাপ্ত হওয়া অসম্ভব। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, যেখানে প্রকৃত জ্ঞান আছে সেখানে কর্ম হয় না। আবার যেখানে কর্ম আছে সেখানে জ্ঞানের অভাব পরিলক্ষিত হয়। একসাথে দুটো সত্তা খুবই দুর্লভ।

আমি জানতে চাইলাম, যোগ আর বিজ্ঞান দুটোই কি একই ভূমির ওপর অবস্থিত? লামা বললেন, না তা নয়, দুইয়ের মধ্যে ভিন্নতা আছে। ইচ্ছাশক্তির পূর্ণ বিকাশই হলো যোগ। সেইভাবে মনোশক্তির পূর্ণ বিকাশ হলো প্রকৃষ্ট বিজ্ঞান। সৃষ্টি যোগবল থেকেও হয়, আবার বিজ্ঞানবল থেকেও হয়। একটায় কাজ করে ইচ্ছাশক্তি, আর অন্যটায় মনোশক্তি। বর্তমানে বিজ্ঞানের যে উন্নতি হচ্ছে তার মূলে ইচ্ছাও আছে আবার মনও আছে। শুধু শক্তিটাই নেই। এই জন্যই তার আধার ভূমিতে অজ্ঞান অথবা ত্রুটি থেকেই যায়। সেই অজ্ঞানতা আর ত্রুটির কারণেই আগামীদিনে এই ভৌতিক বিজ্ঞান বিনাশেরও কারণ হতে পারে। এই পর্যন্ত বলার পর এবার থামলেন লামাজি। এইসব শুনে আর দেখে মনের মধ্যে একটা অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছিল।

আমার খুবই জানার ইচ্ছে হচ্ছিল, এই সৃষ্টি কোন বল থেকে হচ্ছে? যোগবলে না বিজ্ঞানবলে? এ ছাড়া এটাও আমি জানার জন্য খুবই উৎসুক ছিলাম, ঐ পরম মহাযোগীর কি পরিচয়? কিন্তু সে কথা আমি তখন ওঠালাম না।

আমি ঐ লামার সঙ্গে আশ্রমের ভেতরে ঢুকলাম। ফটক পার হতেই বিশাল লম্বা চওড়া উঠোন। যার মাঝখানে পদ্মফুলের মতো আকারের একটা খুব বড় ফোয়ারা। ফুলের ওপর এক নগ্নযুবতীর মূর্তি। মূর্তির হাতে কাচের মতো স্বচ্ছ একটা পাথরের কলসী। তার ভেতর থেকে জল বেরিয়ে ফোয়ারার রূপ নিয়ে বাইরে আসছে। উঠোনের চারদিকে ছিল লম্বা লম্বা দালান এবং অনেক কামরা। দালানের স্তম্ভগুলোতে ছিল নানা রকমের অপূর্ব বুটিদার নকসা। মেঝেগুলোও সেইরকম। দেওয়ালে দেওয়ালে বিভিন্ন ধরনের সব প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি আঁকা রয়েছে। সেই উঠোন এবং দালান পার হওয়ার পর আবার সিঁড়ি পেলাম। সেই সিঁড়ি দিয়ে নেমে একটা অতি সুন্দর বাগানে পৌঁছোলাম। বাগানে নানা রকমের ফুল আর ফলের গাছ লাগানো ছিলো। সেই সব ফুলের দিব্য সুগন্ধে সারা বাতাবরণ ম ম করছিল। এর ফলে সামগ্রিক পরিবেশ আরো রসময় আর আনন্দময় হয়ে উঠেছিল। জমির ওপর মখমলের মতো মোলায়েম সবুজ ঘাসে ভরা।

সত্যি কথা বলতে কি, সবকিছুই যেন কেমন স্বপ্নময় লাগছিল। ঘোরটা কাটছিল না। মনে হচ্ছিল আমি যেন কোনো স্বপ্নের জগতে ঢুকে পড়েছি। মুগ্ধ হয়ে মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারদিকে দেখছিলাম সেই মহান আর পরম যোগীর অদ্ভুত কীর্তি। আর তখনই একটা অবাক করা ঘটনা ঘটে গেলো। কোথা থেকে যেন চব্বিশ পঁচিশটি যুবতী সেখানে এসে গেলো। তারা সবাই ছিল একই বয়সের। শুধু এই নয়, দেখতেও তারা একইরকম। উচ্চতাও একরকম। কুড়ি-একুশ বছরের বেশি বয়েস কারুরই হবে না। প্রত্যেকের খোলা চুল পিঠের ওপর দুলছে। পরনে সকলেরই গেরুয়া রঙের শাড়ি। গলায় স্ফটিকের মালা। সকলের চেহারায় অপূর্ব তেজের দমক। চোখেমুখে তাদের অপার শান্তি আর পরিতৃপ্তির ভাব।

যুবতীদের হাবভাব দেখে মনে হচ্ছিল, তারা যেন কারুর আসবার জন্য প্রতীক্ষা করছে। আমার এই অনুমান ভুল ছিল না। একটু পরে দেখলাম, রূপালী আলোর এক তেজোময় পুঞ্জ সহসা সেখানে প্রকট হলো। সেই প্রকাশ ঠিক কেমন ছিল তা আমি ঠিকমতো বর্ণনা করতে পারব না। ব্যস, শুধু এইটুকু শুনে রাখো, ঐ প্রকাশপুঞ্জ ছিল অদ্ভুত, অবর্ণনীয়, অসাধারণ। সেই আলোকপুঞ্জের চারদিকে রঙিন রশ্মি ছড়িয়ে পড়ছিল। ঐ প্রকাশপুঞ্জ বাগানে নেমে, সেখান থেকে ধীরে ধীরে আশ্রমের ভেতরে যেতে থাকলো। যুবতীরাও সকলে তার পেছনে পেছনে যেতে লাগলো।

লামার কাছে জানতে চাইলাম, এই প্রকাশপুঞ্জটা কি? তিনি জবাব দিলেন, এটা ঐ পরম মহাযোগীর আত্মশরীর। আত্মশরীর? চমকে উঠলাম আমি। হ্যাঁ, আত্মশরীর। লামা বললেন। যোগীদের আত্মশরীর এইরকমই হয়। আমি জানতে চাইলাম, এই আত্মশরীর কোন যোগীর? লামা বললেন, ঐ মহান আর পরম যোগীর। এইসব অলৌকিক সৃষ্টি যাঁর।

আমি অপলক দৃষ্টিতে ঐ প্রকাশপুঞ্জের দিকে তাকিয়ে রইলাম। ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে ঐ প্রকাশপুঞ্জ উঠোনের একদিকে তৈরি একটা স্ফটিকের চবুতরার ওপরে গিয়ে স্থির হয়ে গেলো। স্থির হতেই ঐ যুবতীরা চবুতরার চারদিকে ঘিরে বসে পড়ল। তারপর একদৃষ্টে সকলে ঐ প্রকাশপুঞ্জের দিকে তাকিয়ে রইল। ঐ

সময়কার বাতাবরণ ছিল বড়ই আধ্যাত্মিক, আর অলৌকিক। আমি জানতে চাইলে লামা বললেন, ঐ যুবতীরা সবাই 'যোগকন্যা'। অনেক জন্মের সাধনার ফলে এঁরা এই দিব্য স্থিতি লাভ করেছেন। যোগের ভাষায় এটাকেই বলে কৈবল্য অবস্থা। এঁরাও সকলে আত্মশরীর ধারিণী। যোগীর মনোরঞ্জনের জন্যই এঁরা সব ভৌতিক শরীর ধারণ করেছেন।

আমি জানতে চাইলাম, এটা কি সম্ভব? লামা বললেন, কেন সম্ভব নয়? আত্মশরীর ধারণ করার পর যোগাত্মারা তাঁদের ইচ্ছেমতো যে-কোনো সময়ে নিজের জন্য ভৌতিক শরীর রচনা করতে পারেন। এদিকে লামার সঙ্গে কথা বলতে বলতেই আমার দৃষ্টি আবার চলে গেল প্রকাশপুঞ্জের দিকে। আর সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম আমি।

ঐ প্রকাশপুঞ্জ ধীরে ধীরে মানবাকৃতির রূপ নিচ্ছিল। আমি মোহাবিষ্টের মতো তাকিয়ে রইলাম সেই দিকে। একটু পরেই দেখলাম, প্রকাশপুঞ্জের জায়গায় এক দিব্য শরীরধারী মহাত্মা বসে আছেন। তিনি পদ্মাসনে বসে ছিলেন। তাঁর চোখ দুটি ছিল নিমীলিত। নির্বিকারভাবে ধ্যানমূর্তিতে বসেছিলেন তিনি। যোগকন্যারা যাঁরা তাঁকে ঘিরে বসে ছিলেন, তাঁদের মুখমুদ্রাও ছিল গম্ভীর আর নির্বিকার।

জানি না কতক্ষণ, ঐ আধ্যাত্মিক বাতাবরণ আর অথৈ শান্তিসাগরে ডুবেছিলাম আমি। সহসা মেঘের গর্জনের মতো আওয়াজে চারদিক কেঁপে উঠল। মুহুর্মুহু বিদ্যুৎ চমকাতে লাগলো। জ্বলন্ত পারার মতো তীক্ষ্ণরেখা আকাশের এক কোণা থেকে অন্য কোণায় ছুটে বেড়াতে লাগলো। হাজার হাজার ম্যাগনেসিয়াম তারের মতো প্রখর আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল ঐ রহস্যময় পরিবেশ। মুহূর্তে ধাঁধিয়ে গেলো আমার চোখ। চোখের সামনে শুধুই অন্ধকার। আমি চোখ বন্ধ করে ফেললাম। আর একটু পরে যখন চোখ খুললাম, তখন কি দেখলাম জানো? প্রথমে এসে যা যা দেখেছিলাম, ঠিক তাই। একটা হালকা সাদা আলোর আভায় ভরা শান্ত বাতাবরণে ডুবে থাকা সেই সাংগ্রীলা ঘাঁটি। আর কোনো কিছু নয়, চারদিকে শুধু গভীর নিস্তব্ধতা। আমি একা দাঁড়িয়ে আছি। সবচেয়ে অবাক করা কথা, ঐ লামাকেও আর কোথাও দেখতে পেলাম না। তিনিও কোথায় যেন গায়েব হয়ে গেছেন। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। এই সময়েই সামনে দেখি গুরুদেব আসছেন। কাছে এসে হেসে বললেন, চলো, ফিরে যাই তাওয়াং। তাই গিয়েছিলাম ফিরে। কিভাবে জানা নেই। পরে একবার গুরুদেবের কাছে জানতে চেয়েছিলাম, হে মহর্ষি, সাংগ্রীলা মঠে আমি যা কিছু দেখেছিলাম তা কি সত্যি? গুরুদেব ধীর ভাবে বলেছিলেন, বর্ণে বর্ণে সত্যি।

কিভাবে আমি রহস্যময় ঘাঁটির বাইরে এসেছিলাম, তা আজও অজানা। আমার যখন চেতনা ফিরল, তখন মনে হল স্বপ্ন দেখছিলাম। তোমরা সাংগ্রীলা ঘাঁটির কথা শুনতে চেয়েছিলে, সে কথা তোমাদের শোনালাম। হাজার হাজার ফুট উঁচু পর্বতমালায় ঘেরা এই সাংগ্রীলা ঘাঁটির খোঁজ বিগত প্রায় ৮০ বছর ধরেই চলেছে। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও আজ পর্যন্ত কেউই সফলতা পায়নি। এমনকি চীনও দীর্ঘকাল ধরে অবিরাম এই সাংগ্রীলা ঘাঁটির খোঁজ করে চলেছে। আজও তারা গভীরভাবে খুঁজে বেড়াচ্ছে। কিন্তু নিরাশা ছাড়া তারাও আজ পর্যন্ত কিছু পায়নি।

এই কথা শুনে আমরা দুজনেই খুব আশ্চর্য হয়ে গেলাম। আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গেলো, কি বলছেন আপনি যোগীবর? চীন আর সাংগ্রীলা ঘাঁটি? সাংগ্রীলা ঘাঁটির সঙ্গে চীনের কী সম্পর্ক? কেনই বা তারা এত বছর ধরে এর খোঁজ করে চলেছে?

য়ুৎসুং লামা বললেন, সে এক অবিশ্বাস্য আর অসাধারণ কাহিনী। সত্যি ঘটনা আমি নিজে উপস্থিত থেকে যা দেখেছি আর জেনেছি, সে কথা যদি তোমরা শুনতে চাও তাহলে আমি শোনাতে পারি। আবারও বলছি, এই ঘটনা সর্বৈব সত্য।

এবার শঙ্কর মহারাজ আর চুপ থাকতে পারলেন না। হাতজোড় করে একটু হেসে তিনি বললেন, দয়া করে বলুন লামাজী। আমরা শোনবার জন্য যথার্থই আগ্রহী। শুধুমাত্র তাওয়াং, সাংগ্রীলা বা চীন নয়, সত্যি কথা বলতে কি, আপনার যে-কোনো কথা শোনার জন্যই আমরা আগ্রহী। সে আপনি সারাদিন ধরে বললেও

আমরা শুনব। এ পর্যন্ত যা শুনেছি, তাতেই আমরা ধন্য হয়ে গেছি। তবে মুশকিল একটাই। দাদার সামনে আপনি যে কাহিনী শোনালেন, তাতে দাদা তো এবার সাংগ্রীলা সাংগ্রীলা করে পাগল হয়ে যাবেন।

লামাজী বললেন, তাই তো আমি ওকে আমার মঠে গিয়ে কয়েকমাস থাকতে বলছি। সেখানে যা দেখবে আর বুঝবে, তা এক জীবনে লিখে শেষ করা যাবে না। ভাগ্যে থাকলে কী কী দুর্লভ দর্শন হয়ে যায়, তা কে বলতে পারে? সে কথা এখন থাক। একটু আগে তোমরা জানতে চেয়েছিলে, চীনের সঙ্গে সাংগ্রীলা ঘাটির কি সম্বন্ধ? যে কথা এখন তোমাদের বলব, সে কথা তোমাদের বিশ্বাস করা উচিত। শুনতে যতই অবিশ্বাস্য মনে হোক না কেন, এটাই বাস্তব ঘটনা। সেই ঘটনার সাক্ষী আমি নিজেই।

অক্টোবর ১৯৬২-তে চীন ভারতের ওপর আক্রমণ করেছিল। সেটা কিন্তু ভারতের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ওপর আঘাত হানবার জন্য নয়। চীন আক্রমণ করেছিল একটি মাত্র কারণে। সেটা হল যে-কোনও মূল্যে সাংগ্রীলা ঘাঁটিকে খুঁজে বার করা, আর তার দখল নেওয়া। সেই চেষ্টা আজও অব্যাহত রয়েছে। শুধু অব্যাহত আছে বললে কম বলা হবে। উত্তাপ আরো বেড়েছে। হিমালয়ের ওপারে, তিব্বতে এখন কি পরিস্থিতি চলছে, সে সব খবর বাস্তবে সারা বিশ্বেরই অজানা। কখনো কি তোমরা এই প্রশ্নটার ওপর গভীরভাবে বিচার করে দেখেছো যে, ভারতের ওপর চীন কি কারণে আক্রমণ করেছিল? সত্যি তো এটাই, আজ পর্যন্ত কেউই দায়িত্বপূর্ণভাবে আর স্পষ্ট ভাষায় এই প্রশ্নের উত্তর দেননি। তার সঙ্গে আরও আশ্চর্যের কথা এই যে, উনিশ দিন যুদ্ধের পরেই চীন একতরফা যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করলো। কেন? কেন চীন যুদ্ধবিরতি ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই সব সৈন্য ফিরিয়ে নিয়ে গেল? আবার এর চেয়েও অবাক করা ঘটনা, চীনের তৎকালীন কোনো নেতাই কোনো সময়ে এই প্রশ্নের উত্তর দেননি।

যুৎসুং লামা বললেন, ১৯৬২ সালে চীন-ভারত যুদ্ধের সময় আমি নিজে অরুণাচলের তাওয়াং মঠে ছিলাম। চীন আক্রমণ করে প্রথম তাওয়াং-ই দখল করেছিল। তাদের আগ্রাসনের প্রথম লক্ষ্যই ছিল তাওয়াং।

ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে তখন যুদ্ধের দামামা বাজছে। সাজ সাজ রব ভারতীয় সেনা মহলে। অত্যাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত চীনা সেনাদের মুহুর্মুহু আক্রমণে অনেক জায়গাতেই ভারতীয় সেনাবাহিনী পিছু হটতে বাধ্য হচ্ছে। এই সময় লেফটেন্যান্ট কর্নেল বি.এম. ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে এসে পৌঁছোলো 'গাড়োয়াল রেজিমেন্ট' বাহিনী। শুরু হলো তুমুল যুদ্ধ। অক্টোবরের শেষ তখন। তাওয়াং মঠে সেই সময় আমি ছাড়া আরো কয়েকজন বিশিষ্ট লামা, চীনা আক্রমণের বাস্তব তথ্যের সঙ্গে ভালোভাবেই পরিচিত ছিলেন। কিন্তু আমার কথা যেমন এখনও কেউ সহজে বিশ্বাস করতে চাইবে না, তেমনিই তখন সেই লামাদের কথাও কেউ বিশ্বাস করত না। পুরোটা শুনলেই তোমরা বুঝতে পারবে।

জেমস হিলটনের নাম তোমরা শুনে থাকবে। তাঁর লেখা একটি বিখ্যাত বই আছে। বইটির নাম 'লস্ট হরাইজন'। নিজের এই বইয়ে তিনি তিব্বত ও ভারতের এমন কিছু রহস্যময় ঘাঁটির কথা উল্লেখ করেছেন, যেখানে মানুষ শত শত বছর জীবিত থাকে কিন্তু কেউ বৃদ্ধ হয় না। পাঁচশো, ছশো বছর বেঁচে থাকা সেখানে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, তাও সবল ও সুস্থভাবে। এই প্রসঙ্গেই তিনি সাংগ্রীলা ঘাঁটির বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর লেখায় তিনি বিশেষ কোনো স্থান নির্দিষ্ট করে দেখাননি একথা ঠিক, কিন্তু যে ইঙ্গিত তিনি দিয়েছেন, তাতে স্থানটি ভারত-তিব্বত-ভুটান সীমান্তের কাছাকাছি হওয়া সম্ভব। এই বই প্রকাশিত হবার পর দেশ-বিদেশের অনেক অনুসন্ধানকারী দল এই সাংগ্রীলা ঘাটির খোঁজে এসেছে। কিন্তু কোনো দলই সফল হয়নি। অনেকেই অনুসন্ধানের সময় অদৃশ্য হয়ে গেছেন, যাঁদের কোনো খোঁজখবরই আর পাওয়া যায়নি।

সে যাই হোক, সাংগ্রীলা ঘাঁটির বিষয়ে, চীন কিভাবে আর কোন সময় এইসব তথ্য জানতে পেরেছিল, সে বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যাবে না। কিন্তু এটা আমি নিশ্চিন্তভাবেই জানি, সাংগ্রীলা ঘাঁটির প্রতি প্রবল অনুসন্ধিৎসার বশীভূত হয়েই চীন ১৯৫০ সালে, মরিয়া হয়ে তিব্বত অধিকার করেছিল। তিব্বত অধিকারের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল সাংগ্রীলা ঘাঁটির খোঁজ পাওয়া। কিন্তু সেই প্রয়াস বা সেই উদ্দেশ্য চীনের সফল হয়নি।

আজও চীনের 'টৌহি' বিমান নিয়মিতভাবে সাংগ্রীলা ঘাঁটির খোঁজে তিব্বতের আকাশে টহলদারি করছে। যদিও সফলতা আজও আসেনি।

শঙ্কর মহারাজ বললেন, চীন যে এখনো সাংগ্রীলা ঘাঁটির খোঁজ পায়নি, এটা আপনি সঠিক কি করে জানলেন? তাছাড়া চীনের মূল উদ্দেশ্যটা কী? সাংগ্রীলা ঘাঁটির দখল নিতে পারলে তারা কি করবে?

লামাজি হেসে বললেন, চীন যেদিন সাংগ্রীলা ঘাঁটির খোঁজ পেয়ে যাবে, সেদিনই চীনের তাবড় তাবড় নেতারা সেখানে চলে যাবে। রাজধানী বেজিং-এ আর কাউকেই দেখা যাবে না। তবে হ্যাঁ, ১৯৬০ সালেই সাংগ্রীলা ঘাঁটির অস্তিত্ব সম্পর্কে চীন নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলো। ঐ অদৃশ্য ঘাটির সন্ধান তারা প্রায় পেয়েই গিয়েছিলো। কিন্তু অল্পের জন্য এই সুযোগ তাদের হাতছাড়া হয়ে যায়। তা না হলে চীন এতদিনে অবশ্যই নিজেকে পৃথিবীর এক নম্বর শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারতো।'

সাংগ্রীলা ঘাঁটি, জ্ঞানগঞ্জ সম্পর্কে আমাদের অনেককিছু জানিয়েছেন যোগী দেবদীপ। আমাদের মতো সাধারণ মানুষের কাছে তিব্বত শুধুমাত্র একটি রহস্যময় দেশ। কৈলাস ও মানস সরোবর ছাড়া এই দেশটি সম্পর্কে তেমন কিছুই জানি না। অথচ এই তিব্বতের প্রতিটি ইঙ্গিতে লুকিয়ে আছে অসীম অপার রহস্য। আর এই রহস্যজাল একমাত্র প্রকৃত সাধকরাই ছিন্ন করতে পারেন। যেমন করেছিলেন স্বামী ত্রৈলঙ্গজি। দীর্ঘ উনিশ বছর তিনি কাটিয়েছেন এই তীর্থভূমিতে। বস্ত্রহীন এক সাধকের কাছে নতি স্বীকার করেছেন প্রকৃতি। শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা তাঁকে কাবু করতে পারেনি। তিব্বতের রহস্য জ্ঞানগঞ্জে তিনি অবশ্যই গিয়েছিলেন। শিব-দুর্গার আবাসস্থল কৈলাসে গিয়ে কী করেছিলেন? দর্শন করেছিলেন মানস সরোবর!

স্বয়ং ব্রহ্মা এই হ্রদকে সৃষ্টি করেছিলেন। ব্রহ্মার মানস-সৃষ্ট এই হ্রদ। সে কারণেই নাম মানস সরোবর। এই হ্রদে ব্রহ্মা রাজহংসের রূপ ধরে জলকেলি করতেন। এখানে শিব, পার্বতী সহ অন্যান্য দেব-দেবী এখনো অবগাহন করেন।

সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এই হ্রদের উচ্চতা ৪৬২০ মিটার। স্বচ্ছ নীল জলরাশি। এই সরোবরের আকৃতি অনেকটা ডিম্বাকার। তিব্বতি ভাষায় এর নাম 'MAPAM YUM TSO'। মানস সরোবরকে একবার পরিক্রমা করতে পার হতে হয় ১০৪ কিলোমিটার পথ। কারণ এর পরিধি ৮৮ কিলোমিটার। গভীরতা ৮১.৯ মিটার।

আদি কবি বাল্মীকি 'রামায়ণ'-এ 'মানসসরোবর'-এর উৎপত্তি ও নামকরণ সম্পর্কে লিখেছেন—

'কৈলাস পর্বতে রামমনসা নির্মিতং পরম।।
ব্রহ্মণা নরশার্দূল তেনেদং মানসং সরঃ।
তস্মাৎ সুস্রাব সরসঃ সাযোধ্যামূপগূহতে।।
সরপ্রকৃত্তা সরযূ পুণ্যা ব্রহ্মসরশ্চ্যুতা।
তস্যায়মতুলঃ শব্দো জাহ্নবীমভিবর্ততে।।
বারিসংক্ষোভজো রাম প্রণামং নিয়তঃ কুরু।'

গঙ্গাবক্ষে যাওয়ার সময় মা গঙ্গার তুমুল আওয়াজ শুনে রামচন্দ্র শব্দের কারণ জানতে চান। উত্তরে বিশ্বামিত্র বলেন, হে নরোত্তম রাম! শোনো, পুরাকালে ব্রহ্মা কৈলাস পর্বতে মনের সাহায্যে একটি সরোবর নির্মাণ করেন। সে জন্য ওই সরোবরের নাম মানস সরোবর। সেই সরোবর থেকে উৎপন্ন হয়ে এক নদী এসে অযোধ্যা নগরকে ঘিরে রেখেছে। ব্রহ্মার সৃষ্ট সরোবর থেকে প্রবাহিত হওয়ায় ওই নদী অতিপবিত্র। সরোবর থেকে উৎপন্ন হওয়ায় তার নাম সরযূ। সেই নদী এখানে গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। সরযূর জলরাশি গঙ্গায় পড়ার কারণেই এই অদ্ভুত শব্দ। রাম! তুমি দুই নদীকে প্রণাম করো।

ত্রৈলঙ্গস্বামী ১১১৪ সনে তিব্বতে প্রবেশ করেছিলেন। তবে তিনি কোন পথে তিব্বতে যান সে সম্পর্কে কেউ-ই তেমনভাবে আলোকপাত করেননি। সে যাই হোক, তিনি তিন বছর তিব্বতের নানা স্থানে ঘুরে

১১১৭ সনে চলে এলেন মানস সরোবরে। এই তীর্থে স্বামীজির কৃপায় সাত বছরের এক বালক পুনরায় প্রাণ ফিরে পায়। শঙ্করী মাতাজির মুখ থেকে সেই অলৌকিক ঘটনার কথা শোনা যাক—বিধবা মায়ের একমাত্র সন্তান, সর্প দংশনের তার মৃত্যু হয়েছে। দেহ সৎকারের জন্য সবাই তাকে নিয়ে শ্মশানের দিকে রওনা হলেন। সেখানে পৌঁছে সৎকারের প্রস্তুতি শুরু হল। কিন্তু মায়ের কাছ থেকে কিছুতেই মৃত পুত্রকে আলাদা করা যাচ্ছে না। মায়ের বিলাপ, বুক ফাটা আর্তনাদে স্বয়ং ঈশ্বরের প্রাণও গলে গেল। হঠাৎ সেখানে কোথা থেকে আবির্ভূত হলেন স্বয়ং ত্রৈলঙ্গস্বামী। তাঁকে দেখে সদ্য সন্তানহারা মায়ের মনে হয়েছিল স্বয়ং মহেশ্বর বোধহয় সেখানে উপস্থিত হয়েছেন। তিনি স্বামীজির পদতলে পড়ে নীরবে অশ্রু বিসর্জন করতে লাগলেন। দয়াময় স্বামীজি বালককে স্পর্শ করে তার শরীরে সস্নেহে হাত বোলাতে লাগলেন। ঘটে গেল অলৌকিক ঘটনা। মৃত শিশুটির শরীরে ফিরে এল জীবনের লক্ষণ। ছেলেটি কিছুক্ষণের মধ্যে উঠে বসল। বিস্মিত, হতবাক মা মৃত পুত্রকে বসে থাকতে দেখে চমকে উঠেছিলেন। তিনি ছেলেকে নিজের কোলে টেনে নিয়ে আদর করতে শুরু করলেন। তারপর যখন মুখ তুললেন তখন স্বামীজি আর সেখানে নেই। তিনি অদৃশ্য। এরপর আর তাঁকে মানসতীর্থে কেউ দেখতে পাননি।

অপরাধ নেবেন না! এই 'সর্প দংশন' প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন বড়ই মনকে পীড়া দিচ্ছে। মনে হয় এক্ষেত্রে শোনার বা বোঝার কোনও ভুল হয়েছিল। মানস সরোবরে সাপ থাকাটা একটু অসম্ভব বলেই মনে হয়। তিব্বত চিরতুষারের দেশ। সেখানে সাপ থাকবে কী করে! শীত ঘুমেই তো তার জীবন কেটে যাবে। খুব সম্ভবত সর্প দংশন নয়, অন্য কোনও গুরুতর পীড়া বা অপুষ্টিজনিত কারণেই শিশুটি মারা গিয়েছিল। এরপর স্বামীজির কৃপায় সে পুনরায় জীবিত হয়ে ওঠে। এই ঘটনাটি ঘটার পরই স্বামীজি মানস সরোবর থেকে একদম অদৃশ্য হয়ে গেলেন। এরপর তাঁকে আবার আমরা দর্শনের সুযোগ পেলাম ১১৩৩ সনে। এই মাঝের ষোলোটি বছর তিনি কোথায় ছিলেন, কী করছিলেন সে সম্পর্কে তাঁর শিষ্য-শিষ্যা বা ভক্তরা কোনও আলোকপাত করতে পারেননি। তাহলে কি তিনি মানস সরোবর ছেড়ে আবার জ্ঞানগঞ্জে ফিরে গিয়েছিলেন। জ্ঞানগঞ্জের পরমগুরু মহাযোগী মহাতপা আবার কি তাঁকে জ্ঞানগঞ্জে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। আমাদের মন্দ ভাগ্য, স্বামী ত্রৈলঙ্গজি সেই চিরবসন্ত, চিররহস্যময় জ্ঞানগঞ্জ নিয়ে একটি বাক্যও কোনওদিন খরচ করেননি।

বন্ধুবর ডাঃ রথীন চক্রবর্তী। ঈশ্বর বিশ্বাসী, ধর্মপ্রাণ এক উদার চিকিৎসক। হোমিওচিকিৎসা অন্তপ্রাণ। যোগ্য পিতা প্রয়াত ডাঃ ভোলানাথ চক্রবর্তীর যোগ্য সন্তান। এক রবিবার দুপুরে রথীনের সঙ্গে নানা বিষয় নিয়ে কথা হচ্ছিল। হঠাৎই উঠেছিল জ্ঞানগঞ্জের প্রসঙ্গ। রথীন এক 'বাবা'-র কথা শোনালেন। তাঁদেরই জীবনে ঘটে যাওয়া দুটি অলৌকিক ঘটনার কথা তিনি বললেন, 'হাওড়ার নবীন সেনাপতি লেনে সচ্চিদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি। সেই বাড়িতে মাঝে মাঝেই বহিরাবাবা নামে এক সাধু আসতেন। তাঁকে দেখে কখনোই সাধু বলে মনে হত না। খাটো ধুতি, একটা হাফ পাঞ্জাবি পরতেন আর লোটা কম্বল নিয়ে সারা ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়াতেন।

সচ্চিদানন্দ বাবুর বাড়িতে একদিন বাবা এসেছেন। আমার বাবা সবাইকে নিয়ে তাঁকে দর্শন করতে গেলেন। একটি প্রশস্ত ঘরে বাবাকে ঘিরে সবাই বসেছিলেন। আমরাও গিয়ে সেখানে বসে পড়লাম। বহিরাবাবা নানা বিষয় নিয়ে কথা বলছিলেন। হঠাৎই তিনি কথা থামিয়ে চুপ করে গেলেন। তিনি থেমে যাওয়া মাত্রই অদ্ভুত একটা কাণ্ড ঘটল। এক এক করে সবাই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। একসময় আমি, দিদি ও মা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম। কিন্তু বাবা যেই উঠতে গেছেন বহিরাবাবা ইশারায় তাঁকে কাছে আসতে বললেন। বাবা সামনে যাওয়া মাত্রই বহিরাবাবা বললেন, 'আমি চাইছিলাম বলেই সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আমার কিছু কথা তোমাকে বলার আছে। তোমার স্ত্রীর শরীর কয়েকদিনের মধ্যে খুব খারাপ হবে। মাকে তোমরা ধরে রাখতে পারবে না। বাবা একটু অবাক হয়েই জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কী ধরনের সমস্যা হবে বাবা, এর কি কোনও প্রতিকার নেই। উত্তরে বহিরাবাবা বলেন, হার্ট অ্যাটাক হবে। তুমি একটু

বসো। দেখি কোনও কিছু করা যায় কিনা! জ্ঞানগঞ্জের বিষয়ে তুমি কিছু জানো। আমি একটু মা চণ্ডীর ধ্যান করি। মা যদি কৃপা করেন তাহলে জ্ঞানগঞ্জ থেকে অবশ্যই এখানে প্রসাদ আসবে। সেই প্রসাদ যদি আসে তাহলে তোমার স্ত্রী ভালো হয়ে যাবে। বাবা ধ্যানে বসলেন। প্রথমবার ব্যর্থ, দ্বিতীয়বার ব্যর্থ। তৃতীয়বারের ধ্যান শেষ হওয়া মাত্র শূন্য থেকে একটি ছোট টুকরি বাবার পাশে এসে কে যেন নামিয়ে দিয়ে গেলেন। হিমালয়ের কোনও গাছের ছাল দিয়ে টুকরিটি বানানো। তাতে ছিল ক্ষীর জাতীয় প্রসাদ ও লাড্ডু। বহিরাবাবা ওই টুকরিটি বাবার হাতে দিয়ে বললেন, এই প্রসাদ তোমার স্ত্রীকে খাওয়াবে, এবং তোমরাও খাবে। আর কোনও ভয় নেই। বাবা আমাদের সবাইকে নিয়ে বাড়ি ফিরে এলেন।

এটি ১৯৭৪-৭৫ সালের ঘটনা। বহিরাবাবার কাছ থেকে ফিরে আসার দিন কয়েক বাদে, একদিন রাত্রে মায়ের ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক হল। সেইসময় হার্ট অ্যাটাকের চিকিৎসা এত উন্নত হয়নি। বাবা ডাঃ সুখেন্দু বিশ্বাসকে খবর দিলেন। তিনি তড়িঘড়ি চলেও এলেন। মায়ের ইসিজি করা হল। ডাঃ বিশ্বাস বাবাকে বললেন, ভোলাদা, বউদির অবস্থা মোটেই ভালো নয়। ম্যাসিভ অ্যাটাক হয়েছে। বাবা সব শুনে বললেন, ঠিক আছে, রুগি একদম নড়াচড়া করবে না। এখানেই থাকবে। আর আমি হোমিওপ্যাথি ওষুধ দিচ্ছি। এইভাবেই চিকিৎসা চলল। মাও ধীরে ধীরে সুস্থ হচ্ছিলেন। এরমধ্যে ডাঃ বিশ্বাস এসে মায়ের আবার ইসিজি করলেন। সেই রিপোর্টটা হাতে নিয়ে তিনি প্রায় লাফিয়ে উঠেছিলেন। তিনি বাবাকে বলেছিলেন, ভোলাদা, আশ্চর্য কাণ্ড ঘটেছে। এই রিপোর্টে হার্ট অ্যাটাকের কোনও চিহ্ন পর্যন্ত নেই। সব মুছে গেছে।

বহিরাবাবা খুব উচ্চস্তরের সাধক ছিলেন। সাধন চলাকালীন তাঁর গুরুদেব কুপিত হয়ে তাঁর কানে একটা চড় মেরেছিলেন। সেই থেকে তিনি একটা কানে কম শুনতেন। তখন থেকেই তাঁর নাম বহিরাবাবা। জ্ঞানগঞ্জে তিনি দীর্ঘদিন সাধনা করেছিলেন। সেসব কথা চট করে বলতে চাইতেন না। তবে আমার বাবাকে খুব ভালোবাসতেন। কখনও-সখনও বাবাকে দু-চারটে কথা বলতেন।

বহিরাবাবা তখন হাওড়ায় নয়, কলকাতায় এলে বালিগঞ্জ প্লেসে ফণীভূষণবাবুর বাড়িতে উঠতেন। একদিন চেম্বার শেষ করে বাবা আমাকে নিয়ে সেখানে গেলেন। বাবাকে দেখে আর এক বাবাও খুব খুশি। তিনি বাবাকে বললেন, ভোলা, কাল আমি তোমার বাড়িতে যাব। আমার বাবা বললেন, বাবা, তাহলে কাল কখন গাড়ি পাঠাব। উনি বললেন, গাড়ি! কেন! আমি পটর পটর করে তোমার ঘরে চলে যাব। বহিরাবাবার আশ্রম তৈরি ও দীক্ষা দানের ব্যাপারে বড়ই অনীহা ছিল। আর গাড়ি চড়তে চাইতেন না। তিনি বলতেন, তোমরা সব মায়ের থেকে এসেছ মায়ের জগতে চলে যাবে। যা দেখার মা দেখবেন। আমি কি পল্টন বানাব?

পরদিন চেম্বার তাড়াতাড়ি শেষ করে বাবা বাড়ি ফিরে এলেন। বহিরাবাবা আসবেন, আমরাও উদগ্রীব হয়ে রয়েছি। রাত এগারোটা, সাড়ে এগারোটা বেজে গেল, কিন্তু বাবা এলেন না। আমার বাবা বললেন, কাল গিয়ে আমি বাবাকে ধরব। জিজ্ঞাসা করব, আসব বলে কেন তুমি এলে না? সেদিন বাবার এক রুগি চন্দননগর থেকে মোতিচুর সন্দেশ নিয়ে এসেছিলেন। মা দোতলার মিটসেফে ওই প্যাকেটটা তুলে রেখে শুয়ে পড়লেন। আমরাও যে যার মতো শুয়ে পড়লাম।

পরদিন ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠেই মা খুব রাগারাগি করতে শুরু করলেন। কী ব্যাপার! মোতিচুরের প্যাকেট ভিতরে নয় মিটসেফের ওপর খোলা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। দেড়খানা মিষ্টি উধাও। মা সবাইকে একে একে জেরা করলেন। সেই তালিকায় অবশ্য আমার দাদু ছিলেন না। কারণ তিনি সন্ধ্যার পর আর জলস্পর্শ করতেন না। সূর্যোদয়ের পর পূজা সমাপ্ত করে তিনি যা খাওয়ার খেতেন। বাবার তখন সদ্য অল্প সুগার ধরা পড়েছে। মা বাবাকেই অপরাধী বলে ধরে নিয়ে খুব বকলেন। কিন্তু কেউই মোতিচুর লোপাটের দায়িত্ব নিজের কাঁধে রাখলেন না, সবাই কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলে দিলেন।

সেদিন রাতে চেম্বার শেষ করে বাবা আবার বালিগঞ্জ প্লেসের বাড়িতে গেলেন। বহিরাবাবা তখন একাই বসে ছিলেন। বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, কাল আপনি গেলেন না কেন? বহিরাবাবা বললেন, আমি তো গিয়েছিলাম। তোমাদের কুকুর আমাকে দেখে খুব চিৎকার করল। আমার সঙ্গে আমার মাঈও গিয়েছিলেন।

ওপরের ঘরে তোমার বাবা বসে বসে জপ করছিলেন। মা আগে ওই ঘরে ঢুকলেন। আমিও গেলাম। তার পাশের ঘরে তোমার মেয়ে ঘুমোচ্ছিল। তোমাদের দোতলার মধ্যিখানের ঘরে তুমি, তোমার স্ত্রী শুয়েছিলে। তোমার ছেলে বিছানায় বসেছিল। ওর মা ওকে নিয়ে একবার বাথরুম করিয়ে নিয়ে এল। তারপর তোমরা আবার শুয়ে পড়লে। তোমাদের উলটো দিকের ঘরে তোমার ভাই শুয়েছিল। সব দেখে বাইরে বেরিয়ে এসে মিটসেফ খুলে মিষ্টির প্যাকেটটা বের করলাম। খুব ভালো মিষ্টি। আমার চণ্ডীমাঈকে দিলাম। তিনি খেয়ে আমাকে দিলেন। বাকিটা বাক্সে রেখে দিলাম। ওটা তো এখন মায়ের প্রসাদ। সবাইকে ওই প্রসাদ দিও।

বহিরাবাবার কথা শুনে বাবা স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। ওই মানুষটি কখনও আমাদের বাড়িতে আসেননি। কিন্তু সেদিন, সেই রাতে বাবার কাছে আমাদের বাড়ির যে বর্ণনা তিনি দিয়েছিলেন তা কোনও বড় সাধক ছাড়া দেওয়া সম্ভব নয়। সত্যিই বহিরাবাবা খুব উচ্চকোটির সাধক ছিলেন।'

ত্রৈলঙ্গ স্বামীজিও কি ষোলোটা বছর জ্ঞানগঞ্জে থেকেই সাধন ভজন করেছিলেন। তিনি যদি তখন লৌকিক জগতে থাকতেন তাহলে তাঁর দিব্যচ্ছটা কিছুতেই লুকিয়ে রাখা যেত না। বাবার অমোঘ আকর্ষণে মানুষ দলে দলে ছুটে যেতেন তাঁর কাছে। লুটিয়ে পড়তেন তাঁর চরণে।

১১৩৩ সাল, বোধহয় দেবী নর্মদার আহ্বানেই ত্রৈলঙ্গ স্বামীজি স্বেচ্ছা নির্বাসন থেকে জনসমক্ষে বেরিয়ে এলেন। তিনি এতদিন কোথায় ছিলেন, কী করছিলেন—সেকথা জিজ্ঞাসা করার সাহস কারও বোধহয় হয়নি। ফলে ওই ষোলোটা বছর কালের গহ্বরে চিরতরে চাপা পড়ে রইল। জানা গেল না সেই অমূল্য, অপূর্ব দিনগুলির কথা। স্বামীজি নর্মদা নদীর তীরে মার্কণ্ডেয় ঋষির আশ্রমে এসে উঠলেন।

সাধু মাত্রেই নর্মদার মাহাত্ম্যের কথা জানেন। একবার ফিরে যাই সেই সুদূর অতীতে—মহাভারতের যুগে। দ্যুতক্রীড়ায় মামা শকুনির কাছে সর্বস্ব হারিয়ে যুধিষ্ঠির তখন পথের ভিখিরি। মারাত্মক কষ্টের মধ্যে দিন কাটছে তাঁদের। তখন পুরোহিত ধৌম্যমুনি তাঁদের তীর্থে তীর্থে ঘোরার পরামর্শ দিয়ে বললেন, এর ফলে তোমাদের মনের কষ্ট দূর হবে, মানুষের প্রতি তোমাদের মনে যে অবিশ্বাসের বীজ রোপিত হয়েছে তাও মুছে যাবে। যাবতীয় সংকট তোমাদের কেটে যাবে। ধৌম্যমুনি যখন যুধিষ্ঠিরকে এইসব পরামর্শ দিচ্ছেন সেইসময় হঠাৎই সেখানে উপস্থিত হলেন পুলস্ত্যমুনি। তিনি জ্যেষ্ঠ পাণ্ডবকে বললেন, যুধিষ্ঠির, তুমি অন্যান্য তীর্থে অবশ্যই যাবে। তবে ত্রিলোক প্রসিদ্ধ নর্মদাকে দর্শন না করে কখনওই ফিরবে না। নর্মদা দর্শন তোমাদের জন্য আবশ্যক।

এরপর মহামুনি মার্কণ্ডেয় যুধিষ্ঠিরের কাছে নর্মদার আসল স্বরূপ উদঘাটন করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন,

'ইয়ং মাহেশ্বরী গঙ্গা মহেশ্বর তনুদভবা।
প্রোক্তা দক্ষিণ গঙ্গেতি ভারতস্য যুধিষ্ঠির।।
জ্বাহ্নবী বৈষ্ণবী গঙ্গা ব্রাহ্মীগঙ্গা সরস্বতী।
ইয়ং মাহেশ্বরী গঙ্গা রেবা নাস্ত্যত্র সংশয়।।'

স্বামী সহদেবানন্দ তাঁর 'অমৃতের সন্ধানে নর্মদায়' এই শ্লোকের খুব সুন্দর বঙ্গানুবাদ করেছেন। তিনি লিখছেন, 'মহেশ্বরের দিব্যশরীর হতে উৎপন্ন হওয়ার জন্য হে যুধিষ্ঠির! নর্মদাকে 'মাহেশ্বরী-গঙ্গা' বলা হয়। মধ্যপ্রদেশের যে অংশ দিয়ে এখন নর্মদাকে প্রবাহিত হতে দেখা যাচ্ছে, ইন্দ্রপ্রস্থ হতে তা দক্ষিণ দিকে অবস্থিত বলে মহামুনি মার্কণ্ডেয় 'দক্ষিণগঙ্গা' বলে নর্মদাকে অভিহিত করেছেন। বিষ্ণুর চরণ হতে উদ্ভূতা বলে ভাগীরথী গঙ্গার নাম বৈষ্ণবীগঙ্গা, ব্রহ্মার পত্নীর নামানুসারে সরস্বতী নদীর নাম ব্রাহ্মীগঙ্গা, আর মহেশ্বরের তেজোময় তনু হতে নর্মদার উৎপত্তি বলে নর্মদাকে নিঃসন্দেহে মাহেশ্বরীগঙ্গা বা শঙ্করীগঙ্গা বলা হয়।

মহাত্মা ও ঋষিগণ নর্মদার গুণগান করতে গিয়ে বলেছেন—

'ত্রিভি সারস্বতং পুণ্যং সপ্তাহেন তু যামুনম।
সদ্যঃ পুনাতি গাঙ্গেয়ং দর্শনাদেব নর্মদা।।'

সরস্বতীর জলে তিনদিন, যমুনার জলে এক সপ্তাহ ধরে স্নান এবং গঙ্গাজলে সদ্য স্নান করা মাত্রই মানুষ পবিত্র হয়, কিন্তু নর্মদার জল কেবল দর্শনমাত্রেই মানুষ পাপ থেকে মুক্ত হন।

তাঁরা বলেছেন—

'গঙ্গা কনখলে পুণ্যা কুরুক্ষেত্রে সরস্বতী।
গ্রামে বা যদি বরেণ্য পুণ্যা সর্বত্র নর্মদা।।'

গঙ্গা নদীর পুণ্যমহিমা হরিদ্বারের কনখলে বেশি। কারণ সেখানে বসেই দক্ষ প্রজাপতি তপস্যা করেছিলেন, 'পবিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম'—ভগবানের এই উদ্দেশ্যে আবির্ভাবের সিদ্ধপীঠ সরস্বতী নদীতট কুরুক্ষেত্র। সেইজন্য কুরুক্ষেত্রেই সরস্বতী নদীর মহিমা সবচেয়ে বেশি। কিন্তু নর্মদা সর্বত্রই সমানভাবে পতিতোদ্ধারিণী।

নর্মদা গঙ্গার থেকেও প্রাচীন। অর্থাৎ পৃথিবীতে তাঁর আগমন ঘটেছে মা গঙ্গার বহু পূর্বে। প্রমাণ কী? ভগীরথের প্রপিতামহ কপিল মুনি নর্মদা নদীর তীরে বসে তপস্যা করেছেন। ফলে গঙ্গা নর্মদার থেকে বয়েসে নবীন। স্বামী সহদেবানন্দ নর্মদার নামের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন—

'সমুদ্রাঃ সরিতঃ সর্বাঃ কল্পে কল্পে ক্ষয়ংগতাঃ।
সপ্ত কল্প ক্ষয়ে ক্ষীণে ন মৃতা তেন নর্মদা।।'

প্রলয়কালে পৃথিবীর সমস্ত নদী এবং সমুদ্র মহাসমুদ্রে লয় হয়ে যায়, তাদের স্ব স্ব সত্তার বিলুপ্তি ঘটে। কিন্তু সপ্তকল্পান্তজীবী মহামুনি মার্কণ্ডেয় দেখছেন, সাত সাতটি কল্পান্তের মহাপ্রলয়েও নর্মদার সত্তার বিলুপ্তি ঘটেনি। সমস্ত কল্পেই তিনি স্বমহিমায় বিরাজিতা। 'ন মৃতা তেন নর্মদা'—কোনো অবস্থায় তিনি ক্ষীণ হন না, তাঁর মৃত্যু ঘটে না, তাই তাঁর নাম নর্মদা।

'নর্মদা হলেন জীবন্তশংকর ভাষ্য, নর্মদাক্ষেত্র প্রত্যক্ষ শিবতীর্থ। কাশীতে মৃত্যু হলে মুক্তি হয়, গঙ্গাতীরে মৃত্যু হলে জীবের উর্ধ্বগতি হয়, কিন্তু তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করতে হলে—জীবমুক্তির আনন্দ আস্বাদন করতে হলে তাঁকে যেতে হবে নর্মদায়। তাই শাস্ত্রে বলা হয়েছে—''নর্মদায়াং তপঃ কুর্যাৎ মরণং জাহ্নবীতটে।'''

এই নর্মদা তীরে কত সাধক তপস্যা করে সিদ্ধিলাভ করেছেন। এখানে দীর্ঘ চল্লিশ বছর তপস্যা করেছিলেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের গুরু তোতাপুরীজি। এই স্থানেই আচার্য শঙ্করাচার্যের গুরু গোবিন্দপাদজি বহু বছর নির্বিকল্প অবস্থায় সাধনা করেছিলেন। শঙ্করাচার্যও তাঁর সাধনক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন নর্মদাতীরের ওঁকারেশ্বরকে।

সে এক ছোট্ট বালকের কথা। তখন তার বয়স আট। ওই বয়সেই তাঁর মনে জেগে উঠল ঈশ্বর লাভের চিন্তা। যেমন ভাবনা তেমন কাজ। পরম প্রেমের সন্ধানে তিনি বেরিয়ে পড়লেন পথে। মায়ের স্নেহ, ভালোবাসা সব তুচ্ছ হয়ে গেল এক ভয়ঙ্কর টানে।

বিখ্যাত এক গবেষণামূলক গ্রন্থ 'কা তব কান্তা'। সাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের লেখা গবেষণামূলক এক অসাধারণ জীবনীগ্রন্থ। ভক্ত ও ভগবানের অদ্ভুত এক বন্ধুত্বের কাহিনি। শঙ্করাচার্যের জীবন অবলম্বনে লেখা সেই 'কা তব কান্তা'-র সাহায্য না নিলে চলবে না। সঞ্জীববাবুর সেই অমূল্য লেখনী থেকে তুলে নিলাম কিছু

অংশ। প্রকাশক মহাশয় অবশ্য জানিয়ে রেখেছেন—প্রকাশক ও সত্বাধিকারীর অনুমতি ব্যতীত এই পুস্তকের কোনও অংশ ব্যবহার করা যাবে না। কিন্তু লোভ বিষম দায়। তাকে দমন করব কীভাবে! বুকে বল এনে চৌর্যবৃত্তির কাজে নেমেই পড়লাম। শ্রীচট্টোপাধ্যায় লিখছেন, ''মাতা বিশিষ্টা পরিস্থিতিতে পড়ে সন্ন্যাসী হও বলেছিলেন কিন্তু ভাবতে পারেননি সংসারী শঙ্কর পরিব্রাজক সাধক হয়ে গৃহসীমার বাইরে চলে যাবে। তিনি বললেন, 'ছিঃ বৎস, ও কি কথা তোমার! তুমি দুধের ছেলে সন্ন্যাস কি তোমার সাজে? অযত্নে প্রাণ হারাবে! এই তো দেখলে এত সাবধানতা এত চেষ্টাতেও প্রাণ যেতে বসেছিল। তোমার জীবনের আশা নেই ভেবেই অনুমতি দিয়েছিলুম। সংসারধর্মকর্ম, বৃদ্ধ হও, আমি মরে যাই, তারপর সন্ন্যাস নিও।...শঙ্করের আজ কঠিন পরীক্ষা। অনেকক্ষণ ভাবলেন তারপর বললেন, মা! আমি বিষয়সম্পত্তির ব্যবস্থা যথাযথ করে দিচ্ছি। জ্ঞাতিদের এই মুহূর্তে সমস্ত সম্পত্তি দান করে দিচ্ছি এই শর্তে যে, আপনি যতদিন জীবিত থাকবেন ততদিন তাঁরা আপনার ভরণপোষণের ব্যবস্থা করবেন। আর আমি কথা দিচ্ছি আমি যেখানেই থাকি যথাসময়ে এসে আমি আপনার সৎকার করব। সন্ন্যাসীর এটা নিষিদ্ধ। তবু আপনার জন্য আমি তাও করব। না হয় একটু নিয়ম ভঙ্গ হবে।...।'

'গিরিশচন্দ্র শঙ্করাচার্য নাটক লিখেছিলেন। কলকাতার রঙ্গমঞ্চে রাতের পর রাত অভিনীত হয়েছিল। গিরিশচন্দ্র সেখানে গৈরিশ ছন্দে শঙ্করের সন্ন্যাসগ্রহণের দৃশ্যটি মঞ্চে এইভাবে উপস্থিত করলেন,

'অতি বাঞ্ছনীয় কার্য্যে রবে পুত্র তব।
ক্ষণিক বিচ্ছেদ হেতু চিন্তা নহে শ্রেয়,—
মাত্র মাতা দৈহিক বিচ্ছেদ,
বিচ্ছেদ আশঙ্কা কেন স্বপ্নের মিলনে।
যেই কালে করিলে প্রসব,
হের সে আকার নাহি আর মম—
কালে অন্য ব্যতিক্রম ঘটিবে এ ক্ষণস্থায়ীকায়।
তবে কোন দেহ পুত্রের তোমার,
বিচ্ছেদ আশঙ্কা যার করে সন্তাপিত?
কৌমার, যৌবন—শরীরের করিছে কর্ত্তন
মৃত্যুকালে জীর্ণবাস প্রায়
পড়ে রবে শরীর ধরায়।
শারীরিক বিচ্ছেদ আশঙ্কা করো দূর।
জ্ঞানচক্ষে নেহারি জননি,
তুমি আমি বিশ্ব অবিচ্ছেদ,
দেখ, তুমি আমি—নাহি ভেদাভেদ,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপি আছে এক হয়ে।
অলক্ষিতে কালস্রোতে ধায়,
আর মা রহিতে নারি গৃহে—
বিদরে তনয়ে, পদে প্রণাম জননি।
বিশিষ্টা।। চল চল—আমারই বা কিসের
গৃহ, আমি তোমার সঙ্গে যাই।'

'সকাল হল। এ এক অদ্ভুত সন্ন্যাস। শঙ্কর নিজেকেই নিজে সন্ন্যাস করবেন।...সকলের সামনে অষ্টমবর্ষীয় বালক শঙ্কর সন্ন্যাসী হলেন। তিনি উত্তরমুখে চলতে লাগলেন। এখন তো গুরু চাই। শাস্ত্র বলেছেন—গুরু বিনা গতি নাই।...শঙ্কর চললেন গুরুর সন্ধানে। সেই গুরু আর কেউ নয় স্বয়ং পতঞ্জলিদেব।

কালাডি থেকে নর্মদা তো সামান্য পথ নয়। পদব্রজে সেখানে যেতে এক মাসের বেশি সময় লাগে। শুরু হল নর্মদা যাত্রা।...এইভাবে প্রায় দু-মাস অবিশ্রান্ত চলার পর শঙ্করাচার্য নর্মদার দর্শন পেলেন। তাঁর উদ্বেগ কিছুটা কমল। এখন প্রশ্ন—কোন দিকে যাবেন! কোথায় গেলে গোবিন্দ যোগীর দেখা পাবেন। যিনি পতঞ্জলিদেব। যাঁর সঙ্গে দেখা হয় তাঁকেই জিগ্যেস করেন—আপনি কি জানেন সেই জায়গা যেখানে হাজার হাজার বছর ধরে সমাধিস্থ হয়ে আছেন পতঞ্জলিদেব। গোবিন্দ যোগী নামেই যিনি পরিচিত। প্রশ্ন শুনে সকলেই অবাক হন আর বলেন,—সে ঠিকানা আমাদের জানা নেই। এমন সময় এক বৃদ্ধ তাঁকে বললেন, পূর্বদিকে একটি জায়গা আছে যার নাম ওঙ্কারনাথ। সেখানে একজন বড় যোগী আছেন বলে শুনেছি। তবে তিনি সেই গোবিন্দ যোগী কিনা বলতে পারব না। কিছুটা আশ্বস্ত হয়ে শঙ্কর চললেন ওঙ্কারনাথের দিকে। কয়েকদিন হাঁটার পর একটি পাহাড়ের সামনে এসে দাঁড়ালেন। অভ্রভেদী বিশাল এক শৈলশৃঙ্গ। নর্মদা সেই পর্বতটিকে বেষ্টন করে বয়ে চলেছেন। অপূর্ব সেই শোভা। বিস্ময়ে স্তব্ধ। এ কী দৃশ্য তিনি দেখছেন! পুরাণকাহিনি শুনলেন। সেই সুদূর অতীতে এক রাজা এখানে রাজত্ব করতেন। তাঁর নাম মান্ধাতা। আর সামনে যে পাহাড়টি দেখছেন সেটির নাম বৈদূর্যমণি। ওই পাহাড়েই আছেন ওঙ্কারনাথ, মহাকাল প্রভৃতি জাগ্রত শিব। দূর দূর থেকে মানুষ আসেন শিবদর্শনে। পাহাড়টি যেন নর্মদা পরিবেষ্টিত একটি দ্বীপ। নর্মদা পেরিয়ে শঙ্কর সেই পর্বতস্থলীতে এলেন। দেবদর্শন করে বড়ই আনন্দ পেলেন। এইবার শুরু হল তাঁর জিগ্যেস করা। যাকেই দেখেন তাকেই প্রশ্ন করেন—'আপনি কি গোবিন্দ যোগীর কথা জানেন?' কেউই জানে না! তবু শঙ্কর আশা ছাড়েন না। প্রশ্ন চলতেই লাগল। শেষে একজন বললেন, যাকে তাকে জিগ্যেস করে লাভ কী! ওঙ্কারনাথের তলায় একটা বাড়ি আছে। সেখানে একদল সন্ন্যাসী বাস করেন। তাঁদের কাছে জিগ্যেস করলে হয়তো খোঁজ পেতে পারেন। শঙ্কর সেখানে গেলেন। পাথরের তৈরি বেশ বড় একটি গৃহ। বাস করেন কয়েকজন সন্ন্যাসী। সকলেই নিজের ভাবে বিভোর। কেউ অন্য কোনওরকম কাজ করেন না! শুধু ধ্যান-জপ। সকলেই মনে হয় মৌনী। শঙ্কর সাহস করে সেই আশ্রমে ঢুকে সন্ন্যাসীদের অভিবাদন করে বললেন, মহাত্মগণ! হাজার বছর ধরে সমাধিস্থ মহাযোগী গোবিন্দপাদ, আসলে যিনি পতঞ্জলিদেব, তিনি এখানে কোথায় থাকেন, আপনারা কি বলতে পারেন?

শঙ্করের প্রশ্ন শুনে এক বৃদ্ধ সন্ন্যাসী বিস্মিতভাবে শঙ্করের দিকে তাকিয়ে বেশ কিছুক্ষণ তাঁকে দেখে প্রশ্ন করলেন, 'আপনি কোথা থেকে আসছেন?'

'কেরল দেশ থেকে আমি আসছি।'

'সে তো বহুদূর। আর কে আছে আপনার সঙ্গে?'

'হ্যাঁ, সে অনেক দূর। আমার সঙ্গে আর কে থাকবে! সেই অন্তর্যামী ভগবানই আমার সঙ্গী।'

'গোবিন্দ যোগীর সন্ধান কেন করছেন! কার মুখে শুনলেন তাঁর কথা?'

'মহাত্মন! আমি তাঁর কথা ভাষ্য পড়ার সময় আচার্যের মুখে শুনেছি। আর তখন থেকেই সংকল্প করেছি আমি সেই মহাযোগীর শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ করব।'

বৃদ্ধ এইবার অতি সম্ভ্রমে বললেন, 'আপনি এই বয়সে সব ভাষ্য পাঠ করেছেন! আবার দেখছি সন্ন্যাসী! এই বয়সে কোথায়, কার কাছে সন্ন্যাস নিলেন?'

শঙ্কর তখন বিনীতভাবে বললেন, 'ব্রাহ্মণ! আমার গুরুগৃহের পাঠ সমাপ্ত হয়েছে। সংসারে অনিত্যতা ও জীবনের ক্ষণভঙ্গুত্ব ভেবে আমি নিজেই সন্ন্যাস গ্রহণ করেছি।'

বৃদ্ধ সশ্রদ্ধভাবে বললেন, একটু রহস্যময় কণ্ঠস্বর, 'যতি, আপনি এখানে বসুন। গোবিন্দ যোগী এইখানেই আছেন। ওই যে দেখছেন গৃহ প্রাচীর—তাকিয়ে দেখুন, দেখতে পাবেন একটি প্রস্তর ফলক লাগানো

রয়েছে। ওই ফলকটি সরালে দেখতে পাবেন একটি গুহাদ্বার। ওই গুহার ভেতর তিনি সমাধিস্থ। তাঁর সমাধিভঙ্গ হলে, তাঁর কাছে উপদেশ নেব—এই আশায় আমরা বহুকাল এখানে বাস করছি। যৌবন হাতে করে এসেছিলুম, এখন হাজির হয়েছি বার্ধক্যের শেষ সীমায়। কিন্তু তাঁর সমাধি আজও ভাঙল না। শুধু এই বলি, ধন্য আপনার উদ্যম।'

শঙ্কর মহা উদগ্রীব হয়ে বললেন, 'মহাত্মন! আমি কি এখন তাঁকে দর্শন করতে পারব?'

বৃদ্ধ বললেন, 'হ্যাঁ পারেন। তবে গুহার ভেতর ঘুটঘুটে অন্ধকার। ওই দেখুন ওখানে একটি প্রদীপ আছে। সেটি জ্বেলে নিন। সেই আলোয় তাঁকে দর্শন করুন।'

শঙ্করাচার্য নির্দেশমতো প্রদীপ জ্বালালেন। প্রস্তর ফলকটি সরালেন। প্রকাশিত হল একটি গুহামুখ। সেটির পরিধি দেড় হাতের বেশি নয়। অর্থাৎ একটি ছিদ্র। অতি শীর্ণ কোনও মানুষ অতি কষ্টে প্রবেশ করতে পারে। প্রদীপের আলোয় যতটুকু দেখা যায় সেই আলোতে শঙ্কর দেখলেন, শিলাখণ্ডের ওপর অতি দীর্ঘকায় কঙ্কালসার দীর্ঘ জটাবৃত একটি মানবদেহ পদ্মাসনে উপবিষ্ট। জীবনের সামান্যতম লক্ষণ নেই। অচল, অটল, নিস্পন্দ, নির্নিমেষ—যেন একটি প্রস্তরমূর্তি।

শঙ্কর শ্বাস নিতে ভুলে গেছেন। চোখে পলক পড়ছে না। স্থির দৃষ্টিতে দেখছেন, মহাযোগীর মুখমণ্ডল। এই মুখের সৌন্দর্য দেখে শঙ্কর অভিভূত। কী দেখছেন—দীর্ঘনাসা, আকর্ণ বিস্তৃত দুটি নয়ন। প্রশস্ত ললাট। দেহত্বক শুষ্ক কিন্তু ভস্মাচ্ছাদিত হোমাগ্নি। শঙ্করের মনে উপমা আসছে—ক্ষীর সমুদ্রে নবনীতের ন্যায় যেন ব্রহ্মসাগরে মনপ্রাণ সবই বিলীন হয়ে গেছে। শঙ্কর প্রদীপটি নামিয়ে রাখলেন গুহামুখে। নতজানু হলেন। যুক্ত করেই কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ। অন্যান্য সন্ন্যাসীরা বালক সন্ন্যাসীর এই নীরব পূজা লক্ষ করছেন। শঙ্কর তাঁর ভাব আর চেপে রাখতে পারলেন না। দু-চোখে নামল যেন নর্মদার ধারা। তাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত হল স্তবমালা—

গুরুর্ব্রহ্মা স্বয়ং সাক্ষাৎ সেব্যে বন্দ্যো মুমুক্ষুভিঃ।
নোদবেজনায় এবায়ং কৃতজ্ঞেন বিবেকিন।।
যাবদায়ুস্ত্রয়ো বন্দ্যো বেদান্তো গুরুরীশ্বরঃ।
মনসা কর্ম্মাণা বাচা শ্রুতিরেবৈষ নিশ্চয়ঃ।।
ভাবাহদ্বৈতং সদা কুর্য্যাৎ ক্রিয়াহ দ্বৈতং ন কর্হিচিৎ।
অদ্বৈতং ত্রিষু লোকেষু নাদ্বৈতং গুরুণা সহ।।

শঙ্কর চোখের সামনে দেখছেন সেই গুরুদেবকে যিনি সাক্ষাৎ ব্রহ্মার স্বরূপ। মুমুক্ষু মানুষ-সেবা কর, বন্দনা গাও। এমন কাজ কোরো না যা গুরুর উদ্বেগের কারণ। যতদিন তোমার পরমায়ু ততদিন কায়মনোবাক্যে বেদান্ত, গুরু ও ঈশ্বর—এই তিনের বন্দনা কর। নিরন্তর অদ্বৈত ভাব অবলম্বন কর। কাজ যখন করবে তখন তুমি আমি থাকবে আর যখন কর্ম শিথিল হবে তখন ত্রিলোকের প্রতি অদ্বৈতভাব। কিন্তু গুরুর সঙ্গে অদ্বৈতভাব করবে না। তিনি গুরু, তুমি শিষ্য—সেবাই তোমার কর্ম।

শঙ্করের স্তবগানে সেই শীর্ণমুখ গুহাটি ধ্বনিত স্পন্দিত হল। অন্যান্য সন্ন্যাসীরা যে যেখানে ছিলেন বালক সন্ন্যাসীকে দেখার জন্য ছুটে এলেন। অনেকেই এই সমাধিস্থ প্রাচীন যোগীকে দেখতে আসেন কিন্তু এমন করে, এমনভাবে দর্শন করতে কাউকে দেখেননি। এ কী অদ্ভুত ব্যাপার আজ ঘটল!

শঙ্করের প্রাণতন্ত্রীর ঝংকারে গোবিন্দপাদের নিথর, নিস্পন্দ প্রাণতন্ত্রী যেন থিরথির করে কেঁপে উঠল। ক্ষীর সমুদ্র থেকে ভেসে উঠল ননীর একটি দলা। হাজার বছর যিনি সমাধিস্থ হয়ে আছেন শিলাখণ্ডে পদ্মাসনে তিনি একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। হাজার বছর ধরে যে বায়ুকে ধরে রেখেছিলেন সেটি ওই গুহার বাতাসে মিশে গেল। কিছুক্ষণ পরে অতি ধীরে তিনি চোখ মেললেন। এ কী অভাবনীয় ব্যাপার! কার প্রাণশক্তিতে, কার নিবেদনে যোগীর যোগভঙ্গ হল! কেরলের বালক সন্ন্যাসী শঙ্করাচার্য।

জয়ধ্বনিতে গুহা প্রকম্পিত। সন্ন্যাসীরা একবার গোবিন্দপাদকে প্রণাম করছেন। পরক্ষণেই শঙ্করকে। বয়েসটয়েস কোথায় উবে গেছে! সেটাই তো স্বাভাবিক। যোগী গোবিন্দপাদ—তাঁর বয়েস এক হাজার বছর আর শঙ্করের বয়েস আট কি নয়। আর কিছু সাধু যথেষ্ট প্রবীণ, কয়েকজন নবীন। অদ্ভুত এক কালের আবর্ত। একজন বৃদ্ধ সন্ন্যাসী ছিলেন যোগী। তিনি জানতেন সমাধিভঙ্গের পর কী করতে হয়। তিনি শঙ্করকে নিয়ে সেই সংকীর্ণ মুখ গুহার মধ্যে কোনওক্রমে প্রবেশ করলেন। তারপর গোবিন্দপাদের সেবায় রত হলেন। দীর্ঘকাল পদ্মাসনে বসে থাকলে স্বাভাবিকভাবেই পায়ের হাঁটু আটকে যায়। সহজে খুলতে চায় না। এক আধ বছর নয়, এক হাজার বছর! এমন যোগীর শরীরে হাত দিতেই তো ভয় করবে। কিন্তু সেই সন্ন্যাসী কৌশল জানতেন। তিনি ধীরে ধীরে সেই বৃহৎ ঋজু শরীরে রক্ত সঞ্চালন ফিরিয়ে আনলেন। রক্তই বা কোথা থেকে এল! পুরোটাই তো বায়ুস্তম্ভিত একটি সোনার খাঁচা। এই শরীরে অস্থি আর মজ্জা মানব শরীরের মতো নেই। ধীরে ধীরে তাঁকে মানবের সংসারে মানবের নিয়মে ফিরিয়ে আনা হল। গোবিন্দপাদ এক সময় নিষ্ক্রান্ত হলেন সেই গুহা থেকে। আনন্দের হিল্লোল, বিস্ময়ের শিহরন খেলে গেল। সংবাদ ছড়াতে তো বেশি দেরি হয় না—দেশ দেশান্তর থেকে আবালবৃদ্ধবনিতা এই মহাযোগীকে দর্শনের জন্যে পিলপিল করে আসতে শুরু করলেন। ওঙ্কারনাথ হয়ে উঠল একটি উৎসবক্ষেত্র। এই আলোড়ন প্রশমিত হওয়ার পর এল সেই শুভক্ষণ। যেসব সন্ন্যাসী দীক্ষা গ্রহণের জন্য ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছিলেন তাঁরা নির্দিষ্ট দিনে দীক্ষাগ্রহণ করলেন। এঁদের মধ্যে শঙ্করই একমাত্র বয়সে বালক। কিন্তু সুপণ্ডিত। শঙ্করের আগমনেই মহাযোগীর সমাধিভঙ্গ হয়েছে। তিনি বালক হলেও সকলের অতি শ্রদ্ধেয়। গুরুদেবও যেন তাঁকে সর্বাধিক স্নেহ করতেন।

গোবিন্দপাদ সকলকে যোগের উপদেশ দিতে শুরু করলেন। তবে শঙ্করের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা। গোবিন্দপাদ শঙ্করকে প্রথমে দিতে লাগলেন হঠযোগের শিক্ষা। অতি দ্রুত বালক সন্ন্যাসী শঙ্কর সেসব আয়ত্ত করে নিলেন। দ্বিতীয় বছরের শুরুতে গোবিন্দপাদ শঙ্করকে রাজযোগে দীক্ষিত করলেন। শঙ্করের কৃতিত্ব দেখে গুরু গোবিন্দপাদ হয়ত বিস্মিত হলেন। যোগের রাজা রাজযোগ আয়ত্ত করা খুবই কঠিন। তৃতীয় বছরে গুরু গোবিন্দপাদ শুরু করলেন জ্ঞানযোগের উপদেশ। ব্যাসশুক—সম্প্রদায় লব্ধ অর্থ তাঁকে শিক্ষা দিতে লাগলেন—শ্রবণ, মনন ও নিধিধ্যাসনের প্রকৃত রহস্য শঙ্করাচার্যকে বোঝাতে লাগলেন। শঙ্কর শ্রুতিধর। একবার যা শোনেন তা আয়ত্ত করে ফেলেন। গুরুর কৃপায় তাঁর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ-অপরোক্ষ অনুভবও হতে লাগল। এটি যদি না হত তাহলে শঙ্করাচার্যকে মানুষ অবতার বলবেন কেন!

তৃতীয় বছরও শেষ হল। মহাগুরু গোবিন্দপাদ দেখলেন, শঙ্করের সাধন সম্পূর্ণ। তাঁর মুখে সব সময়ই অপূর্ব এক যোগীর হাসি। শরীরে থইথই করছে অপূর্ব এক লাবণ্য। সদা সর্বদাই যেন সমাধিস্থ। আহার ও পানীয়ের জন্যে তাঁর কোনও চঞ্চলতা নেই। হলে হবে, না হলে না হবে! তাঁর আয়ত্তে এসে গেছে স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ, আকাশ গমন ইত্যাদি যোগসিদ্ধি। এদিকে এসে গেছে বর্ষাকাল। নর্মদা পরিবেষ্টিত মান্ধাতা দ্বীপটি অপূর্ব সুন্দর হয়ে উঠেছে। চতুর্দিকে সবুজে সবুজ। চতুর্দিকে যেন পত্রশোভিত সবুজ প্রকৃতির নৃত্য। কত রকমের ফুল। শিলা-গাত্র পাহাড় উঠে গেছে ঊর্ধ্ব আকাশের দিকে। সে আকাশ কখনও ঘননীল কখনও ঘনকৃষ্ণ। একদিন আকাশের সমস্ত নীল হারিয়ে গেল। কুচকুচে কালো বর্ষার মেঘ যেন আতঙ্কের পূর্বাভাস! দেখতে দেখতে শুরু হল মুষলধারে বৃষ্টি। সে বৃষ্টির থামার লক্ষণ নেই। দিনের পর দিন। নর্মদার জল ক্রমশ বাড়ছে। সহসা একদিন—সবাই পুবদিকে তাকিয়ে দেখলেন, বিশাল এক জলের প্রাচীর হু-হু শব্দে এগিয়ে আসছে। তুমুল গর্জন। উৎপাটিত গাছপালা সেই তোড়ে ছুটে আসছে সাধুদের ডেরার দিকে। যাঁরা তীরে ছিলেন তাঁরা সকলেই ছুটছেন উঁচু জায়গার দিকে। সবাই ভীত, ত্রস্ত। চতুর্দিকে ঘোর আর্তনাদ। এর কয়েকদিন আগেই গোবিন্দপাদ কয়েকদিনের জন্যে তাঁর পূর্ব গুহায় ফিরে গেছেন এবং তিনি সমাধিস্থ। এদিকে বন্যার জল গুহার সামনে সাধুদের সেই ঘরটিতে প্রবেশ করতে শুরু করেছে। সন্ন্যাসীরা আতঙ্কিত। জল আর কিছুটা বাড়লেই গুহার মধ্যে প্রবেশ করবে। তাঁরা ভাবছেন, জল যদি গুহা মধ্যে প্রবেশ করে তাহলে গুরুদেবকে আর রক্ষা করা যাবে না। কিন্তু কী করবেন! অসহায় অবস্থা। শঙ্কর আর বসে থাকতে

পারলেন না। তিনি উঠলেন, এদিকে-ওদিকে অনুসন্ধান করে নিয়ে এলেন একটি কুম্ভ। গুহার মুখে সেটি স্থাপন করে সন্ন্যাসীদের বললেন, 'আপনারা এইবার শান্ত হোন। জল এখানে এসেই প্রতিহত হবে। গুহায় প্রবেশ করতে পারবে না।'

সত্য সত্যই তাই হল। জল বাড়ল কিন্তু গুহায় প্রবেশ করল না। সমস্ত জলই শঙ্কর স্থাপিত সেই কুম্ভে ঢুকতে লাগল। সন্ন্যাসীরা অবাক হয়ে সেই দৃশ্য দেখতে লাগলেন। কারুর মুখে কথা নেই। একি বিস্ময়! সকলেই তখন বলতে লাগলেন—এ বালকের সবই অদ্ভুত! বৃষ্টি থামল। জল নেমে গেল। কয়েকদিন পরেই গোবিন্দপাদের সমাধিভঙ্গ হল। তিনি শিষ্যদের মুখে বন্যার কথা শুনলেন। তাঁর প্রিয় শিষ্য শঙ্করের কীর্তির কথা। মহাযোগীর মুখে অদ্ভুত এক হাসি। তিনি শঙ্করের মস্তক চুম্বন করে বললেন, 'বৎস আমি আশীর্বাদ করি—তোমার কীর্তি অক্ষয় হবে। সমগ্র বন্যার জল যেমন তুমি এক কুম্ভ মধ্যে আবদ্ধ করলে, আশীর্বাদ করি সমগ্র বেদের অর্থ তুমি সেইরকম তোমার ভাষ্যে লিপিবদ্ধ করো।' গুরু এবং শিষ্য দুজনেই আধ্যাত্মিক আনন্দে ডগমগ।

গুরুর আদেশ তো উপেক্ষণীয় হতে পারে না বিশেষত, গুরু যখন গোবিন্দপাদ আর শিষ্য যখন শঙ্কর! শঙ্করাচার্য 'অজ্ঞানবোধিনী' শুরু করছেন—

'চিৎসদানন্দরূপায় সর্ব্বধীবৃত্তিসাক্ষিণে।
নমো বেদান্তবেদ্যায় ব্রহ্মণেহনন্ত রূপিণে।
যদাজ্ঞানাদিদং ভাতি যজ্জ্ঞানাদবিনিবর্ত্ততে।
নমস্তস্মৈ চিন্দানন্দবপুষে পরমাত্মনে।।
অথাধ্যাত্মবিদ্যোপদেশবিধিং ব্যাখ্যাস্যামঃ।
তপোভিঃ ক্ষীণপাপানাং শান্তানাং বীতরাগিণাম।
মুমুক্ষুণামপেক্ষ্যাহয়মাত্মবোধো বিধীয়তে।।'

শঙ্করাচার্য ব্রহ্মের স্বরূপ, (যদি কোনও রূপ থাকে) জানাতে গিয়ে অপূর্ব বাক্যবন্ধ প্রয়োগ করছেন—সচ্চিদানন্দরূপী, যাবতীয় বুদ্ধিবৃত্তির সাক্ষীর স্বরূপ, বেদান্তবেদ্য অনন্তরূপী ব্রহ্মকে নমস্কার। যাঁকে জানতে না পারার ফলে এই ব্রহ্মাণ্ড অবভাসিত হয়, আর যাঁকে জানতে পারলে সেই বোধ আর থাকে না, সেই চিদানন্দ বিগ্রহ পরমাত্মকে নমস্কার। এরপর তিনি বলছেন—এই আমার উপস্থাপনা। এখন আমি, 'অধ্যাত্ম বিদ্যার উপদেশবিধি ব্যাখ্যা করি—তপস্যার দ্বারা যাঁরা ক্ষীণ পাপ হয়েছেন, যাঁরা শান্তশীল, যাঁরা বিষয়ভোগে বীতস্পৃহ ও মুমুক্ষু তাঁদের জন্যে এই আত্মবোধ—এই আত্মজ্ঞানের উপদেশ।'

গুরুর কৃপা ছাড়া শিষ্য কি কখনও সাফল্য লাভ করতে পারেন! ভারতধর্মের এইটিই আদিকথা এবং মূল কথা। আকাশে যাঁরা এক-একটি বড় বড় নক্ষত্রের মতো দীপ্যমান তাঁরা সকলেই কিন্তু গুরুর কৃপায় ঈশ্বরত্ব লাভ করেছিলেন। গুরুর আবার অপূর্ব খেলা। তিনি কখনও সামনে আসেন না। পেছন থেকেই রাশ ঠেলে দেন। গুরু গোবিন্দপাদ শিষ্য শঙ্করকে শেষ কথা বলছেন, 'বৎস শঙ্কর! শোন, আজ আমি তোমাকে আমার শেষ কথাটি বলি। আমি বুঝেছি তোমার শেখবার আর কিছুই বাকি নেই। তুমিও তা বুঝেছ। এখন বল তোমার আর কোনও অভাব আছে কি?'

সবাই দেখছেন সেই অপূর্ব দৃশ্য যা সময়ের স্রোতে ভেসে চলে গেছে। শঙ্কর গুরুদেবের চরণ দুটি হাত দিয়ে ধরে মাথাটি নত করে স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন। তিনি মৌন। মৌনই তো সম্মতির লক্ষণ। কিন্তু গুরুদেবের শেষ ইচ্ছা শঙ্করের মুখ থেকে তিনি শুনতে চাইছেন তিনি যা বললেন তা ঠিক কি না—গোবিন্দপাদ বললেন, 'বল বৎস! তোমার আর কোনও সন্দেহ আছে কি না। আমার কাছ থেকে তোমার আর কি কিছু পাওয়ার আছে? আমি তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই।'

শঙ্কর অবনত মস্তকে মৃদু হেসে বললেন, 'ভগবান! আপনার কৃপায় আমার জ্ঞাতব্য তো কিছু নেই। আপনি অনুমতি করলে আমি ব্রহ্মতত্ত্বে চিরতরে নির্বাণ প্রাপ্ত হই।'

গোবিন্দপাদ শঙ্করের উত্তরে সন্তুষ্ট হলেন। গুরু এবং শিষ্যের মাঝখানে কিছুক্ষণের নীরবতা। গোবিন্দপাদের কণ্ঠস্বর, ''বৎস শঙ্কর! তুমি বেদের ধর্ম রক্ষা করবে বলে ভগবান শঙ্করের অংশে জগতে অবতীর্ণ হয়েছ। তুমি তো একটি দেহ নয়, তিনটি দেহ। এর মূলে রয়েছেন ভগবান শঙ্করের ইচ্ছার শক্তি। তুমি যা করবে তা তুমি করবে না, করবেন স্বয়ং মহাদেব। তোমার এই অবতরণ বার্তা আমি গুরু গৌড়পাদের কাছে শ্রবণ করেছি। তোমাকে সম্প্রদায়ক্রমে রক্ষিত সেই অদ্বৈত ব্রহ্মবিজ্ঞান দেওয়ার জন্য গৌড়পাদেরই আদেশে আমি আজ প্রায় সহস্র বৎসরকাল অপেক্ষা করে আছি। তা না হলে আমি কবেই এই জগৎ থেকে মুক্তিলাভ করে স্বধামে চলে যেতুম। তোমার জন্যই আমার এই অপেক্ষা। এখন আমার কাজ শেষ। আমার এই দেহ রাখার আর কোনও প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। তুমি এইবার কাশীধামে যাও। সেখানে তুমি ভগবান বিশ্বেশ্বরের দর্শন লাভ করবে। আর তিনি তোমায় যা করতে বলবেন তাই করবে। আমার মনে হয় তিনি তোমাকে বলবেন—মহামুনি ব্যাস বিরচিত ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করে অদ্বৈতব্রহ্মাত্মজ্ঞান প্রচার করতে। কারণ, এই যে সময়, সে সময়ে আমরা বসে আছি, নানা অবৈদিক ধর্ম মত অতীব সূক্ষ্ম দার্শনিক তত্ব প্রচার করে জনসাধারণকে এমনই বিমোহিত করেছেন যে তাঁদের তর্কজাল ভেদ করে প্রকৃত পরমাত্মতত্ব জানা সাধারণ মানুষের পক্ষে এখন এক প্রকার অসম্ভব। শুধু তাই নয় শঙ্কর, যাঁরা নিজেদের বলছেন, আমরা বেদসেবী, বলছেন আমরা মীমাংসক, তাঁরাও বেদের জ্ঞানকাণ্ড বিলোপের পথে পাঠিয়েছেন। তাঁরা শুধু আচার আর বিচার নিয়ে ব্যস্ত। শোন আমি কী বলছি—তুমিই সেই জ্ঞানগুরু শঙ্করাবতার। তোমার হাতেই, তোমার প্রচেষ্টাতেই বেদ আবার ফিরে পাবে তার পূর্ব মহিমা। তুমি সেই কাজই করতে এসেছ। আঃ! আজ আমার বড় তৃপ্তি। গুরু গৌড়পাদের আদেশে আমার এই দীর্ঘ অপেক্ষা। তাঁরই আদেশে প্রকৃত ব্রহ্মতত্ব তোমাকে শেখানো। সব কাজ আমার শেষ হল। এবার তোমরা যোগজনোচিত আমার সৎকারের ব্যবস্থা করো।''

এরপর শঙ্করাচার্য কী করলেন! তিনি নর্মদাতীরে বসে রচনা করলেন বিখ্যাত 'নর্ম্মদাষ্টক স্তোত্র'। তাঁর লেখা সেই স্তোত্র অতি অনবদ্য। এইভাবে নর্মদা প্রশস্তি পূর্বে কেউ করেছেন বলে মনে হয় না। শঙ্করাচার্য বলছেন—'হে দেবি নর্ম্মদে! তোমার সলিলবিন্দু সমুদ্রগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া তরঙ্গভঙ্গসহকারে মনোহারিণী শোভা ধারণ করিয়াছে; তোমার জল স্পর্শ করিলে পাপরাশি বিনাশ প্রাপ্ত হয়। তোমার জল কৃতান্ত দূতের ভয় ও কালভয় দূর করে। হে কল্যাণদায়িনি! তোমার পাদপদ্মে নমস্কার।'

'তোমার জলগর্ভে নিরীহ মৎস্যাদি জীবকূল অবস্থিতি করিতেছে। তোমার জল কলিযুগে পাপরাশিভার হরণ করে ও উহা সর্ব্বতীর্থের শ্রেষ্ঠ; তোমার জলগর্ভে যে সমস্ত মৎস্য, কচ্ছপ ও চক্রবাক অবস্থিতি করে, তুমি তাহাদিগের কল্যাণ বিধান করিয়া থাক; হে দেবি নর্ম্মদে! তোমার পাদপদ্মে নমস্কার।'

দীর্ঘ শ্লোক! সুললিত এবং শ্রবণমধুর। তা সত্বেও সম্পূর্ণ শ্লোক উদ্ধৃতি না করে বঙ্গানুবাদের ওপরেই নির্ভর করলাম। তবে মাঝে-মাঝে পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমৎ শঙ্করভগবৎপূজ্যপাদ বিরচিত মূল শঙ্করাচার্যের গ্রন্থাবলি থেকে 'নর্ম্মদাষ্টক' স্তোত্রের কয়েকটি পঙক্তি অবশ্যই নিবেদন করব।

শঙ্করাচার্য লিখছেন—'তোমার মহাগভীর জলরাশি দ্বারা ভূতল পাপ পরিমুক্ত হইয়াছে; তোমার জল দ্বারা যাবতীয় ভীষণ পাতকরূপ শত্রু ও আপদরূপ পর্ব্বত বিধ্বস্ত হয়; মহাভয়াবহ প্রলয়কালে তুমি মার্কণ্ডেয় মুনিকে আশ্রয় প্রদান করিয়াছিলে, হে দেবি নর্ম্মদে! তোমার চরণকমলে নমস্কার।'

'গতং তদৈব মে ভয়ং ত্বদম্বু বীক্ষিতং যদা,
মৃকণ্ডুসূনুশৌনকাসুরারিসেবি সর্ব্বদা।
পুনর্ভবাব্ধিজন্মজং ভবাব্ধিদুঃখর্ন্মদে,

ত্বদীয় পাদপঙ্কজং নমামি দেবি নর্ম্মদে।।'

'যখন তোমার জল আমার নয়নগোচর হইয়াছে, তখনই আমার ভয় বিদূরিত হইয়াছে। মার্কণ্ডেয়-শৌনকাদি মুনিবৃন্দ ও দেবগণ সর্ব্বদা যাহার সেবা করেন, যাহার প্রসাদে ভবসাগরে পুনর্জন্ম ধারণ করিতে হয় না এবং যাহা সংসারসাগরজনিত দুঃখ বিনাশ করে, হে দেবি নর্ম্মদে! তোমার পাদপদ্মে নমস্কার।'

'হে দেবি নর্ম্মদে! তুমি বশিষ্ঠ, শিষ্ট, পিপ্পলাদ ও কর্দ্দমাদি মুনিগণের মঙ্গলবিধান করিয়া থাক; লক্ষ লক্ষ কিন্নর, অমর ও অসুরেরা যাহার পূজা করেন। তীরনীরবাসী লক্ষ লক্ষ নিরীহ বিহগকুল যাহার নিকট বসিয়া কুজন করিতেছে, তোমার সেই পাদপদ্মে নমস্কার।'

'সনৎকুমার নাচিকেতকশ্যপ পাত্রিষটপদৈ-
র্ধৃতং স্বকীয়মানসেষু নারদাদিষটপদৈঃ
রবীন্দু দুরন্তিদেব দেবরাজ কর্ম্মশর্ম্ম দে,
ত্বদীয় পাদপঙ্কজং নমামি দেবি নর্ম্মদে।।'

'হে দেবি নর্ম্মদে! তুমি সূর্য, চন্দ্র, রন্তিদেব ও দেবরাজের নিজ নিজ কর্ম্মে কল্যাণবিধান করিয়া থাক, সনৎকুমার, নাচিকেত, কশ্যপ, অত্রি ও নারদাদি মহাত্মারা ষটপদরূপে নিজ নিজ হৃদয়ে যাহা ধারণ করিয়া থাকেন, তোমার সেই পাদপদ্মে প্রণাম।'

'অলক্ষ লক্ষলক্ষপালক্ষসারসায়ূধং
ততস্তু জীবজন্তুভুক্তিমুক্তিদায়কম।
বিরিঞ্চিবিষ্ণুশঙ্করস্বকীয়ধামশর্ম্মদে,
ত্বদীয় পাদপঙ্কজং নমামি দেবি নর্ম্মদে।।'

'হে দেবি নর্ম্মদে! তোমার পাদপদ্ম জ্ঞাতাজ্ঞাত লক্ষ লক্ষ পাতকের পক্ষে আয়ূধস্বরূপ ও জীবজন্তুর ভক্তিমুক্তিপ্রদ; তুমি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশের নিজ নিজ ধামে কল্যাণ প্রদান করিয়া থাক; তোমার পাদপদ্মে নমস্কার।'

'অহোহমৃত স্বনংশ্রুত মহেশকেশজাতটে,
কিরাতসূতবাড়বেষু পণ্ডিতে শঠে।
দুরন্তপাপতাপহারি সর্ব্বজন্তুশর্ম্মদে,
ত্বদীয় পাদপঙ্কজং নমামি দেবি নর্ম্মদে।।

'হে দেবি নর্ম্মদে! তোমার শব্দ অমৃতবৎ শ্রুত হয়; তুমি মহেশ্বরের কেশজালে অবস্থিতি কর; কি কিরাত, কি সূত, কি ব্রাহ্মণ, কি পণ্ডিত, কি শঠ, সকলের দেহে অবস্থিত থাকিয়া তুমি দুরন্ত পাপতাপ হরণ করিয়া থাক এবং তুমি সর্ব্বজীবের কল্যাণবিধাত্রী; তোমার পাদপদ্মে নমস্কার।'

'ইদন্তু নর্ম্মদাষ্টকং ত্রিকালমেবং যে সদা,
পঠন্তি তে নিরন্তরং ন যান্তিদুর্গতিং কদা।
সুলভ্যদেহ দুর্লভং মহেশধাম গৌরবং

পুনর্ভবা নবা ন বৈ বিলোকয়ন্তি রৌরবম।।
ইতি নর্ম্মদাষ্টক স্তোত্রং সম্পূর্ণম।'

'যাহারা প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যা এই নর্ম্মদাষ্টক স্তোত্র নিরন্তর পাঠ করে তাহাদিগকে কদাচ দুর্গতিপ্রাপ্ত হইতে হয় না; এই সুলভ্য দেহে যে শিবধামরূপ গৌরব দুর্ল্লভ, তাহারা সেই গৌরব-প্রাপ্তি হয় এবং তাহাদিগকে পুনর্জন্ম গ্রহণ বা নরক দর্শন করিতে হয় না।'

সেই পুণ্যতীর্থে, মার্কণ্ডেয় ঋষির আশ্রমে এখন ত্রৈলঙ্গস্বামী অবস্থান করছেন। মুনিঋষিদের অত্যন্ত কাঙ্ক্ষিত সাধনস্থল। স্বামীজিও নির্জনে সাধনা করতে চাইবেন—সেটাই তো সাধারণ ঘটনা। এরপর নর্মদা তীর্থে কী ঘটল। দেবী নর্মদা স্বামীজিকে কীভাবে আপ্যায়ন করলেন। তিনি কি তাঁর স্নেহের পুত্র ত্রৈলঙ্গকে সন্তানস্নেহে বক্ষে টেনে নিয়েছিলেন?

সেইসময় মার্কণ্ডেয় ঋষির আশ্রমে আরও কয়েকজন সাধু বাস করতেন। একজনের নাম ছিল 'খাকীবাবা'। তিনি সাধন জগতের বেশ উচ্চস্তরেই অবস্থান করতেন। তাঁদের সঙ্গে আনন্দেই দিন কাটাচ্ছিলেন ত্রৈলঙ্গ স্বামীজি। প্রত্যেকদিন রাতে স্বামীজি নর্মদাকূলে যোগাসনে বসে ধ্যান করতেন।

একদিন ত্রৈলঙ্গস্বামী রাত্রে আশ্রম থেকে বেরিয়ে গেলেন। তার কিছুক্ষণ বাদে খাকীবাবাও আশ্রম থেকে বেরিয়ে নর্মদার তীরে এসে এক অদ্ভুত, অপূর্ব দৃশ্য দেখলেন। সে দৃশ্য দেখে তিনি চমকে উঠলেন। খাকীবাবা কী দেখেছিলেন—দেবী নর্মদা তাঁর রূপ পরিবর্তন করেছেন। নদী দিয়ে এখন আর জল নয় দুধ প্রবাহিত হচ্ছে। কলকল রবে সেই দুধ ছুটে যাচ্ছে আপন গতিপথে। খাকীবাবা আর কী দেখেছিলেন! তিনি দেখলেন, তাঁদের আশ্রমের অতিথি নতুন সাধু ত্রৈলঙ্গস্বামী অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে দুই অঞ্জলি ভরে সেই দুধ পান করছেন। খাকীবাবা এই অলৌকিক দৃশ্য দেখে নিজেকে স্থির রাখতে পারলেন না। সেই অলৌকিক দুধ পান করার জন্য তিনিও নদীর দিকে এগোলেন। তারপর কী ঘটল! খাকীবাবা নদীতীরে গিয়ে হাঁটু মুড়ে বসে দুটি হাত দিয়ে নর্মদাকে স্পর্শ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে নদী আবার তাঁর রূপ পালটে ফেলল। কোথায় দুধ! এ তো স্বাভাবিক জল। ত্রৈলঙ্গস্বামী এই পরিবর্তনের কারণ জানার জন্য পিছন দিকে তাকানো মাত্রই খাকীবাবাকে দেখতে পেলেন। তিনি আর কালক্ষেপ না করে ফিরে গেলেন নিজের আসনে। বসে গেলেন যোগসাধনায়। এদিকে এইসব ব্যাপার-স্যাপার দেখে খাকীবাবাও নদীতীরে আর এক মুহূর্ত থাকলেন না। তিনি ফিরে গেলেন নিজেদের আশ্রমে। তারপর উপস্থিত অন্যান্য সাধুদের ডেকে সমস্ত ঘটনা সবিস্তারে জানালেন। এর ফলে ত্রৈলঙ্গস্বামীকে প্রত্যেকেই যোগবিভূতিসম্পন্ন মহাপুরুষ বলে মনে করতে শুরু করলেন। স্বামীজির খাতির যত্ন বহুগুণ বেড়ে গেল। আদরের চোটে স্বামীজির তখন ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা।

প্রায় সাতবছর মার্কণ্ডেয় আশ্রমে কাটাবার পর তিনি দেবী নর্মদার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আবার পথে নামলেন। ১১৪০ সনে তিনি এলেন পুণ্যতীর্থ এলাহাবাদের প্রয়াগধামে।

আবার একটু পুরাণে ফিরে যাই। দেবতা ও অসুররা মিলে সমুদ্র মন্থন করবেন। সমস্ত ঝগড়া-বিবাদ ভুলে তাঁরা এখন প্রাণের ভাই। মন্দার পর্বতকে মন্থনদণ্ড এবং বাসুকী নাগকে রজ্জু বানিয়ে শুরু হল সমুদ্রমন্থনের কাজ। উদ্দেশ্য অমৃত সংগ্রহ করা। কিন্তু কী বুদ্ধি! রজ্জু হিসাবে নির্বাচন করা হয়েছে বাসুকী নাগকে। মন্থনের কাজ শুরু হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যে তাঁর পেট ও সর্বশরীরে প্রচণ্ড চাপ পড়ল। যা হওয়ার এরপর তাই হল। তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে এল তীব্র ও ভয়াবহ কালকূট বিষ। সেদিকে কোনও হুঁশ নেই 'মন্থন ভাইদের'। তাঁরা হেঁইও হেঁইও করে মন্থন চালিয়ে যাচ্ছিলেন। মন্থনের ফল বা উপহার হিসাবে উঠে এল তীব্র ও ভয়াবহ সেই কালকূট বিষ। তার গন্ধ তীব্র। সে জগৎ জুড়ে ধূমায়িত আগুনের মতো জ্বলতে শুরু করল। ফলস্বরূপ ত্রিলোকের সবাই পটাপট মূর্ছিত হয়ে পড়লেন।

'অতিনির্মথনাদেব কালকূটস্ততঃ পরঃ।

জগদাকৃত্য সহসা সাধূমোহগ্নিরির জ্বলন।
ত্রৈলোক্যং মোহিতং যস্যগন্ধমাত্রায় তদ্বিষম
প্রাগসল্লোকরক্ষার্থং ব্রক্ষণঃ বচনাচ্ছিষঃ
দয়ার ভগবান কণ্ঠে মন্ত্রমূর্তির্মহেশ্বরঃ।
তদাপ্রভৃতি দেবস্তু নীলকণ্ঠ ইতি শ্রুতঃ।

ত্রিলোকের সমস্ত জীব অজ্ঞান। কালকূট সমগ্র জগৎকে বিনাশ করে দিতে পারে। ভয়াবহ তার ক্ষমতা। জগৎকে কে রক্ষা করবেন! সেই মহাদেব! ব্রহ্মার অনুরোধে মহেশ্বর ভয়াবহ কালকূট হলাহলকে নিজের কণ্ঠে ধারণ করলেন। মহাদেবের কণ্ঠ বিষের তীব্রতায় নীল হয়ে গেল। জগৎকে রক্ষা করে তিনি নীলকণ্ঠ নামে পরিচিত হলেন।

একটা সমস্যা মহাদেবের কৃপায় মিটে গেল। কিন্তু দেবতাদের মতো 'সমস্যা' এই ত্রিলোকের আর কেউ তৈরি করতে পারেন না। তাঁরা হলেন সমস্যা তৈরির ফ্যাক্টরি। সমুদ্র মন্থনের ফলে এক সময় উঠে এল অমৃত। শুরু হল দখলদারির লড়াই। টানাটানি, কাড়াকাড়ি, সে এক বিশ্রী পরিস্থিতি। দেবতারাও গোঁ ধরে বসে আছেন এক ফোঁটা অমৃত আমরা ওই ভয়ংকর অসুরদের দেব না। অসুররাও ছাড়বেন না। লণ্ডভণ্ড কাণ্ড। ভয়াবহ হলাহল কণ্ঠে ধারণ করে মহেশ্বরও তখন ফিট নন। আনফিট মহেশ্বর। এই ঝগড়া কে মেটাবে! আসরে অবতীর্ণ হলেন বিষ্ণু। মোহিনী বেশে তিনি সেখানে উপস্থিত হলেন। অসুররা চিরকালই একটু মাথামোটা। তাঁরা ওই মোহিনীর রূপে অসম্ভব মুগ্ধ হয়ে কেমন হতবুদ্ধি হয়ে পড়লেন। সেই সুযোগে মোহিনীরূপী বিষ্ণু সেই অমৃত সমস্ত দেবতাদের খাইয়ে দিলেন। এতক্ষণে ঘোর কাটল অসুরদের। অমৃত গন। সব হারানোর বেদনায় ক্রু�দ্ধ অসুরগণ দেবতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। শুরু হল দেবাসুরের প্রবল সংগ্রাম।

এই সংগ্রাম চলাকালীন ইন্দ্রপুত্র জয়ন্ত অমৃতকুম্ভটিকে প্রয়োজনমতো পৃথিবীর চারটে জায়গায় রেখেছিলেন। তারই স্মরণে সেই চারটি জায়গা—প্রয়াগ, উজ্জয়িনী, নাসিক ও হরিদ্বারে কুম্ভমেলা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর মিলনক্ষেত্র মহাতীর্থ প্রয়াগ। ডঃ প্রাণগোপাল ভট্টাচার্য তাঁর 'মহাযোগী শ্রীশ্রী ত্রৈলঙ্গ স্বামী' গ্রন্থে এই মহাতীর্থের বর্ণনা খুব সুন্দরভাবে করেছেন। তিনি লিখছেন, ''ভারতবর্ষের মধ্যে হিমালয় আর বিন্ধ্য পর্বতের মধ্যবর্তী ভূ-ভাগের নাম আর্যাবর্ত। পুণ্যপ্রদ স্থান হল এই আর্যাবর্ত।...আবার তারই মধ্যে গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্তী ভূ-ভাগ অন্তর্বেদী স্থান শ্রেষ্ঠ। আবার এই অন্তর্বেদী স্থানের চেয়ে কুরুক্ষেত্র অতি উত্তম। আর কুরুক্ষেত্রের চেয়ে স্বর্গসাধন নৈমিষারণ্য আরও অধিক উত্তম।...আবার নৈমিষারণ্য এবং অন্যান্য তীর্থের চেয়ে প্রয়াগ আরও শ্রেষ্ঠ।...স্বর্গ-মোক্ষ-কাম্যফল প্রদানকারী প্রয়াগ সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার ক্ষেত্র। তাই প্রয়াগকে তীর্থরাজ বলা হয়।...পুরাকালে সমস্ত যাগ ও কামনা পরিপূরক পরম রমণীয় এই তীর্থরাজকে দাঁড়িপাল্লায় চাপিয়ে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা ধারণ অর্থাৎ ওজন করেছিলেন। ওজন করে দেখা গিয়েছিল—এই তীর্থ দক্ষিণাদি দ্বারা পরিপুষ্ট যাগ-যজ্ঞের চেয়ে ভারী বা শ্রেষ্ঠ। তখন দেবগণ এই তীর্থের নাম রেখেছিলেন 'প্রয়াগ'।...এই তীর্থের নাম স্মরণ করলে মানবদেহে কোন পাপই আশ্রয় করতে পারে না।...পাপ থেকে ত্রাণ করবার মতো অনেক তীর্থ আছে বটে, কিন্তু সে-সব তীর্থ কৃতপাপের পরিশুদ্ধি (পাপক্ষয়) ছাড়া প্রয়াগের মতো এত বেশি ফল প্রদান করতে পারে না।...বাতাস জোরে বইলে যেমন গাছের ডাল-পালা-পাতা কাঁপতে থাকে, ঠিক তেমনি বহু জন্মের সঞ্চিত পাপরাশি (যা সহজে দান-ব্রত-তপস্যা-জপাদিতে দূর করা যায় না) প্রয়াগের উদ্দেশে গমনকারী তীর্থযাত্রীর অঙ্গে কাঁপতে থাকে। প্রয়াগের অর্ধেক পরিমিত পথ পেরনো মাত্র সে-সব সঞ্চিত পাপরাশি ঐ তীর্থযাত্রীর দেহ ছেড়ে অন্যত্র পালাতে ব্যাকুল হয়। শেষে যখন ঐ তীর্থযাত্রী প্রয়াগের একেবারে কাছে এসে তীর্থরাজকে দেখতে পান তখন ঐসব সঞ্চিত পাপরাশি তাঁর দেহ থেকে নিমেষে পালিয়ে যায়।...অনেকেই জানেন না যে পঞ্চভূত (ক্ষিতি-অপ-তেজ-মরুৎ-ব্যোম) এবং সপ্তধাতুতে

(ত্বক-মাংস-রক্ত-স্নায়ু-অস্থি-মজ্জা-শুক্র) তৈরি এই মানবদেহের সমস্ত পাপরাশি মাথার চুলকে আশ্রয় করে থাকে।...তাই প্রয়াগে মাথা মুণ্ডন করলে সে-সব পাপরাশি দূর হয়ে যায়।...এভাবে নিষ্পাপ হয়ে গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর সঙ্গমক্ষেত্রে তীর্থযাত্রীকে অবগাহন করতে হয়। ঐ অবগাহনের সময় তীর্থযাত্রী যে বিষয় কামনা করবেন তা তিনি প্রাপ্ত হবেন।''

তীর্থরাজ প্রয়াগে এসেছেন সাধকশ্রেষ্ঠ ত্রৈলঙ্গ স্বামী। যথেষ্ট সাধন-ভজনও হচ্ছে। কিন্তু আর কয়েকদিনের মধ্যে প্রয়াগ ছেড়ে চলে যেতে হবে স্বামীজিকে। একদিন বিকেলে তিনি বসে আছেন প্রয়াগ ঘাটে। হঠাৎই প্রবল ঝড় আর বৃষ্টি শুরু হল। সেদিন স্বামীজির কৃপায় বহু মানুষ প্রাণ ফিরে পান। নৌকোযাত্রী ও ভট্টাচার্য মহাশয়ের কৃপায় স্বামীজির অলৌকিক ক্ষমতার কথা প্রয়াগের চতুর্দিকে নিমেষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। প্রচারবিমুখ স্বামীজি আর প্রয়াগে থাকতে চাইলেন না। তিনি আবার পথে নামলেন। যাবেন কাশী। প্রয়াগ থেকে খুব বেশি দূর নয়। কিন্তু বয়সটার কথা একবার ভাবুন! স্বামীজি তখন ঠিক একশো ত্রিশ।

৬

শিবের ধাম, অন্নপূর্ণার স্থান, সেই কাশীতে এলেন ত্রৈলঙ্গ স্বামী। এইস্থানে তিনি কাটাবেন তাঁর জীবনের দীর্ঘ একশো পঞ্চাশ বছর। মাঝে দু-একবার ছোটখাটো তীর্থভ্রমণে বেরোবেন। তবে আবার ফিরে আসবেন সেই কাশীতে। শত অসুবিধা, অসংখ্য উৎপাত মুখ বুজে সহ্য করবেন কাশীর সচল বিশ্বনাথ প্রচারবিমুখ ত্রৈলঙ্গজি। কিন্তু একবারও কাশী ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা ভাববেন না। অদ্ভুত এক বৈপরীত্য। সর্বত্র তিনি মানুষের ভিড় দেখলেই পালাই পালাই করেছেন। কাশীর ক্ষেত্রে সে ঘটনা ঘটেনি। কেন তিনি কাশীকে এত ভালোবেসেছিলেন! কেন তিনি এই শিবভূমি ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা একবারের জন্যও ভাবেননি। এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে চলুন একটু কাশী থেকে ঘুরে আসি।

এই কাশী বা বারাণসী ধামে চক্র সরোবর, মণিকর্ণিকা আর সুরধুনী মিলিত হয়েছেন। এখানে কলিকালজনিত ভয়, দেহান্তে পুনর্জন্ম আর করাল কলুষাশঙ্কা নেই। এই ক্ষেত্রের মতো মঙ্গলময় পুরীর সন্ধান অখিল ব্রহ্মাণ্ডের কোথাও পাওয়া যায় না। প্রতিদিন গভীর রাতে বাবা বিশ্বনাথ তাঁর মন্দির থেকে বেরিয়ে মা অন্নপূর্ণার সঙ্গে সুখদুঃখের কথা বলতে আসেন। এখনও তিনি যান বোধহয়, ভাগ্যবান ভক্ত সেই দৃশ্য দেখে ধন্য হন। তাই তো শঙ্করাচার্য তাঁর কাশীপঞ্চক স্তোত্রম-এ লিখছেন—

'মনোনিবৃত্তিঃ পরমোপশান্তিঃ, সা তীর্থবর্য্যা মণিকর্ণিকা চ।
জ্ঞানপ্রবাহা বিমলদিগঙ্গা, সা কাশিকাহং নিজ বোধরূপা।। (১)
যস্যামিদং কল্পিতমিন্দ্রজালং, চরাচরং ভাতি মনোবিলাসম।
সচ্চিৎসুখৈকা পরমাত্মরূপা সা কাশিকাহং নিজবোধরূপা।। (২)
কোশেষু পঞ্চস্বধিরাজ মানা, বুদ্ধির্ভবানী প্রতিদেহগেহম।
সাক্ষী শিবঃ সর্ব্বগতহন্তরাত্মা, সা কাশিকাহং নিজবোধরূপা।। (৩)
কাশ্যাং হি কাশতে কাশী কাশী সর্ব্বপ্রকাশিকা।
কা কাশী বিদিতা যেন তেন প্রাপ্তা হি কাশিকা।। (৪)
কাশীক্ষেত্রং শরীরং ত্রিভুবনজননী ব্যাপিনী জ্ঞানগঙ্গা,
ভক্তিঃ শ্রদ্ধা গয়েয়ং নিজগুরুচরণধ্যানযোগঃ প্রয়াগঃ।
বিশ্বেশোহয়ং তুরীয়ঃ সকলজনমনঃ সাক্ষীভূতোহন্তরাত্মা,
দেহে সর্ব্বং মদীয়ে যদি বসতি পুনস্তীর্থ মনৎ কিমস্তি।।' (৫)

'যে স্থানে মানবের নিবৃত্তি হয় (চিত্তে বিষয় বাসনা থাকে না), যেখানে পরমা শান্তির আবির্ভাব হয়, যে স্থানে তীর্থশ্রেষ্ঠ মণিকর্ণিকা বিরাজমান, যিনি জ্ঞানের প্রবাহস্বরূপ, বিমল আদিগঙ্গা যেখানে বিরাজিত, আমিই সেই স্বয়ং বোধরূপিণী কাশীস্বরূপ (১)। যাহাতে এই চরাচর ব্রহ্মাণ্ড ইন্দ্রজালের ন্যায় মনোবিলাসরূপে কল্পিত হইতেছে, যিনি সচ্চিৎসুখময়ী, অদ্বিতীয় ও পরমাত্মস্বরূপা, আমিই সেই স্বয়ং-বোধরূপিণী কাশীরূপা (২)। প্রত্যেক দেহরূপ গৃহে অন্নময়াদি পঞ্চকোষে যে বুদ্ধিরূপা ভবানী বিরাজমানা এবং সর্ব্বসাক্ষী সর্ব্বান্তর্যামী পরমাত্মা শিব বিরাজিত, যে কাশী সেই শিবশক্ত্যাত্মক, আমিই সেই স্বয়ং-বোধরূপিণী কাশীস্বরূপ (৩)। জ্ঞান দ্বারাই কাশী প্রকাশিত হয় এবং জ্ঞানরূপিণী কাশীই সকলকে প্রকাশিত করে। এই প্রকারে যিনি জ্ঞানকাশীকে বিদিত হন তিনিই কাশীলাভে সমর্থ (৪)। মনুষ্যদেহই কাশীক্ষেত্র, জ্ঞানই ত্রিভুবনজননী ও সর্ব্বব্যাপিনী গঙ্গাস্বরূপা, ভক্তি ও শ্রদ্ধাই গয়া, স্বীয় গুরুর চরণধ্যানই প্রয়াগ এবং সকললোকের মনঃসাক্ষীভূত তুরীয় ব্রহ্মই বিশ্বেশ্বর ; সুতরাং আমার দেহমধ্যে যখন সকলই রহিয়াছে, তখন আর তীর্থান্তরে কি আবশ্যক (৫)।'

কাশী বা বারাণসী ধাম পরমব্রহ্মের এক নিকেতন, ভগবান শঙ্করের আনন্দকানন। এখানে বিষ্ণুর চক্র পুষ্করিণীর অবস্থান। বারাণসী নগর নির্বাণপ্রকাশ হেতু কাশী নামে বিখ্যাত। শঙ্কর এই স্থান কখনও পরিত্যাগ করেন না বলে কাশী অবিমুক্ত ক্ষেত্র নামে প্রসিদ্ধ। অসি আর বরুণা নদীর সঙ্গমস্থান বলেই এই অবিমুক্ত ক্ষেত্রের নাম বারাণসী। এই তীর্থক্ষেত্রে দেহত্যাগই দান, দেহত্যাগই তপস্যা আর দেহত্যাগই যোগ ও নির্বাণ সুখপ্রদ। অতি বড় অপরাধীও যদি বারাণসীতে দেহত্যাগ করে তাহলে সে অনায়াসে বিষ্ণুর সেই পরম আস্পদ প্রাপ্ত হয়। সর্বপাপবিনাশক চন্দ্রতুল্য পরম পাবন বারাণসীর ধূলিকণা এত পবিত্র যে দেবগণও অতি সমাদরে মণিকর্ণিকার পবিত্র ধূলিকণা তাঁদের ললাটে ধারণ করেন।

লেখক ও সাংবাদিক সুমন গুপ্ত তাঁর 'কাশীর বিশ্বনাথ বিশ্বনাথের কাশী' গ্রন্থে লিখছেন 'একবার মহাদেব প্রজাপতি ব্রহ্মার অনুরোধে ও মন্দার পর্বতের অশেষ আরাধনায় তুষ্ট হয়ে এই পর্বতকে বরদান করেন এবং এই বরদান রক্ষায় বাধ্য হয়ে ঐ পর্বতে কিছুদিন গৌরীসহ বসবাস করতে উদ্যোগী হন। কিন্তু প্রিয়ধাম কাশী ছেড়ে অন্য একটি জায়গায় এতদিনের জন্য থাকবেন ভেবে মহাদেব কিছুতেই শান্তি পাচ্ছিলেন না। অথচ সেই মুহূর্তে কাশী ত্যাগ না করেও তাঁর উপায় নেই। দেবাদিদেব সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত নেন কাশীক্ষেত্রে তিনি লিঙ্গরূপেই অবস্থান করবেন। গৌরীকে সঙ্গে নিয়ে এরপর সশরীরে তিনি মন্দার পর্বতে এসে পৌঁছোলেন। স্থানান্তরে বসবাস করেও নিজ ক্ষেত্র কাশীকে আপনার সংসর্গ থেকে কখনও বিমুক্ত করেননি দেবাদিদেব। তাই কাশী ও এই লিঙ্গ উভয়েরই নাম 'অবিমুক্ত' বলে খ্যাত। লিঙ্গপুরাণেও এর সমর্থন মেলে—

'বিমুক্তং ন ময়া অস্মান্মোক্ষতে বা কদাচন।
সমক্ষেত্রমিদং তস্মাৎ অবিমুক্তমিতিস্মৃতম।।'

কাশীখণ্ড গ্রন্থেও বলা হয়েছে—'অবিমুক্তং মহাক্ষেত্রম ন মুক্তং সংভুনাক্কচিৎ। অবিমুক্ত এক মহাক্ষেত্র কাশী। এই অবিমুক্তেশ্বরই সকলের আদি লিঙ্গ। এর আগে জগতে কেউ কোনো শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেনি বা শিবলিঙ্গের আকৃতি কেমন তাও কেউ জানত না। স্বয়ং মহাদেব এই লিঙ্গ স্থাপন করলে যথোচিত অর্চনার পর ব্রহ্মা ও বিষ্ণু তাঁর পুজো করেন। বশিষ্ঠ, অগস্ত্য ও বিশ্বামিত্রের মতো মহর্ষিরাও অবিমুক্তেশ্বরের পুজো করেছেন বলে জানা যায়। অবিমুক্তেশ্বর সৃষ্টি হওয়ার পরই যুগে যুগে মুনি-ঋষিরা পুণ্যতীর্থ বারাণসীতে বসবাস করেন।'

তবে কাশী সম্পর্কে শেষ এবং চূড়ান্ত কথা বলে গেছেন আমাদের প্রাণের ঠাকুর, প্রাণের মানুষ ঠাকুর শ্রীপরমহংস রামকৃষ্ণদেব। ঠাকুর মথুরবাবুর সঙ্গে কাশীতে। 'শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ'-এ স্বামী সারদানন্দ লিখছেন, 'ঠাকুরের নিকট শুনিয়াছি এই তীর্থভ্রমণোপলক্ষে মথুর লক্ষ মুদ্রারও অধিক ব্যয় করিয়াছিলেন। মথুর কাশীতে আসিয়াই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে প্রথমে মাধুকরী দেন; পরে একদিন তাঁহাদিগকে সপরিবারে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া পরিতোষপূর্বক ভোজন, প্রত্যেককে এক একখানি বস্ত্র ও এক এক টাকা দক্ষিণা দেন।...নৌকোযোগে বারাণসী প্রবেশকাল হইতেই ঠাকুর ভাব-নয়নে দেখিতে থাকেন শিবপুরী বাস্তবিকই সুবর্ণনির্মিত—বাস্তবিকই ইহাতে মৃত্তিকা প্রস্তরাদির একান্ত অভাব—বাস্তবিকই যুগ-যুগান্তর ধরিয়া সাধু-ভক্তগণের কাঞ্চনতুল্য সমুজ্জ্বল, অমূল্য হৃদয়ের ভাবরাশি স্তরে স্তরে পুঞ্জীকৃত ও ঘনীভূত হইয়া ইহার বর্তমান আকারে প্রকাশ। সেই জ্যোতির্ময় ভাবঘন মূর্তিই ইহার নিত্য সত্যরূপ—আর বাহিরে যাহা দেখা যায় সেটা তাহারই ছায়ামাত্র।...বারাণসী সর্বদা সুবর্ণময় দেখিতে পাইয়া শৌচাদি করিয়া সুবর্ণকে অপবিত্র করিতে হইবে বলিয়া বালকস্বভাব ঠাকুর প্রথম প্রথম ভাবিয়া আকুল হইয়াছিলেন। তাঁহার শ্রীমুখে শুনিয়াছি, এজন্য তিনি মথুরকে বলিয়া পালকির বন্দোবস্ত করিয়া কয়েকদিন অসীর পারে গমন ও তথায় (বারাণসীর বাহিরে) শৌচাদি সারিয়া আসিতেন।...কাশীতে আর একটি বিশেষ দর্শনের কথা আমরা ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছিলাম। বারাণসীর মণিকর্ণিকাদি পঞ্চতীর্থ দর্শন করিতে অনেকেই গঙ্গাবক্ষে নৌকাযোগে যাইয়া

থাকেন। মথুরও ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া তদ্রূপে গমন করিয়াছিলেন। মণিকর্ণিকার পাশেই কাশীর প্রধান শ্মশানভূমি। মথুরের নৌকা যখন মণিকর্ণিকা ঘাটের সম্মুখে আসিল তখন দেখা গেল শ্মশান চিতাধূমে ব্যাপ্ত —শবদেহসকল সেখানে দাহ হইতেছে। ভাবময় ঠাকুর সহসা সেদিকে দেখিয়াই একেবারে আনন্দে উৎফুল্ল ও রোমাঞ্চিত কলেবর হইয়া নৌকার বাহিরে ছুটিয়া আসিলেন এবং একেবারে নৌকার কিনারায় দাঁড়াইয়া সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। মথুরের পাণ্ডা ও নৌকার মাঝি-মাল্লারা জলে পড়িয়া স্রোতে ভাসিয়া যাইবে ভাবিয়া ঠাকুরকে ধরিতে ছুটিল। কিন্তু কাহাকেও আর ধরিতে হইল না; দেখা গেল ঠাকুর ধীর স্থির নিশ্চেষ্টভাবে দণ্ডায়মান আছেন এবং এক অদ্ভুত জ্যোতিঃ ও হাস্যে তাঁহার মুখমণ্ডল সমুদ্ভাসিত হইয়া যেন সে স্থানটিকে শুদ্ধ জ্যোতির্ময় করিয়া তুলিয়াছে। মথুর ও ঠাকুরের ভাগিনেয় হৃদয় সাবধানে ঠাকুরের নিকট দাঁড়াইয়া রহিলেন, মাঝি-মাল্লারাও বিস্ময়পূর্ণনয়নে ঠাকুরের অদ্ভুত ভাব দূরে দাঁড়াইয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।'

ঠাকুর সেদিন কোন অলৌকিক দৃশ্য দেখে ওইরকম ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন! কাশীর প্রকৃত স্বরূপ তাঁর সামনে সেই মুহূর্তে উন্মোচিত হয়েছিল। 'কাশীখণ্ডে' বলা আছে এই স্থানে মৃত্যু হলে বিশ্বনাথ জীবকে নির্বাণপদবী দিয়ে থাকেন। অর্থাৎ তাঁর আর জন্ম হবে না। তিনি তখন শুদ্ধ-মুক্ত। বিশ্বনাথ জীবকে কীভাবে মুক্ত করেন সে কথা কোনও শাস্ত্রে লেখা নেই। শাস্ত্রের অতীত, ঈশ্বর রামকৃষ্ণদেব সেদিন সেই দৃশ্যটি দেখে ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। শাস্ত্রে যা কখনও লেখা হয়নি সেই সত্যটি বাবা বিশ্বনাথ ও মা ভবতারিণী ঠাকুরের শ্রীমুখ দিয়ে বলিয়েছিলেন। যা আজ শাস্ত্রের চেয়েও অধিক প্রত্যক্ষ ও ভাবগম্ভীর। আমাদের প্রাণের ঠাকুর কী দেখেছিলেন—মণিকর্ণিকার ঘাটে দাঁড়িয়ে আছেন দীর্ঘদেহী শিব। সেখানে তখন চলছে শিব ও শক্তির অপূর্ব খেলা। তাঁর বর্ণনায়—'জগতের গম্ভীর নিয়ে। সারি সারি চিতা জ্বলছে।' ঠাকুর দেখছেন ভস্মাচ্ছাদিত বিপুল দেহ নিয়ে মহাদেব চিতায় শায়িত জীবের কানে তারকব্রহ্ম নাম শোনাচ্ছেন। আর পরক্ষণেই মহামায়ীকালী চিতায় আরোহণ করে জীবকে অষ্টপাশ মুক্ত করে মুক্তির আকাশে ধোঁয়ায় উড়িয়ে দিচ্ছেন। অহোঃ, শাস্ত্র যা কখনও জানায়নি, সেই কথাটি কত সুন্দরভাবে ঠাকুর আমাদের হৃদয়শাস্ত্রে খোদাই করে দিয়ে গেলেন। এইজন্যই তিনি ধনীর ঠাকুর, দরিদ্রের ঠাকুর, জ্ঞানীর ঠাকুর, অজ্ঞানীর ঠাকুর—তিনি আমাদের পরমপ্রিয় পরমহংসদেব, চিরঠাকুর।

দুই মহাসাধকই তখন কাশীতে। ত্রৈলঙ্গস্বামী তখন তাঁর ভক্ত মঙ্গলভট্টজির গৃহে অবস্থান করছেন। সারাদিন তিনি ঘুরে বেড়ান কাশীর বিভিন্ন ঘাট ও শ্মশানে। স্বামীজি তখন মৌনী ও অজগর বৃত্তি ধারণ করেছেন। নিজের হাতে তিনি কিছুই খান না। কেউ কিছু খাইয়ে দিলে পরমানন্দে সেই খাদ্য গ্রহণ করেন। আমাদের প্রাণের ঠাকুরের খুব ইচ্ছা তিনি একবার স্বচক্ষে কাশীর সচল বিশ্বনাথ ত্রৈলঙ্গস্বামীকে দর্শন করবেন। তিনি তাঁর মনের কথা মথুরবাবুকে জানালেন। অদ্ভুত এক টিউনিং ছিল এই দুজনের মধ্যে। ভক্ত ও ভগবান নয়, দুজনে যেন প্রাণের বন্ধু, ভগবান ও বন্ধুর মনের ভাষা, মনের কথা মথুরবাবুর থেকে ভালো কেউ বুঝতে পারতেন না। তিনি বললেন, আপনি কোনও চিন্তা করবেন না। স্বামীজি এখন কোথায় আছেন তার খোঁজ আমি নিয়ে নিচ্ছি। তারপর আপনাকে নিয়ে যাব। ঠাকুর একগাল হেসে বলেছিলেন, 'হ্যাঁগো! তাই হবে!'

স্বামী সারদানন্দজি লিখছেন, ''কাশীতে অবস্থান কালে ঠাকুর এখানকার খ্যাতনামা সাধুদেরও দর্শন করিতে যান। তন্মধ্যে ত্রৈলঙ্গ স্বামীজিকে দেখিয়াই তাঁহার বিশেষ প্রীত হইয়াছিল। স্বামীজির অনেক কথা ঠাকুর অনেক সময় আমাদিগকে বলিতেন। বলিতেন, 'দেখলাম, সাক্ষাৎ বিশ্বনাথ তাঁহার শরীরটা আশ্রয় করে প্রকাশিত হয়ে রয়েছেন। উঁচু জ্ঞানের অবস্থা। শরীরের কোনো হুঁশই নাই, রোদে বালি এমন তেতেছে যে পা দেয় কার সাধ্য—সেই বালির উপরেই সুখে শুয়ে আছেন। পায়েস রেঁধে নিয়ে গিয়ে খাইয়ে দিয়েছিলাম। তখন কথা কন না—মৌনী।' (শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ)

বাংলা ১২৭৬ সন, ইংরেজি ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দ। এই সালটিকে ঘিরে কিছু মতান্তর রয়েছে। শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণকথামৃত গ্রন্থে বলা হয়েছে ত্রৈলঙ্গ স্বামীর সঙ্গে ঠাকুরের দেখা হয়েছিল, ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি

মাসে। সে যাই হোক, ঠাকুর ত্রৈলঙ্গ স্বামীজিকে দর্শন করতে যান। সেইসময় সদ্য হিমালয় থেকে কাশীতে ফিরে এসেছেন স্বামীজির মানসকন্যা ও শিষ্যা শঙ্করী মাতাজি। তিনি তখন ত্রৈলঙ্গ স্বামীজির বেদির নীচে গুহাকৃতি সাধনকক্ষে বসবাস করতেন। শ্রীশ্রী শঙ্করী মাতাজি সেই ক্ষণটির খুব সুন্দর বর্ণনা আমাদের জন্য রেখে গেছেন। ঠাকুর ত্রৈলঙ্গ স্বামীজির সম্মুখে। তাঁকে দেখেই স্বামীজি মাতাজির গুরুভাই ও তাঁর একান্ত সেবক মঙ্গল ভট্টকে ইঙ্গিতে শঙ্করী মাতাজিকে ডেকে দিতে বললেন। মঙ্গল ভট্টজি মাতাজির ঘরে প্রবেশ করে বললেন, একজন বাঙালি সাধু এসেছেন, বাবা তাই আপনাকে ডাকছেন। গুরুর আদেশ। তিনি তাড়াতাড়ি ওপরে উঠে এলেন। তিনি দেখলেন, 'একজন শুভ্রকান্ত উজ্জ্বলদ্যুতি বিশিষ্ট বাঙালি পরমহংস বাবা ত্রৈলঙ্গ স্বামীজির সহিত আলাপ করিতেছেন। তাঁহার সহিত অপর একজন বাঙালি ভদ্রলোক 'শামলা' (তৎকালীন অভিজাতগণের মস্তকের এক রকম বিশিষ্ট পাগড়ি) পরিহিত ছিলেন, পরে জানিতে পারিয়াছিলেন তিনিই দক্ষিণেশ্বরের মালিক 'রাণী রাসমণির জামাতা মথুরবাবু'।

ঠাকুরের সঙ্গে স্বামীজির সমস্ত কথাবার্তা শঙ্করী মাতাজির সামনেই হয়েছিল। তবে পুরোটাই আকারে ইঙ্গিতে—

ঠাকুর—ভগবান এক না দুই?

স্বামীজি—যখন সাধকের মন আত্মাতে বিলীন হয়ে যায়—সমাধি মগ্ন হয়—তখন 'এক' ভিন্ন দুই আর থাকে না, তাকেই অদ্বৈতবাদ বলা হয়। আবার মন যখন ভগবানের অন্বেষণে সাধনায় নিয়োজিত হয় তখন 'দুই' অর্থাৎ (১) ভক্ত ও (২) ভগবান : ইহাকেই দ্বৈতবাদ বলা হয়। তাই বলতে পারা যায় ভগবান এক ও দুই। তবে বস্তুত ভগবান এক। দুইটি দানা-যুক্ত সম্পূর্ণ ছোলা হল এর প্রকৃত দৃষ্টান্ত।

ঠাকুর—ধর্ম কী?

স্বামীজি—সত্য।

ঠাকুর—জীবের কর্ম কী?

স্বামীজি—জীব সেবা।

ঠাকুর—প্রেম কী?

স্বামীজি—ভগবানের নামে তন্ময় হওয়ার পর যখন চোখে জল আসে, সেই অবস্থার নামই প্রেম।

শঙ্করী মাতাজি পরবর্তীকালে বলেছেন, 'এইসকল মর্মস্পর্শী কথা শুনে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের 'ভাবসমাধি' হয়ে গেল। তাঁর দুই চোখ দিয়ে অবিরল প্রেমাংশু পড়তে লাগল। তিনি আরও লিখছেন, 'তাঁর চক্ষুর বহির্প্রান্ত ভাগ দিয়া মুক্তধারাবৎ গণ্ডস্থল প্লাবিত করিয়া চিবুকে পতিত হইতে লাগিল। (চক্ষুর অন্তরভাগ ও নাকের পাশ দিয়া শোকে দুঃখে 'শোকাশ্রু' বর্ষিত হয়)।'

ভাবে বিহ্বল ঠাকুরকে দেখে স্বামীজিও আপ্লুত। তিনি ইঙ্গিতে মাতাজিকে রামকৃষ্ণদেবের মাথায় পাখার বাতাস করার নির্দেশ দিলেন। কিছুক্ষণ বাদে ঠাকুরের সমাধি ভঙ্গ হল। তিনি স্বামীজির আসন-বেদি প্রদক্ষিণ করে দুই হাত তুলে নাচতে লাগলেন। পরে তিনি মথুরবাবুকে দিয়ে আধমন ক্ষীর আনিয়ে নিজের হাতে স্বামীজিকে খাইয়ে দিয়েছিলেন। এখানেও ক্ষীর ও পায়েসের মতান্তর। স্বামী সারদানন্দজি বলেছেন পায়েস। আর অন্য গ্রন্থে আছে ক্ষীর। এক্ষেত্রে দুধটা অবশ্য কমন।

শঙ্করী মাতাজি লিখছেন, 'উভয়েই প্রেমানন্দরূপ সচ্চিদানন্দ সাগরে ভাসিতে লাগিলেন। তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে একই আত্মরাজ্যে অবস্থিতিজনিত অন্তর্নিহিত ভাষায় আরও অনেক কথাবার্ত্তাদি হইয়াছিল কিন্তু তাহার প্রকৃত মর্ম উপস্থিত অন্যান্য লোকে ধারণা করিতে ও বুঝিতে পারিলেন না।'

কাশীর সচল বিশ্বনাথ ত্রৈলঙ্গ স্বামীজি সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রিয় শিষ্য স্বামী অদ্ভুতানন্দজি (লাটু মহারাজ) অদ্ভুত সুন্দর কথা বলে গিয়েছেন—'ত্রৈলঙ্গস্বামী কি অমনি হয়? কত খাটুনি খেটে তবে হয়েছে। তপস্যা চাই! তপস্যা! কঠোর তপস্যা। তবে যদি অমন হওয়া যায়।'

শ্রীশ্রীঠাকুরের মানসপুত্র রাখাল মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দজি) ত্রৈলঙ্গস্বামী প্রসঙ্গে সুন্দর একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন—'একটি লোক ত্রৈলঙ্গ স্বামীজির নিকট গিয়াছিল। তাঁকে দেখে ভাবলে, ইনি কথা বলেন না, এঁর কাছে গিয়ে আর কি ফল? এই ভেবে সেদিন ফিরে গেল। অন্য আর একদিন এসে তাঁর কাছে কিছুক্ষণ বসে রইল। সেদিন দেখলে, স্বামীজি অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে কাঁদছেন। কতক্ষণ পরে আবার খুব হাসি। তাঁর এই ভাব দেখে সেই লোকটি তখন বলেছিল,—'আজ যা শিখলুম সহস্র পুস্তক পাঠেও তা হত না। ভগবানের জন্য যখন এরূপ ব্যাকুলতা আসবে তখনই তাঁর দর্শন পাব, এমনি আনন্দলাভ করব।' (ধর্ম্মপ্রসঙ্গে-স্বামী ব্রহ্মানন্দ)।

শ্রীম কথিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত গ্রন্থে ঠাকুর বারেবারে বিভিন্ন সময়ে কাশীর সচল বিশ্বনাথ ত্রৈলঙ্গ স্বামীজির প্রসঙ্গ টেনে এনে নানা কথা বলেছেন, 'ঠাকুর ছোট খাটটির উপর গিয়া নিজের আসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন। সর্বদাই ভাবে পূর্ণ। ভাবচক্ষে রাখালকে দর্শন করিতেছেন। রাখালকে দেখিতে দেখিতে বাৎসল্যরসে আপ্লুত হইলেন; অঙ্গে পুলক হইতেছে। এই চক্ষে কি যশোদা গোপালকে দেখিতেন?'

এরপর তিনি বলেছিলেন—'যতক্ষণ জীব, জগৎ, আমি, তুমি—এ সব বোধ থাকে। যখন ঠিক ঠিক এক জ্ঞান হয় তখন চুপ হয়ে যায়। যেমন ত্রৈলঙ্গ স্বামী।'

মণি মল্লিক কাশীধামে গিয়েছিলেন। ব্যবসায়ী লোক। কাশীতে তাঁদের কুঠি আছে। তিনি কাশী থেকে ফিরে ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছেন। শ্রীম-র বর্ণনায়,

'শ্রীরামকৃষ্ণ—হ্যাঁগা, কাশীতে গেলে, কিছু সাধু-টাধু দেখলে?

মণিলাল—আজ্ঞে হাঁ, ত্রৈলঙ্গ স্বামী, ভাস্করানন্দ—এঁদের সব দেখতে গিছলাম।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কীরকম সব দেখলে বলো?

মণিলাল—ত্রৈলঙ্গ স্বামী সেই ঠাকুরবাড়িতেই আছেন, মণিকর্ণিকার ঘাটে বেণীমাধবের কাছে। লোকে বলে, আগে তাঁর উচ্চ অবস্থা ছিল। কত আশ্চর্য আশ্চর্য কার্য করতে পারতেন। এখন অনেকটা কমে গেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ও-সব বিষয়ী লোকের নিন্দা।

মণিলাল—ভাস্করানন্দ সকলের সঙ্গে মেশেন, ত্রৈলঙ্গ স্বামীর মতো নয়—একেবারে কথা বন্ধ।'

বেলঘরের ভক্তদের উপদেশ দিতে গিয়ে ঠাকুর ত্রৈলঙ্গস্বামীর প্রসঙ্গ টেনে এনে বলেছিলেন, 'ত্রৈলঙ্গ স্বামী বলেছিল, বিচারে অনেক বোধ হচ্ছে সমাধির পর শেষে একুশদিনে মৃত্যু হয়।'

আবার নিরাকারবাদী ও সাকারবাদী প্রসঙ্গে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন, 'নিরাকারবাদী আবার সাকারবাদী। নিরাকারবাদী যেমন ত্রৈলঙ্গ স্বামী। এঁরা আপ্তসারা—নিজের হলেই হল।'

শঙ্করী মাতাজি ভৈরবী ব্রাহ্মণী সম্পর্কে নতুন একটি তথ্য দিয়েছেন, তিনি লিখছেন, ''শ্রীশ্রী যোগেশ্বরী মা, ইনিই সুপ্রসিদ্ধা ভৈরবী মা বা ব্রাহ্মণী মা বলিয়া পরিচিতা। তিনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে তাঁহার ছাব্বিশ বৎসর বয়েসে—বাংলা ১২৬৮ সনের প্রথম ভাগে, সর্ব্বপ্রথমে দিব্যোন্মাদ অবস্থায় দেখেন। তিনি গুরুদেব বাবা ত্রৈলঙ্গ স্বামীজির আদেশেই বঙ্গদেশের তিন জন মহাপুরুষকে চিনিয়া বাহির করিয়া দীক্ষা দিবার জন্য পরিভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। তিনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দেখার পরেই সকল আত্মীয়স্বজনকে আশ্বাসদানে পরিতুষ্ট করেন এবং (১) প্রথম পরমহংসদেবকে তান্ত্রিক সাধনা মার্গে দীক্ষিত করিয়াছিলেন এবং তদনন্তর তিনি মাতৃসাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। অবশেষে পরমহংসদেব দক্ষিণেশ্বরের রাণী রাসমণির কালী বাড়িতেই অদ্বৈত মতে সোহংবাদী সুপ্রসিদ্ধ শ্রীশ্রী স্বামী তোতাপুরী মহারাজ কর্তৃক বিশিষ্টভাবে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন—ইহা সর্বজনবিদিত। প্রথম অংশটির উক্তি বিষয়ক বিবরণ বোধহয় অনেকেই অবগত নহেন, তাই ঘরের সঠিক খবর লেখা হইল। অপর দুইজন মহাপুরুষের মধ্যে (২) দ্বিতীয় জন হলেন 'শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী' এবং (৩) তৃতীয়জন হলেন 'শ্রী বেণীমাধব গাঙ্গুলি'। ইহারা উভয়েই বাবা ত্রৈলঙ্গ স্বামীজির নিকট হইতেই যোগদীক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।'' অর্থাৎ স্বামী ত্রৈলঙ্গস্বামীর নির্দেশেই ভৈরবী মা ঠাকুরের সাধনপথের কাণ্ডারী হতে এসেছিলেন। ঠাকুর তাঁকে 'বামনী' বলে ডাকতেন।

কাশীতে ভৈরবী ব্রাহ্মণী যোগেশ্বরীর সঙ্গে আবার ঠাকুরের দেখা হয়েছিল। তিনি সেখানে মোক্ষদা নামের এক ভক্তিমতী রমণীর সঙ্গে চৌষট্টি-যোগিনী পল্লীতে থাকতেন। ঠাকুর তাঁর বাড়িতে বেশ কয়েকবার গিয়েছিলেন। ঠাকুরের সঙ্গেই তিনি বৃন্দাবনে যান। ঠাকুর তাঁকে সেখানেই থাকতে বলেছিলেন। এবং বৃন্দাবনেই তিনি দেহ রাখেন।

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' গ্রন্থে ভৈরবী মা সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'ভৈরবী ব্রাহ্মণী—যশোহর জেলার বিদুষী ব্রাহ্মণ কন্যা—প্রকৃত নাম যোগেশ্বরী। ইনি শ্রীশ্রীঠাকুরের তন্ত্র সাধনার গুরু। ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে আনুমানিক চল্লিশ বৎসর বয়েসে তিনি দক্ষিণেশ্বরে আসেন। শ্রীশ্রীঠাকুরকে ইনি চৌষট্টি প্রকার তন্ত্রসাধনা করান এবং ঠাকুরকে অবতার বলিয়া ঘোষণা করেন। ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে ইনি ঠাকুরের সহিত কামারপুকুরে গিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমাও যোগেশ্বরীকে শ্বশ্রুমাতার মতোই সেবা করিতেন। কামারপুকুর হইতে তিনি কাশী গমন করেন এবং শেষ জীবন কাশী ও বৃন্দাবনে অতিবাহিত করেন।'

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মতোই বাংলার এক প্রখ্যাত তন্ত্রসাধক তারাপীঠের তারামায়ের সুবোধ সন্তান বামদেব বা বামাক্ষ্যাপার সঙ্গেও ত্রৈলঙ্গস্বামীর দেখা হয়েছিল। আমার পিতামহ প্রয়াত শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ছোট মামা তন্ত্রসাধক, শ্রীশ্রীবামাক্ষেপা বাবার অন্যতম খ্যাতিমান প্রধান শিষ্য শ্রীমৎ তারানাথ ব্রহ্মচারীর (তারাক্ষেপা) শিষ্য, তারাপীঠের 'বামদেব সংঘ'-এর প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মা সুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'তারাপীঠ ভৈরব'-এ দুই সাধকের মিলন দৃশ্যের কথা সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখছেন, ''সব ঠিক ঠাক কালই সকালের গাড়ীতে ব্রজবাসী ও মোক্ষদানন্দ যাত্রা করবেন কাশী তারপর যাবেন হরিদ্বার। আয়োজনের কিছুই নেই, এক লোটা আর কম্বল। এ তো বদ্ধজীব সংসারীদের যাত্রা নয়, যে ডেও-ঢাকনি, লেপ, কাঁথা, প্যাঁটরা, পুটলী নিয়ে ব্যতিব্যস্ত, তারপর চ্যাঁ-ভ্যাঁ-ট্যাঁ ত কোলেই আছেন। এ হোল সাধু সন্ন্যাসী সর্ব্বত্যাগী—এক কোপনি আর আপনি। সারারাত তারামায়ের নাম সুধা আস্বাদন করে বেশ শান্তিতে ঘুমোচ্ছেন ক্ষেপা শিমূলতলায় শ্মশান মায়ের কোলে। দেখলেন স্বপ্ন, গুরুদ্বয় চললেন কাশী। আমিও যাব বলে আব্দার ধরলেন শিষ্য গুরুর কাছে। বাধা দিলেন তারামা : যেমন মা ছেলেকে ভোলায় পাছে বিপদ ঘটে। আদর করে মা বল্লেন, ''আমায় ছেড়ে যাসনি বামা, তোর তাতে খুব কষ্ট হবে।'' ''না মা তুমি আমায় বাধা দিও না, আমার বড় ইচ্ছে একবার মা অন্নপূর্ণাকে দেখে আসি।'' মা কিছুতেই যেতে দিতে রাজী নন, কিন্তু ছেলে নাছোড়বান্দা, শেষে মা বল্লেন, ''আচ্ছা যাবি যা কিন্তু তোর খুব কষ্ট হবে। তোর ওখানে ভাল লাগবে না।'' স্বপ্ন ভেঙে গেল, ক্ষেপাও জেগে উঠলেন। শিমূলতলা ত্যাগ করে চললেন গুরুর সন্ধানে।

"মন যেতে চাও কেন কাশী,
ও তুই পাবিরে ফল ঘরে বসি।" (প্রেমিক)

''তুই কাশী গিয়ে কি করবি?'' জিজ্ঞাসা করলেন ব্রজবাসী ক্ষেপাকে। কাকুতি মিনতি করে বল্লেন ক্ষেপা, ''আমার বড় ইচ্ছে শ্রীগুরুবাবা, একবার অন্নপূর্ণা মাকে দেখি।'' ''আচ্ছা এখন যা যাবার সময় তোকে ডেকে নিয়ে যাব।''

ক্ষেপা শিমূলতলায় এসে তারামার ধ্যানে মনোনিবেশ করলেন। দেখতে দেখতে রাত্রিটা কেটে গেল। ঊষার আলোকে সাধু সন্ন্যাসীরা আসন ত্যাগ করে প্রাতঃস্নানে রত। ব্রজবাসী ও মোক্ষদানন্দ কাশী যাত্রার জন্য মায়ের প্রাতঃপূজায় ব্যস্ত কিন্তু ক্ষেপা তখনও শিমূলতলায় সমাসীন।

বেলা ৯টায় গাড়ি, তারাপীঠ হতে ষ্টেশন প্রায় সাড়ে তিন ক্রোশ পথ, পদব্রজে যাওয়া ছাড়া অন্য কোন সুবিধা নেই। গো-শকট পাওয়া যায়, কিন্তু ডিস্ট্রীক্ট বোর্ডের জীর্ণ কদর্য্য রাস্তায় নিরীহ পশুদের প্রাণান্ত হয়। ঠিক সময়ই ক্ষেপা আসন ত্যাগ করে শৌচ সমাপন করে গুরুর সামনে উপস্থিত হলেন। তারামাকে বার বার প্রণাম করে যাত্রা করলেন গুরু-সমভিব্যাহারে। পথে ধর্ম্মরাজ, দেখুলের কালীবাড়ি পার হয়ে ''তারা'' নাম

করতে করতে পৌঁছলেন তাঁরা রামপুরহাট ষ্টেশনে। ব্রজবাসী তিনখানি টিকিট কিনলেন কাশীধামের। কিছুক্ষণ পরেই গাড়ী এসে থামলো ষ্টেশনে। ব্রজবাসী ক্ষেপার হাত ধরে গাড়ীতে উঠলেন।

কামরাখানি পরিষ্কার ও ঝকঝকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন ক্ষেপা ব্রজবাসীকে, ''আচ্ছা শ্রীগুরুবাবা! এ ঝক-ঝকে তক-তকে রথ কে করেছে?'' ''এ বিশ্বকর্ম্মা বাবারা করেছে,'' গম্ভীর-ভাবে উত্তর দিলেন ব্রজবাসী। ''তা হলে তো শ্রীগুরুবাবা, আমার বিশ্বকর্ম্মা বাবারা তো খুব ওস্তাদ।'' বেদজ্ঞ মোক্ষদানন্দ বললেন, ''হ্যাঁরে ক্ষেপা।'' ষ্টেশনের উপর দণ্ডায়মান গার্ড সাহেবকে আর একটি সাহেবের সঙ্গে ইংরাজী ভাষায় কথা বলতে দেখে ক্ষেপা আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন, ''আচ্ছা বেদজ্ঞবাবা, ঐ ধব ধবে, গব গবে, পিরান-পরা গট-মট করে যে কথা বলছে, ওরা কারা?'' মৃদু হাস্যে উত্তর দিলেন বেদজ্ঞ, ''ওরা সাহেব-বাবারা, ওরাই বিশ্বকর্ম্মার জাত, এখন বুঝতে পেরেছিস ত?'' ''তাহলে ত বেদজ্ঞ বাবা, আমার সাহেব বাবারা তো খুব বুজরুগ আছে।'' ক্ষেপার কথা শুনে মুচকে হাসলেন গুরুদ্বয়। নীল পতাকা দেখিয়ে বাঁশী বাজালেন গার্ড সাহেব। ক্ষেপা মনে মনে ভাবলেন, সাহেব বাবারা তারামায়ের ভক্ত, তাই ঘণ্টা বাজিয়ে তারামায়ের পূজা করছে! গাড়ী ত ছাড়লো, কিন্তু পূজার প্রসাদ ত সাহেব বাবারা দিলো না। তাই ক্ষেপা জিজ্ঞাসা করলেন, ''কৈ শ্রীগুরুবাবো, বুজরুগ সাহেব বাবারা যে ঘণ্টা বাজিয়ে তারামা'র পূজা করলে, তা আমাদের একটু প্রসাদ ত দিলে না?'' ব্রজবাসী বিরক্তভাবে বল্লেন, ''আর তুই আমাদের বকাসনি।''

ব্রজবাসী ও মোক্ষদানন্দ কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়লেন, ক্ষেপা জানালার ধারে চুপ করে বসে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখতে লাগলেন। মাঠ, ঘাট, পাহাড়, পর্বত, নদী, নালা, গাছ-গুল্ম পিছনে রেখে ছুটলো গাড়ি দ্রুতবেগে। ছোট ছোট ষ্টেশন পার হয়ে গাড়ী থামলো ভাগলপুরে। টিকিট চেকার উঠলো কামরায়। ব্রজবাসী ও মোক্ষদানন্দ বেশ ঘুমুচ্ছেন, ক্ষেপাই কেবল জেগে বসে একবার এদিক একবার ওদিক দেখছেন। চেকার টিকিট দেখতে চাইল, ক্ষেপা বল্লেন, ''টিকিট নেই।'' চেকার জোর করে নামিয়ে দিলো ক্ষেপাকে গাড়ী থেকে। বেশ একটা গোলমালের সৃষ্টি হোল টানা-টানিতে। ব্রজবাসী জেগে উঠলেন গোলমালে। ক্ষেপাকে গাড়ীর মধ্যে না দেখে তিনি নেমে টিকিট দেখালেন। সব গোলমাল মিটে গেল। তাঁকে নিয়ে ব্রজবাসী উঠলেন গাড়ীর মধ্যে এবং নিজের পাশে রাখলেন। পরদিন প্রভাতে গাড়ী পৌঁছলো কাশীধামে।

যাত্রীর ভিড় দেখে ক্ষেপার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। আপন মনে তিনি বকতে লাগলেন, ''ওরে বাবা কত লোক, কি দুর্গন্ধ, আমার পিত্তি শুকিয়ে আসছে; এই বুঝি অন্নপূর্ণার স্বর্গরাজ্য, আমার তারামা'র রাজ্যই ভাল, কেমন আলো বাতাস, কত বড় শ্মশান, সব ঝক-ঝক তক-তক করছে; এত ভীড়ও নেই।'' ''তুই এলি কেন, তোকে ত বারণ করেছিলুম; শ্মশান ছেড়ে তোর এ জায়গা ভাল লাগবে না। একটু কষ্ট করে এক সপ্তাহ থাক, বেদজ্ঞ হরিদ্বার থেকে ফেরবার পথে তোকে তারামা'র রাজ্যে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে,''—বল্লেন ব্রজবাসী। একটা ছোট আশ্রমে উঠলেন তাঁরা দিনকতকের জন্যে। রাত্রের গাড়ীতে ব্রজবাসী, মোক্ষদানন্দ যাত্রা করলেন হরিদ্বার। আশ্রমে রইলেন ক্ষেপা একলা।

সে দিনটা কাটলো পথশ্রান্তিতে। একখানি কম্বল বিছিয়ে ক্ষেপা শুয়ে পড়লেন, ক্ষিদে পেয়েছে কিন্তু এক কৌপিন ছাড়া ক্ষেপার কাছে একটি কানাকড়িও নেই যে কিছু কিনে খাবেন। দু'একজন সাধু সন্ন্যাসী, যাঁরা আশ্রমে যাতায়াত করছেন, তাঁদের গেরুয়া বসন, মাথায় জটা, গলে তুলসী বা রুদ্রাক্ষমালা, কারো কপালে তিলক-কাটা। ক্ষেপাকে নিশ্চয়ই তাঁরা ভেবেছেন, হয় ভিখারী, না হয় পাগল, তাই আহার হয়েছে কিনা কোন কথাই তাঁরা কেউ জিজ্ঞাসা করেননি। শ্রান্তিতে কেটে গেল দিনটা আশ্রমে। সন্ধ্যা এলো, বাবা বিশ্বনাথের মন্দিরে ঢাক, ঢোল ও ঘণ্টা বেজে উঠলো, পঞ্চক্রোশী স্বর্গরাজ্য কাশীধাম ''হর হর ব্যোম ব্যোম'' ''জয় বিশ্বনাথজি কি জয়'' শব্দে মুখরিত হল। মাঝে মাঝে ''রাম-নাম সত্য'' শব্দে ঘটা করে সাজান শব চলেছে মণিকর্ণিকার ঘাটে পতিতপাবনী ভাগীরথীর তীরে।

শাস্ত্র বলেন এখানে দেহত্যাগ করলে শিবপ্রাপ্তি হয়, তাই খুব ভাগ্যবান যাঁরা তাঁদেরই ঐভাবে ঘটা করে নিয়ে যাওয়া হয়। ইচ্ছে করলেই যে ওখানে দেহত্যাগ করা যায়, তা যায় না। বাংলাদেশের অনেক বৃদ্ধ-বৃদ্ধা

শিবের পদ পাবার লোভে কাশীবাসী হয়েছেন, কিন্তু শেষ অবধি দেখা গেছে যে, তাঁদের অধিকাংশই বহুদিন কাশীতে বাস করে মৃত্যুর সময় অন্য জায়গায় দেহত্যাগ করেছেন। এখানে বুঝতে হবে, ''নিয়তি কে ন বাধ্যতে।''

রাত্রি অনেক হল, কিন্তু বোঝার উপায় নেই কত রাত্র। সারারাত্রি হৈচৈ আর জয় বিশ্বনাথের শব্দে কাশীধাম মুখরিত। ক্ষেপার বেশ ক্ষিদে পেয়েছে, পেলেই বা কি হবে, উপায় তো কিছুই নেই, তাই আপন মনে বল্লেন ক্ষেপা, ''ছ্যা ছ্যা, এই বুঝি মা অন্নপূর্ণার স্বর্গরাজ্য, মা অন্নপূর্ণার কত দানের কথা শুনি, এই তো বাবা সেই কাল চারটি তারামা'র প্রসাদ খেয়ে এসেছি, এখনও পর্যন্ত ত কেউ একটু জলও খেতে দিলে না। মা অন্নপূর্ণার বুঝি এই দান, কাজ নেই বাবা, আমার বদ কাশীতে, আমার তারামা'র রাজ্যই ভাল।'' ক্ষুধায় কাতর ক্ষেপা আপন মনে বকতে বকতে নিশীথিনীর কোলে ঘুমিয়ে পড়লেন। এক অজানা বৃদ্ধা হাতে একটি খাবারের ঠোঙা নিয়ে ঘুম ভাঙ্গালেন ক্ষেপার, মায়ের প্রসাদ খাওয়াবার জন্যে ঠোঙাটি একপাশে রেখে বলে গেলেন বৃদ্ধা, ''এই মায়ের প্রসাদ রইলো, উঠে খাও।'' প্রসাদের কথা শুনে ক্ষেপা ধড়মড়িয়ে উঠে পুরী, পেঁড়া, ফল-পাকড় খাচ্ছেন আর মুচকে হেসে বলছেন, ''বেটি বোধ হয় শুনতে পেয়েছে, তুমি মা অন্নপূর্ণাই হও, আর যেই হও, তোমার কাশী কিন্তু বদ।'' বেশ পেট ভরে খেয়ে ক্ষেপা শুয়ে পড়লেন, কিন্তু মলত্যাগের বেগ আসাতে ঘুমোতে পারলেন না, পায়খানায় গেলেন। চিরকাল ফাঁকা জায়গায় মল-মূত্র ত্যাগ করা অভ্যাস, সেই জয়গায় সান-বাঁধান ঘরের মধ্যে মল-মূত্রত্যাগের স্থান দেখে ক্ষেপা পড়লেন ভীষণ ফাঁপরে। ঠিক যে কোথায় মলত্যাগ করতে হবে তা অজ্ঞাত থাকায়, মলত্যাগ করলেন প্রস্রাবের জায়গায়। মলমূত্র ত্যাগ করে ক্ষেপা নিদ্রা গেলেন।

যখন ক্ষেপা গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত, সেই সময় স্বপ্ন দেখলেন মা অন্নপূর্ণা বলছেন, ''তুই অত নেমকহারাম কেন? আমি নিজে তোকে প্রসাদ দিয়ে এলুম, তাতেও আমার স্বর্গরাজ্য কাশীধামের নিন্দা করিস?''

অভিমান ভরে উত্তর দিলেন ক্ষেপা, ''তুমি মা অন্নপূর্ণাই হও, আর শিবই হও, তোমার কাশী কিন্তু বদ। কি দুর্গন্ধ, কত লোক, বাপরে বাপ আমার প্রাণ বায়ু শুকিয়ে যাচ্ছে, আমার তারামা'র রাজ্য কত সুন্দর, এতো লোক নেই, কেমন বড় শ্মশান, আলো বাতাসে ঝক ঝক করছে।''

''তুই যদি আমার স্বর্গধামের নিন্দা করিস, তবে তোকে খুব কষ্ট দোব। তুই এখান থেকে বিদায় হয়ে যা, তোর এখানে জায়গা হবে না,'' বল্লেন অন্নপূর্ণা মা স্বপ্নে।

''কাজ নেই আমার স্বর্গধামে, চাইনে থাকতে তোমার বদ কাশীতে, আমার তারামা'র রাজ্যই ভাল'', উত্তর দিলেন ক্ষেপা।

স্বপ্ন ভেঙে গেল, ধড়মড়িয়ে উঠে ভাবতে লাগলেন স্বপ্নের কথা। সকালবেলায় বাবা বিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণা, দুর্গাবাড়ী ইত্যাদি দেখে ক্ষেপা উপস্থিত হলেন মণিকর্ণিকার ঘাটে। চাতালে বসেছিলেন কাশীধামের চলন্তশিব শ্রীমৎ ত্রৈলঙ্গ স্বামী ভক্তবৃন্দ পরিবেষ্টিত হয়ে। ক্ষেপার আগমনের কিছু পূর্বে হঠাৎ এক ভক্তকে বল্লেন চলন্ত শিব, ''জলদি একঠো কাপড়া লেয়াও, এক ভৈরব আতা হায়।'' আদেশের সঙ্গে সঙ্গে ভক্ত একটি লেংটী কিনে আনলেন। চলন্ত-শিবের সম্মুখে ভৈরবের আগমনে এক অপূর্ব্ব শান্ত-গম্ভীর আনন্দের হিল্লোল প্রবাহিত হ'লো ভাগীরথীর তীরে। ভক্ত-জনগণ আনন্দ বিহ্বল চিত্তে অবাক হয়ে চেয়ে দেখলেন চলন্ত-শিব ও ভৈরবের প্রেমালিঙ্গন। কিছুক্ষণ পরে ভৈরব, রাজা হরিশচন্দ্রের মহাশ্মশানে আশ্রয় নিলেন। কাশীধামের নিন্দা করার জন্য ক্ষেপার তিন-দিন আহার জুটলো না, শুধু বেলপাতা আর গঙ্গাজল খেয়ে দিন কাটাতে লাগলেন বেদজ্ঞের প্রতীক্ষায়। সাধকদের জীবনে কত পরীক্ষা কত বিপদ আপদ আসে তার ইয়ত্তা নেই। এই ভাবে গেল চারদিন কাশীধামে, ক্ষেপা শান্তি পেলেন না। কাশীতে আর মন টিকলো না, গুরুর প্রতীক্ষায় না থেকে তিনি চললেন ষ্টেশনের দিকে গাড়ী ধরবার জন্যে।'

তবে শঙ্করী মাতাজি বা উমাচরণ মুখোপাধ্যায়ের গ্রন্থ থেকে কেন ত্রৈলঙ্গ স্বামীজির সঙ্গে বামাক্ষেপার দেখা হওয়ার প্রসঙ্গটি বাদ পড়ল তা বলতে পারব না। এ ব্যাপারে স্বামীজি কি তাঁদের কাছে কিছু বলেননি? এই

প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়ার মতো কেউই এখন লৌকিক শরীরে আমাদের মধ্যে নেই।

যোগীরাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ি মহাশয়। মহামহোপাধ্যায় ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজ মহোদয়ের 'জ্ঞানগঞ্জ' গ্রন্থের শেষাংশে এই মহাত্মা যোগী সম্পর্কে সুন্দর একটি প্রতিবেদন রয়েছে,

'সাল ১৮৬১। হিমালয়ের রাণীক্ষেত অঞ্চলে সেনা বিভাগ কর্তৃক একটি বৃহৎ সেনানিবাস নির্মাণের আয়োজন চলিতেছে।

এই সামরিক পূর্ত বিভাগে এক বাঙালী সবেমাত্র দানাপুর থেকে এই রাণীক্ষেতে বদলি হয়ে এসেছেন।

প্রাতেঃ কিছু সামান্য কাজকর্ম—তারপরে আবার অখণ্ড অবসর। প্রায়শই এই অবসর সময় কুলী-মজুর-ডাকবিভাগের পিয়ন প্রভৃতি ব্যক্তিদের সঙ্গে আলাপচারিতার মধ্যেই কাটে।

সম্মুখে নাগাধিরাজ হিমালয়। কন্দরে কন্দরে ইহার কত যোগী, কত সিদ্ধ সাধু-সন্ন্যাসী তপস্যায় রত। জন্মজন্মান্তরের পুণ্যফলে কোনো কোনো ভাগ্যবানের জীবনে ঘটে তাঁহাদের আবির্ভাব, প্রকাশিত হয় দেবতাত্মা হিমালয়ের প্রকৃত স্বরূপ।

পূর্তবিভাগের এই কর্মচারীটি স্থানীয় লোকেদের মুখে নানা অলৌকিক কাহিনী, নানা জনশ্রুতি শুনেছেন। আরও জানিয়েছেন অদূরস্থ দ্রোণগিরি শিবকল্প তাপসদের এক বিচরণভূমি। এখানে তাঁহাদের নানা কৃপালীলা নাকি অনুষ্ঠিত হয়।

সেদিন তাঁহার অন্তরে কৌতূহল জাগিয়া উঠিল। পাহাড়টিকে ভাল করিয়া একবার দেখিয়া আসা মন্দ কি? বিকালবেলায় এ উদ্দেশ্যে তাঁবু হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন।

রাণীক্ষেত হইতে চীরগাছের ঘন বন। অদূরে দুর্গম পাহাড়ের সারি পরপর উঁচু হইয়া গিয়াছে ঊর্ধ্বে নীলাকাশের মহাশূন্যে।

পাকদণ্ডির আঁকাবাঁকা বনপথ দিয়া চলিতে চলিতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিল। সম্মুখেই চোখ পড়ে নন্দাদেবীর গিরি চূড়ায় অস্তরাগের অপরূপ সমারোহ। দূরে দিকচক্রবালে চিরতুষারমণ্ডিত পর্বতশৃঙ্গের তরঙ্গমালায় ছড়াইয়া পড়ে তাহার বর্ণচ্ছটা। দেবাদিদেব ধূর্জটির তাম্রাভ জটাজালে যেন দিগন্ত ঢাকিয়া গিয়াছে।

আত্মবিস্মৃত তরুণ এ মহিমময় দৃশ্যের দিকে চাহিয়া আছেন।

অকস্মাৎ নির্জন দ্রোণগিরি কম্পিত করিয়া ধ্বনিত হইল—

''শ্যামাচরণ! শ্যামাচরণ লাহিড়ী!''

একি! কে এই জনমানবহীন পার্বত্য অঞ্চলে তাঁহার নাম ধরিয়া ডাকিতেছে? সরকারী টেলিগ্রাম পাইয়া শ্যামাচরণ হঠাৎ দানাপুর হইতে পাঁচশত মাইল দূরে এই রাণীক্ষেত্রে চলিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু এই অঞ্চলে কোন লোকই তো তাঁহার পরিচিত নয়! অন্তরে কিছুটা ভয়ের সঞ্চার হইল। আবার কৌতূহলও জাগিল।

কণ্ঠস্বর অনুসরণ করিয়া কিছু দূর অগ্রসর হইয়া গেলেন! দেখিলেন, অদূরে পর্বত গুহার দ্বারে তেজঃপুঞ্জকলেবর, জটাজূটসমন্বিত এক যোগী সন্ন্যাসী একাকী দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি যেন শ্যামাচরণের জন্যই অপেক্ষমাণ!

আয়ত নয়ন দুইটিতে দিব্য আনন্দের দ্যুতি। যোগীবর নিকটে আসিয়া প্রসন্ন মধুর কণ্ঠে কহিলেন, ''শ্যামাচরণ, অব তুম আগয়া! ব্যয়ঠ যাও বিশরাম কর লো। ম্যাঁয়হী তুমহে পুকার রহা থা!'' অর্থাৎ—শ্যামাচরণ, তুমি তাহলে এসে গিয়েছ! এবার বিশ্রাম কর। আমিই তোমায় এতক্ষণ ডাকছিলাম।

শঙ্কা ও সন্দেহ শ্যামাচরণের মনে ভিড় করিতেছে। তাড়াতাড়ি কোনমতে একটি শুষ্ক প্রণাম জানাইয়া দাঁড়ালেন।

যোগী সাদরে আহ্বান জানাইলে কি হইবে, শ্যামাচরণের মনের দ্বিধাদ্বন্দ্ব সহজে যাইতে চায় না। মনে মনে কেবলই ভাবিতেছেন, তাই তো, এ সাধু আমার নাম কি করে জানলো? হয়তো কোনো পিয়ন বা পাহারাদারের কাছে জেনে নিয়েছে।

পরম আশ্চর্য্যের কথা, মনে এই চিন্তা খেলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই যোগী অবলীলায় শ্যামাচরণের পিতৃপুরুষের নাম, ধাম পরিচয় সবকিছু এক নিঃশ্বাসে বলিয়া দিলেন। শুধু তাহাই নয়, ঘনিষ্ঠ লোকের মতো তাঁহার দিকে তাকাইয়া কেবলই তিনি মধুর হাসি হাসিতেছেন।

ক্ষণপরে কহিলেন, "বেটা, মন তোমার বৃথা সন্দেহে আলোড়িত হচ্ছে। জেনে রেখো আমি তোমার নিতান্ত আপন জন—তোমারই প্রতীক্ষায় এ দুর্গম গিরিশিখরে বসে আছি। একবার ভালো করে ভেবে দেখ দেখি, এ পাহাড়ে আগে তুমি আর কখনো এসেছিলে কিনা?"

সস্নেহে হাতটি ধরিয়া শ্যামাচরণকে তিনি গুহার অভ্যন্তরে নিয়া গেলেন। স্বল্পালোকে দেখা গেল, এক কোণে পড়িয়া আছে একটা বাঘছাল, ধুনি, দণ্ড ও কমণ্ডলু।

রহস্যময় মহাপুরুষ শ্যামাচরণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেখ তো, এগুলো চিনতে পারছো কিনা? এসব যে তোমারই পরিত্যক্ত জিনিস। এসব কথা একটুও কি তোমার স্মরণে আসছে না?"

বিস্ময়বিমূঢ় শ্যামাচরণ স্মৃতির দুয়ারে আঘাত করিতেছেন, কিন্তু কোন কিছুই মনে করিতে পারিতেছেন না।

যোগীবর স্মিতহাস্যে আরো কাছে আসিলেন, হস্তদ্বারা স্পর্শ করিলেন শ্যামাচরণের মেরুদণ্ড। এ কি ইন্দ্রজাল! শ্যামাচরণের মনোলোকের যবনিকাটি মুহূর্তমধ্যে কোথায় অপসৃত হইয়া গিয়াছে। তড়িৎ সঞ্চালিত তন্ত্রীর মতো সাড়া দেহটি তাঁহার বার বার কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে, দেহে জাগিতেছে অলৌকিক আনন্দের শিহরণ।

পূর্বজন্মের অধ্যাত্ম-জীবনের চিত্রপট শ্যামাচরণের নয়ন সমক্ষে সহসা উদঘাটিত হইয়া গেল। জন্মান্তরের ব্যবধান শক্তিধর মহাযোগীর পুণ্যকরস্পর্শে এক নিমিষে আজ ঘুচিয়া গিয়াছে। তিনি চিনিলেন—এই দণ্ড, কমণ্ডলু, বাঘছাল ও পবিত্র ধুনি তাঁহারই পূর্বজন্মের ব্যবহৃত বস্তু; সম্মুখে দণ্ডায়মান এ যোগী তাঁহার পূর্বজন্মের গুরু—আর তিনি তাঁহার ইহকালের পরকালের পরমাশ্রয়।

সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া শ্যামাচরণ যুক্তকরে দণ্ডায়মান রহিলেন।

যথাসময়ে দীক্ষা অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়া গেল। একদিকে উপযুক্ত অধিকারী শিষ্য, অপরদিকে কৃপাবর্ষণে উন্মুখ মহাশক্তিধর সদগুরু—এ যেন মণিকাঞ্চন সংযোগ। বিস্ময়কর দ্রুততার সহিত লাহিড়ী মহাশয় যোগসাধনার পদ্ধতিসমূহ আয়ত্ত করিলেন। নবীন সাধক গুরুশক্তিতে উদ্দীপিত—তাই গুরুর কৃপায় একের পর এক লাভ করিলেন অতীন্দ্রিয় রাজ্যে বহুতর দুর্লভ অনুভূতি।

শক্তিধর গুরু যোগসিদ্ধির অনেক কিছু ঐশ্বর্য এ সময়ে অকৃপণ করে ঢালিয়া দেন, আর আত্মনিবেদিত শ্যামাচরণ তাহা গ্রহণ করেন অপূর্ব নিষ্ঠায়।

রোজকার সাধনা ও যোগক্রিয়া শেষ হইলে লাহিড়ী মহাশয় গুরুর সান্নিধ্যে আসিয়া বসেন, যোগ-রাজ্যের নানা সাধনা-রহস্য শ্রবণ করেন। যোগীজীবনের বিচিত্র কাহিনী একএকদিন তাহাকে বিস্ময়ে অভিভূত করিয়া ফেলে। সিদ্ধযোগী মহা আত্মীয়দের লীলাভূমি এই পবিত্র হিমালয়। প্রতিশৃঙ্গে, প্রতি কন্দরে ইহার অধ্যাত্মলোকের কত নিগূঢ় ধন সঞ্চিত রহিয়াছে তাহার পরিমাপ কে করিবে!

বাবাজী মহারাজের মুখ হইতে শ্যামাচরণ এ সময়ে স্থানীয় এক মহাযোগীর কথা শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হন—

দ্রোণগিরির এই জনমানবহীন গুহা হইতে মাইল পাঁচেক দূরে দেখা যায় এক সুপ্রাচীন জীর্ণ দেবালয়। স্থানটি এক সিদ্ধ মহাপুরুষের বিচরণক্ষেত্র। সাধু-সন্ন্যাসীদের মতে এই যোগসিদ্ধ মহাপুরুষের বয়সের কোনো হিসাব নাই। স্থানীয় অধিবাসীরা বলে—এই মহাত্মা দ্রোণগিরির অভিভাবক, পৌরাণিক আমলের অমর মানুষ, 'অশ্বথমা' নামে অনেকে এ রহস্যময় মহাপুরুষকে অভিহিত করে।

কাঠের খড়ম পায়ে, গভীর রাত্রে খটখট শব্দে ইনি একবার করিয়া পূর্বোক্ত ভগ্ন দেবালয়ে প্রবেশ করেন, দিব্য দেহ-জ্যোতিতে চতুর্দিক তখন আলোকিত হইয়া উঠে।

যোগসাধন-পথের নতুন পথিক লাহিড়ীমহাশয় কৌতূহলী হইয়া উঠেন এবং তাঁহার সনির্বন্ধ অনুরোধে গুরুজী এক নিশীথে দূর হইতে তাঁহাকে এই মহাত্মার দেহজ্যোতি দর্শন করান।

বাবাজী মহারাজ বলিতেন, "ওখানকার অনেক মৃতকল্প রোগীদের এই মহাত্মার কৃপার উপর নির্ভর করে পাহাড়ে ফেলে রেখে যায়। তাঁর কৃপা-দৃষ্টিপাতে তারা বেঁচে ওঠে।"

লাহিড়ীমহাশয় নিজেও একদিন ইহার কিছু পরিচয় পান—।

একদিন দুই তিনজন সাধুর সহিত তিনি ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। পথ চলিতে চলিতে একজন সঙ্গী হঠাৎ অরণ্যের এক বিষাক্ত ফল খাইয়া পীড়িত হইয়া পড়ে। প্রবল ভেদবমি দেখা দেয়। এদিকে রাত্রির অন্ধকার ধীরে ধীরে ঘনাইয়া আসিতে থাকে। এই আকস্মিক বিপদে সকলে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন।

সম্মুখে মহাত্মা 'অশ্বত্থমা'র ভগ্ন দেউলের চূড়া। অপর কোনো উপায় না দেখিয়া তাঁহারা দ্রোণগিরির ওই রহস্যময় মহাপুরুষের আশ্রয়েই সাধুটিকে রাখার সিদ্ধান্ত করিলেন। সে তখন মৃত্যুপথের যাত্রী। সকলে ধরাধরি করিয়া আনিয়া জরাজীর্ণ দেউলের একপাশে তাহাকে শোয়াইয়া রাখিলেন।

সাধুটি কিন্তু পরদিনই সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইয়া আশ্রমে ফিরিয়া আসে। তাহার মুখে পর্বতশীর্ষচারী মহাত্মার কৃপা কাহিনী শুনিয়া লাহিড়ীমহাশয়ের বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

মৃতকল্প সাধুটি জীবন সম্বন্ধে হতাশ হইয়া পড়িয়া আছে, এমন সময় রহস্যময় পুরুষ সেখানে আবির্ভূত হন, রোষকষায়িত নেত্রে গর্জন করিয়া বলেন, "এখানে কে রে তুই?"

সঙ্গে সঙ্গেই আসে প্রচণ্ড পদাঘাত। এ আঘাতের ফলে রোগী গড়াইতে গড়াইতে সন্নিহিত নিম্নভূমিতে পড়িয়া যায়। কিন্তু পরম বিস্ময়ের কথা, কিছুকাল পরেই তাহার দেহে বলের সঞ্চার হইতে থাকে। তারপর পায়ে হাঁটিয়া সে নিচে চলিয়া আসে।

দ্রোণগিরি অঞ্চলের এইসব সিদ্ধ-যোগীদের লীলা কাহিনী নবীন সাধক লাহিড়িমহাশয়ের চেতনায় প্রচণ্ডভাবে নাড়া দেয়, অতীন্দ্রিয় রাজ্যের নানা কাহিনী, নানা অলৌকিক তথ্য শুনিয়া তিনি আরও উদ্বুদ্ধ হইয়া ওঠেন।

এ সময়ে চমকপ্রদ যোগবিভূতি দেখাইয়া দু-একজনের গুরুভ্রাতাও তাঁহাকে কম বিস্মিত করেন নাই।

একদিন লাহিড়িমহাশয় তাঁহার এক গুরুভ্রাতা ও কয়েকটি সাধুসহ খরস্রোত পার্বত্য নদী গগাস-এর ওপর শৌচাদির জন্য গিয়াছেন। ফিরতে সেদিন তাঁহাদের বেশ দেরি হইয়া গেল। ইতিমধ্যে নদীতে হড়কা বান আসিয়া পড়ে, দুই কূলের বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্লাবিত হইয়া যায়। তরুণ সাধকেরা তো প্রমাদ গনিলেন, তাই তো এ জলোচ্ছ্বাস অতিক্রম করা যে অসম্ভব!

গুরুভ্রাতাদের একজন ছিলেন অষ্টসিদ্ধিপ্রাপ্ত যোগী। মস্তক হইতে তাড়াতাড়ি পাগড়ীটি খুলিয়া নিয়া তিনি এ সময়ে এক অলৌকিক কাণ্ড করিয়া বসিলেন। পাগড়ীটি জলের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া সঙ্গীদের কহিলেন, "তোমরা এক মুহূর্ত দেরি না করে এর ওপর হাত রেখে একে একে অপর পারে চলে যাও।"

সঙ্গীরা অগৌণে জলে নামিয়া পড়িলেন। শক্তি সঞ্চারিত এই ভাসমান বস্ত্রখণ্ড ধারণ করিয়াই সেদিন সকলে নদীর অপর পারে আসিয়া পৌঁছিলেন।

উত্তরকালে লাহিড়ীমহাশয়ের মুখে সেদিনকার এ ঘটনাটির চমকপ্রদ বর্ণনা মাঝে-মাঝে শোনা যাইত।

ঐ অলৌকিক বস্ত্র-সেতুর রহস্য সম্বন্ধে তিনি গুরুদেবকে একদিন প্রশ্ন করিয়াছিলেন। উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, "বেটা, এতে বিস্ময়ের তো কিছু নেই। অষ্টসিদ্ধি পেয়েছে বলেই তোমার সাধন পন্থা অনুসরণ করলে তুমিও অতি সহজে এ ধরনের যোগবিভূতি প্রকাশের মধ্যে দিয়া গুরুদেব সেদিন তাঁহারই অন্তরে উদ্দীপনার সঞ্চার করিতে চাহিয়াছিলেন।

গুরুভ্রাতাদের কাছে বসিয়া নবীন যোগী এই সময়ে বাবাজী মহারাজের যোগবিভূতির নানা কাহিনী শুনিতেন। দ্রোণগিরিতে থাকিতে তিনি নিজেও ইহার কিছু পরিচয় পাইয়াছিলেন।'

যোগীরাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ি মহাশয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল কাশীর সচল বিশ্বনাথ ত্রৈলঙ্গ স্বামীজির। কাশীতে যোগীরাজের অনেক ভক্ত ও শিষ্য ছিল। দেওঘরের শ্রীমৎ বালানন্দ ব্রহ্মচারী ও কাশীধামের অপর এক সাধক স্বামী ভাস্করানন্দ সরস্বতী তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসে ক্রিয়া যোগ শিক্ষা লাভ করেছিলেন। জ্ঞানাবতার শ্রীশ্রী স্বামী যুক্তেশ্বর গিরি মহারাজও তাঁর শিষ্য ছিলেন। তিনি তাঁর অধিকাংশ শিষ্যদের সন্ন্যাস নিতে নিষেধ করে বলতেন, সন্ন্যাসজীবন খুবই কঠিন ও দায়িত্বপূর্ণ। এই ক্ষেত্রে গৃহস্থের ভুলভ্রান্তি হয়তো বা কিছু ক্ষমা পেতে পারে। সন্ন্যাসীর ভুলের কোনও ক্ষমা নেই।

কাশীর রাজা ঈশ্বরীনারায়ণ সিংহ বাহাদুর ও তাঁর দুই পুত্র মহাত্মা যোগীরাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ি মহাশয়ের কাছ থেকে ক্রিয়া যোগের দীক্ষা নিয়েছিলেন। কাশীর নামী হোমিওপ্যাথ চিকিৎসক ডাঃ গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় লাহিড়িমহাশয়ের শিষ্য। তিনি মাঝে-মাঝেই ত্রৈলঙ্গস্বামীকে দর্শন করতে যেতেন। একদিন তিনি পঞ্চগঙ্গার ঘাট থেকে ফিরে এসে গুরুদেবকে বললেন, ত্রৈলঙ্গস্বামীর সঙ্গে দেখা করতে যাবেন কি! স্বামীজি তখন পঞ্চগঙ্গার ঘাটে অবস্থান করছেন। শিষ্যের অনুরোধে যোগীরাজ যেতে রাজি হলেন। পরদিন বিকেলে তাঁরা দুজনে বেরোলেন স্বামীজিকে দর্শন করতো। লাহিড়ি মহাশয়ের পরনে ছিল ধুতি আর পাঞ্জাবি। পায়ে ফিতে বাঁধা কাপড়ের জুতো।

পঞ্চগঙ্গার ঘাটে পড়ন্ত বিকেলে দেখা হল দুই সাধকের। ত্রৈলঙ্গ স্বামী তখন মৌনী। যোগীরাজকে তিনি বুকে টেনে নিলেন। সেখানে উপস্থিত ভক্ত ও মানুষজন স্বামীজির এহেন ব্যবহারে যথেষ্ট আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন। সেদিন দুই সাধক মুখোমুখি বসে বহুক্ষণ নানা কথা বলেছিলেন। তবে পুরোটাই আকারে-ইঙ্গিতে।

যোগীরাজ চলে যাওয়ার পর এক ভক্ত স্বামীজিকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, এই বাঙালি ভদ্রলোক কে, যে আপনি আসন ছেড়ে উঠে আপনার বুকে টেনে নিলেন। মৌনী স্বামীজি সেই ভক্তের কথা শুনে লিখলেন, 'যোগ সাধন কী জিস উন্নতি করনেকে লিয়ে সাধকোঁকো লঙোটিতক ছোড়নি পড়তি হ্যায়, গৃহস্থী মে রহতে হুয়েভি ইস পুরুষনে উসপদবী কো প্রাপ্ত করলিয়া।' ধন্য শ্যামাচরণ যোগীরাজ। যোগসাধনার যে উচ্চস্তরে পৌঁছোতে যোগীকে লেঙটিটিও ছাড়তে হয়, তুমি ধুতি, পাঞ্জাবি পরেও অনায়াসে সেই উচ্চতায় পৌঁছে গেছ।

যোগীরাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ি মহাশয়ের তিন প্রখ্যাত সন্ন্যাসীশিষ্য সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলার প্রয়োজন আছে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ১৮৬০ সালে উজ্জয়িনীর এক সারস্বত ব্রাহ্মণবংশে বালানন্দ ব্রহ্মচারীর জন্ম। তাঁর পূর্বাশ্রমের নাম ছিল পীতাম্বর। ছোটবেলা থেকেই তাঁর পড়াশুনার প্রতি কোনওরকম মন ছিল না। কখনও শিপ্রা নদীর তীরে, কখনও ভর্তৃহরি ও গোরখনাথের গুহায় গিয়ে চুপ করে বসে থাকতেন। মা নর্মদাদেবী পুত্রকে নিয়ে বড়ই চিন্তা করতেন। যথাসময়ে তাঁর পৈতে হল। এই অনুষ্ঠানের দিনকয়েক বাদেই তিনি গৃহত্যাগ করলেন। নর্মদার তীরে অবস্থিতগঙ্গোনাথের ব্রহ্মানন্দ মহারাজ তাঁর দীক্ষাগুরু। শেষ জীবন তিনি কাটিয়েছেন দেওঘরের আশ্রমে। ১৩৪৪ সালের ২৬ জ্যৈষ্ঠ রাত্রির মধ্য যামে তিনি ব্রহ্মে লীন হয়ে যান।

ভাস্করানন্দ স্বামী (১৮৩৩-১৮৯৯) কাশীর সিদ্ধসন্ন্যাসী, প্রকৃত নাম মতিরাম। মণিলাল মল্লিক ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবকে তাঁর কথা বলেছিলেন। কানপুর জেলার মিথিলাপুর গ্রামে জন্ম, ব্যাকরণ ও বেদশিক্ষা সাঙ্গ করে তিনি সাতাশ বছর বয়েসে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী তাঁকে দর্শন করেন। এই নির্বিকার সাধক সম্পর্কে তিনি খুব উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। স্বামীজিও পরিব্রাজক অবস্থায় তাঁকে দর্শন করেছিলেন। স্বামী অভেদানন্দও এই ত্যাগী ও নিরহঙ্কার সাধকের কথা উল্লেখ করেছেন। শেষ জীবন তিনি কাশীতেই অতিবাহিত করেন।

যুক্তেশ্বর গিরি মহারাজের জন্ম শ্রীরামপুরের কাঁড়ার পরিবারে। পূর্বাশ্রমের নাম প্রিয়নাথ কাঁড়ার। লেখাপড়ায় অত্যন্ত মেধাবী। শ্রীরামপুরের খ্রিস্টান মিশনারি কলেজের ছাত্র। ছাত্রাবস্থাতেই বাইবেল গ্রন্থটির প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে একটি বই লিখেছিলেন—যোগ ও বাইবেল। মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করেছিলেন ডাক্তার হওয়ার জন্য। দুবছর ক্লাসও করেন। কলেজ থেকে বেরিয়ে বিবাহ

করেছিলেন। একটি কন্যাও ছিল। বিবাহের কয়েক বছর পরে স্ত্রী বিয়োগ হয়। জীবন ঘুরে যায় আধ্যাত্মিকতার দিকে। অল্প দিন পরেই যোগীরাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ি বাবার কাছে ক্রিয়াযোগে দীক্ষা লাভ করেন। শুরু হল ধর্মপথে যাত্রা। এরপরেই তিনি ক্রিয়াযোগে সিদ্ধ হয়ে অবিস্মরণীয় এক যোগীতে পরিণত হলেন। এই সময়ই তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। শ্রীরামপুরের বিশাল বাড়িটি তিনি আশ্রমে রূপান্তরিত করলেন। শুধু যোগ নয় জ্যোতিষ শাস্ত্রেও তাঁর অসাধারণ দখল ছিল। তাঁর প্রধান এবং পরম প্রিয় শিষ্য পরমহংস যোগানন্দ এই সাধককে বিশ্বের কাছে সুপরিচিত করেন।

কাশীধাম পর্ব! একশো পঞ্চাশ বছর তিনি এই স্থানে অবস্থান করবেন। ঘটাবেন অনেক অলৌকিক ঘটনা। তবে কাশীতে থাকাকালীন স্বামী ত্রৈলঙ্গজি দু-একবার তীর্থভ্রমণে বেরিয়েছেন। সেই পর্বটি শেষ করে পাকাপাকিভাবে কাশী পর্বে প্রবেশ করব। দুই স্বনামধন্য, সুবিখ্যাত মহাপুরুষ, বারদীর লোকনাথ ব্রহ্মচারী ও বেণীমাধব গঙ্গোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে তাঁদের গুরুদেব ভগবান গাঙ্গুলী একবার কাশীতে এলেন।

গুরুদেব ভগবান গাঙ্গুলী এই পুণ্যতীর্থে যোগাবলম্বনে দেহরক্ষা করেন। কিন্তু তখনও তাঁর দুই শিষ্যের যোগশিক্ষা সম্পূর্ণ হয়নি। ভগবান গাঙ্গুলি তাঁর দুই শিষ্যকে ত্রৈলঙ্গস্বামীর হাতে অর্পণ করে যান। তাঁদের পরবর্তী শিক্ষা দেন কাশীর সচল বিশ্বনাথ। তাঁদের শিক্ষা সমাপ্ত হওয়ার পর দুই গুরুভ্রাতা দেশভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। অবশ্যই ত্রৈলঙ্গস্বামীর অনুমতি নিয়ে। তাঁরা পশ্চিমের বহুদেশ ঘুরে আবার একদিন ফিরে আসেন শিবধাম, অন্নপূর্ণার স্থান কাশীতে। এরপর স্বামীজি বেরোবেন তীর্থভ্রমণে। তিনি সেই ভ্রমণকালে সঙ্গে নিয়েছিলেন এই দুই গুরুভ্রাতা ও তাঁর অত্যন্ত প্রিয় শিষ্য সিদ্ধ মুসলমান ফকির আবদুল গফুরকে।

স্বামীজি পৃথিবীর শেষসীমা মেরু অঞ্চল পর্যন্ত যাবেন বলে ঠিক করেছিলেন। শুরু হল পথচলা। তাঁর সঙ্গী শিষ্যত্রয় গুরুদেবের সঙ্গে শেষসীমা পর্যন্ত যেতে সমর্থ হলেন না। শিষ্যদের কাহিল অবস্থা দেখে তিনি তাঁদের ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। একাকী মহেশ্বর, ত্রিশূল সম্বল করে পৌঁছে গেলেন শেষসীমায়। শোনা যায় মেরু অঞ্চল ভ্রমণ শেষ করে তিনি পৃথিবীর পূর্বসীমা উদয়াচল দর্শনও করেছিলেন। সব শেষে তিনি আবার ফিরে আসেন কাশীধামে।

৭

এরপরই সেই প্রশ্ন! স্বামীজির কাছেই জানতে চাইব—তিনি কেন কাশীতে এলেন? এলেন ভালো কথা কিন্তু দেড়শো বছর সেই তীর্থক্ষেত্রে কেন কাটালেন! কীসের টানে! এর পিছনে কি কোনও দৈব নির্দেশ ছিল! বরাহনগর শ্রীগুরু আশ্রম ত্রৈলঙ্গমঠ-এর প্রাক্তন সভাপতি ও বর্তমান ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য অমরনাথ পোদ্দার মহাশয়ের গুরুদেবের নাম কুলনদাই স্বামী গণেশন। দক্ষিণ ভারতের মানুষ, উচ্চশিক্ষিত, ঈশ্বরমুখী। গণেশন স্বামী ত্রৈলঙ্গ স্বামীজির বংশধর এবং শিষ্য রঘুপতি ভেঙ্কটরাঘবন স্বামীর নাতি। গণেশন স্বামী তাঁর তামিল গ্রন্থ 'গুরুদর্শন'-এ এই প্রশ্নের উত্তর খুব সুন্দরভাবে দিয়েছেন। মূল তামিল বই থেকে সেই অংশটি ইংরেজিতে অনুবাদ করিয়েছেন অমরনাথবাবু। সেখান থেকে তুলে নিলাম প্রয়োজনীয় অংশটুকু—ত্রৈলঙ্গ স্বামীর জীবন মা মীনাক্ষীর দান। দশমহাবিদ্যার এক বিদ্যা মাতা মীনাক্ষী। দক্ষিণ ভারতে তিনি এই নামেই পূজিতা। তন্ত্রে তিনি ললিতা, ত্রিপুরাসুন্দরী। তাঁর আরও পরিচয় তিনি প্রভু সুন্দরেশ্বরের শক্তি। তিনি আদ্যাশক্তি। তন্ত্রের এই দেবী দক্ষিণ ভারতে নিজেকে প্রকাশ করলেন একটি কারণে, সেটি হল দিগবন্ধন। দক্ষিণের সঙ্গে বারাণসীর মেরুটিকে সুস্থির ও সুরক্ষিত করার জন্য। বারাণসীকে বলা হয় শিবপুরী, মহাদেবের রাজধানী ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিকতার কেন্দ্রভূমি। অতএব বারাণসীর অন্নপূর্ণা আর মাদুরাইয়ের মা মীনাক্ষী একই শক্তির দুইটি প্রকাশ। মা মীনাক্ষীর বিশাল মন্দির ভারতবর্ষের এক অনবদ্য দর্শনীয় স্থান। ঠিক যেমন বারাণসী। এটিও শক্তিপীঠ, বারাণসীও শক্তিপীঠ। উভয়ক্ষেত্রেই শিবের অবস্থান।

মাতা মীনাক্ষী চিরতীর্থ বারাণসীকে সুরক্ষিত করার জন্য আবির্ভূতা হয়েছিলেন। তিনি তাঁর প্রিয় সন্তান ত্রৈলঙ্গ স্বামীকে নামিয়ে এনেছিলেন তিনটে কারণেই—কাশী, গঙ্গা ও বিশ্বনাথ। তিনি চেয়েছিলেন তাঁর প্রিয় সন্তান ত্রৈলঙ্গ বিধর্মীদের আক্রমণ থেকে পুণ্যভূমি কাশীকে রক্ষা করে তার হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করবে।

ত্রৈলঙ্গস্বামী জানতেন তিনি কে। এই চেতনা মা মীনাক্ষীর সঞ্চার। তিনি এই সচল বিশ্বনাথকে দক্ষিণ ভারতের জন্মভূমি থেকে তুলে দেবেন উত্তর ভারতের স্বর্ণকাশীতে। তাঁর দীর্ঘ জীবৎকালে বারাণসীকে তিনি গৌরবান্বিত করবেন। ত্রৈলঙ্গ মহারাজ এই বারাণসীতেই প্রকাশ করেছিলেন তাঁর ঐশ্বরিক রূপ ও শক্তি। বিজাতীয়, বিধর্মী শাসকগোষ্ঠীর টনক নড়িয়ে দিয়েছিলেন। প্রকাশ করেছিলেন তাঁর রুদ্র শক্তি। কখনও কখনও মনে হত তিনি স্বয়ং মহাকালী, মহাভৈরব আর মহাকালীর একত্রিত রূপ।

তিনি ফিরিয়ে এনেছিলেন কাশীর হৃত আধ্যাত্মিক সম্পদ। পরবর্তীকালে বহু সাধক বারাণসীতে আসবেন, তাঁদের সাধন ঐশ্বর্যে স্থানটিকে করে তুলবেন শিবস্বর্গ। কাশীতে যিনি দেহ রাখবেন তিনি শিবলোকে মুক্তি পাবেন, পুনর্জন্ম হবে না। অবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ এই দৃশ্য দেখেছিলেন।

ত্রৈলঙ্গস্বামীর জীবৎকালে তাঁকে দেখার সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছিল তাঁদের মনে হত—এই নগরের তিনিই একমাত্র অভিভাবক, অষ্টাঙ্গ ভৈরব, হাতে বিরাট ত্রিশূল—ঠিক যেমনটি দেখতে পাওয়া যায় কাশীর কালভৈরব মন্দিরে। এ এক অপূর্ব প্রকাশ, অবিশ্বাস্যও বলা চলে।

স্বামীজি আমার এই প্রশ্নের উত্তর নিজে না দিলেও তাঁর বংশধরের মাধ্যমে অবশ্য দিয়েছেন। এখন আমার কাছে পুরোটাই স্বচ্ছ জলের মতো স্পষ্ট। তিনি কাশীতে এসেছিলেন মা মীনাক্ষীর তিনটে কাজ সুসম্পন্ন করতে। তিনি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন কাশীর হৃতগৌরব, নিজের শরীরে স্থাপন করেছিলেন বাবা বিশ্বনাথকে। আর মা গঙ্গা! সে তো মাতা-পুত্রের অচ্ছেদ্য বন্ধন!

ত্রৈলঙ্গস্বামী এলেন শিবধাম কাশীতে। মহাদেবের রাজধানীতে সচল বিশ্বনাথ। স্বামীজি তাঁর আসন পাতলেন অসি ঘাটের কাছে তুলসীদাসের বাগানে।

অসি ঘাট, বিখ্যাত এক স্থান। এই ঘাটেই লোলার্ককুণ্ডের অবস্থান। লোলার্ক অর্থাৎ সূর্যদেবতা। জনশ্রুতি অস্তগামী সূর্যের কুণ্ডল এই কুণ্ডে পড়েছিল। তা থেকেই লোলার্ককুণ্ড। মানুষ এখনও মনে করেন এই কুণ্ডের

জলে স্নান করলে সন্তানলাভ হয়। ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষে সূর্যষষ্ঠীর দিন রাত থেকে এখানে স্নান শুরু হয়। শেষ হয় ভোরবেলায়। মেলাও বসে। পুরী ও হালুয়া নিবেদন করা হয় সূর্যদেব ও লোলার্কেশ্বর মহাদেবের নামে। কথিত আছে, এই কুণ্ডের মাটির স্পর্শে কোচবিহার রাজ্যের কোনও মহারাজের কুষ্ঠ সম্পূর্ণ সেরে গিয়েছিল।

তুলসী দাসের বাগান থেকে মাঝে-মাঝেই স্বামীজি লোলার্ককুণ্ডে যান। খেয়ালখুশি মতো ঘোরেন তারপর ফিরে আসেন নিজের স্থানে। একদিন ওইভাবে ঘুরছিলেন। কুণ্ডের কিছুটা দূরেই শুয়েছিলেন আজমিরের বাসিন্দা বধির ব্রহ্মসিংহ। তাঁর কুষ্ঠ হয়েছিল। স্বামীজি ঠিকভাবে খেয়াল করেননি। সেই রুগির গায়ে তাঁর পা-টি ঠেকে যায়। ঘুম ভেঙে যায় ব্রহ্মসিংহের। তিনি চোখ মেলে দেখলেন তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন মহাদেবের ন্যায় বিশাল এক পুরুষ। তিনি স্বামীজিকে বিশ্বনাথ ভেবে স্তব করতে শুরু করেন। স্বামীজি তাঁর হাতে একটি বেলপাতা দিয়ে বলেন, বাবা তুমি ওই কুণ্ডের পবিত্র জলে স্নান করে এসে এই বিল্বপত্রটি ধারণ করো। তুমি নিশ্চয়ই এই নিদারুণ ব্যাধি থেকে মুক্তি পাবে। স্বামীজির আশীর্বাদে ব্রহ্মসিংহ শ্রবণ শক্তি ফিরে পেলেন। শরীর থেকে কুষ্ঠের প্রকোপও দূর হল। এরপর থেকে তিনি স্বামীজির সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করলেন।

ব্রহ্মসিংহ সুস্থ। স্বামীজির কৃপায় কুষ্ঠ ও বধির ব্যক্তি আজ সম্পূর্ণ নীরোগ—এই খবরটি ছড়িয়ে পড়ল কাশীর বিভিন্ন প্রান্তে। তুলসীদাসের বাগান মুখরিত হয়ে উঠল জনকোলাহলে। স্বামীজি স্থান পরিত্যাগ করে চলে এলেন মহর্ষি বেদব্যাসের আশ্রমে। খুব বেশি বাইরে বেরোনো বন্ধ করে দিলেন। তবে নিয়মিত গঙ্গাস্নান চাই। একদিন সকালে গঙ্গাস্নানে যাওয়ার সময় ঘাটে একটা জায়গায় প্রচুর মানুষকে জটলা পাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন। বালকসুলভ কৌতূহল নিয়ে সদা বালক ত্রৈলঙ্গস্বামী সেখানে গিয়ে উঁকি মারলেন। যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত ব্রাহ্মণ প্রতিদিনের মতো আজও স্নানে এসেছিলেন। কিন্তু হঠাৎই তাঁর রোগযন্ত্রণা বৃদ্ধি পেয়ে শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। তিনি অচেতন হয়ে ঘাটেই পড়ে যান। পূর্বে তিনি বহু চিকিৎসা করিয়েছিলেন। তাতে কোনও লাভ হয়নি। তাই তিনি কাশীতে এসেই থাকার সংকল্প করেন। অর্থাৎ আর পুনর্জন্ম নয়।

অন্যান্য মানুষজন তাঁর সেবাশুশ্রূষা করলেও ফল কিছুই হয়নি। বিশাল দেহী, মহাদেব সদৃশ ত্রৈলঙ্গ স্বামীজি ব্রাহ্মণকে দেখে যা বোঝার তা বুঝে গেলেন। তিনি ভিড় ঠেলে বসে পড়লেন মৃত্যুপথযাত্রী ব্রাহ্মণের পাশে। তিনি স্নেহভরে সেই মানুষটির বুকে হাত বোলাতে শুরু করলেন। আশ্চর্য ঘটনা। ধীরে ধীরে মানুষটি যেন অন্য কোনও এক লোক থেকে ফিরে এলেন বাস্তব জগতে। একটু ধাতস্থ হওয়ার পর তিনি স্বামীজির চরণ দুটি জড়িয়ে ধরে বারেবারে রোগ থেকে মুক্ত করার আকুল আর্তি জানাতে লাগলেন। স্বামীজি মৃদু হেসে পাশ থেকে একটু গঙ্গামাটি তুলে তাতে মন্ত্র পড়ে সেই ব্রাহ্মণের হাতে দিয়ে বললেন, যাও স্নান করে এসে এই মাটিটুকু খেয়ে নিও। এই কয়েকটি কথা বলে তিনি স্নানে চলে গেলেন। ব্রাহ্মণও স্বামীজির আদেশ মেনে সবকিছু ঠিকঠাক করেছিলেন। অচিরেই তাঁর রোগমুক্তি ঘটল। বাঙালি এই ভদ্রলোকের নাম সীতানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। আজীবন তিনি স্বামীজিকে সাক্ষাৎ বিশ্বনাথ জ্ঞানে পুজো করতেন।

সর্প দংশনে মৃত ব্যক্তিকে কলাগাছ দিয়ে ভেলা বানিয়ে, সেই ভেলায় শুইয়ে গঙ্গা বা নদীতে ভাসিয়ে দেওয়ার নিয়ম অতি প্রাচীন। বেহুলাও তাঁর স্বামী লক্ষ্মীন্দরকে নিয়ে নদীবক্ষে ভেসেছিলেন স্বর্গে যাওয়ার জন্য। অসিঘাটের কাছে এক ব্যক্তি সর্প দংশনে মারা গেলেন। প্রথানুযায়ী মৃতের আত্মীয়স্বজন তাঁকে নিয়ে গঙ্গার তীরে উপস্থিত হলেন। মৃতের স্ত্রীর বয়স খুবই অল্প। স্বামীজি সেইসময় ধারেকাছে কোথাও ছিলেন। বালবিধবার ক্রন্দন তাঁর হৃদয়কে ভীষণভাবে স্পর্শ করল। তিনি ছুটে এলেন সেই মৃত ব্যক্তির কাছে। কিছুটা গঙ্গা মাটি তুলে দংশন স্থানে সেই মাটির প্রলেপ লাগিয়ে গঙ্গাবক্ষে ঝাঁপ দিয়ে নিমেষের মধ্যে উধাও হয়ে গেলেন।

অল্পক্ষণ পরেই সেই মৃতের শরীরে প্রাণের সঞ্চার লক্ষ করা গেল। ধীরে ধীরে তাঁর চেতনাও ফিরে এল। নিজেকে ওই অবস্থায় দেখে তিনি যতটা অবাক হয়েছিলেন তার থেকে বেশি আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন তাঁর স্ত্রী

ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজন।

স্বামীজি এরপর এলেন হনুমান ঘাটে। এই পথেই জনৈকা মহারাষ্ট্রবাসিনী মহিলা প্রতিদিন বাবা বিশ্বেশ্বরের পুজো দিতে যেতেন। একদিন হঠাৎই তিনি স্বামীজিকে নগ্নাবস্থায় দেখতে পান। ভীষণই লজ্জা পান সেই মহিলা। তিনি স্বামীজিকে কিছু কটু কথা বলে পুজো দিতে চলে যান। পুজো দিয়ে প্রতিদিনের মতো বাড়িও ফিরে আসেন। সেদিন রাতে তিনি এক ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখেন। স্বয়ং বিশ্বেশ্বর ত্রিশূল উদ্যত করে অত্যন্ত কঠোর কণ্ঠে বলেন, 'যে কামনায় তুই আমার পূজা করছিস, আমার দ্বারা তা পূর্ণ হবে না। যে উলঙ্গ সাধুকে তুই আজ অহেতুক গালি দিয়েছিস, তাঁর কৃপা না হলে তোর মনস্কামনা কোনওমতেই পূর্ণ হবে না।' ভয়ে নিরাশায় মহিলার ঘুম ভেঙে গেল। তিনি সূর্যোদয়ের অপেক্ষায় সারারাত জেগে কাটালেন। ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ত্রৈলঙ্গ স্বামীর চরণকৃপা লাভের আশায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লেন।

স্বামীজির সঙ্গে যথাসময়ে যথাস্থানে তাঁর দেখা হল। তিনি কোনও কথা না বলে স্বামীজির চরণদুটি ধরে অবিরল ধারায় কাঁদতে শুরু করলেন। স্বামীজিও বিব্রত। তিনি মহিলার কাছে কেন তিনি এরকম করছেন জানতে চাইলেন। তিনি তখন স্বপ্ন ও বিশ্বেশ্বরের ক্রোধের কথা জানালেন, মৃদু হেসে স্বামীজি তাঁর সমস্যার কথা জানতে চাইলেন।

মহিলার স্বামীর পেটের একটি ক্ষত কিছুতেই সারছিল না। তাই স্বামীর আরোগ্যকামনায় তিনি প্রতিদিন মন্দিরে পুজো দিতে যেতেন। সব শুনে স্বামীজি পাশ থেকে একটু ভস্ম তুলে তাঁর হাতে দিলেন। সেই ভস্মের গুণেই সেই ভদ্রলোকের উদরক্ষত সেরে গিয়েছিল। স্বামীজি আবার স্থান পরিবর্তন করে এলেন দশাশ্বমেধ ঘাটে।

'দশাশ্বমেধিকং প্রাপ্য সর্ব্যে তীর্থোত্তমোত্তমম।
যৎ কিঞ্চিত ক্রিয়তে কর্ম-তদক্ষয়মিহেরিতম।।'

পুরাণে এই ঘাটটির নাম ছিল 'রুদ্রসর'। কিন্তু নামটি পালটে যায় প্রজাপতি ব্রহ্মার কারণে। তিনি এখানে দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। আর এরপরই এই ঘাটের নাম হল দশাশ্বমেধ ঘাট। কাশীখণ্ডে বলাই আছে, এখানে কেউ যৎসামান্য পুণ্যের কাজ করলে তা চির অক্ষয় হয়ে থাকে। কথিত আছে, রাজা ধৃতরাষ্ট্রও এই রুদ্রসর ঘাটে দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদ মতে এই ঘাটেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছিলেন রাজা অজাতশত্রু। কাশীর রাজা দ্বিতীয় প্রবর সেনের তাম্রপত্র থেকে জানা যায় এক হিন্দু সম্রাট ভারশিব গঙ্গায় স্নান করে এই ঘাটে অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। আর এই যজ্ঞের কথা স্মরণে রাখার জন্য একটি পাথরের ঘোড়া এই ঘাটের উত্তরদিকে স্থাপন করা হয়েছিল। তাই এই ঘাটটি ঘোড়াঘাট নামেও পরিচিত।

১১৯৫ সাল। দেশীয় কোনও নৃপতি কাশী ভ্রমণে এসে একদিন সস্ত্রীক দশাশ্বমেধ ঘাটে আসেন। রানির মুখদর্শন যাতে কেউ না করতে পারে সে জন্য রাজার আদেশে বাসভবন থেকে গঙ্গার ঘাট পর্যন্ত পর্দা টাঙিয়ে দেওয়া হয়। প্রহরীগণ এখনকার মতো তখনও মানুষজন আটকে রাস্তা একদম শুনশান করে ফেলল। রানি চললেন গঙ্গা স্নানে। স্নান সেরে তিনি উঠে এলেন পর্দা ঘেরা ঘাটে। কিন্তু এ কী দৃশ্য! এই বিরাটকায় নগ্নপুরুষ কোন পথে তাঁর সামনে চলে এল। রানি কালবিলম্ব না করে সহচরীদের নিয়ে ভিজে কাপড়ে ফিরে গেলেন নিজের ভবনে। সব শুনে ক্রোধে উন্মত্ত রাজা প্রহরীদের নির্দেশ দিলেন সেই নগ্ন ব্যক্তিকে ধরে আনার জন্য।

রাজ আদেশ। কালক্ষেপ না করে প্রহরীরা ত্রৈলঙ্গ স্বামীকে ধরে নিয়ে রাজার সামনে হাজির করল। বহু প্রশ্ন করেও রাজা জানতে পারলেন না নগ্ন পুরুষ কোন পথে স্নানঘাটে উপস্থিত হয়েছিল। ত্রৈলঙ্গ স্বামীকে প্রহরীরা ধরে নিয়ে গিয়েছে এই খবর তো চাপা থাকতে পারে না। বহু মানুষ রাজার সম্মুখে উপস্থিত হয়ে

সন্ন্যাসীর আসল পরিচয় জানালেন। উদ্দেশ্য, যাতে শাস্তি না হয়। সব শুনে রাজা ত্রৈলঙ্গ স্বামীকে ছেড়ে দিতে বললেন। কিন্তু কথায় আছে বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়। রাজা মুক্তি দিলে কী হবে! রাজপ্রহরীগণ তাঁকে অপমান করতে ছাড়লেন না। স্বামীজির তাতে কোনও হেলদোল নেই। তিনি ফিরে গেলেন নিজের স্থানে।

রাতে ঘুমোতে গেলেন দর্পিত মহারাজা। সেদিন তাঁর কপালে অশেষ দুঃখ জমা ছিল। সুখনিদ্রায় সে রাত কাটল না। তিনি স্বপ্নে দেখলেন, এক বিশাল জটাজূট-মণ্ডিত ব্যাঘ্রচর্ম পরিহিত ত্রিশূলধারী শ্বেতবর্ণ পুরুষ তার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। ক্রোধে তাঁর চোখ দুটি লাল হয়ে আছে। তিনি রাজাকে বললেন, পাপিষ্ঠ! তুই ত্রৈলঙ্গর পরিচয় পেয়েও তাঁকে তোর সামনে অপমানিত হতে দিলি। তুই কোনও বাধা দিলি না। তুই আমাকেই অপমান করলি। তুই এই পুণ্যধাম কাশী থেকে যত তাড়াতাড়ি পারিস চলে যা, নইলে তোর রক্ষা নেই।

ত্রিশূলধারী শ্বেতবর্ণ পুরুষ বিদায় নেওয়া মাত্রই রাজার ঘুম ভেঙে গেল। তিনি ভয়ে চিৎকার করে অচেতন হয়ে পড়লেন। তাঁর চিৎকারে দাস-দাসীরা ছুটে এলে। সবাই মিলে শুশ্রূষা করে তাঁকে সুস্থ করে তুললে। ধাতস্থ হয়ে রাজা সেই স্বপ্নের কথা কাউকে আর জানালেন না। সকাল হওয়ার পর তিনি কয়েকজন বিশ্বস্ত সঙ্গীকে নিয়ে ত্রৈলঙ্গ স্বামীর খোঁজে বেরোলেন। দশাশ্বমেধ ঘাটেই তাঁকে পাওয়া গেল। রাজা কোনও কথা না বলে স্বামীজির চরণে লুটিয়ে পড়লেন। রাজা কাঁদছেন, তাঁর সমস্ত দর্প অশ্রু হয়ে ঝরে পড়ছে বিশ্বনাথের চরণে। আর স্বামীজি হাসছেন। তিনি ক্ষমাসুন্দর। ক্ষমার প্রতিমূর্তি। তিনি রাজাকে ক্ষমা করে দিলেন।

বাচস্পতি কেদারনাথ ব্যানার্জি। স্বামীজির শিষ্য। তাঁর বাড়িতে একদিন স্বামীজিকে নিয়ে গিয়ে খাওয়াবার খুব ইচ্ছা। ত্রৈলঙ্গজি যেতে রাজি হলেন। খাওয়া শেষ হওয়ার পর স্বামীজি জল চাইলেন। বাচস্পতিমশাই জল আনতে ভিতরের ঘরে গেলেন। যে-কোনও কারণে তাঁর জল নিয়ে আসতে একটু দেরিই হয়েছিল। তিনি জল নিয়ে ফিরে এসে দেখলেন স্বামীজি জল পান করছেন। অথচ ধারেকাছে জল এনে দেওয়ার মতো কেউ নেই। অলৌকিক এই ঘটনায় বাচস্পতিমশাই স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন অতিথিকে নিমন্ত্রণ করে খেতে দেওয়ার সময় পরিমাণমতো খাদ্য ও পানীয় জলের ব্যবস্থা রাখা যথার্থ গৃহকর্তার আশু কর্তব্য। তিনি স্বামীজির কাছে ক্ষমা চেয়ে নিলেন।

উজ্জয়িনীর মহারাজা কাশীর নরেশের সঙ্গে গঙ্গাভ্রমণে বেরিয়েছেন। নৌকো তখন মণিকর্ণিকার কাছে। রাজা দেখতে পেলেন গঙ্গাবক্ষে বিশালদেহী এক মানুষ পদ্মাসনে বসে আছেন। ওই অবস্থায় তাঁকে দেখে তিনি আশ্চর্য হয়ে গেলেন। নৌকোর অন্যদের কাছ থেকে মানুষটির আসল পরিচয় জানতে চাইলেন। তাঁরা বললেন, ভাসমান ওই ব্যক্তি একজন যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ। জল-স্থল-অন্তরীক্ষে তাঁর অবাধ গতি। এইসব কথা শুনে রাজার বড় আহ্লাদ হল। সাধুকে নিয়ে তাঁর গঙ্গাভ্রমণের সাধ জাগল। অন্তর্যামী স্বামীজি পদ্মাসনে বসে মিটিমিটি হাসছেন। রাজার মনের ইচ্ছা তো তাঁর কাছে অজানা নয়। ফলে নৌকো তাঁর কাছে আসা মাত্রই, কোনও অনুরোধ করার আগেই তিনি নৌকোয় উঠে পড়লেন। উজ্জয়িনীর রাজা খুবই অবাক হয়েছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, সাধক অত্যন্ত উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন মহাপুরুষ। রাজার হাতে সেইসময় ধরা ছিল একটি সুদৃশ্য তরবারি। কোনও একটি কৃতিত্বের উপহার স্বরূপ তিনি সেটি ব্রিটিশদের কাছ থেকে পেয়েছিলেন। স্বামীজি বালকসুলভভঙ্গিতে সেই তরবারিখানি দেখতে চাইলেন। রাজা তাঁর হাতে তরবারিখানি তুলে দিলেন। ত্রৈলঙ্গ স্বামী বেশ ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে সেটিকে অনেকক্ষণ ধরে দেখলেন। তারপর তিনি সেই চমৎকার কাণ্ডটি ঘটালেন। তরবারিটি রাজার হাতে ফেরত না দিয়ে ফেলে দিলেন গঙ্গাবক্ষে। কাণ্ড দেখে রাজা বাকরহিত। তারপর তিনি রাগে ফেটে পড়লেন। স্বামীজিকে চরম অপমান করে বললেন, তুমি দ্রব্যের গুণাগুণ নির্ণয়ে অনভিজ্ঞ এক যোগী। যাঁরা রাজাকে স্বামীজির পরিচয় দিয়েছিলেন তাঁরা বড়ই বিপদে পড়লেন। তাঁরা রাজাকে শান্ত করার জন্য বললেন, মহারাজ আপনি শান্ত হোন, আমরা ডুবুরি নামিয়ে ওই তরবারি উদ্ধার করে আনব। রাজা তাতেও শান্ত হলেন না। এক সময় নৌকো ঘাটে এসে ভিড়ল। স্বামীজি রাজার মনোভাব বুঝতে পেরেও নৌকো থেকে নামতে চাইলেন। মহারাজা তাঁকে বাধা দিলেন, ইচ্ছা শাস্তি

দেওয়ার। ত্রৈলঙ্গ স্বামীজি রাজার মনের কথা অনেক আগেই বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি হাসতে হাসতে গঙ্গাবক্ষে হাত ডুবিয়ে দুটি একই রকম দেখতে তরবারি তুলে এনে রাজার সামনে পেশ করে বললেন, আপনার তরবারিটা আপনি নিয়ে নিন। মহারাজ মহাবিপদে পড়লেন। তরবারি দুটি একই রকমের দেখতে। কোনটা যে তাঁর তা তো বোঝা যাচ্ছে না। মহারাজের দর্পচূর্ণ হয়ে গেল এক নিমেষে। তিনি লজ্জায় মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইলেন। তখন ত্রৈলঙ্গস্বামী জলদ গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'বাবা, তুমি নিজের জিনিস বলে যাহা দাবি করিতেছ তাহা নিজেই চিনিতে পারিলে না। আমি দেখিতেছি তুমি একেবারে অজ্ঞান, মোহ ও দম্ভে পরিপূর্ণ। ইহকাল ও পরকালের যাহা নিত্যসঙ্গী তাহাই তো নিজের জিনিস। মৃত্যুর পর এ তরবারি তোমার সঙ্গে যাইবে না। যে জিনিস বা যে বস্তু তোমার সঙ্গে যাইবে না—যাহাকে এপারেই ফেলিয়া যাইতে হইবে, তাহা কী করিয়া তোমার জিনিস হইল? যাহা তোমার নিজের নয় তাহার জন্য এত ক্রোধ কেন?' ত্রৈলঙ্গ স্বামীজি কথা শেষ করে একটি তরবারি রাজার হাতে দিয়ে অন্যটিকে গঙ্গাবক্ষে বিসর্জন দিলেন। তারপর তিনি ফিরে চললেন নিজের গন্তব্যে। এতক্ষণে মহারাজের চৈতন্য ফিরল। তিনি বুঝতে পারলেন, এই মানুষটি সত্যই একজন ত্রিকালজ্ঞ মহাপুরুষ। তিনি আর কালক্ষেপ না করে স্বামীজির চরণদুটি দু-হাতে চেপে ধরলেন। তিনি তখন অনুতপ্ত। স্বামীজির কাছে বারংবার ক্ষমা চাইতে লাগলেন। স্বামীজি আশীর্বাদ করে চলে গেলেন নিজের গন্তব্যে।

প্রসঙ্গক্রমে এসে পড়েছে মণিকর্ণিকা ঘাটের কথা। বারাণসীর এইখানেই দেবীর কুণ্ডল পড়েছিল। সেই জন্যই এই স্থান মণিকর্ণিকা নামে খ্যাত। এটি মহাশ্মশানও বটে। কথিত আছে, এখানে চিতার আগুন কখনও নেভে না। ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব এই ঘাটে চিতার ধূম দেখে সমাধিস্থ হয়ে পড়েছিলেন। জীব কীভাবে মুক্তি পান তা স্বচক্ষে দেখেছিলেন তিনি। শাস্ত্রে যে কথা কখনও কেউ লেখেননি তা তিনি জানিয়েছিলেন আমাদের।

কাশীখণ্ডে কী বলা আছে—দ্বাপর যুগে ভগবান বিষ্ণু এখানে মহাতপস্যা করেন। এবং তাতে সিদ্ধিলাভ করে নিজের সুদর্শনচক্র দিয়ে একটি পুষ্করিণী খনন করে ফেললেন। তারপর এই পুষ্করিণী তিনি নিজের ঘাম দিয়ে পুণ্য করে দেন। বিষ্ণু তাঁর চক্রের সাহায্যে এই পুষ্করিণী খনন করেছিলেন বলে এর আর এক নাম চক্রপুষ্করিণী।

বিষ্ণুর কঠোর তপস্যায় মুগ্ধ হয়ে মহাদেব আনন্দে মাথা নাড়াতে থাকেন। আর এর ফলে তাঁর কর্ণকুণ্ডল খুলে ওই পুষ্করিণীতে পড়ে। মহাদেব তখন বিষ্ণুকে বলেন, আমার কুণ্ডল তোমার খোঁড়া পুষ্করিণীতে গিয়ে পড়েছে। তাই আজ থেকে এর নাম হল মণিকর্ণিকা।

তবে শিবপুরাণ অন্য কথা বলছেন। সেখানে বলা হয়েছে ওই কুণ্ডে স্বয়ং বিষ্ণুর কুণ্ডল খসে পড়েছিল। আবার পীঠ নির্ণয় সম্পর্কিত গ্রন্থে বলা হয়েছে, এই কুণ্ডে স্নানের সময় দেবী পার্বতীর কুণ্ডল ও শংকরের মণি জলে হারিয়ে যায়। স্নানের আগে পুরোহিতকে কুণ্ড দক্ষিণা দিতে হয়। কিন্তু পার্বতী ও শংকর সেই কাজটি করেননি।

হারিয়ে যাওয়া কুণ্ডল ও মণি খোঁজার কাজে ব্যস্ত শংকরের কাছে এই সময় বিষ্ণু জানতে চেয়েছিলেন—দেবাদিদেব আপনি কী খুঁজছেন। শংকর বলেছিলেন—কুণ্ডল ও মণি। উত্তরে বিষ্ণু বলেছিলেন, আপনি ও দেবী পার্বতী স্নানের আগে দক্ষিণা দেননি, তাই দক্ষিণাস্বরূপ ওগুলো কুণ্ডে পড়েছে।

সুমন গুপ্ত তাঁর গ্রন্থে লিখছেন, 'কাশীমাহাত্ম্যে এভাবেই লেখা আছে, কপিল বা সাংখ্যযোগ তথা বহুতর ব্রত দ্বারা যে গতি লাভ করা যায় না, এই মণিকর্ণিকা মানবগণকে অনায়াসে সেই গতি প্রদান করে। ব্রহ্মচারীগণও অন্তিমকালে মুক্তির জন্য মণিকর্ণিকায় আশ্রয় নেন। প্রতিদিন সহস্র-সহস্র তীর্থযাত্রী এই মণিকর্ণিকার জল স্পর্শ করে অশেষ পুণ্য লাভ করে।'

সৌরপুরাণ মতে বিশ্বেশ্বরের প্রিয় মণিকর্ণিকা তীর্থের তুল্য তীর্থ আর কোথাও নেই। গুপ্তযুগেও বারাণসীর শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান ছিল মণিকর্ণিকা। তাই তো বলা হয়—

'তীর্থকং পঞ্চকং সারং বিশ্বেশানন্দ কাননে।
দশাশ্বমেধং লোলার্কঃ কেশবোবিন্দুমাধবঃ
পঞ্চমী তু মহাশ্রেষ্ঠা প্রোচ্যতে মণিকর্ণিকা।।'

বলা হয় চক্রপুষ্করিণী গঙ্গার মতোই পবিত্র। মণিকর্ণিকা ঘাটের উপর রয়েছে মণিকর্ণিকেশ্বর মন্দির ও বিষ্ণুর চরণপাদুকা। রয়েছে তারকেশ্বর মন্দির। প্রবাদ আছে—এখানে ভগবান বিষ্ণু মহাদেবের ধ্যান করেছিলেন বলে একখানি মর্মর প্রস্তরের উপর দুখানি পদতলের ন্যায় চিহ্ন আছে। এই চিহ্ন প্রায় দেড়হাত লম্বা। কার্তিক মাস নারায়ণের মাস। এই মাসে নানা জায়গা থেকে তীর্থযাত্রীরা এখানে এসে এই চরণপাদুকার পুজো করেন।

'বিষ্ণুপাদাৎসম্ভুতে গঙ্গে ত্রিপদগামিনী।
ধর্মরূপেণ বিখ্যাতা পাপমসে হরিজাহ্নবী।।
জাহ্নবী সর্বদৎ পুণ্যাম ব্রহ্মহত্যাদি পাপহারিণী।
বারাণ্যাস্যাং বিশেষণ গঙ্গা উত্তরবাহিনী।।'

'মধ্যাহ্ন মণিকর্ণিকা হরিহর সাজ জোমুক্তিপ্রদ।' মধ্যাহ্নের বারোটা থেকে দুটোর মধ্যে মণিকর্ণিকার একটি বিশেষ মাহাত্ম্য আছে। এই সময় শংকর ও পার্বতী এই কুণ্ডে স্নান করতে আসেন। তখন এই কুণ্ডে স্নান করলে তাঁর অশেষ পুণ্যলাভ হয়। শোনা যায়, এই ঘাটের মহাশ্মশানেই মহারাজা হরিশ্চন্দ্র সত্য রক্ষার জন্য নিজেকে এক চণ্ডালের হাতে বিক্রি করে দেন। এখানেই দাহকার্য করতেন তিনি।

'তৃণকৃত্য নিজং দেহং যত্র রাজর্ষিসত্তমঃ।
হরিশ্চন্দ্রঃ সপত্নীকো ব্যক্রিণাদ ভূরিয়ং হি সং।।'

শ্মশান ঘাট ও তীর্থঘাট—মণিকর্ণিকার দুটো অংশ। এই ঘাটে পিণ্ডদানও হয়। বিশ্বাস করা হয়, যে-কোনও মনস্কামনা নিয়ে এই ঘাটে স্নান করলে তা পূর্ণ হয়। বহুযুগ আগে মহাদেব কালুডোমকে মণিকর্ণিকা মহাশ্মশানে মৃতদেহ দাহ করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। আজও কালুডোমের বংশধররা এই কাজে নিযুক্ত।

আবার ফিরে যাই স্বামীজির পাশটিতে। কলকাতার এক নাস্তিক উকিল শুধুমাত্র ভ্রমণের উদ্দেশে কাশী এলেন। সময় কাটাবার জন্য বিশ্বনাথ মন্দির, অন্নপূর্ণা মন্দিরেও গেলেন। ঘুরলেন আরও নানা মন্দিরে। তবে কোথাও কোনও পুজো নয়, প্রণাম তো দূর অস্ত। তিনি যে প্রতিমা পুজোর ঘোর বিরোধী। হিন্দু শাস্ত্রে বলা আছে, দেব-দেবী এবং সাধু দর্শন অত্যন্ত হিতকর। এবং এই সব জায়গায় খালি হাতে কখনওই যাওয়া উচিত নয়। দরিদ্র ও অসমর্থ ব্যক্তি পত্র, পুষ্প এবং ফল কিনতে না পারলে হরীতকী বা সুপারি দিয়েও দর্শন করতে পারেন। যে ব্যক্তি শাস্ত্র কখনও পড়েননি তিনি তা জানবেন কীভাবে! ফলে উকিল ভদ্রলোক নিজের ইচ্ছেমতো যথেচ্ছ ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

কাশীধামের ত্রৈলঙ্গ স্বামীজির কথাও তিনি বেশ কয়েক দিন ধরে শুনছিলেন। লোকটি নাকি নানা অলৌকিক কাণ্ড ঘটাচ্ছেন। নাস্তিক উকিল মনে মনে ভাবলেন, অনেককিছু তো দেখা হল, এবার কাশী ছাড়ার আগে ওই লোকটির তামাশা দেখা যাক। একদিন বিকেলে তিনি স্বামীজিকে দেখতে গেলেন। অন্যান্য দিনের মতো সেদিনও বহু ভক্ত সেইসময় তাঁকে ঘিরে বসেছিলেন। ওই ভদ্রলোক এক পাশে দাঁড়িয়ে সবকিছু দেখতে লাগলেন। বেশ কিছুক্ষণ কেটে যাওয়ার পর ওই উকিল ভদ্রলোকের সমস্ত অহঙ্কার ফুটো বেলুনের

মতো একদম চুপসে গেল। কোনও এক অদৃশ্য শক্তি তাঁর ঘাড় ধরে স্বামীজির চরণতলে ঠেলে ফেলে দিল। পাশে কোনও অদৃশ্য শক্তিধর কেউ যে আছেন তা তিনি উপলব্ধি করতে পারলেন। হিমশীতল কণ্ঠে সেই অদৃশ্য শক্তি তাঁর কানের কাছে ফিসফিস করে বললেন, 'পাপিষ্ঠ, দুছত্র ইংরেজি পড়ে তোমার এতটাই অহঙ্কার হয়েছে যে তুমি হিন্দু ধর্ম-কর্ম সব পরিত্যাগ করে বসে আছ। যদি নিজের কল্যাণ চাও তবে ওই মহাত্মার পায়ে ধরে কৃপা প্রার্থনা করো।' ভদ্রলোক দেখলেন মহা বিপদ। তিনি স্বামীজির দুটি পা দু-হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরলেন। প্রণাম করার পর সেই মানুষটির মন অলৌকিক আনন্দে ভরে গেল। হিন্দু শাস্ত্র ও দেব-দেবী সম্পর্কে তাঁর ধারণা সম্পূর্ণ পালটে গিয়েছিল। সম্পূর্ণ রূপান্তরিত ব্যক্তি হয়ে তিনি ফিরে গেলেন কলকাতায়।

তিনি কলকাতায় ফেরার আগে মঙ্গল ভট্টজির কাছে স্বামীজির সেবার জন্য মাসিক কিছু টাকা পাঠানোর ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। মঙ্গলজির কাছ থেকে স্বামীজি সেকথা শুনে অত্যন্ত বিরক্ত হন। পরবর্তীকালে স্বামীজি ব্রহ্মে লীন হওয়ার পর তিনি মাসিক দশ টাকা করে নিয়মিত পাঠাতেন।

কলকাতা নিবাসী দুই বাঙালি ভদ্রলোক স্বামীজিকে দর্শন করতে এসেছেন। তাঁরা স্বামীজিকে প্রণাম করা মাত্র তিনি তাঁদের ইঙ্গিতে চলে যেতে বললেন। তাঁদের মধ্যে একজন স্বামীজির আদেশ মেনে চলে যেতে উদ্যত হলেন। কিন্তু অপরজন 'কেন যাব' গোঁ ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন। স্বামীজি তখন আশ্রমের শিষ্য গো-সেবককে ইশারা করে ভদ্রলোককে বাইরে নিয়ে যেতে বললেন। কিন্তু গো-সেবকের অনুরোধেও সেই ব্যক্তি বাইরে যেতে রাজি হলেন না। গো-সেবক বললেন, আপনার তো দর্শন হয়ে গেছে। তাহলে আপনি কেন এখানে অহেতুক দাঁড়িয়ে থাকবেন! বাবা, নিরর্থক ভিড় পছন্দ করেন না। ব্যক্তিটি এই কথায় আরও খেপে গিয়ে গো-সেবককে ধাক্কা মেরে বললেন, আমি এখন এখান থেকে যাব না। বাবা সামনে দাঁড়িয়ে আছেন, গো-সেবক তাই এতক্ষণ কোনও অশোভন আচরণ করেননি। এক ধাক্কায় তাঁর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। তিনিও বলপ্রয়োগে উদ্যত হলেন। এই সময় স্বামীজি ইঙ্গিতে তাঁদের নিরস্ত করে নিজ শিষ্য মঙ্গল ভট্টকে কাগজ-কলম নিয়ে আসতে বললেন, স্বামীজি বেদি সংলগ্ন দেওয়ালে দেবনাগরী অক্ষরে বহু শ্লোক লেখা ছিল। তিনি মঙ্গল ভট্টকে একটি একটি করে অক্ষর দেখাতে শুরু করলেন, আর ভট্টজি তা তাঁর হাতের কাগজে লিখে ফেললেন, লেখা শেষ হওয়ার পর স্বামীজির আদেশে মঙ্গল ভট্ট সেটি ওই অসভ্য ভদ্রলোককে পড়ে শোনালেন। তাতে লেখা ছিল—'বাবা, তুমি তোমার আঠারো টাকা দামের জুতো জোড়া বাহিরে খুলে রেখে আমাকে দেখতে এসেছ। জুতো জোড়া চোরে নিয়ে গেলে বড় ক্ষতি হবে, খালি পায়ে বাসায় যেতে হবে ভেবে কখন থেকে ব্যাকুল হয়ে রয়েছে। এইরকম দুশ্চিন্তা নিয়ে এখানে থাকার কি কোনও প্রয়োজন আছে? জুতো এখনও চুরি যায়নি।' ভদ্রলোক তখন বাকরহিত। তিনি খানিকটা ধাতস্থ হওয়ার পর জুতোর দাম আঠারো টাকা ও দুশ্চিন্তার কথা স্বীকার করলেন, তখন সেই মানুষটির তর্জন-গর্জন সব উধাও। স্বামীজি এরপর ইঙ্গিত করা মাত্র তিনি সুড়সুড় করে আশ্রম থেকে বিদায় নিলেন।

শ্রীরামপুর নিবাসী জয়গোপাল কর্মকার পরিণত বয়েসে কাশীতে চলে এলেন। সাধু-সন্ন্যাসীর ওপর তাঁর অগাধ ভক্তি ও বিশ্বাস। তিনি প্রতিদিনই স্বামীজির কাছে ফল ও দুধ নিয়ে আসতেন। এইভাবে কিছুদিন আসার পর স্বামীজির কৃপালাভে ধন্য হলেন। একদিন সকালে ঘুম থেকে ওঠার পরই কর্মকারবাবুর বুক ভীষণ ধড়ফড় করতে শুরু করল। শরীর জুড়ে প্রবল এক অস্বস্তি। তিনি স্বামীজির সঙ্গে দেখা করে তাঁকে সব কথা জানালেন। শারীরিক অসুবিধার কথাও জানাতে ভুললেন না। তিনি যে বাড়ির চিন্তায় বড়ই উদগ্রীব হয়ে আছেন তা বুঝতে পেরেছিলেন স্বামীজি। তিনি কর্মকারবাবুকে বললেন, বাবা, তুমি শান্ত হয়ে বসো। আমি এখনিই তোমার বাড়ির খবর এনে দিচ্ছি। এই কথা বলেই স্বামীজি ধ্যানে বসলেন। কেটে গেল বেশ কিছুক্ষণ। একসময় চোখ খুলে কর্মকারবাবুকে বললেন, বাবা, আজ ভোর ছটার সময় তোমার বড় পুত্র কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে। তুমি আজ রাতে স্বপ্নে তাকে দর্শন করতে পারবে। এই খবর শুনে কর্মকারবাবু নিজেকে আর স্থির রাখতে পারলেন না। কান্নায় ভেঙে পড়লেন। স্বামীজি এইসময় তাঁকে সান্ত্বনা

দিয়ে জীবনের অনিত্যতা সম্পর্কে নানা উপদেশ দেন। পরের দিন তাঁর বাড়ি থেকে মৃত্যুসংবাদ নিয়ে টেলিগ্রাম এল। তবে সেই তার আসার অনেক আগেই তিনি তাঁর বড়ছেলের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে গিয়েছিলেন।

১২৭৬ সাল। দয়ানন্দ সরস্বতী নামে একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে কাশীতে এলেন। তিনি তাঁর বক্তৃতায় হিন্দু দেব-দেবী উপাসনার চরম বিরোধিতা করতে শুরু করেন। তিনি ব্রাহ্মধর্মের প্রতিনিধি। এক ঈশ্বর জগতের কর্তা। তাঁর কোনও আকার নেই। তিনি নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ। তিনি সর্বদা সর্বত্র অবস্থান করে জগতের মঙ্গলসাধন করছেন। তাই সীমাবিশিষ্ট দেবদেবীতে তাঁর উপাসনা সম্ভব নয়, দয়ানন্দ সরস্বতীর কথা শুনে বহু মানুষই হিন্দু ধর্ম পরিত্যাগ করে ব্রাহ্ম হতে শুরু করলেন। একদিন বেশ কয়েকজন ভক্ত ও শিষ্য ত্রৈলঙ্গ স্বামীজির কাছে দয়ানন্দ সংকটের কথা জানালেন। তিনি সব কথা শুনে একটা কাগজ ও কলম আনিয়ে দেবনাগরী অক্ষরে কিছু কথা লিখে সেটি পাশে রেখে দিলেন। এরপর তিনি ডেকে পাঠালেন মঙ্গল ভট্টজিকে। সেই কাগজটি তাঁর হাতে দিয়ে ইশারায় বললেন, তুমি এই কাগজটি এখনই দয়ানন্দ সরস্বতীকে দিয়ে এসো। গুরুদেবের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন ভট্টজি। দয়ানন্দ সেই চিঠিটি পড়ার পরই কাশী ত্যাগ করে কোথায় চলে গেলেন! কিন্তু সেই কাগজে কী লেখা ছিল! স্বামীজি ও দয়ানন্দ সরস্বতী ছাড়া আর কেউই সে সম্পর্কে আলোকপাত করতে পারবেন না।

১২৮১ সাল, স্বামী পৃথীগিরির শিষ্য বিদ্যানন্দ স্বামী রাজঘাটে এলেন। সেইসময় অনেকেই তাঁকে কাশীধাম দর্শন করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। উত্তরে স্বামী বিদ্যানন্দ বলেছিলেন, কাশীতে দর্শন করার তো তেমন কিছু নেই, তবে ত্রৈলঙ্গস্বামীকে একবার দেখে আসলে হয়।

কয়েকদিন বাদে একদিন সকালবেলায় বিদ্যানন্দ স্বামী ত্রৈলঙ্গজির আশ্রমে উপস্থিত হলেন। সেইসময় সেখানে কয়েকজন ব্রহ্মচারী ও ভক্ত এদিক-ওদিক বসেছিলেন। বিদ্যানন্দকে দেখতে পেয়েই স্বামীজি উঠে গিয়ে তাঁকে সাদরে আলিঙ্গন করলেন। তারপর কী হল! দুজনেই ভ্যানিশ। কর্পূরের মতো উবে গেলেন। উপস্থিত সকলেই খুব অবাক হয়েছিলেন। বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল। স্বামীজির কোনও খোঁজ নেই। হঠাৎই তাঁকে আবার তাঁর বেদিতে বসে থাকতে দেখা গেল। কিন্তু স্বামী বিদ্যানন্দ কোথায়! পরে স্বামীজি বলেছিলেন, তিনি বিদ্যানন্দ স্বামীর সঙ্গে রাজঘাটে গিয়েছিলেন, এবং তিনি একা ফিরে আসেন।

খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে স্বামীজি সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। নিজে কখনও খাওয়ার সংগ্রহের চেষ্টা করতেন না। তিনি 'অজগর বৃত্তি' বা 'আকাশ বৃত্তি' অবলম্বন করেছিলেন। নিজের হাতে কখনও কোনও খাবার তিনি মুখে তুলতেন না। যে যা এসে মুখে তুলে দিতেন তাই তিনি খেয়ে নিতেন। এবং সেই খাবার পরিমাণও কখনও ঠিক থাকত না। স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁকে একবারে আধমন ক্ষীর খাইয়ে ছিলেন। মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর একবার ওইরকম অভিজ্ঞতা হয়েছিল, তিনি তাঁর খাবার সরিয়ে রেখে বাকিটা স্বামীজিকে খাইয়ে দিয়েছিলেন। বিজয়কৃষ্ণজির এইরকম আচরনে স্বামীজি খুব মজা পেয়ে বলেছিলেন—'বাচ্চা সাচ্চা হ্যায়।' শোনা যায় কোনও কোনও সময় স্বামীজি এক মন পর্যন্ত খাবারও খেয়ে নিতেন। তবে এইরকম অস্বাভাবিক খাদ্যগ্রহণের ফলে তিনি কখনও অসুস্থ হয়ে পড়েননি। যোগীর শরীর, তাতে যা দেওয়াই হোক না কেন কোনওরকম সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে না। স্বামীজি কখনও কখনও দিনের পর দিন অনাহারেও থাকতেন। তখনো তাঁর কোনও সমস্যা হত না। অতি আহার বা অনাহার—কখনওই এই যোগীকে কোনও বিপদে ফেলতে পারেনি।

স্বামীজির খাদ্যাখাদ্য বিষয়ে কোনও বিচার ছিল না বলে দুষ্ট প্রকৃতির কিছু লোক তাঁকে ভণ্ড বলে মনে করত। কতিপয় দুষ্ট লোক একদিন মজা করার জন্য স্বামীজিকে প্রচুর পরিমাণে চুনমিশ্রিত জল দুধ বলে খাইয়ে দেয়। স্বামীজি অন্তর্যামী। তিনি তাদের সমস্ত কু-অভিপ্রায় বুঝতে পারা সত্ত্বেও বালতি ভরা চুন-গোলা জল পান করে নিলেন। তার পরেও তিনি তাঁর আসনে নির্বিকারভাবে বসে রইলেন। মুখমণ্ডলে কোনওরকম ছাপ পড়ল না। এইসব দেখে সেই লোকগুলি ভীষণই ভয় পেয়ে গেল। অথবা ঈশ্বরের ইচ্ছায় তাদের মনে কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ জেগেছিল। তারা স্বামীজির চরণ স্পর্শ করে নিজেদের অপরাধের কথা স্বীকার করে

ফেলল। তারা স্বামীজির পা দুটি ধরে ক্ষমাও চেয়েছিল। ত্রৈলঙ্গ স্বামীজি সে কথায় কর্ণপাত না করে তাদের সামনে প্রস্রাব করে আলাদাভাবে চুন ও জল শরীর থেকে বের করে দিলেন। এই ব্যাপার দেখে অপরাধীগণ আরও ভয় পেয়ে যায়। তারা তড়িঘড়ি সেখান থেকে পালিয়ে গিয়েছিল। শোনা যায় কিছুদিন বাদে স্বয়ং ঈশ্বর তাদের শাস্তি দিয়েছিলেন। কঠিন রোগে ভুগে তারা অকালে মারা যায়। এর থেকেই বোঝা যায় সাধুর ওপর বিন্দুমাত্র অত্যাচার ভগবান সহ্য করতে পারেন না। শাস্তি দেওয়ার দায়িত্বটা তিনি নিজের কাঁধে তুলে নেন।

কাশীর সোনারপুর এলাকার বাসিন্দা রামকমল চট্টোপাধ্যায়ের পাঁচ বছরের পুত্র, সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে তাঁর পাঁজরের একখানি হাড় ভেঙে যায়। তাকে ভর্তি করা হয় ভেলপুর হাসপাতালে। কিছুদিন চিকিৎসা চলার পর বাচ্চাটি কিছুটা সুস্থ হলেও পাঁজরের ব্যথা কোনওমতেই কমল না। সে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারত না। তখন ভেলপুর হাসপাতালের চিকিৎসকরা বালকটিকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করাতে বলেন। এই কথা শুনে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পুত্রকে নিয়ে কলকাতার উদ্দেশে রওনা হলেন। কলকাতার চিকিৎসকরা বালকটিকে পরীক্ষা করে বুঝতে পারলেন অস্ত্রোপচার ছাড়া একে কিছুতেই সম্পূর্ণ সুস্থ করা যাবে না। তাঁরা সেই কথা চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে জানিয়ে দিলেন। ডাক্তাররা আরও বললেন, অস্ত্রোপচারটি বড়ই জটিল। এতে বালকটির প্রাণসংশয় পর্যন্ত হতে পারে। এই কথা শুনে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ভীষণই ভয় পেয়ে গেলেন। তিনি পুত্রকে নিয়ে তড়িঘড়ি কাশীতে ফিরে আসেন। বাড়ি ফিরে তিনি তাঁর স্ত্রীকে সমস্ত কথা জানালেন। বাড়িতে প্রবল শোকের ছায়া। চট্টোপাধ্যায় গৃহিণী ভীষণভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন। প্রবল কান্নাকাটি। এদিকে বাচ্চাটির শারীরিক অবস্থা ক্রমশ খারাপ হচ্ছে। একদিন এই দম্পতি ত্রৈলঙ্গ স্বামীর শরণাপন্ন হবেন বলে ঠিক করলেন। তাঁরা পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে স্বামীজির কাছে গেলেন এবং তাঁর পাশে চুপ করে বসে রইলেন। এইভাবে কেটে গেল একটা মাস। একদিন হঠাৎই স্বামীজি ছেলেটির মাকে ইশারায় তাঁর সামনে আসতে বললেন, তিনি সামনে আসা মাত্র স্বামীজি তাঁর কাছে তাঁদের আসার কারণটা ইশারায় জানতে চাইলেন। ভদ্রমহিলা স্বামীজির চরণ স্পর্শ করে পুত্রের সমস্যার কথা সবিস্তারে জানালেন। স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে বালকের দিকে একবার তাকিয়ে স্বামীজি ইঙ্গিতে বললেন, সামনে ওই যে মাটি দেখছ ওখান থেকে একটু মাটি তুলে নিয়ে ওর আঘাতের স্থানে লাগিয়ে দাও। এবং তোমরাও আর এখানে বেশিক্ষণ বসে থেকো না। তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে যাও। কারণ কিছুক্ষণ বাদেই তোমাদের পুত্র প্রবলজ্বরে আক্রান্ত হবে। তাতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। কিছুক্ষণের মধ্যে জ্বর কমে যাবে। এরপর তোমাদের পুত্রের ভীষণ খিদে পাবে। বাড়িতে যা আছে তাই ওকে খেতে দিও। ভয় নেই, তোমাদের পুত্র ভালো হয়ে যাবে।

স্বামীজি যা যা বলেছিলেন সেদিন সেইরকম ঘটনাই একের পর এক ঘটেছিল। শুধু তাই নয় বালকটি অতি দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠল। স্বামীজির কৃপায় তার ব্যথা-বেদনা সব উধাও হয়ে গিয়েছিল।

এইরকম নানা অলৌকিক ঘটনা স্বামীজি 'কাশীপর্বে' বারে বারে ঘটিয়েছেন। কখনও মৃত মানুষ তাঁর কৃপায় পুনরায় জীবিত হয়েছেন, আবার কখনও মৃত্যুপথযাত্রী মানুষকে তিনি ছিনিয়ে এনেছেন মৃত্যুর করাল গ্রাস থেকে। মৃত্যুর হাতকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে তিনি জীবননৌকায় তুলে দিয়েছেন সেই মানুষটিকে। মনে করিয়ে দিয়েছেন বিশ্বের স্রষ্টা সেই ঈশ্বরকে—আমি কাশীর বর্তমান অভিভাবক। আমাকে না জানিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত তুমি নিতে পারবে না। যে দেহে স্বয়ং বিশ্বেশ্বর বাস করেন তাঁকে উপেক্ষা করার সাধ্য কার আছে! তাই তো তিনি কাশীর সচল বিশ্বনাথ ত্রৈলঙ্গ স্বামী।

আবার ঘটাবেন আর একটি অলৌকিক ঘটনা। খালিসপুরের বাসিন্দা ভবানীচরণ বাচস্পতিমহাশয় নানাবিধ রোগে আক্রান্ত। প্লিহা, যকৃৎ আর বশে নেই। রোজই জ্বর হচ্ছে। সবরকম চিকিৎসা তিনি করিয়েছেন, কিন্তু কোনও ফল হয়নি। মৃত্যুভয় গ্রাস করেছে বাচস্পতি মশাইকে।

তিনি কেন, কাশীর সবাই তখন জানতেন কাশীর সচল বিশ্বনাথ ত্রৈলঙ্গস্বামী মৃত্যুকেও পরোয়া করেন না। মৃত্যু তাঁর আজ্ঞাবহ ভৃত্য মাত্র। বাচস্পতিমশাই এরপর থেকে প্রতিদিনই স্বামীজির আশ্রমে যেতে শুরু করলেন। যাওয়া-আসা চলতেই থাকল। স্বামীজিও প্রতিদিন বাচস্পতিমশাইকে লক্ষ করেন কিন্তু মুখে কিছু

বলেন না। এইভাবে বেশ কিছুদিন কেটে গেল। একদিন সকালে বাচস্পতিমশাই আশ্রমে যাওয়া মাত্রই স্বামীজি জানতে চাইলেন—তুমি কী কারণে নিয়মিত আমার কাছে আসছ? বাচস্পতিমশাই তাঁর শারীরিক সমস্যার কথা জানিয়ে স্বামীজির কৃপা প্রার্থনা করলেন।

স্বামীজি সব কথা মন দিয়ে শুনলেন। ওষ্ঠে সেই স্মিত হাসিটি তখনও লেগে রয়েছে। মঙ্গল ভট্টকে কিছুটা সিদ্ধি এনে দিতে বললেন। সিদ্ধি এল, তিনি সেই সিদ্ধি বাচস্পতিমশাইকে বাটতে দিলেন। সিদ্ধি বাটা শেষ হওয়ার পর স্বামীজি সেখান থেকে এক মটর দানা পরিমাণ খেতে আদেশ করলেন। প্রাণের মায়া বড় মায়া। সাতসকালেই তিনি ছোট্ট সিদ্ধির গুলিটি খেয়ে ফেললেন। নিয়মিত এই একই ঘটনা চলতে লাগল। বাচস্পতিমশাই সকালে আসেন, সিদ্ধি বাটেন, এক মটর দানা পরিমাণ সিদ্ধির গুলি সেবন করে বাড়ি চলে যান।

বেশ কিছুদিন এইভাবেই কেটে গেল। একদিন সকালে বাচস্পতিমশাই আশ্রমে এসে দেখলেন একটা জায়গায় কেউ প্রচুর বমি করে রেখেছেন। স্বামীজি তাঁকে দেখেই ইশারায় ওই বমি পরিষ্কার করার আদেশ দিলেন। তিনি কোনওরকম ঘৃণা-দ্বিধা না করে সেটি পরিষ্কার করলেন এবং স্নান করে এলেন। তারপর শুরু হল সিদ্ধি বাটা। কাজ শেষ হওয়া মাত্র সেখান থেকে এক মটর দানা পরিমাণ সিদ্ধি নিয়ে তিনি খেলেন। স্বামীজিকে প্রণাম করে বাড়ি চলে গেলেন।

পরের দিন সকালে বাচস্পতিমশাই আশ্রমে ঢুকেই একটু চমকে উঠেছিলেন। আশ্রমের এক স্থানে প্রচুর বিষ্ঠা কেউ জড়ো করে রেখে দিয়েছেন। তাঁকে দেখেই স্বামীজি ইশারায় ওই স্থানটি পরিষ্কার করার আদেশ দিলেন। বাচস্পতিমশাই বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে সেটি পরিষ্কার করলেন। তারপর স্নান সেরে বসে গেলেন সিদ্ধি বাটতে। অবশেষে সিদ্ধি সেবন ও প্রণাম।

প্রণাম করে মাথা তোলা মাত্র স্বামীজি তাঁকে ইশারায় বললেন, কাল থেকে তোমার এখানে আসার আর কোনও দরকার নেই। তুমি খুব শিগগিরই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাবে। তবে হতাশাকে জীবনে কখনও স্থান দিও না। অল্পদিনের মধ্যে বাচস্পতিমশাই সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হয়ে উঠলেন। তিনি এরপর থেকে মাঝে-মাঝেই স্বামীজিকে দর্শন ও প্রণাম করে যেতেন।

শুধু আমরা নই, ইংরেজ শাসকরাও মাঝে-মাঝে ত্রৈলঙ্গ স্বামীজিকে শাসন করতে চেয়েছে। আইনের দণ্ড দিয়ে তারা কব্জা করতে চেয়েছে সর্বস্ব ত্যাগী এই মহাযোগীকে। কোনও বয়স্ক, সুস্থ ব্যক্তি নগ্ন হয়ে রাজপথে চলাফেরা করতে পারবে না, যদি করে তাহলে সেটি আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হবে। এই আইন ব্রিটিশরা বহু আগেই প্রণয়ন করেছিল। অথচ কুম্ভমেলা উপলক্ষ্যে কত সাধু, ভক্ত, পুণ্যার্থী স্নান করতে আসেন। তাঁদের সঙ্গে আসেন নাগা সন্ন্যাসীরা। সেখানে তাঁদের চলাফেরায় কোনও বাধা-নিষেধ থাকে না। যত শাসন শুধু স্বামীজির বেলায়।

কাশীধামে এখনকার মতো তখনও বহু সাহেব-মেম বেড়াতে আসতেন। নগ্ন এই মহাপুরুষ তাঁদের চক্ষুপীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়াল। তাঁরা নিয়মিত স্বামীজির নামে প্রশাসনের কাছে নালিশ জানাতে লাগলেন। সেইসময় কাশীর ম্যাজিস্ট্রেট অত্যন্ত কঠোর প্রকৃতির ছিলেন। তাঁর নির্দেশে পুলিশ এসে বার কয়েক স্বামীজিকে সতর্ক করে যায়। কিন্তু নির্বিকার স্বামীজি তাদের কথায় কোনও কর্ণপাত করলেন না। ফল যা হওয়ার তাই হল। একদিন স্বামীজি গঙ্গাতীরে ধ্যানে বসেছেন। সেইসময় পুলিশ এসে তাঁকে থানায় যেতে বলল। সমাধিস্থ স্বামীজি, তখন তিনি বিচরণ করছেন অন্য এক জগতে। প্রহরীর কথা তাঁর কানে প্রবেশ করল না। স্বামীজির এহেন আচরণকে সেই প্রহরী উপেক্ষা বলে মনে করল। অপমানিত প্রহরী হাতের রুল দিয়ে স্বামীজির শরীরের বিভিন্ন স্থানে দু-চার ঘা বসিয়ে দিল। ঘাটে উপস্থিত মানুষজন প্রহরীর এই আচরণের তীব্র প্রতিবাদ জানালে সে আরও রেগে গেল। থানা থেকে আরও কয়েকজন প্রহরীকে ডেকে এনে বাহ্যজ্ঞানহীন স্বামীজিকে প্রায় পাঁজাকোলা করে থানায় নিয়ে গেল।

পরদিন স্বামীজিকে বিচারের জন্য সেই ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করা হলে সাহেব স্বামীজিকে সাবধান করে বলেন, তুমি আর কখনও নগ্ন হয়ে রাস্তাঘাটে ঘুরবে না। স্বামীজি তাঁর কথার কোনও উত্তর দিলেন না। এর ফলে সাহেব প্রচণ্ড রেগে গিয়ে স্বামীজিকে হাতকড়া পরানোর আদেশ দিলেন। কিন্তু হাতকড়া যাঁকে পরানো হবে তিনি কোথায়? সাহেব আদেশ দেওয়া মাত্রই তিনি কাঠগড়া থেকে মুহূর্তের মধ্যে উধাও হয়ে গেলেন। সকলের চোখের সামনে যেহেতু ঘটনাটি ঘটেছিল তাই সবাই ভীষণ অবাক হয়ে পড়লেন। একী রে বাবা! কী করে এরকম ঘটনা ঘটল! শুরু হল খোঁজাখুঁজি। কিন্তু কোথায় তিনি! সবাই যখন ভীষণই হতাশ হয়ে পড়েছেন ঠিক তখনিই স্বামীজি আবার ওই কাঠগড়ায় দৃশ্যমান হলেন। এইসব দেখে সাহেবের বিচারবুদ্ধি প্রায় লোপ পেয়ে গেল। তিনি হতবুদ্ধি হয়ে বসে রইলেন।

স্বামীজির শিষ্য ও ভক্তরা স্বামীজির জন্য একজন ভালো উকিল নিয়োগ করেছিলেন। তিনি ও এজলাসে উপস্থিত এক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট স্বামীজি সম্পর্কে সাহেবকে সব কথা জানিয়ে বলেছিলেন, স্বামীজি যথার্থই একজন মহাপুরুষ। তাঁর তো বস্ত্র পরিধানের কোনও আবশ্যকতা নেই।

কিছুক্ষণ আগেই স্বামীজি সাহেবের গালে ওইরকম একটি অদৃশ্য চড় মেরেছেন। তিনিও আর মেজাজ চড়াবার সাহস পেলেন না। তিনি অত্যন্ত নরম কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন—স্বামীজি, আপনি কি আমার খাবার খেতে পারবেন?

স্বামীজি মৃদু হেসে উত্তর দিলেন, খেতে পারি, যদি আপনি আমার খাওয়ার খেতে পারেন।

সাহেব মনে-মনে ভাবলেন, সাধু মানুষ, ফল, দুধ, রুটি ছাড়া আর কী বা খাবেন? তিনি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ, আমি আপনার খাওয়ার খেতে রাজি আছি।

স্বামীজি আবার হাসলেন। তারপর সেই ভয়ংকর কাণ্ডটি ঘটালেন। ভরা এজলাসে তিনি নিজের হাতে মলত্যাগ করলেন; তারপর সেই হাতটি সাহেবের দিকে বাড়িয়ে বললেন,—নিন খান! সাহেব এই দৃশ্য দেখে প্রায় লাফিয়ে উঠে বলেছিলেন—এটা কখনও খাদ্য হতে পারে না। তাই খাওয়ার কোনও প্রশ্নই নেই।

স্বামীজি কোনও কথা বাড়ালেন না। সেই বিষ্ঠা নিজের মুখে ঢেলে দিলেন। আর অদ্ভুত ব্যাপার, চন্দনের সুবাসে সেই জায়গাটি ভরে গেল। সাহেব এই ঘটনাটি দেখার পর স্বামীজিকে মুক্ত করে দিলেন।

ব্রহ্মানন্দ পরমহংসদেব মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর গুরুদেব। তিনি একদিন তাঁর এই প্রিয় শিষ্যকে অষ্টসিদ্ধি সম্পর্কে নানা কথা বলেছিলেন। তিনি বিজয়কৃষ্ণজিকে বললেন, 'ভারতবর্ষের প্রকৃত যাঁরা যোগী ও মহাপুরুষ তাঁরা প্রত্যেকেই অষ্টসিদ্ধির অধিকারী।'—এই প্রসঙ্গে তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের প্রসঙ্গ তুলে বলেছিলেন, ''শ্রীমদ্ভাগবতে অষ্টাদশ সিদ্ধির কথা আছে 'সিদ্ধয়োঽষ্টাদশ প্রোক্তা ধারণা যোগপারগৈঃ।' উল্লেখিত এই অষ্টাদশ সিদ্ধির মধ্যে আটটি প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ।''

ব্রহ্মানন্দজি তাঁর শিষ্যকে সেই আটটি সম্পর্কে সেদিন বিস্তারিতভাবে জানিয়েছিলেন। সেই আটটি সিদ্ধাই হল—১) অণিমা—বিরাট দেহ নিমেষে ক্ষুদ্র করে ফেলা যায়। ২) গরিমা—সূক্ষ্ম থেকে মুহূর্তে বিরাট আকৃতি ধারণ করার ক্ষমতা। ৩) লঘিমা—দেহের ওজন এক নিমেষে কমিয়ে ফেলা যায়। ৪) প্রাপ্তি—যে-কোনও জিনিস নিজের অধীন বা হস্তগত করার ক্ষমতা। ৫) প্রাকাম্য—যে-কোনও বাসনা নিজের ইচ্ছাশক্তির দ্বারা পূর্ণ করা যায়। ৬) বশিত্ব—যে-কোনও জীবকে বশীভূত করার ক্ষমতা পাওয়া যায়। ৭) ঈশিত্ব—ঈশ্বরের ওপরে প্রভুত্ব করার ক্ষমতা জন্মায়। ৮) যদকামস্ত দবস্যতি—গরলকে অমৃত ও অসম্ভবকে সম্ভব করার ক্ষমতা লাভ করা যায়।

অষ্টসিদ্ধি নয়, স্বামী ত্রৈলঙ্গজি অষ্টাদশ সিদ্ধির অধিকারী ছিলেন। কাশীর মানুষজন বারে বারে তাঁর অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় পেয়েছেন। নেপালের জঙ্গলে হিংস্র বাঘ তাঁর বশ মেনেছে। বিদ্যানন্দ স্বামীর সঙ্গে বা কাঠগড়া থেকে নিমেষের মধ্যে তিনি উধাও হয়ে গেছেন। স্বয়ং ঈশ্বর তাঁর বশীভূত ছিলেন। এই কাশীতেই তাঁকে এক বালতি চুন-গোলা জল দুধ বলে খাইয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাতে তাঁর বিন্দুমাত্র অনিষ্ট হয়নি। তবে এক্ষেত্রেও কিছু সন্দেহ আছে। এক বালতি চুন-গোলা জল তিনি নিজের হাতে পান করেছিলেন

কি! যদি বলা হয় নিজের হাতে করেছেন, তাহলে ঘটনাটির সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ জাগাটা অস্বাভাবিক নয়! কারণ তিনি নিজের হাতে কিছুই খেতেন না। তাঁকে খাইয়ে দিলে তবেই খেতেন।

তিনি সাধন জগতের এমন চরম শিখরে পৌঁছে গিয়েছিলেন, যার ফলে তাঁর লৌকিক চাহিদা, বাসনা বোধগুলি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়েছিল। তপ্ত বালির ওপর তিনি অনায়াসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুয়ে থাকতে পারতেন, আবার প্রবল শীতে তিনি গঙ্গাবক্ষে বহুক্ষণ এধার থেকে ওধার ভেসে বেড়াতেন। একটু একটু করে তিনি নিজেকে এক ত্রিকালজ্ঞ মহাপুরুষ হিসাবে তুলে ধরেছিলেন আমাদের সামনে। যাঁকে স্পর্শ করা যায় কিন্তু তাঁর বিশালত্ব সম্পর্কে বোঝা আমাদের মতো সাধারণ মানুষের পক্ষে অসম্ভব। তাঁকে সঠিকরূপে চিনতে পেরেছিলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব। তিনিও তো অষ্টাদশ সিদ্ধির অধিকারী ছিলেন। মা ভৈরবী তাঁকে অবতার বলে ঘোষণা করেছিলেন। পঞ্চবটীতে গভীর রাতে ভাগ্নে হৃদয় মামার সেই সিদ্ধাই দেখে চমকে উঠেছিলেন। ঠাকুর তাঁকে বলেছিলেন, হৃদে, একথা আর কাউকে বলিস না।

আবার সেই ম্যাজিস্ট্রেট সমস্যা। আগের সাহেব বদলি হয়ে গেলেন। তাঁর জায়গায় এলেন নতুন এক উদ্ভট ম্যাজিস্ট্রেট। কাজে যোগ দিয়ে সস্ত্রীক কাশী ভ্রমণে বেরোলেন। বেশ ঘোরাঘুরি চলছিল। হঠাৎই তাঁদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল নগ্ন স্বামীজির। তাঁকে ওই অবস্থায় দেখে সাহেব ভীষণই রেগে গেলেন। সঙ্গে-সঙ্গে প্রহরীকে নির্দেশ দিলেন স্বামীজিকে থানায় নিয়ে যাওয়ার জন্য। আবার হাজতবাস।

সারারাত স্বামীজিকে কাটাতে হল ওই বদ্ধ, ঘুপচি হাজতঘরে। মন আর কিছুতেই সেখানে আবদ্ধ থাকতে চাইছিল না। ফলে স্বামীজি মনের কথা শুনে বেরিয়ে এলেন হাজতঘরের বাইরে। ঘরের দরজা পূর্বের মতোই তালাবন্ধ ছিল। সকালবেলায় সাহেব খবর পেলেন, হাজতঘর বন্ধ কিন্তু নগ্ন সাধু বাইরে পায়চারি করছেন। অবিশ্বাস্য কথা, সাহেব প্রথমে বিশ্বাস করতে চাইছিলেন না। কিন্তু প্রহরীদের কথায় থানায় এসে দেখেন, স্বামীজি নিশ্চিন্তমনে বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সাহেব তো অবাক! তিনি জিগ্যেস করলেন—তুমি বাইরে কীভাবে এলে?

স্বামীজি বললেন, ভোরবেলায় আমার বাইরে আসবার ইচ্ছা হল, তাই চলে এলাম।

সাহেব প্রহরীকে হাজতঘরের চাবি আনতে বললেন, চাবি নিয়ে প্রহরী ফিরে এল। সাহেব তালা পরীক্ষা করার জন্য চাবি ঢুকিয়ে ঘোরালেন। কুট করে শব্দ হয়ে খুলে গেল তালা। বড়ই চিন্তায় পড়ে গেলেন সাহেব। এই নগ্ন মানুষটি তাহলে কীভাবে বেরিয়ে এল! তিনি এরপর হাজতের দরজা খুলে ভেতর দিকে তাকিয়ে আবার চমকে উঠলেন। ঘরের মেঝে জলে পরিপূর্ণ। ছোটখাটো একটা পুকুর। তিনি ত্রৈলঙ্গজির কাছ থেকে এই জল কীভাবে এল তা জানতে চাইলেন। স্বামীজি বললেন, রাতে আমার প্রস্রাব করার ইচ্ছা হল। দরজা বন্ধ। কোথায় করব! তাই ঘরের ভিতরেই করে দিলাম। সাহেব আর কথা বাড়ালেন না। তিনি স্বামীজিকে আবার হাজতঘরে ঢুকিয়ে পরপর দুটো তালা লাগিয়ে, চাবি দুটো নিজের পকেটে পুরে এজলাসে চলে গেলেন।

গ্রীষ্মকাল। তাই সকালবেলাতেই ওখানকার কাজকর্ম শুরু হয়ে যেত। সাহেবও কাজ শুরু করে দিলেন। হঠাৎ ঘরে নতুন কোনও অতিথি প্রবেশ করার মতো একটা উপলব্ধি সাহেবের হল। তিনি চোখ তুলে দেখেন, স্বামীজি তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। মুখে লেগে রয়েছে মৃদু ও মধুর হাসি। তিনি সাহেবকে বললেন, 'তালা বন্ধ করিয়া কেহ কাহারও জীবন আটকে রাখিতে পারে না। যদি তাহাই হইত, তবে মরিবার সময় ঘরে তালাবন্ধ করিয়া রাখিলে কেহই মরিত না।'

সাহেবের চক্ষু তখন ছানাবড়ার আকৃতি ধারণ করেছে। তিনি স্বামীজিকে জিগ্যেস করলেন, এতবড় শরীর নিয়ে তুমি বাইরে বেরিয়ে এলে কী করে?

স্বামীজির উত্তরে বললেন, 'দেহ তো জড় পদার্থ, উহার কোনও ক্ষমতা নাই, সে আত্মার চৈতন্য শক্তিতেই কাজ করে, যেমন চুম্বকের শক্তিতে লোহা চলে। যোগবলের কাছে সেইরূপ কোনও কার্য অসাধ্য নাই। বাবা, তোমার এইসব ক্ষমতা নাই, মিছিমিছি আমাকে নির্যাতন করো কেন?'

সাহেবের চৈতন্য এতক্ষণে ফিরল। তিনি স্বামীজিকে বললেন, আজ থেকে আপনি এই অবস্থায় সর্বত্র ঘুরে বেড়াতে পারবেন। আপনাকে কেউ বাধা দেবে না। সাহেব শুধু মৌখিক আশ্বাস নয় লিখিত আদেশও দিয়েছিলেন।

জ্ঞানেন্দপ্রসাদ গোস্বামীর বিখ্যাত একটি গানের লাইন বারবার মনে পড়ছে—'মন বলে তুমি আছ ভগবান, চোখ বলে তুমি নাই।' ঘোর কলি, সর্বত্র অশান্তি, রক্তপাত দিয়ে দিনের শুরু, দিনের শেষও হয় রক্তলাঞ্ছিত হয়ে। এইরকম সংকটজনক মুহূর্তে আমরা কোনও কিছুই বিশ্বাস করতে চাই না। সবেতেই সন্দেহ, সবেতেই অবিশ্বাস। কিন্তু সেই অমূল্য কথাটিকে ভুললে যে চলবে না—বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর।

ত্রৈলঙ্গ স্বামীজির সময়েও শঠ, ভণ্ড, প্রতারকের দর্শন পাওয়া যেত। স্বামীজির শিষ্য উমাচরণ মুখোপাধ্যায় সেই সময়কার এক প্রতারকের গল্প আমাদের শুনিয়েছেন—'ম্যাডাম ব্লাভাডসকি ও কর্নেল অলকট বম্বে শহরে থিওসফিক্যাল সোসাইটি নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করলেন। সেই সংস্থার মাধ্যমে তাঁরা যোগ-শাস্ত্র বিদ্যার মহিমা প্রচার করতে শুরু করেন। মাঝে মধ্যে তাঁরা নানা অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়ে শহরে ভীষণ আলোড়ন ফেলে দিলেন। বিভিন্ন সংবাদপত্রে তাঁদের নিয়ে লেখালেখি শুরু হল। প্রচারের বৃত্তে থেকে নিজেদের কাজ তাঁরা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁরা সিদ্ধ যোগী এ বিষয়ে মানুষের কোনও সন্দেহ রইল না।

'সেইসময় আমার সঙ্গে স্বামীজির গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক। আমি একদিন বাবাকে যোগসিদ্ধ ওই বিদেশীদের কথা বলে জানতে চেয়েছিলাম—তাঁরা এই শক্তি কীভাবে অর্জন করলেন? স্বামীজি মৃদু হেসে বলেছিলেন, পুরোটাই ফাঁকা, তোমরা যাকে সিদ্ধাই বলছ, সেটা কোনও সিদ্ধাই নয়। ওরা ইন্দ্রজালের সাহায্যে এগুলো করছে। ঘাবড়িও না, সবকিছুই খুব শিগগির প্রকাশিত হবে। কিছুই গোপন থাকবে না। বেশিদিন অপেক্ষা করতে হল না। কয়েকদিন বাদেই সবকিছু জনসমক্ষে চলে এল।

ম্যাডামের সহচরী কুলুম নামের এক খ্রিস্টান মহিলা ব্লাভডসকির মাদ্রাজের বাড়ির গুপ্তগৃহের গুপ্ত ঘটনাকে আর গুপ্ত থাকতে দিলেন না। তিনি তা প্রকাশ করে দিলেন। সেইসময় এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চতুর্দিকে প্রচুর হইচই হয়েছিল। বিভিন্ন সংবাদপত্র ম্যাডামকে তুলোধনা করে ছেড়েছিল। ম্যাডাম সেই যে কোথায় পালালেন তাঁর খোঁজ আর পরবর্তীকালে পাওয়া যায়নি।'

সাধনজগতেও পা স্লিপ করার ঘটনা আছে। চেয়েছিলেন সাধক হতে কিন্তু হয়ে গেলেন ভোগী। এক ব্যক্তি বেশ ভালো রকম তপস্যা করে কিছু সিদ্ধাই অর্জন করেছিলেন। তিনি অদৃশ্য হয়ে যেতে পারতেন। মানুষজন তাঁর এই কাণ্ড দেখে বেশ চমকে উঠতেন, এইভাবে চলতে পারলে তাঁর কোনও সমস্যা হত না। কিন্তু তাঁর মতিভ্রম হল। তিনি তাঁর চলার পথটা একটু বদলে নিলেন। তিনি তাঁর সেই অলৌকিক ক্ষমতাকে ব্যবহার করলেন অত্যন্ত ঘৃণ্য কাজে। তিনি অদৃশ্য হয়ে বিভিন্ন গৃহের অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে শুরু করেন। থাক, তিনি কী করতেন তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব না। তবে ওই ব্যক্তির কপালে অশেষ দুঃখ নাচছিল। একদিন তিনি ধরা পড়ে গিয়ে প্রবল মার খেয়েছিলেন।

বারাণসীর সচল বিশ্বনাথ ত্রৈলঙ্গ স্বামীজির কাছে অপ্রকট হওয়া কোনও অসম্ভব বা অস্বাভাবিক ব্যাপার ছিল না। তাঁর এই ক্ষমতার পরিচয় আমরা বহুবার পেয়েছি। প্রাকৃতিক কোনও নিয়ম তিনি মানতেন না। রোগ-ব্যাধি, জরা তাঁর পুণ্যশরীরকে কখনও স্পর্শ করতে পারেনি। প্রাকৃতিক নিয়ম নয়, তিনিই তৈরি করেছিলেন তাঁর নিয়ম। সেইসময় যাঁদের সচল বিশ্বনাথকে দর্শন করার সৌভাগ্য হয়েছিল তাঁরা নিজেদের ধন্য বলে মনে করতেন। কত মানুষ তাঁর দ্বারা কতভাবে উপকৃত হয়েছেন। কত রাজা-মহারাজ তাঁকে স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত করে প্রণাম জানিয়েছেন। কিন্তু পরমুহূর্তে সেসব বস্তু তাঁর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে দুষ্কৃতীরা। স্বামীজি নির্বিকার, নির্বিকল্প। ওইসব অপ্রয়োজনীয় জিনিসের প্রতি তাঁর কোনও মোহ ছিল না। তিনি যে অন্য ধনভাণ্ডারের সন্ধান পেয়েছিলেন। সেই ভাণ্ডারের কাছে এগুলি অত্যন্ত তুচ্ছ, নেহাতই নগণ্য।

ত্রৈলঙ্গ স্বামী ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী। দুজনের মধ্যে অদ্ভুত একটা সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। একদিন সকালবেলায় তাঁরা কাশীর রাস্তায় নামলেন। দুজনেই হাঁটছেন। তাঁদের যাতায়াতের পথে দক্ষিণদেশের এক

মহারাজার বাড়ি ছিল। স্বামীজিকে দেখতে পেয়ে ওই বাড়ির দারোয়ান ও প্রহরীগণ তাঁকে দাঁড় করিয়ে প্রণাম করতে লাগলেন। স্বামীজি ওই পথ দিয়ে যাচ্ছেন এই খবরটি অন্তঃপুরে রাজার কানে পৌঁছোল। তিনি তাড়াতাড়ি নীচে নেমে এসে স্বামীজিকে অন্দরমহলে নিয়ে গেলেন। গোস্বামীজি যেতে রাজি হলেন না। তিনি সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন। রাজঅন্তঃপুরে নিয়ে গিয়ে তাঁকে উৎকৃষ্ট পট্টবস্ত্র পরানো হল। তাঁকে সাজানো হল সোনার অলংকারে। অপূর্ব সুন্দর এক দৃশ্য। স্বামীজি সবাইকে আশীর্বাদ করে নীচে নেমে এলেন। দুই অসমবয়সি সাধকের আবার পথ চলা শুরু হল। কাশীর ষাঁড়, গুন্ডা ও কিছু কিছু জিনিস বড়ই ভয়ংকর। স্বামীজির পথরোধ করল একদল গুন্ডা। ঘটনাটি রাজবাড়ির সামনেই ঘটছে। এখন যেমন থানার সামনেই নানা ঘটনা ঘটে ঠিক সেইরকম। স্বামীজিকে তারা দাঁড় করিয়ে সবকিছু খুলে নিয়ে মহাসাধককে আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে দিল।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীজি অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখছেন। কিছু করার নেই। কিন্তু রাজপ্রহরী ও দারোয়ানরা কেন তাদেরকে ছাড়বে! তারা সব জনকে কিছুক্ষণের মধ্যে ধরে ফেলল। বামাল সমেত অপরাধীরা গ্রেপ্তার হয়েছে। রাজামশাইয়ের কাছেও সেই খবর পৌঁছোল। তিনি আবার নীচে নেমে এলেন। তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণ, সাত্বিক ও নির্লোভ প্রকৃতির। তিনি সব শুনে বললেন, কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত এই জিনিসগুলো আমার ছিল। কিন্তু এখন এইসব জিনিসের ওপর আমার কোনও অধিকার নেই। সমস্ত বস্তুই বর্তমানে স্বামীজির। যে জিনিসের ওপর আমার কোনও অধিকার নেই তা আমি ফেরত চাইব কীভাবে! তবে স্বামীজির যা ইচ্ছা হয় তা তিনি করতে পারেন।

স্বামীজি এতক্ষণ সব শুনছিলেন। তিনি বললেন, ওরা আমার তো কোনও ক্ষতি করতে পারেনি। আমি যা ছিলাম তাই আছি। স্বামীজির নির্দেশে তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হল। স্বামীজির এইরূপ আচরণে উপস্থিত সকলেই স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তাঁর প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা, ভক্তি আরও বেড়ে গেল।

ডঃ প্রাণগোপাল ভট্টাচার্য মহাশয় আরও দুটি ঘটনার কথা তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন। কিন্তু অন্য কোথাও তার কোনও উল্লেখ নেই। ঘটনা—১) একদিন সন্ধ্যাবেলায় এক ধনী ব্যবসায়ী প্রায় বিশভরি ওজনের দুগাছা সোনার বালা এনে স্বামীজিকে পরিয়ে দিলেন। ঘটনাটি যখন ঘটল সেইসময় ভক্তদের মাঝে দুজন গুন্ডা প্রকৃতির মানুষও ছিল। তারা সেখানে বসেই ইশারায় ঠিক করে নিয়েছিল পরবর্তী কাজ কী হবে। সেদিন ভক্তদের সঙ্গে তারাও সেখান থেকে নির্দিষ্ট সময়ে চলে গেল। বাইরে বেরিয়ে তারা ঠিক করল—বেশ কয়েক বোতল কারণবারি ওই সাধুকে খাইয়ে দিতে পারলে উনি অচেতন হয়ে পড়বেন, তারপর আমরা বালা দু-গাছি হাতিয়ে কেটে পড়ব।

রাত তখন বেশ গভীর। দুই দুষ্ট ব্যক্তি কয়েক বোতল কারণবারি নিয়ে দশাশ্বমেধ ঘাটে উপস্থিত হল। স্বামীজি তখন গভীর ধ্যানে মগ্ন। তারা স্বামীজির আসনের পাশে বোতলগুলি রেখে ধ্যানভঙ্গের অপেক্ষায় রইল। স্বামীজি অন্তর্যামী। তিনি বহু পূর্বে, সেই সন্ধের সময় তাদের মতলবের কথা জেনে গিয়েছিলেন। তিনি চোখ মেলে তাকালেন ও ইশারায় বোতলগুলির ছিপি খুলে দিতে বললেন। আহ্লাদে আটখানা হয়ে তারা ছিপি খুলে দিল। স্বামীজি অত্যন্ত তৃপ্তিসহকারে সবকটি বোতল গলায় ঢেলে দিলেন। তারপর কেটে গেল অনেকক্ষণ সময়। কিন্তু স্বামীজি তো অপ্রকৃতিস্থ হলেন না। তারা খুবই হতাশ হয়ে পড়ল। ঠিক সেইসময় নিরাসক্ত স্বামীজি বালা দুটি খুলে হাসতে হাসতে তাদের হাতে তুলে দিলেন। তারাও পরমানন্দে বালা দুগাছি নিয়ে সেখান থেকে পালাল।

ঘটনা-২)—রামপুরা নিবাসী ব্রাহ্মণ শিবনাথ মিশ্রের মনে বড় কষ্ট। পক্ষাঘাতে তাঁর একমাত্র পুত্র দীর্ঘদিন ধরে পঙ্গু। কোনও চিকিৎসাতেই কোনও ফল পাওয়া যায়নি। অতএব অগতির গতি সচল বিশ্বনাথ ত্রৈলঙ্গস্বামীর তিনি শরণাপন্ন হলেন। স্বামীজি শিবনাথের মুখে ছেলেটির অসুস্থতার কথা শুনে বড়ই ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। তিনি ছেলেটির মাথায় তাঁর ডান হাতটি একবার ঠেকালেন। তারপর বললেন, তুমি এখনিই

তোমার ছেলেকে নিয়ে বাড়ি ফিরে যাও। ও ভালো হয়ে যাবে। অল্পদিন পর থেকে ছেলেটি পুনরায় হাঁটতে শুরু করল।

ঘটনা এক, অর্থাৎ কারণবারি প্রসঙ্গে মনে কিছু প্রশ্ন জাগছে! সত্যিই তাঁর কোনও খাদ্যাখাদ্য বিচার ছিল না। যে যা দিতেন তাই তিনি খেয়ে নিতেন। তবে সেই খাওয়ার তিনি নিজের হাতে মুখে তুলতেন না। তাঁকে খাইয়ে দিতে হত। কিন্তু কারণবারির ক্ষেত্রে তিনি নিজে হাতে বোতল তুলে গলায় ঢেলেছিলেন। এটা একটু অবিশ্বাস্য বলে মনে হচ্ছে। তাছাড়া স্বামীজির মাতা ছিলেন শৈব উপাসক। তিনিই তাঁর পুত্রের প্রথম গুরুদেব। শৈবসাধকরা তন্ত্রসাধকদের মতো কারণবারিকে অত গুরুত্ব দেন না। স্বয়ং মহাদেবও সিদ্ধি, গাঁজা, ভাঙের ভক্ত। যে মানুষটিকে জোর না করলে তিনি কিছুই খেতে চাইতেন না, তিনি অত বোতল কারণবারি পান করবেন বলে মনে হয় না। অতিরঞ্জিত ও অসত্য কাহিনি। তবে এ ব্যাপারে ডঃ ভট্টাচার্যকে কোনওভাবেই দায়ী করা যাবে না। মনে হয় এটা তাঁরও পূর্বের কোনও লেখকের মস্তিষ্কপ্রসূত কাহিনি। এবং সেই ভুলেরই তিনি শিকার হয়েছেন।

তবে গাঁজা, ভাঙ, সিদ্ধি ছাড়াও দেবাদিদেব মহাদেবকে কখনও কখনও লীলার প্রয়োজনে আমিষ আহার, কারণবারি সেবন করতে হয় বইকী? ভগবানের লীলা আমাদের মতো সাধারণ মানুষের পক্ষে বোঝা মোটেই সহজসাধ্য নয়। তিনি সৃষ্টির প্রয়োজনে, ভক্তের স্বার্থে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রূপ ধারণ করেছেন। লীলাময় বিশ্বেশ্বর যখন যে রূপ ধারণ করেছেন তাঁকে তখন সেইরকমই আহার এবং আচরণ করতে হয়েছে। পুরোটাই নির্ভর করেছে তাঁর লীলার ওপরে।

হঠাৎই জানতে পারলাম বেহালার একটি স্থানে পুরো চৈত্র মাস জুড়ে মহাদেবের পুজো করা হয়। চৈত্রমাসে মহাদেবের পুজো—এতে তো কোনও নতুনত্ব নেই। অবশ্যই নতুনত্ব আছে। যাঁরা এই পুজোটি করেন তাঁরা দেবাদিদেবের উপাসনা করেন একটু অন্যভাবে। একটি বৃক্ষকাণ্ড বা গুঁড়ি মহাদেব হিসাবে সেখানে পূজিত হন। এক্ষেত্রেও তিনি শায়িত থাকেন। এবং চৈত্র সংক্রান্তির দিন গভীর রাতে দেবাদিদেব মহাদেবের সামনে বলি দেওয়া হয়। উৎসর্গ করা হয় কারণ। অর্থাৎ মহাদেব সেদিন আমিষ গ্রহণ এবং কারণ সেবন করেন। পুজোর শেষ কিন্তু এখানে নয়। এরপর সেই ছাগমুণ্ডকে রন্ধন করে নিয়ে যাওয়া হয় কলকাতার অন্যতম এক অলৌকিক সিরিটি শ্মশানে। সেখানেও পুজো ও শিবাভোগ নিবেদন করা হয়ে থাকে। শোনা যায় এই শ্মশানেই দীর্ঘদিন সাধু হিসাবে বসবাস করেছিলেন বিখ্যাত ম্যাজিসিয়ান গণপতি।

দক্ষিণ কলকাতার সেবাপীঠ মাতৃমন্দিরের আচার্য স্বামী বেদানন্দ, তাঁর অসংখ্য সন্তানের কাছে বাবুজি নামেই তিনি পরিচিত। তিনি মহাদেবের এই বিশেষ ব্যাপারটি নিয়ে খুব সুন্দর কথা বললেন। ছোট্ট একটা কুটিরে মা ও পুত্রের বসবাস। মা যাঁর আনন্দময়ী সে কি নিরানন্দে থাকে—পরমানন্দে রয়েছেন বাবুজি। মহাদেবের আমিষ ভক্ষণ ও কারণবারি পানের প্রসঙ্গ তোলামাত্র তিনি প্রথমে চলে গেলেন সুদূর অতীতে সেই মহাভারতের যুগে। বললেন, 'মহাবীর, শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর অর্জুনকে পরীক্ষা করার জন্য মহাদেব একবার কিরাত অর্থাৎ ব্যাধের রূপ ধরেছিলেন, একটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি পরবর্তী সময়ে কুমির রূপ ধারণ করেন। তিনি কুমির হয়ে আচার্য শঙ্করের পা কামড়ে ধরেছিলেন। শঙ্করাচার্যের কাছে অবশ্য সেই কুমিরের আসল স্বরূপ গোপন ছিল না, আবার মহিষরূপে তিনি পাণ্ডবদের দর্শন দেন।

লীলাময় ভগবান কখন কী রূপ ধারণ করবেন এবং তাঁর প্রয়োজনে তিনি সেইসময় কী ধরনের আহার্য খাবেন তা তো সাধারণ মানুষের পক্ষে ঠিক করে দেওয়া সম্ভব নয়। যখন তিনি কিরাত তখন তো তিনি নিশ্চয়ই ফলমূল খাননি। কিরাতরা যে ধরনের খাবার খান এবং পানীয় পান করেন তাই খেয়েছিলেন। আবার যখন মহাদেব কুমির তখন তো তিনি শিকার করেই ক্ষুন্নিবৃত্তি করেছেন। কুমির তো মাংসাশী জীব।

দেবাদিদেব মহাদেবের লীলার কোনও অন্ত নেই। 'তন্ত্রসার' গ্রন্থে দেবাদিদেবকে আমরা দশভুজ ও পঞ্চানন রূপে দেখতে পেয়েছি। তাঁর দশ হাতে দশটি ভয়ঙ্কর অস্ত্র। ওড়িশার তপ্তপাণি উষ্ণ প্রস্রবণের গায়ে একটি

ছোট মন্দির রয়েছে। সেখানকার দেওয়াল গাত্রে দশভুজ শিবের চিত্র অঙ্কিত আছে। তাঁর প্রতিটি হাতে এক-একটি অস্ত্র।

রুরুভৈরবের পুজোর মন্ত্র ও তার ব্যাখ্যা থেকেও মহাদেবের লীলাময় রূপেরই ছবি ফুটে ওঠে। সেখানে বলা হয়েছে—'ওঁ জলদাভং বিশালাক্ষং শঙ্খচক্রলসৎ-করম। নানালঙ্কারসংযুক্তং কৃত্তিবাসং সুরালয়ম। মদিরাঘূর্ণনয়নং রুরুভৈরবম আশ্রয়ে। ওঁ ঐং হ্রীং ঈীং রুরুভৈরবায় নমঃ।' মদিরাঘূর্ণনয়নং—তার মানে মদিরা পান করার ফলে তাঁর চোখ দুটি বন বন করে ঘুরছে।

দেবাদিদেব শিব গৃহে মঙ্গলময়। তিনি লিঙ্গ এবং অলিঙ্গ। তিনি যখন অলিঙ্গ তখন সদাশিব। তিনি সাধক সমাজে পূজিত। মহাদেবকে আমরা বেশিরভাগ সময় শায়িত অবস্থায় দেখতে পাই। অর্থাৎ তিনি সৃষ্টি বিমুখ। কিন্তু তাঁর মধ্যেও তো সৃষ্টির ইচ্ছা রয়েছে। সেই ইচ্ছা যখন প্রবল হয় তখন তিনি তাঁর শরীর থেকে বামাশক্তিকে প্রকটিত করেন। তিনি হলেন কালী। কালকে কলন করেন বলেই তো কালী। তিনি নিত্যকালী, লীলায়িতা। তিনি আমাদের মা। আর মা যেখানে সেখানেই তো সংসার। মায়ের ভিতরেই লুকিয়ে থাকে সংসার।'

কথাপ্রসঙ্গে তন্ত্র, তান্ত্রিক, শ্মশান, ভৈরব ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গ উঠেছিল। স্বামী বেদানন্দজি খুব সুন্দরভাবে ব্যাপারগুলি বুঝিয়ে দিলেন। তিনি বললেন, 'তন্ত্র কথার অর্থ কিন্তু তান্ত্রিক নয়। অর্থ অনুশাসন। অনেকটা পরিবারতন্ত্র, রাজতন্ত্র, গণতন্ত্রের মতো। আধ্যাত্মজগতে নানা ভাগ আছে। শৈবতন্ত্র, বিষ্ণুতন্ত্র, শক্তিতন্ত্র ইত্যাদি। কিন্তু এই উপাধির সৃষ্টিকর্তা আমরাই, অর্থাৎ মানুষ। এগুলো তো দেবতারা সৃষ্টি করেননি। আমরা যেমন পুরুষ বলতে বুঝি ছেলে এবং নারী অর্থাৎ মেয়ে। কিন্তু পুরুষ ও নারী কথার অর্থ তো তা নয়। পুরুষ কথার প্রকৃত অর্থ হল জ্ঞান, আর নারী হচ্ছেন কর্ম। এই দুজন মিলিত হলেই জগৎ সচল। একটি পাখির দুটি ডানা। একটি পুরুষ, অন্যটি নারী। একটি ডানা অচল হলে পাখি উড়বে কী করে!

আমরা তন্ত্রসাধক বলতে কাপাল সাধকদের বুঝি। কাপাল থেকে কাপালিক। তাঁদের প্রিয় ভূমি শ্মশান, প্রিয় পানীয় কারণবারি, প্রিয় খাদ্য মাংস। শ্মশানের যিনি প্রধান তিনি হলেন শ্মশান ভৈরব। তাঁকে সৃষ্টির সকলে অর্থাৎ ভূত, প্রেত, পিশাচ, দেবতা, মানুষ, জীবগজতের অন্যান্য প্রাণী ঘিরে থাকেন। আমরা সবাই তাঁর সন্তান। আর ভৈরবের শ্মশানকে পাহারা দেন পাঁচজন। ১) শিবা—তিনি সময়ের ঘোষক। ২) সারমেয় অর্থাৎ ভৈরব—তিনি অতন্দ্র প্রহরী, পীঠ রক্ষাকর্তা, ৩) চিল, ৪) শকুনি—ক্ষেত্র পাহারাদার, গাছের ওপর থেকে নজরদারি চালান, ৫) চণ্ডাল—সাধকের সহায়ক। এই পাঁচজনকে ভোগ দিয়েই সাধনা শুরু করেন সাধক। এবং তাঁদের ভোগে আমিষ বস্তু ও কারণ তো থাকবেই। অতএব দেবাদিদেব মহাদেব যখন যে রূপ ধারণ করেন তা তো তাঁর লীলারই অঙ্গ। এবং সেইসময় তিনি কী ধরনের খাদ্য গ্রহণ ও পানীয় পান করবেন তা তাঁদের লীলার ওপরেই নির্ভর করবে। তিনি মানুষের নির্দেশ মতো তো চলবেন না।'

সুন্দর বর্ণনা, চমৎকার ব্যাখ্যা। মনের সমস্ত সংশয় দূর হয়ে গেছে। বুঝতে পেরেছি লীলার প্রয়োজনে দেবতারা যখন যে রূপ ধারণ করবেন তখন তিনি সেই আহার ও পানীয় গ্রহণ করবেন। কাশীর সচল বিশ্বনাথ ত্রৈলঙ্গস্বামীও লীলাময়। তাঁর শরীর আশ্রয় করে রয়েছেন বিশ্বেশ্বর। কাশীপর্বে তিনি বহু অলৌকিক কাণ্ড ও লীলা রচনা করেছেন একথাও ঠিক। কিন্তু তাঁর ক্ষেত্রে কারণ পান করবার মতো কোনও অবস্থা তৈরি হয়নি। স্বামীজি বিবাহিত ছিলেন বলে কয়েকজন দাবি করেছিলেন। এটিও অনেকটা সেইরকম কল্পনাপ্রসূত গপ্পোকথা।

আমার কথা শুনে মনে হতে পারে বিবাহ খুব খারাপ বস্তু। স্বামীজি বিবাহিত ছিলেন তা মেনে নিতে পারছি না। আমরা অর্থাৎ বহু বাঙালিই মনীষীরা বিয়ে করেছেন তা কিছুতেই মানতে পারি না! আমাদের শ্রদ্ধেয় অবিস্মরণীয় এক মানুষ, যিনি আজ প্রায় মহাপুরুষে রূপান্তরিত হয়েছেন, তাঁর স্ত্রী ও কন্যা আছে শুনে আমরা অনেকেই শোকে ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলাম। ক্ষোভ-হুঙ্কার-তর্জন-গর্জন করে সত্যিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে চাইলাম। তারপর আমাদের চরিত্র অনুযায়ী সবকিছু ভুলে গেলাম।

আমরা কিন্তু ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা এক মুহূর্তের জন্য ভুলিনি। তিনিও বিবাহিত ছিলেন। মা সারদামণি, 'সতেরও মা অসতেরও মা' ছিলেন তাঁর সহধর্মিণী। ঠাকুর যে বিবাহিত ছিলেন, সেকথা তো কেউ অস্বীকার করেন না। কারণ সেটি ছিল বাস্তব ঘটনা। ঠাকুর নিজের মুখে তাঁর সহধর্মিণীর প্রশংসা করেছেন। কত সুন্দর, অলৌকিক মুহূর্ত তাঁরা কাটিয়েছেন বিভিন্ন সময়ে। কাশীপুর উদ্যানবাটীর শেষের সেই দিনগুলোর কথা একবার ভাবুন তো!

ত্রৈলঙ্গ স্বামীজির মতো এত বড় মাপের ত্রিকালজ্ঞ মহাপুরুষ কখনও স্ত্রী ও সন্তানদের কথা তাঁর দুই প্রিয় শিষ্য ও শিষ্যা উমাচরণ মুখোপাধ্যায় ও শঙ্করী মাতাজির কাছে একবারের জন্য বলবেন না, তা কি হতে পারে! স্বামীজির সব কথা আমরা জানি, কিন্তু অন্ধকারে পড়ে রইলেন তাঁর স্ত্রী ও সন্তানরা! এটা বড়ই অবিশ্বাস্য ঘটনা। এবং এই ব্যাপারটি যিনি আমাদের জানালেন তাঁকে একদিন স্বামীজি অত্যন্ত কঠোর ভাষায় ভর্ৎসনা করেছিলেন। তিনি তাঁর সেই অপমানের প্রতিশোধ স্বামীজির তিরোধানের পর কি এইভাবে নিয়েছিলেন! এটাও কিন্তু ভাবার বিষয়। পরবর্তীকালে সেই ভুল বা মিথ্যাকে অবলম্বন করে আরও দুজন লেখক একই বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। গণেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'জীবনী সংগ্রহ' ও চণ্ডীচরণ বসাক মহাশয় সম্পাদিত 'শত জীবনী' গ্রন্থে এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি লক্ষ করা গেছে।

ফলে এই ভুলের আবারও প্রতিফলন ঘটেছে স্বামীজির জীবনী অবলম্বনে তৈরি বাংলা ছবি 'ত্রৈলঙ্গ স্বামী'-তে। ১৯৭১ সালের ছবি। কাহিনি ও সংলাপ লিখেছিলেন প্রবাদপ্রতিম বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র মহাশয়; চিত্রসারথি ছবির পরিচালক। নির্মল বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিভূতিভূষণ হুঁই প্রযোজিত সেই ছবিতে অভিনয় করেছিলেন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনন্দা দেবী, ছবি বিশ্বাস, পদ্মাদেবী, নীতীশ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ শিল্পী। ছবিটির গীতিকার ও সুরকার ছিলেন শ্যামল গুপ্ত ও অনিল বাগচি।

খুব সম্ভবত প্রয়াত বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র মহাশয় ওই জীবনী অবলম্বনেই ছবির চিত্রনাট্য লিখেছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁকে কোনওভাবেই দায়ী করা যায় না। দোষটা তাঁর, যিনি জেনেবুঝে একটি মিথ্যা কথাকে স্বামীজির মুখে বসিয়ে সত্য বলে প্রচার করতে চেয়েছিলেন। 'মহিষাসুর মর্দিনী'-র প্রবক্তা বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র মহাশয়ের এক্ষেত্রে কিছুই করণীয় ছিল না। অত্যন্ত শ্রদ্ধেয়, ঈশ্বরমুখী এক মানুষ। তাঁর উদাত্ত চণ্ডীপাঠ এখনও শরীরের তন্ত্রীতে ঝঙ্কার তোলে। মহালয়ার সকালটা কেমন পানসে লাগে তাঁর কণ্ঠস্বর না শুনলে। তিনি এবং তাঁর সহশিল্পীরা বেতারের 'মহিষাসুর মর্দিনী'-কে ইতিহাস করে তুলেছেন। প্রণম্য সেই মানুষটি ভুল গ্রন্থের সাহায্য নিয়ে ভুল তথ্য পরিবেশন করে ফেললেন।

স্বামীজি বেশ কিছুদিন হনুমান ঘাটে কাটিয়েছেন। এই ঘাটটির অতীত ইতিহাস বড় চমৎকার, বড় সুন্দর। পূর্বে এর নাম ছিল রামেশ্বরম ঘাট। বারাণসীর পবিত্র জুনা আখড়ায় এটি অবস্থিত। অনেকের বিশ্বাস এই ঘাটটি নির্মাণ করেছিলেন স্বয়ং রামচন্দ্র আর নিবেদন করেছিলেন তাঁর প্রিয় ভক্ত হনুমানজিকে। অনেকেই মনে করেন সন্ত তুলসীদাসজি অষ্টাদশ শতকে এইখানে হনুমান মন্দিরটি স্থাপন করেছিলেন। আর সেই কারণেই এই ঘাটটির নাম হনুমান ঘাট। ত্রৈলঙ্গ স্বামী এই ঘাটে বসে মহারাষ্ট্রের বাসিন্দা এক মহিলার স্বামীর পেটের ক্ষত সারিয়েছিলেন।

দশাশ্বমেধ ঘাটে অনেকদিন কাটানো হয়ে গেল। এবার স্থান পরিবর্তন করতে হবে—স্বামীজি বোধহয় এইরকমই কিছু ভাবতেন। বাংলা ১২০৭ সালে তিনি চলে এলেন পঞ্চগঙ্গা ঘাটের ওপর অবস্থিত বিন্দুমাধব জোড়াধ্বজার কাছে। কাশীর বিখ্যাত পাঁচটি ঘাটের অন্যতম এই পঞ্চগঙ্গা। এই ঘাটের সঙ্গে জড়িয়ে আছে অনেক অলৌকিক ঘটনা ও ইতিহাস।

এই ঘাটের নীচেই পাঁচটি নদীর মিলন হয়েছে, যথা—গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, কিরানা আর ধুতপাপ। কার্তিক মাসের পূর্ণিমায় এই ঘাটে স্নান করার বিধান আছে শাস্ত্রে। এই স্নানে প্রভূত পুণ্য সঞ্চয় হয়। এই ঘাটের কাছেই সপ্তদশ শতকে ঔরঙ্গজেব তৈরি করেছিলেন বৃহৎ সেই মসজিদ, যার নাম আলমগীর মসজিদ।

এটি নির্মাণের জন্য তিনি হিন্দুদের বিন্দুমাধব মন্দিরটি ধ্বংস করেছিলেন। তারপর বিন্দুমাধবের জন্য এই মসজিদের পাশে ক্ষুদ্র একটি মন্দির তৈরি করা হয়। পঞ্চগঙ্গা ঘাটের ঠিক ওপরে বিন্দুমাধবের অবস্থান।

পঞ্চগঙ্গা ঘাটটি নির্মাণ করেছিলেন শ্রীপতরাও। ১৭৩৫ সালে বাজীরাও পেশোয়া ও সদাশিব নায়েক এই ঘাটটিকে আবার পুনর্নির্মাণ করেন। ১৫৮০ খ্রিস্টাব্দে রঘুনাথ ট্যান্ডন এবং ১৭৫৫ খ্রিস্টাব্দে অন্ধ্রপ্রদেশের পন্থ পিরিনিধি এটি পুনর্নিমাণ করেন। অর্থাৎ সংস্কার।

রঘুনাথ বা টোডরমল ঘাটের সিঁড়িগুলি পাথর দিয়ে বাঁধিয়ে দিয়েছিলেন। টোডরমল ছিলেন আকবরের অর্থসচিব। ১৭৭৫ সালে পুনরায় সংস্কারের প্রয়োজন হয়। তখন সেই কাজটি করেছিলেন শ্রীপতরাও পেশোয়া এবং পন্থ পিরিনিধি। এর থেকেই বোঝা যায় বারাণসীর এই ঘাটটি কত গুরুত্বপূর্ণ।

উপাখ্যান আছে শিব এবং বিষ্ণু মন্দার অঞ্চল থেকে ভ্রমণে বেরিয়ে কাশীতে এসে হাজির হলেন। তাঁদের একটি দায়িত্বও ছিল। সেটি হল রাজা দিবোদাসেশ্বরকে কাশী থেকে বিতাড়িত করা। সেই কাজটি হয়ে যাওয়ার পর বিষ্ণুর জায়গাটি ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছিল না। কাশীর বিভিন্ন তীর্থ তাঁরা পরিক্রমা করেছিলেন, যেমন পঞ্চনদ তীর্থ, পাদোদক তীর্থ ইত্যাদি। এই পঞ্চনদ তীর্থে বিষ্ণু এক সাধুর সাক্ষাৎ পেলেন। দেখেই বুঝলেন, ইনি এক তপস্বী। শরীর অতি শীর্ণ। বিষ্ণু সেই সাধুর কাছে গিয়ে তাঁর নাম জানতে চাইলেন। সাধুর নাম অগ্নিবিন্দু। বিষ্ণুর সাক্ষাৎলাভ করে সাধু আনন্দে মাতোয়ারা হলেন। সাষ্টাঙ্গে প্রণত হয়ে প্রভুর জয়গান শুরু করলেন। তিনি যেসব নাম বলেছিলেন তা হল, মুকুন্দ, মধুসূদন, মাধব, নারায়ণ, রামভদ্র, চতুর্ভুজ, জনার্দন ইত্যাদি। সাধু আরও বললেন, প্রভু! আপনাকে যাঁরা তুলসীপত্র অথবা তুলসীপত্রের মালা দিয়ে পুজো করবে তাঁরা আপনার প্রভূত আশীর্বাদে ধন্য হবে। অগ্নিবিন্দু প্রভুর সামনে হাতজোড় করে দাঁড়ালেন। বিষ্ণু তখন সাধুকে বললেন, কী বর চাও? সাধু যে সমস্ত বর চেয়েছিলেন তার একটি হল—পঞ্চনদ তীর্থে এসে যে প্রার্থনা করবে সে-ই বিষ্ণুলাভ করবে। পঞ্চনদ তীর্থে স্নানের ফল হবে অন্য কোনও জায়গায় মৃত্যু হলেও মোক্ষ লাভ। সাধু আরও প্রার্থনা করেছিলেন, এখানে স্নান করে যারা প্রভু বিষ্ণুর পুজো করবে তারা প্রচুর ধনসম্পত্তির মালিক হবে।

প্রভু বিষ্ণু সাধুর প্রার্থনায় স্বীকৃতি জানিয়ে বললেন, এই তীর্থে আমার নাম হবে বিন্দুমাধব। এই তীর্থটি আমার অবস্থানে পবিত্রতম হবে। আর তুমি যেমন চাইলে, পুণ্যার্থীর প্রভূত ঐশ্বর্য লাভও হবে। বলা হয় এই তীর্থে সমস্ত পাপ ধুয়ে যায়। সেই কারণে এই তীর্থকে বলা হয় বিন্দুতীর্থ। যে যত পাপই করুক না কেন কার্তিক মাসে পঞ্চনদে স্নান করলে বিন্দুমাধব তাঁকে মুক্তি দেন। পঞ্চনদ তীর্থের আধুনিক নাম পঞ্চগঙ্গা ঘাট।

ত্রৈলঙ্গ স্বামীজি একটানা সাত বছর এই পঞ্চনদ তীর্থ বা পঞ্চগঙ্গা ঘাটে কাটালেন। এবার তিনি যাবেন মঙ্গল ভট্টজির গৃহে। পঞ্চগঙ্গা ঘাটের কাছেই তাঁর বাড়ি। বৃদ্ধা মা অম্বালিকা দেবী ও ছোট দুই ভাই মহাদেব ও কৃষ্ণভট্টকে নিয়ে তাঁর সুখের সংসার। ওই বাড়িতেই স্বামীজি তাঁর জীবনের পরবর্তী আশি বছর কাটাবেন। ঘটাবেন নানা অলৌকিক ঘটনা। সৃষ্টি হবে চমৎকার এক ইতিহাস। ভারততীর্থের এই মহাসাধকের নাম ছড়িয়ে পড়বে বিশ্বের নানা প্রান্তে।

মঙ্গল ভট্টজি পরিবারের সবাইকে নিয়ে স্বামীজির কাছে দীক্ষা নিলেন। এরপর তিনি আর প্রিয়তম শিষ্যের একান্ত অনুরোধ অগ্রাহ্য করতে পারলেন না। চলে এলেন শিষ্যের বাড়িতে। এখানেও তৈরি হল আর এক ইতিহাস, সেবার ইতিহাস। ভট্ট পরিবারের গুরুভক্তি, গুরুসেবা তো আজ ইতিহাস হয়ে আছে।

অসাধারণ শক্তির কথা প্রকাশ হয়ে যাওয়ায় জনসমাগম ক্রমশ বেড়েই চলছিল। নানা মানুষ, নানা প্রশ্ন, নানা সমস্যা—সেইসব প্রশ্নের উত্তর, সেইসব সমস্যার সমাধান করতেই স্বামীজির দিনের বেশিরভাগ সময় কেটে যেত। তিনি কথা বলা একদম বন্ধ করে দিলেন। তিনি মৌনব্রতমঙ্গল ভট্টজির বাড়িতে আসার অনেক আগেই অবলম্বন করেছিলেন। শিষ্যের বাড়িতে বসবাসের ফল তাঁর পক্ষে যথেষ্ট শুভ হয়েছিল। জনস্রোতকে অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে এনে ফেললেন মঙ্গল ভট্টজি ও তাঁর দুই ভাই। বিনা অনুমতিতে কেউই আর স্বামীজির

কাছে আসতে পারতেন না। ফলে নির্বিঘ্নে সাধনা করার ক্ষেত্রে আর কোনও সমস্যা রইল না। জীবনের শেষ আশি বছর স্বামীজি বেশ উৎপাতবিহীন অবস্থায় দিন কাটাতে পেরেছিলেন।

স্বামীজি এখানে সপ্তাহে একদিন মৌনভঙ্গ করে শিষ্যদের নানা উপদেশ দিতেন। কখনও কখনও তাঁর সঙ্গে অনেক সাধক দেখা করতে আসতেন। ধর্মবিষয়ক নানা প্রশ্নের উত্তর তাঁরা স্বামীজির কাছে জানতে চাইতেন। স্বামীজি তাঁদের সেই সব প্রশ্নের উত্তর দু-এক কথায় লিখে দিতেন। বাকি সময়টা তিনি ইঙ্গিতেই কাজ চালাতেন। মঙ্গল ভট্টজি স্বামীজির সঙ্গে প্রায় ছায়ার মতো লেগে থাকতেন, সদাসর্বদা তাঁর নজর থাকত গুরুদেবের প্রতি। কোনওরকম কষ্ট যেন তাঁর না হয়। স্বামীজির কাছে সবসময় থাকার ফলে ভট্টজি স্বামীজির ইঙ্গিত সবথেকে ভালো বুঝতে পারতেন।

ত্রৈলঙ্গ স্বামীজি এই বাড়িতে খোলা আকাশের নীচে একটি উঁচু বেদিতে রাতে ঘুমোতেন। সেই বেদির দেওয়ালে অনেক শ্লোক লেখা ছিল। ধর্মবিষয়ে কেউ কোনও প্রশ্ন করলেই স্বামীজি মঙ্গল ভট্টজিকে ডেকে পাঠাতেন। তারপর সেই শ্লোকের এক-একটি অক্ষর আঙুল দিয়ে শিষ্যকে দেখাতেন। মঙ্গল ভট্টজি সেই অক্ষরগুলি কাগজে লিখে নিতেন। লেখা শেষ হলে তিনি সেটি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে পড়ে শোনাতেন।

উমাচরণ মুখোপাধ্যায় লিখছেন, 'কখনও কখনও দুইজন-একজন ব্রহ্মচারী কঠিন বিষয় মীমাংসা করিতে আসিতেন। স্বামীজির ২৫/৩০ খানি হাতে লেখা পুঁথি ছিল তাহা হইতে আবশ্যক মতো পুঁথিখানি আনাইয়া তাঁহাদিগকে দেখাইয়া মীমাংসা করিয়া দিতেন। যদি কখনও কথা কহিবার বিশেষ আবশ্যক হইত তবে রাত্রিকালে তাহা করিয়া বুঝাইয়া দিতেন।'

উমাচরণবাবু লিখছেন, 'যে বাড়িতে তিনি অবস্থিতি করিতেন সেই বাড়িতে মঙ্গলদাস ঠাকুর, তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণপ্রসাদ ঠাকুর ও তাঁহাদের মাতা অম্বাদেবী (ইহারা মহারাষ্ট্র দেশের লোক) বাস করিতেন। মঙ্গলদাস ঠাকুর তাঁহার সেবক এবং অম্বাদেবী তাঁহার সেবিকা ছিলেন। অম্বাদেবী তাঁহার খাবার প্রস্তুত করিয়া দিতেন। তিনি মঙ্গলদাস ঠাকুরকে ও তাঁহার মাতা অম্বাদেবীকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। তিনি একটি গাভী রাখিয়াছিলেন। মঙ্গলদাস ঠাকুরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ওই গাভীর সেবা করিত।' এখানেও সংশয়! মঙ্গলভট্টজিরা কয় ভাই! তাঁকে ধরে দুই না তিন!

শঙ্করী মাতাজি মঙ্গলদাস ঠাকুরের বাড়ি ও স্বামীজি সম্পর্কে বেশ কিছু নতুন তথ্য দিয়েছেন। তিনি লিখছেন, ''বাবা ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী নিজে কখনও কোনও স্থায়ী বাসস্থান বা আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন নাই। স্বামীজী শেষ জীবনে মঙ্গল ভট্টজীর আঙিনায় বেদীর উপরে উন্মুক্ত আকাশের তলে থাকিতেন। স্বামীজীর জীবিত অবস্থায় তাঁহার একটি নিজ বৃহৎ প্রস্তরমূর্ত্তি নির্ম্মিত হয়, স্বামীজীর তিরোধানের পর মঙ্গল ভট্টজীর গৃহপ্রাঙ্গণে কালোপাথরের জাজ্বল্যমান মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া আঙিনায় বৃহৎ শিবলিঙ্গমূর্ত্তিসহ মা কালী বিগ্রহ সেখানে বেদীর পশ্চিম প্রকোষ্ঠে এবং ওই প্রাঙ্গণের দক্ষিণ বারান্দায় 'বেণীমাধব বিগ্রহ' ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। আপনারা লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন এই কালীমূর্ত্তির জিহ্বা বাহির করা নাই এবং ইহার পদতলে মহাদেবও নাই, তজ্জন্যই ইহার অপর নাম হল 'মঙ্গলা-গৌরী-মা'। কথিত আছে স্বামীজী গঙ্গাগর্ভ হইতেই ওই দুই প্রসিদ্ধ কালীমূর্ত্তি ও প্রকাণ্ড শিবলিঙ্গ আদিষ্ট হইয়া উদ্ধার করেন এবং নিজে স্বহস্তে তাহা মঙ্গল ভট্টজীর প্রাঙ্গণে আনিয়া প্রতিষ্ঠিত করেন। এই শিবলিঙ্গ বর্ত্তমানে 'ত্রৈলঙ্গেশ্বর শিব' বলিয়া প্রসিদ্ধ। কাশীধাম যাত্রীদের ইহাও একটি প্রকৃত তীর্থ দর্শনীয় স্থান।''

মঙ্গল ভট্টজির বাড়িতে ত্রৈলঙ্গ স্বামীজির প্রস্তরমূর্তির ঠিক নীচে ভূগর্ভে একটি সাধন প্রকোষ্ঠ এখনও বর্তমান। ওইখানেই স্বামীজি তাঁর শিষ্যদের শিক্ষা ও দীক্ষার কাজ সম্পন্ন করতেন। স্বামীজির শিষ্যা সন্ন্যাসিনী শঙ্করী মাতাজি ওই সাধন প্রকোষ্ঠে বারো বছর বয়েসে ব্রহ্মচর্য্যে দীক্ষিতা হয়ে এবং পরে আরও বারো বছর সাধনা করেছেন। এসবের জন্যই মঙ্গল ভট্টজির বাড়িকেই আমরা ত্রৈলঙ্গস্বামীর মঠ বা আশ্রম বলে জানি। কিন্তু স্বামীজি কোনও মঠ বা আশ্রম নিজে কখনও প্রতিষ্ঠা করেননি। তাঁর তিরোধানের পর স্বামীজির ভক্ত, শিষ্য ও শিষ্যারা ওই বাড়ির বাইরে স্বামীত্রৈলঙ্গজির নামে সাইনবোর্ড লাগান।

মাতা মীনাক্ষী দেবীর আদেশে ত্রৈলঙ্গ স্বামীজি দক্ষিণভারত থেকে চলে এসেছিলেন কাশীধামে। এইখানে তিনি তাঁর জীবনের সত্তর বছর দেখতে দেখতে কাটিয়ে ফেললেন। বর্তমানে তাঁর বয়স দুশো বছর। কাশীর সচল বিশ্বনাথ ত্রৈলঙ্গ স্বামীর দিব্যচ্ছটায় কাশীধাম আরও উদ্ভাসিত হয়েছে। চুম্বক যেমন লোহাকে আকর্ষণ করে ঠিক সেইরকম স্বামীজির আকর্ষণে প্রতিদিন কত শত মানুষ ছুটে এসেছেন তাঁর চরণতলে। কাশীধামের ঐতিহ্য আরও গরিমাযুক্ত হয়েছে। এই কাশীধামকে ঘিরে তো কাহিনির শেষ নেই। অসংখ্য পৌরাণিক ঘটনা, অজস্র অলৌকিক কাণ্ড কাশীধামকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে। এই কাশীধামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে কালভৈরবের উপাখ্যান। ঘুরতে ঘুরতে একদিন ব্রহ্মা ও নারায়ণ সুমেরু পর্বত শিখরে এলেন। সেখানে তখন দেবতারা যজ্ঞে ব্যস্ত। বহু দেব-দেবী ও ঋষি সেই যজ্ঞস্থলে উপস্থিত রয়েছেন। ব্রহ্মা ও নারায়ণ তাঁদের পাশে বসে পড়লেন।

এই যজ্ঞ চলাকালীন অব্যয়-ব্রহ্মের প্রসঙ্গটি উঠল। এক ঋষি জানতে চাইলেন অব্যয় ব্রহ্ম কে? ব্রহ্মা বললেন, আমি জগতের সৃষ্টিকর্তা। তাই আমি অব্যয় ব্রহ্ম। সঙ্গে সঙ্গে বিরোধী দলের নেতার মতো বিরোধিতা করলেন বিষ্ণু। তিনি বললেন, আমি জগৎকে পালন করি, তাই আমিই অব্যয় ব্রহ্ম। প্রবল ঝগড়া শুরু হল। সেই ঝগড়া থামাতে সবাই সচেষ্ট হলেন। কিন্তু ব্যর্থতা, কেবল ব্যর্থতা নিয়ে তাঁরা ফিরে গেলেন যে যাঁর আসনে। মহা সমস্যা। সঙ্কটজনক পরিস্থিতি। তখন চতুর্বেদ সেখানে উপস্থিত হলেন সমস্যা মেটাবার জন্য। বেদগণকে দেখে ব্রহ্মা ও নারায়ণ তাঁদের কাছে অব্যয় ব্রহ্ম কে তা জানতে চাইলেন। অনেক ভেবেচিন্তে, ঘাড় নেড়ে, মাথা চুলকে তাঁরা বললেন, আপনাদের দুজনের মধ্যে কেউই অব্যয় ব্রহ্ম নন। দেবাদিদেব মহাদেবই অব্যয় ব্রহ্ম। তবে বেদ-এ শিবের কোনও অস্তিত্ব নেই। বেদ শিব নয়, রুদ্রকেই স্বীকৃতি দেন। বেদের অবস্থান তখন অনেকটা এখনকার কেন্দ্রীয় সরকারের মতো। কেন্দ্র কোনও সিদ্ধান্ত নিলে সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বিরোধিতা করার জন্য রাজ্য সরকার ও বিরোধীপক্ষ ভাই-ভাই হয়ে যায়। অব্যয় ব্রহ্মকে সেই সিদ্ধান্তের ব্যাপারে ব্রহ্মা ও নারায়ণ এক হয়ে গেলেন। ধুন্ধুমার ঝগড়া শুরু হল চতুর্বেদের সঙ্গে। এই কোলাহলে মহা বিরক্ত হয়েছিলেন দেবাদিদেব। তিনি তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। ঝগড়া ও কোলাহল বন্ধ করার জন্য পাতাল থেকে একটা আলোর শিখা সেখানে উঠে এল। সেই জ্যোতিঃপুঞ্জের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন ত্রিশূলধারী রুদ্র বা মহাদেব।

প্রজাপতি ব্রহ্মার তো তখন যথেষ্ট বয়েস হয়েছে। রুদ্র বা দেবাদিদেবের মুড যে মোটেই ভালো নেই তিনি তা বুঝতে পারেননি। ফলে তিনি মহাদেবকে দেখেই বললেন, বৎস শিব! আমি তোমার পিতা। আমাকে প্রণাম করো!

ব্যস যা হওয়ার তাই হল। সঙ্গে-সঙ্গে তিনি তাঁর জটা ছিঁড়ে এক ভয়ংকর পুরুষকে সৃষ্টি করলেন। তাঁর নাম কালভৈরব। শিব বা রুদ্রের আদেশে কালভৈরব তাঁর নখ দিয়ে ব্রহ্মার পঞ্চম মস্তকটি টুক করে ছিঁড়ে নিলেন। আর এরপরেই বিপদে পড়লেন কালভৈরব। সেই কর্তিত মস্তককে তো ঝেড়ে ফেলা যাচ্ছে না। সেটা তো হাতেই আটকে আছে। কী হবে এবার!

বিষ্ণু অত্যন্ত বুদ্ধিমান। তিনি গতিক খারাপ দেখে রুদ্রের স্তব করে স্থান পরিত্যাগ করলেন। তখন কালভৈরব মহাদেবকে বললেন, এখন কী হবে! শিব বললেন, তুমি চিন্তা কোরো না, এই মাথাটি হাতে নিয়েই তীর্থ পরিক্রমায় বেরিয়ে পড়ো। কোনও একটা তীর্থে তুমি অবশ্যই ব্রহ্মহত্যার পাপ থেকে মুক্ত হবে। নরকবাস করতে হবে না।

দেবাদিদেব মহাদেব কী ভয়ংকর কাজটি করলেন! তাঁরই আদেশে কালভৈরব হত্যা করলেন। আর পুলিশরূপী 'পাপ' যখন তাঁকে গ্রাস করতে আসছেন তখন তিনি হাত ধুয়ে নিয়ে বললেন, তুমি তীর্থে তীর্থে ঘুরে মরো। কোনও তীর্থে তোমার পাপ মুক্ত হবে। অর্থাৎ আমি এখন কিছু করতে পারব না। তুমি আন্ডারগ্রাউন্ডে যাও। পরিস্থিতি ঠান্ডা হলে আমি খবর পাঠাব। সত্যিই শিক্ষণীয় বিষয়।

বোঝো ঠ্যালা। হাতে কর্তিত মস্তক নিয়ে কালভৈরব একের পর এক তীর্থ পরিক্রমা করলেন। নো ফল! কাটা মাথা যে অবস্থায় ছিল সেভাবেই ঝুলে রইল। হতাশায় মন প্রায় ভেঙে যেতে বসেছে। নিশ্চিত নরকবাস আর কেউ আটকাতে পারবেন না—এইসব নানা অশুভ কথা ভাবতে-ভাবতে তিনি কাশীধামে প্রবেশ করলেন। সেই পুণ্যধামে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে হাত থেকে কাটা মাথাটি টুক করে খুলে পড়ে গেল। কালভৈরব প্রায় আনন্দে নেচে উঠলেন।

ঠিক সেইসময় সিনে এন্ট্রি নিলেন দেবাদিদেব মহাদেব। তিনি জলদগম্ভীর স্বরে কালভৈরবকে বললেন, তুমি আজ থেকে এই কাশীধামেই বাস করবে। তুমি হবে কাশীর প্রহরী। আমার প্রতিনিধি। আগে তোমার পুজো করে তারপর আমার পুজো করতে হবে। যদি তা না হয় তাহলে সেই পুজোর কোনও ফললাভ হবে না। সেইদিন থেকে কালভৈরব এই কাশীধামে বসবাস করছেন।

স্বামীজির সাধন পদ্ধতি! পুরোটাই এতকাল রহস্যাবৃত ছিল। তিনি অথবা তাঁর দুই প্রিয় শিষ্য-শিষ্যা উমাচরণবাবু ও সন্ন্যাসিনী শঙ্করী মাতাজি এব্যাপারে কোনওরকম মুখ খোলেননি। ফলে স্বামীজির এই একটি বিষয় সম্পর্কে এতদিন অন্ধকারেই ছিলাম। সম্প্রতি একটি বই হাতে এল। লেখক টি এন গণপতি, বইটির নাম 'দি ফিলোসফি অফ দি তামিল সিদ্ধস'। এই বই থেকে সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি—'তামিল সিদ্ধদের আরাধ্য দেবতা হলেন মহাদেব অর্থাৎ শিব। এই শৈব সাধনাতেই তাঁদের সিদ্ধিলাভ। মাদুরাই মীনাক্ষী মন্দিরের দেবীকে বলা হয় সিদ্ধের সিদ্ধ। এই সাধনধারাটির নাম কৈল্য। শব্দটির অর্থ ভগবান শিবের অনুগামী। শিবই গুরু। দক্ষিণ ভারতে বহু সাধকের নাম শিবগুরু। শিবের আর এক নাম সিদ্ধিশ্বর। এইসব সাধকদের দর্শন এবং অনুভূতি হল—জীব এবং শিব এক। যিনি নিজের মধ্যে শিবের অস্তিত্ব অনুভব করেন তিনিই সিদ্ধ। শুধু তাই নয়, সাধনার শেষে তাঁরা নিজেরাই শিব হয়ে যান। জীব শিবে রূপান্তরিত হলেন—এই হল শেষ কথা। একটু একটু করে শিব ভাবনায় পূর্ণ হতে হতে একসময় দেখতে পান তিনি শিব চেতনায় পরিপূর্ণ। তাঁরা নিজের ভেতরে একটি প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ দেখতে পান। শিবানুভব। তখন তাঁর জীবত্ব ঘুচে যায়। জীব-শিব-ঐক্য। আসলে সমস্ত পদ্ধতিটি একটি যোগ। যোগ সাধনাই মূল সাধন। কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ। এই শক্তি জাগরণের ফলে খুব সহজেই তাঁরা অষ্টসিদ্ধি লাভ করেন। অণিমা—অর্থাৎ ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র হয়ে যাওয়া, মহিমা—বিশাল থেকে বিশালতর হয়ে যাওয়া, লঘিমা—শূন্যে ভাসমান। গরিমা—সর্বত্র গমনের ক্ষমতা। প্রকাস্য—ইচ্ছাশক্তির দ্বারা যে-কোনও জিনিস লাভ করা। ঈশিত্ব—যে-কোনও জিনিস তৈরি ও নিয়ন্ত্রণে রাখার ক্ষমতা। বশিত্ব—জগৎকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা। যদকামস্তদবস্যতি—ইচ্ছাপূরণ।

দেহমুক্ত অবস্থায় পৌঁছোনোই লক্ষ্য। কিন্তু মৃত্যু নয়। অনেক সময় মনে হতে পারে তাঁরা বুঝি জাদুকর অথবা বিশ্রী কোনও সাধু। তা কিন্তু নয়। এক সিদ্ধ শিবভাক্তিয়ার দুঃখ করে বলেছিলেন, অনেকেই জানেন না পাগল আর সিদ্ধে কী তফাত। এই ধারার সাধকরা এতটাই উন্নত, যাঁরা বলতে পারেন আমি আত্মাকে জেনেছি। তাঁরা কেউ নাস্তিক নন। সর্বময় ঈশ্বরকে বিশ্বাস করেন। ধর্মে আবদ্ধ তেত্রিশ কোটি ঈশ্বরকে তাঁরা পাত্তা দেন না। একজন ভগবান, তিনি শিব। তাঁকে কোনও সীমায় অথবা মতবাদে বেঁধে রাখা যায় না। একজন প্রকৃত সিদ্ধ নাস্তিকও নন আস্তিকও নন। তাঁর চিন্তা সম্পূর্ণ স্বাধীন।

সিদ্ধদের চারটে শ্রেণীতে রাখা হয়, যথা—কুটিচক, বহুদক, হংস এবং পরমহংস। এই শেষ অবস্থাটি সুপ্রাচীন। পরমহংসের স্থান বৃক্ষতলে, শ্মশানে, অথবা পরিত্যক্ত আবাসে। তাঁরা সবসময় নগ্ন। বস্তু জগতের কোনও বস্তুই তাঁদের আকর্ষণ করতে পারে না। তাঁরা আত্মারাম। মাটির তাল ও সোনার তাল তাঁদের অনুভূতিতে এক। যে কোনও বর্ণের দেওয়া মানুষের খাদ্যগ্রহণে তাঁদের আপত্তি নেই। তাঁরা তান্ত্রিক যোগী। একটি উপনিষদও আছে; যার নাম পরমহংস উপনিষদ। এর চারটি শ্লোকের সঙ্গে তামিল সিদ্ধদের সম্পূর্ণ মিল।

তাঁদের মুখ্য সাধনা হল প্রাণায়াম ও হঠযোগ। তাঁরা আজ্ঞাচক্রে কুণ্ডলিনী শক্তিকে তুলে বিশ্বাত্মার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেন। সাধনার সঙ্গে সাতটি আচার বা করণীয় যুক্ত থাকে, যথা—বেদ, বৈষ্ণব, শৈব্য, দক্ষিণা, বামা, সিদ্ধান্ত এবং কৌল্য। এর প্রথম তিনটিকে বলা হয় পশুভাব। চতুর্থ এবং পঞ্চমটিকে বলা হয় বীরভাব, আর শেষের দুটি হল দিব্যভাব। কোনও কোনও মতে একমাত্র কৌল্যভাবই হল দিব্যভাব।'

ত্রৈলঙ্গ মহারাজ এই সম্মিলিত সাধন প্রক্রিয়ার বলে সম্পূর্ণ মুক্ত অবস্থায় পৌঁছোতে পেরেছিলেন। তিনি স্বয়ং শিব হয়ে গিয়েছিলেন। কোনও একটি ধর্ম তাঁর ধর্ম নয়, কোনও একটি দেবতা তাঁর দেবতা নয়। তাই তো তিনি ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে বলতে পেরেছিলেন, ''যখন সাধকের মন আত্মাতে বিলীন হইয়া যায়—সমাধি মগ্ন হয়—তখন 'এক' ভিন্ন দুই আর থাকে না, তাহাকেই অদ্বৈতবাদ বলা হয়। আবার

মন যখন ভগবানের অন্বেষণার্থে সাধন তৎপর হয় তখন 'দুই' অর্থাৎ (এক) ভক্ত, (দুই) ভগবান—ইহাকেই দ্বৈতবাদ বলা হয়। তাই বলিতে পারা যায় ভগবান এক ও দুই, তবে বস্তুত ভগবান এক।'

সেইজন্যই ত্রৈলঙ্গ স্বামী গণেশ, রুদ্র, বিষ্ণু, শিব, ভৈরব, কাপালিক, পশুপতি, অঘোর ইত্যাদির উপাসক ছিলেন না। তিনি স্বয়ং শিব, এবং ব্রহ্মের অনুভূতি সদা জাগ্রত ছিল তাঁর আচার-আচরণে। শেষ কথা বলা যায়—কুণ্ডলিনীর সদা জাগ্রত অবস্থায় প্রভূত সিদ্ধির অধিকারী হয়ে সুদীর্ঘ জীবন কাটিয়েছিলেন।

ছোট একটি প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করে আবার ফিরে যাব স্বামীজির কাছে। লেখক টি এস গণপতি মহাশয়ের অষ্টসিদ্ধির বর্ণনার সঙ্গে আমাদের বর্ণনার কিছু ফারাক লক্ষ করা যাচ্ছে। পালটে গেছে কিছু নামও।

স্বামীজির সাধন পদ্ধতি সম্পর্কে তেমন কিছু জানা না গেলেও তাঁর শিষ্যা সন্ন্যাসিনী শঙ্করী মাতাজির কঠোর ব্রহ্মচর্য পালন ও যোগসাধনার কথা তো আমরা জানি। কী ভয়ংকর সেই সাধনা। শঙ্করী মাতাজি নিজের মুখে সেকথা আমাদের জানিয়ে গেছেন—'বারো বছর বয়েসে বাবা ও মায়ের গুরুদেব ত্রৈলঙ্গ স্বামীজি আমাকে বৈশাখ মাসের শুভ অক্ষয় তৃতীয়ার দিন মহাব্রহ্মচর্য্য ব্রতে দীক্ষা দেন। বৈদিক যুগের রীতি অনুসারে আমার পৈতে হয়েছিল। কাশীধামে মঙ্গল ভট্টজির গৃহে গুরুদেবের শয়নবেদির ঠিক নীচে গুহার মতো একটা ছোট সাধন প্রকোষ্ঠ ছিল। ওই ভূগর্ভস্থ গৃহে স্বামীজি তাঁর শিষ্য ও ভক্তদের সাধন-ভজন সম্পর্কে উপদেশ ও দীক্ষা দিতেন।'

ওই ভূগর্ভস্থ প্রকোষ্ঠে বসবাস করেই তিনি স্বামীজির কাছে যোগশিক্ষাদি লাভ করেছিলেন। মাতাজিও মুখ বুজে সমস্ত কষ্টকে অগ্রাহ্য করে ব্রহ্মচর্য পালন করেন। এই সময় তিনি বাবা, মা ও গুরুদেব ছাড়া আর কারও মুখদর্শন পর্যন্ত করেননি। মাতাজির মা অম্বালিকা দেবী মেয়েকে প্রতিদিন দুবেলা ঊষাকালের প্রাক্কালে ও সূর্যাস্তের পর গঙ্গাস্নান করিয়ে আনতেন। ওই ভূগর্ভস্থ প্রকোষ্ঠ থেকে গঙ্গা পর্যন্ত একটি সুড়ঙ্গ ছিল। ওই পথেই তাঁরা নিয়মিত গঙ্গাস্নানে যেতেন।

অম্বালিকা দেবী প্রতিদিন রাতে মেয়ের কাছে খাবার দিয়ে আসতেন। কী ধরনের খাদ্যদ্রব্য দেওয়া যাবে তাও ঠিক করে দিয়েছিলেন ত্রৈলঙ্গ স্বামীজি। প্রথম চার বছর অর্থাৎ মাতাজি তাঁর বারো বছর বয়স থেকে ষোলো বছর বয়স পর্যন্ত শুধু ফল খেয়েই জীবন অতিবাহিত করেছেন। তারপর ষোলো থেকে কুড়ি বছর—কন্দমূল সিদ্ধ ও দুধ। কুড়ি থেকে চব্বিশ বছর, অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য ব্রতের শেষ চার বছর তিনি খেতেন একমুঠো চালের ভাত ও দুধ।

বারোটা বছর তাঁকে অত্যন্ত কঠোর নিয়মশৃঙ্খলার মধ্যে জীবন কাটাতে হয়েছিল। এক বেলা আহার করে তিনি গুরুদেবের নির্দেশগুলি অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতেন। মাঝে মাঝেই স্বামীজি শিষ্যার কাছে গিয়ে তাঁকে নানাবিধ উপদেশ দিতেন। আর অদ্ভুত ব্যাপার, স্বামীজিকে দর্শন করার সঙ্গে সঙ্গে বালিকা শঙ্করী মাতাজির সমাধি হয়ে যেত।

এইভাবে ব্রহ্মচর্য ব্রতের বারোটা বছর কেটে গেল। স্বামীজির নির্দেশে তিনি গুহাসদৃশ সেই সাধনকুঠির থেকে ওপরে উঠে এলেন। তখন তাঁর বয়স চব্বিশ বছর। ত্রৈলঙ্গ স্বামীজি শঙ্করী মাতাজিকে ব্রহ্মচর্য ব্রত উদযাপনের পর চব্বিশ বছর বয়েসে কাশীধামে, বৈশাখী সংক্রান্তির দিন সন্ন্যাস প্রদান করেন। সেদিন বিরজা হোম করে মাতাজি ব্রহ্মচর্যের সূত্র আহুতি দিলেন। এইসব কাজ মিটে যাওয়ার পর স্বামীজি শিষ্যাকে হিমালয়ের নির্জন স্থানে তপস্যা করার নির্দেশ দেন। সেদিন মাতাজি গুরুদেবকে জিগ্যেস করেছিলেন, বাবা, আমি একা কী করে হিমালয়ে গিয়ে থাকব! স্বামীজি তাঁকে আশ্বাস ও অভয় দিয়ে বলেছিলেন, একা কেন থাকবে মা! তোমার বড় দাদার মতো গুরুভ্রাতা ভোলানন্দ তোমার সঙ্গে যাবে। সবকিছু সে দেখবে। আর আমাকেও সেখানে মাঝে মাঝে তুমি দেখতে পাবে।

বাংলা ১২৫৭ সন, ইংরেজি ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে শঙ্করী মাতাজি গুরুদেব পিতা ত্রৈলঙ্গ স্বামী, মা অম্বালিকাদেবীকে প্রণাম ও তাঁদের আশীর্বাদ নিয়ে কাশী থেকে হিমালয়ের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। তিনি ও তাঁর গুরুভ্রাতা ভোলানন্দজি হরিদ্বার হয়ে হিমালয়ে গমন করেন। সেখানে শ্রীশ্রী কেদারনাথধাম, বদ্রিকাশ্রম,

গোমুখী গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী এবং তিব্বতের মানসসরোবর সহ আরও বিভিন্ন স্থানে আঠারো বছর কঠোর সাধনা ও তপস্যা করে তিনি সিদ্ধিলাভ করেছিলেন।

'মহাযোগেশ্বর বাবা ত্রৈলঙ্গ স্বামীজির জীবনী ও তৎশিষ্যা শ্রীশ্রী শঙ্করী মাতাজি এবং মাতাজির নির্দেশিত নিত্যপূজা পদ্ধতি' গ্রন্থে স্বামী ত্রৈলঙ্গজির জীবনের নানা কথা বলা হয়েছে। কিন্তু তাঁর সাধন পদ্ধতি সম্পর্কে তেমন কিছু বলা না থাকলেও, এখানে স্বামীজির অজস্র গুণাবলীর কথা সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। একজন ত্রিকালজ্ঞ মহাপুরুষের কী কী গুণ থাকা আবশ্যক তা খুব সুন্দরভাবে চিত্রিত করেছেন শঙ্করী মাতাজি। এই পুস্তকের একটি অধ্যায়—যুক্তযোগী ত্রৈলঙ্গ স্বামীজি। সেখানে বলা হয়েছে, যা মাতাজি লিখেছেন তাই হুবহু তুলে দিলাম।

"জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ।।" (গীতা)

যে ব্যক্তি নিজের মলিন আত্মাকে (ইন্দ্রিয়াসক্ত মনকে) জয় করিয়া পরম শান্তিলাভ করিয়াছেন তাঁহার পরমাত্মা প্রকৃতির অধীনতা হইতে সর্ব্বপ্রকারে মুক্ত হইয়া সর্ব্বদা সকল অবস্থাতেই অবিচলিত থাকে। এরূপ অবস্থাতেই শীত-উষ্ণ, সুখ-দুঃখ বা মান-অপমান ইত্যাদি দ্বন্দ্ববোধ আর থাকে না—থাকিতে পারে না। সাংসারিক যাবতীয় চেতনার ও কর্ম্মের মধ্যে তাঁহার কোন বিক্ষোভ দৃষ্ট হয় না। তিনি যুক্তযোগী।

ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে আমরা স্পষ্টরূপে দেখিতে পাই যে শীত-উষ্ণ, সুখ-দুঃখ, মান-অপমান প্রভৃতি দ্বন্দ্বাবস্থা তিনি সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করিয়াছিলেন। এমনকী শীতোষ্ণ দ্বন্দ্ববোধ তাঁহার পাঞ্চভৌতিক দেহের উপরেও কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হয় নাই। দারুণ গ্রীষ্মে বালু বা পাথর অগ্নিতুল্য গরম হইয়া রহিয়াছে, 'লু' অর্থাৎ আগুনে বাতাস হু-হু করিয়া বহিতেছে, অথচ স্বামীজী ইহার মধ্যে নগ্নগাত্রে মহাসুখে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। পক্ষান্তরে কাশীর ভীষণ শীতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গঙ্গার বরফ প্রায় শীতল কনকনে জলে অবস্থান করিতেন।

ক্ষুধা এবং তৃষ্ণাও ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী এমনি সম্পূর্ণরূপে জয় করিয়াছিলেন। তিনি কখনও চাহিয়া আহার করিতেন না—নিজের হাতেও খাইতেন না, খাওয়াইয়া দিলে খাইতেন! দিনের পর দিন অনশনে কাটাইয়াছেন, কিন্তু শারীরিক দুর্ব্বলতা কাছেও ঘেঁসিতে পারে নাই। আবার ভোজনের সময় যে পরিমাণ যিনি খাদ্য মুখে দিয়া দিতেন তাহাই তিনি খাইয়া ফেলিতেন। এরূপ অস্বাভাবিক আহারেও তাঁহার দেহের উপর কোনওরূপ ক্রিয়া বৈলক্ষণ্য প্রকাশ পায় নাই। দ্বন্দ্বাতীতের ঊর্ধ্বে তুরীয় অবস্থায় সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বত্যাগী-উলঙ্গ মহাযোগেশ্বর বাবা ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর মতো এমন জীবন্ত দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত আর কোথাও পাওয়া যায় কি?

"জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ।।" (গীতা)

সেই যোগীকেই যুক্তযোগী বলা যায় যিনি জ্ঞান (শাস্ত্রোপদিষ্ট পরোক্ষ জ্ঞান) ও বিজ্ঞান (আত্ম-অনুভূতি লব্ধ বা অপরোক্ষ জ্ঞান) দ্বারা পরিতৃপ্ত যিনি নির্ব্বিকার ও বিশিষ্ট জিতেন্দ্রিয়, যিনি হেয়—উপাদেয়—বুদ্ধিশূন্য, স্বর্ণ-প্রস্তর-মৃত্তিকাদি যাঁহার নিকট সমতুল্য। সাধারণ লোকে স্বর্ণকে বহু মূল্যবান জিনিস বলিয়াই মনে করে, আর প্রস্তর বা মৃত্তিকাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে, তাহা কেহ কুড়াইয়া নিয়া যায় না। স্বর্ণ দ্বারাই লোকে ইহ সংসারে ভোগের উপকরণ সংগ্রহ করিয়া থাকে। কিন্তু দেখুন সর্ব্বত্যাগী যোগীর চিত্তে ভোগের আকাঙ্ক্ষা নাই বলিয়া তাঁহার নিকট সুবর্ণ ও প্রস্তর এবং মৃত্তিকা সকল বস্তুরই সমান মূল্য বলিয়া বোধ হয়, ইহাদের কোনটিতেই তাঁহাদের প্রকৃত লক্ষ্য থাকে না। তাঁহারা যে পরমধন প্রাপ্তে 'পরমধনী' হন তাহাতেই রাজ্যাদিপদ অতি তুচ্ছ ও হেয় বোধ হয়! তাই বলি সর্ব্বসাধারণ লোক ব্যতীতও রাজা-মহারাজা-মহারাজাধিরাজ পর্য্যন্ত সকলেই

এই পরমধনের প্রাপ্তি বিহনে যুক্তযোগী মহাপুরুষগণের চরণে অভাবগ্রস্ত মনে মস্তক অবনত করেন!! তাই বলা হয় রাজা শুধু নিজ রাজ্যে মানিত ও পূজিত হন, কিন্তু এবম্বিধ মহাপুরুষগণ সর্ব্বত্র আদৃত ও সর্ব্বদেশে সর্ব্বপূজিত হন!!

ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর মত মহাজ্ঞানী মহানিষ্কাম ব্রতধারী-সুদক্ষ-কর্ম্মী-মহাভাগবৎ ভক্তজগতে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তিনি অদ্বিতীয় শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। কত সাধুর, কত দার্শনিকের কত দুরূহ সমস্যা ও কঠোর তত্ব সমূহের সর্ব্বতোভাবে স্বামীজী মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী অধিকাংশ সময়েই অপরোক্ষানুভূতির জগতে সমাধিস্থ অবস্থায় কালযাপন করিতেন। এমন নির্ব্বিকার জিতেন্দ্রিয় পুরুষই বা জগতে কয়জন হয়?

সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চন-ভাবের পরিচায়ক ঘটনা স্বামীজীর জীবনে যে কত ঘটিয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। কতবার কত ধনী ভক্ত তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ স্বর্ণাভরণে সাজাইয়া দিয়াছেন, ক্ষণিক পরেই তাহা লোকে খুলিয়া লইয়া গিয়াছে, তিনি কোনটাতেই ভ্রূক্ষেপ করেন নাই।

"সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীন মধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু।
সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে।।" (গীতা)

যে যুক্তযোগী সুহৃত মিত্র, শত্রু, উদাসীন, মধ্যস্থদ্বেষ্য, বন্ধু এবং সাধু ও অসাধু সকলের প্রতিই সমভাবাপন্ন —তিনি সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চন ব্যক্তি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ! সাধারণ লোকের বন্ধু ও সুহৃৎ নিতান্ত প্রিয়, পক্ষান্তরে শত্রু ও দ্বেষ্য লোক অপ্রিয় হইয়া থাকে। উপকারী ব্যক্তিকে সকলেই আদর করে, পক্ষান্তরে অপকারী ব্যক্তিকে ঘৃণা করিয়া থাকে! কিন্তু যোগী মিত্রকেও আদর করেন না, শত্রুকেও ঘৃণা করেন না। তিনি উভয়কেই সমদৃষ্টিতে দর্শন করেন!! যোগীর নিকট পাপী ও পুণ্যাত্মার ভেদ নাই!!

"এজগতে কেহ কারও শত্রু মিত্র নয়।
ব্যবহারই শত্রু মিত্র পরিচয় হয়।"

যোগী ও মহাপুরুষগণ পাপীকে ঘৃণা করেন না। সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চন ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী মানুষের সহিত ব্যবহারেও সম্পূর্ণরূপেই সাম্য ভাবাপন্ন ছিলেন। ইহার ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত তাঁহার জীবনে পাওয়া যায়।'

ওই গ্রন্থের পরবর্তী অধ্যায়ের নাম 'ভগবানের আত্মস্বরূপ ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী'। সেখানে কী বলা হয়েছে?

শ্রীভগবান গীতায় বলিয়াছেন—

"চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনা সুকৃতিনোহর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভঃ।।" (গীতা)

ইহ সংসারে সুকৃতিশালী চারিশ্রেণীর লোক মাত্র শ্রীকৃষ্ণ ভগবানকে ভজনা করে;—(১) আর্ত্ত, (২) জিজ্ঞাসু ও (৩) অর্থার্থী এবং (৪) জ্ঞানী।

অর্থাৎ—(১) কেহ সংসারের রোগ-শোক, দুঃখ-দারিদ্র প্রভৃতি দ্বারা প্রপীড়িত বা আর্ত্ত হইয়া, (২) জিজ্ঞাসু—কেহ বা আত্মজ্ঞান ও ভগবৎতত্বাদি জানিতে উৎসুক হইয়া, (৩) অর্থার্থী—কেহ ঐহিক বা পারত্রিক কল্যাণ কামনায়, অপরে বা কোন প্রয়োজন সাধন উদ্দেশ্যে অর্থলাভেচ্ছু লইয়া এবং (৪) জ্ঞানী—আবার কেহ আত্মবিৎ হইয়া বা পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিয়া অর্থাৎ ''বাসুদেবঃ সর্ব্বম''—যাহা কিছু জগন্ময় আছে তৎসমুয়েই সর্ব্বব্যাপী ভগবান বাসুদেব ইহা জানিয়া, কোন প্রকার অন্যান্য উদ্দেশ্যবিহীন হইয়া কেবল মাত্র

আমাকে (ভগবানকে) পাইবার জন্যই আমাকে ভজনা করে। ''সব দেবতাকেই পূজন করি আপন ইষ্টদেবকে ভজন করি।'' তবেই একনিষ্ঠা হইয়া ইষ্ট ও ভগবান প্রাপ্তি হইবে। ভগবান লাভ হইলে গুরু-ইষ্ট-ভগবান তিন একই হইয়া যাবেন ভিন্ন জ্ঞান তিরোহিত হইয়া অভিন্নাত্বক বোধ হইবে। ভগবান আর দূরে নহেন, স্বর্গে নহেন, নিজ নিভৃত অন্তরতম অন্তঃস্থলে বিদ্যমান দেখা যায়, তাঁহাকে তিনি সকলের হৃদয় মধ্যে আছেন এবং সর্ব্ব সৃষ্টপদার্থেই বিদ্যমান আছেন ও তিনি সর্ব্বব্যাপী ইহা সিদ্ধ-সাধক তখন সম্যকরূপে উপলব্ধি করেন।

"তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তিবিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোহত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ।" (গীতা)

এই উপরোক্ত চারি শ্রেণীর সুকৃতিশালী ভক্ত মধ্যে জ্ঞানীভক্তই শ্রেষ্ঠ, কারণ তিনি সর্ব্বদা আমার সহিত যুক্ত থাকেন এবং তিনি একমাত্র আমাতেই ভক্তিমান। আমি জ্ঞানীর অত্যন্ত প্রিয় এবং তিনিও আমার অত্যন্ত প্রিয়।

"জ্ঞানী তু আত্মৈব মে মতম" (গীতা)

এমম্বিধ জ্ঞানী আমারই আত্মস্বরূপ; ইহাই আমার অভিমত!

ভগবানের এই প্রিয়তম ভক্তের যে সকল লক্ষণ শ্রীভগবান গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহার সমস্তগুলিই আমরা স্থিতপ্রজ্ঞ যুক্তযোগী ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর ভিতরে দেখিতে পাই।

"অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এবং চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কার সমসুখদুঃখ ক্ষমী।" (গীতা)

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং—সর্ব্বভূতে দ্বেষ শূন্য বা ''বাসুদেবং সর্ব্বম'' এইরূপ জ্ঞাননিবিষ্টযুক্ত ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী সর্ব্বভূতে ব্রহ্ম বা বাসুদেব দর্শন করিতেন। সুতরাং কাহারও প্রতি হিংসা ও দ্বেষের ভাব তাঁহার হৃদয়ে কখনও উদয় হইত না। এই কারণেই তিনি অপকারী ব্যক্তিকেও বিদ্বেষের চক্ষে কখনও দেখিতেন না।

মৈত্র : বিশ্বপ্রেমিক ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী সকলেরই শুভ্যানুধ্যায়ী সুহৃদ ছিলেন।

করুণ : সর্ব্বতোমুখী সাগরের ন্যায় সর্ব্বভূতের প্রতি করুণা ত্রৈলঙ্গস্বামীজীর হৃদয়ে সতত প্রবাহিত ছিল। তিনি কখনও স্বীয় অলৌকিক যোগবিভূতি নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করেন নাই, জীবের প্রতি করুণাপাতে স্বামীজীর ঐ সকল বিভূতি স্বতঃ প্রকাশিত হইয়া তাহাদের দুঃখমোচন করিত।

নির্ম্মম : যিনি প্রকৃত জ্ঞানী তাঁহার নিকট সমস্তই ভগবানের বলিয়াই মনে হয়। কাঁচা আমি বা আমার মমত্ববুদ্ধি ভাব তাঁহার মনে কখনও স্থান পায় না। আমার ও তোমার ভাব মমতা জনিতই হইয়া থাকে এবং তাহা অজ্ঞান সম্ভূত।

পূর্ণজ্ঞানসম্পন্ন ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর হৃদয় এই জন্য ''সর্ব্বত্রানাভিস্নেহ'' বা মায়ান্ধ-মমত্ববোধশূন্য ছিল।

নিরহঙ্কার : ''আমি কর্ত্তা'' এইরূপ ভাব প্রকৃত ভক্তের বা প্রকৃত জ্ঞানীর কখনও থাকে না। শাস্ত্রে ত্রিবিধ অহঙ্কারের উল্লেখ আছে :

অহং সর্ব্বমিদং বিশ্বং পরমাত্মাহমচ্যুতঃ।
নান্যদস্তীতি সংবিত্যা পরমা সা হ্যহংকৃতি।। ১
সর্ব্বস্মাদ ব্যতিরিক্তোহহং বালাগ্রদপ্যহং তনুঃ।

ইতি যা সংবিদো ব্রহ্মণ দ্বিতীয়াহংকৃতিঃ শুভা।। ২
পাণিপাদাদি মাত্রোহয়মিত্যেব নিশ্চয়ঃ।
অহংকারস্তৃতীয়োহসৌ লৌকিকস্তুচ্ছ এব সঃ।। ৩

শাস্ত্রোক্ত ত্রিবিধ অহঙ্কারের ভাবার্থ যথা :

(১) এই সমগ্র বিশ্বই আমি, আমিই সর্ব্বভূতান্তর্য্যামী পরমাত্মা, আমি ভিন্ন আর কিছুই নাই : এবম্বিধ অহংজ্ঞান প্রথম উৎকৃষ্ট বা শ্রেষ্ঠতম অহঙ্কার।

(২) আমি সকল পদার্থ হইতে ব্যতিরিক্ত এবং কেশাগ্র হইতেই সূক্ষ্ম বা সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম, এরূপ ভাব যে জ্ঞানীগণ অনুভব করেন—তাহাই দ্বিতীয় স্তরের বা শ্রেষ্ঠতর অহঙ্কার।

(৩) হস্তপদাদিযুক্ত দেহই আমি—এরূপ দেহাভিমানী সাধারণ লৌকিক ও তুচ্ছ অহঙ্কার তৃতীয় স্তরের বা নিম্নস্তরের বলিয়া কথিত হইয়াছে।

এখন দেখুন, ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী লৌকিক অহঙ্কার হইতে সম্পূর্ণরূপেই মুক্ত ছিলেন, সন্দেহ নাই। তাঁহার নিরহঙ্কারিতা স্বতন্ত্ররকমের ছিল। তিনি শ্রেষ্ঠতম অহং, সর্ব্বাত্মক ভাবরূপ পরম অহং, 'সোহহং ভাব' নিয়া বিরাজমান ছিলেন। তাঁহার সর্ব্বভূতে করুণা এই অহংকৃতির বিকাশরূপে অভিব্যক্তি হইয়াছিল।

সমসুখদুঃখ : ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী যে শীত-উষ্ণ, সুখদুঃখের দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত ছিলেন তাহা বিস্তারিতভাবে পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি আবার অন্যের সুখদুঃখে সমসুখদুঃখ সম্পন্ন ছিলেন।

ক্ষমী : ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর ক্ষমাশীলতার দৃষ্টান্তও পূর্বেও উল্লেখ করা হইয়াছে। অযথা উৎপীড়িত হইয়াও তিনি কখনও প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নাই বা কাহাকেও কখনও অভিশাপ দেন নাই। তাঁহার ক্রোধ ও দ্বেষলেশহীন চিত্ত চিরকাল অপকারীকে ক্ষমাই করিয়া গিয়াছে।

"সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধি যো মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ।।" (গীতা)

যিনি সদা সন্তুষ্ট, যোগী, সংযতচিত্ত, দৃঢ়নিশ্চয়, আমাতে মনোবুদ্ধি সমর্পণকারী যে ভক্ত তিনিই আমার প্রিয়। সন্তুষ্ট সততং—ঐহিক কামনা বাসনাদির অপূরণেই জীবের অসন্তোষের সৃষ্টি। ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর চিত্তে পরমার্থিক ছাড়া অন্য কোনরূপ কামনার আধিপত্য একেবারেই ছিল না, সুতরাং তাঁহার অসন্তোষেরও কোনও সম্ভাবনা ছিল না।

যোগী : প্রকৃত ভগবদ ভক্ত সর্ব্বদাই সমাহিত চিত্ত হন। বাসনাই চিত্ত বিক্ষেপের হেতু। বাসনা মুক্ত ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর চিত্ত তাই কখনও বিক্ষিপ্ত হইত না, ভগবানের সহিত যুক্ত হইয়া সর্ব্বদা অবস্থান করিত।

যতাত্মা : ইন্দ্রিয়বৃত্তি সমূহই চিত্ত চাঞ্চল্যের কারণ। কাম ক্রোধাদি রিপুসকল মানুষকে সর্ব্বদা বিপথে লইয়া যায়। কিন্তু ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর ইন্দ্রিয় বৃত্তি ও রিপুসকল সতত সম্পূর্ণ সংযত ছিল।

দৃঢ়নিশ্চয় : পরমেশ্বরই একমাত্র সৎ, ইহা ছাড়া অধর সমস্ত অসৎ এইরূপ দৃঢ়-নিশ্চয়াত্মক সদ বিবেক ও অটল বিশ্বাস হেতু ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী পরমেশ্বরকেই একমাত্র আশ্রয় জানিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হন ও দৃঢ়সংকল্পঃ হইয়া ভগবৎ ভজনে নিরত থাকেন।

ময্যর্পিত মনোবুদ্ধি : প্রেম ও ভক্তি দ্বারা স্বামীজী তাঁহার সমস্ত মন ও বুদ্ধিকে ভগবানে অর্পণ করিয়াছিলেন।

"মস্যান্নোদ্বিজতেলোকো লোকারোদ্বিজতে চ যত্ত।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যত্ত স চ মে প্রিয়ঃ।।" (গীতা)

যাহা হইতে লোক সকল উদ্বিগ্ন হয় না, যিনি স্বয়ং লোক সকল হইতে উদ্বেগ প্রাপ্ত হয়েন না এবং যিনি হর্ষ অর্থাৎ স্বীয় ইষ্টলাভে উৎসাহান্বিত, অমর্ষ অর্থাৎ অপরের লাভে অসহিষ্ণু বা পরশ্রীকাতর, ভয় ও উদ্বেগ মুক্ত অর্থাৎ ভয়াদি নিমিত্ত চিত্তক্ষোভ হইতে মুক্ত, তিনিই আমার প্রিয়।

যস্মান্নোদ্বিজতে লোক : প্রকৃত ভগবৎ ভক্ত ও প্রকৃত জ্ঞানী কাহারও উদ্বেগের কারণ হন না। আমরা দেখিয়াছি ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর জীবন-যাত্রা হইতে শেষ পর্য্যন্ত কখনও কাহাকেও অনর্থক উদ্বেগ ভোগ করিতে হয় নাই। এখানে সহজ সরল বোধে বলিতে চাই যে গীতার আদর্শ পুরুষোত্তম ভগবানকে নিষ্কামকর্ম্মী ও প্রকৃত ভক্ত প্রকৃত জ্ঞানী সকলেই লাভ করিতে পারেন। ভগবৎ পথ যেন রাজপথ মত সুপ্রশস্ত—এখানে পৌঁছিলে সকলেই এক! এই একেতেই বা অন্তঃরাজ্যে অধিষ্ঠিত হইয়া সর্ব্বমিলন ক্ষেত্রভূমি স্থাপিত হয়। নচেৎ মিলন না হইয়া বিবাদ ও বিসম্বাদ এবং বিচ্ছেদ চির অপরিহার্য্য। সর্ব্বতোভাবে নিষ্কাম কর্ম্মী ও ভক্ত এবং জ্ঞানীর দৃষ্টান্ত ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর প্রতীক ছাড়া আর কোথাও পাওয়া দুষ্কর!

লোকান্নোদ্বিজতে চ য : ভগবদ ভক্ত নিজেও কাহারও কর্ম্মে উদ্বেগ বোধ করেন না। অপরের দ্বারা অতিশয় উৎপীড়িত হইলেও ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর সদা প্রশান্ত চিত্তের শমতা কখনও নষ্ট হইত না! স্বামীজীর সম্পূর্ণ অহিংসা, মুক্ত-চিত্তের প্রেম প্রভাবে ব্যাঘ্র সর্পাদি হিংস্র জন্তুও জিঘাংসা বৃত্তি পরিত্যাগ করিত!

হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্ত : ভগবদ ভক্ত নিজের ইষ্টলাভে হৃষ্ট এবং অপরের ইষ্টলাভে অসহিষ্ণু হন না, সর্ব্বপ্রকার ভয় ও উদ্বেগ হইতে তাঁহার চিত্ত মুক্ত। দ্বন্দ্বাতীত ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর মত এমন গম্ভীর প্রশান্তচিত্ত মহাপুরুষ আধুনিককালে অতিশয় দুর্লভ।

"অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃং সে মে প্রিয়ঃ।।" (গীতা)

যিনি অনপেক্ষ অর্থাৎ যদৃচ্ছালব্ধ অর্থেও স্পৃহাশূন্য, শুচি (বাহ্যাভ্যন্তর শৌচসম্পন্ন), দক্ষ (অনলস প্রত্যুপন্নমতিসম্পন্ন এবং কার্য্যকুশলদক্ষ) ও উদাসীন (পক্ষপাত রহিত), গতব্যথ (আধিশূন্য অর্থাৎ চিত্ত ক্লেশ বিহীন) ও সর্ব্ববিধ উদ্যম পরিত্যাগী,—এতাদৃশ ভক্ত আমার প্রিয়।। ১৬।।

অনপেক্ষ : ভগবদভক্ত কোন ব্যক্তি বা বস্তুর অপেক্ষা রাখেন না। জীবন-মুক্ত ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীও সর্ব্ববিষয়েই স্বাধীন ছিলেন। এক ভগবান ভিন্ন স্বামীজী কখনও কাহার ওপর নির্ভর করিতেন না।

শুচি : বাহ্যভ্যন্তর শুচি; ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর ত্রিসীমানায়ও অপবিত্রতা ঘেঁষিতে পারিত না।

দক্ষ : দেখুন, যাহারা আপনার ব্যক্তিগত বুদ্ধি, রুচি বা কামনা দ্বারা কর্ত্তব্য নির্ণয় করে তাহাদিগকে অনেক স্থলেই সন্দেহ দোলায় দুলিতে হয়, কিন্তু একমাত্র ভগবানের উপর নির্ভরশীল বলিয়া ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর চিত্তে কোনো সংশয় উপস্থিত হইত না। স্বামীজী কর্ত্তব্য নির্ণয়ে এবং ক্ষিপ্রতার সহিত সেই কর্ত্তব্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করিতে কখনও অক্ষম হন নাই,

উদাসীন : সুখ দুঃখ, সম্পদ বিপদ, যাহাই আসুক না কেন, ভগবদভক্ত তাহা গ্রাহ্য করেন না। বহু ঘটনায় দেখা গিয়াছে যে ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী সর্ব্বাবস্থায় অবিচলিত থাকিতেন, কারণ তাঁহার নির্ব্বিকার চিত্ত ঊর্দ্ধলোকে "শাশ্বত সনাতন সত্যে" সর্বদাই স্থির সমাহিত অবস্থায় সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিত।

গতব্যথ : দুঃখ ক্লেশের প্রবল কারণ বর্তমান সত্বেও ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী কোনও ব্যথা অনুভব করিতেন না। ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত স্বামীজীর জীবনে পাওয়া গিয়াছে।

সর্ব্বারম্ভ পরিত্যাগী : ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী অহঙ্কারের বলে ব্যক্তিগত ভাবে দেহ মনের দ্বারা বাহ্যিক বা আভ্যন্তরীণ কোন কর্ম্মই আরম্ভ করিতেন না। ভগবৎ জ্ঞানকে স্বামীজীর নিজের কোন সঙ্কল্প ও ব্যক্তিগত অভিলাষ বা বাসনার দ্বারা বিচ্যুত না করিয়া আপনার ভিতর দিয়া অবাধে প্রবাহিত হইতে দিতেন।

বাংলাদেশের ৺শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলিতেন, "স্বয়ং বিশ্বেশ্বর ঐ শরীরটা আশ্রয় করে প্রকাশিত হয়ে রয়েছেন।" বস্তুত ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর এই পুণ্যদেহটি অবলম্বন করিয়া ৺বাবা বিশ্বেশ্বর কত লীলা

করিয়াছেন, কত লোককে কৃপা করিয়াছেন, এবং কত শত সহস্র সনাতনধর্ম্ম রক্ষক মহাপুরুষের বীজ বপন করিয়া অক্ষয় অমর কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন তাহার সংখ্যা নাই! ইহাতে স্বামীজীর বিন্দুমাত্রও অহংভাব ছিল না বলিয়াই ঐ সকল কর্ম্মে তিনি কখনও আবদ্ধ হন নাই।

শ্রীমদ্ভগবতগীতা ভক্তিযোগে :

যো না হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভ পরিত্যাগী ভক্তিমান যঃ স মে প্রিয়া।। ১২।১৭।।
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ।। ১২।১৮।।
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতিভক্তিমান মে প্রিয়ো নরঃ।। ১২।১৯।।

যে ভক্ত প্রিয়বস্তু লাভে হৃষ্ট হন না, অপ্রিয়বস্তু প্রাপ্তিতেও দ্বেষ করেন না, যিনি প্রিয়বিয়োগে শোক করেন না, অপ্রাপ্ত দ্রব্যাদিও আকাঙ্ক্ষা করেন না এবং শুভাশুভ সকল কর্ম্ম (পুণ্য ও পাপ) পরিত্যাগ করিয়াছেন, এইরূপ ভক্তিমান যিনি, তিনি আমার প্রিয়।।১২।১৭।। যিনি শত্রু ও মিত্রে সমজ্ঞান নিরাসক্ত সমচিত্তবান, যিনি মানে ও অপমানে সমচিত্ত বা অবিচলিত, যিনি শীত-গ্রীষ্মে এবং সুখদুঃখাদিতে দ্বন্দ্বরহিত অবিকৃত সমভাবাপন্ন এবং নির্বিকারচিত্ত সঙ্গ বিবর্জ্জিত আসক্তিহীন। যাঁহার নিন্দা ও স্তুতি সমজ্ঞান, যিনি যথার্থ মৌনী, যিনি পরমাত্মা-স্বরূপ ভগবানে স্থিরবুদ্ধি ও সংযতবাক, সর্ব্বাবস্থায় যদৃচ্ছালাভে সন্তুষ্ট, নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান বিহীন, স্থিরমতি-গুরুগম্ভীর ব্যবস্থিত-চিত্তসম্পন্ন ; এতাদৃশ ভক্তিমান মহোদয়গণ আমার অতীব প্রিয়।।১২।১৮-১৯।।

শ্রীমদ্ভগবতগীতার ভক্তিযোগের মধ্যে উপরোক্ত কতিপয় শ্লোকগুলিতে ভগবদ ভক্তের যে সকল লক্ষণাদি বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে তাহার অধিকাংশই স্থিতপ্রজ্ঞ ও যুক্তযোগীর লক্ষণের সহিত অভিন্ন বলিয়া তৎপ্রসঙ্গে আলোচিত হইয়াছে, সুতরাং এখানে আর পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই। যে কয়েকটি অতিরিক্ত লক্ষণের উল্লেখ আছে তাহা সদসঙ্গ আদর্শানুযায়ী নিম্নে উল্লিখিত হইতেছে—

মৌনী : ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী সাধারণত মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিতেন। শুধু শিষ্য ও অন্তরঙ্গ ভক্তগণকে সপ্তাহে একদিন রাত্রিতে মৌনভঙ্গ করিয়া উপদেশ দিতেন। আমরা অবগত আছি যে বঙ্গদেশের মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুর কাশীতে প্রাথমিক দীক্ষা ও দেহশুদ্ধি উপলক্ষেও স্বামীজী মৌনভঙ্গ করিয়াছিলেন। কথা বলিলেই চিত্তবিক্ষেপ উপস্থিত হয় এজন্য মৌনধারণ বা বাক-সংযম সাধনার পক্ষে বিশেষ অনুকূল। ইহাতে শক্তি অযথা ক্ষয় না হইয়া সংরক্ষিত হয় এবং অন্তর্শক্তি উপলব্ধির বিশেষ সহায়কারক হয়।

আমরা সচরাচর দেখতে পাই আজকাল লোকরঞ্জনের নিমিত্ত সাধুদিগকে অনেক কথা বলিতে হয়। কিন্তু নির্ব্বিকার অনপেক্ষ উদাসীন ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী লোকরঞ্জনের বহু ঊর্দ্ধে অবস্থান করিয়া লোককল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন। স্বামীজী মৌনভঙ্গ না করিয়াও প্রকৃত ধর্ম্ম জিজ্ঞাসু সর্ব্বপ্রকার সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দিয়াছেন।

অনিকেত : নির্দ্দিষ্ট বাসস্থানহীন ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী কোথায়ও স্থায়ী বাসস্থান বা আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন নাই। যখন যেখানে থাকিতেন সেখানেই স্বচ্ছন্দ চিত্তে বাস করিতেন। আমরা এখানে বলিতে চাই যে অনেকের ভ্রান্ত ধারণা আছে যে কাশীতে জীবনের সর্ব্ব শেষভাগে স্বামীজী যেখানে কালাতিপাত করিয়াছেন তাহাই তাঁহার আশ্রম বা মঠ। ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী নিজ সুদীর্ঘ জীবনে কোনও বন্ধনই স্বীকার করেন নাই। 'ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর আশ্রম বা মঠ' বলিয়া ৺কাশীধামে বর্ত্তমানে যাহা পরিচিত—তাহা শ্রীমৎ মঙ্গল দাস ভট্টজী নামক জনৈক কাশীবাসী মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণের নিজ পৈতৃক বাড়ি। আকুমার ব্রহ্মচারী মঙ্গল ভট্টজী ও তাঁহার ছোট দুই ভ্রাতা এবং তাঁহাদের মাতা অম্বাদেবী সকলেই স্বামীজীর শিষ্য ছিলেন। স্বামীজী যখন বেণীমাধব জোড়াধ্বজার

পূর্ব্বদিকস্য গঙ্গাতটোপরি পঞ্চগঙ্গা ঘাটে অবস্থান করিতেন তখন কিছুদিন স্বামীজীকে সেবায় তাঁহারা মুগ্ধ করেন এবং দয়ালু সুদূরদর্শী মহাযোগেশ্বরও বিশেষ দৈবীকার্য্যাদি সাধনার্থে তথায় ভিত্তি স্থাপন করিবার মানসে ভক্তিমতি মাতা সহ ভ্রাতৃত্রয়ের আকুল আন্তরিক আহ্বানে তাঁহাদের বাড়ির উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে গিয়া অবস্থান করিলেন। সেখানে স্বামীজীকে শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সকলে অক্লান্ত সেবা করিয়াছেন। এরূপ অকৃত্রিম ভক্ত গুরুসেবকমঙ্গল ভট্টজীর পরিবার অতিশয় দরিদ্র ছিলেন। তাঁহাদিগকে কৃপা করিবার জন্যই 'অনিকেত' স্বামীজী তথায় অবস্থান করিয়াছেন। ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী অন্যান্য সব শিষ্যদিগকে ঐ স্থান দখল করিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন।'

স্বামীজি কত বড় মনের অধিকারী ছিলেন তা তাঁর এই নির্দেশ থেকেই বোঝা যায়। তাঁর তিরোধানের পর কেউ যাতে তাঁর দরিদ্র শিষ্যের শেষ মাথা গোঁজার আশ্রয়টুকু কেড়ে নিতে না পারেন তার ব্যবস্থা তিনি আগেই করে গিয়েছিলেন। ধন্য স্বামীজি, ধন্য বিশ্বনাথ! তুমি যোগ্য শরীরকেই তোমার আবাসস্থল হিসেবে নির্বাচন করেছিলে। সর্বপ্রকার কামনা-বাসনা মুক্ত শরীরকে আশ্রয় করেছিলেন শ্মশানচারী এক দেবতা, দেবাদিদেব মহেশ্বর। আর তাঁদের লীলাচ্ছটায় আমরা বারে বারে চমকে উঠেছি। সৃষ্টি হয়েছে অসংখ্য অলৌকিক মুহূর্ত। বারে বারে চোখে আঙুল দিয়ে তাঁরা আমাদের শিখিয়ে গেছেন—আজ যাকে তোমরা নিজের ভাবছ কাল তা তোমার থাকবে না। যাওয়ার সময় সঙ্গে তোমার কিছুই যাবে না। মুক্তির আকাশে তখন তুমি সম্পূর্ণ একা। একদিন উড়বে সাধের ময়না।

৯

সাধু হরিদাস কি স্বামীজির শিষ্য ছিলেন? তাঁর গুরু কি আমাদের ত্রৈলঙ্গস্বামীজি! তথ্য তো তাই বলছে। কিন্তু স্বয়ং উমাচরণ মুখোপাধ্যায় স্বামীজির পাঁচজন শিষ্যের কথা তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। মনে রাখবেন, তাঁকে নিয়েই কিন্তু পাঁচজন। অন্যদিকে শঙ্করী মাতাজি কুড়ি জন শিষ্যের নাম আমাদের জানিয়েছেন। সেই তালিকায় সাধু হরিদাসজির নাম নেই। অথচ আমার হাতে প্রমাণ স্বরূপ একখানি অতি প্রাচীন গ্রন্থ রয়েছে। লেখকের নাম রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়, বইটির নাম হরিদাস(সাধু)। তিনি অর্থাৎ লেখক কখনও কখনও মুখোপাধ্যায়ের পরিবর্তে শর্ম্মা উপাধিটি ব্যবহার করতেন। হরিদাস গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণে এই বিষয়টিকে লক্ষ করা গেল। এই বইটি ৩৪/১ কলুটোলা স্ট্রিট, বঙ্গবাসী স্টিম মেশিন যন্ত্রে শ্রীকেবলরাম চট্টোপাধ্যায় দ্বারা ১২৯৯ সালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। বইটির দাম ছিল—একটাকা।

হরিদাস সাধুর পরিচয় দিতে গিয়ে রঙ্গলালবাবু লিখছেন, 'মহারাজ রণজিৎ সিংহ যে সাধুকে চল্লিশদিন মৃত্তিকায় পুড়িয়া রাখিয়া যোগবল পরীক্ষা করিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার উপাখ্যান।' এবার ভূমিকা ও ভণিতা ছেড়ে সরাসরি আসল ও মূল প্রসঙ্গে চলে যাচ্ছি। যেহেতু বিতর্কিত ও স্পর্শকাতর বিষয় তাই রঙ্গলালবাবুর ছাতার তলায় থেকেই পুরো ঘটনাটি আপনাদের সামনে পেশ করছি। অর্থাৎ তিনি যা লিখেছেন তাই অনুসরণ করব। তিনি লিখছেন, 'হরিদাস চলে যাওয়ার পর মহারাজ তাঁর বিরহে ভীষণ কাতর হয়ে পড়লেন। ঘটনাটি কি ঘটেছিল—সাধু লাহোরে থাকলে মহারাজা দু-বেলা তাঁর খোঁজখবর নিতেন। একদিন মহারাজ শুনলেন, জিতেন্দ্রিয় এই যোগীর ইন্দ্রিয়দোষ ঘটেছে। এইসময় রানি ঝিন্দনও সাধুর ওপর কোনও কারণে খুব বিরূপ ছিলেন। রানির মতো বুদ্ধিমতী ও তেজস্বিনী মহিলা কেন সাধুর ওপর রেগে আছেন তা কেউই বুঝতে পারলেন না। তাঁর আদেশে একদিন রাজদূতেরা সাধুকে যথেষ্ট অপমান করেছিল। সেইদিন হরিদাসও খুব রেগে গিয়ে দূতেদের বলেছিলেন—তোরা তোদের পাপিষ্ঠ মহারাজকে বলে দিস, তাঁর বংশে বাতি দেওয়ার জন্য একটি প্রাণীও জীবিত থাকবে না। পাপীয়সি চাঁদ রানিকে পথে পথে ভিক্ষে করে বেড়াতে হবে। তাঁরা আমার সাধনা ও সদভিপ্রায় না বুঝে যেমন দুষ্কর্ম করেছে, বিধাতা অবশ্যই তার উচিত দণ্ড দেবেন।'

রাজদূতের মুখে সাধুর অভিশাপের কথা শুনে মহারাজা ভীষণই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। সেইসময় রণজিৎ সিংহের শরীরটা মোটেই ভালো ছিল না। তাঁর রোগ যদি আরও বাড়ে সেই চিন্তায় রাজকর্মচারীরা সাধুর সন্ধানে চতুর্দিকে বেরিয়ে পড়লেন। কিন্তু কোথায় সাধু! দূতেরা সবাই একে একে রাজপ্রাসাদে ফিরে এলেন। একটি দল ফিরে এসে খবর দিলেন, সাধু হরিদাস আর ইহলোকে নেই। তিনি যোগবলে প্রাণত্যাগ করেছেন। শিষ্যরা তাঁর সৎকার করে নিজ নিজ স্থানে ফিরে গেছেন। তাঁর একজন শিষ্যের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছিল। তাঁকেই আমরা রাজপ্রাসাদে নিয়ে এসেছি; লাহোরে উপস্থিত সেই শিষ্যের নাম রামতীর্থ। মহারাজ সাধু হরিদাসের পূর্বাশ্রমের কথা কিছুই জানতেন না। রামতীর্থ তাঁর গুরুদেবের পূর্ব ইতিহাস মহারাজাকে জানিয়েছিলেন।

হরিদাসের জন্ম মহারাষ্ট্রের একটি ক্ষুদ্র পল্লিতে। তখন তাঁর বয়েস পনেরো কি ষোলো বছর। সেইসময় তাঁর বাড়ির কাছে একটি বৃক্ষতলে এক সন্ন্যাসী এসে আসন করলেন। তাঁর নাম ত্রৈলঙ্গ স্বামী। তিনি কুবেরপন্থী বৈষ্ণব। তাঁর সঙ্গে ছিল একগাছি বেতের লাঠি ও নারকেলের কমণ্ডুলু। এ ছাড়া তাঁর সঙ্গে আর কিছুই ছিল না। ধার্মিক ব্যক্তি দেখলে সেইসময় স্ত্রী ও পুরুষ সকলেই শ্রদ্ধা করতেন। হিন্দুদের এই অভ্যাস চিরকালের। আজ যেমন ইংরেজি পড়ে সকলে সবকিছুই ভুলে যেতে বসেছেন, তখনও এই ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়নি। সেইসময় পাড়ায় পাড়ায় এত ইংরেজি স্কুল ছিল না। সুতরাং ভিখারিকে মুষ্টিভিক্ষা দিলে দেশের অন্নভাণ্ডারে টান পড়বে অর্থনীতির এই জটিল অঙ্ক তখনও আমাদের স্থূলবুদ্ধিতে প্রবেশ করেনি। ফলে

ক্ষুধার্তকে প্রত্যেকেই অন্ন দিতে দ্বিধা করতেন না। লোকালয়ে অতিথি বা সন্ন্যাসী এলে তাঁদের সেবা করার জন্য প্রত্যেকেই ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। তাঁরা সকাল-সন্ধ্যা-দুবেলা তাঁদের দর্শন করতে যেতেন। সাধুর ভোগের জন্য তাঁরা সঙ্গে করে দুধ, ফল, মিষ্টি আনতেন।

সন্ন্যাসীর আসন যেহেতু হরিদাসের বাড়ির কাছে তাই তিনি অবসর পেলেই সাধুর সঙ্গে দেখা করতে যেতেন। সন্ন্যাসীকে তিনি অত্যন্ত ভক্তি করতেন। সাধুও হরিদাসকে খুব ভালোবাসতেন। একদিন ভোরের আলো সবে ফুটছে, পাখিরা গাছের ডালে আড়মোড়া ভেঙে আহারের সন্ধানে বেরোবার প্রস্তুতি নিচ্ছে। প্রয়োজনীয় কাজে গরুরগাড়ি নিয়ে চালক রাস্তায় বেরিয়েছেন। ধীরে ধীরে পল্লি জাগছে। গ্রামবাসীরা ঘুম থেকে উঠে দেখেন—বৃক্ষমূল শূন্য, ত্রৈলঙ্গস্বামী তাঁদের গ্রাম ছেড়ে চলে গেছেন।

কিছুটা বেলা হওয়ার পর আবার শোরগোল শুরু হল, হরিদাসকেও কোথায়ও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কোথায় গেলেন হরিদাস! সবাই বললেন—এতদিন ওই তো সবথেকে বেশি স্বামীজির সেবাযত্ন করত। মনে হয় ও ত্রৈলঙ্গস্বামীর সঙ্গে চলে গিয়েছে। অনুমান সত্য। হরিদাস ত্রৈলঙ্গস্বামীর সঙ্গে পুষ্করে গিয়ে ন্যাড়া হয়ে পৈতে ত্যাগ করলেন। সন্ন্যাস জীবনের শুরু হল এইভাবে।

মাস দুয়েক পুষ্করে কাটাবার পর নবীন সন্ন্যাসী গুরু ত্রৈলঙ্গস্বামীর সঙ্গে কুরুক্ষেত্রে গেলেন। শুরু হল কঠিন যোগশিক্ষা; যোগসাধনার প্রথম অঙ্গ ছিল—'পথ্যের নিয়ম, আসন বন্ধন, বাকসংযম এবং প্রাণায়াম।' রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় লিখছেন, 'পথ্যের নিয়ম পালন করিবার জন্য তিনি দিনান্তে কেবল একবার হবিষান্ন ভোজন করিতেন—তিনমুষ্টি সরু চাউল, একসের গাভিদুগ্ধ, কিঞ্চিৎ গব্যঘৃত এবং কিঞ্চিৎ চিনি। দিনমানের মধ্যে আর জলস্পর্শ করিতেন না। একাদশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা এবং সংক্রান্তির দিন কেবল অর্দ্ধসের দুধ খাইতেন, —অন্নের দ্রব্য নয়। এইরূপে চতুর্মাস গেল। আর চতুর্মাস, পর্যায়ক্রমে একদিন হবিষান্ন একদিন কেবল দুগ্ধ। একাদশী, অমাবস্যাদিতে নির্জলা উপবাস। আট মাস ফুরাইল। বাকি চারি মাসের তপস্যা আরও কঠিন। একদিন কাঁচা ময়দা, চিনি ও দুগ্ধ গুলিয়া খাইতেন, পরদিন কেবল অর্দ্ধসের দুগ্ধ এবং তৃতীয় দিবসে নিরম্বু উপবাসী থাকিতেন।

এই গেল পথ্যের কথা। তাহার পর আসন বন্ধন। সাধু পায়ের উপর পা রাখিয়া কুশাসনের উপর সোজা হইয়া বসিতেন। চক্ষু অর্দ্ধোন্মীলিত, ভ্রূযুগলের মধ্যে স্থাপিত। বামহস্তে দক্ষিণ পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ধরিয়া প্রণব জপ করিতে করিতে দক্ষিণহস্তে মালা ঘুরাইতেন।

পূর্বে হরিদাসের কাছে একছড়া বড় রুদ্রাক্ষের মালা থাকিত, তাহাতে সহস্রটি বীজ ছিল। দশ দশটি বীজের পর এক একটি সূত্রের চিহ্ন। এক একবারের পূরক, কুম্ভক ও রেচকের মধ্যে তিনি কত মন্ত্র জপ করিতে পারেন এবং কত সংখ্যা জপ করিলে তাঁহার আসন চঞ্চল হয় না, রুদ্রাক্ষের মালায় তাহাই নিশ্চিত হইত। প্রথমদিন সুস্থির হইয়া একাসনে যদি শত মন্ত্র জপ করিতে পারিতেন, দ্বিতীয় দিনে আরও অধিকক্ষণ থাকিতে চেষ্টা করিতেন। এইরূপে উত্তরোত্তর একাসনে জপের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া দিতেন।

সমাধিসিদ্ধির পূর্বে সাধকেরা শ্বাসপ্রশ্বাস কমাইয়া আনেন। কথা কইলে এবং পরিশ্রম করিলে শ্বাস বৃদ্ধি হয়, সে কারণে যোগীগণ মৌনী হইয়া থাকেন। হরিদাস নির্জ্জনগৃহে বাস করিতেন, প্রয়োজন হইলে অনুচরদিগকে সঙ্কেত দ্বারা মনের কথা বুঝাইয়া দিতেন।

প্রাণায়ামের সময় পূর্বের মত আসন করিয়া বসিতেন। প্রথমে দুই নাসারন্ধ্রে বায়ু লইতেন—তখন অঙ্গুলি দ্বারা নাসাপুট টিপিয়া ধরিতেন না। ষোড়শবার মালায় মন্ত্র জপ করিয়া বায়ুপূরণ করিতেন, বত্রিশবার জপ করিয়া বায়ুধারণ করিতেন এবং বিশবার মন্ত্র জপ করিয়া বায়ু ত্যাগ করিতেন। এইরূপে প্রাণায়াম সাধিত হইলে শিষ্যেরা ধীরে ধীরে মালা ঘুরাইত, হরিদাস অঙ্গুলিদ্বারা চক্ষু, কর্ণ ও নাসিকা টিপিয়া প্রাণায়াম করিতেন। যখন কুম্ভকের সময় দুই হাজার মন্ত্র জপ করিতে পারিতেন তখন তাঁহার শরীর অত্যন্ত হাল্কা হইয়া পড়িল। তিনি অল্প যত্ন করিলেই শূন্যে উঠিতে পারিতেন। এই সময়ে কখন কখন তিনি কুম্ভক করিয়া জলে ভাসিতেন। কথিত আছে হরিদাস একাদিক্রমে ত্রিশবৎসর প্রাণায়াম অভ্যাস করিয়া সমাধিসিদ্ধ

হইয়াছিলেন। যোগী এইরূপ সাধন করিতে করিতে কাশী, শ্রীক্ষেত্র, প্রয়াগ, অযোধ্যা, হিমালয় পর্ব্বত প্রভৃতি নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া সিদ্ধপুরুষদের কাছে উপদেশ লইতেন।'

রামতীর্থ বিন্ধ্যাচলে সাধু হরিদাসের কাছে দীক্ষা নেন। তখনও হরিদাস সিদ্ধি লাভ করেননি। একবার শীতকালে হরিদাস সাধু কাশ্মীরের পার্বত্য প্রদেশে গেলেন। সেখানে তিনি পৌঁছোবার পর শিষ্যেরা একটা গর্ত খুঁড়ে তার ভেতর আকন্দপাতা বিছিয়ে দিলেন। সাধু গর্তে প্রবেশ করলেন। তিনি শিষ্যদের কাছে বলেছিলেন, ঠিক এক সপ্তাহ বাদে আমাকে ওই গর্ত থেকে তোমরা তুলে নিও। শিষ্যেরা ওই গর্তের মুখ বন্ধ করে দিল। কেটে গেল সাতটা দিন। তিনি গর্ত থেকে উঠে এলেন। এইভাবে তিনি পুরো শীত জুড়ে প্রত্যেক মাসে এক সপ্তাহ করে গর্তে থাকতেন।

রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় জানাচ্ছেন, 'তাহার দুই বৎসর পরে হরিদাসের যোগনিদ্রা আরম্ভ হইল। তিনি বাঁশের তীক্ষ্ণ নীলত্বকদ্বারা জিহ্বার নিম্নস্থ চর্ম্ম কাটিয়া দুগ্ধ ও ঘৃতে মর্দ্দন করিতে লাগিলেন। তিন মাসে প্রয়োজনমতো সমস্ত চর্ম্ম কাটা হইল, ক্ষত স্থানও শুষ্ক হইয়া গেল; ক্রমে তিনি খেচরীমুদ্রা দ্বারা জিহ্বা উলটাইয়া বায়ুধারণ করিতে লাগিলেন। যখন উদরের ও ফুসফুসের সমস্ত বায়ু মস্তকে তুলিলে ব্রহ্মতালুতে জ্বলন্ত অঙ্গারের ন্যায় উত্তাপ জন্মিল, তখন বুঝিলেন এইবার সমাধিতে বসা যাইবে। সর্ব্বপ্রথমে তিনি কুরুক্ষেত্রে সমাধিধারণ করেন, সেবার কেবল অহোরাত্রমাত্র মৃত্তিকার ভিতরে ছিলেন। তাহার পর ক্রমে তিনি এই বিদ্যায় বিশেষ পরিপক্ক হন। রামতীর্থ রণজিৎ সিংহকে বলিয়াছিলেন যে, ফিরিঙ্গীরা তাঁহার গুরুকে অবজ্ঞা করিত বটে, কিন্তু বাস্তবিক তিনি ভণ্ড বা প্রতারক ছিলেন না।

হরিদাসের মৃত্যু ঘটনা আশ্চর্য্য। একদিন তিনি শিষ্যদের ডাকিয়া বলিলেন, বৎস এতদিন আমি যোগে বসিতাম আবার উঠিতাম, তোমরা আমাকে বাঁচাইতে। আমার জীবনের আশা পূর্ণ হইয়াছে। আমি সমাধিতে দেহত্যাগ করিব, আর বাঁচিব না। তোমরা সকলে নিকটে এস। শিষ্যরা কাঁদিতে লাগিল। হরিদাস একটি নির্ঝরের ধারে শয়ন করিয়া জন্মের মতো যোগ শয্যায় ঘুমাইলেন। বর্ষার বজ্রপাতে, ঝড়ের তাড়নায়, জলের কলকল শব্দে সে ঘুম আর ভাঙিল না।'

খুব সম্ভবত স্বামী ত্রৈলঙ্গজি যখন নর্মদা তীর্থে এসেছিলেন সেইসময়ই তাঁর সঙ্গে হরিদাস সাধুর সাক্ষাৎ হয়। তারপরের ঘটনা তো আমাদের রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় জানালেন। শুধু তাই নয়, হরিদাস সাধুর এইরকম মৃত্যু অনেকে বিশ্বাস নাও করতে পারেন। সেই জন্য তিনি নিজের দেখা একটি ঘটনার কথাও উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখছেন, 'শান্তিপুরের বিশ্বনাথ ক্ষ্যাপাকে অনেকেই চিনতেন। সেই বিশে ক্ষ্যাপার নানা অলৌকিক গল্প আছে। আমি এখানে সেসব উল্লেখ করছি না। তবে একদিন সকালে বিশে ক্ষ্যাপা তাঁর আশপাশে যাঁরা ছিলেন তাঁদের ডেকে বললেন, ওহে, বিশে আজ মরবে। তোমরা সবাই দেখতে চল। অনেকেই মজা দেখার জন্য তাঁর পেছনে ছুটলেন, বিশে, জাহ্নবী তীরে সূর্যের দিকে তাকিয়ে শুয়ে পড়লেন। বেশ কিছুক্ষণ ওইভাবে থাকবার পর তিনি বললেন, আমি চললাম। বিশ্বনাথ ক্ষ্যাপা তার পরই চিরতরে ঘুমিয়ে পড়লেন।

এবার শঙ্করী মাতাজির শরণাপন্ন হওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। ত্রৈলঙ্গ স্বামীর অন্যান্য শিষ্যদের সম্পর্কে তাঁর কাছ থেকেই জানব। সন্ন্যাসিনী শঙ্করী মাতাজির শিষ্য পরমানন্দ স্বামীজি জানিয়েছেন, 'আমার গুরুমাতা শ্রীশ্রী শঙ্করী মাতাজি ছাড়া স্বামীজি অন্য কোনও শিষ্যকেই দীর্ঘকাল নিজের নিকট থাকতে দেন নাই।'

ত্রৈলঙ্গ স্বামীজির শিষ্য ও শিষ্যা :

১) স্বামী কালিকানন্দ সরস্বতী (কালীচরণ স্বামী)—তাঁর পূর্বাশ্রমের নাম কালীচরণ মিশ্র। শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত ঢাকার দক্ষিণ পরগনার মিশ্র গ্রামের মহাপ্রভু শ্রীশ্রী চৈতন্যদেবের পিতৃকুল সুপ্রসিদ্ধ জগন্নাথ মিশ্রের বংশে তাঁর জন্ম। তিনি ত্রৈলঙ্গ স্বামীজির প্রধান শিষ্য ছিলেন।

২) স্বামী ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী।
৩) স্বামী ভোলানন্দ সরস্বতী (ভোলানাথ স্বামী)।
৪) স্বামী সদানন্দ সরস্বতী।
৫) স্বামী ত্রিপুরলিঙ্গ সরস্বতী—ঢাকা শহরের স্বামীবাগের সুপ্রসিদ্ধ 'ডায়লা বাবা।' তাঁর তিনজন প্রখ্যাত শিষ্য—১) শ্রীমৎস্বামী নীলানন্দজি, ২) স্বামী শঙ্করানন্দজি, ৩) ঢাকা স্বামীবাগের মহান্ত মহারাজ শ্রীমৎস্বামী নরেশানন্দ সরস্বতী।
৬) স্বামী সচ্চিদানন্দ সরস্বতী—তিনি প্রায় দুশো বছর বয়েসে নেপালের মুক্তিনাথে দেহত্যাগ করেন।
৭) স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী—চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত ফতেয়াবাদে ইংরেজি ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দ, বাংলা ১৩২৫ সনে সমাধিস্থ অবস্থায় ব্রহ্মে লীন হন।
৮) স্বামী নরসিংহানন্দ সরস্বতী (নরসিংহজি)—বিখ্যাত হঠযোগী। এই বিষয়ে তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। জীবনের প্রথমভাগে তিনি স্বামীজির কাছে যোগশিক্ষা করেন। পরবর্তীকালে তিনি অদ্ভুত কিছু খেলা জনসমক্ষে দেখাতেন। তিনি সবার সামনে উৎকট বিষ খেতেন। এবং সেই বিষের প্রভাবে বিন্দুমাত্র কাবু হতেন না। পুরো বিষ হজম করে ফেলতেন। কিন্তু ইংরেজি ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দেরেঙ্গুন শহরে এই ধরনের খেলা দেখাতে গিয়ে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে যায়। শেষমেশ তাঁর প্রাণটি অকালে চলে যায়।
৯) স্বামী কানাইলালজি—কাশ্মীরে তাঁর প্রচুর শিষ্য-শিষ্যা ছিল।
১০) মঙ্গল দাস ভট্ট।
১১) মহাদেব ভট্ট—মঙ্গল ভট্টের মেজ ভাই।
১২) কৃষ্ণ ভট্ট—মঙ্গল ভট্টের ছোট ভাই।
১৩) অম্বাদেবী—ভট্ট-ভাইদের মা।
১৪) রামভট্ট—মঙ্গল ভট্টের ভাই মহাদেবের ছেলে।
১৫) শ্রীশ্রী যোগেশ্বরী মা—ভৈরবী মা বা ব্রাহ্মণী মা, ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের গুরু।
১৬) মা রাজলক্ষীদেবী—(গুরুদত্ত নাম অম্বালিকা)—কালীচরণ মিশ্রের সহধর্মিণী। সন্ন্যাসিনী শঙ্করী মাতাজির মাতৃদেবী।
১৭) চিরকুমারী সন্ন্যাসিনী শঙ্করী মাতাজি।
১৮) কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাচস্পতি—গৃহস্থ শিষ্য
১৯) রামতারণ ভট্টাচার্য—গৃহস্থ শিষ্য।
২০) উমাচরণ মুখোপাধ্যায়—ত্রৈলঙ্গ স্বামীজির শেষ গৃহস্থ শিষ্য, স্বামীজির তিরোধানের বিয়াল্লিশ বছর পর, বাংলা ১৩৩৬ সনে 'জীবন্মুক্ত ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর জীবনী' গ্রন্থটি লেখেন।

এই কুড়িজন ছাড়াও আমরা লোকনাথ ব্রহ্মচারী, বেণীমাধব গাঙ্গুলি, সুফি সিদ্ধ ফকির আবদুল গফুরজির কথা জানি। তাঁরাও স্বামীজির শিষ্য ছিলেন। মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর প্রাথমিক দীক্ষা ও দেহশুদ্ধি ত্রৈলঙ্গ স্বামীজির কাছেই হয়েছিল।

ত্রৈলঙ্গ স্বামীজির মানসকন্যা সন্ন্যাসিনী শঙ্করী মাতাজি। বাবা কালীচরণ মিশ্র, সন্ন্যাসজীবনের নাম কালিকানন্দ স্বামী। ঢাকা দক্ষিণ পরগনার মিশ্র গ্রামের বাসিন্দা। বাংলাদেশের মিশ্র বংশের খ্যাতির কথা আজ সর্বজনবিদিত। এই মিশ্র বংশের সন্তান ছিলেন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব। এই বিখ্যাত মিশ্র বংশেই কালীচরণ মিশ্রের জন্ম। তাঁর বাবার নাম হরিনারায়ণ মিশ্র।

খুব অল্প বয়েস থেকে কালীচরণ মিশ্র অন্য আর পাঁচটা বালকের মতো ছিলেন না। ঈশ্বর অনুরাগী, সংসার উদাসীন এক বালক। যতদিন গেল সংসারের প্রতি আকর্ষণ তাঁর বিন্দুমাত্র বাড়ল না। শুধুই বিকর্ষণ। তিনি সংসার ত্যাগ করে তীর্থভ্রমণে বেরোলেন। বহু তীর্থ ঘুরে অবশেষে এলেন কাশীধামে। দেখা হল কাশীর সচল বিশ্বনাথ ত্রৈলঙ্গ স্বামীজির সঙ্গে। তিনিও বোধহয় কালীচরণের জন্য অপেক্ষা করে বসেছিলেন। কারণ

কালীচরণ মিশ্রই স্বামীজির প্রথম শিষ্য। সদগুরু ছাড়া কোনওভাবেই ঈশ্বর লাভ সম্ভব নয়। ঈশ্বর কেন, সাধন পথে এক পাও অগ্রসর হওয়া যায় না। তাই বোধহয় অবতারদেরও গুরুর প্রয়োজন হয়। শ্রীরামচন্দ্র ও স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও গুরু কৃপা লাভে বঞ্চিত হননি। রামচন্দ্রের গুরু ছিলেন মহর্ষি বশিষ্ঠদেব এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গুরুদেবের নাম সন্দীপনী মুনি। অতএব কালীচরণ মিশ্রেরও গুরু কৃপা পাওয়া আবশ্যক। তিনিও ত্রৈলঙ্গ স্বামীজির কৃপালাভে অচিরেই ধন্য হলেন। দীক্ষা দিলেন ত্রৈলঙ্গস্বামী।

কিন্তু এ কী আদেশ করলেন গুরুদেব! তিনি শিষ্যকে বিয়ে করার নির্দেশ দিলেন। বিয়ে মানেই সংসারের বন্ধন। সেই বন্ধনে জড়িয়ে যাতে পড়তে না হয় সে জন্যই তাঁর গৃহত্যাগ। সংসার যে ঈশ্বর লাভের পথে চরম অন্তরায় হবে। গুরুদেবের আদেশে তিনি বড়ই মুষড়ে পড়লেন। অন্তর্যামী গুরুদেব শিষ্যের মনের সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ্বের কথা বুঝতে পেরেও চুপ করে বসেছিলেন। শিষ্য আবার গুরুদেবের কাছে দরবার করলেন, উদ্দেশ্য আদেশ ফিরিয়ে নিন। স্বামীজি সেদিন তাঁর শিষ্যকে বলেছিলেন, বিয়ে তোমার সাধন পথে কোনওরকম সমস্যা সৃষ্টি করবে না। এরপর তিনি শিষ্যকে নানা উপদেশও দেন। গুরুদেবের আশ্বাসবাণী তাঁর মনের সমস্ত সংশয় দূর করে দিল। তিনি গুরুদেবের নির্দেশ পালনের জন্য বিয়েতে সম্মতি জানালেন।

পূর্ব নির্ধারিত ব্যবস্থা! পাত্রীর খোঁজ পেতেও দেরি হল না। নদীয়া জেলার শান্তিপুরের গোস্বামী বংশের মেয়ে রাজলক্ষ্মী দেবীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হল। স্বামী ও স্ত্রী দুজনেই স্বামীজির শিষ্য। কাশীধামে স্বামীজির কাছেই তাঁদের দিনের বেশিরভাগ সময় কেটে যেত। স্বামী সন্ন্যাস গ্রহণের পর রাজলক্ষ্মীদেবী চলে এসেছিলেন মঙ্গল ভট্টজির গৃহের কাছেই একটি বাড়িতে।

বর্তমানে ওই বাড়িটিকে কেন্দ্র করে সুন্দর এক দেবালয় গড়ে উঠেছে। সেখানে শ্বেত পাথরের তৈরি দেব-দেবী ও সন্ন্যাসীর মূর্তি আছে, যথা ১) গায়ত্রী দেবী, ২) ত্রিমুণ্ডধারী আদি বা জুনা সন্ন্যাসী গুরু দত্তাত্রেয়, ৩) শ্রীশ্রী শঙ্করাচার্য, ৪) দশনামী সন্ন্যাসী স্বামী ব্রহ্মানন্দজি। তিনি অবশ্য স্বামীজির শিষ্য নন, তিনি এই দেবালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। ৫) ঋষি যাজ্ঞবল্ক ও তাঁর দুই সহধর্মিণী কাত্যায়ণী ও মৈত্রেয়ী দেবী।

ইতিমধ্যে রাজলক্ষ্মীদেবী গর্ভবতী হয়ে পড়লেন। অন্যদিকে কালীচরণ মিশ্রের সংসারের প্রতি বৈরাগ্য আরও প্রবল হয়ে উঠল। তিনি স্বামীজির চরণ দুটি আঁকড়ে ধরে সন্ন্যাস গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সব শুনে স্বামীজি তাঁকে বলেছিলেন, 'কালীচরণ এটাই তোমার শেষ জন্ম। এই জন্মেই তুমি সিদ্ধি লাভ করবে। শুধু তাই নয় তোমার কর্মরূপ বাসনা ক্ষয়প্রাপ্ত হবে। তোমার মুক্তিলাভ সুনিশ্চিত। জানো তো, সিদ্ধ-ধান মাটিতে পুতলে তা থেকে কোনওভাবেই ধানগাছ বেরোয় না। ব্রহ্মও জ্ঞানাগ্নি, যে বাসনা ভগবৎ বিমুখী সেই বাসনাকে ভস্ম করে জন্মমৃত্যুর চক্র থেকে অর্থাৎ পুনর্জন্ম থেকে মুক্তি দেয়।'

কালীচরণ মিশ্রের মন থেকে তখনও সমস্ত সংশয় দূর হয়নি। তিনি স্বামীজিকে করুণ কণ্ঠে বললেন, 'বাবা, আপনি আবার আমাকে নতুন কী বন্ধনে বাঁধতে চাইছেন? স্বামীজি মৃদু হেসে বলেছিলেন, 'দেখ কালীচরণ, প্রকৃত বিষয় বাসনা শূন্য মুক্ত মানুষকে সংসার বন্ধনে কি কেউ কখনও আটকে রাখতে পারে! বদ্ধ পাগল ব্যক্তিকেই লোক আটকে রাখতে পারে। প্রত্যেক মানুষের ভেতরেই ব্রহ্মশক্তি বর্তমান। ফলে মানুষ ইচ্ছা করলেই ওই শক্তিবলে অষ্টপাশ বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারে। মানুষের মধ্যে বিদ্যাশক্তি ও অবিদ্যাশক্তি—দুটিই বিদ্যমান। অহঙ্কারশূন্য হয়ে বিদ্যাশক্তির শরণাপন্ন হতে পারলে মানুষ পূর্ণজ্ঞান ও ভগবান লাভে সক্ষম হয়। কিন্তু অবিদ্যাশক্তির আশ্রিত হলে সাংসারিক বন্ধন ফাঁসের আকার ধারণ করে তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলবে, এছাড়াও নানাবিধ দুঃখদুর্গতি তাকে ভোগ করতে হবে। মুক্তির পথ সে কোনও দিন খুঁজে পাবে না। দেখেছ তো গুঁটিপোকার অবস্থা। নিজের জালেই সে নিজে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। সে কিছুতেই সেই জাল কেটে বেরিয়ে আসতে পারে না। এরপর প্রাকৃতিক নিয়মে সে যখন প্রজাপতিতে রূপান্তরিত হয় তখন সে তার ইচ্ছাশক্তির বলে ওই জাল ছিন্ন করে মুক্তির আকাশে উড়ে যায়। বাবা কালীচরণ তুমিও তোমার চারপাশে গুটিপোকার মতো জাল তৈরি করেছ। তোমার ইচ্ছাশক্তি প্রবল হলে তুমিও ওই জাল কেটে উড়ে যেতে পারবে। চেষ্টা করে দেখ।'

কালীচরণ বলেছিলেন, 'বাবা, গুরুকৃপা না হলে আমার সাধ্য নেই ওই জাল কাটার। আপনার কৃপা পেলেই আমি ওই জাল কেটে অবশ্যই উড়ে যেতে পারব।'

'স্বামীজি বললেন, 'বাবা, তুমি ইচ্ছা করলে এখনিই সন্ন্যাস নিয়ে তপস্যায় যেতে পারো। মাতৃগর্ভেই মানুষের জন্ম। প্রাচীনকালে তপঃবলে মানস পুত্রের জন্ম হত বটে! কিন্তু সেই শক্তি ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে যাওয়ার ফলে মৈথুন ব্যতীত জন্ম হয় না। শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরই মহামায়ার লীলায় জীব মায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। ভগবানকে তখন সে ভুলে যায়। হেটমুণ্ড, ঊর্ধ্বপদ, করজোড়ে—ঠিক অনেকটা যোগধ্যানে মগ্ন কোনও ঋষি, ঠিক এইভাবে শিশু মাতৃগর্ভে ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে। এইসময় তার চোখের সামনে ছবির মতো পূর্বজন্মের সব কিছু ভেসে বেড়ায়। তার কৃতকর্ম, অপরাধ—সব কিছুই গর্ভে থাকাকালীন তার মনে থাকে। ভূমিষ্ঠ হয়ে এই পৃথিবীতে তাকে কত কষ্ট সহ্য করতে হবে তাও সে এইসময় জানতে পারে। তখন সে ঈশ্বরের কাছে বারবার একই প্রার্থনা জানায়, হে ঈশ্বর, পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর আমি যেন তোমার সান্নিধ্যে থেকে তোমায় লাভ করতে পারি। কিন্তু সংসার বড়ই মায়াময়। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর সে সব কথাই ভুলে যায়। সংসার-মায়ায় প্রবলভাবে জড়িয়ে পড়ে। কেউ কেউ ভোগসাগরে নিমজ্জিত হয়ে ঈশ্বরের কথা সম্পূর্ণভাবে ভুলে যায়। ফলে এই যে জন্ম-মৃত্যুর চক্র, সেই চক্রে ক্রমান্বয়ে ঘুরপাক খেতে থাকে। তার আর মুক্তি হয় না। অন্যদিকে কিছু মানুষ সংসারের মায়াপাশ ছিন্ন করে ঈশ্বর লাভের আশায় সন্ন্যাস গ্রহণ করে। সর্ব্বত্যাগী মানুষটি একদিন তাঁর কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে ঠিকই পৌঁছোতে পারে।

দেখ বাবা, পদ্মফুলের জন্ম হয় পঙ্ক কুণ্ডে। পরে সেই পদ্ম ক্ষিতি, অপ অতিক্রম করে সূর্যের তেজে প্রস্ফুটিত হয়ে মরুৎ-এ মিশে জগৎকে সৌরভ দেয়। অবশেষে ব্যোমে বা আকাশে মিলিয়ে যায়। তুমিও এই মায়াময় সংসারে জন্মগ্রহণ করেছ। এখন তুমি ইচ্ছা করলে পদ্মফুলের মতো প্রস্ফুটিত হয়ে জগৎকে সৌরভ দান করে যথাস্থানে মিশে যেতে পারো।

এই জগতে কে কার পিতা, কে কার মাতা, কে কার পুত্র, কে কার স্বামী, কে কার স্ত্রী—এই পৃথিবীতে একা এসেছ, যাবে যখন তখন একাই যাবে। আসার সময় তোমার সঙ্গে কিছুই ছিল না, যাওয়ার সময়ও তোমার কাছে কিছুই থাকবে না। তুমি সঙ্গে করে কিছুই নিয়ে যেতে পারবে না। কেবলমাত্র সঙ্গে নিয়ে যাবে কর্ম ও ধর্মকে। মনে রেখ নিজের নিজের প্রারব্ধ কর্ম সকলকেই ভোগ করতে হবে।'

গুরুদেবের সঙ্গে কথা বলে কালীচরণ স্ত্রীর কাছে গিয়ে গুরুকৃপার কথা সবিস্তারে জানালেন। তিনি স্ত্রীকে বললেন, তুমি চিন্তা কোরো না, গুরুদেবের ওপর নির্ভর করে থেকো। তা হলেই তোমার মঙ্গল হবে। এরপর তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন। তাঁর সন্ন্যাস জীবনের নাম কালিকানন্দ সরস্বতী। গুরুদেবের আদেশে তিনি বিরাট, বিশাল হিমালয়ের উদ্দেশে রওনা হলেন। মাঝে হরিদ্বারের নিকট চণ্ডী পাহাড়েও তিনি দীর্ঘদিন তপস্যা করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে অপর তিন গুরুভ্রাতা—ব্রহ্মানন্দজি, ভোলানন্দজি ও সদানন্দজিও হিমালয়ে তপস্যায় রত ছিলেন। ভোলানন্দজি তো প্রায় সময়েই স্বামীজির কাছে চলে আসতেন। শঙ্করী মা তাঁর পিতা সম্পর্কে একবার বলেছিলেন, 'আমার পিতা শ্রীকালিকানন্দজিও সূক্ষ্ম শরীর ধারণ করে চলাফেরা করতেন।' স্বামীজির আদেশে তিনি কখনও কখনও কাশীধামে গুরুদর্শনে আসতেন।

স্বামী সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন। তিনি গুরুদেবের নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে থাকার জন্যই চলে এলেন মঙ্গল ভট্টজির বাড়ির কাছে। এইসময় স্বামীজি তাঁর নতুন নামকরণ করেন। নাম হয় মা অম্বালিকা।

বাংলা ১২৩৩ সন, চৈত্রমাস, বৃহস্পতিবার, শুভ রামনবমী তিথিতে কাশীধামের গুরুস্থানে অম্বালিকাদেবীর কোল আলো করে এলেন শঙ্করী মাতাজি। শুভ অশৌচ কেটে যাওয়ার পর মা তাঁর নবজাত কন্যাকে নিয়ে গেলেন স্বামীজির কাছে। স্বামীজির চরণে কন্যাকে তিনি নিবেদন করে দিলেন। সেদিন শিশুটির দিকে স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন স্বামীজি। তারপর বলেছিলেন, এই দেবকন্যাসম শিশুসন্তানকে খুব যত্ন ও সতর্কতার সঙ্গে লালনপালন কোরো। মনে রেখো এই কন্যা আজীবন অবিবাহিত ও চিরকুমারী অবস্থায় থেকে অখণ্ড ব্রহ্মচর্য পালন করবে। আমার কাছে এই কন্যা সন্ন্যাস ধর্মের শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করে যোগ

বিভূতিসম্পন্না, মহাশক্তিস্বরূপিণী সন্ন্যাসিনী রূপে জগতের অসংখ্য মানুষের আধ্যাত্মিক ও পরমার্থিক কল্যাণ সাধন করবে। মা তুমি ওর জন্য কোনও চিন্তা কোরো না।

শঙ্করী মাতাজির জন্য তাঁর মাকে জীবনে সত্যিই কোনওদিন চিন্তাভাবনা করতে হয়নি। কাশীর সচল বিশ্বনাথ ত্রৈলঙ্গ স্বামীজি তাঁর মানসপুত্রীর দিকে সদাসর্বদা কড়া নজর রাখতেন। সেইসময় বসন্ত রোগ হলে তাঁর বাঁচার আশা থাকত না। ছোটবেলায় শঙ্করী মাতাজির একবার এই রোগ হয়েছিল। বাঁচার কোনও আশা ছিল না। আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারিণী হওয়া সত্বেও কন্যার মৃত্যু আশঙ্কায় তাঁর মা অম্বালিকাদেবী ভীষণ ভেঙে পড়েছিলেন। শঙ্করী মাতাজি তখনও চেতনায় ছিলেন। তিনি মাকে এইভাবে ভেঙে পড়তে দেখে বললেন, মা তুমি কাঁদছ কেন? স্বামীজি তো আমার কাছে বসে গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন।

অম্বালিকাদেবী স্বামীজিকে কিছুতেই দেখতে পেলেন না। তিনি মেয়ের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়েছিলেন। ভেবেছিলেন, রোগের কারণে বোধহয় প্রলাপ বকছে। মায়ের মনোভাব বুঝতে পেরে শঙ্করী মাতাজি তাঁর মায়ের হাতটি ধরে বলেছিলেন, এই তো, এইখানে বাবা বসে আছেন। ভালো করে দেখ। এরপর তিনিও স্বামীজিকে দেখতে পেলেন। শুধু তাই নয় স্বামীজি তাঁকে আশ্বস্ত করার জন্য বললেন, তোমার মেয়ে শঙ্করী খুব তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে যাবে। মা, মৃত্যু তাকে কীভাবে স্পর্শ করবে? এরপর স্বামীজি অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

সাধারণত স্বামীজি ওইসময় আশ্রম থেকে বড় একটা কোথাও বেরোতেন না। অম্বালিকাদেবী পরে আশ্রমে গিয়ে জানতে পেরেছিলেন, গুরুদেব তখনও পর্যন্ত আশ্রমের বাইরে কোথাও যাননি। তিনি সমাধিস্থ অবস্থায় নিজের আসনেই বসে আছেন। অর্থাৎ তিনি সূক্ষ্ম শরীরে শঙ্করী মাকে দেখতে গিয়েছিলেন।

স্বামীজির আশ্রমের কাছে একটি ভাড়া বাড়িতে মা ও মেয়ে বসবাস করতেন। ওই বাড়িতে কাঠের তৈরি একটি বড় রামচন্দ্রদেবের মূর্তি ছিল। মাতাজি খেলার ছলে তাঁকে প্রতিদিন ফুল ও জল দিয়ে পুজো করতেন। এটাই ছিল তাঁর সবথেকে প্রিয় খেলা।

একদিন হঠাৎই শঙ্করী মাতাজির মনে এক প্রশ্ন জাগল। তিনি নিজেকেই প্রশ্ন করলেন—আমি কেন কাঠের পুতুলকে ফুল জল দিয়ে পুজো করব! আমি তো তার পরিবর্তে স্বামীজিকে পুজো করতে পারি। যেমন ভাবনা তেমন কাজ, ছোট্ট বালিকা শঙ্করী মাতাজি ছোট্ট একটি ঘটি নিয়েপঞ্চগঙ্গার ঘাট থেকে জল আনতে দৌড়লেন। জল নিয়ে বাড়িতে ফিরে দেখলেন, মা তাঁকে ফেলে একাই আশ্রমে চলে গেছেন। আশ্রম তো খুব বেশি দূরে নয়, একা যেতে কোনও সমস্যা হবে না। তিনি জলের ঘটি ও ফুলের মালা নিয়ে আশ্রমে একাই যাবেন বলে ঠিক করলেন। কিন্তু বহুদিনের অভ্যাস। তাই বাড়ি থেকে বেরোবার আগে তিনি রামচন্দ্রদেবের ওই কাঠের মূর্তিকে প্রণাম করতে গেলেন। শঙ্করী মাতাজি সেদিন চমকে উঠেছিলেন। কোথায় রামচন্দ্রদেবের মূর্তি, সেখানে তো রামচন্দ্রদেব নেই, ওই জায়গায় বসে আছেন তাঁর প্রাণের দেবতা ত্রৈলঙ্গ স্বামীজি। বিস্মিত বালিকাকে তিনি বলেছিলেন, মা, আমি তো তোমার কাছে এসেছি, তুমি আমার পুজো করবে না! মাতাজির ঘোর তখনও কাটেনি। ওই অবস্থায় তিনি ত্রৈলঙ্গ স্বামীজির গলায় পরিয়ে দিলেন হাতে ধরা ফুলের মালাটি। পুজো করলেন সর্বপাপহর গঙ্গাজল দিয়ে। তার পরই তিনি সমাধিস্থ হয়ে পড়েন। প্রকৃতিস্থ হওয়ার পর তিনি আর স্বামীজিকে সেখানে দেখতে পাননি। তিনি অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলেন।

শঙ্করী মাতাজি এরপর এক মুহূর্ত দেরি না করে আশ্রমে চলে যান। সেখানে তাঁর জন্য অপেক্ষা করেছিল আরও বড় বিস্ময়। স্বামীজি তাঁর আসনে একটু আগে পরিয়ে দেওয়া ফুলের মালাটি গলায় জড়িয়ে বসে আছেন। বাবা তখন সমাধিস্থ। তাই শঙ্করীমা চুপ করে একপাশে দাঁড়িয়ে রইলেন। স্বামীজি লৌকিক জগতে ফিরে আসার পর মাতাজি জানতে চেয়েছিলেন, বাবা, তোমায় এই মালাটি কে পরিয়ে দিয়েছে? উত্তরে স্বামীজি বলেছিলেন, কেন মা, তুমিই তো একটু আগে এই মালাটি আমাকে পরিয়ে দিলে। বাবার কথা শুনে শঙ্করী মাতাজি কেঁদে ফেলেছিলেন।

মাতাজির বয়স এখন চব্বিশ। স্বামীজির আদেশে তিনি তাঁর গুরুভাই ভোলানন্দজিকে সঙ্গে নিয়ে হিমালয়ের উদ্দেশে বেরোলেন। ওই সময়েই কেদারনাথধাম যাত্রার পথে চন্দ্রাপুরীতে তিনি বহুদিন তপস্যা করেন। অত্যন্ত রমণীয় এক স্থান। এরপর তিনি যান গুপ্তকাশী ও ত্রিযুগীনারায়ণ পাহাড়ে। এইখানেই হিমালয়কন্যা গৌরীর সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল দেবাদিদেব মহাদেবের। সেই বিবাহের যজ্ঞাগ্নি কখনও নির্বাপিত হয় না। যা আজও চিররক্ষিত আছে বলে মহাপুরুষরা জানান।

এখান থেকে তিনি যাবেন গৌরীকুণ্ডে। সেখানে তিনি অনেকদিন সাধনভজন করবেন। তারপর গেলেন কেদারনাথধামে। অত্যধিক ঠান্ডা ও বরফ পড়ার জন্য কেদার মন্দিরের দ্বার ছ'মাস বন্ধ থাকে। তাই মাতাজি বৈশাখ থেকে আশ্বিন মাস পর্যন্ত কেদারনাথধামে থাকতেন। বরফ পড়া শুরু হলে তিনি নেমে আসতেন গুপ্তকাশীতে। কেদার, গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী, উত্তর কাশী প্রভৃতি স্থানে তিনি ন'বছর কঠোর তপস্যা করেছিলেন।

এরপর তিনি গেলেন বদরীনারায়ণধামে। এখান থেকে বরফাবৃত সৎপথ-এর দূরত্ব প্রায় কুড়ি মাইল। কথিত আছে এই সৎপথ পাহাড় থেকেই ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির সশরীরে স্বর্গারোহণ করেছিলেন। বদরীনারায়ণধামেও মাতাজি টানা ছমাস থাকতেন। তারপর ঠান্ডা প্রবল আকার ধারণ করলে তিনি নেমে যেতেন যোশীমঠ এবং আর নীচে ব্যাস আশ্রমে। শ্রীশ্রী শঙ্করাচার্য হিমালয়ের এই অঞ্চলে সনাতন ধর্মের বন্ধনীতে দেশটিকে বাঁধার জন্য স্থাপন করেন যোশীমঠ। একে বলা হয় চারধামের চার খুঁটি বা পিলারের অন্যতম একটি। বাকি তিনটি হল—চেন্নাই-এর শৃঙ্গেরী মঠ, পুরীর গোবর্দ্ধনমঠ ও দ্বারকাধামের সারদা মঠ।

স্বামীজির আদেশ ও ইচ্ছায় মাতাজি এবার যাবেন তিব্বতের মানস সরোবরে। এর ওপরেই হর-পার্বতীর আবাসস্থল, আনন্দ-নিকেতন কৈলাস পর্বত। মানস সরোবরে দীর্ঘদিন তপস্যা করার পর ত্রৈলঙ্গ স্বামীজির কৃপা ও সাহায্যে মাতাজি সূক্ষ্ম শরীরে কৈলাস সহ বিভিন্ন স্থানে গিয়েছিলেন। মাতাজি কৈলাস পর্বতের নীচে ব্যাসকুণ্ডের তীরে ব্যাসগুহায় বহুকাল তপস্যা করেন। এখানেই তিনি মা ভগবতীর দর্শন ও আশীর্বাদ পেয়ে সিদ্ধি লাভ করেছিলেন।

হিমালয়ের এইসব অঞ্চলে খুব কষ্ট করেই তাঁদের থাকতে হত। ভোলানন্দজি জংলি ফল এবং পাহাড়ি নানা কন্দমূল সংগ্রহ করে আনতেন। সেই খেয়েই তাঁদের দিন কেটে যেত। এ ছাড়াও একরকম পাহাড়ি গাছের পাতা আগুনে ঝলসে নিয়েও তাঁরা আহার করতেন। পরবর্তীকালে মাতাজি কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, ওই ঝলসানো পাতা খেতে অনেকটা রুটির মতো।

মানসকন্যার জন্য স্বামীজির মন বোধহয় মাঝে-মাঝেই খুব ব্যাকুল হয়ে উঠত। স্নেহের শঙ্করীকে দেখার জন্য তিনি সূক্ষ্ম শরীরে ওইসব স্থানে যেতেন। তিনি শঙ্করী মাতাজি ও ভোলানন্দজিকে একরকম ফল খেতে দিতেন। বরফে জন্মায় বলে তিনি নাম দিয়েছিলেন বরফ ফল। এই ফল একটি খেলে পরবর্তী ছ'মাস তাঁদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা বোধ থাকত না।

স্বামীজির কৃপায় শঙ্করী মাতাজি একবার পাকা হরিতকিও খেয়েছিলেন। কৃপা কেন! কারণ পাকা হরিতকি মর্ত্যে খুব একটা সহজলভ্য নয়। কথিত আছে পাকা হরিতকি দেবতাদের ভোগ্য বস্তু। তাই মর্ত্যে এই ফল পাকে না। এই ফলটি খেয়ে মাতাজি টানা ছ'মাস একাসনে বসে সাধনা করেছিলেন। বরফ ফলের মতো একই ফল পাওয়া যায় পাকা হরিতকিতে। শুধু ক্ষুধা ও তৃষ্ণা নয়, প্রাকৃতিক অন্যান্য কাজেরও প্রয়োজন হয় না।

অবশ্য এই হিমালয়ে যাওয়ার ঠিক ছ'বছর পর স্বামীজির আদেশে শঙ্করী মাতাজিকে বিশেষ কোনও কাজে একবার এলাহাবাদে ফিরে আসতে হয়েছিল। সেইসময় সিপাহীরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। যা পরবর্তীকালে 'সিপাহী মিউটিনি' নামে স্মরণীয় হয়ে আছে। এইসময় তিনি প্রয়াগধাম পর্যন্ত এসেছিলেন। সেখানে একমাস থেকে ফেরার পথে বৃন্দাবন ধাম দর্শন করে আবার হিমালয়ে ফিরে যান।

মাতাজির বয়স এখন বিয়াল্লিশ। দীর্ঘ আঠারো বছর কঠোর তপস্যা ও সিদ্ধিলাভের পর ১২৭৫ সন, ইংরেজি ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি ও তাঁর গুরুভ্রাতা ভোলানন্দজি ফিরে এলেন ত্রৈলঙ্গ স্বামীজির চরণপ্রান্তে।

মাতাজিকে তখন চেনা দায়। শৈশবে তিনি যথেষ্ট রোগা ছিলেন। এখন চেহারায় কিছুটা হলেও পরিবর্তন এসেছে। তার ওপর মাথায় সুদীর্ঘ জটা। তিনি কাশীধামে ফিরে প্রথমেই বাড়িতে গেলেন। ঢুকতে গিয়েই তিনি চমকে উঠেছিলেন। মনে পড়ে গেল আঠারো বছর আগের সেই দিনটির কথা। গৃহত্যাগের দিন। ঘরের বারান্দায় তিনি তাঁর ভিজে কাপড়টি শুকোতে দিতে গিয়েছিলেন। একমাত্র কন্যার স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে সেই কাপড়টি সেখান থেকে এতদিন তোলেননি তাঁর স্নেহময়ী মা। সেই একইভাবে দড়িতে মেলা রয়েছে সেই শাড়িটি। মায়ের কথা ভেবে তাঁর চোখের কোণদুটি ভিজে গিয়েছিল। দু-ফোঁটা অশ্রুবিন্দু নেমে এসেছিল গালের দু-পাশ দিয়ে।

মেয়েকে দেখে মা অম্বালিকাদেবী কিন্তু প্রথমে চিনতে পারেননি। সিদ্ধ কোনও সন্ন্যাসিনী তাঁর গৃহে এসেছেন ভেবে তিনি প্রণাম করতে চেয়েছিলেন। সেইসময় কন্যা তাঁর মায়ের দুই বাহু দু-হাতে চেপে ধরে বলেছিলেন—মা, তুমি আমাকে চিনতে পারছ না। আমি তোমার মেয়ে শঙ্করী। অপূর্ব সে মিলনদৃশ্য। সে দৃশ্যও তোলা আছে কালের ক্যামেরায়, অদৃশ্য সেলুলয়েডে।

শঙ্করী মাতাজি ফিরে এসেছেন কাশীধামে। হঠাৎই একদিন তাঁর মনে হল, অনেকদিন ফিরে এসেছি, কিন্তু একদিনও বাবা বিশ্বনাথদেবকে দর্শন ও পুজো করতে যাওয়া হয়নি। বেশ সুন্দর কচি কচি বেলপাতা ও ফুল নিয়ে তিনি মন্দিরে পুজো করতে চললেন। কিছুদূর যাওয়ার পর তাঁর মনে হল, কে যেন তাঁকে বললেন ত্রৈলঙ্গ স্বামীজিই তো স্বয়ং বিশ্বনাথ। তাঁকেই তো রোজ তুমি পুজো করো!' সেকথা শুনেও মাতাজি মন্দিরে গিয়ে বিশ্বনাথকে খুব সুন্দরভাবে পুজো করলেন। তারপর রোজকার মতো স্বামীজির কাছে চললেন। আশ্রমে ঢুকে দেখলেন, বিশ্বনাথের মাথায় যে বেলপাতা ও ফুল তিনি অর্পণ করে এসেছেন সেই বিল্বপত্র ও ফুল মাথায় নিয়ে বসে আছেন কাশীর সচল বিশ্বনাথ ত্রৈলঙ্গ স্বামীজি। সেইদিন থেকে তাঁর মনের সব দ্বিধাদ্বন্দ্ব দূর হয়ে গেল। শিবস্বরূপ গুরুদেবের কৃপা ও আশীর্বাদ পাচ্ছেন জেনে তিনি আনন্দসাগরে ডুবে গেলেন। পরম তৃপ্তিতে তাঁর মন ভরে গেল।

মাতাজি সিদ্ধ সাধিকা। দীর্ঘ জীবনের অধিকারিণী, তিনিও তাঁর ঈশ্বরের কোলে ফিরে যাওয়ার দিনটির কথা খুব ভালোভাবে জানতেন। তাই তো তাঁর এক শিষ্যা পরমানন্দ স্বামীকে চিঠি লিখে মাকে তাঁদের বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। মাতাজির শিষ্য স্বামী পরমানন্দজি তাঁর গুরুবোনের একান্ত ইচ্ছার কথা গুরুমাতাকে জানিয়েছিলেন। মাতাজি তাঁর শিষ্যকে কী উত্তর দিতে হবে বলে দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর গুরুবোনকে মায়ের উত্তর লিখে পাঠিয়েছিলেন। মাতাজি উত্তর দিয়েছিলেন—'তোমাদের ওখানে কি যেতে পারব? সেটা আগামী দোল পূর্ণিমার পরেই জানতে পারবে! দোল পূর্ণিমার আগেই রংভরি একাদশীর দিন রাত সাড়ে বারোটার সময় সিদ্ধ সাধিকা সন্ন্যাসিনী শঙ্করী মাতাজি যোগাসনে বসে ব্রহ্মে লীন হয়ে গেলেন। অন্য এক লোকে পিতা ও পুত্রীর এক অন্য লীলা শুরু হল। দিনটা ছিল ইংরেজি ১.৩.১৯৫০, বাংলা ১৩৫৬ সন।

ত্রৈলঙ্গ স্বামীজির শিষ্যা যোগেশ্বরী মা, তিনি ভৈরবী ব্রাহ্মণী নামেও পরিচিতা। তিনি ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাধন পথের প্রথম গুরু। আমাদের ভারতবর্ষকে তন্ত্র একটি অদ্ভুত ভৌগোলিক সীমানায় বেঁধেছে। দেশটিকে চারটে ভাগে ভাগ করেছে। সেই চারটে ভাগের নাম বিষ্ণুক্রান্তা, রথক্রান্তা, অশ্বক্রান্তা ও গজক্রান্তা। আমাদের বঙ্গদেশ, আসাম ও পূর্বাঞ্চল হল বিষ্ণুক্রান্তা। এইখানে চৌষট্টিটি তন্ত্র আছে।

ভৈরবী ব্রাহ্মণী ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবকে বললেন, আমি তোমাকে তন্ত্রসাধন করাবার জন্য এসেছি। তোমার কি কোনও আপত্তি আছে! ঠাকুর বলেছিলেন, আমি তো কোনও পদ্ধতি ধরে সাধনভজন করি না। আমি মনে করি, আমি মায়ের ছেলে, আর আমার মা ওই মন্দিরে, মা কালী, মা তো তন্ত্রের দেবী। তাই আমার

তো কোনও আপত্তির কারণ নেই। মা-ই তোমাকে পাঠিয়েছেন। ভৈরবী খুব খুশি হলেন। শুরু হল তন্ত্রসাধনা।

১৯০১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত, শ্রীভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিরচিত 'রামকৃষ্ণ চরিতামৃত' বা 'ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী' গ্রন্থে যোগেশ্বরী, যোগিনী মা বা ভৈরবী ব্রাহ্মণীকে আমরা নতুন নামে, নতুন রূপে পেয়েছি। ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁকে 'শ্রীমতী ভূতভাবিনী' নামেই আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়েছেন।

১৩০৮ সালের ২০ ভাদ্র, জন্মাষ্টমীর দিন এই পুস্তকটি প্রথম প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের ভক্তিগীতি সংযোজিত করেন শ্রী জয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয়। কলিকাতা ৩৯ নং মানিক বসুর ঘাট স্ট্রীট হাটখোলা দত্তবাটী, জন্মভূমি কার্যালয় হইতে শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত গ্রন্থটির প্রকাশক। মূল্য—এক টাকা।

দীর্ঘদিন বাদে আবার সেই পুস্তকটি আমাদের হাতে এল বিভাস চন্দ মহাশয়ের সৌজন্যে। তিনি সত্যিই এক অসাধারণ উদ্যোগ নিয়েছেন। তিনি প্রাচীন শ্রীরামকৃষ্ণ সাহিত্য পুনঃপ্রকাশ প্রকল্পের কাজে হাত দিলেন। এই গ্রন্থের পরিকল্পনা ও গবেষণার গুরুদায়িত্ব তিনি নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। অতি প্রাচীন এই গ্রন্থটিকে তিনি কালের গর্ভ থেকে আবার আমাদের হাতে তুলে দিলেন।

শ্রীম কথিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত'-র প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল ১৯০২ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে। স্বামী সারদানন্দজির 'রামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ' প্রকাশিত হয় বাংলা ১৩১৮ সালের শ্রাবণ মাসে। ঠাকুর সম্পর্কিত এই দুই মহাগ্রন্থের আগেই প্রকাশিত হয়েছিল ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'রামকৃষ্ণ চরিতামৃত'।

উনিশ শতকের এক কৃতী লেখক মহাভারতের অনুবাদক কালীপ্রসন্ন সিংহের সহকারী ছিলেন ভুবনচন্দ্রবাবু। ঠাকুরের থেকে তিনি ছ'বছরের ছোট। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবিতাবস্থায় তিনি এই গ্রন্থের কাজ শুরু করেছিলেন। তাঁর তিরোধানের পাঁচবছর বাদে এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল।

ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখছেন, 'অগ্রে শঙ্কা করিয়া রামকৃষ্ণদেব কোন কার্য্যই করিতেন না, সচ্চিদানন্দময়ী কালী চরণেই তাঁহার আত্মসমর্পণ। স্তন্যপায়ী শিশুর ন্যায় তাঁহার প্রকৃতি। তাঁহার মনে যখন যে ভাবের উদ্দীপনা হইত, সেই ভাবের উত্তেজনাতেই তিনি যেন যন্ত্রবৎ কার্য্য করিতেন। একদিন প্রাতঃকালে তিনি হৃদয়নাথের সহিত গঙ্গা স্নান করিতেছিলেন, হঠাৎ দেখিলেন, আলুলায়িত কুন্তলা গৈরিক বসন পরিহিতা সন্ন্যাসিনী রূপিণী একটি সুন্দরী যুবতী গঙ্গাতীরে বসিয়া আছে। তাহাকে ডাকিয়া আনিবার জন্য হৃদয়কে তিনি আদেশ করিলেন। হৃদয়নাথ বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। স্ত্রীলোকের নাম করিলে যিনি রুষ্ট হইয়া উঠিতেন, যাঁহার কাছে স্ত্রীলোক আসিলে মহাবিভ্রাট ঘটিত, সেই পরমহংস আজ একটি সুন্দরী যুবতীকে নিকটে ডাকিতে বলিলেন, বিস্ময়ের কথাই বটে। বিস্ময় হউক, সন্দেহই হউক, অথবা যাহাই হউক, হৃদয় কিন্তু তৎক্ষণাৎ সেই সন্ন্যাসিনীকে প্রভু সন্নিধানে আনিয়া উপস্থিত করিলেন।

পরিচয়ে প্রকাশ হইল, সন্ন্যাসিনী একটি ব্রাহ্মণ কন্যা। পরমহংস তাঁহাকে দেখিয়াই মহানন্দে মা বলিয়া তত্বভাবে নিমগ্ন হইলেন, দুইজনে নানাবিধ তত্বকথার আলাপ চলিতে লাগিল। সন্ন্যাসিনী নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিতা, নানা-গুণে অলঙ্কৃতা এবং পবিত্র ধর্ম্মানুরাগে যশঃস্বিনী ছিলেন, বঙ্গ মহিলার মধ্যে তাদৃশী দ্বিতীয়া রমণী কেহ কখন দেখিয়াছেন কি না সন্দেহ। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার এতদূর বুৎপত্তি ছিল যে, তখনকার বিখ্যাত পণ্ডিত পূর্ণানন্দ ও বৈষ্ণবচরণ তাঁহার সহিত বিচারে নির্ব্বাক হইয়াছিলেন। বেদ বেদান্ত, গীতা পুরাণ তন্ত্র, এবং বৈষ্ণব গ্রন্থাদিতে সেই ব্রাহ্মণীর সম্যক অধিকার ছিল, প্রায় সমস্তই তিনি কণ্ঠস্থ রাখিয়াছিলেন। অধুনা ঘোষ পাড়ার কর্ত্তাভজা নবরসিক, পঞ্চনামি, বাউল ইত্যাদি যে সকল নূতন নূতন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের উত্থান হইয়াছে, তাহার বিশেষ বিশেষ তত্বও সেই সন্ন্যাসিনীর জানা ছিল। পরমহংসদেবের অবস্থা ও ভাব অবগত হইয়া সন্ন্যাসিনী বলিলেন, উহা অবশ্যই শাস্ত্রসম্মত; ঈশ্বরের নামে নিষ্ঠজীব জড়ভাব প্রাপ্ত হয়, ইহাও যোগমার্গে স্বাভাবিক। সে ভাবকে যাহারা মৃগী অথবা মূর্ছা রোগ অনুমান করে, তাহারা অজ্ঞান; সেভাবের প্রকৃত নাম মহাভাব।

সন্ন্যাসিনীর মুখে মহাভাবের নাম শ্রবণ করিয়া সেখানকার লোকেরা আশ্চর্য জ্ঞান করিল। আশ্চর্য জ্ঞান করিবারই কথা। ভাব কাহাকে বলে, প্রকৃত বৈষ্ণব ভিন্ন আর কেহ তাহা জানে না। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের মহাভাব হইত, এখনকার সাধারণ বৈষ্ণবেরা সেইভাবের ভাণ করে, কিন্তু ভাবের ভাব হৃদয়ঙ্গম করা দূরে থাকুক, অনেকে সে কথার অর্থ পর্য্যন্ত অজ্ঞাত। সন্ন্যাসিনীর মুখে মহাভাবের নাম শুনিয়া লোকেরা তখন ভাব বলিয়া একটা নূতন কথা শিখিল, কিন্তু তাহাতে রামকৃষ্ণদেবের প্রতি কাহারও বিশেষ ভক্তি শ্রদ্ধা আসিল না।

কিছুদিন পরে পশ্চিমদেশ হইতে একজন দিকবিজয়ী পণ্ডিত দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরবাড়িতে উপস্থিত হন; কলিকাতার পণ্ডিতগণের সহিত বিচার করিতে তাঁহার ইচ্ছা হয়, রাসমণির জামাতা মথুরানাথ বিশ্বাস তজ্জন্য প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বৈষ্ণবচরণ তর্কালঙ্কারকে দক্ষিণেশ্বরে লইয়া যান। দিকবিজয়ী পণ্ডিত তখন পরমহংসদেবের সহিত কালী মন্দিরের সম্মুখভাগে উপবিষ্ট ছিলেন, বৈষ্ণবচরণকে দেখিবামাত্র পরমহংসদেব সানন্দে গাত্র উত্থান পূর্ব্বক এক লম্ফে তাঁহার স্কন্ধোপরি আরোহণ করিলেন। পরমহংসের ভাবাবেশ হইয়াছে স্থির করিয়া বৈষ্ণবচরণ প্রেমানন্দে স্বরচিত কতিপয় শ্লোকের দ্বারা ভক্তিভাবে তাঁহার স্তব করিলেন। শ্লোকগুলি তাঁহার পূর্বে রচনা করা ছিল না, সেই ক্ষেত্রে যেমন উদয় হইল, তেমনি রচনা করিয়া চৈতন্যানন্দ প্রকাশ করিলেন; দিকবিজয়ী পণ্ডিতও তাহা বুঝিলেন। বৈষ্ণবচরণের সহিত আর তাঁহার বিচার করিতে সাহস হইল না, তন্মুহূর্ত্তেই পরাজয় স্বীকার করিয়া নম্রভাব ধারণ করিলেন; অনন্তর কিছুদিন পরমহংসের নিকটে দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করিয়া স্বদেশে প্রস্থান করেন।

রামকৃষ্ণদেবকে প্রাপ্ত হইয়া পণ্ডিতবর বৈষ্ণবচরণ পরমানন্দে উৎসাহিত হইলেন, ব্রাহ্মণীও তাঁহার পাণ্ডিত্যগুণের পক্ষপাতিনী হইয়া উঠিলেন। ব্রাহ্মণী বলিয়াছিলেন; "পরমহংসের মহাভাব"; বৈষ্ণবচরণও সেই কথা স্বীকার করিলেন; শাস্ত্র গ্রন্থাদি সংগ্রহ করিয়া রামকৃষ্ণ পূর্ব্ব সাধনার প্রণালী ও অবস্থা মিলাইয়া দেখিলেন, কিছুই অশাস্ত্রীয় হয় নাই। লৌকিক শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ রামকৃষ্ণ কিরূপে এই দুরূহ সাধনার প্রক্রিয়া স্বীয় যত্নে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, ইহা চিন্তা করিয়া বৈষ্ণবচরণের মহা বিস্ময় জন্মিল।

বৈষ্ণবচরণ যখন সন্ন্যাসিনীর বাক্যে রামকৃষ্ণের মহাভাব স্বীকার করিলেন, তখন রামকৃষ্ণের প্রতি মথুরবাবুর কতক কতক ভক্তি সঞ্চারিত হইল, দেখাদেখি আরও কতকগুলি লোকও সেইদিকে একটু একটু ঢলিয়া পড়িল, রামকৃষ্ণ সেই সময় তন্ত্রোক্ত সাধনে অভিনিবিষ্ট হইলেন, সন্ন্যাসিনী সেই সাধনায় তাঁহার যথেষ্ট সহায়তা করিতে লাগিলেন। পূর্ব্ব কথিত বিল্ব বৃক্ষতলে পঞ্চমুণ্ডী প্রভৃতি পঞ্চতন্ত্রের যাবতীয় প্রক্রিয়া সমাধা হইতে লাগিল।

তন্ত্রসাধকগণের মধ্যে দুটী প্রধান শ্রেণীদৃষ্ট হয়;—দক্ষিণাচারী এবং বামাচারী। দক্ষিণাচারীরা সাত্বিকভাবে পূজাদি ক্রিয়া সমাপন পূর্ব্বক মন্ত্র জপ করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন; বামাচারীরা সাত্বিকভাবকে দূরে রাখিয়া তামসভাবের আদর করিয়া থাকেন। বামাচারী মতে কুলস্ত্রীর পূজা করিতে হয়। কুলভ্রষ্টা পর-পুরুষগামিনী স্ত্রীলোকগণকে তান্ত্রিকেরা কুলস্ত্রী বলেন। নটের স্ত্রী, কাপালিকের স্ত্রী, রজকের স্ত্রী, নাপিতের স্ত্রী, ব্রাহ্মণের স্ত্রী, শূদ্রের স্ত্রী, গোপের স্ত্রী, মালাকারের স্ত্রী এবং বার বিলাসিনী, এই নয় প্রকার স্ত্রীকে বামাচারীরা কুলকামিনী বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের সাধনায় পঞ্চতত্ব অথবা পঞ্চ ম'কার ব্যবহৃত হয়। পঞ্চ ম'কারের ব্যাখ্যা—মদ্য মাংস মৎস্য মুদ্রা মৈথুন। ইহা ব্যতীত রজঃস্বলা স্ত্রীলোকের রজঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই শ্রেণীর লতা সাধন প্রভৃতি কার্য্য কেবল অশ্লীলতায় পরিপূর্ণ। বামাচারীগণের শব সাধনটি অতি গুরুতর কার্য্য। কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী অথবা চতুর্দ্দশী তিথিতে, মঙ্গল বাসরে, শ্মশানে, নদী তীরে, বিল্বমূলে, কিংবা অরণ্য মধ্যে অপঘাতে মৃত মনুষ্যের দেহ আনিয়া পূজা করিতে হয়, পূজার পর মৎস্যাদি উপাচার লইয়া, শবের বুকের উপর বসিয়া মন্ত্র জপ করিতে হয়।

অন্ময়া শুনিয়াছি, রামকৃষ্ণ একদিন নরশির লইয়া সাধন করিতেছিলেন, সেই সময় তাঁহার মনে কিঞ্চিৎ বিকার জন্মিয়াছিল। তদ্দর্শনে সন্ন্যাসিনী বলিয়াছিলেন, 'ও কি বাবা! এই দেখ, আমি ঐ নরমুণ্ড দংশন করিতেছি।' সত্য সত্যই সন্ন্যাসিনী নিজে সেই ক্রিয়া দেখাইয়া দিয়াছিলেন। তন্ত্রের সাধন অতি ভয়ানক।

রামকৃষ্ণের তন্ত্র সাধনের সময় তথায় অনেক তান্ত্রিকের সমাগম হইত। রামকৃষ্ণদেব তাঁহাদের জন্য কারণ, মদ্য, চাউল ভাজা এবং ছোলা ভাজা সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন, স্বয়ং কখন রসনাগ্রে কারণ স্পর্শ করেন নাই, অঙ্গুলির অগ্রভাগে মদ্য লইয়া কালী কালী বলিয়া কপালে ফোঁটা করিতেন। কালীঘাটের অচলানন্দ স্বামী প্রায় সর্ব্বদাই দক্ষিণেশ্বরে আসিতেন, রামকৃষ্ণদেব তাঁহার যথোচিত সমাদর করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করিতেন না।

তন্ত্রশাস্ত্র মধ্যে 'উর্দ্ধমুখতন্ত্র' নামে একখানি গ্রন্থ আছে, সেই গ্রন্থানুসারে সাধন প্রণালী অতীব ভয়ঙ্করী। সেই সাধনার প্রক্রিয়া এতদূর অশ্লীল যে, সাধারণ সমীপে পরিচয় দেওয়া যায় না, কিন্তু নিষ্ঠ সাধকের তাহার সহিত কোন সংস্রব নাই। সেই সাধনায় সাধকের মনের শক্তি বিলক্ষণ পরীক্ষিত হয়। যুবতী সন্ন্যাসিনীর দ্বারা সেই সাধন সম্পাদন করিতে পরমহংসদেবের সবিশেষ সুবিধা হইয়াছিল।

তন্ত্রসাধন সমাপ্ত হইলে পরমহংসদেব অন্য প্রকার সাধনায় প্রবৃত্ত হন। তিনি যখন কর্ত্তাভজা, নবরসিক, পঞ্চনামী, এবং বাউল প্রভৃতি উপধর্ম্মের আলোচনা করেন। সেই সকল ধর্ম্ম প্রণালীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কিরূপ, ব্রাহ্মণী তাহাও জানিতেন। কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের একটি লোককে তিনি দক্ষিণেশ্বরে আনাইয়াছিলেন; সে লোকটার নাম চন্দ্রনাথ, নিবাস বঙ্গদেশ। পরমহংসদেবের যখন মহাভাব উপস্থিত হইত, যখন তিনি বাহ্যজ্ঞান পরিশূন্য হইতেন, চন্দ্রনাথ তখন তাহার দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিয়া বলিতেন, "রামকৃষ্ণ! ও কি! তোমার চৈতন্য কোথায় গেল?" রামকৃষ্ণ কিছুই উত্তর দিতেন না।

কর্ত্তাভজাদিগের মতে সহজ জ্ঞানই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাঁহারা বলেন, "বহির্জ্ঞানের সহিত অন্তর্জ্ঞান থাকে, ইহা অগ্রাহ্য কথা।" বৈদান্তিক নির্ব্বিকল্প সমাধির ভাব কর্ত্তাভজারা বুঝিতে পারেন না। যোগীরা যোগসাধন করিয়া সেই নির্ব্বিকল্প সমাধিভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যোগের দ্বারা সমাধিলাভ অতিশয় কষ্টসাধ্য, কিন্তু রামকৃষ্ণদেব সেই ভাব লাভ করিবার সহজ প্রণালী দেখাইয়া গিয়াছেন, কথায় কথায় তিনি গৌরাঙ্গের ন্যায় বাহ্যজ্ঞান হারাইতেন। আমরা শুনিয়াছি, এইরূপ সমাধি অবস্থায় একদা তাঁহার গাত্রে গুলের আগুন পতিত হইয়া মাংস ভেদ করিয়াছিল, তথাপি তাঁহার চৈতন্য হয় নাই। তাঁহার উদরের বামভাগে একটি ক্ষতচিহ্ন ছিল, সেটি সেই গুলের আগুনের দাগ। কর্ত্তাভজা চন্দ্রনাথ বহু চেষ্টা করিয়াও রামকৃষ্ণের সমাধি টলাইতে না পারিয়া হতাশে স্বস্থানে প্রস্থান করেন।

কর্ত্তাভজা সাধনের সময় রামকৃষ্ণদেব মধ্যে মধ্যে গঙ্গার পশ্চিম তীরবর্ত্তী বালী গ্রামে নিবাসী তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্যের বাটীতে গমন করিতেন। সেইজন্য সেই সময় কতকগুলি লোকের বিশ্বাস হইয়াছিল; রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তাভজা। আজিও কেহ কেহ সেই কথা বলে।

রামকৃষ্ণের ন্যায় সেই সন্ন্যাসিনীরও ভাব উদয় হইত, সন্ন্যাসিনী রামকৃষ্ণের সহিত বাৎসল্য সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন। সময়ে সময়ে তিনি বিবিধ বেশভূষায় ভূষিতা হইয়া নিকটস্থ পল্লীর মহিলাদের সঙ্গে রজত পাত্রে ক্ষীর নবনী লইয়া পরমহংসদেবের আবাস গৃহাভিমুখে গমন করিতেন, এবং বাৎসল্যভাবের গোপাল সঙ্গীত গান করিতে করিতে গৃহদ্বারে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িতেন। কৃষ্ণের অদর্শনে স্নেহময়ী নন্দরাণীর যে ভাব উপস্থিত হইত, ইহাও সেইভাব। তাহার কর্ণকুহরে অবিরত গোপাল নাম শুনাইলে তবে তাঁহার চৈতন্য সম্পাদিত হইত।

পরমহংস রামকৃষ্ণদেব নানা প্রকার সাধনা করিতেন বটে, কিন্তু কালীর মন্দিরে গমন করিতে কদাচ ভুলিতেন না। ব্রাহ্মণীও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যাইতেন। একদা বলীদানের সময় তাঁহারা উভয়েই মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করেন; ছাগ রুধিরের সরা যখন দেবী সমীপে নীত হইল, ব্রাহ্মণী সেই সময় সাগ্রহে মুখ ব্যদন করিয়া সেই রুধির পান করিতে আরম্ভ করিলেন; রুধিরাক্ত রম্ভা সন্দেশগুলিও অম্লান বদনে হাসিতে হাসিতে ভক্ষণ করিয়া ফেলিলেন। পরমহংসদেব তাহা দর্শন করিয়া ফুল্লমনে মৃদু মৃদু হাস্য করিয়াছিলেন।

ক্রমে প্রকাশ পায়, পরমহংসদেবের সহচারিণী নবীনা সন্ন্যাসিনীর নাম শ্রীমতী ভূতভাবিনী। এটি কিন্তু তাঁহার সন্ন্যাসাশ্রমের নাম; গৃহাশ্রমেও কি নাম ছিল, তাহা জানা যায় নাই, সে কথা তিনি বলেনও নাই। যাঁহারা আশ্রম ত্যাগ করেন, সেই সঙ্গে তাঁহাদের নামেরও বিলোপ হয়। যাহাই হউক, শ্রীমতী ভূতভাবিনী

আমাদের পরমহংসদেবকে যেরূপে চিনিয়াছিলেন, পণ্ডিত বৈষ্ণবচরণ তর্কালঙ্কার তাঁহার যে সকল বাক্যের পোষকতা করিয়াছিলেন, তাঁহার সন্তোষকর ফল এই হইল যে, রামকৃষ্ণদেবকে প্রকৃত সিদ্ধ বলিয়া মথুর বাবুর মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল, রাসমণিও বলিলেন, রামকৃষ্ণ ঠাকুর সত্য সত্য সিদ্ধপুরুষ হইয়াছেন। তদবধি পরমহংসদেবের সেবায় তাঁহারা সমধিক যত্ন প্রকাশ করিতে লাগিলেন। হায় হায়! বালক স্বভাব-সম্পন্ন উন্মত্তবৎ এই রামকৃষ্ণকে লইয়া ইন্দ্রিয় পরীক্ষা করা হইয়াছিল? অল্পবুদ্ধি হৃদয়নাথ আসলেই এই মহাপুরুষকে চিনিতে পারেন নাই। যে সময়ের কথা, সে সময় রামকৃষ্ণদেবের বয়ঃক্রম অনুমান ২৪/২৫ বৎসর, রূপলাবণ্য অতি চমৎকার, অথচ লোকেরা তাঁহাতে পূর্ণযৌবনে পঞ্চম বৎসরের বালকের ন্যায় মনে করিত। ভদ্রকুলের স্ত্রীলোকেরা তাঁহার সম্মুখে আসিতে কিছুমাত্র লজ্জা করিতেন না, স্থূলভাব এই বোধ হয় যে সিদ্ধপুরুষের কাছে তাঁহাদের স্বলজ্জভাব আসিতেই পারিত না।'

বিভাস চঁন্দ মহাশয় এই গ্রন্থের ভূমিকায় শ্রীভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে লিখছেন, 'ভুবনচন্দ্র ছিলেন একজন খাঁটি সাহিত্যিক এবং সাহিত্যরসিক মানুষ। সাহিত্যিক হিসেবে তাঁর উদারতা ও বিনম্র স্বভাবের বহু উদাহরণ মেলে। অনেক লেখা অনেক রচনা তিনি নেপথ্য থেকে সংস্কার করে দিয়েছেন, তরুণ সাহিত্যিকদের রচনা সংশোধন করে প্রকাশযোগ্য করে তুলেছেন।' যতীন্দ্রনাথ দত্তের বিবরণ থেকে জানা যায়, ''ভুবনচন্দ্র শ্রীশ্রীহরিবংশ'' গ্রন্থের অনুবাদের ব্যবস্থা করে, সেই অনুবাদ পরিমার্জন করে দিয়েছিলেন উক্ত গ্রন্থ প্রকাশে আগ্রহী গোপালকৃষ্ণ রায় নামক এক ব্যক্তিকে। 'কাশীখণ্ড'-র প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ করে দিয়েছিলেন একজন নবদ্বীপ পণ্ডিতের সাহায্যে, বাবু কালীকৃষ্ণ মণ্ডলের জন্য। 'সংবাদ প্রভাকর' সম্পাদন সময়ে ভুবনচন্দ্রের নিকট মীর মোশারফ হোসেন নামে এক যুবক এসেছিলেন, দু-খানি বাংলা পুস্তক নিয়ে 'বসন্তকুমারী' ও 'বিষাদসিন্ধু'। ভুবনচন্দ্র সেই পুস্তকগুলি উত্তমরূপে সংশোধন করে দিয়েছিলেন। কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রয়াণজনিত কারণে অসম্পূর্ণ নাটক 'মায়াকানন' সম্পূর্ণ করেন ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।' সুকুমার সেন লিখেছেন, ''ফকিরচাঁদ বসুর আশ্রয়ে থাকার সময়ে ভুবনচন্দ্র টাকীর জমিদার কৃষ্ণচন্দ্র রায়চৌধুরীকে একটি নাটক লিখিতে সাহায্য করিয়াছিলেন। চন্দ্রকালী ঘোষের 'কুসুমকুমারী' নাটকের দ্বিতীয় সংস্করণে (১৮৭২) ভুবনচন্দ্রের সংশোধন ছিল।''

ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৯০০ সালে প্রকাশিত 'ঠাকুরবাড়ির দপ্তর' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় নিজের রচনা সম্বন্ধে লিখেছেন—'বিষয় সংসারে প্রবেশ করিয়া অবধি আমি সবিশেষ আগ্রহে মাতৃভাষায় বাঞ্ছনীয় কাব্য-সাহিত্যের সেবা করিতেছি। সংবাদপত্র পরিচালন ব্যতীত সমাজস্পর্শী পুস্তক-পুস্তিকা প্রণয়নেও আমার আন্তরিক অনুরাগ। কৃতকার্য্য হইতে পারি আর নাই পারি, অনুরাগের মায়া কাটাইতে পারি না। ত্রিংশৎ বৎসর পূর্বে 'হরিদাসের গুপ্তকথা'-র জন্ম; সেই রহস্যোপন্যাসখানি আমার লেখনী-লতিকার প্রথম ফল। তদবধি উৎসাহপ্রাপ্ত হইয়া, স্বদেশীয় জনরঞ্জনার্থ বিবিধ উপন্যাসে, নবন্যাসে, খণ্ডকাব্যে, ধর্মপ্রসঙ্গে এবং সামাজিক চিত্রে আমি বহু শ্রম, বহু যত্ন ও বহু সময় অর্পণ করিয়া আসিতেছি। পাঠগুলি সারশূন্য না হয়, সমাজ তাহা হইতে কিছু কিছু উপদেশ প্রাপ্ত হন, সর্ব্বদা তাহাই আমার লক্ষ্য।'

তবে একথা ঠিক বঙ্গসাহিত্যের জনপ্রিয় এই সাহিত্যিককে আজ কেউই মনে রাখেননি। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একটি ক্ষুদ্রকায় জীবনী-লেখক বলেও তিনি আলোচিত নন। তবে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক পরিপ্রেক্ষিতে ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নাম বিংশ শতাব্দীর শেষে বাংলা সাহিত্যের পণ্ডিতমহলে যথেষ্ট আলোচিত হয়েছে। পরিপ্রেক্ষিত আসলে একটি বিতর্ক। 'হুতোম প্যাঁচার নকশার আসল রচয়িতা কে? ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত 'ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের চরিতকথায়' এই বিতর্কের নাম গন্ধ নেই। এই বিতর্কের জন্ম কিছুকাল পরে এবং বিতর্কের জন্মদাতা ডঃ সুকুমার সেন। তিনি তাঁর 'বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে প্রথম সন্দেহ প্রকাশ করে অভিমত ব্যক্ত করেন, ''বইটি ('হুতোম প্যাঁচার নকশা') কালীপ্রসন্ন সিংহের রচনা বলিয়া প্রচলিত কিন্তু রচনা কালীপ্রসন্নের নহে। অনুমান করি রচনাটি মুখ্যত ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের লেখনী প্রসূত।'' প্রসঙ্গত উল্লেখ প্রয়োজন, ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রতিষ্ঠিত 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'-র একজন লিপিকার

এবং বেতনভূক কর্মচারী ছিলেন। এবং কালীপ্রসন্নের সঙ্গে তাঁর সুসম্পর্ক বজায় ছিল। তিনি মাইকেল মধুসূদন দত্তেরও লিপিকার ছিলেন। বিদ্যোৎসাহিনী সভার লিপিকার ছিলেন বলেই, ভুবনচন্দ্র নেপথ্যে থেকে হুতোম প্যাঁচার নকশা রচনা করেন—এই হল ডঃ সুকুমার সেনের যুক্তি। তাঁর যুক্তিকে সমর্থন করে জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায় 'দেশ' পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখেন এবং তাঁর মতানুযায়ী নকশা রচনা করেন ভুবনচন্দ্র এবং বিদ্যোৎসাহিনীর অপর একজন লেখক নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিতর্কে উপাদান জোগায় মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের চিঠি, প্রবন্ধ ইত্যাদি। এই সমস্ত যুক্তিকে নাকচ করে ডঃ পরেশচন্দ্র দাস তাঁর গবেষণাগ্রন্থ 'বাংলার সমাজ ও সাহিত্যে কালীপ্রসন্ন সিংহ'-তে প্রমাণ করেছেন যে, 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'-র একমাত্র লেখক স্বয়ং কালীপ্রসন্ন সিংহ, অন্য কেউ নন। পরেশবাবুর এই অভিমত মেনে নিয়েছেন অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ ভবতোষ দত্ত, প্রবোধচন্দ্র সেন প্রমুখ পণ্ডিত সমালোচকগণ।

উমাচরণ মুখোপাধ্যায়, ত্রৈলঙ্গ স্বামীজি তাঁকে পরীক্ষা করে, পরখ করেই তবে দীক্ষা দিতে রাজি হয়েছিলেন। উমাচরণবাবু স্বামীজির শেষ গৃহস্থ শিষ্য। এরপর তাঁর আর কোনও নতুন শিষ্যের কথা এখনও জানা যায়নি। মুঙ্গেরের এক বড় ডাক্তারখানায় উমাচরণবাবু চাকরি করতেন। তাঁর জন্মবৃত্তান্ত সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। অর্থাৎ এই ব্যাপারটি তিনি অত্যন্ত সুকৌশলে আমাদের কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছেন।

ধর্মসম্পর্কিত বক্তৃতা ও বহু-ধর্মালোচনা করে উমাচরণবাবুর মনে পুনর্জন্ম সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন জেগেছিল। শাস্ত্রে জন্ম-জন্মান্তরের কথা রয়েছে। তিনি লিখছেন, ''জন্মান্তরবাদে আমার বিশ্বাস আছে। মানুষকে কর্মফল ভোগ করতেই হয়। শাস্ত্রে যেমন বলেছেন—সুকৃতীর ফল একরকম, দুষ্কৃতীর ফল আর একরকম। স্বর্গ কোথায়? নরক কোথায়? তা আমি জানি না। তবে কর্মফল অনুসারে উচ্চযোনি অথবা নিম্নযোনিতে জন্ম হবেই। বারে বারে আসা-যাওয়া—একথা আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি। কিন্তু সমর্থন চাই। পণ্ডিতরা কী বলবেন? সমস্ত সংশয় দূর করতে পারেন তাঁরাই যাঁরা প্রকৃত মহাপুরুষ। তখনই ঠিক করলাম মহাত্মা ত্রৈলঙ্গ স্বামীর কাছে যাব এবং এ ব্যাপারে তাঁর কী অভিমত তা জানব। কারণ এই বিষয়ে জানার জন্য আমার মন বড়ই ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। সমস্ত সংশয় দূর করার জন্য তীর্থে বেরোব বলে মনস্থ করলাম। ভেবেছিলাম হরিদ্বার পর্যন্ত যাব, এবং প্রথমেই কাশীধাম। সেখানে ত্রৈলঙ্গ স্বামীজিই আমার মনের সমস্ত সংশয় অবশ্যই দূর করে দেবেন।

কিন্তু ত্রৈলঙ্গ স্বামীজি কেন? কারণ আমি বুঝতে পেরেছিলাম কোনও বড় পণ্ডিত আমার এই প্রশ্নের উত্তর কিছুতেই ঠিকভাবে দিতে পারবেন না। যিনি যত বড় পণ্ডিত তিনি তত বেশী যুক্তি দেবেন। কাজের কাজ কিছু হবে না। আমার তখন প্রত্যক্ষ প্রমাণ দরকার। কোনও বড় পণ্ডিত কিছুতেই এই কাজটি করতে পারবেন না। একমাত্র ত্রৈলঙ্গ স্বামীজিই আমার মনের সমস্ত সংশয় দূর করতে পারেন। প্রত্যক্ষ প্রমাণ তিনি ছাড়া আর কারও পক্ষে দেওয়া যে সম্ভব হবে না তা ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিলাম। তাই স্বামীজির কাছে যাওয়ার জন্য মন বড়ই আকুল হয়ে উঠেছিল। ঠিক করলাম, স্বামীজির কাছে আমাকে যেতেই হবে এবং যতদিন না আমি আমার প্রশ্নের উত্তর পাচ্ছি ততদিন ওখানেই থাকব। কিছুতেই ফিরব না।

সেইসময় আমি মুঙ্গেরের এক বড় ডাক্তারখানায় চাকরি করি। ফলে ছুটি না পেলে তো কিছুতেই যেতে পারব না। এইসব ভাবনাচিন্তা করতে করতে আমার বেশ কিছুদিন কেটে গেল। এদিকে স্বামীজির কাছে যাওয়ার জন্য মন ক্রমশই চঞ্চল হয়ে উঠছিল। তাই কীভাবে ছুটি পাওয়া যায় তার সুযোগ খুঁজতে শুরু করলাম।

কিছুদিন পরে সত্যিই ছুটি পেলাম। একবারে তিনমাসের ছুটি। ১২৮৭ সালের ২ অগ্রহায়ণ আমি বাক্স-প্যাঁটরা গুছিয়ে তীর্থযাত্রায় বেরোলাম। মুঙ্গের স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক বাবু সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কাশীধামের নারদ ঘাটের কাছে নিজের একটি বাড়ি ছিল। আমি কাশী যাব শুনে তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ওই বাড়ির তত্বাবধায়ক রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে একটি চিঠি লিখে আমার হাতে দিয়ে বললেন—আমি চিঠি লিখে দিলাম। আপনি আমার বাড়িতেই থাকবেন। সুরেন্দ্রবাবু আমার যথেষ্ট উপকার করেছিলেন।

কাশীতে পৌঁছে আমাকে কোনওরকম কষ্ট ভোগ করতে হয়নি। রামচন্দ্রবাবু আমাকে যথেষ্ট যত্ন করতেন। তাঁর সাহায্যে প্রথমে পিতা-মাতার শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করলাম। তারপর ব্রাহ্মণ ও কুমারী ভোজন ইত্যাদি সমস্ত কাজে তিনি আমার পাশে ছিলেন। তাঁর সাহায্য না পেলে এইসব কাজ এত সহজে মেটাতে পারতাম না।

এইসমস্ত কাজকর্ম মিটে যাওয়ার পর তিনি আমার সঙ্গে পরপর সাতদিন দুবেলা কাশীধামের সমস্ত তীর্থস্থানে ঘুরেছিলেন। তিনি সঙ্গে থাকাতে আমাকে কোনওরকম সমস্যায় কখনই পড়তে হয়নি। তিনি আমাকে এই তীর্থের সমস্ত দেব-দেবী দর্শন করালেন, তার সঙ্গে তিনি আমাকে এই তীর্থের মাহাত্ম্যও খুব সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। একদিন তাঁর কাছে আমি আমার মনের বাসনা—অর্থাৎ ত্রৈলঙ্গ স্বামীজিকে দর্শন করতে চাই বলে জানালাম। শেষে একদিন তিনি আমাকে স্বামীজির কাছে নিয়ে গেলেন। পঞ্চগঙ্গা ঘাটের ওপর অবস্থিত বিন্দুমাধব ও ত্রৈলঙ্গ স্বামীজিকে দর্শন করে আমার মনে ভক্তিভাব আরও প্রবল হয়ে উঠল। তবে আমার মনের সেই ভাব আমি মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে জানাইনি, আর তিনিও বুঝতে পারেননি। অল্পক্ষণ সেখানে থেকে স্বামীজিকে প্রণাম করে আমরা দুজনে বাড়িতে ফিরে এলাম। রাতে তাঁর কাছে স্বামীজির ক্ষমতার কথা জানতে চেয়েছিলাম। এ ব্যাপারে তিনি আমাকে বিশেষ সাহায্য করতে পারলেন না। শুধু বললেন, ওর কথা কেন জিজ্ঞাসা করো? ওর কোনও কাণ্ডজ্ঞান নেই। পুরা পাগল। কোনও জাত-বিচার নেই। যার তার হাতে খায়। দোকানের জিনিসপত্র ফেলে দেয়। কারও সঙ্গে কথা বলে না। উলঙ্গ হয়ে সর্বত্র ঘুরে বেড়ায়। গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড উত্তপ্ত বালিতে নিশ্চিন্তে শুয়ে থাকে আবার ভরা শীতে জলে বসে থাকে। কখনও কখনও দুই-তিন ঘণ্টা জলের তলায় ডুবে থাকে। কখনও আবার জলের ওপর ভাসে। লোকে ওকে কুম্ভকযোগী বলে। শুনি তো ওর বয়স নাকি সাত-আটশো বছর। আমি তো বহুদিন এইভাবেই দেখছি।

পরদিন সকালে মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে কিছু না বলে মণিকর্ণিকায় স্নান করে স্বামীজিকে দর্শন করার জন্য তাঁর আশ্রমে গেলাম। তাঁকে প্রণাম করে একটি থামের আড়ালে চুপ করে দাঁড়িয়ে দু-চোখ ভরে স্বামীজির দেবমূর্তি দর্শন করতে করতে ভাবছিলাম—আজ আমি আমার প্রশ্নের উত্তর জেনেই তবে বাড়ি ফিরব। আসলে মনের সংশয় দূর না হওয়া পর্যন্ত কিছুতেই শান্তি পাচ্ছিলাম না। এদিকে স্বামীজির কাছে গিয়ে প্রশ্ন করার সাহসও হচ্ছিল না। কোনও কথা জিজ্ঞাসা করবার আগেই হঠাৎ স্বামীজি আমার দিকে তাকালেন এবং ইশারা করে আমাকে চলে যেতে বললেন। আমি সেখানে আরও কিছুক্ষণ থাকবার ইচ্ছা প্রকাশ করা মাত্রই স্বামীজি তাঁর সেবক মঙ্গলদাস ঠাকুরকে ডেকে আমায় চলে যেতে বলার জন্য আদেশ করলেন। কী আর করি! অত্যন্ত ক্ষুব্ধ চিত্তে, বিষণ্ণ মনে নানারকম কথা ভাবতে ভাবতে বাড়িতে ফিরে এলাম। দুপুরে খাওয়া-দাওয়া সেরে বিকেলে আবার আশ্রমে গেলাম। সকালের মতো তখনও স্বামীজিকে প্রণাম করে ওই থামের পাশেই দাঁড়ালাম। কিন্তু কোনও প্রশ্ন করার আগেই স্বামীজি সকালের মতো হাতের ইশারায় চলে যেতে বললেন। স্বামীজি ইশারা করা মাত্রই মঙ্গলদাস আমার কাছে ছুটে এসে বললেন, 'আপনি এখনই এখান থেকে চলে যান।' আমার তো করার কিছু নেই। মন খারাপ করে বাড়ি ফিরে এলাম।

দ্বিতীয় দিন সকালে পঞ্চগঙ্গা ঘাটে স্নান সেরে আবার আশ্রমে গিয়ে স্বামীজিকে প্রণাম করে ওই থামের পাশে চুপ করে দাঁড়ালাম। বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর স্বামীজির নজর হঠাৎই আমার ওপর পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমায় চলে যেতে ইশারা করলেন। আমি তবুও সেই জায়গা ছেড়ে নড়লাম না। তিনি মঙ্গল ভট্টজিকে পাঠালেন আমাকে বের করে দেওয়ার জন্য। আমি তাঁর কথাও শুনলাম না। এরপর স্বামীজির আদেশে গো-সেবক এসে আমায় বলপূর্বক আশ্রম থেকে বের করে দিলেন। এই ঘটনায় বড়ই অপমানিত হয়েছিলাম। কাঁদতে কাঁদতে বাসায় ফিরে এসে ঠিক করলাম, কপালে যাই লেখা থাক, আমি আশ্রমে যাওয়া বন্ধ করব না। বিকেলবেলায় ভয়ে ভয়ে আশ্রমে গেলাম। স্বামীজিকে প্রণাম করে ওই থামের কাছে দাঁড়ানো মাত্রই স্বামীজি আমাকে চলে যেতে বললেন। সেই সকালের মতো কাণ্ড ঘটল। এর ফলে আমি বড়ই হতাশ হয়ে পড়লাম। কী যে করব কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলাম না। অনেক ভাবনাচিন্তা করে ঠিক করলাম, মঙ্গলদাস ও গোসেবককে যে-কোনও ভাবে খুশি করতে হবে। তাঁরা আমার ওপর সন্তুষ্ট থাকলে ভয়

অনেকটাই কেটে যাবে। আমাকে চট করে তাঁরা তাড়িয়ে দেবেন না। স্বামীজি ইশারা করলেও আমি সেখান থেকে নড়ব না। মনের সমস্ত সংশয় দূর করেই তবে বাড়ি ফিরব।

তৃতীয় দিন সকালে মণিকর্ণিকায় স্নান সেরে আশ্রমে প্রবেশ করে স্বামীজিকে প্রণাম করলাম। তারপর থামের পাশে না দাঁড়িয়ে মঙ্গলদাসজির পাশে গিয়ে বসলাম। প্রথমে আমি মঙ্গলদাসকে চার টাকা ও গোসেবকের হাতে দু'টাকা গুঁজে দিয়ে করজোড়ে বললাম, আপনারা আমাকে আর এখান থেকে তাড়িয়ে দেবেন না। তাঁরা আমার আচরণে যে খুব সন্তুষ্ট হয়েছেন তা বেশ বুঝতে পারলাম। তবে মঙ্গলদাসজি বললেন, 'বাবা, অনুমতি না দিলে এখানে থাকাটা বড় শক্ত। তিনি যা আদেশ করবেন তা আমাদের পালন করতেই হবে।' গোসেবক বললেন, 'আমি স্বামীজির সামনে না হয় থাকব না।' আমি আবার থামের পাশে গিয়ে করজোড়ে দাঁড়ালাম। আজ তো তাড়িয়ে দেওয়ার কোনও ভয় নেই, তাই স্বামীজির কাছে যাওয়ার জন্য মানসিক প্রস্তুতি নিতে শুরু করলাম। তবে ভয় যে লাগছিল না তা কিন্তু নয়। একসময় মনের সমস্ত ভয় দূর করে স্বামীজির কাছে যাওয়ার জন্য ধীরে ধীরে অগ্রসর হলাম। ঠিক সেইসময় বাঙালি দুই ভদ্রলোক আশ্রমে প্রবেশ করলেন। তাঁরা প্রণাম করা মাত্রই স্বামীজি তাঁদের চলে যেতে বললেন। তৈরি হল এক বিশ্রী পরিস্থিতি। এক ভদ্রলোক স্বামীজি ইঙ্গিত করা মাত্র আশ্রম থেকে বেরিয়ে যান। কিন্তু অপরজন কিছুতেই যেতে রাজি হচ্ছিলেন না। গোসেবকের সঙ্গে তাঁর একপশলা গণ্ডগোল হয়ে গেল। শেষে স্বামীজির হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি শান্ত হল। ভদ্রলোক স্বামীজির সামনে দাঁড়িয়ে বাইরে ছেড়ে আসা জুতোর কথা ভাবছিলেন। স্বামীজি মঙ্গলদাসজির মাধ্যমে বাঙালি ভদ্রলোককে তাঁর জুতো ভাবনার কথা জানান মাত্র তিনি আশ্রম ছেড়ে চলে গেলেন।

তাঁকে আমি জিগ্যেস করেছিলাম, আপনি কি সত্যিই আপনার জুতোর কথা ভাবছিলেন? বাঙালি ভদ্রলোক বললেন, হ্যাঁ, আমি সত্যি সত্যিই জুতোর কথা ভাবছিলাম। এই কথা শোনার পর স্বামীজির ওপর আমার ভক্তি ও শ্রদ্ধা আরও বহুগুণ বেড়ে গেল। কিন্তু আমার কপাল বড় মন্দ। তিনি আশ্রম থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর স্বামীজি আমাকে দেখতে পেলেন। ব্যস, তিনি আমাকে চলে যেতে ইঙ্গিত করলেন। ভেবেছিলাম, থাকব বলে একটু জেদ করে দেখিই না। কিন্তু সাহসে কুলালো না। তাই বাধ্য হয়ে বাড়ি ফিরে এলাম। এইভাবে টানা বারোদিন দুই বেলা আশ্রমে গিয়ে স্বামীজির কৃপালাভে বঞ্চিত হলাম। তিনি একটু বসবার অনুমতি পর্যন্ত দিলেন না। স্বামীজির কৃপা না পেয়ে মনে মনে ভীষণ হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। নিজেকে বড় তুচ্ছ মনে হতে লাগল, এ জগতে আমার মতো তুচ্ছ জীব আর কেউ নেই বলে মনে হচ্ছিল। কত পাপ করেছি যার জন্য স্বামীজি আমাকে তাঁর কাছে বসতে দিতেও রাজি নন, দেখতে পেলেই তাড়িয়ে দেন—এইসব ভাবনা আমাকে ব্যাকুল করে তুলল। নিজেকে বড় অসহায় এবং হীন বলে মনে হচ্ছিল।

তা সত্বেও পরের দিন সকালে আমি আবার আশ্রমে গেলাম। স্বামীজিকে প্রণাম করার পর নিজেকে আর সংযত রাখতে পারলাম না। আমি তাঁর সামনেই কেঁদে ফেলেছিলাম। আমার এই কাতরতায় স্বামীজিও বোধহয় কিছুটা নরম হয়ে আমাকে বসবার অনুমতি দিলেন। স্বামীজির কাছে বসবার পর তিনি আমায় ইঙ্গিতে শান্ত হতে বললেন। কিন্তু তাঁর এই অযাচিত করুণা আমাকে আরও নরম করে ফেলল। আমি তাঁর চরণ দুটি ধরে একবারে কান্নায় ভেঙে পড়েছিলাম। পরিতাপে আমার হৃদয় তখন মথিত হচ্ছিল। আমার এই অবস্থা দেখে স্বামীজি মঙ্গলদাসজিকে কাছে ডেকে ইঙ্গিতে বললেন, একে এখন চলে যেতে বলো, কাল সকালে ওকে আসতে বলে দিও। তিনিও স্বামীজির নির্দেশ আমাকে বুঝিয়ে দিলেন। স্বামীজির আদেশের কথা শুনে আমার মন শান্ত হল, হৃদয়ে আনন্দের জোয়ার বয়ে গেল। আমার আশা অবশেষে পূর্ণ হবে ভেবে মনটা একদম শীতল হয়ে গিয়েছিল। দুপুরের কিছু আগে বাড়ি ফিরে এলাম। এবং পরদিন সকালের প্রতীক্ষায় আমার সময়গোনা শুরু হল।

পরদিন সকালে পঞ্চগঙ্গায় স্নান করে পূর্ণউৎসাহে আশ্রমে পৌঁছোলাম। এরপর স্বামীজিকে প্রণাম করে তাঁর চরণযুগল মাথায় ঠেকিয়ে সেই চরণধূলা সারা শরীরে লাগিয়ে তাঁর বেদির নীচে বসলাম। কিছুক্ষণ কেটে

যাওয়ার পর স্বামীজি মঙ্গলদাসকে ডেকে কিছু আনতে ইঙ্গিত করলেন। ভেতর থেকে একটা পাথর, গেরিমাটি এবং একলোটা জল আমার সামনে রেখে ভট্টজি বললেন, বাবা, আপনাকে গেরিমাটি ঘসতে বলেছেন। আমিও মনের আনন্দে কাজে লেগে পড়লাম। দুপুরের কিছু আগে স্বামীজি ইঙ্গিতে ওই ঘসা গেরিমাটি একটা পাথরের বাটিতে তুলে বাড়ি গিয়ে খেয়ে আসতে বললেন।

খাওয়া-শেষ করে আবার আমি আশ্রমে চলে এলাম। শুরু হল গেরি ঘসার কাজ। বিকেল বেলায় একজন ব্রহ্মচারী আশ্রমে এলেন। তিনি সেখানে আসা মাত্র স্বামীজি তাঁর হাতে একটি কাগজ তুলে দিলেন। সেই ব্রহ্মচারী ওই গেরিমাটি ভর্তি বাটিটা হাতে নিয়ে স্বামীজির আদেশ মতো দেবনাগরী হরফে ওই কাগজে লেখা শ্লোকগুলি দেওয়ালে লিখতে শুরু করলেন। সন্ধ্যার সময় আমার ঘসা গেরিমাটি বাটিতে তুলে রেখে বাড়ি চলে যেতে বললেন স্বামীজি। তাঁর নির্দেশ পালন করে আমি বাড়ি ফিরে গেলাম।

পরদিন সকালে যথারীতি স্নান করে আশ্রমে পৌঁছে স্বামীজিকে প্রণাম করলাম। তিনি আবার গেরিমাটি ঘসার সংকেত করলেন। আমিও কাজ শুরু করলাম। মাঝে মাঝে হাতে ব্যথা হওয়ার জন্য যেই না থেমেছি সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজি মুখ গম্ভীর করে, নিজের হাত জোরে জোরে ঘুরিয়ে ওইভাবে ঘসতে ইঙ্গিত করলেন। তাঁর ওই রকম গম্ভীর মূর্তি দেখে হাত থামাবার সাহস আর আমার হল না। দুপুরবেলা পাথরের বাটিতে ঘসা গেরিমাটি তুলে বাড়ি ফিরে গেলাম। বিকেলে আশ্রমে পৌঁছেই গেরি ঘসার কাজ শুরু করে দিলাম। বিকেল বেলায় ওই ব্রহ্মচারী আশ্রমে এসে আগের দিনের মতো তিনি তাঁর কাজ শুরু করলেন।

এইভাবে পনেরো দিন দু-বেলা গেরি ঘসে ঘসে আমার দু-হাত অবশ হয়ে গেল। দু-হাতের জোর একবারে কমে গিয়েছিল। খাবারের সময় হাত মুখে তুলতেও বড় কষ্ট হচ্ছিল। নিজের অদৃষ্টের কথা ভেবে খুবই দুঃখ পেতাম। মনে হত যেমন অদৃষ্ট তেমনিই কাজ পেয়েছি। তবে স্বামীজির কাছে মুখ ফুটে সে কথা বলার সাহস আমার ছিল না। এইভাবে দুবেলা গেরি ঘসার কাজ চলতেই থাকল। এবং সেই ব্রহ্মচারী বিকেলে আশ্রমে এসে আমার ঘসা গেরিমাটি দিয়ে দেওয়ালে দেবনাগরী হরফে শ্লোক লিখে যেতেন। তিনি একাজে বিন্দুমাত্র বিরক্ত না হলেও ক্রমশ আমার হাতদুটি সবরকম কাজেই অচল হয়ে পড়ল।

কেটে গেল আটাশ দিন। উনত্রিশ দিন, সকালবেলায় পঞ্চগঙ্গায় স্নান করে স্বামীজিকে ভক্তিভরে প্রণাম করলাম। তারপর তাঁর পদতলে বসে ভাবতে শুরু করলাম—আজ যদি আমার ওপর গেরি ঘসার আদেশ হয় তাহলে আমি কোনওভাবেই তা করতে পারব না। কারণ আমার দুটো হাতে আর কোনও জোর অবশিষ্ট নেই। মুখে খাওয়ার তুলে খেতেও প্রাণান্তকর অবস্থা হচ্ছিল। এই অবস্থায় স্বামীজি যদি গেরিমাটি ঘসার হুকুম দেন এবং আমি যদি রাজি না হই তাহলে তো তিনি আমাকে অবশ্যই তাড়িয়ে দেবেন। আমার সমস্ত আশা-ভরসা আজ শেষ হয়ে গেল। এই অশুভ চিন্তাস্রোত আমাকে কিছুক্ষণের মধ্যে আচ্ছন্ন করে ফেলল, কখন যে বাঁধ ভাঙা অশ্রু বন্যার আকার ধারণ করে চোখের সীমানা পার হয়ে দু-গাল বেয়ে ঝরে পড়তে শুরু করল তা নিজে বুঝতেও পারিনি। বেশ কিছুক্ষণ বাদে স্বামীজি আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে মঙ্গলদাসজিকে ইশারায় কাছে আসতে বললেন, তিনি সামনে আসা মাত্র স্বামীজি ইশারায় আমি দেবনাগরী পড়তে পারি কি না জানতে বললেন। দীর্ঘদিন স্বামীজির সঙ্গে থাকার ফলে মঙ্গলদাসজি তাঁর গুরুদেবের সমস্ত ইশারাই খুব ভালোভাবে বুঝতে পারতেন। আমার কাছে তিনি স্বামীজির করা প্রশ্নের উত্তর জানতে চাইলেন। আমি বললাম, হ্যাঁ, আমি পড়তে পারি।

আমার মুখে হ্যাঁ শোনার পর স্বামীজি কম্বলের তলা থেকে একটা বড় বাঁশের চোঙা বের করে আমার হাতে দিলেন। তারপর আমায় কি করতে হবে তা বুঝিয়ে দেন মঙ্গলদাসজি। ওই চোঙার ভেতরে দেবনাগরী হরফে শ্লোক লেখা ছিল। সেই শ্লোকগুলি আমায় বাংলায় অনুবাদ করতে হবে। মঙ্গলদাসজি কাগজ, দোয়াত ও কলম এনে দিলেন। আমিও আমার কাজ শুরু করলাম। একটা করে পাতা শেষ হয় আর আমি সেই পাতার শেষদিকে নিজের নামটা লিখে পাশে রাখতে শুরু করলাম। পাঁচদিন, দুবেলা লেগেছিল সমস্ত শ্লোক বাংলায় অনুবাদ করতে। কাজ শেষ হওয়ার পর স্বামীজিকে সে কথা জানানো মাত্র তিনি সেগুলো পড়তে

বললেন। আমার পড়া হয়ে যাওয়ার পর তিনি আরও একটি বাঁশের চোঙা আমার হাতে দিলেন। এটি আগের থেকে আকারে একটু ছোট। এই চোঙার শ্লোকগুলি শেষ করতে আমার তিনদিন সময় লেগেছিল। লেখা শেষ হওয়ার পর তিনি পুরোটা শুনে আমার লেখা বাংলা অনুবাদের কাগজগুলি চোঙায় পুরে কম্বলের তলায় রেখে, বাড়ি চলে যাওয়ার ইঙ্গিত করলেন।

আহারাদি সেরে আশ্রমে এসে স্বামীজিকে প্রণাম করে তাঁর কাছে বসলাম। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বেদির ওপর শুয়ে পড়লেন। তখনিই আমার মনে হল, আজ আমাকে আর কোনও কাজ স্বামীজি দেবেন না। তাই তাঁর চরণধুলো আমার মাথা ও সর্বাঙ্গে মাখিয়ে স্বামীজির পা টিপতে শুরু করলাম। স্বামীজি কোনও বাধা না দেওয়াতে মনের জোর যথেষ্ট বেড়ে গিয়েছিল। ঠিক করলাম, স্বামীজি উঠলেই আজ আমি আমার প্রশ্নের উত্তর অবশ্যই জানব। সন্ধ্যার মুখে তিনি উঠে বসলেন, এবং মঙ্গলদাসজির মাধ্যমে আমাকে, পরদিন সকালে নয় সন্ধ্যার সময়ে আশ্রমে যাওয়ার আদেশ করেন। আমি সেদিন প্রায় আনন্দে নাচতে নাচতে বাড়ি ফিরে এলাম। আমার সমস্ত কষ্ট সেইমুহূর্তে দূর হয়ে গিয়েছিল।

পরের দিন সন্ধ্যার মুখে আমি আশ্রমে গেলাম। প্রথমে আশ্রমে প্রতিষ্ঠিত মহাদেব ও মা কালীর আরতি দর্শন করে স্বামীজির পাশে গিয়ে বসলাম। তাঁকে প্রণাম করা মাত্র তিনি আমাকে নিয়ে তাঁর শয়ন বেদির নীচে অবস্থিত ছোট ঘরটিতে প্রবেশ করলেন। ওই ঘরে একটি ছোট আসন ও প্রদীপ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তিনি ওই আসনটিতে বসলেন, আর আমি তাঁর সামনে।

আমার জন্য সেদিন তিনি মৌনব্রত ভঙ্গ করে ধীর স্বরে বললেন, 'তুমি যে বিষয় জানবার জন্য আমার কাছে এসেছ সেটি নিয়ে তোমার এত সংশয় কেন!' বিষয়টি হল একটি প্রশ্ন, যার প্রকৃত সমাধান তত্ত্বজ্ঞ, ত্রিকালদর্শী, সিদ্ধ মহামানবই করতে পারেন। অনেকদিন ধরেই প্রশ্নটি আমাকে উতলা করছিল। প্রভুর কী অসীম কৃপা, তিনি সেই প্রসঙ্গেই বিস্তারিত ভাবে বলতে থাকলেন। আমি এক অবাক শ্রোতা। আমার এতকালের সংশয় দূর হল। তিনি বললেন দেখ—''ত্রিকালদর্শী, আত্মতত্ত্বজ্ঞ, মহর্ষি, দেবর্ষি, সিদ্ধ, মহাত্মাগণ তপোবলে, জ্ঞানবলে ও যোগবলে যে সকল চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন তাহাতে কি সংশয় করিতে আছে? তাঁহারা যাহা বলিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ সত্য। জীবের সুকৃতি ও দুষ্কৃতি অনুসারে সুখদুঃখ ভোগ করিবার জন্য জন্ম-জন্মান্তর পরিগ্রহ করিতে হয় ইহাও সম্পূর্ণ সত্য। মনুষ্যমাত্রেই যদি একটু চিন্তা ও চেষ্টা করে তবে পূর্বজন্ম, বর্তমান জন্ম ও ভবিষ্যৎ জন্ম এই তিন জন্মের সংবাদ সহজে অবগত হইতে পারে এবং স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইতেছে তাহাও বেশ বুঝিতে পারে। দুঃখের বিষয় আসল তত্ব জানিবার বা বুঝিবার কাহারও চেষ্টা নাই। আমি তোমাকে যাহা বলিব বা বুঝাইব তাহাই যে সত্য হইবে তাহার প্রমাণ কি? এবং তাহাই তোমার বিশ্বাস হইবার কারণ কি? তুমি যখন আমার নিকটে আসিয়া এবং এত কষ্ট স্বীকার করিয়াছ তখন আমি তোমাকে পুনর্জন্ম ভালোরূপ বুঝাইয়া দিব্য চক্ষে দেখাইয়া দিব। প্রথমে তোমার পূর্ব ঘটনা কতকগুলি আমি বলিব, যাহা তুমি ভিন্ন এখানে আর কেহই জানে না, যদি তাহা তোমার প্রত্যয় হয় ও সত্য বলিয়া বিশ্বাস হয় তবে আমি পরে যাহা বলিব, যাহা তুমি জান না, যাহা জানিবার জন্য এত ব্যাকুল হইয়াছ, নিশ্চয়ই সত্য বলিয়া প্রত্যয় হইবে। দেখ লোকের যখন পুনর্জন্ম হয় তখন ইহজীবনের মালমশলা অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মার সমষ্টি লইয়া গঠন হয়। সেজন্য ইহজীবনে যে বিদ্বান, পরজন্মে সে নিশ্চয় বিদ্বান হইবে। ইহজীবনে যে ভাল বাজাইতে পারে পরজন্মে সে নিশ্চয় ভাল বাজাইতে পারিবে। ইহজীবনে যিনি ধার্মিক, পরজন্মে তিনি নিশ্চয় ধার্মিক হইবে। ইহজীবনে যে চোর পরজন্মে সে কখনই সাধু হইতে পারে না। যদি একটু ভাবিয়া দেখ তবে বেশ বুঝিতে পারিবে যে যদি পরকাল না থাকিত তবে ভগবানকে দয়াময় ও সর্বশক্তিমান বলা যাইতে পারিত না। সকলকেই বলিতে হইত যে, ঈশ্বর যত অবিচার করেন এত অবিচার কোনও পাপিষ্ঠ মনুষ্যের দ্বারাও সম্ভব নয়। যদি কেবলমাত্র এক জীবন অর্থাৎ ইহজীবনই শেষ জীবন হইত তাহা হইলে কেহ রাজা, কেহ প্রজা, কেহ ধনী, কেহ নির্ধন, কেহ বেহায়া, কেহ মেথর; তাহা ব্যতীত, কেহ রোগী, কেহ নীরোগ এবং কেহ মহা ঐশ্বর্য ভোগ করিতেছেন, কেহ অতি কষ্টে জীবনযাত্রা নির্বাহ

করিতেছেন, জীবনের এত প্রভেদ কেন? কোনো প্রকার অন্যায় কার্য না করিলে কোনো প্রকার দণ্ড কখনওই ভোগ করিতে হয় না। ঈশ্বরের কি তবে কোনো প্রকার ভালোমন্দ বিচার নাই? যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতেছেন? কখনওই না। এমন সুবিচার করিবার কাহারও সাধ্য নাই, এই সকল বিষয় কাহারও বোধগম্য নহে বলিয়াই তাঁহারই উপযুক্ত। কর্মফল অনুসারে জীবনের এত প্রভেদ হইয়া থাকে। ইহা জীবনের আকৃতি, বর্ণ, বিদ্যা, বুদ্ধি, স্বভাব এবং কর্মফল ইত্যাদির পরমাণু সমষ্টি, আত্মা ও জীবাত্মা লইয়া পরজন্মের গঠন হইয়া থাকে সেই জন্যেই লোকে নানা প্রকার আকৃতি, নানা প্রকার অবস্থা ও নানা প্রকার কর্মফলের অধীন হইয়া নানা প্রকার ঐশ্বর্য ও সুখদুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। যেমন দর্পণে মুখপ্রতিবিম্ব প্রশান্তভাবে দেখিলে প্রশান্তমূর্তি দেখায়, বিকটভঙ্গি করিয়া দেখিলে বিকটাকার দেখা যায়। সেই প্রকার লোকে সোজা পথে থাকিয়া কোনো প্রকার অন্যায় কার্য না করিলে এখন যে অবস্থা আছে পরেও ঠিক সেই অবস্থা প্রাপ্ত হয়। বিকটাকার অর্থাৎ অন্যায় বা অসৎ কার্য করিলে নীচগামী হইতে হয় আর সৎকর্ম ও ধর্মচর্চা করিলে আত্মার উন্নতি হইয়া উত্তম অবস্থা প্রাপ্ত হয়, ইহাতে আর সন্দেহ কি? তুমি যদি চুরি কর তবে রাজদ্বারে অবশ্য তোমার শাস্তি হইবে। যদি কখনও চুরি বা কোনো প্রকার অসৎকর্ম না কর তবে তোমার জীবনের মধ্যে কাহার সাধ্য তোমাকে কোনো প্রকার শাস্তি দেয়? যেমন পীড়া হইলে ডাক্তার এবং ঔষধ প্রয়োজন হয় তেমনই পীড়া না হইলে ডাক্তার বা ঔষধ কিছুমাত্র প্রয়োজন হয় না। এক্ষণে বেশ বিবেচনা করিয়া দেখ তুমি কী প্রকার বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ—তোমার আকৃতি, বিদ্যা, বুদ্ধি, স্বভাব ইত্যাদি কী প্রকার পাইয়াছ তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে পূর্বজন্মে তুমি কী প্রকার অবস্থার ও কেমন স্বভাবের ছিলে। বর্তমান জীবনে বেশ দেখিতে পাইতেছ। ইহজীবনে ভালো-মন্দ কার্য যাহা কিছু করিয়াছ তাহা তুমি বেশ জান। ভালো কার্য করিলে ভালো হয়, মন্দ কার্য করিলে মন্দ হয়। পূর্বজন্মের সুকৃতির বলে এ জন্মে ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। যদি ব্রাহ্মণোচিত সৎকার্য করিয়া যাও ও সৎপথে থাক তবে আত্মোন্নতি করিতে পারিবে, আর যদি সেরূপ না করিয়া পাপাচারী হও এবং অন্যায় কাজ কর তবে চণ্ডালের ঘরেও জন্ম হইতে পারে। আর ভালোমন্দ কিছুই না করিলে যেমন অবস্থা তেমনই থাকে। পরজন্মে কি প্রকার জন্ম হইবে এক্ষণে তুমি নিজেই তাহা স্থির করিতে পারিবে। অপর কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিবার কিছুমাত্র আবশ্যক হইবে না। এ বিষয় পরে ভালোরূপে বুঝাইব। এক্ষণে তোমার দৃঢ় বিশ্বাসের জন্য কিছু বলিব।''

স্বামীজির এই অমৃতবাণী শুনে উমাচরণবাবু কার্যত স্তম্ভিত। কারণ তিনি কী উদ্দেশ্যে কাশীধামে স্বামীজির কাছে এসেছেন তা তখনও বলে উঠতে পারেননি। অথচ স্বামীজি তাঁর মনের কথা কোন অলৌকিক ক্ষমতায় জেনে ফেললেন তা ভেবে উমাচরণবাবু অত্যন্ত আনন্দিত ও আপ্লুত হয়েছিলেন। ত্রৈলঙ্গ স্বামী যে একজন সর্বান্তর্যামী, আত্মজ্ঞ যোগী সেই বিশ্বাস আরও দৃঢ় হল। তিনি মনে করতে শুরু করলেন—স্বামীজি এতক্ষণ যা বললেন এবং পরে যা বলবেন তা ধ্রুব সত্য। তাঁর কথা কখনও মিথ্যা হতে পারে না।

এরপর স্বামীজি বললেন, ''তোমার নাম অমুক, তোমার পিতার নাম অমুক, তোমার নিবাস অমুক গ্রামে, তোমার বাসগৃহে এতগুলি ঘর আছে, বাড়ির অমুক দিকে একটি পুকুর আছে, তাহার নিকট অমুক অমুক বৃক্ষ আছে, এবং বাড়িতে অমুক অমুক বাস করিয়া থাকেন।'' স্বামীজিকে অতি সুপরিচিতের ন্যায় এই সকল কথা বলিতে শুনিয়া আমি অবাক হইয়া গেলাম। পুনরায় যখন স্বামীজি বলিলেন, ''তুমি পূর্বজন্মে ব্রাহ্মণ ছিলে, অমুক গ্রামে অমুক নামে একজন বিখ্যাত জমিদার ছিলে। তুমি বড় শিষ্টাচারী ছিলে, দ্বিতলের উপর দক্ষিণদ্বারি তোমার শয়ন ঘরের ভিতর দরজার উপর তোমার নিজের লেখা তিনটি সংস্কৃত শ্লোক এখনও আছে। সুবিধামতো যাইয়া দেখিয়া আসিয়ো।''

শ্লোক তিনটি—

১) বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোহপরানি।
তথা শরীরনি বিহায় জীর্ণ্যণ্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।।

(মনুষ্য যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নতুন বস্ত্র গ্রহণ করে সেইরূপ দেহী জীর্ণ শরীর পরিত্যাগ করিয়া নূতন শরীর আশ্রয় করে।)

২) রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজু কুটিলনানাপথজুষাং।
নৃণামেকা গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব।।
(নদী সমুদয় নানা পথগামী হইলেও পরিণামে যেমন এক সমুদ্রে বিলীন হয়, সেইরূপ মনুষ্যের প্রবৃত্তি ও উপাসনার পথ পৃথক হইলেও পরিণামে ব্রহ্মপ্রাপ্তি সকলেরই উদ্দেশ্য হয়।)

৩) নির্মমস্যাপ্রমেয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
সাধকামাংহিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা।।
(ব্রহ্ম অহংকার ও পরিণামশূন্য, নিত্যশুদ্ধ, শরীরহীন হইলেও সাধক সকলের মঙ্গলের জন্য তাঁহার নানাবিধ রূপ কল্পিত হইয়া থাকে।)

স্বামীজি এরপর বললেন, "দেখ অমুক গ্রামে অমুক নামে যে লোকটি বাস করেন তিনি তোমাকে অতিশয় ভালোবাসেন; তুমিও তাঁহাকে অন্তরের সহিত ভালোবাস এবং স্নেহ করো, ইহার কারণ কী জান? তিনি তোমার পূর্বজন্মের পিতা ছিলেন। তুমি পুত্র তিনি পিতা বলিয়া পূর্বের যেমন স্নেহ তেমনি আছে, কেবল দেহ পরিবর্তন হেতু কেহ কাহাকেও চিনিতে পারিতেছ না। আর তোমার খুল্লতাত অমুক নাম ধারণপূর্বক মুঙ্গেরেই আছেন। তিনি তোমাকে অতিশয় ভালোবাসেন; তন্নিমিত্ত প্রত্যহ সন্ধ্যার পর তোমার নিকট আসিয়া রাত্রি ৯টা-১০টা পর্যন্ত থাকেন। তোমাকে একবার না দেখিলে তাঁহার মনে শান্তি হয় না। তুমিও তাঁহাকে অতিশয় ভক্তি করিয়া থাক, ইহার কারণ কেবল পূর্বজন্মের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, স্নেহ যেমন সেইরূপই আছে দেহ পরিবর্তন হইয়াছে মাত্র।" শেষে বলিলেন, "এ সকল কথা বলিবার বিশেষ কোনও আবশ্যক ছিল না, কেবল আমি পরে যাহা বলিব তাহা যে নিশ্চয় সত্য তাহা তোমার বিশ্বাসের জন্য বলিতে হইল। তোমার যাহাতে কোনও প্রকার সন্দেহ না থাকে সেই প্রকারে বুঝাইয়া দিব।"

স্বামীজি বলিলেন, "উমাচরণ! তোমার পূর্বজন্মের সুকৃতিগুণে অবকাশ লইয়া কাশীধামে আসিয়াছ। ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, নিজোচিত সৎকার্যের অনুষ্ঠান কর, যেন জন্মজন্মান্তরে আর কোনও প্রকার যন্ত্রণা ভোগ করিতে না হয়। তুমি যদি ভালোরূপে এবার জীবন অতিবাহিত কর তবে পুনর্জন্মে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে। বাসনা ত্যাগই মুক্তির সোপান। বাসনা ত্যাগ করিতে না পারিলে মুক্তির আশা নাই।"

সেদিন তাঁর কীরকম অবস্থা হয়েছিল তার খুব সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন উমাচরণ মুখোপাধ্যায়। তিনি বলছেন, "স্বামীজির এই সব অলৌকিক কথা শুনে আমি কীরকম যেন হয়ে পড়লাম। আমি নিস্তব্ধ ও চমৎকৃত হয়েছিলাম। আমার জন্ম-জন্মান্তর নিয়ে আর বিন্দুমাত্র কোনও সন্দেহ রইল না। সেদিন মনে মনে যে কথাটি ভেবেছিলাম তা হল—অসীম করুণার প্রতিমূর্তি আমাদের স্বামীজি। তিনি দয়ার সাগর, তবু আমাকে প্রথমে কেন এত কষ্ট দিলেন! কষ্ট না করলে কি সুখের সন্ধান পাওয়া যায় না!

কথায়-কথায় কখন যে রাত কেটে গেল তা আমি বুঝতেই পারিনি। একসময় স্বামীজি বললেন, "তুমি বাড়ি গিয়ে প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে তাড়াতাড়ি আশ্রমে চলে এস। আজ আমরা একসঙ্গে স্নান করতে যাব।" আমি স্বামীজির আদেশমতো তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে গেলাম। কিন্তু মনটা পড়ে রইল স্বামীজির চরণপ্রান্তে। আশ্রমে ফিরে আসা মাত্র তিনি আমায় নিয়ে স্নান করতে বেরোলেন। সেদিন আমরা পঞ্চগঙ্গা ঘাটে গিয়েছিলাম। স্নানে নেমে তিনি আমায় বললেন, "উমাচরণ, আজ রাতে আসার সময় সঙ্গে একটা খাতা এনো। আমি তোমাকে কিছু উপদেশ দেব। তুমি সেগুলো লিখে নিও। এইসব উপদেশে তোমার খুবই উপকার হবে। খাতা না আনলে তুমি শুধু শুনে সবকিছু মনে রাখতে পারবে না। এরপর তোমাকে আর বহু

ধর্মশাস্ত্র পড়তে হবে না। আমি তোমাকে যা লিখিয়ে দেব সেগুলো নিয়মিত পড়ে মনে রাখতে পারলে তোমার কার্যসিদ্ধি হবে। তোমার জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে।'' স্বামীজি আরও বললেন, ''জীবদের মুক্তি অপেক্ষা সারবস্তু আর কিছুই নাই, আত্মজ্ঞান অপেক্ষা আর জ্ঞান নাই, সেই মুক্তি ও আত্মজ্ঞান লাভ করিবার জন্য বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার কোনও প্রয়োজন হয় না, কেবল আসল কথা জানিতে পারিলেই কার্য সিদ্ধি হয়। মুক্তি ভিন্ন মানবের গতি নাই। সর্বদা মুক্তি কামনা করিবে, যতদিন না জ্ঞানের উদয় হয়, ততদিন কেবল যাতায়াত ও যন্ত্রণাভোগ করিতে হয়। পৃথিবীতে যাহা কিছু দেখিতেছ বা করিতেছ সমস্তই ভুল। সংসারে রাজা অথবা প্রজা কাহারও কোনও প্রকার নির্মল সুখভোগ করিবার ক্ষমতা নাই।''

স্বামীজির মুখনিঃসৃত এইসব অমৃতবাণী শুনে উমাচরণবাবু ভীষণই আপ্লুত ও আনন্দিত হয়েছিলেন। এরপর শুরু হল জলকেলি। স্বামীজি তখন আবার মৌনী। তিনি হঠাৎই জলের ওপর চিৎ হয়ে ভাসতে লাগলেন। তারপর কোনও অঙ্গ সঞ্চালন না করে স্রোতের বিপরীত দিকে ভেসে গেলেন। এইভাবে কিছুদূর যাওয়ার পর তিনি হঠাৎই জলের তলায় অদৃশ্য। এইভাবে কেটে গেল ঘণ্টাদুয়েক সময়। তারপর হঠাৎই তিনি ভেসে উঠলেন উমাচরণবাবুর অদূরেই।

স্বামীজি জল থেকে উঠে ঘাটের ওপর এসে বসলেন। উমাচরণবাবু লিখছেন, 'আমি তাঁর গা মুছিয়ে দিলাম। কিছুক্ষণ ওইভাবে বসে থাকার পর স্বামীজি ও আমি আবার আশ্রমে ফিরলাম। তিনি তাঁর বেদির ওপর উঠে বসলেন এবং আমি মেঝেতে তাঁর চরণপ্রান্তে। একসময় স্বামীজি বাড়ি ফিরে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। ফেরার পথে আমি একটা খাতা সংগ্রহ করে বাড়ি ফিরলাম।

সন্ধ্যার কিছু আগে খাতা নিয়ে আমি আশ্রমে উপস্থিত হলাম। আরতি শেষ হওয়ার পর আগের দিনের মতো তিনি আমাকে নিয়ে সেই ক্ষুদ্র ঘরে প্রবেশ করলেন। তিনি আসনে এবং আমি তাঁর সামনে। স্বামীজি ধীর কণ্ঠে বললেন, 'আমি তোমাকে বারোটি বিষয় বোঝাব, তুমি সেগুলো খাতায় লিখে নেবে। সৃষ্টির শুরুতে জগৎ-এ ঈশ্বর ভিন্ন কেউ ছিলেন না। প্রথমে তাঁহার বিষয়ে বলব, এরপর আমি সৃষ্টি, সংসার, গুরু ও শিষ্য, চিত্তশুদ্ধি, ধর্ম, উপাসনা, পুনর্জন্ম, আত্মবোধ, তন্ময়ত্ত, কয়েকটি সারকথা ও তত্বজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। এই বিষয়গুলি বুঝতে পারলে তোমার কোনও চিন্তা থাকবে না। প্রচুর জ্ঞান লাভ করবে।'

উমাচরণ মুখোপাধ্যায় লিখছেন, 'তিনি ঈশ্বর বিষয়ে বলতে শুরু করলেন এবং আমি তখন লিপিকার। এইভাবে তিনি তেরো রাত ধরে আমাকে বারোটি বিষয় লিখিয়ে দিলেন। লেখা শেষ হওয়ার পর স্বামীজি বললেন, এরপর তোমার আর কোনও ধর্মশাস্ত্র পড়ার দরকার নেই। মনে রেখো এইসব বিষয় নিয়ে অনেক পড়াশুনা করলে মনের ঠিক থাকে না, মনে নানাপ্রকার সন্দেহ উপস্থিত হয়।'

সেদিন স্বামীজি উমাচরণবাবুকে বলেছিলেন, 'তোমার দেবতত্ব বিষয়ে অবশ্যই কিছু জানা দরকার। তোমাকে আরও বারোটি বিষয় লিখতে হবে। তুমি আরও একটি খাতা নিয়ে আমার কাছে কাল রাতে আসবে।' ''স্বামীজির আদেশ মতো আরও একখানি খাতা নিয়ে পরদিন সন্ধ্যার পর আশ্রমে গেলাম। আরতির পর তিনি আমাকে নিয়ে ওই ঘরে প্রবেশ করলেন। এবং সেই রাত্রে তিনি আমাকে বারেটি বিষয় লিখিয়ে দিয়েছিলেন। বিষয়গুলি হল—'কৃষ্ণলীলা,' 'রামলীলা,' 'সীতাহরণ', 'রামরাবণের যুদ্ধ', 'সমুদ্রমন্থন', 'ইন্দ্র', 'বায়ু', 'বরুণ', 'গৌতম', 'তীর্থভ্রমণ', 'আহার এবং পরিধান', 'শুচি ও অশুচি'। লেখা শেষ হওয়ার পর স্বামীজি তাঁর লেখা একখানি গ্রন্থ 'মহাবাক্য রত্নাবলী' আমার হাতে দিয়ে বলেছিলেন, এই বইটি এবং আমি যেগুলো লিখিয়ে দিলাম তা মাঝে মাঝে পড়বে। এতে তোমার উপকার হবে।''

এই দেবতত্ব বিষয়ে আমার কিছু প্রশ্ন মনে জাগছে। ত্রৈলঙ্গ স্বামীজি ত্রিকালজ্ঞ মহাপুরুষ। তিনি ছিলেন কাশীর সচল বিশ্বনাথ। স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেব তাঁর শরীরকে আশ্রয় করে বাস করতেন। তাঁর মতো মহাপুরুষ দেবতত্ব নিয়ে বলতে গিয়ে কৃষ্ণলীলা, রামলীলা, সীতাহরণ, রামরাবণের যুদ্ধ প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করবেন বলে মনে হয় না। এক্ষেত্রে কোনও একটা সমস্যা হয়েছিল কি? সেইরকম সন্দেহই মনে জাগে। এই অংশটুকু খুব সম্ভবত মহাত্মা উমাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখেছিলেন বলে মনে হয় না।

উমাচরণবাবুর লেখা 'তত্ববোধ' গ্রন্থটি যাঁরা পড়েছেন তাঁরাও আমার সঙ্গে সহমত হবেন। খুব সম্ভবত স্বামীজি যা বলেছিলেন তা উমাচরণবাবু তত্ববোধ নাম দিয়ে লিখেছিলেন। এই গ্রন্থটি বাংলা ১৩২৪ সন, ইংরেজি ১৯১৭ সালে উমাচরণবাবুর পুত্র যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের তত্বাবধানে প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থে উনত্রিশটি বিষয় নিয়ে আলোচিত হয়েছে। বিষয়গুলি হল—১) বিশ্ব বা জগৎ, ২) আর্যভূমি ভারতবর্ষ, ৩) অহংতত্ব, ৪) দর্শন, ৫) ত্রিবেণী, ৬) কাল, ৭) ব্যোম বা আকাশ, ৮) শব্দ ও নাদ, ৯) বাক্য, ১০) প্রকৃতি, ১১) শক্তি, ১২) মায়া, ১৩) প্রাণ, ১৪) মন, ১৫) বুদ্ধি, ১৬) চিত্ত, ১৭) তত্বসার। এই পুস্তকের দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিষয়গুলি ১) কুমার দেবব্রত, ২) সিদ্ধাশ্রম, ৩) ব্রহ্মচর্য, ৪) সন্ন্যাস ও আনন্দ, ৫) স্বাধীন ও পরাধীন, ৬) সত্য, ৭) চৌর্য, ৮) শরীর, ৯) ব্যাধি, ১০) জরা, ১১) মৃত্যু, ১২) শ্মশান।

ত্রৈলঙ্গ স্বামীজিতে যিনি বর্তমানে তন্ময় হয়ে আছেন এবং শঙ্করী মাতাজির গ্রন্থটির প্রকাশক অমরনাথ পোদ্দার মহাশয়ের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। তিনিও আমার সঙ্গে সহমত প্রকাশ করে বললেন—'আমারও সেইরকম মনে হয়েছিল। আমার গুরুদেবের সঙ্গে উমাচরণবাবুর পৌত্র বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের যোগাযোগ হয়েছিল। তাঁর কাছে 'তত্ববোধ'-এর একটি মাত্র কপি ছিল। তিনি সেটি পড়তে দিয়েছিলেন। এই বিষয়ে তাঁর মনেও সন্দেহ জেগেছিল। তিনি বলেছিলেন, সেইরাতে স্বামীজি দাদুকে যা বলেছিলেন তিনি তা এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছিলেন।'

দেবতত্ব প্রসঙ্গে স্বামীজি উমাচরণবাবুকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন, তা আমরা কেউই জানি না। মানে কোথাও সে বিষয়ে কিছু লেখা নেই। অথচ 'তত্ববোধ' বইটির অস্তিত্ব নিয়ে আমাদের কারও মনে কোনও সন্দেহ নেই। প্রতিটি পরিচ্ছেদের প্রতিটি বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এই গ্রন্থে। তত্ববোধ-এর শেষ পরিচ্ছেদ শ্মশান থেকে কিছুটা অংশ তুলে দিলাম। স্বামীজির সেই উপদেশ পড়ে মনে মৃত্যুভয় জাগে না। বরঞ্চ মনে পড়ে যায় প্রয়াত রামকুমার (দাদু) চট্টোপাধ্যায়ের সেই বিখ্যাত গান—'ভবে কে বলে কদর্য শ্মশান, সে যে পরম পবিত্র পরম যোগের স্থান'-এর কথা।

অধ্যায় শ্মশান : 'বিশ্ব-নাট্যের বিরামস্থান শ্মশান। অভিমান, গর্ব্ব, দুঃখ, শোক, তাপ, আধি, ব্যাধি, জ্বালা, যন্ত্রণার অবসান-নিকেতন, ধনী, নির্ধন, দুঃখী, সুখী, রাজা, প্রজা, দীন, ভিখারি যেখানে সমভাব, তাহারই নাম শ্মশান। বিশ্ব একটি মহাশ্মশান; কেননা জগতে অদাহ স্থান নাই, তবে কেন শ্মশানের নামে এত ভয়? পৃথিবীতে যদি কোনও পবিত্র স্থান থাকে, তাহা এই শ্মশান। যে পুতধামে, পুতমনা সদানন্দে বিরাজিত, সেই স্থানের নাম শ্মশান।

একদিন মহেশ্বর কহিলেন—দেবী! আমি পবিত্র স্থান অন্বেষণ করিয়া থাকি, কিন্তু শ্মশান অপেক্ষা কোনও স্থানই পবিত্র বলিয়া জ্ঞান হয় না। তাই শ্মশানবাস করিতে আমি নিতান্ত অভিলাষী হইয়াছি। পবিত্রস্থান-লাভাকাঙ্ক্ষী মহাত্মারা এই পরম পবিত্র শ্মশানেই সর্বদা বাস করিয়া থাকেন। যাঁহারা পবিত্রমনা, পবিত্রধাম শ্মশানেই তাঁহারা আনন্দ অনুভব করেন। এখানে ক্রোধ নাই, মাৎসর্য নাই, কাম নাই, ভয় নাই, লোভ নাই, ক্ষয় নাই, হিংসা নাই, কুটিলতা নাই, নাই অসূয়া, নাই অশুচি, সেই জন্য এই শ্মশানে মহাপুরুষেরা মহানন্দে অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন।

জীবের মহা বিশ্রামস্থান, চির শান্তিধাম এই সেই মহাশ্মশান। এই মহাশ্মশানে, মহাশয্যায়, মহাশয়নে, মহাশয়েরা তিনজনে, নির্জ্জনে, এই ঘোর নিশিতে এখানে কীসের যুক্তি করিতেছেন? এক মহাপুরুষের পাশে একটি বালক দণ্ডায়মান, বালকটি বলিতেছে পিতঃ! এসো; ক্রোড়ে একটি বালিকা শায়িত ও নিদ্রিত, মাঝে-মাঝে চমকিয়া উঠিতেছে আর বলিতেছে—বাবা! চলো, আর যন্ত্রণা সয় না। মহাপুরুষ বলিতেছেন—বৎস! এখনও নিশা অবসান হয় নাই, চতুর্দ্দিক গাঢ় নিস্তব্ধ, ঘোর অন্ধকার, আমি এ নিশায় তোকে লইয়া কোথায় যাইব? আমি কি তোদের ছেলেমানুষের কথায় যাইব? যখন আমার ইচ্ছা হইবে, যাইবার উপযুক্ত সময় বোধ করিব, তখনই তোকে লইয়া যাইব, তোর যদি যন্ত্রণা হইয়া থাকে, আয় তোর গায়ে হাত বুলাইয়া দিই। মহাপুরুষ বালিকার গায়ে হাত বুলাইয়া দিলেন, বালিকা পুনঃ নিদ্রিত হইল। বালিকা কিয়ৎক্ষণ পরে আবার

চমকিয়া উঠিয়া বলিল—পিতঃ! আর যন্ত্রণা সয় না, এইবার চলো, এ শয্যা আমার পক্ষে বড়ই যন্ত্রণাদায়ক, বাবা! তুমি প্রফুল্ল মনে কেমন করে শুইয়া রহিয়াছ? যদি তুমি না যাও, তবে আমি তোমাকে ফেলিয়া চলিয়া যাইব, আমার আর এ যন্ত্রণা সয় না, তুমি কেমন করিয়া সহ্য করিতেছ? বাবা! তুমি কি আমার কথা শুনিতে পাইতেছ না, তুমি কী ভাবিতেছ? বালিকা যথার্থই বলিয়াছে, মহাপুরুষ কি ভাবিতেছেন, মহাপুরুষকে দেখিলে বোধ হয়, যেন কী এক মহাচিন্তায় নিমগ্ন, যেন কন্যাদায়গ্রস্ত; 'মাগ নাই তার পুতের দিব্বি করা'-র ন্যায় এই মহাপুরুষও কন্যাদায়গ্রস্থ। মহাপুরুষ এবার হাসিয়া বলিলেন—তোর বিবাহের কথা ভাবিতেছি, কার সঙ্গে তোর বিয়ে দিই। তোকে বিবাহ করিতে কেহ রাজি হয় না, তুই যে বড় দুরন্ত মেয়ে। তোর নামে বিশ্বত্রাসিত, জীবমাত্রেই ভাবিত, সুরাসুরনাগলোক কম্পিত, তাই ভাবিতেছি তোকে বিয়ে করবে কে? তোর বিয়ের জন্য আমি বড় বিপদে পড়িয়াছি, তোর কাছে কেহ স্বেচ্ছায় ঘেঁসে না, তোর রাক্ষসগণ, সেইজন্য পাত্র জুটে না; যাহার সঙ্গে বিবাহ দিব, তাহাকেই খাইয়া ফেলিবি, সুতরাং বিবাহ দেওয়া আর না দেওয়া সমান ও বৃথা; যেখানে বিবাহ দিলে নিশ্চয়ই বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে, জানিয়া শুনিয়া কী প্রকারে সেখানে বিবাহ দিই। বালিকার জন্য মহাপুরুষ ত্রিভুবন খুঁজিলেন, কোথাও পাত্র মিলিল না। অগত্যা পাশের সেই বালকটির সহিত বিবাহ দিলেন। উপযুক্ত পাত্রে উপযুক্ত পাত্রী সম্প্রদান করা হইল। বালকটি স্থির যৌবন, মৃত্যুরহিত, সুতরাং বালিকাকে আর বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না। মহাপুরুষ এই বিবাহে ত্রিভুবন নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। মহা ঘটা করিয়া এই বিবাহ দিবেন স্থির করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে কেহই আসেন নাই! মনুষ্য, দেবাসুর, যক্ষ, দক্ষ, স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল হইতে কেহই বরযাত্র, কন্যাযাত্র হইয়া আসেন নাই। হরিহর বিরিঞ্চি নামে ত্রাসিত, বাজনা বাজায় কে? লক্ষ্মী, সরস্বতী, সাবিত্রী, দুর্গা ভয়ে কম্পিত, তবে হুলু বা উলু দিবে কে? দেবকন্যা কেহ ভয়ে বাহির হইলেন না, শাঁখ বাজাবে কে? পাঠক! এ বিবাহে কেহই আসিলেন না, তোমরা কেহ বরযাত্র যাইতে রাজি আছ কি? দেখো সাবধান! কন্যা দেখিলে সকলেরই চক্ষুস্থির হইবে, কেহই কিন্তু ঘরে ফিরিয়া আসিতে পারিবেন না, শেষে যেন আমি গালাগাল না খাই। সরস্বতী, সাবিত্রী প্রভৃতি দেবীরা এ বাসরে বাসর জাগিতে কেহ আসিলেন না। মা লক্ষ্মীগণ! এ বাসরে বাসর জাগিতে কেহ রাজি আছ কি? মা, মনে রাখিও এখানে আসিলে না বটে, কিন্তু একদিন এই বাসরে আসিয়া বাসর জাগিতেই হইবে। মাগো, কেহই আটক করিয়া রাখিতে পারিবে না। যাঁহাদিগকে কত ভয় কর, কত মান্য কর, কত কায়দার মধ্যে থাক, কত আধিপত্য, কত রকমের বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া সুখে দিন কাটাও, একদিন তোমার সাধের যাহা কিছু আছে, সমস্ত ত্যাগ করিয়া দীন-হীন বেশে এই বাসরে জাগিতে আসিতেই হইবে।

পাঠক মহাশয়! এই মহাপুরুষ কে, যিনি এই মহাশ্মশানে প্রফুল্লমনে বিবাহকার্য সমাধান করিতেছেন। আর ওই বালক বালিকাই বা কে? ইহাদিগকে চিনিতে পারিলেন কি? মহাপুরুষ আত্মা, সম্মুখে দণ্ডায়মান বালকটি কাল, ক্রোড়ে শায়িত বালিকাটি মৃত্যু। নিত্য বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্য ভোগ করিতেছে যে পদার্থ তাহাই কাল ও মৃত্যু; সুতরাং বালক, বালিকা বলা যায়। পুত্র, কন্যা যেমন পিতা মাতার আজ্ঞাধীন ও বশীভূত। বিশ্বে এমন কোনও প্রাণী নাই, যাহার মহাকাল ও মহামৃত্যু বশীভূত। যে কাল এবং মৃত্যু সকলকেই কেশে আকর্ষণ করিয়া বলপূর্বক লইয়া যায়, তাহারা আজ আত্মার আজ্ঞাবহ। কাল ও মৃত্যু বলিতেছে—চল, আত্মা বলিতেছেন এখন যাইব না, আমার যখন ইচ্ছা তখন যাইব, এবং মৃত্যুই বা কাহার কথায় প্রতীক্ষা করিয়াছে? সেই মৃত্যু বিষদাঁত-ভাঙা সর্পের ন্যায় শান্ত মূর্তিতে আত্মার বা পরমাত্মার আজ্ঞা প্রতীক্ষা করিয়া থাকে, তাহার ইচ্ছানুযায়ী আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া থাকে, আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া থাকে।

কাল এবং মৃত্যু করজোড়ে ভীষ্মদেবের প্রতীক্ষা করিয়াছে। মৃত্যু যে শয্যায় মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিয়াছে, সেই শরশয্যায় ভীষ্মদেব মৃত্যুকে ক্রোড়ে করিয়া মহানন্দে মহাশয়নে উত্তরায়ণ দিবা অপেক্ষা করিয়াছেন। সেই মহাপুরুষ বীর-ও ধন্য। মৃত্যুই যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছে, তিনি কিন্তু প্রফুল্ল মনে মহানন্দে ছিলেন...।'

বহুদিন, বহু বছর আগের কথা। ফলে সন্দেহ নিরসন করার মতো কোনও ব্যক্তিই এখন হাতের কাছে নেই। তবুও বলা যেতে পারে স্বামীজি মহাত্মা উমাচরণবাবুকে দ্বিতীয় খাতাটিতে যে উপদেশ লিখিয়েছিলেন তাই পরবর্তীকালে 'তত্ববোধ'-এ সংকলিত হয়েছে। আবার ফিরে যাই কাশীধামের সেইসব দিনে। সেখানে তখন শুধুই স্বামীজি ও উমাচরণবাবু।

উমাচরণ মুখোপাধ্যায় তাঁর গ্রন্থে লিখছেন, 'সংসারে লোকে কনিষ্ঠ পুত্রকে যেমন অধিক ভালোবাসে ও স্নেহ করে সেই প্রকার দুই মাস যাতায়াত করায় আমিও যেন একজন আশ্রমেরই লোক বলিয়া অনেকের ধারণা হইল। বিশেষত উভয়ে প্রত্যহ স্নান করিতে যাওয়াতে সকল লোকে বলিত এই বাঙালি বাবুটিকে বাবা চেলা তৈয়ার করিতেছেন। আমাকেও স্বামীজি সেই প্রকার ভালোবাসিতে ও স্নেহ করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া আমারও ভয় ভাঙিয়া গেল ও ক্রমশ সাহস বাড়িয়া গেল, আর ভয়ে ভয়ে বা ভাবিতে ভাবিতে আশ্রমে যাইতে হইত না। পিতার ধনে পুত্রের যেমন অধিকার হয় আমারও যেন ঠিক সেই প্রকার আশ্রমে একটু অধিকার জন্মিল। নিজের বাড়ির মতো যখন ইচ্ছা তখন যাই, যখন ইচ্ছা তখন আসি। বেশ মনের সুখে আছি, আনন্দের সীমা নাই। স্বামীজি যখন আমার ওপর এত দয়া করিয়াছেন ও করিতেছেন তখন তাঁহার নিকট দীক্ষা না লইয়া ছাড়িব না মনে মনে স্থির করিলাম। ইহার জন্য আমার যতদিন থাকিবার আবশ্যক ততদিন থাকিব।

পরদিন অপরাহ্নে আমি স্বামীজির নিকট বসিয়া তাঁহার পদসেবা করিতেছি এমন সময়মঙ্গলদাস ঠাকুর আমাকে বলিলেন, ''উমেশবাবু (মঙ্গলদাস ঠাকুর সেই সময় হইতে আমাকে উমেশবাবু বলিয়া ডাকিতেন) আপনি বাবাকে খুব বশীভূত করিয়াছেন; বোধহয় বাবা আপনাকে চেলা করিবেন।'' তাঁহার এই কথা শুনিয়া অতিশয় আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলাম যে, ''আপনি কি স্বামীজির কোনো কথা শুনিয়াছেন?'' তিনি বলিলেন, ''আপনাকে চেলা করিবার আর কি বাকি আছে? বাবা আজ পর্যন্ত এত ঘনিষ্ঠতা কাহারও সহিত করেন নাই; আর প্রায়ই বলিয়া থাকেন যে, 'এই বাঙালিবাবুটি অতি শান্ত ও সৎ স্বভাবেরর লোক'।'' মঙ্গলদাস ঠাকুরের নিকট এই কথা শুনিয়া বড় আনন্দ হইল ও স্বামীজির নিকট দীক্ষা লইতে পারিব শুনে মনে মনে অনেকটা আশা হইল। আমি মঙ্গলদাস ঠাকুরকে করজোড়ে বলিলাম, ''যাহাতে আমার দীক্ষা হয় সে বিষয়ে আপনাকে বিশেষ সাহায্য করিতে হইবে আর সুবিধামতো স্বামীজির মনের ভাব কী একবার দয়া করিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন।'' তিনি তাহা স্বীকার করিলেন। ক্রমে সন্ধ্যা হইল, স্বামীজি আমাকে বাসায় যাইতে সংকেত করিলেন, আমি চলিয়া আসিলাম।

পরদিবস প্রাতঃকালে স্বামীজির নিকট বসিয়া তাঁহার যোগশাস্ত্রে অলৌকিক ক্ষমতার বিষয় ভাবিয়া আমি যোগ শিক্ষা করিবার জন্য তাঁহার শিষ্য হইতে মনস্থ করিলাম। স্বামীজিকে মনের কথা প্রকাশ করিব ভাবিয়া আর একটু নিকটে অগ্রসর হইয়া বসিলাম। আমার মনের কথা প্রকাশ করিবার পূর্বেই তিনি মঙ্গলদাস ঠাকুরকে ডাকিয়া বলিলেন, ''এই বাঙালিবাবু এক্ষণে দীক্ষা লইবার মানস করিয়াছে।'' আমি করজোড়ে বলিলাম, ''আমার প্রতি আপনি বিশেষরূপে দয়া প্রকাশ করিয়াছেন; এরূপ কাহারও ভাগ্যে ঘটে না; আমাকে উদ্ধার করিতেই হইবে।'' তিনি বলিলেন, ''সে বিষয়ে রাত্রে যুক্তি দেওয়া যাইবে, ইহা বড় শক্ত কথা, এক্ষণে স্বাধীন ও মুক্ত আছ। দীক্ষা লইলেই বাঁধা পড়িতে হইবে।'' এই কথা বলিয়া বাসায় যাইতে আদেশ করিলেন। আমি বাসায় চলিয়া আসিলাম। সন্ধ্যার সময় আশ্রমে আসিয়া স্বামীজিকে প্রণাম করিয়া তাঁহার নিকট বসিলাম। তিনি আমাকে সঙ্গে লইয়া সেই ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া উপবেশন করিলেন; আমি তাঁহার নিকট বসিলাম। তিনি আমাকে বলিলেন, ''তুমি এক্ষণে যোগ শিক্ষা করিবার মানস করিয়াছ কিন্তু তুমি যোগ শিক্ষার অনধিকারী, তুমি উপাসনা মার্গে প্রবৃত্ত হও।'' আমি তাহাই স্বীকার করিলাম, তাঁহার উপদেশ প্রার্থনা করিলাম। তিনি আমাকে বলিলেন, ''এই মাঘ মাসের ৩রা তারিখে পুষ্যা নক্ষত্রে যে চন্দ্রগ্রহণ আছে তোমাকে সেই গ্রহণ পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে, কারণ দেহ শুদ্ধ না হইলে দীক্ষা হইতে পারে না। সেই চন্দ্রগ্রহণের রাত্রে তোমার দেহ শুদ্ধ করিয়া দিব।''

তাহার পর কয়েকটি দ্রব্যের একটি ফর্দ লিখাইয়া দিয়া সেই দ্রব্যগুলি গ্রহণের সময় একজন সৎ ব্রাহ্মণকে দান করিতে বলিলেন এবং সে সময় গঙ্গা স্নান করিয়া এক আসনে বসিয়া জপ করিবার একটি মন্ত্র উপদেশ দিয়া যথাবিধি ক্রিয়া করিবার ব্যবস্থা বলিয়া দিলেন। কাশীধামে গ্রহণের সময় সৎ ব্রাহ্মণকে দান করা বড়ই শক্ত। আমি তাঁহাকে বলিলাম, ''বাবা! আমার প্রতি বড় কঠিন আদেশ হইল। কাশীধামে গ্রহণের সময় কোনও সৎ ব্রাহ্মণ আমার দান গ্রহণ করিবেন না। কী উপায়ে এবং কাহাকে দান করিব দয়া করিয়া তাহা আমাকে বলিয়া দিন।'' তিনি হাস্য করিয়া বলিলেন, ''ঐ সকল দ্রব্যের নাম ধরিয়া যিনি ভিক্ষা চাহিবেন তাঁহাকে দিবে তাহা হইলেই তোমার কার্য সিদ্ধি হইবে।'' আমি তাহাতে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া মনে করিলাম বাবা নিজেই কোনও ব্রাহ্মণকে পাঠাইয়া দিবেন। আমি নিশ্চিত মনে গ্রহণের দিন প্রতীক্ষা করিয়া রহিলাম এবং প্রত্যহই দুইবেলা নিয়মিতরূপে আশ্রমে যাতায়াত করিতে থাকিলাম। যথা সময়ে গ্রহণের দিন আসিয়া উপস্থিত হইল। স্বামীজির আজ্ঞা অনুসারে কার্য করিলাম। আশ্চর্য এই যে ঠিক গ্রহণের সময় একজন ব্রাহ্মণ ঐ সকল দ্রব্যের নাম করিয়া আমার নিকট আসিয়া ভিক্ষা চাহিলেন, আমি অতি ভক্তি সহকারে তাঁহাকে প্রদান করিলাম।

পরদিন ৪ঠা মাঘ প্রাতঃকালে পঞ্চগঙ্গায় স্নান করিয়া আশ্রমে গমনপূর্বক সকল দেবতাকে ও স্বামীজিকে প্রণাম করিয়া তাঁহার নিকট বসিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি বলিলেন, তোমার দেহ শুদ্ধ হইয়াছে। তাহার পর গুরু কি প্রকার হওয়া উচিত এবং শিষ্যই বা কি প্রকার হওয়া উচিত তাহা ভালোরূপে বুঝাইয়া দিলেন এবং অনুমতি করিলেন যে, আগামীকল্য তোমার দীক্ষা হইবে। দীক্ষার জন্য কোন কোন দ্রব্য যোগাড় করিতে হইবে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, ''কিছুই যোগাড় করিতে হইবে না''।'

দুজনের সম্পর্কটা এখন বেশ মধুর এবং ভালোবাসার। স্বামীজি উমাচরণবাবুকে অত্যন্ত পছন্দ করছেন। কদিন বাদেই তিনি দীক্ষা দেবেন গৃহী উমাচরণ মুখোপাধ্যায়কে। স্বামীজি গুরু হতে রাজি হওয়ায় উমাচরণবাবু অবশ্যই বেশ উত্তেজিত। যে-কোনও মানুষের কাছে এর থেকে বড় প্রাপ্তি আর কী হতে পারে। উমাচরণবাবু লিখছেন, স্বামীজিকে কিছু খাওয়াতে হবে, বহুদিন ধরে এই ইচ্ছা আমার মনে বাসা বেঁধেছিল। সেদিন সকালে আশ্রমে ঢুকে স্বামীজিকে বেশ প্রফুল্ল মনে হল। আমি ভয়ে ভয়ে তাঁর কাছে আমার মনের বাসনা প্রকাশ করতেই তিনি বললেন, 'ঠিক আছে আজ আমাকে অন্ন আহার করতে হবে। তুমি কিছু বেগুন কিনে আনো।' আমি মহানন্দে বাজারে ছুটলাম। পাঁচ সের ভালো বেগুন তো কিনলাম, সঙ্গে পাঁচ সের মিষ্টিও আনলাম। আশ্রমে আসার পর স্বামীজি বেগুন দেখে বেশ খুশি হলেন। তিনি মঙ্গলদাসজির মা অম্বাদেবীকে বেগুন ভাজা ও তরকারি রাঁধতে বললেন। এবং ওই বেগুন থেকে গোটা চারেক তিনি নিজের হাতে আমাকে দিলেন। তবে মিষ্টি দেখে তিনি আমার ওপর খুব রেগে গিয়ে বলেছিলেন—আমি কি তোমাকে মিষ্টি আনতে বলেছিলাম? তাহলে তুমি আনলে কেন? তাঁর মুখের ভাবভঙ্গি দেখে আমি সত্যিই খুব ভয় পেয়েছিলাম, কোনও কথা না বাড়িয়ে চুপ করে তাঁর পায়ের কাছে বসে রইলাম।

ইতিমধ্যে বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেছে। রাগ অনেকটা প্রশমিত। খুব ভয়ে ভয়ে স্বামীজিকে মিষ্টি খাওয়ার জন্য অনুরোধ করলাম। বহুবার অনুনয় বিনয় করার পর তিনি মিষ্টি খেতে রাজি হলেন। প্রায় সাড়ে চার সের মতো মিষ্টান্ন খেয়ে তিনি বাকিটা আমাদের জন্য রেখে দিলেন। ইঙ্গিতে মঙ্গলদাসজি ও আমাকে ওই মিষ্টি খেয়ে নিতে বললেন। আমরা আনন্দে স্বামীজির প্রসাদ গ্রহণ করলাম। তারপরই তিনি আমায় বাড়ি চলে যেতে বললেন। অবশ্যই ইঙ্গিতে।

ঠিক সেইসময় অম্বাদেবী স্বামীজির খাওয়ার নিয়ে সেখানে এলেন। অর্থাৎ স্বামীজি এখন আহারে বসবেন। তাহলে আজ আমার আরও একটা বাসনা পূর্ণ হতে পারে, যদি আমি আরও কিছুক্ষণ এখানে থাকতে পারি। আমি বাড়ি না ফিরে আশ্রমেই থেকে গেলাম। স্বামীজি আজ অন্ন আহার করছেন। যদি ভাগ্যে থাকে তবে তাঁর অন্নপ্রসাদ পাওয়াটা মোটেই অসম্ভব হবে না। অন্তত একটা টুকরো ভাতও কুড়িয়ে খেতে পারব। আহার শেষ হওয়ার পর আমি স্বামীজির কাছে তাঁর প্রসাদ খাওয়ার অনুমতি চাইতেই তিনি বললেন, তুমি আমার

এঁটো খাবে কেন? আমি বললাম, এ তো উচ্ছিষ্ট নয়, মহাপ্রসাদ, অন্তত একটা ভাতও আমি কুড়িয়ে খাব। স্বামীজি বললেন, যদি তোমার ইচ্ছা হয় তাহলে তুমি খেতে পারো। আমি সেই মহাপ্রসাদ খেয়ে স্বামীজির পাথরের থালা, বাটি ও খাওয়ার জায়গাটি পরিষ্কার করে বাড়ি ফিরে গেলাম।

বিকেলে আশ্রমে গিয়ে দেখি তিনজন স্বামীজি তাঁর সামনে বসে আছেন। আমি স্বামীজিকে প্রণাম করে একপাশে বসলাম। স্বামীজিরা তাঁর কাছে কিছু জানতে এসেছিলেন। ত্রৈলঙ্গ স্বামীজি মঙ্গলদাসজিকে ডেকে একটি বিশেষ পুঁথি আনতে বললেন। দালানের মাঝখানে দেবনাগরী অক্ষরে, পঁচিশ, ত্রিশখানা পুঁথি সবসময় থাকত। মঙ্গলদাসজি সেখান থেকে নির্দিষ্ট পুঁথিটি এনে দিলেন। স্বামীজি এরপর সেই পুঁথি খুলে তাঁদের সমস্ত প্রশ্নের সমাধান করে দেন।

হঠাৎই আবহাওয়াটা কেমন যেন পালটে গেল। প্রবল মেঘ কোথা থেকে উড়ে এসে কাশীধামের আকাশ ঢেকে ফেলল, সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া। তিনজন মহাপুরুষ আকাশের ওই অবস্থা দেখে স্বামীজির অনুমতি নিয়ে আশ্রম ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। আমিও তাঁর কাছে বাড়ি যাওয়ার অনুমতি চাইলে, তিনি ঘাড় নেড়ে বললেন, না, এখন তুমি যাবে না, আরও কিছুক্ষণ বসো। কী আর করি! স্বামীজির আদেশ। বসে রইলাম।

ইতিমধ্যে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। যত সময় গেল বৃষ্টির তেজ ততই বাড়ল। সে এক ভয়ঙ্কর বৃষ্টি। আর সেদিন কাশীধামের সমস্ত আলো কে যেন শুষে নিয়েছিল। প্রবল অন্ধকার। এক হাত দূরের জিনিস দেখা যাচ্ছে না। খুব চিন্তায় পড়ে গেলাম। বুঝতে পেরেছিলাম, আজ আশ্রমেই থাকতে হবে। কোনওভাবেই বাড়ি ফেরা সম্ভব হবে না। এদিকে বৃষ্টি তার তেজ ক্রমশ বাড়িয়েই চলেছে।

দুর্যোগ যখন আরও বেড়ে গেল, ঠিক সেইসময় স্বামীজি আমাকে বাড়ি যেতে বললেন। আমি ভয়ে ভয়ে তাঁকে বলেছিলাম—বৃষ্টির তেজ একটু কমলে তারপর বাড়ি যাই। তিনি মাথা নেড়ে বললেন, না, এখনই যাও। স্বামীজির আদেশ! কি আর করি। স্বামীজিকে প্রণাম করে তাঁর চরণধূলি মাথায় ঠেকিয়ে উঠে পড়লাম। সঙ্গে ছাতা পর্যন্ত নেই। খুব চিন্তায় পড়ে গেলাম। মঙ্গলদাসজিকে বলেছিলাম, স্বামীজি আজ আমাকে বড় বিপদে ফেলে দিলেন, একে ঘনঘোর অন্ধকার, সঙ্গে প্রবল বৃষ্টি। কী যে হবে কে জানে! মঙ্গল ভট্টজি বললেন, চিন্তা করবেন না, স্বামীজির কোনও উদ্দেশ্য আছে বলেই আপনাকে এই সময়ে বাড়ি পাঠাচ্ছেন। ভয় পাবেন না।

ভয় পাব না মানে! ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, সঙ্গে বজ্রপাত। যা হবে হোক, এই মনোভাব নিয়ে রাস্তায় নামলাম। কিন্তু অদ্ভুত অলৌকিক কাণ্ড। মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে অথচ তার এক ফোঁটা জল আমার শরীর স্পর্শ করছে না। আমার চতুর্দিকে কে যেন একটা বৃত্ত এঁকে দিয়েছেন। যত দুর্যোগ সবই ওই বৃত্তের বাইরে। এইভাবে একটু এগোনোর পর দেখতে পেলাম এক ভদ্রলোক একটি আলো নিয়ে আমার আগে আগে যাচ্ছেন। চিৎকার করে তাঁর কাছে জানতে চাইলাম, মহাশয়, আপনি কোনদিকে যাবেন? তিনি কোনও উত্তর দিলেন না। জোরে জোরে পা চালিয়ে তাঁকে ধরার চেষ্টা করলাম, সে কাজেও ব্যর্থ হলাম। কিছুতেই তাঁর নাগাল পেলাম না। দৌড়ে গিয়ে ধরার চেষ্টা করলাম, তাতেও দূরত্ব কমল না; তখন ভাবলাম, দৌড়ঝাঁপ করার কি দরকার, ওই ভদ্রলোকের আলোয় যখন আমি ঠিকভাবে হাঁটতে পারছি তখন দেখাই যাক কতদূর যাওয়া যায়। এইভাবে আমি একসময় বাড়ি পৌঁছে গেলাম, এবং ঘরে ঢুকে স্বামীজির অদ্ভুত, অলৌকিক কৃপার মহিমা উপলব্ধি করলাম। এই প্রবল বর্ষণে এতটা হেঁটে বাড়ি ফিরলাম, অথচ আমি সম্পূর্ণরূপে স্বাভাবিক এবং সুস্থ। এক ফোঁটা জল আমার শরীর স্পর্শ করেনি। শুধু তাই নয়, হাঁটতে অসুবিধা হবে বলে স্বামীজি আলোর ব্যবস্থাও করে দিলেন। এই রকম এক মহাপুরুষ কাল আমায় দীক্ষা দেবেন ভেবে সেই মুহূর্তে ভীষণ পুলকিত হয়েছিলাম।

৫ মাঘ, পরদিন আশ্রমে গিয়ে স্বামীজিকে প্রণাম করলাম। তারপর স্নানে বেরোলাম। বাবার স্নান দু-ঘণ্টার কমে হয় না। অথচ আমি অতক্ষণ জলে থাকতে পারি না। আমি স্নান সেরেপঞ্চগঙ্গার ঘাটের সিঁড়িতে বসে তাঁর জন্য অপেক্ষা করতাম। তিনি স্নান সেরে ওঠার পর তাঁর গা মুছিয়ে তাঁকে নিয়ে আশ্রমে ফিরতাম। স্নান

করতে যাওয়া ও আসার সময় তিনি আমার কাঁধ ও গলায় হাত দিয়ে পথ চলতেন। কোনও কোনও দিন আমাকে তিনি লাঠির মতো ব্যবহার করতেন। আমার ওপর ভর দিতেন। তাঁর সেই চাপ সহ্য করতে আমায় বেশ বেগ পেতে হত।

আশ্রমে ফিরে তিনি বেদির ওপর এবং আমি আমার নির্ধারিত স্থানেই বসলাম। উপস্থিত ভক্তজন একটা সময় স্বামীজিকে প্রণাম করে বিদায় নিলেন। এরপর শুরু হল আমার শিক্ষা। সেদিন তিনি আমাকে বসার আসন প্রণালী দেখিয়ে বললেন, 'দ্যাখো বিষয়কার্য অনুরোধে যে কথা না কহিলে কার্য সিদ্ধ হয় না কেবল সেই কথা মাত্র কহিবে, বৃথা বাক্য এবং গল্পাদি করিয়া সময় কাটাইবে না। বৃথা বাক্য উচ্চারণ করিলে তেজ ক্ষয় হয়। কখনও কাহারও ধর্মে বিদ্বেষ করিয়ো না। যাহার যে ধর্মে বিশ্বাস তাহার তাহাতেই মুক্তি। আহারাদিতে ধর্মের হানি হয় না, কেবল মুক্তি পাইতে বিলম্ব হয়। মুসলমানেরও মুক্তি হইয়া থাকে। ব্যাকুল হইয়া ভক্তিভাবে যিনি তাঁহাকে ডাকিবেন তিনিই তাঁহাকে পাইবেন।'

এরপর তিনি বললেন, 'যে সকল ঘটনা দেখিয়া এখন তুমি মোহিত হইতেছ ইহার কোনোটাই আশ্চর্য নহে। মানুষ যদি প্রকৃত মানুষ হয় তবে সকলেই এই সকল কার্য করিতে পারে। কেবল আহার, বিহার ও বিষয় সম্ভোগ করিবার জন্য মনুষ্যের সৃষ্টি হয় নাই। ভগবানের যে সকল শক্তি আছে মানুষেরও ঠিক সেই সমস্ত শক্তি আছে। ভগবান মানুষকে মনের মতো তৈয়ার করিয়া তাহাতে নিজের সমস্ত শক্তি দিয়া সকল জীবের শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন, কেহ সেই শক্তির ব্যবহার করিতে জানে না। যাঁহা হইতে এই পৃথিবী এবং কার্য করিবার, কথা বুঝিবার ও চলিবার শক্তি পাইয়াছি, যিনি নিয়ত আমাদের সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছেন, তাঁহাকে জানিবার বা দেখিবার ইচ্ছা কাহারও নাই। যদি কখনও কাহারও ইচ্ছা হয় তবে প্রণালী অনুসারে কার্য করিতে না হইলেই সে কার্য ছাড়িয়া দিয়া নাস্তিক হইয়া পড়ে। যিনি অন্তরের সহিত তাঁহাকে পাইবার চেষ্টা করিবেন তিনি নিশ্চয়ই পাইবেন। এই পৃথিবীর নিশ্চয়ই একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন, যিনি সকল সময় সকল স্থানে বিদ্যমান রহিয়াছেন, তিনিই ঈশ্বর।' তিনি সমস্ত পৃথিবী ব্যাপ্ত হইয়া আছেন। কেবল জ্ঞান ও বিচার বলে তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করা চাই। যে জিনিস আছে তা চেষ্টা করিলে অবশ্যই পাওয়া যায়।'

স্বামীজির উপদেশবাণী শুনে আমার মনে একটা প্রশ্ন জেগেছিল, আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, সত্য সত্যই কি ঈশ্বরের দর্শন পাওয়া যায়? স্বামীজি বললেন, 'সাধনা এবং গুরুর কৃপা হলে অবশ্যই ঈশ্বর দর্শন সম্ভব। তুমি কি দেখতে চাও!' আমি বিগলিত কণ্ঠে বললাম, প্রভু! তাহলে আমার জীবন সার্থক হবে। আমার আজ পরম সৌভাগ্য, আমি একজন ভগবানকে আমার গুরুপদে বরণ করতে পেরেছি। কারণ ভগবান ছাড়া অন্য কারও পক্ষে ভগবান দর্শন করানো সম্ভব নয়। তিনি সব শুনে মৃদু হেসে বললেন, 'আজ রাতে আমি তোমার সে আশাও পূর্ণ করে দেব।' এরপর আমি বাড়ি ফিরে গেলাম।

সেদিন আর বিকেলে আশ্রমে গেলাম না, আরতির কিছু আগে আশ্রমে গিয়ে দেবতা ও স্বামীজিকে প্রণাম করে তাঁর চরণপ্রান্তে বসলাম। আরতি শেষ হওয়ার পর স্বামীজি আমাকে নিয়ে ওই ক্ষুদ্র গৃহে প্রবেশ করলেন। তিনি আসনে এবং আমি তাঁর সামনে উপবিষ্ট হওয়া মাত্র তিনি বললেন, 'আমার বেদির কাছে, ছোট ঘরে যে কালীমূর্তি আছে তাঁকে দর্শন করে এস।' তাঁর আদেশমতো আমি দর্শন করে এসে বললাম, মা অচলা পাষাণময়ী। তিনি আমার কথা শুনে হাসতে হাসতে বললেন, 'তুমি কি মাকে এখানে দর্শন করতে চাও!' আমি বললাম, গুরুদেব, আমার কি সেই সৌভাগ্য হবে, যে মাকে এখানে দেখব! মাকে দেখা আর জগৎমাতাকে দেখা সমান কথা। এ দীন হীনকে আপনি দয়া করে দেখালে কৃতার্থ হব।

গুরুদেব আমাকে স্থিরভাবে বসতে বলে ধ্যানস্থ হলেন। প্রায় এক ঘণ্টা পরে তাঁর ধ্যান ভঙ্গ হল। এবং তিনি আমাকে বললেন, এবার দেখ! কি দেখলাম! যা দেখলাম তা আমার গুরুদেবের দয়াতেই দর্শন করলাম —পাষাণময়ী মা ছোট একটি বালিকার মতো ধীর পদবিক্ষেপে স্বামীজির সামনে উপস্থিত হলেন। অস্পষ্ট আলোয় মায়ের উজ্জ্বল জ্যোতি ও রূপের ছটা দেখে আমি ভীত এবং চমৎকৃত হলাম। ইচ্ছা জেগেছিল, সাধ

হয়েছিল মা বলে ডেকে একবার প্রণাম করার। সম্মুখে জগন্মাতা ও গুরুদেব অধিষ্ঠান করছেন, এই মুহূর্তে মৃত্যু হলে অবশ্যই সশরীরে স্বর্গলাভ করতে পারব—এইরকম নানা ভাবনায় ভাবিত হলাম।

আমি তখন জড়বুদ্ধি, চেতনার মধ্যে থেকেও অচেতন। স্বামীজি আমার মনের অবস্থা বুঝতে পেরে বললেন, 'তুমি আবার ওপরে যাও, এবং গিয়ে দেখে এস মা ওই স্থানে আছেন কিনা!' আমি কম্পিত ও ভীত অবস্থায় সেখানে গিয়ে দেখলাম, মা ওই বেদিতে নেই। বেদি শূন্য। আমার কম্পন আরও বেড়ে গেল। দ্রুতপদে স্বামীজির কাছে ফিরে এলাম। তিনি মৃদু হেসে আমাকে বসতে বললেন। আমি তাঁর কাছে বসে মাকে প্রাণভরে দর্শন করেছিলাম। দেখলাম সবই ঠিক আছে, জিহ্বা বাইরে নেই, এবং পদতলে মহাদেব অনুপস্থিত। বাবার অনুমতি নিয়ে মাকে প্রণাম করে তাঁর পদধূলি মাথায় ঠেকালাম। মায়ের চরণযুগল মনুষ্য পদের মতো নরম এবং শীতল। স্বামীজি ধীর কণ্ঠে বললেন, 'মাকে ভালো করে দর্শন করো, মনে যেন কোনওপ্রকার আক্ষেপ না থাকে, সেইভাবে দর্শন করে ধন্য হও।' আমি স্তম্ভিত, নিস্তব্ধ হয়ে জগৎজননীকে দর্শন করেছিলাম। বেশ কিছুক্ষণ কেটে যাওয়ার পর গুরুদেব মাকে তাঁর আসনে ফিরে যাওয়ার ইঙ্গিত করলেন। মা, জগৎজননী ফিরে গেলেন নিজের আসনে।

অবিশ্বাস্য ঘটনা। সেদিন স্বামীজিকে বলেছিলাম, গুরুদেব! পাথরের মূর্তি কীভাবে চলাফেরা করতে পারেন! এ তো অতি অসম্ভব ব্যাপার। কী করে সম্ভব হল! আমার ওপর তিনি রেগে গেলেন না। বললেন, 'তোমার জড়দেহ কীভাবে চলাফেরা করে?' উত্তরে বলেছিলাম, আমাদের দেহে আত্মা ও চৈতন্য আছে, সেজন্যই কথা বলতে ও চলতে পারি! তিনি বললেন, 'সিদ্ধ সাধকের সাধন গুণে যখন মাটি, পাষাণ বা ধাতুতে আত্মা ও চৈতন্যের সঞ্চার হয় তখন সেই মূর্তি চলতে, বলতে, শুনতে ও কাজ করিতে পারেন।' সেই রাতে এর বেশি আর কোনও কথা হল না। তিনি ওপরের বেদিতে গিয়ে শুয়ে পড়লেন। আমি বাড়ি ফিরে গেলাম। আবার তো কিছুক্ষণ বাদেই আশ্রমে আসতে হবে। দুজনে মিলে স্নান করতে যাব।

৬ই মাঘ, স্নান করতে করতে গুরুদেব বললেন, 'আজ রাতেও তোমাকে আসতে হবে। আজই তোমার সমস্ত কাজ শেষ হবে। এরপর আর রাতে তোমায় আসতে হবে না।' স্নান শেষে আমরা একত্রে আশ্রমে ফিরে আসি। আমিও বাড়ি ফিরে গেলাম। রাত্রি জাগরণের ক্লান্তিতে সেদিন দুপুরে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম ভাঙল সন্ধের কিছু আগে। দেরি হয়ে গেছে ভেবে তড়িঘড়ি আশ্রমে পৌঁছোলাম। দেবতা ও স্বামীজিকে প্রণাম করে আমি আমার নির্দিষ্ট জায়গায় বসলাম। সেদিন বেদির ওপরে তাঁর কাছে চারখানা কচুরি ছিল। তিনি সেখান থেকে দুটো কচুরি আমাকে খেতে দিলেন এবং তিনি দুখানা খেলেন। অবশ্যই কেউ খাইয়ে দিলেন। খাওয়া শেষ হওয়ার পর তিনি আমাকে নিয়ে সেই ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করলেন।

তিনি বললেন, 'দেখ উমাচরণ, এখন হইতে বাঁধা পড়িলে, প্রত্যহ নিয়মিত কার্য করিবে, কোনোমতে অবহেলা করিয়ো না, তোমার জন্য আমাকে খাটিতে না হয়। দিবসে সুবিধা না হইলে সন্ধ্যার সময় করিবে, যদি সন্ধ্যার সময় সুবিধা না হয় তবে শেষ রাত্রে কার্য করা চাই—সময় পাই না বলিলে চলিবে না। যদি তুমি ফাঁকি দাও তাহাও আমি জানিতে পারিব।' সেদিন তিনি আমাকে দু-তিন প্রকার প্রণালীও বিশেষভাবে বুঝিয়ে বলেছিলেন, 'এর ফলে তোমার সহজেই আত্মদর্শন হবে।'

এরপর তিনি বললেন, 'ভগবান মনুষ্যকে মনের মতো গঠন করিয়া নিজের সমস্ত শক্তি দিয়া সকল জীবের শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন। সেই জন্য মনুষ্য যে ভগবানের সমান কার্য করিতে পারে, তাহা আজ তোমাকে প্রত্যক্ষ দেখাইব, দেখিলেই বেশ জানিতে পারিবে যে মনুষ্যই ঈশ্বর। তিনি আত্মারূপে হৃদয়ে এবং পরমব্রহ্ম রূপে মস্তকে বাস করিতেছেন। আমি নামে যে মনুষ্য দেহ ইহা কিছুই নহে, সমস্তই তিনি এবং সকলই তাঁহার। আমি কিছুই নহি এবং আমার কিছুই নাই, ইহা সর্বদা মনে করিবে। শম (বাসনা নিবৃত্তি, চিত্তের স্থিরতা) সৎসঙ্গ, বিচার ও আনন্দ—এই চারিটি বিষয়কে সর্বদা সঙ্গী করিবে। ধর্ম বিষয় লইয়া কখনও কাহারও সহিত তর্ক করিয়ো না। ধর্ম লইয়া যে স্থানে বচসা হইতেছে দেখিবে সেই স্থান ত্যাগ করিবে। শুনিয়া থাকিবে মা কালী আসিয়া ভক্ত রামপ্রসাদ সেনের বেড়া বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু বলো দেখি তিনি কি কখনও কোনও

লোকের সহিত ধর্ম বিষয়ে তর্ক অথবা নিজের ধর্মে কাহাকেও আনিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন।' কথা শেষ করে তিনি আমাকে চোখ বুজে আসনে স্থির ভাবে বসার আদেশ করে নিজে ধ্যানস্থ হলেন। প্রায় এক ঘণ্টা ওইভাবে কাটাবার পর তিনি চোখ খুলে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বলো দেখি, আমরা এখন কোথায় আছি?' আমি চারিদিকে ভালো করে তাকিয়ে চমকে উঠলাম। সেই ক্ষুদ্র গৃহ এখন কোথায়! সেই ঘর আর নেই। এখন আমরা গঙ্গার মাঝে একটি সুন্দর, নতুন পালঙ্কের ওপর বসে আছি। পালঙ্কটি জলে ভাসছে। তার ওপর সাদা চাদর পাতা। তিনদিকে তিনটি শ্বেত শুভ্র বালিশ, পালঙ্কে শ্বেত মশারি টাঙানো। স্বামীজিও মহাদেবের মতো শুভ্র শ্বেত। তিনি সেই পালঙ্কে অত্যন্ত আরামে শুয়ে আছেন। আর আমি তাঁর নিকটে।

আমি যা দেখলাম তাই তাঁকে জানিয়েছিলাম। তিনি বললেন, 'আমরা যদি মা গঙ্গার মধ্যস্থলে থাকি তবে গঙ্গায় জল আছে কিনা দেখ!' আমি হাত ডুবিয়ে সেই জল তুললাম। এরপরই আমাকে ভয় গ্রাস করল। যদি পালঙ্ক নিয়ে ডুবে যাই তাহলে কি হবে! এইসব ভাবনা আমায় আরও ভীত করে তুলল। আমি গুরুদেবকে স্পর্শ করে কাঠের পুতুলের মতো বসে রইলাম। ইতিমধ্যে কেটে গেছে বেশ কিছুক্ষণ। গুরুদেব আবার আমায় চোখ বন্ধ করে বসার আদেশ করলেন। নির্দেশ মেনে তাই করলাম। কিছুক্ষণ কেটে যাওয়ার পর তিনি ধীর কণ্ঠে বললেন, 'উমাচরণ চোখ খুলে দেখ আমরা কোথায় আছি।' চোখ খুলে আমি চমকে উঠলাম। দেখলাম, আমরা ওই আশ্রমেই রয়েছি। তিনি শুয়ে আছেন তাঁর বেদিতে এবং আমি আমার জায়গায়।

মনে মনে ভাবছিলাম, মানুষের পক্ষে এই কাজ করা কি সম্ভব! এটা কীরকম ভৌতিক ব্যাপার। দেবতারাও এই ঘটনা ঘটাতে পারবেন বলে মনে হয় না। অন্তর্যামী স্বামীজি আমার মনের ভাব বুঝতে পেরে বললেন, 'ইহাতে আশ্চর্য কিছুই নাহি। মানুষ যদি প্রকৃত মানুষ হয় তবে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারে। এত প্রকার ঘটনা দেখাইবার কারণ তোমার বিশ্বাস দৃঢ় হইবে এবং নিজে এই প্রকার সকল বিষয় আয়ত্তাধীন করিতে পারিবে।'

৭ই মাঘ, গুরুদেবের সঙ্গে পরমানন্দে গঙ্গাস্নান করে আশ্রমে ফিরলাম। সেদিন লোকসমাগম কমে যাওয়ার পর আমি গুরুদেবের কাছে তাঁর গুরুর কথা জানতে চেয়েছিলাম। তিনি প্রথমে আমার কথা গ্রাহ্য করলেন না। বারবার অনুরোধ করাতে তিনি বললেন, 'এই ব্যাপারে জানতে হলে তুমি আমার শিষ্য কালীচরণের সঙ্গে কথা বলো।'

মহাত্মা কালীচরণ স্বামীর সঙ্গে আমার আগেই দেখা হয়েছিল। বাবার আশ্রমেই তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। আমি বাবার সমস্ত জীবনী তাঁর মুখ থেকেই শুনেছিলাম। বাল্য অবস্থা থেকে কাশীধাম পর্যন্ত—সমস্ত কথাই।

গুরুদেব তাঁর বেদিতে একটা কম্বল পেতে এবং একটি কম্বল গায়ে দিয়ে শুতেন। এইরকম এক মহামানব, মহাসাধকের জন্য আমার খুব কষ্ট হত। একদিন তাঁকে কিছু না বলে বাজার থেকে আলোয়ান ও চাদর কিনে ফেললাম। আশ্রমে এসে আলোয়ানটি বাবার গায়ে দেওয়া মাত্র তিনি খুব রেগে গেলেন। গা থেকে ছুঁড়ে সেটি মাটিতে ফেলে দিয়ে আমার দিকে কড়া চোখে তাকালেন। তাঁর মুখের ভাব দেখে ভয়ে আমার বুক কেঁপে উঠেছিল। আমি দু-হাত দিয়ে তাঁর চরণ ধরে ক্ষমা প্রার্থনা করে বলেছিলাম—আমার বড় অন্যায় হয়েছে। কিছুক্ষণ বাদে তিনি খানিকটা শান্ত হলেন। আমি তখন ভয়ে ভয়ে মনের সুপ্ত বাসনা তাঁর কাছে প্রকাশ করলাম। বলেছিলাম, আপনি শুধু কম্বল পেতে এবং গায়ে দিয়ে শুয়ে থাকেন, এটা দেখে আমার বড় কষ্ট হয়। আমি আপনার গায়ে দেওয়ার জন্য কাপড় দিতে চাই। তিনি আমাকে বললেন, 'তুমি মনে দুঃখ কোরো না, আমাকে একখানি কম্বল এনে দিও তাতেই আমি খুশি হব। এখন অনেক বেলা হল, যাও বাড়ি যাও।'

বিকেল বেলায় প্রথমেই বাজার গেলাম। সেখান থেকে দুটি ভালো কম্বল ও আসন কিনে আশ্রমে এলাম। কম্বল দেখে স্বামীজি কিছু না বলাতে আমার হারানো সাহস পুনরায় ফিরে এল। একটি কম্বল বেদিতে পাতার ইচ্ছা প্রকাশ করা মাত্র তিনি নীচে নামলেন। এবং কম্বলটি পেতে দেওয়ার পর তিনি অন্য কম্বলটি গায়ে দিয়ে

আবার শুয়ে পড়লেন। তারপর আমায় বললেন, 'এটাই ভালো হল। ওই আলোয়ানটা তুমি নিজে ব্যবহার করলে আমি খুব খুশি হব।' আমি আলোয়ানটি রাখলাম, চাদরখানি মঙ্গলদাস ঠাকুরকে দিলাম।

দুই বেলা যাতায়াত, নানা ধরনের উপদেশ শুনে মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র মাসের ২৪ তারিখ পর্যন্ত কেটে গেল। সেদিন সকালে আশ্রমে গেছি। প্রচুর ভক্ত সমাগম হয়েছে। সবাই চলে যাওয়ার পর গুরুদেব আমায় বললেন, 'এই সকল ঘটনা যাহা দেখিলে এবং এই সকল কথাবার্তা যাহা শুনিলে তাহা কোনও অবিশ্বাসী লোকের নিকট বলিয়ো না। ধর্ম আশ্রয় করিয়া সংসারে থাকিবে, সর্বদা সাবধান থাকিয়া কাজকর্ম করিবে। কদাচ আসল কাজ ছাড়িয়ো না। সকল বিষয়েই তোমাকে দেখাইয়া, বুঝাইয়া ও লিখাইয়া দিলাম, তুমি আর এখানে থাকিয়ো না, এই কয়েকটি দিন পরে তুমি চাকরিস্থলে চলিয়া যাও।'

সংসারে আর ফিরব না, তাঁর কাছেই বাকি জীবন কাটাতে চাই—আমার কথা শুনে তিনি বললেন, 'তুমি বিবাহ করিয়া আসিয়াছ, আমি কি তাহার ভরণপোষণ করিব? তোমার আর এখানে থাকা হইবে না।' আমি সেদিন বিনয়যুক্ত কণ্ঠে বলেছিলাম, আমার হরিদ্বার পর্যন্ত যাওয়ার খুব ইচ্ছা ছিল। যদি এই সময় যেতে না পারি তাহলে এ জীবনে আর কখনও যেতে পারব না। সব শুনে গুরুদেব বললেন, 'আগামী সংক্রান্তির দিন প্রাতে অযোধ্যা হইয়া প্রয়াগ গমন করিবে। অযোধ্যায় রামদাস স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিবে, তিনি সরযূর ধারে ঝরনার ওপর থাকেন এবং প্রয়াগে সুরদাস বাবাজিকে দর্শন করিবে, তাহার পর হরিদ্বার যাত্রা করিয়ো।'

চৈত্র মাস শেষ হবে। সংক্রান্তির আগের দিন আমি স্বামীজির কাছে অযোধ্যা যাত্রার অনুমতি চাইলাম। আমার মনে একটি সন্দেহ বহুদিন ধরে ঘুণপোকার মতো কুরে কুরে খাচ্ছিল। সেদিন সেই সন্দেহটি দূর করার জন্য গুরুদেবকে বললাম, বাবা, আপনি আমাকে সবকিছুই প্রত্যক্ষ করিয়েছেন, কিন্তু আমি যে পাপ থেকে মুক্ত হয়েছি তার কিছু প্রমাণ দেখিয়ে আমার সন্দেহ দয়া করে দূর করে দিন। তিনি বললেন, 'তোমার বিশ্বাসের জন্য বলিয়া দিতেছি তোমার করপল্লবের উপরের চর্মস্তর উঠিয়া যাইবে।' হরিদ্বার থেকে মুঙ্গের আসার পর চাষীপোকা অথবা আগুনে বাত হলে যেমন চামড়া উঠে যায়, ঠিক সেইরকম আমারও দুই হাতের তালুর চামড়া উঠে গিয়েছিল। আমার হাতের অবস্থা অনেকেই সেইসময় দেখেছিলেন।

প্রণাম করে যখন বিদায় নিচ্ছি সেইসময় স্বামীজি বললেন, 'উমাচরণ, যদি কখনও কোনও বিষয়ে সন্দেহ হয় তাহলে একা আমার কাছে আসবে। সঙ্গে কাউকে আনবে না।' আমি বলেছিলাম, হরিদ্বার থেকে ফেরার সময় আপনার শ্রীচরণ দর্শন করেই তবে মুঙ্গেরে ফিরব। এই অনুমতি আপনাকে দিতে হবে। কারণ আপনার কথার ভাবে মনে হচ্ছে, আপনি আমায় শেষ বিদায় জানাচ্ছেন। তিনি বললেন, 'ঠিক আছে, ফেরবার সময় কাশীধামে দু-একদিন থেকে তারপর মুঙ্গের যেও।' আমিও প্রণাম করে গুরুদেবের কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

চৈত্র সংক্রান্তির দিন গুরুদেবের আদেশানুসারে অযোধ্যার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। সেখানে তিন দিন ছিলাম। আমার নিজের কিছু কাজকর্ম ছিল। তারপর গুরুদেবের নির্দেশমতো সরযূর ধারে ঝরনার ওপর মহাত্মা রামদাসকে খুঁজে বের করলাম। তিনি সেইসময় ধ্যানে মগ্ন ছিলেন। তাঁর ধ্যান ভাঙার অপেক্ষায় প্রায় দু-ঘণ্টা বসেছিলাম। ধ্যান ভাঙার পর তিনি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কাহে বাবা হামারে পাস বৈঠা হায়? তোমারা কামতো হো গিয়া।' এরপরই তিনি আবার ধ্যানে মগ্ন হলেন। আমিও আর অপেক্ষা না করে ফিরে গেলাম।

তার পরদিন আমি প্রয়াগের দিকে চললাম। সেখানেও আমার কিছু কাজকর্ম ছিল। প্রয়াগে সাতদিন থাকার পর গুরুদেবের আজ্ঞামতো মহাত্মা সুরদাস বাবাজিকে দর্শন করতে যাই, তিনি গঙ্গাতীরবর্তী একটি বাঁধের একপাশে ধ্যানস্থ অবস্থায় থাকেন বলে শুনেছিলাম। সত্যিই তাই, তিনি ধ্যানস্থ—আমরা তিনজনে তাঁকে দর্শন করতে গিয়েছিলাম। তিনঘণ্টা বসে থাকার পরও তাঁর ধ্যান ভঙ্গ হল না। শুনলাম, সিপাহি বিদ্রোহের আগে থেকে তিনি ওইখানে বারোমাস, দিবারাত্রি ওইভাবেই ধ্যান করেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় লড়াই শুরু হওয়ার দিন সকালে সিপাহীরা তাঁকে ওই জায়গা থেকে সরাবার বহু চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছিলেন।

তাঁর ধ্যান কিছুতেই ভঙ্গ করা যায়নি। অবশেষে সিপাহীরা একটি জ্বলন্ত টিকা তাঁর দক্ষিণ থাই-এর ওপর বসিয়ে দেন। তারও আধঘণ্টাবাদে তাঁর ধ্যান ভঙ্গ হয়েছিল। তিনি সেই জ্বলন্ত টিকে ফেলে দিয়ে বলেছিলেন, অকারণ আমার ওপর কেন অত্যাচার করছ? সিপাহীরা যুদ্ধ শুরু হওয়ার কথা বলাতে তিনি বলেছিলেন, 'আজ যদি আমার গোলার আঘাতে মরিবার দিন উপস্থিত হইয়া থাকে তবে তোমরা কোনও মতেই আমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। তোমরা লড়াই করো, আমার জন্য কোনও চিন্তা করিবার আবশ্যক নাই, আমি এই স্থান ছাড়িতে পারিব না।' এই বলে তিনি আবার সমাধিস্থ হলেন। সেইখানে এরপর যুদ্ধ শুরু হয়ে থেমেও যায়, তাঁর কিন্তু কোনও ক্ষতি হয়নি। সেই পোড়ার দাগ এখনও বিদ্যমান। অত্যন্ত কৃশ এক সাধক, দেহখানি হাড় ও চামড়ায় ঢাকা। সন্ধ্যার সময় সমাধি ভঙ্গ হল না দেখে আমরা বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে এলাম।

এরপর আগ্রা ও মথুরা ঘুরে বৃন্দাবনধামে গেলাম। সেখানেও আমায় সাতদিন থাকতে হয়েছিল। তারপর দিল্লি হয়ে সোজা হরিদ্বার। সেখানে নিজের কাজকর্ম সেরে বাবার শিষ্য কালীচরণ স্বামীর সঙ্গে দেখা করলাম। তাঁর কৃপায় কঞ্খলের তিন-চারজন অতি প্রবীন সাধুকে দর্শন করার সুযোগ হয়েছিল। এই হরিদ্বারেই মহাত্মা কালীচরণ স্বামী বাবার আরও দুই প্রিয় শিষ্য মহাত্মা ব্রহ্মানন্দ স্বামী ও মহাত্মা ভোলানাথ স্বামীর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিলেন। হরিদ্বারে প্রায় একমাস আমরা চারজন মহাসুখে কাটালাম। তাঁরা আমার সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা করবেন বলেও কথা দিলেন।

হরিদ্বার ঘুরে ফেরার পথে কাশীধামে নেমে সোজা গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তাঁকে প্রণাম করে আমার নির্দিষ্ট স্থানে বসার পর তিনি বলেছিলেন, 'তোমার সমস্ত কার্য শেষ হইয়াছে আর এখানে থাকিয়ো না, আগামী কল্য মুঙ্গেরে যাইতেই হইবে। তিন মাসের বিদায় লইয়া আট মাস হইয়াছে আর একদিনও বিলম্ব করা উচিত নহে, আগামী কল্য অবশ্য অবশ্য যাইবে। তোমার চাকরির জন্য কোনো চিন্তা নাই। তোমার চাকরি মারে কে?' এই বলে তিনি আমাকে যেতে আদেশ করলেন। আমি তাঁকে প্রণাম করে মঙ্গলদাস ঠাকুরের কাছ থেকে বিদায় নিতে গেলাম। তাঁকে প্রণাম করার পর বহুক্ষণ নানা কথাবার্তা হল। পরদিন মুঙ্গেরের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম।

মুঙ্গেরে ফিরে এসে সকলের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হল। আমি শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ বাগচী মহাশয় ও মুঙ্গেরের আর্যধর্ম প্রচারিণী সভার প্রতিষ্ঠাতা শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন মহাশয়কে গুরুদেবের অলৌকিক ক্ষমতার কথা গল্পচ্ছলে বলে ফেলি। আসলে তাঁরা আমায় খুবই স্নেহ করতেন ও ভালোবাসতেন। তাঁরা আমার কাছে গুরুদেবের কথা শুনে কাশীধামে যাওয়ার জন্য ভীষণ জেদ ধরলেন। অগত্যা এক বছর বাদে তাঁদের নিয়ে গুরুদেবের কাছে গেলাম। গুরুদেব শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেনকে দেখে মোটেই খুশি হননি। তিনি তাঁকে যথেষ্ট তিরস্কার করেন। শুধু শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন নন, গোপন কথা তাঁদের কাছে বলার জন্য আমাকেও যথেষ্ট বকেছিলেন। আমি তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছিলাম।

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন মহাশয় কাশীধামে মিসির পোকরাতে আর্যধর্ম প্রচারিণী সভা প্রতিষ্ঠা করার জন্য সেখানে থেকে গেলেন। আমি মুঙ্গেরে ফিরে গেলাম। পরবর্তীকালে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন মিসির পোকরাতে বসবাস করা কালীন হাউজ কটরাতে একটি বাড়ি কিনে সেখানে অন্নপূর্ণা প্রতিষ্ঠা করেন। বাড়িটির নাম দেন 'যোগাশ্রম।' তিনি ওখানে ধর্মপ্রচারের কাজ শুরু করেন। এই সময় থেকে তিনি কৃষ্ণানন্দ সরস্বতী নামে পরিচিত হন।

দেখতে দেখতে আরও একটা বছর কেটে গেল। আশ্বিন মাসের পুজোর ছুটিতে আমি এবং হালিশহর নিবাসী যদুনাথ বাগচী মহাশয় কাশীধামে গেলাম। সন্ধ্যার পর আমি ও যদুনাথবাবু আশ্রমের দেবতাকে প্রণাম করে স্বামীজির কাছে এলাম। তাঁকে প্রণাম করে আমরা দুজনে স্বামীজির চরণপ্রান্তে চুপ করে বসলাম। তিনি আমাদের দুজনকে ভালোভাবে নিরীক্ষণ করলেন। তারপর যদুনাথবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'দেখ যদুনাথ! তুমি অনেক শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করিয়া খারাপ হইয়া গিয়াছ, এখনও মন ঠিক করিতে পারো নাই। অগ্রে মন স্থির করে, তবে মুক্তির পথপাইবে। আমার নিকট দীক্ষা লইবার ইচ্ছা করিয়াছ কিন্তু আর কাহাকেও

দীক্ষা দিব না, দীক্ষা দেওয়া মহাপাপের কাজ। শিষ্যকে যাহা উপদেশ দেওয়া হয়, সে যদি তাহা না করে তবে গুরুকে সেই সমস্ত কর্ম করিতে হয়, না করিলে মহাপাপ হয়। সর্বদা শিষ্যের উদ্ধারের জন্য তাহার প্রতি নজর রাখিতে হয়। আমি আর পাপে লিপ্ত হইব না। তবে আমার ন্যায় উপযুক্ত লোক আমার দ্বিতীয় শিষ্য কালীচরণ স্বামী তোমাকে দীক্ষা দিবেন। দীক্ষা লইবার পূর্বে তোমার দেহ শুদ্ধ হওয়া উচিত।'

দেহশুদ্ধির জন্য কী কী জিনিস লাগবে তা জানিয়ে গুরুদেব যদুনাথবাবুকে বললেন, 'আগামী বৈশাখ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে কাশীধামে আসিয়া একটি সৎ ব্রাহ্মণ দ্বারা এই কার্য সমাধা করিবে। দেখ, তুমি অফিসের একজন বড়বাবু, অনেক বিষয় নিয়ে তোমাকে চিন্তা করতে হয়। তুমি কুড়ি-বাইশ বৎসর হইতে নিরামিষ ভোজন করিতেছ, কিছুদিন পরে তোমার ভয়ানক গাত্রদাহ পীড়া হইবে। যদি শরীর সুস্থ রাখিতে চাও তবে এইবার বাড়ি যাইয়া মৎস্য আহার করিবে। আর যদি চাকরি ছাড়িয়া দাও, তাহা হইলে মৎস্য ব্যবহার আবশ্যক নাই। এক দিবস জামালপুরে তোমার নিম্নস্থ কোনো এক কর্মচারী প্রস্রাব করিবার সময় ব্রাহ্মণ সন্তান হইয়া কানে পৈতা দেয় নাই, তাহা তুমি হঠাৎ দেখিতে পাইয়া তাহার উপর এত চটিয়াছ যে তাহার উন্নতির পথ বন্ধ করিবার ইচ্ছা করিয়াছ। ইহাতে বোধহয় কানে পৈতা দিবার প্রকৃত কারণ তুমি জান না। পৈতা শুচি ও প্রস্রাব অশুচি, পাছে পৈতায় প্রস্রাবের ছিটা লাগে সেইজন্যেই দুই-তিন ফের কানে জড়াইয়া লইতে হয়।'

বাগচী মহাশয় স্বামীজির মুখে এই কথা শুনে স্তম্ভিত হয়েছিলেন। সেইসময় তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র সরোজনাথের পৈতে দেবার সময় হয়েছিল। গুরুদেব উপনয়নের দিন স্থির করে দেবার পর তাঁকে প্রণাম করে আমরা আশ্রম থেকে বেরিয়ে পড়লাম।

পরদিন সকালে আশ্রমে যাব বলে বাড়ি থেকে বেরিয়েই দেখা হল ভোলানাথ স্বামীর সঙ্গে। তিনিও আশ্রমে যাচ্ছিলেন। আমরা একসঙ্গে গল্প করতে করতে আশ্রমে এলাম। স্বামীজিকে প্রণাম করে আমি আমার নির্দিষ্ট স্থানেই বসলাম। লোক সমাগম কমে যাওয়ার পর গুরুদেব আমাকে আবার সতর্ক করলেন। বললেন, 'তুমি আর কখনও কাহাকেও সঙ্গে করিয়া আনিয়ো না! আসিতে ইচ্ছা হইলে একা আসিবে নতুবা আসিয়ো না।' কথা শেষ করে তিনি ভোলানাথ স্বামীর সঙ্গে তাঁর আশ্রমে যেতে বললেন। আমরা তাঁকে প্রণাম করে আশ্রম ত্যাগ করলাম। ফেরার পথে ভোলানাথস্বামী আমাকে অনেক কথা বুঝিয়েছিলেন। বাবার কাছে ভিড় করা মোটেই উচিত নয় বলেও জানান। এবার সাতদিন মতো কাশীতে ছিলাম।

মুঙ্গেরে ফিরে বাগচী মহাশয় তাঁর দেহ শুদ্ধির জন্য সৎ ব্রাহ্মণের খোঁজ করতে শুরু করেন। তিনি সৎ ব্রাহ্মণ শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়কে এ ব্যাপারে অনুরোধ জানান। তিনি কিছুতেই রাজি হলেন না। চিন্তিত বাগচী মহাশয় এরপর নবদ্বীপ ও ভাটপাড়ায় চেষ্টা করলেন। কিন্তু কেউই কাশীধামে কাজ করে দানগ্রহণ করতে রাজি হলেন না। ব্রাহ্মণ না পাওয়াতে তাঁর চিন্তা আরও বেড়ে গেল। এদিকে কাজের দিনও এসে পড়েছে। সৎ ব্রাহ্মণের সন্ধান কিছুতেই পাওয়া যাচ্ছে না। বাগচী মহাশয় ভীষণ হতাশ হয়ে পড়লেন। আর মাত্র চারদিন বাকি, ঠিক সেইসময় দেবদূতের মতো ভোলানাথ স্বামী আমার বাড়িতে এসে বললেন, যদুনাথের জন্য সৎ ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করে গুরুদেব আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন। যদুনাথ ব্রাহ্মণকে আজই আমার সঙ্গে কাশী যেতে হবে। পরদিন তাঁরা দুজনে কাশীর উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। নির্দিষ্ট দিনে গুরুদেবের নিযুক্ত করা একজন সৎ অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ যদুনাথ মহাশয়ের দেহশুদ্ধির কাজ করেছিলেন। তিনি সাতদিন কাশীতে থেকে তারপর মুঙ্গেরে ফিরে এলেন। এই ঘটনার পাঁচ-ছয় বছর পর স্বামীজির শিষ্য মহাত্মা কালীচরণ স্বামী বাগচী মহাশয়ের হালিশহরের বাড়িতে গিয়ে তাঁকে দীক্ষা দেন। দীক্ষার ঠিক এক বছর পরে হঠাৎই যদুনাথবাবুর প্রবল গাত্রপীড়া শুরু হল। গুরুদেব তাঁকে এব্যাপারে পূর্বেই সাবধান করেছিলেন। আমি সেইসময় দার্জিলিং-এ। বাগচী মহাশয় কর্মস্থল থেকে তিন মাসের ছুটি নিয়ে আমার কাছে এসেছিলেন। দার্জিলিং-এ থাকাকালীন তার সেই সমস্যা অনেকটাই কমে গিয়েছিল।

একদিন হঠাৎই একটা বিশ্রী ঘটনা ঘটে গেল। আমি যে ডাক্তারখানায় চাকরি করতাম সেখানকার ম্যানেজারবাবু শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ ঘোষ বললেন, 'উমাচরণ! ক্যাশ মিলছে না। ছ'শ টাকা কম হচ্ছে। কাউকে ওই টাকা দেওয়া হয়েছে কিনা ভালোভাবে মনে করে দেখত! অনেক ভেবেও সেরকম কারও কথা মনে পড়ল না। ডাক্তারখানাতে চার চাবি যুক্ত দুটি লোহার সিন্দুক ছিল। এবং সে দুটি যে ঘরে থাকত সেই ঘরে রাতে আমি থাকতাম। ফলে প্রত্যেকেই আমাকে সন্দেহ করবেন এটাই তো স্বাভাবিক। ইতিমধ্যে কথাটি আর চাপা থাকল না। প্রকাশ হয়ে পড়ল। সমস্ত খাতা তন্ন তন্ন করে খুঁজেও সেই টাকার সন্ধান আমাদের দুজনের কেউই করতে পারলাম না। ইতিমধ্যে তিন-চার মাস কেটে গেল। খুবই মর্মাহত অবস্থায় দিন কাটাচ্ছি। একদিন ঠিক করলাম কাশী যাব। বাবার শরণাপন্ন না হলে এ অপবাদ কিছুতেই ঘুচবে না। কাউকে কিছু না বলে কাশীধামে চলে গেলাম।

আশ্রমে ঢুকে যথারীতি দেবতাদের পর স্বামীজিকে প্রণাম করে আমি আমার নির্দিষ্ট স্থানে বসলাম, কিছুক্ষণ পর তিনি আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, 'কি বাবা, টাকার গোলমাল করিয়া আসিয়াছ।' আমি বললাম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, টাকার গোলমাল হয়েছে। সেইজন্য আপনার কাছে এসেছি।' তিনি বললেন, 'যেমন তুমি তেমনিই তোমার মাস্টারমশাই (আমি ও মহেন্দ্রনাথ উভয়ে উভয়কে মাস্টারমশাই বলে সম্বোধন করতাম), অমুক মাসে অমুক তারিখে পাঁচশত টাকা কলকাতায় পাঠানো হয়েছে। তার মধ্যে তিনশত টাকা নরসিংহ দত্তকে ও দুই শত টাকা স্মিথ স্ট্যানিস্টীট কোম্পানিকে দেওয়া হয়েছে। তুমি নিজেই তো সেটা রেজিস্ট্রি করে এসেছিলে। তার রসিদ তো ডাক্তারখানার অমুক জায়গায়, অমুক ফাইলে আছে। তারা টাকা পাওয়ার পর প্রাপ্তি স্বীকার করে চিঠিও দিয়েছে। তাতেও তোমাদের ঘুম ভাঙেনি, তোমরা খাতাতেও কিছু তুলে রাখনি। আর বাকি একশো টাকা তোমার মাস্টারমশাই বের করবেন, কোথায় আছে বা কি হয়েছে তা আমি বলব না।'

এরপর স্বামীজি বললেন, 'তুমি আমার সকল কথা মুঙ্গেরে প্রকাশ করায় তথা হইতে মধ্যে মধ্যে লোক আসিয়া আমার নিকট দীক্ষা লইবার জন্য বড় বিরক্ত করে, আমার এখানে থাকা দায় হইয়াছে। তোমার আর মুঙ্গেরে থাকা হইবে না। এইবার মুঙ্গেরে যাইয়া চিফ ইঞ্জিনিয়ার, শিলং আসাম, এই ঠিকানায় একখানা দরখাস্ত করিবে।' আমি করজোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে বলেছিলাম, 'আমি সব কথা কাউকেই কখনও বলিনি। তবে কিছু কথা দু-চারজনকে বলে ফেলেছি। তা ছাড়া আগুনকে কখনও ছাই দিয়ে ঢেকে রাখা যায় না। আপনার অলৌকিক ঘটনার কথা আপনিই প্রকাশ পেয়েছে।'

সেদিন তিনি তারপর যে কথাটি বললেন তা শুনে আমি স্তম্ভিত ও মর্মাহত হয়েছিলাম। মনে হয়েছিল ঠিক শুনেছি তো! তিনি বললেন, 'আর পাঁচ-ছয় বৎসরের মধ্যে আমি দেহত্যাগ করিব। যেখানেই থাক পূর্বে সংবাদ দিব একবার আসিবে। আর এখানে থাকিয়ো না, আগামী কল্য মুঙ্গেরে যাইবে।'

পরদিন আমি ট্রেন ধরলাম। স্টেশন থেকে ডাক্তারখানায় এসে দেখলাম বাগচী মহাশয় ও মাস্টারমশাই সেখানে উপস্থিত আছেন। আমাকে দেখে মাস্টারমশাই জিগ্যেস করলেন, কি হে উমাচরণ! কোথায় উধাও হয়ে গিয়েছিলে, তিন-চারদিন কোনও খোঁজ পাওয়া গেল না তোমার। আমি বললাম, টাকার গোলযোগ মেটাতে গিয়েছিলাম। একথা শুনে বাগচী মহাশয় বললেন, তবে কি তুমি কাশীধামে গিয়েছিলে! আমি বললাম, বাবার কাছে ছাড়া আর কার কাছে যাব! বাবার কাছে গিয়েছিলাম শুনে তাঁরা দুজনেই আগ্রহের সঙ্গে বাবা কী বললেন জানতে চাইলেন। আমি কোনও উত্তর না দিয়ে প্রথমে রসিদ দুটো খুঁজে মাস্টারমশাইয়ের হাতে তুলে দিলাম। আমার মুখে সমস্ত কথা শুনে তাঁরা নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। মাস্টারমশাই তখন একশো টাকা নিয়ে একটু চিন্তায় পড়ে গেলেন।

কাশীধাম থেকে ফিরে আসার আট-দশ দিন পরে ডাক্তারখানার বাইরের ঘরে আমি ও বাগচী মহাশয় বসে নানা কথাবার্তা বলছিলাম। হঠাৎই মাস্টারমশাই আমার নাম ধরে উচ্চস্বরে ডাকলেন। আমরা দুজনেই দ্রুতপদে ভিতরের ঘরে যাওয়া মাত্র মাস্টারমশাই একটি রং লাগা একশো টাকা দেখিয়ে বললেন, অবশেষে

টাকার হিসেব মিলে গেল। আসলে ক'দিন আগে সিন্দুক দুটিতে রং করা হয়েছিল। সেইসময় কোনওভাবে টাকাটি রং-এ আটকে গিয়েছিল।

আমার আবার কিছুতেই মুঙ্গের ছাড়তে ইচ্ছা করছিল না। তাই আমি আসামে দরখাস্ত করিনি। তারপর এক বছর বাদে আসামে চিফ ইঞ্জিনিয়ারের কাছে হেলাফেলা করে একটি দরখাস্ত পাঠিয়ে দিলাম। দশ-বারো দিনের মধ্যেই সেখান থেকে উত্তর এসে গেল। পঞ্চাশ টাকা মাইনে ও পনেরো টাকা ভাতায় দ্বিতীয় শ্রেণির সাব-ওভারসিয়ার পদে আমাকে নিযুক্ত করা হয়েছে। সঙ্গে নিয়োগপত্রও ছিল। আমার প্রথম পোস্টিং হল শিবসাগরে। অতদূর যেতে হবে ভেবে প্রথমে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন হয়েছিলাম। অবশেষে অনেক ভাবনাচিন্তা করে যাব বলেই মনস্থ করি। মাস্টারমশাইকে আমার নতুন চাকরি পাওয়ার কথা জানিয়ে ডাক্তারখানা ও তহবিলের হিসেব বুঝিয়ে দিতে চাইলাম। তিনি ও অন্যান্যরা আমার কথায় কোনওরকম গুরুত্ব দিলেন না। তাঁরা বললেন, তোমায় কোথাও যেতে হবে না। এই মাস থেকে তোমায় পঞ্চাশ টাকা করে দেওয়া হবে।' আমি রাজি হলাম না। এইভাবে একমাস কেটে গেল। ইতিমধ্যে আসামের কর্মস্থল থেকে দুখানা টেলিগ্রাম পেয়ে গেছি। বক্তব্য, তুমি যদি কাজে যোগ না দাও তাহলে অবিলম্বে আমাদের জানাও। এদিকে মাস্টারমশাই ও অন্যান্যরা আমাকে কিছুতেই ছাড়তে রাজি নন। তাঁরা আমাকে এ ব্যাপারে নানাভাবে বোঝাতে লাগলেন। আমিও খুব দোটানায় পড়ে গেলাম। অগত্যা কাউকে কিছু না বলে আবার কাশীধামে গিয়ে বাবার শরণ নিলাম। তিনি বললেন, 'তোমার কিছুতেই মুঙ্গেরে থাকা চলবে না। তুমি অবিলম্বে তোমার নতুন কর্মক্ষেত্রে যোগ দাও।' বাবার কথা শুনে বুঝতে পারলাম আমাকে নতুন কর্মক্ষেত্রেই যেতে হবে এবং আমি যদি মুঙ্গেরে ফিরে যাই তাহলে আমি কিছুতেই শিবসাগর যেতে পারব না। তাইমুঙ্গেরে না ফিরে কয়েকদিনের জন্য নিজের বাড়িতেই যাব বলে ঠিক করলাম। সেখানে আট-দশদিন কাটিয়ে সোজা শিবসাগর চললাম।

বাড়িতে আট-দশদিন কাটালাম দুটো কারণে, একবার ওখানে গেলে কিছুতেই তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে পারব না, আর দ্বিতীয় কারণটি হল আমার পূর্বজন্মের লেখা শ্লোক তিনটি। সেইগুলি দেখেই আসাম যাব বলে ঠিক করেছিলাম। সেই উদ্দেশ্য একদিন ওই গ্রামে গিয়ে সেই বাড়ির গৃহকর্তার সঙ্গে আলাপ করলাম। কিন্তু মনের কথা তাঁর সামনে বলতে পারলাম না। বিফল মনোরথ হয়ে বাড়ি ফিরে এলাম।

শিবসাগরে একবছর থাকার পর আমাকে গোলঘাটে বদলি করা হল। আমি সেখানে যাওয়ার তিন-চার মাস পর রুরকি কলেজ থেকে এক যুবক ওভারসিয়ার হয়ে সেখানে এলেন। আমি যে বাড়িতে থাকতাম তিনিও সেখানে এসে উঠলেন। অল্পদিনের মধ্যে আমাদের মধ্যে বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গেল। একদিন কথায় কথায় জানতে পারলাম, আমার পূর্বজন্মের বাড়িতেই ওই যুবকের বিয়ের ঠিক হয়েছে। তিন-চার মাসের মধ্যে তার বিয়েও হয়ে গেল। ওই ভদ্রলোক বিয়ের পর কর্মস্থলে ফিরে এলেন। একদিন আমি তাঁর শ্বশুরবাড়িতে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলাম। তিনিও সানন্দে রাজি হলেন। কিন্তু আমার মন্দ কপাল। অল্পদিনের মধ্যে সেই ভদ্রলোক অন্যত্র দুশো টাকা বেতনের চাকরি নিয়ে চলে গেলেন। এই কারণে আমার মন বেশ ভেঙে গিয়েছিল। তবে ওই যুবককে উপলক্ষ্য করে তাঁর শ্বশুরকে মাঝে মাঝে চিঠি লিখতে শুরু করি। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, তাঁর জামাই আমার বিশেষ বন্ধু। তিনিও আমার চিঠির উত্তর দিতেন। এইরকম চার-পাঁচটি চিঠি দেওয়ার পর একটি চিঠিতে লিখলাম আপনার বাড়ির দোতলার দক্ষিণ দিকের ঘরের দরজার ওপর তিনটি শ্লোক লেখা আছে বলে শুনেছি। যদি আপনার কোনও অসুবিধা ও আপত্তি না থাকে তাহলে ওই শ্লোক তিনটি পরের চিঠিতে আমাকে লিখে পাঠালে আমি অত্যন্ত বাধিত হব। ভদ্রলোক অত্যন্ত খুশি হয়ে আমাকে শ্লোক তিনটে লিখে পাঠিয়েছিলেন। সেই শ্লোক তিনটে পড়ে আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। বুঝতে পেরেছিলাম, বাবার ইচ্ছাতেই ওই ভদ্রলোক বাধ্য হয়েছিলেন গোলাঘাটে আসতে।

সাল ১২৯৪, অগ্রহায়ণ মাস, হঠাৎই স্বামীজির একটি চিঠি পেলাম। তিনি লিখছেন, এই চিঠি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তুমি কাশীধামে চলে এসো। আমি সকলকেই চিঠি দিয়েছি। তোমাকেও দিলাম। দরখাস্ত করলেই ছুটি পেয়ে যাবে। অবশ্যই আসবে।

চিঠি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি তিন মাসের জন্য ছুটির দরখাস্ত করলাম। নির্দিষ্ট সময়ে তা মঞ্জুরও হল। আমি বাড়ি না ফিরে সোজা কাশীধামে বাবার কাছে যাব বলে ট্রেন ধরলাম।

১০

কাশীধামের অলৌকিক, অবিস্মরণীয় সেই রাত। একটি দুটি নয়, পরপর তেরোটি রাত। গুরুদেব তাঁর প্রিয় শিষ্যকে তৈরি করছেন মনের মতো করে। এরপর বারে বারে বহু রাতই ফিরে এসেছে তাঁর জীবনে। কিন্তু সেই তেরোটি রাতের মতো আনন্দঘন রাত বোধহয় মহাত্মা উমাচরণ মুখোপাধ্যায়ের জীবনে আর কখনও আসেনি। গুরু-শিষ্য, পিতা-পুত্রের অলৌকিক রাত্রিযাপন। স্বামীজি তেরো রাত ধরে বারোটি অমূল্য বিষয় নিয়ে উপদেশ দিয়েছিলেন তাঁর ভাবি শিষ্যকে। আর শিষ্য মন্ত্রমুগ্ধের মতো তা কাগজের বুকে লিপিবদ্ধ করেছিলেন।

প্রথমদিন তিনি ঈশ্বর নিয়ে আলোচনা করেছিলেন।

'বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়োর্বিভিন্নাঃ।
নাহসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং।।
ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং।
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা।।'

ঈশ্বর কথাটিতে কোনো গুণ বুঝায়, কি কোনো বস্তু বুঝায় এবং তাঁহাকে জানিবার অথবা প্রত্যক্ষ করিবার কোনো উপায় আছে কি না? সকলেই স্বীকার করেন যে, ঈশ্বর কথাটি সর্বব্যাপী বস্তুই বুঝায়। যখন বলি ঈশ্বর সর্বব্যাপী, ঈশ্বর বিশ্বব্যাপী, তখন ঈশ্বরের যে স্থানব্যাপকতা গুণ আছে তাহাতে আর কাহারও সন্দেহ থাকে না। একখানি পুস্তক স্থান ব্যাপিয়া আছে এই জন্য তাহাকে সাকার বলি, কিন্তু ঈশ্বর স্থান ব্যাপিয়া আছেন, অথচ তাঁহাকে নিরাকার বলি—ইহার কারণ কি? যে দ্রব্য কোনো সীমাবদ্ধ স্থানে ব্যাপিয়া থাকে, তাহাকেই সকলে সাকার বলিয়া বুঝেন। কিন্তু বিশ্বব্যাপী ঈশ্বর কোনো সীমাবদ্ধ স্থান ব্যাপিয়া নাই। এই বিশ্ব যে অনন্ত ও অসীম, ঈশ্বর যে স্থান ব্যাপিয়া আছেন তাহার সীমা নাই, তাহা অনন্ত ও অসীম, এই জন্য তিনি নিরাকার।

যদি বলো কল্পনায় বিশ্বের একটি সীমা দিতে পারি, কিন্তু ঐ সীমা দিয়া একবার ভাব দেখি, যে ঐ সীমার বাহিরে আর স্থান আছে কি না? ইহা কেহ কখনও ভাবিতে পারিবে না এবং কাহারও বুদ্ধিতে আসিবে না। এই জন্যই বিশ্বের সীমা নাই এবং সেই জন্যই ঈশ্বর নিরাকার। এই বিশ্বে যত স্থান আছে, ততস্থান তিনি ব্যাপিয়া আছেন, এই জন্যই তিনি নিরাকার। মনুষ্যের জ্ঞান বা বুদ্ধির দ্বারা এমন কোনো বস্তু স্থির করিবার ক্ষমতা নাই যাহা দ্বারা তাঁহার আকারের তুলনা হয়; সুতরাং তাঁহার আকারের তুলনা নাই বলিয়াই তিনি নিরাকার।

ঈশ্বর নির্গুণ কেন? যাঁহার এত গুণ যাহা বুদ্ধির অগোচর তাহা কি প্রকারে নির্গুণ হইতে পারে? ঈশ্বরের গুণের সীমা নাই এবং কত প্রকার গুণ তাহারও সীমা নাই। অতুলনীয় গুণ বলিয়াই তিনি নির্গুণ। এই কথাটি অনেকের কাছে নূতন বোধ হইতে পারে, কারণ অসীম কথাটিতে সাধারণত এই প্রকার অর্থ বুঝায় যে যাহার পরিমাণ অত্যন্ত বেশি, যাহার পরিমাণের ইয়ত্তা নাই, তাহাকেই অসীম বলা যায়। এখানে যে অসীম কথাটি ব্যবহার হইয়াছে তাহার অর্থ, যাহার কোনো বিশেষ সীমা নাই, যাহার দ্বারা তাঁহাকে অন্য কোনও গুণ হইতে বিশেষ রূপে ভাবা যায়, যে গুণের এমন কোনো সীমা নাই তাহাই অসীম গুণ, ঈশ্বর নির্বিশেষ এই জন্য তিনি নির্গুণ! এই জগতে যত প্রকার গুণ আছে সকলই ঈশ্বরের একমাত্র গুণ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, সুতরাং এই গুণটি তাঁহাতে আছে এবং তাহার বিপরীত ভাবাপন্ন গুণটি তাঁহাতে নাই, একথা কেহই বলিতে পারিবেন না। এই জগতে যত গুণ আছে, সমস্তই তাঁহার এক অনির্বচনীয় গুণের অন্তর্গত,

এই জন্য তাঁহার গুণের সীমা নাই, এই জন্য তাঁহার গুণ আমাদের ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হইতে পারে না বলিয়াই তিনি নির্গুণ।

ঈশ্বরের রূপ কি প্রকার? এই জগতে যত প্রকার রূপ আছে সকলই তাঁহার একমাত্র রূপ হইতে উৎপন্ন হইয়া ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকাশ হইয়াছে। পৃথিবীতে এমন কোনো প্রকার রূপ নাই, যাহা সেই রূপের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। তিনি জ্যোতির্ময় আনন্দস্বরূপ বলিয়া, তাঁহাকে বিশ্বরূপ বলা হইয়া থাকে। বিষ্ণু, মহেশ্বর ও দেবদেবী সমস্তই তাঁহার স্থূল রূপ। প্রথমে এই সকল স্থূল রূপ ধ্যান না করিলে সূক্ষ্ম দর্শনের অধিকার হয় না; অতএব মুমুক্ষু ব্যক্তি প্রথমে স্থূল রূপের আশ্রয় লইবেন। ক্রমে তাঁহার অবিনাশী পরম সূক্ষ্ম রূপের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে বিশ্বরূপ যে কি প্রকার তাহা অনুভব করিতে পারিবেন। সে রূপের মাধুরী যিনি দেখেন নাই, তাঁহার তো কথাই নাই। আর যিনি দেখিয়াছেন তাঁহারও লিখিয়া প্রকাশ করিবার সাধ্য নাই। কারণ সেই প্রকার ভাষা নাই এবং সে রূপ দেখিলেই লোকে মোহিত হইয়া বাক্যহীন ও জ্ঞানশূন্য হয়।

ঈশ্বর চেতন কি অচেতন? ঈশ্বর চেতনও নহেন, অচেতনও নহেন, তাঁহার নির্গুণ অনবচ্ছিন্ন গুণকে চৈতন্য গুণ বলা হইয়া থাকে। চেতন গুণ কাহাকে বলে সকলেই তাহা জানেন, কিন্তু অনবচ্ছিন্ন চৈতন্য গুণ কিরূপ, তাহা আমরা অন্তরে ধারণা করিতে অক্ষম। ঈশ্বর বিশ্বরূপ, নিরাকার ও নির্গুণ, তাঁহার আকার ও গুণ সম্বন্ধে চিন্তা করা আমাদের সাধ্যাতীত। সেই জন্য তাঁহার উপাসনা করাও বড় শক্ত। বাস্তবিক নিরাকার ঈশ্বরকে আমরা ভাবিতে পারি না, ঈশ্বর মনের অগোচর, যদি কেহ বলেন যে, তিনি মনে মনে নিরাকার ঈশ্বরকে ভাবিতে পারেন তবে ইহা নিশ্চয় স্থির যে তিনি নিরাকার শব্দের অর্থও বুঝেন নাই। নিরাকার ও নির্গুণ সম্বন্ধে কিছুই ভাবা যায় না বলিয়া সগুণ ঈশ্বর ধারণা করিয়া চিন্তা করিতে হয়। সগুণ ঈশ্বর চিন্তা করিতে করিতে চিত্ত যত নির্মল হইবে ততই সেই আত্মার উজ্জ্বলতা অন্তরে উদিত হইবে। তখন মনের সাহায্য ব্যতিরেকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবে।

কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, সগুণ ঈশ্বর কাহাকে বলে? ঈশ্বরের স্বরূপ উন্নতির চরম সীমা। যিনি উন্নতির চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছেন তিনিই ঈশ্বরে লীন হইয়াছেন। এবং তাঁহার আর পরিবর্তন নাই। এই উন্নত মনুষ্য সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড আপনাতে দেখিতে পান এবং এই উন্নত মনুষ্য-দশার চরম আদর্শ পুরুষই সগুণ ঈশ্বর। এক মনুষ্যরূপ আধারে সমগ্র বিশ্ব যাঁহাতে একেবারে প্রতিবিম্বিত রহিয়াছে তিনিই সগুণ ঈশ্বর। যিনি কর্ম করিয়াও নিষ্ক্রিয়, যিনি মনুষ্য আকার ধারণ করিয়াও অন্তরে বিশ্বরূপ, যাঁহার আমি জ্ঞান, এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড জন্মিয়াছে, যিনি আমিই ব্রহ্ম, এইরূপ জ্ঞান করেন, সেই আত্মজ্ঞানী পুরুষই ভগবানের স্বরূপ এবং তিনিই সগুণ ঈশ্বর।

যদি ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞান লালসা জন্মিয়া থাকে তবে এইরূপ উন্নত পুরুষ সম্বন্ধে অবিরাম চিন্তা কর। নিজের আমি জ্ঞান এইরূপ মুক্ত আত্মার গুণে মিশাইতে চেষ্টা কর। ক্রমে দেখিবে চিত্ত নির্মল হইতেছে আর কোথা হইতে কে যেন তোমাকে পথ দেখাইয়া সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেছে। একই ঈশ্বর, ইনি নির্গুণ নিরাকার, বিশ্বব্যাপী এবং সচ্চিদানন্দ তাহা বেশ বুঝিতে পারিবে।

আমার চারিদিকে, অন্তরে ও বাহিরে যিনি নিত্য নিরবচ্ছিন্নভাবে অধিষ্ঠান করিতেছেন, যাঁহার ইঙ্গিত মাত্র ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য, বায়ু, ও বরুণাদি নিজ নিজ কর্তব্য পালন করিতে তৎপর হইতেছেন, যাঁহার সত্তা প্রভাবে আমরা জীবিত রহিয়াছি, যিনি চরণশূন্য অথচ সর্বত্র গমন করেন, কর্ণহীন অথচ মনের কথা পর্যন্ত শ্রবণ করেন, নেত্রহীন কিন্তু সমস্তই প্রত্যক্ষ করেন, যিনি আমাকে দেখিতেছেন, অথচ আমি তাঁহাকে দেখিতে পাই না; কাম, ক্রোধ, লোভ, দুরাশা, বিষয়-বাসনা ইত্যাদি প্রতারকগণ যাঁহার সমাগম-ভয়ে ভীত হইয়া দেশ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতেছে; জ্ঞান যাঁহার স্বরূপ নির্ণয় করিতে অক্ষম, কল্পনা যাঁহার পরিমাণ করিতে অক্ষম, মন ও আত্মা যাঁহার নিকটে গেলে আর ফিরিয়া আসে না, মায়া যাঁহাকে আবরণ করিতে পারে না, বাক্য যাঁহার ব্যাখ্যা করিতে পারে না তিনিই ঈশ্বর।

যাঁহার আরতি করিবার জন্য চন্দ্র, সূর্য দীপ জ্বালিতেছে, পবন চামর ব্যজন করিতেছে, তরুলতা পুষ্পরাশি লইয়া সুগন্ধ দান করিতেছে, বিহঙ্গ সকল কীর্তন করিতেছে, বজ্র শঙ্খনিনাদ করিতেছে, ভক্তি, শ্রদ্ধা, শান্তি, করুণা, মুক্তি যাঁহার পদসেবা করিতেছে, বৈরাগ্য, জ্ঞান, যোগ, ধর্ম যাঁহার দ্বারে প্রহরী রহিয়াছে, যিনি জীবের কর্মানুসারে ফল বিধান করিতেছেন, যাঁহাকে লোকে বিস্মৃত হইলেও তিনি তাহাকে ত্যাগ করেন না, যিনি মায়া নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া জাগ্রত করিবার জন্য সকলকে আহ্বান করিতেছেন, যিনি নিজে নির্গুণ হইয়া ত্রিগুণে ত্রিজগৎ বাঁধিয়া রাখিয়াছেন, অরূপ হইয়া আশ্চর্যরূপে ত্রিভুবন মোহিত করিয়া রাখিয়াছেন, চৈতন্য স্বরূপ হইয়া জীবকে মোহিনী মায়ায় অচেতন করিয়া রাখিয়াছেন তিনিই ঈশ্বর।

ব্রহ্ম জগৎ হইতে অতিরিক্ত কিন্তু ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন কোনও কিছু নাই। তবে যে ব্রহ্মভিন্ন পদার্থ সকল দৃশ্য হইতেছে সেই সমুদয় মরুভূমিতে মরীচিকার ন্যায় মিথ্যা জ্ঞান মাত্র। যে-কোনও বস্তু দৃশ্য বা শ্রুত হয় তাহা ব্রহ্ম ভিন্ন নহে, কারণ জ্ঞানোদয় হইলে সেই সমুদয় বস্তুকে অদ্বিতীয়, সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছু বোধ হয় না। জ্ঞানী ব্যক্তি সর্বব্যাপী, নিত্য ও জ্ঞানরূপ আত্মাকে জ্ঞানচক্ষু দ্বারা দর্শন করেন, জ্ঞানচক্ষুবিহীন ব্যক্তি তাঁহাকে দর্শন করিতে পারে না, যে প্রকার অন্ধ মনুষ্য সূর্যকে দেখিতে পায় না। যিনি সূক্ষ্ম নহেন, স্থুল নহেন, হ্রস্ব নহেন, দীর্ঘ নহেন, জন্ম-বিনাশ-বিহীন এবং রূপ, গুণ, বর্ণ ও নাম-রহিত, নিত্য, একই রূপে পার্শ্বে, ঊর্ধ্বে, নিম্নে ও চতুর্দিকে অবস্থান করেন যিনি পূর্ণ, সত্য, চৈতন্য, আদি, অন্তরহিত, অদ্বিতীয়, আনন্দময়, তিনিই ঈশ্বর।

যে লাভের পর লাভ আর নাই, যে সুখের পর আর সুখ নাই, যে জ্ঞানের পর আর জ্ঞান নাই, যাঁহাতে দৃষ্টি হইলে আর কোনো বস্তু দৃশ্য হয় না, যাহা হইলে আর তাহার পুনর্বার জন্ম হয় না, যাঁহাকে জানিলে আর কিছু জানিতে হয় না তিনিই ব্রহ্ম বা ঈশ্বর।

সূর্য, চন্দ্র প্রভৃতি কোনও দীপ্যমান বস্তু যাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, যাঁহার প্রকাশে সূর্য, চন্দ্র প্রভৃতি প্রকাশ হয়, যাঁহা দ্বারা এই ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ পায়; যে প্রকার অগ্নি লৌহপিণ্ডে প্রবিষ্ট হইয়া প্রদীপ্ত করে, সেই প্রকার স্বয়ং ব্রহ্ম সমুদয় বস্তুর অন্তরে ও বাহ্যে ব্যাপ্ত থাকিয়া সমুদয় জগৎকে প্রকাশ করেন, তিনিই ব্রহ্ম বা ঈশ্বর।

যিনি মনুষ্য, দেবতা, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, গৃহী, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ আশ্রয়ী এবং রাজা বা ভিক্ষু নহেন কিন্তু সর্বব্যাপী, সর্বান্তর্যামী, জ্যোতির্ময় জ্ঞানস্বরূপ; ইন্দ্রিয় প্রভৃতি জড় পদার্থ সকল যে অদ্বিতীয়, নিশ্চল, অগ্নির উষ্ণতার ন্যায় নিত্য জ্ঞানস্বরূপ, আত্মাকে আশ্রয় করিয়া নিজ নিজ কার্যে প্রবৃত্ত হয়, সেই নিত্য জ্ঞান স্বরূপ তিনিই ব্রহ্ম বা ঈশ্বর।

যেমন সূর্যোদয় লোক সকলের ব্যবহারের কারণ হয়, সেই প্রকার যিনি মন, বুদ্ধি, অহংকার ও চিত্ত এই চারি অন্তরেন্দ্রিয়ের ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের এবং পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের স্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃত্তির কারণ, আর সমস্ত উপাধি-রহিত ও আকাশের ন্যায় সর্বব্যাপী এবং মনোহর সৃষ্টিকার্য দ্বারা সর্বদা প্রত্যক্ষভাবে রহিয়াছেন তিনিই ব্রহ্ম বা ঈশ্বর।

যেমন দর্পণ, জল, তৈল প্রভৃতি বস্তুতে মুখ প্রতিবিম্বের দর্শন হয়, কিন্তু সেই প্রতিবিম্ব মুখ হইতে ভিন্ন নহে, সেইরূপ বুদ্ধিতে যে আত্মার প্রতিবিম্ব তাহা জীবাত্মা হইতে ভিন্ন নহে, তিনিই ব্রহ্ম বা ঈশ্বর।

যিনি স্বরূপত মনশ্চক্ষু ইন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন এবং মনের মন, প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, কর্ণের কর্ণ, কিন্তু মন, চক্ষু ইত্যাদি কোনও ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহেন, তিনিই ব্রহ্ম বা ঈশ্বর।

যেমন নানা পাত্রস্থ জলে এক সূর্যের প্রতিবিম্ব নানা প্রকার হয়, সেই প্রকার যিনি স্বয়ংপ্রকাশ, বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ অদ্বিতীয় হইয়াও নানা প্রকার জীবের নানা প্রকার বুদ্ধিতে, নানা প্রকারে কল্পিতের ন্যায় হইয়া রহিয়াছেন, তিনিই ব্রহ্ম বা ঈশ্বর।

যেমন সাধারণ প্রকাশক সূর্য এক হইয়াও অনেক চক্ষুর বিষয়কে এককালে প্রকাশ করেন, সেই প্রকার এক হইয়া অনেক বুদ্ধির বিষয়কে, যিনি এককালে প্রকাশ করিতেছেন, সেই নিত্য জ্ঞান স্বরূপ তিনিই ব্রহ্ম

বা ঈশ্বর।

যেমন চক্ষু সূর্যকিরণ দ্বারা প্রকাশিত রূপকে গ্রহণ করে এবং অপ্রকাশিত রূপকে গ্রহণ করিতে পারে না, সেই প্রকার এক সূর্য যে চৈতন্য জ্যোতি দ্বারা প্রকাশিত হইয়া রূপাদিকে প্রকাশ করে; সেই সর্বপ্রকার নিত্য জ্ঞানস্বরূপ তিনিই ব্রহ্ম বা ঈশ্বর।

যেমন সূর্য এক হইয়াও চঞ্চল জলেতে অনেক রূপ দৃষ্ট হয় কিন্তু স্থির জলেতে একরূপই দেখায়, সেই প্রকার স্বরূপত এক হইয়াও চঞ্চল বুদ্ধিতে নানা প্রকারে প্রতীত হয়েন, সেই নিত্য জ্ঞান স্বরূপ তিনিই ব্রহ্ম বা ঈশ্বর।

যেমন অতি অজ্ঞান ব্যক্তি স্বয়ং মেঘাবৃত নয়ন হইয়া এই অসম্ভাবিত কথা বলে যে সূর্য মেঘে আচ্ছাদিত হইয়া প্রভাশূন্য হইয়াছে, সেই প্রকার অজ্ঞানীদের নিকট যে নিত্য শুদ্ধ চৈতন্য বদ্ধ রূপে প্রতীত হয়েন সেই নিত্য জ্ঞানস্বরূপ তিনিই ব্রহ্ম বা ঈশ্বর।

যিনি গভীর নহেন, একমাত্র নির্বাণরূপী পুণ্যময়, যিনি জগতের সার, যিনি পাপ-পুণ্যবিহীন, যিনি ব্যক্ত, অব্যক্ত, রূপশূন্য এবং সর্বময় তিনিই ব্রহ্ম বা ঈশ্বর।

যিনি এক হইয়াও তাবৎ বস্তুর অন্তরে অন্তর্যামীরূপ হইয়া অবস্থিতি করেন কিন্তু তাবৎ বস্তু তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না এবং যিনি আকাশের ন্যায় সর্বব্যাপী, সেই নিত্য চৈতন্য স্বরূপ তিনিই ব্রহ্ম বা ঈশ্বর।

আত্মাকে পৃথিবী বলা যায় না, কারণ পৃথিবীতে গন্ধ গুণ আছে, আত্মার সে গুণ নাই, আত্মা সেই গন্ধের প্রকাশক। আত্মা জল নহে, কেননা জলে রস গুণ আছে, আত্মাতে তাহা নাই, আত্মা রসের বিজ্ঞাতা। আত্মাকে তেজ বলা যায় না, কারণ তেজে রূপ গুণ আছে, আত্মায় তাহা নাই, তিনি রূপের দর্শক। আত্মাকে বায়ু বলা যায় না, যেহেতু বায়ুর ন্যায় আত্মার স্পর্শ গুণ নাই, আত্মা স্পর্শ গুণের বিজ্ঞাতা। আকাশকেও আত্মা বলা যায় না, কারণ আকাশে শব্দগুণ আছে, আত্মায় তাহা নাই, আত্মা শব্দের উচ্চারণকর্তা। আত্মা কোনও প্রকার ইন্দ্রিয় হইতে পারে না, কারণ ইন্দ্রিয় অনেক, আত্মা এক এবং সর্ব অবস্থাতে এক ভাবাপন্ন। যিনি ভূমি প্রভৃতি হইতে পৃথক, কেবল নিত্য সর্ব-মঙ্গলময়, তাঁহাকেই আত্মা বলিয়া জানিবে এবং তিনিই ব্রহ্ম বা ঈশ্বর।

যে সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মের স্থান, পরিমাণ, রূপ, বর্ণ, কিছুই নাই, যিনি কোনও প্রকার আকৃতি-বিশিষ্ট নহেন, যাঁহার দ্রষ্টা, দৃশ্য, শ্রবণ, শ্রাব্য কিছুই নাই, যে ব্রহ্ম বৃক্ষ স্বরূপ, অথচ তাঁহার মূল, বীজ, শাখা, পত্র, লতা, পল্লব, পুষ্প, গন্ধ, ফল ও ছায়া কিছুই নাই, তিনিই নিত্য জ্ঞানময় ব্রহ্ম বা ঈশ্বর।

কি বেদ, কি শাস্ত্র, কি শৌচ, কি সন্ধ্যা, কি মন্ত্র, কি জপ, কি ধ্যান, কি ধ্যেয়, কি হোম, কি যজ্ঞ, যাহার এ সকল কর্মের কিছুই নাই, যিনি ঊর্ধ্বে নহেন, অধঃ নহেন, শিব নহেন, শক্তি নহেন, পুরুষ নহেন, নারী নহেন, ব্রহ্মা নহেন; বিষ্ণু নহেন; কি গ্রহ, কি তারা, কি মেঘমালা কিছুই নহেন, যিনি চন্দ্র নহেন, সূর্য নহেন, যাঁহার উদয় অস্ত কিছুই নাই, যিনি স্বর্গে, নরকে বা ক্ষেত্রে অবস্থিতি করেন না, কি জাতিগত, কি অজাতিগত, যাঁহার কোনো ভিন্নতা নাই, যিনি একমাত্র নির্বাণরূপী পুণ্যময়, যিনি জগতের সার, যিনি পাপ-পুণ্যবিহীন, সর্বময় চৈতন্য স্বরূপ, তিনিই ব্রহ্ম বা ঈশ্বর।

আলোকের প্রকাশে যেমন অন্ধকার বিনষ্ট হয়, কিন্তু অন্ধকারের তত্ব পরিজ্ঞাত হওয়া যায় না, সেই প্রকার অজ্ঞানের নাশ হইলেই জ্ঞান আপনি প্রকাশ পায়, ব্রহ্মই সর্বশক্তিমান বলিয়া তিনিই জীবাত্মা এবং সত্য, চৈতন্য তাঁহার স্বরূপ। ব্রহ্মই সর্বস্বরূপ জানিবে, কিছুই তাঁহা হইতে ভিন্ন নহে। আকাশে মেঘ হইতে আকাশের স্বরূপ অনুভব হয় না, মেঘ দূর হইলে আকাশ আবার পূর্ববৎ স্বচ্ছ হইয়া যায়। এই আকাশের অস্তিত্বও আকাশ রূপেই প্রতীয়মান হয়। সেইরূপ দৃশ্যপ্রপঞ্চের অবসান হইলে, চিৎশক্তির স্বাভাবিক সত্তা উদিত হইয়া থাকে। এই সত্তা বা অস্তিত্বও উহা হইতে ভিন্ন নহে। যে পদার্থ যাহা হইতে উৎপন্ন, সেই পদার্থ তাহা হইতে কদাচ ভিন্ন নহে। চিৎস্বরূপ, ইক্ষুরসের মধুরতা, অনলের উষ্ণতা, তুষারের শীতলতা, সর্ষপের তৈল স্বরূপ। চিৎসত্তাই জগতের সত্তা। জগৎসত্তাই চিৎসত্তার আকার। পল্লবের অন্তরে যেমন শিরা রেখা

থাকে, তাহা পল্লব হইতে অভিন্ন হইলেও বিভিন্নরূপে প্রতীয়মান হয়, সেই প্রকার ব্রহ্ম জগৎ হইতে অভিন্ন। ব্রহ্ম জগৎ হইতে এবং জগৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হইলেও এই জগৎকে ব্রহ্ম ধারণ করিতেছেন।

রাগ, দ্বেষ, বায়ু, মন, বুদ্ধি, মায়া, আশা, বাসনা, চিন্তা প্রভৃতি বিষয়গুলি কেহই দেখিতে পান না। ইহারা অপ্রত্যক্ষ হইলেও ইহাদিগের কার্য দেখিয়া প্রত্যক্ষ বলিয়া বোধ হয়। সেই প্রকার ঈশ্বরকে কেহ দেখিতে পান না কিন্তু তাঁহার অলৌকিক কার্যকলাপ দেখিয়া তিনি অপ্রত্যক্ষ হইলেও তাঁহাকে প্রত্যক্ষ বলিয়া বোধ হয়।'

'বিশ্বপতির বিশ্ব-সৃষ্টির অপার কৌশল সাধারণ মনুষ্যবুদ্ধির অতীত হইলেও নিয়মগুলি এত সরল যে অনুশীলন করিলেই হৃদয়ঙ্গম হইয়া মন ভক্তিরসে মগ্ন হয়। জীব সৃষ্টির প্রারম্ভে এই জগতে কেবল পঞ্চভূতের ও পরমাত্মার অস্তিত্ব বর্তমান ছিল, সেই পঞ্চভূতই জীব সৃষ্টির উপাদানস্বরূপ গৃহীত হইয়াছে।

সেই নিত্য চৈতন্য স্বরূপ পরমাত্মা হইতে প্রথমে আকাশ সৃষ্টি হয়। তাহার পর আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে। উৎপত্তির পরে আকাশে ইত্যাদিতে কারণগুণ ক্রমে তারতম্য বিশেষে সত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণ উৎপন্ন হয়। সেই অবস্থাপন্ন আকাশাদিকে সূক্ষ্মভূত, মহাভূত ও পঞ্চ তন্মাত্র কহা যায়। এই সকল সূক্ষ্মভূত হইতে সূক্ষ্ম শরীর এবং স্থূল ভূত সকল উৎপন্ন হইয়াছে।

সপ্তদশ অবয়ব বিশিষ্ট যে শরীর, তাহাকে সূক্ষ্ম শরীর বলে। সপ্তদশ অবয়ব-বিশিষ্ট শরীর যথা—পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ বায়ু, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় যথা—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক। এই সকল জ্ঞানেন্দ্রিয় পৃথক পৃথক আকাশাদির সাত্বিক অংশ হইতে উৎপন্ন হয়, যথা আকাশের সত্বাংশ হইতে কর্ণ, বায়ুর সত্বাংশ হইতে ত্বক, তেজের সত্বাংশ হইতে চক্ষু, জলের সত্বাংশ হইতে জিহ্বা এবং পৃথিবীর সত্বাংশ হইতে ঘ্রাণ উৎপন্ন হইয়াছে। এই সূক্ষ্ম শরীর সুখ ও দুঃখ ভোগের কারণ।

বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মক অন্তঃকরণ বৃত্তি। মন সংকল্প বিকল্পাত্মক অর্থাৎ সংশয়াত্মক অন্তঃকরণ বৃত্তি। চিত্ত ও অহংকার ইহারা উভয়ই বুদ্ধি ও মনের অন্তর্গত দুই বৃত্তি মাত্র। চিত্ত অনুসন্ধানাত্মক বৃত্তি এবং অহংকার অভিমানাত্মক বৃত্তি। বুদ্ধি ও মন আকাশাদি পঞ্চ ভূতের সাত্বিক অংশ হইতে উৎপন্ন হয়। এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি ইহার প্রকাশ স্বভাব বলিয়া সাত্বিক অংশের কার্য বলা যায়।

পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় যথা—বাক, পাণি, পাদ, পায়ু এবং উপস্থ। এই পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় পৃথক পৃথক, আকাশাদির রজঃ অংশ হইতে উৎপন্ন হয়, যথা আকাশের রজঃ অংশ হইতে বাক্য, বায়ুর রজঃ অংশ হইতে পাণি, তেজের রজঃ অংশ হইতে পাদ, জলের রজঃ অংশ হইতে পায়ু এবং পৃথিবীর রজঃ অংশ হইতে উপস্থ উৎপন্ন হইয়াছে।

পঞ্চ বায়ু যথা—প্রাণ, অপান, সমান, উদান এবং ব্যান। ঊর্ধ্বে গমনশীল নাসাগ্রস্থায়ী বায়ুকে প্রাণ বায়ু বলে। অধোগমনশীল পায়ু আদি স্থানে স্থায়ী বায়ুকে অপান বায়ু বলে। ভুক্ত পীত অন্নজলাদির সমীকরণকারী বায়ুকে সমান বায়ু বলে। ঊর্ধ্বে গমনশীল কণ্ঠে স্থায়ী বায়ুকে উদান বায়ু বলে এবং সর্ব নাড়ীতে গমনশীল সমস্ত শরীরে স্থায়ী বায়ুকে ব্যান বায়ু বলে।

সাংখ্য মতাবলম্বী লোকেরা কহেন যে, নাগ, কূর্ম, কৃকর, দেবদত্ত এবং ধনঞ্জয় নামক আরও পঞ্চ বায়ু আছে। নাগ উদগীরণকারী বায়ু, কূর্ম চক্ষু উন্মীলনকারী বায়ু, কৃকর ক্ষুধাজনক বায়ু, দেবদত্ত হাফিকা জনক অর্থাৎ হাইতোলা বায়ু এবং ধনঞ্জয় পুষ্টিকর বায়ু। বৈদান্তিকেরা প্রাণাদি পঞ্চ বায়ুতে এই নাগাদি পঞ্চ বায়ুর অন্তর্ভাব করিয়া প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু কহেন। এই প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু আকাশাদি পঞ্চ ভূতের মিলিত রজঃ অংশ হইতে উৎপন্ন হয়। গমনাগমন ক্রিয়া স্বভাববশত প্রাণাদি পঞ্চ বায়ুকে রজঃ অংশের কার্য বলা যায়।

শরীর তিন প্রকার, স্থূল শরীর, সূক্ষ্ম শরীর ও কারণ শরীর। এই তিন প্রকার শরীর মধ্যে পাঁচটি কোষ আছে, যথা—অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ এবং আনন্দময় কোষ।

১) স্থূল শরীর অন্ন রসে উৎপন্ন হয়, অন্ন রসে বৃদ্ধি পায় ও বিনষ্ট হইয়া অন্নরূপ পৃথিবীতে লয় পায়, এই নিমিত্ত তাহাকে অন্নময় কোষ বলে।

২) পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত এই প্রাণাদি পঞ্চ বায়ুকে প্রাণময় কোষ বলে।

৩) পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত মনকে মনোময় কোষ বলা যায়।

৪) জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত এই বুদ্ধিকে বিজ্ঞানময় কোষ বলা যায়। সেই বিজ্ঞানময় কোষ কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, সুখ, দুঃখ ইত্যাদি অভিমানী ইহলোক পরলোকগামী জীব বলিয়া উক্ত হয়।

৫) কারণ শরীরে সুষুপ্তি কালে আত্মা প্রচুর আনন্দ ভোগ করেন—এই নিমিত্ত ওই কারণ শরীরকে আনন্দময় কোষ বলা যায়। সন্তোষই কারণ শরীর।

জীবের কর্মের দ্বারা সঞ্চিত ও পঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূতের দ্বারা নির্মিত এই স্থূল শরীর সুখ-দুঃখের ভোগস্থান হইয়াছে। অনির্বচনীয় ও অনাদি যে অবিদ্যা, যাহা সমস্ত প্রপঞ্চের কারণ, তাহাকে কারণ শরীর কহা যায়। যিনি কারণ শরীর, সূক্ষ্ম শরীর ও স্থূল শরীর হইতে ভিন্ন, তিনিই আত্মা।

যে প্রকার স্ফটিক অতি নির্মল, নীলবর্ণাদি বস্ত্রের যোগে তাহাকে নীলবর্ণাদি বোধহয়, সেই প্রকার আত্মা অতি নির্মল কিন্তু অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময় এই পঞ্চ কোষ প্রভৃতির যোগে তাহাকে যেন তত্তৎ কোষময় প্রভৃতি বলিয়া বোধ হয়।

এই পঞ্চ কোষের মধ্যে জ্ঞানশক্তি-বিশিষ্ট বিজ্ঞানময় কোষ কর্তা। ইচ্ছাশক্তি বিশিষ্ট মনোময় কোষ কারণ; ক্রিয়াশক্তি বিশিষ্ট প্রাণময় কোষ কার্য। একত্রিত এই কোষত্রয়কে সূক্ষ্ম শরীর কহা যায়। যেমন বনেতে বৃক্ষের অভেদ, বনাবচ্ছিন্ন আকাশ ও বৃক্ষাবচ্ছিন্ন আকাশে ভেদ নাই। জলাশয়েতে জলের ভেদ নাই, জলাগত প্রতিবিম্বিত আকাশের সহিত জলাশয়গত প্রতিবিম্বিত আকাশের ভেদ নাই। এই প্রকারে সূক্ষ্ম শরীর উৎপন্ন হয়।

পঞ্চীকরণ : প্রত্যেক পঞ্চ ভূতকে সমান দুই ভাগ করিবে। পরে সেই দুই ভাগের মধ্যে প্রত্যেক পঞ্চ ভূতের প্রত্যেক প্রথম চারি অংশে স্বকীয় দ্বিতীয় অর্ধ ভাগের সহিত মিশ্রিত করণ।

এই পঞ্চীকরণকালে আকাশ শব্দগুণ উৎপন্ন হয়। বায়ুতে শব্দ ও স্পর্শ; অগ্নিতে শব্দ; স্পর্শ, রূপ; জলেতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস; পৃথিবীতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ উৎপন্ন হয়।

স্থূল শরীর চারি প্রকার : জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিদ। মনুষ্য, পশু প্রভৃতি জরায়ুজ হইতে উৎপন্ন হয়। পক্ষী, সর্পাদি অণ্ড হইতে উৎপন্ন হয়। ক্লেদাদি হইতে মশক, উই ইত্যাদি উৎপন্ন হয়। ভূমি হইতে বৃক্ষ, লতা ইত্যাদি সকল প্রকার উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়।

জরায়ুজ দেহ তিন প্রকার, পুরুষ, স্ত্রী ও নপুংসক। শুক্রের ভাগ অধিক থাকিলে পুরুষ হয়। শোণিতের ভাগ অধিক থাকিলে নারী হয়। শুক্র শোণিত উভয়ের ভাগ সমান থাকিলে নপুংসক হয়। অনন্তর ঋতুকালে পুরুষের স্ত্রী সংসর্গ হইলে জীব শুক্রের সহিত মাতৃগর্ভে প্রবিষ্ট হয়। যুগ্ম দিবসে সংসর্গ হইলে যে সন্তান উৎপন্ন হয় তাহা পুরুষ, অযুগ্ম দিবসে সহবাসে যে সন্তান হয় তাহা নারী। ঋতুস্নাতা নারী যাহার মুখাবলোকন করিবে সেই ঋতুকালে উৎপন্ন সন্তানের আকার তাহার ন্যায় হইবে। অতএব তখন স্বামীর মুখাবলোকন করাই কর্তব্য। তাহার পর পাঁচদিনে বুদ্বুদাকার হয়। সাতদিনে মাংসপেশিরূপে পরিণত হয়, পরে সেই পেশি একপক্ষ মধ্যেই শোণিতাপ্লুত হইয়া থাকে। পঞ্চবিংশতি দিবসে অঙ্কুরাকার হয়। এক মাসে ক্রমে স্কন্ধ, গ্রীবা, মস্তক, পৃষ্ঠ এবং উদর এই পাঁচটি অঙ্গ হয়। দ্বিতীয় মাসে হস্ত পদাদি, তৃতীয় মাসে সমুদয় অঙ্গ-সন্ধি এবং চতুর্থ মাসে জীবশরীরে রক্ত সঞ্চার হয়। পঞ্চম মাসে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, নখশ্রেণী এবং গুহ্য উৎপন্ন হয়। ষষ্ঠ মাসে গুহ্যছিদ্র, স্ত্রী চিহ্ন, পুং চিহ্ন, কর্ণছিদ্র এবং নাভি উৎপন্ন হয়। সপ্তম মাসে কেশ রোমাদি হয়। অষ্টম মাসে জীব গর্ভমধ্যে বেশ বিভক্ত অবয়ব হয়। কেবল দন্ত গোঁফ দাড়ি ইত্যাদি ব্যতীত সমস্ত অবয়ব গর্ভ মধ্যে হয়। নবম মাসে সম্পূর্ণরূপে চৈতন্য লাভ করে। তখন জীব জননীর ভোজন অনুসারে গর্ভ মধ্যেই বাড়িতে থাকে। তাহার পর গর্ভ হইতে বাহির হইয়া মাংসপিণ্ডবৎ কোনো কর্ম করিতে

পারে না। যতদিন সুষুম্না নাড়ী শ্লেষ্মা দ্বারা আবৃত থাকে, ততদিন কথা কহিতে পারে না, গমন করিতেও পারে না। কালক্রমে বালকের সকলই হয়, ক্রমে মায়াতে মুগ্ধ হইয়া গর্ভযন্ত্রণা ভুলিয়া যায়।

বাল্যাবস্থা অতিশয় কষ্টকর, কথা কহিয়া মনের ভাব প্রকাশ করা যায় না। ইচ্ছামতো কিছুই করা যায় না। সময়ে সময়ে বিষ্ঠা মাখিয়াও থাকিতে হয়, কোনো সুখ নাই। শৈশব কাল তাহা অপেক্ষাও কষ্টকর। সম্পূর্ণ পরাধীন, লেখাপড়া শিখিবার সময় নানা প্রকার পরিশ্রম করিতে হয়। যেমন ঐ সময়ে কাহারও বশীভূত হইতে ইচ্ছা হয় না, তেমনই ঐ সময়ে সকলেই বশীভূত রাখিতে চায়। কখনও পড়িয়া গিয়া আঘাত পাইতে হয়, কখনও ছুরি বা কাটারিতে হাত-পা কাটিয়া কষ্ট পাইতে হয়। নানা প্রকার অত্যাচার করিতে ইচ্ছা হয়, সেই জন্য খুব পীড়া ভোগও করিতে হয়।

যৌবনকাল তাহা অপেক্ষাও কষ্টকর, অধঃপাতে যাইবার সময়। কেবলমাত্র দেহের একটু চাকচিক্য হয়। যত প্রকার মন্দ কার্য লোকে এই সময় করিয়া থাকে। নানা প্রকার নেশা, বেশ্যাবৃত্তি, লোভ, চুরি, বিষয়ে আসক্তি, মারামারি, কাটাকাটি, বিবাদ, মোকর্দমা, যাহা কিছু মন্দ কর্ম আছে সমস্ত এই সময় করিয়া থাকে। সমুদ্র সন্তরণ দ্বারা পার হওয়া সম্ভব কিন্তু যৌবন শান্তভাবে কাটানো কোনো মতেই সম্ভবপর নহে। অধিকাংশ লোকেই এমন যত্নের দেহ নানা প্রকার অত্যাচার করিয়া মাটি করিয়া ফেলে। যিনি ভালো ভাবে কাটাইতে পারেন তিনিই মহাপুরুষ। লোকে যৌবনে পদার্পণ করিলেই নারীতে আসক্ত হওয়া প্রধান কার্য ধারণা করে। যতদিন না স্ত্রীসংসর্গ হয় ততদিন তাহার সংসার অসার, নানা প্রকার বৃথা বৈরাগ্য, জীবনে কোনো সুখ নাই বলিয়া মনে হয়। বিবেচনা করিয়া দেখ রমণীতে কী আছে? পঞ্চভূত লইয়া একটা আকার ভিন্ন আর কিছু নহে। স্তনযুগল মাংসপিণ্ড ভিন্ন আর কিছুই নহে। সংসর্গ করা নরক ভোগ ভিন্ন আর কিছু নহে। মনুষ্য মৎস্য, চিত্ত তাহার জল, বাসনা তাহার সূতা বঁড়শি, চিন্তা তাহার টোপ। সংসারে তরুণীর প্রতি আসক্ত যুবা, বিন্ধ্য শৈলের গহ্বরে করিণীলোলুপ করীর ন্যায় আবদ্ধ হইয়া অতীব শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হয়। যাহার বাসনা আছে তাহারই ভোগ ও কামনা আছে। বাসনা পরিত্যাগ করিলেই জগৎ পরিত্যাগ করা হয়। জগৎ পরিত্যাগ করিলেই মহা সুখী হওয়া যায়।

যৌবন পূর্ণ হইতে না হইতে জরা আসিয়া যৌবনকে গ্রাস করিয়া বার্ধক্য অবস্থায় আনয়ন করে। জরা আক্রমণ করিলেই লোভ বাড়ে, শ্রীহীন, তেজোহীন ও শক্তিহীন হইয়া চিন্তায় মগ্ন হয়; সেই সময়ই আত্মীয় লোক ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য করিয়া থাকে। যত বার্ধক্য বেশি হয় ততই ভালো খাইবার ইচ্ছা বলবতী হয় কিন্তু কার্যে তাহা পারে না। সেই সময় নানা প্রকার চিন্তা উপস্থিত হয়, পূর্বে যাহা কিছু অন্যায় কার্য করিয়াছে সকলই একে একে মনে উদয় হয়, আর কি করিলাম, কি হইবে, কি করা উচিত, পরকালেই বা কি হইবে, এই প্রকার ভাবিয়া অতিশয় ভীত হয় ও শেষে চুপ করিয়া থাকাই স্থির করে; কারণ এই অবস্থায় নিরুৎসাহ এবং কাতরতা উপস্থিত হয়। বল-শক্তিহীন আহারেও অশক্ত হইয়া দুঃখে হৃদয় দগ্ধ হইতে থাকে। শরীরে জরা উপস্থিত হইলে মৃত্যু তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হয়। শ্বাস, কাশ, মূর্ছা, বাত, ভেদ, আমাশয় ইত্যাদি নানা প্রকার ব্যাধির যাতনায় চিৎকার করিয়া কাঁদিতে থাকে, চক্ষের জলে বুক ভাসিয়া যায়। যে দেহের এত যত্ন, এত আদর, এত ভালোবাসা, আজ সেই দেহ মৃত্যুমুখে পতিত; আত্মীয়স্বজন, স্ত্রী, পুত্র, বিষয়সম্পত্তি সকলই পরিত্যাগ করিয়া কোথায় যাইতে হইবে ভাবিয়া কাঁদিয়া আকুল হয়।

দেহের অল্পেই আনন্দ এবং অল্পেই দুঃখ হইয়া থাকে, অতএব দেহের ন্যায় নীচ, শোচনীয় এবং গুণহীন আর কিছুই নাই। দেহের সম্বন্ধ আমাতে নাই; আমার সম্বন্ধও দেহেতে নাই; এই দেহ ও আমি এক নহে। যিনি সৎপথ অবলম্বনপূর্বক ঈশ্বরসেবায় রত থাকিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করেন তিনি শেষে ঈশ্বরেই লয়প্রাপ্ত হন, আর যিনি বিষয়-বাসনায় ও ভোগবিলাসে মজিয়া যান তাঁহার জন্মটা বিফলে যায়। ঈদৃশ সংসারেও যাহাদের অসার সুখ ভাবনা, কাল তাহাদিগকেও ছেদন করিয়া থাকে। জগতে উৎপন্ন এমন কোনো বস্তু নাই যাহা কালের করাল গ্রাসে পতিত না হয়।

ভগবান সৃষ্টির জন্য নিজ রূপকে স্বেচ্ছাক্রমে স্ত্রী পুরুষ এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। শিব প্রধান পুরুষ, শিবা পরমা শক্তি, তত্বদর্শী যোগীগণ তাঁহাকে শিব শক্তি উভয়াত্মক পরাৎপর পরমব্রহ্ম বলিয়া কীর্তন করেন। তিনিই বিষ্ণুরূপে এই সমস্ত জগৎ পালন করেন, আবার তিনিই অন্তকালে শিবরূপে সমস্ত জগৎ সংহার করেন।

এই চারি প্রকার স্থূল শরীর স্থূল ভোগের হেতু জাগ্রত বলা যায়। জাগ্রতকালে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক এই পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা ক্রমে রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ—এই পঞ্চ বাহ্য বিষয় সকল অনুভূত হয়।

বাক, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা ক্রমেতে বচন, গ্রহণ, গমন, ত্যাগ ও আনন্দ এই পঞ্চ বাহ্য বিষয়ের অনুভব হয়।

মন, বুদ্ধি, অহংকার ও চিত্ত এই চারি অন্তরিন্দ্রিয় দ্বারা ক্রমে সংশয়, নিশ্চয়, অহংকার, চৈত্য এই সকল বিষয় অনুভূত হয়।

তাহার পর জীবশরীরে জীবন বা প্রাণ অর্থাৎ জীবাত্মা, আত্মা, পরমাত্মা বা চৈতন্য, এই সমুদয়ই এক চৈতন্য বলিয়া জানিবে। যেমন বৃক্ষ বন ছাড়া নহে, জল জলাশয় ছাড়া নহে, দগ্ধ লৌহখণ্ড আগুন ছাড়া নহে।

জীব চৈতন্যতে নানা প্রকার মতাবলম্বী ব্যক্তিরা নানা মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। অতি অজ্ঞানী ব্যক্তিরা পুত্রকে আত্মা কহেন, কেহ স্থূল শরীরকে আত্মা কহেন, কেহ কেহ বলেন ইন্দ্রিয়গণই আত্মা, কেহ কেহ প্রাণকে আত্মা কহেন, কেহ মনকে আত্মা কহেন, কেহ বুদ্ধিকে আত্মা কহেন, কেহ অজ্ঞানকে আত্মা কহেন, কেহ চৈতন্যকে আত্মা কহেন, অনেকে শূন্যকে আত্মা কহেন। এই প্রকারে পুত্র হইতে শূন্য পর্যন্ত অতি অজ্ঞানী ব্যক্তির দ্বারা আত্মার ব্যাখ্যা হইয়া থাকে। বাস্তবিক পুত্র স্থূল শরীর, ইন্দ্রিয় প্রাণ, মন, বুদ্ধি, অজ্ঞান বা শূন্য কখনওই আত্মা হইতে পারে না। কেবল সত্যস্বরূপ চৈতন্যই মাত্র আত্মা। ঐ সকল যেমন রজ্জুতে সর্প ভ্রম হইলে পশ্চাৎ ভ্রম নাশ হইলে সর্প জ্ঞানের উচ্ছেদ হইয়া কেবল রজ্জু মাত্র থাকে; সেইরূপ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম বস্তুতে, অবস্তু রূপ অজ্ঞানাদি জড় বস্তুর ভ্রম, তাহার নাশ হইলে পশ্চাৎ ব্রহ্ম মাত্রেরই অবস্থিতি হয়।

তত্বমসি অর্থাৎ তৎ ত্বং অসি। তৎ পদের অর্থ অপ্রত্যক্ষ চৈতন্য, ত্বং পদের অর্থ প্রত্যক্ষ চৈতন্য, এই উভয় পদের অর্থ শোধন করত তৎ ত্বং অসি—এই বাক্য দ্বারা অখণ্ড চৈতন্য অবগত হইলে, আমি নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, সত্যস্বরূপ, পরমানন্দ, অদ্বিতীয় ব্রহ্ম এইরূপ ভাব অন্তঃকরণে উদয় হয়। সেই অন্তঃকরণ-বৃত্তিতে চৈতন্য প্রতিবিম্বিত হইলে তৎ প্রকাশে অভিন্ন পরব্রহ্ম বিষয়ক অজ্ঞান নষ্ট হয়, যেমন প্রদীপের প্রভা সূর্য-প্রভাকে প্রকাশ করিতে অক্ষম। মনোবৃত্তি দ্বারা অজ্ঞান নাশ হয়, কিন্তু প্রতিবিম্বিত চৈতন্য তাহাকে প্রকাশ করিতে পারে না। যেহেতু পরব্রহ্ম স্বপ্রকাশ স্বরূপ, অতএব তাঁহার অন্য কর্তৃক প্রকাশিত হওয়া সম্ভব নহে। সর্বব্যাপী, প্রকাশ স্বরূপ, জন্ম-রহিত, বিনাশ-রহিত, অলিপ্ত, সর্বগত, সর্বদা বিমুক্ত স্বভাব তাহাই অদ্বিতীয় চৈতন্য।

মায়াময় অচেতন সত্ব, রজঃ এবং তমঃ গুণ ও ইন্দ্রিয়গণ ইহারা সমুদয় কর্ম করে। ঐ গুণত্রয় এবং ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা আত্মা সচেতন হইয়াও কিছুমাত্র করেন না। যে প্রকার লৌহ অচেতন হইয়াও চুম্বক প্রস্তরের নিকটস্থ হইলে গমন করে, সেই প্রকার দেহ মধ্যে সকল অচেতন হইয়াও চৈতন্যের অধিষ্ঠানে স্বীয় স্বীয় কর্ম করে। যে প্রকার সূর্যের প্রকাশে লোক সকল কর্ম করে, কিন্তু সূর্য স্বয়ং কোনও কর্ম করেন না এবং কাহাকেও কর্মে নিয়োগ করেন না, আত্মাও ঠিক সেই প্রকার জানিবে।

আত্মা স্বভাবত নির্মল ও সর্বব্যাপী হইয়াও সদসৎ কর্ম সকলের আমি কর্তা, আমি ভোক্তা, আমি দ্রষ্টা এই রূপ জ্ঞান করেন। যে প্রকার স্ফটিক স্বভাবত নির্মল হইয়াও নানাবিধ বর্ণের সন্নিধানে নানাবিধ বর্ণ ধারণ করে, সেই প্রকার আত্মা সর্বব্যাপী ও স্বভাবত নির্মল হইয়াও, সত্ব, রজঃ, তমঃ গুণে মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও শরীরাদি স্বভাব ধারণ করে।

যে প্রকার বাষ্পজালে জল ভ্রান্তি, শুক্তিকাতে রৌপ্য ভ্রান্তি, রজ্জুতে সর্প ভ্রান্তি, দৃষ্টি দোষে দিক ভ্রান্তি এবং দৃষ্টির বৈলক্ষণ্য দ্বারা এক চন্দ্র দুই চন্দ্র দেখায়, সেই প্রকার সমুদয় এই জগৎও ভ্রান্তিমূলক হয়। ধর্ম, অধর্ম, সুখ, দুঃখ, কল্পনা, স্বর্গ ও নরক বাস, জন্ম, মরণ, বর্ণ এবং আশ্রম এই সকল সংসার অবস্থায় হয়; পরমার্থে এ সকল নাই। যে প্রকার এক সূর্য সমুদয় জলাশয়ে ভিন্ন ভিন্ন দেখায়, সেই প্রকার এক আত্মা সমুদয় উপাধিতে, অর্থাৎ মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও শরীরাদিতে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশিত হন।

যে প্রকারে জলে পতিত সূর্যবিম্ব জল গমন করিলে গমন করে, জল স্থির থাকিলে স্থির থাকে, ইহা সেই প্রকার; অন্তঃকরণ গমন করিলে আত্মা গমন করেন এবং অন্তঃকরণ স্থির থাকিলে আত্মা স্থির থাকেন। যে রাহু অদৃশ্য হইয়া চন্দ্রবিম্বে প্রকাশিত হয়, সেই প্রকার সর্বব্যাপী আত্মা অদৃশ্য হইয়াও জীবের বুদ্ধিতে দৃশ্য হন। যে প্রকার নির্মল দর্পণে মনুষ্য স্বীয় রূপ দর্শন করে, সেই প্রকার নির্মল বুদ্ধিতে আত্মা আত্মস্বরূপ দর্শন করেন।

পঞ্চভূত, ইন্দ্রিয় সকল, বুদ্ধি, মন এবং অহংকার ইহারা মায়াবশত সংসারের সৃষ্টি ও রক্ষা করণে সমর্থ এই জন্য ইহারা ত্যাজ্য, কারণ ইহারা কেবল বন্ধনের কারণ। যে প্রকার আকাশ ঘটাদি বস্তুর অন্তরে ও বাহিরে স্থিতি করে, সেই প্রকার পরমাত্মা সমুদয় বস্তুর অন্তরে ও বাহিরে স্থিতি করেন, অতএব তাঁহার বন্ধন কি মোক্ষ অসম্ভব, কিন্তু দেহ এবং আমি এই প্রকার জ্ঞানই বন্ধনের কারণ। যে প্রকার গুড়, শর্করা ও রস এক ইক্ষুরই বিকার মাত্র, সেই প্রকার এক আত্মাতেই নানাবিধ অবস্থা হয়।

পরমাত্মা, প্রাণ প্রভৃতি অসংখ্য অবস্থা ভেদে আপনাকে জালের ন্যায় কখনও বিস্তার, কখনও বা সংহার করিয়া, স্বীয় ঐশ্বর্য দ্বারা যেন ক্রীড়া করিতেছেন। প্রথম জাগ্রত অবস্থায় বিশ্ব, দ্বিতীয় স্বপ্নাবস্থাপন্ন তৈজস, অর্থাৎ স্বপ্নাবস্থায় সূক্ষ্ম শরীর উপাধি বিশিষ্ট যে চৈতন্য এবং তৃতীয় সুষুপ্তি অবস্থাপন্ন প্রাজ্ঞ অর্থাৎ জ্ঞান উপাধি বিশিষ্ট সুষুপ্তি অবস্থায় যে চৈতন্য এই তিন প্রকার ভ্রান্ত চৈতন্য দ্বারা ব্রহ্মচৈতন্য আচ্ছাদিত হইয়া আছেন। এই রূপ জ্ঞানের স্বয়ং আত্মাই বুদ্ধিস্থ পুরুষ অর্থাৎ আত্মা বলিয়া উপলব্ধি করেন।

যে প্রকার অগ্নি হইতে ধূমের ঊর্ধ্ব গতির দ্বারা আকাশে নানাবিধ আকৃতি প্রকাশ পায় সেই প্রকার সর্বব্যাপী পুরুষের স্বীয় মায়াতে সৃষ্টি রূপ দ্বৈত বিস্তার প্রকাশ পায়। মন শান্ত হইলে যেন আত্মা শান্ত, মন প্রফুল্ল হইলে যেন আত্মা প্রফুল্ল এবং মুগ্ধ হইলে যেন আত্মা মুগ্ধ হন। আত্মার এই সকল ভাব সংসার-অবস্থায় ব্যবহারিক মাত্র, বাস্তবিক তাহা সত্য নহে। যে প্রকার মেঘজনক ধূমের ঊর্ধ্ব গতিতে গগনতল মলিন হয় না, সেই প্রকার আত্মা প্রকৃতি-বিকারে লিপ্ত হন না। যে প্রকার ধূমাদির মালিন্য দ্বারা এক ঘট মলিন হইলে অন্য ঘট সকল মলিন হয় না, সেই প্রকার এক দেহস্থ জীব মলিন হইলে অপর দেহস্থ জীব মলিন হয় না।

এক ব্যক্তির দোষগুণে অন্য ব্যক্তি যে লিপ্ত হয় না এই স্থলে এ আশঙ্কা হইতে পারে, আত্মা একই, দুই নহেন; তিনি সকল দেহে আছেন, কেবল উপাধি গুণের সংসর্গে তাঁহারই জীব সংজ্ঞা হইয়াছে, তবে এক ব্যক্তির দোষগুণে অন্য ব্যক্তি লিপ্ত হয় না কেন? পূর্বে বলা হইয়াছে, আত্মা এক বটেন কিন্তু আকাশের ন্যায় নির্মল ও উপাধি গুণে কখনও লিপ্ত হয় না এবং বন্ধন কি মুক্তি তাহার কখনওই নাই। এক আত্মার অধিষ্ঠান সকল জীবে থাকাতে যে আত্মাকে জীব ও সকল জীবকে এক বলিয়া বিবেচনা করা ইহা নিতান্ত অসঙ্গত। অতএব ভিন্ন ভিন্ন উপাধি ভাবাপন্ন জীবের ভিন্ন ভিন্ন কার্য দ্বারা শুভাশুভ ফল ভোগ ভিন্ন ভিন্ন জীবেরই অবশ্য হইবে, আত্মার সহিত তাহার কোনো সংস্রব নাই, সুতরাং এক ব্যক্তির দোষগুণে যে অন্য ব্যক্তি লিপ্ত হয় না ইহা সম্পূর্ণরূপে সঙ্গত।

জীবের কর্মানুসারে আত্মকৃত ফল, সুখ, দুঃখ, স্বর্গ, বা নরক তাহার এই জগতেই ভোগ হইয়া থাকে। নরক ও স্বর্গ পৃথক স্থান নহে। তাহার প্রমাণ আবশ্যক করে না, কারণ জীবের অসংখ্য প্রকার কষ্টপীড়া সুখদুঃখ ভোগ হইতেছে তাহা সকলেই সৃষ্টি করিতেছেন। স্বর্গ বা নরক অন্য স্থানে হইলে সুখদুঃখ ইহ

জীবনে ভোগ করিতে হইত না এবং পরকাল অর্থাৎ পরজন্মও থাকিত না। জীবন্মুক্ত আত্মার কোনো কষ্ট ভোগ নাই।

মনোবৃত্তির সহিত মানবের অবয়বের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। বৃত্তি ও স্বভাব অনুসারে মানবের অবয়বের তারতম্য হইয়া থাকে। যাহার অতি ক্রুদ্ধ স্বভাব তাহার অবয়ব হইতে শান্ত প্রকৃতি বিশিষ্ট মানবের অবয়ব সম্পূর্ণ ভিন্ন। এমন অনেক মনুষ্য আছেন যাঁহারা মানবের বাহ্য দৃশ্য দর্শন করিয়া তাহার স্বাভাবিক ভাব অবধারণ করিতে পারেন। গুণ সকল স্বীয় স্বীয় ভোগের নিমিত্ত; দেহে ও ইন্দ্রিয় সকলে নিয়ত ইহারা কর্ম করে। আমি কর্তা নহি, কোনো বস্তু আমার নহে, এই রূপ জ্ঞান হইলে জীব কর্মে বদ্ধ হয় না।

পরমাত্মা এই ব্যক্ত ও অব্যক্ত বিশ্বের পিতা, আত্মা সেই পরীক্ষা ক্ষেত্রে ভোগে আবদ্ধ, তাঁহাদের জানিলেই বন্ধন মোচন হয়। সংসার-বন্ধন আত্মার নাই। পরমাত্মাকে অনুসরণ করাই মোক্ষ লাভের সেতু। আত্মার উৎপত্তি ও বিনাশ নাই; চিরকাল ব্রহ্মসত্তাকে আশ্রয় করিয়া আছেন ও থাকিবেন।

যখন জীবাত্মা উপাধিযুক্ত তখন তিনি জীবাত্মা, পরমাত্মা হইতে স্বতন্ত্র এবং যখন উপাধিযুক্ত নহেন তখন একত্র। এই জগতের প্রত্যেক জীবাত্মা পরমাত্মার অংশরূপে বিরাজমান। আত্মা শুদ্ধ, নির্গুণ এবং নির্মল প্রকৃতিকে আশ্রয় করিলে তিনি অশুদ্ধ সগুণ সমল। যতক্ষণ পর্যন্ত আত্মা প্রকৃতির সহিত সংযুক্ত থাকেন ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁহার সুখ, দুঃখ, হর্ষ, বিষাদ ভোগ করিতে হয়। আত্মা যতক্ষণ পর্যন্ত দেহ অধিকার করিয়া থাকেন ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁহাকে সংসারে সুখদুঃখ ভোগ করিতে হয়, আর যখন তিনি দেহ ত্যাগ করেন তখন তাঁহার সুখদুঃখ জ্ঞান থাকে না।

বালক শৈশবে যেমন উলঙ্গ থাকে জগতের যখন বাল্য অবস্থা ছিল তখনকার জগৎবাসীরাও উলঙ্গ থাকিত, বালকের যেমন লজ্জা নাই তখনকার লোকদিগেরও সেই প্রকার লজ্জা জ্ঞান ছিল না।

সাধুগণকে পরিত্রাণ করিবার জন্য পাপাত্মাগণকে সংহার করিবার জন্য এবং ধর্ম সংস্থাপন করিবার জন্য তিনি যুগে যুগে অবতার হইয়া সাধু হৃদয় অবস্থানপূর্বক জীবের আদর্শ দেখান। কোনো শাস্ত্র পাঠ করিলে ঈশ্বরকে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না, কিন্তু ভক্তিভাবে মনোযোগপূর্বক এই বিষয়গুলি পাঠ করিলে পুণ্যবান ব্যক্তি মাত্রেই ঈশ্বরকে হৃদয়ঙ্গম ও হৃদয়ে অবরুদ্ধ করিতে পারেন।

প্রজ্বলিত অগ্নি হইতে যেমন সহস্র সহস্র স্ফুলিঙ্গ সমুৎপন্ন হয় সেইরূপ সেই অব্যয় পরমাত্মা হইতে বিবিধ জীবাত্মার সৃষ্টি হয় ও পরিণামে তাহাতেই লীন হয়। সেই পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন হইয়া অন্তে সেই পরমাত্মাকেই প্রাপ্ত হয়। সুতরাং ইহা স্থির যে আত্মা ও জীবাত্মা এক পরমাত্মা হইতে সমুৎপন্ন হয়। আত্মা ও জীবাত্মা এবং পরমাত্মা সর্বদা সংযুক্ত হইয়াই আছেন ইহা জ্ঞানী মাত্রেই বেশ বুঝিতে পারিবেন।'

সংসার : 'সংসার কাহাকে বলে? সকলেই অবগত আছেন আপনি স্বয়ং ও স্ত্রী, পুত্র আত্মীয়স্বজন লইয়াই সংসার। আর কিছু অর্থ উপার্জন দ্বারা কিছু কিছু বিষয়াদি করিয়া ইহাদিগকে লালনপালন করাই সংসারের প্রধান কার্য। ছোট-বড় সমস্ত লোকই সারা জীবন ইহাতেই মোহিত হইয়া রহিয়াছেন, মায়াতে মুগ্ধ হইয়া কে পিতা, কে মাতা, কে ভ্রাতা, কে আত্মীয়, কোথা হইতে আসিয়াছি, কোথায় আসিয়াছি, কি জন্য আসিয়াছি, কেনই বা দেহ ধারণ করিয়াছি, কে আনিল, কে আমাকে কোন কার্য সমাধা করিবার জন্য এখানে পাঠাইয়াছেন কিছুই না ভাবিয়া আত্মবিস্মৃত হইয়া রহিয়াছেন। কখনও ধনী, কখনও মানী, কখনও জ্ঞানী মনে করিয়া উন্মত্ত ও উল্লাসযুক্ত হইয়াছেন, কখনও শোক, কখনও তাপ, কখনও রোগ, কখনও নিন্দা, কখনও বা ব্রাহ্মণ বর্ণে আপনাকে বরণ করিতেছেন। কখনও ভোগী, কখনও যোগী, কখনও ত্যাগী মনে করিয়া আপনাকে নানা অবস্থার অধীন করিতেছেন। কখনও ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া পরপীড়নে উত্তেজিত হইতেছেন; কখনও লোভগ্রস্ত হইয়া পরদ্রব্য অপহরণে ব্যস্ত হইতেছেন; কখনও মোহে অন্ধ হইয়া কাহাকেও পর ভাবিতেছেন, কখনও বিষয়মদে মত্ত হইয়া জগৎকে তৃণবৎ তুচ্ছ ভাবিতেছেন।

মানব তুমি একবার ভাবিয়া দেখ, তোমার অহংকার করিবার কী আছে? যাঁহার সমক্ষে পৃথিবী একটি ধূলিকণা, সূর্য মণ্ডল একটি ক্ষুদ্র বর্তুল, মহাসমুদ্র গোষ্পদ তুল্য সেখানে কি তোমার ক্ষুদ্র দেহ ক্ষুদ্র প্রাণ

গণনীয় হইতে পারে। তুমি ধূলিকণার একটি সূক্ষ্ম পরমাণুর সামান্য অংশ মাত্র, সেখানে আবার তোমার অহংকার কিসের? সত্ব রজঃ তমঃ এই তিন স্থূল আবরণে নেত্র আচ্ছাদন করিয়াছ, সূক্ষ্ম রূপ পরিহারপূর্বক স্থূল দেহ ধারণ করিয়াছ, এক্ষণে আর আপনাকে আপনি চিনিতে পারিতেছ না। এখনও সময় অতীত হয় নাই, এই বেলা আত্মতত্ব নির্ণয় করিয়া চিনিয়া লও তুমি কে এবং কি জন্য এখানে আসিয়াছ।

সকল মনুষ্যকেই "আমার" এই কথাটিতে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। তোমার শিশু অতি রূপবান হইলেও আমার চিত্ত সহসা তত আনন্দিত হয় না যত আমার পুত্র কদাকার হইলেও তাহাকে বারংবার দেখিয়াও নয়নের তৃপ্তি হয় না। যে কার্য তোমার জন্য আমাকে করিতে হইবে তাহা সামান্য হইলেও অতি শ্রমসাধ্য ও ক্লেশকর বলিয়া বোধহয় কিন্তু তাহা অপেক্ষা শত গুণ কার্য যদি "আমার" এরূপ বোধ হয় প্রাণপণে তাহা সমাধা করিলেও বিশেষ ক্লেশ বোধ হয় না। কোনও দ্রব্য তোমার অধিকারে থাকিলে যদি তাহার অপচয় হয় তবে তাহার জন্য কিছুমাত্র দুঃখ হয় না কিন্তু যখন সেই দ্রব্য আমার বলিবার অধিকার পাই তখন যত্ন ও আদরের সীমা থাকে না। আজ যাহা তোমার বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকি পরদিন তাহাই যদি আমার হয় তবে মুখে আর প্রশংসা ধরে না। এই মায়া রাক্ষস "আমার" শব্দটির কুহক জালে কীট হইতে ব্রহ্ম পর্যন্ত মোহিত হইয়া রহিয়াছে। আমি যাহাকে আমার বোধের যত্ন করি, কালের বশে তাহা কাহার হইবে তাহা কাহারও বলিবার সাধ্য নাই।

আমার বুদ্ধিই আমার সর্বনাশ করিল। বাস্তবিক কি তবে আমার কেহ নাই, এখন জানিলাম আমার বলিতে যিনি আছেন আমি তাঁহার হইতে চাহি না বলিয়া তিনি আমার নহেন। শাস্ত্রে বলে সকলই তাঁহার, আমি ভাবি এ সকল আমার। এই সামান্য ধন, পুত্র, দুঃখ, বিষয়সম্পত্তি আমার বলিতে এত আহ্লাদ হয়, যদি একবার সরল চিত্তে, ভক্তিভাবে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার তাঁহাকে আমার বলিতে পারি, না জানি তাহা হইলে কি অপূর্ব আনন্দ হয়।

মানব তুমি বিদ্যাবান হইবার জন্য কত পুস্তক পাঠ করিতেছ। সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, জ্যামিতি, গণিত, নানা প্রকার শাস্ত্র ইত্যাদি পাঠ করিতেছ, কিন্তু যে পুস্তক পাঠ করিলে তুমি প্রকৃত পণ্ডিত হইতে পারো সে পুস্তক পড়িলে না, পড়িবার ইচ্ছাও নাই, তুমি অন্য লোকের ভাষা, অন্য লোকের ইতিহাস ও জীবনী পাঠ করিতেছ কিন্তু নিজের কি আছে বা নাই তাহা একবার দেখিলে না, দেখিবার চেষ্টাও নাই। মনুষ্য মাত্রেই এক-একখানি গ্রন্থ বিশেষ। আপনি আপনাকে পাঠ করিলে জীবনের সমস্ত বিষয় জানা যায়। নিজের শরীরের চর্ম, অস্থি, মাংস, মেদ, মজ্জা, স্নায়ু, শিরা, রস, রক্ত ইত্যাদির গঠন, পরিমাণ, গতিবিধি যদি ভালো করিয়া বুঝিতে পারো তবে দেখিতে পাইবে ভগবান তোমার শরীরকে সুচারুরূপে নির্মাণ করিয়াছেন। কেমন সুর তালে মিলাইয়া শরীরের প্রত্যেক ক্রিয়াগুলি স্পন্দিত হইতেছে, কেমন পঞ্চ তত্বে পঞ্চ তন্মাত্র গা ঢালিয়া নৃত্য করিতেছে, কেমন ইন্দ্রিয়গুলি যথা নিয়মে ক্রীড়া করিতেছে। ইহাদিগের একটি বৃত্তির কার্য যদি কখনও গোলমাল হয় তবে শরীরে মহাপ্রলয় উপস্থিত হয়। গুরুর সাহায্যে যদি তোমার জীবনগ্রন্থ ভালো করিয়া পাঠ করিতে ও রচনা করিতে পার তাহা হইলে তোমার ও অপর লোকের বিশেষ উপকার হইবে।

এক একটি মনুষ্য এক-একখানি পুস্তক বিশেষ। গর্ভবাস এই পুস্তকের মলাট, কর্মফল ইহার সূচিপত্র, দীক্ষা গ্রহণ ইহার বিজ্ঞান, শৈশব, কৈশোর, যৌবন, বার্ধক্য ইহার এক একটি পরিচ্ছেদ, জীবনের ভালোমন্দ কার্য ইহার পাঠ্য বিষয়। যাহারা দরিদ্র ও সামান্য বস্ত্রাদি পরিয়া থাকে তাহারা সাদা মলাট মোড়া সামান্য পুস্তক, যাঁহারা বড়লোক, জমিদার, রাজা বা মহারাজা তাঁহারা ভালো বাঁধাই করা সোনার জলে কাজ করা, মলাট মোড়া এক একখানি বৃহৎ গ্রন্থ। যাহারা অল্পদিন জীবিত থাকিয়া বিশেষ কোনও কার্য না করিয়াই দেহত্যাগ করে তাহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক, যাঁহারা দীর্ঘজীবী হইয়া মহৎ কার্যরাশি অনুষ্ঠান করিয়া যান তাঁহারাই বৃহৎ গ্রন্থ এবং জগতের সকল লোকের আদর্শ ও পাঠের উপযুক্ত।

যাঁহারা অন্যের জীবন ভালো গঠন করিবার উপদেশ দিয়া থাকেন, অথচ নিজে কিছু করেন না, তাঁহারা ব্যাকরণ। যাঁহারা রাজা মহারাজা ইত্যাদি বড় বড় লোকের গল্প করিয়া সভা ও সমাজ গরম করিয়া রাখেন,

তাঁহারা ইতিহাস; যাঁহারা জগতের লৌকিক লাভলোকসান বিচার করিতে করিতে দিন কাটাইয়া থাকেন, তাঁহারা গণিতশাস্ত্র, যাঁহারা জড় জগতের বিষয় চিন্তা করাই পুরুষার্থ মনে করেন, তাঁহারা ভূগোল। যাঁহারা কেবল রঙ্গরস, আমোদপ্রমোদ, বিলাসই জীবনের সার করিয়াছেন, তাঁহারা নাটক। যাঁহারা পরোপকার, সত্য, দয়া, নিষ্ঠা, বেদাধ্যয়ন, ধর্মচর্চা ইত্যাদির দ্বারা কাল যাপন করেন, তাঁহারা ধর্মশাস্ত্র। যাঁহারা ভগবানের আরাধনা করাই জীবনের প্রধান কার্য মনে করেন, তাঁহারা যোগশাস্ত্র। এইরূপ মনুষ্য মাত্রেই প্রত্যেকে এক-একখানি গ্রন্থ। যাহাতে আপনার জীবনগ্রন্থ পরিপাটি রূপে লিখিত হয়, যাহাতে তুমি সকলের পাঠ্য হও, তোমার মৃত্যু হইলেও তোমার জীবনচরিত অন্য জীবনে পুনঃমুদ্রিত হয়, তুমি সেইরূপে আপনার জীবনগ্রন্থ রচনা করিবে। সমস্ত পুস্তকের শেষে সমাপ্ত, অর্থাৎ মৃত্যু লেখা থাকে, এই কথাটি যেন সর্বদা স্মরণে থাকে।

মনুষ্য মাত্রেরই ভাবিয়া দেখা উচিত, কোথায় ছিলাম, কোথায় বা আসিলাম, কি জন্যই বা আসিলাম, আসিয়াই বা তাহার করিলাম কি? এখানে আমাকে কে আনিলেন, কেনই বা আনিলেন, কি রূপেই বা আনিলেন, যে জন্য আনিয়াছেন তাহারই বা কি করিয়াছি? এখানে আসিয়া কত কি দেখিলাম। কত কি শুনিলাম, কত কি বলিলাম, কত কি ভাবিলাম, দেখিয়া শুনিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই ঠিক করিতে পারিলাম না। এখানে পিতামাতা পাইলাম, স্ত্রীপুত্র পাইলাম, বন্ধুবান্ধব পাইলাম, ধনজন পাইলাম, সুখসম্পদ পাইলাম, সমস্তই পাইলাম কিন্তু তৃপ্তি কিছুতেই পাইলাম না। অনেক ভাষা শিখিলাম, অনেক দেশ বেড়াইলাম, অনেক বস্তু দেখিলাম, অনেক লোকের সহিত বাস করিলাম, কিন্তু প্রকৃত সুখ কিছুতেই পাইলাম না। মন ও বুদ্ধির প্রণয় হইল না, সর্বদাই তুমুল সংগ্রাম করিতেছে, প্রবৃত্তির নিবৃত্তির বিবাদ লাগিয়াই আছে। সংসার-সাগরে প্রলয় তুফান দিবারাত্রি হইতেছে, যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই সম্প্রদায় লইয়া মতভেদ। সকলেই আপনার মত বহাল করিতে ব্যস্ত। কেহ বলিতেছে, কেহ শুনিতেছে, কেহ বুঝাইতেছে, কেহ চুপ করিয়া তামাসা দেখিতেছে, কেহ আন্দোলন করিতেছে, কেহ শাসন করিতেছে, কেহ সিংহাসনে, কেহ বা ধরাসনে বসিয়া আছে, কেহ কাঁদিতেছে, কেহ হাসিতেছে, কেহ বা অবাক হইয়া বসিয়া আছে। সংসারে সকলেই ঘুরিতেছে আর চিৎকার করিতেছে, সকলেই গোলমাল স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে, এই সকল দেখিয়া শুনিয়া কেবলমাত্র চিন্তাই বাড়িতেছে, কিন্তু সুখ কিছুতেই পাইলাম না। যেন একটা কোনো আসল বস্তুর অভাবে এত কষ্ট ও যন্ত্রণা দিবারাত্রি ভোগ করিতে হইতেছে।

যিনি ভগবৎচিন্তার গভীর সমুদ্রে মগ্ন হইতেছেন, তিনিই পরম সুখী, তাঁহারই কেবল অন্য ভাবনাচিন্তা কিছুই থাকে না। গুরু যাঁহাকে চিনিবার জন্য উপদেশ দান করেন, যিনি অন্তরে বাহিরে পশ্চাতে ও সম্মুখে থাকিতেও কেহ ধরিতে পারিতেছে না অথচ তিনি সমস্ত ধারণ করিয়া আছেন। আমি কে তাহার পরিচয় লইলাম না, তুমি, আমি তিনি আদি শব্দে কাহাকে নির্দেশ করি, তাহারও তত্ব জানিলাম না। যাঁহার সংসার, যাঁহার আমি তাঁহাকে সমস্ত সমর্পণ না করিয়া আমি কর্তা হইয়া বসিলাম। যাঁহাকে ভাবিলে ভয় ভাবনা দূরে যায়, যাঁহাকে স্মরণ করিলে বিপদসম্পদ সমান হয়, যাঁহার চরণে আশ্রয় লইলে জন্ম-মরণ জীবকে স্পর্শও করিতে পারে না, তাঁহাকে জানিবার চেষ্টা করিলাম না, তবে মানবজন্ম পাইয়া করিলাম কি?

আমি জন্মাবধি সংসার-সুখে আসক্ত, কেননা সংসার ভিন্ন আর কোনো সুখের সামগ্রী আমি কখনও দেখি নাই। এই সুখের সংসার পরিত্যাগ করিতে হইবে, এই নিদারুণ কথা স্মরণ করিলেই চিন্তাসাগরে মগ্ন হইতে হয়। আমি সংসারের দাস হইয়া, সংসারের অনুগত হইয়া আপনার জীবনকে সুখী মনে করি, আমার প্রাণ অপেক্ষাও সংসারকে ভালোবাসি। যখন মনে করি যে, এই গৃহ, অট্টালিকা, বাগান, পুষ্করিণী, বিষয়সম্পত্তির আমিই একমাত্র অধিপতি, তখন আমার হৃদয়ে আত্মগৌরব আর ধরে না। যখন দেখি আমার রূপবতী যুবতি ভার্যা, আমার পুত্র, আমার ভৃত্য সকলেই বিনীতভাবে আমার মুখের দিকে চাহিয়া আছে, যখন দেখি নানা প্রকার যান আমার জন্য সুসজ্জিত, তখন আমার আনন্দের সীমা থাকে না। যখন আমার সুখ্যাতি ঘোষিত হইল, রাজদ্বারে সম্মান হইল, শত শত লোকের মুখে আমার প্রশংসা শুনিতে লাগিলাম, তখন আহ্লাদে মগ্ন হইয়াই যাই। সংসারে মোহনিদ্রায় এই প্রকার ডুবিয়া থাকি।

যখন মানবের বয়ঃক্রম বেশি হয়, যখন আত্মজ্ঞান হইতে থাকে, যখন মোহনিদ্রা ভঙ্গ হয়, তখন বিষয়সুখের কোমল শয্যা আর ভালো লাগে না! সুখময় সংসার যেন বিষ বোধ হয়। ভোগবিলাস বিকট বেশে যেন দংশন করিতে থাকে। চিরদিনের আনন্দভূমি তখন নিরানন্দ বোধ হয়। বাসভবন কারাগার তুল্য বোধ হয়। স্ত্রী, পুত্র, বিষয়, সম্পদ তাবৎ সামগ্রী একত্র সমবেত হইয়া যেন বন্ধন-শৃঙ্খল রচনা করিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। তখন মনে মনে বলিতে থাকে—সংসার! আর তোমার ক্রোড়ে নিদ্রা যাইব না। যে দেশে সন্ধ্যা নাই, শর্বরী নাই, নিদ্রা নাই, শোক নাই, দুঃখ নাই আমি সেই দেশে যাইয়া সেই দেশের লোকের সঙ্গে থাকিব। যাঁহার মধুর স্বর, অসীম দয়া, অতুলনীয় স্নেহ, আমি তাঁহারই শরণাপন্ন হইব। তখন সমস্ত জীবনে যাহা যাহা অন্যায় কার্য করিয়াছে সকলই মনে মনে উদয় হয় আর আক্ষেপ করিয়া মনে মনে বলিতে থাকে—দয়াময় হরি! শুনিতে পাই তুমি নাকি দয়া করিয়া ভক্তের প্রতি তাহার সহায় হও, তুমি সাধুদিগের সর্বস্ব ধন, তোমার মহিমা অপার। দীনবন্ধো! যে তোমার আশ্রয় লয়, তুমি তাহাকে দয়া করিয়া থাকো! হে অনাথের নাথ! তুমি দয়া করিয়া দেখা না দিলে কেহই তোমাকে দেখিতে পায় না। আমি মহাপাপী, আমাকে অভয় পদে স্থান দাও, কোন পথ অবলম্বন করিলে তোমার দর্শন পাইব তাহা আমাকে বলিয়া দাও, কি বলিয়া তোমাকে ডাকিতে হয় তাহা আমাকে বলিয়া দাও, তোমার আদি অন্ত বোধগম্য হওয়া আমার সাধ্য নহে, দয়া করিয়া আমার আশা পূর্ণ কর।

আপনাকে না জানিয়া না চিনিয়া তুমি কাহার সুখের জন্য ধর্ম সাধন করিবে। কাহার বন্ধন মোচনের জন্য জ্ঞান উপার্জন করিবে। প্রথমে তত্ত্ব নিরূপণ করিয়া দেখ, তোমার দুঃখ বা বন্ধন আছে কিনা? একবার জাগ্রত হইয়া দেখ, তুমি কোথায় ও কোন অবস্থায় আছ? সর্বত্রই আত্মসত্তা বর্তমান, সুযোগ সহযোগে যখন আত্মময় জগৎ দেখিবে, তখন প্রত্যক্ষ করিতে ও দেখিতে পাইবে তুমি কে ও কোথা হইতে আসিয়াছ। তখন আর কাহারও সংশয় ও ভেদ জ্ঞান থাকিবে না।

সকলেই গুরু পদে মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়া একবাক্যে বলুন, গুরুদেব! অবোধ শিষ্যের প্রতি কৃপা বিতরণ করুন, আপনি আমার গতি, আপনি আমার মুক্তি, আত্মমন্ত্রে যাঁহার ইঙ্গিত করিয়াছেন, আশীর্বাদ করুন যেন তাঁহার পূর্ণ সত্তায় নিজ সত্তা বিসর্জন দিতে পারি। যদি তাহাই না পারিলাম তবে মানব জীবন পাইয়া এবং আপনার অভয় পদে শরণাপন্ন হইয়া কি করিলাম।

সংসারে সকলেই অর্থ চিন্তায় ব্যস্ত হইয়া রহিয়াছে। সংসারে যত কিছু অনর্থ, যত কিছু অনিষ্ট, যত কিছু দুর্ঘটনা সকলের মূল এই অর্থ। অর্থহীন হইলে যত অনিষ্ট, অর্থশালী হইলেও তত অনিষ্ট। অর্থ থাকিলে জগৎ যত ক্ষতিগ্রস্ত, অর্থ না থাকিলেও তত ক্ষতিগ্রস্ত। অর্থই চিন্তার সহোদর! তুমি ধনবান তোমার চিন্তার সীমা নাই, আমার ধন নাই, আমার কষ্টের ও চিন্তার অন্ত নাই। তোমার ধন আছে তাহা রক্ষার জন্য, তাহার বৃদ্ধির জন্য তুমি সর্বদাই ভাবিত হইতেছ, আমার ধন নাই, কি প্রকারে ধনবান হইব, কোন উপায় অবলম্বন করিলে অর্থ উপার্জন হইবে সেই চিন্তায় দেহ জীর্ণ হইয়া যাইতেছে। তোমার চিন্তা পাছে তুমি নির্ধন হও, আমার চিন্তা আমি কিসে ধনবান হই। ইহার সংযোগ অসহ্য, ইহার বিয়োগও অসহ্য, ইহা হইতে দূরে থাকিলেও নিস্তার পাইবার সম্ভাবনা নাই। অর্থের লীলাভূমি অদৃষ্ট, যাহার যেমন অদৃষ্ট অর্থ তাহার প্রতি সেই প্রকার ব্যবহার করিয়া থাকে। ঈশ্বরই এই অদৃষ্টলিপির লেখক, তিনিই জীবের সুকৃতি অনুসারে এবং পূর্ব জন্মের ফল অনুযায়ী তাহার অদৃষ্টে কর্মফল লিপিবদ্ধ করেন, অর্থ তাহার লিখিত অংশ কার্যে পরিণত করে আর কর্মফল প্রদান করে। অর্থ চিরকালই চঞ্চল, কখনও এক স্থানে তাহার স্থান হয় না। তাহার অগম্য স্থান নাই, লজ্জারও লেশ নাই, সেইজন্য ধোপা বা চণ্ডালকেও আলিঙ্গন করিয়া থাকে। অর্থের হৃদয় নাই, একের সর্বনাশ করিয়া অন্যকে সুখী করিতেছে, আবার তাহার সর্বনাশ করিয়া অপরের বাসনা পূর্ণ করিতেছে।

গুরু ও শিষ্য : 'গুরু কাহাকে বলে এবং তাহার আবশ্যকতাই বা কি? গুরু শব্দের অর্থ—গ শব্দে গতিদাতা, র শব্দে সিদ্ধিদাতা এবং উ শব্দে সকলের কর্তা, অতএব ঈশ্বরকেই একমাত্র গুরু বলা যায়, তিনি ভিন্ন জীবের গতি মুক্তি নাই। যিনি গতি মুক্তির পথ দেখাইয়া দেন, তাঁহাকেও গুরু বলা যায়, এই কারণে

ঈশ্বর ও গুরুতে বিশেষ প্রভেদ নাই, আর এই প্রকার গুরুকে সগুণ ঈশ্বর বলা যায়। কেহ কেহ অর্থ করেন, গু শব্দে অন্ধকার, রু শব্দে নিবারক, অর্থাৎ যিনি অজ্ঞানরূপ অন্ধকার নষ্ট করেন, তাঁহাকে গুরু বলা যায়, অতএব সেই গুরুকে কখনও মনুষ্যবৎ মনে করিবে না। গুরু নিকটে থাকিলে অন্য কোনো দেবতারও অর্চনা করিবে না। যদি কেহ করে তাহা বিফল হয়। গুরুই কর্তা, গুরুই বিধাতা, গুরু সন্তুষ্ট হইলে সকল দেবতা পর্যন্ত সন্তুষ্ট হন। গুরু এই দুই অক্ষর যাহার জিহ্বাগ্রে থাকে, তাহার শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার আবশ্যক নাই। গ এই বর্ণটি উচ্চারণ করিলে মহাপাতক নাশ হয়, উ এই বর্ণটি উচ্চারণ করিলে ইহজন্মের পাপ নষ্ট হয় এবং রু এই বর্ণটি উচ্চারণ করিলে পূর্বজন্মের পাপ নষ্ট হয়। গুরুই পিতামাতা এবং একমাত্র গতি, শিব রুষ্ট হইলে গুরু ত্রাণ করিতে পারেন কিন্তু গুরু রুষ্ট হইলে কেহই উদ্ধার করিতে পারেন না। গুরু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু জগতে আর কিছুই নাই। জপ, তপ, পূজাঅর্চ্চনা, শাস্ত্র, মন্ত্র ইত্যাদি গুরু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে। যিনি গুরুর মূর্তি ধ্যান ও তাঁহার তত্ব সর্বদা জপ করেন তিনি কাশীবাসের ফল প্রাপ্ত হন। গুরুই তারকব্রহ্ম স্বরূপ।

গুরু প্রণাম মন্ত্রের অর্থ ভালো করিয়া হৃদয়ঙ্গম করা উচিত, নতুবা কেবল উচ্চারণ করিলে কোনো ফল হইবে না; ভক্তিভাবে কার্য করিলে তবে ফল হয়।

১) গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরংব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।
২) অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।
৩) অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।

১) গুরুই ব্রহ্মা, গুরু বিষ্ণু; গুরুই দেবাদিদেব মহেশ্বর এবং গুরুই পরমব্রহ্ম, সেই গুরুকে নমস্কার করি।

২) সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার আকার, যিনি চরাচর জগৎ ব্যাপিয়া আছেন, যিনি ব্রহ্মপদ দর্শন করান সেই গুরুকে নমস্কার করি।

৩) অজ্ঞান অন্ধকারে, অন্ধজনের চক্ষু যিনি জ্ঞানরূপ অঞ্জন শলাকা দ্বারা উন্মীলিত করেন, সেই গুরুকে নমস্কার করি।

গুরু দুই প্রকার—শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরু। গুরুর উপদেশ ব্যতীত সামান্য বৃক্ষ লতারও ভালোরূপ পরিচয় জানিতে পারা যায় না। মন, চিত্ত, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ইত্যাদি সকলই আর একটি প্রবল শক্তির দ্বারা উত্তেজিত বা পরিচালিত না হইলে কোনো কার্যই করিতে পারে না। যে শক্তির দ্বারা আমাদের আত্মার উন্নতি হয় ও আমরা মুক্তির দিকে অগ্রসর হই সেই শক্তিই আমাদের গুরু। দুই শক্তির একত্র ঘর্ষণ ব্যতীত কোনো কার্যই সিদ্ধ হয় না। এই দুই শক্তির মধ্যে যে শক্তি প্রবল তাহাই অপরের গুরু। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্রাদি যাঁহার শক্তির ইঙ্গিতে স্ব স্ব কার্যে নিয়ত ধাবিত হইতেছে তিনিই জগৎগুরু। এই জগৎগুরুকে জানিবার জন্য পরিষ্কার ও সুগম করিয়া দেন তিনিই দীক্ষাগুরু, আর জগৎগুরুর মায়াজাল স্বরূপ এই ব্রহ্মাণ্ড পরমাণু হইতে বিশ্ব ব্যাপার পর্যন্ত ভিতর বাহির তত্ব যিনি বুঝাইয়া দেন তিনি শিক্ষাগুরু। একটি কীট হইতে ব্রহ্ম পর্যন্ত সকলেই শিক্ষাগুরু হইতে পারেন। বৃক্ষলতা, পশুপক্ষী ইত্যাদি সকলেই কত সময়ে কত শিক্ষা দেয় তাহা সকলেই জ্ঞাত আছেন। শিখিবার জন্য যেখানেই গমন করে সেইখানেই কিছু না কিছু শিখিবার বিষয় দেখিতে পাইবে। শিক্ষা দ্বারা জীবের পরমাত্মা দর্শন করিবারও সাহায্য হয়। সূক্ষ্ম তত্ব লাভ করিবার জন্য শিক্ষা প্রথম সোপান এবং দীক্ষা দ্বিতীয় সোপান। শিক্ষা দীক্ষার অনুকূল হওয়া চাই। শিক্ষা বিধিপূর্বক না হইলে দীক্ষা ফলবতী হয় না। এই জন্য শিক্ষা দিবার সময়ে সুশিক্ষিত ও দীক্ষিত সদগুরুর আবশ্যক। যিনি শিক্ষাতত্ব ও দীক্ষাতত্বকে পৃথক বলিয়া বিবেচনা করেন তিনি শিষ্যকে বিশেষরূপে সুশিক্ষিত করিতে পারেন না। যেমন

শৈশব যৌবনের এবং যৌবন বার্ধক্যের পূর্বাবস্থা সেইরূপ শিক্ষা দীক্ষার পূর্বাবস্থা। শিক্ষার দ্বারা মনের সংশয় নাশ, যথার্থ জ্ঞান ও দিব্যদৃষ্টি হয়। দীক্ষার দ্বারা জীবের পরমারাধ্য পরম দেবতাকে দর্শন করিয়া জীব কৃতার্থ হয়। উপযুক্ত গুরু ব্যতীত শিক্ষা ও দীক্ষা দিবার অধিকারী কেহই হইতে পারে না।

গুরু বলিলে প্রায় লোকে দীক্ষাগুরু বলিয়া বুঝিয়া থাকেন। গুরুকে মনে করিলে তাঁহাকে জগৎ ছাড়া উচ্চ লোক বলিয়া মনে করিতে হয়। আমাদের মতো মনুষ্য বলিতে ভয় হওয়া উচিত। তাঁহার সহিত এক আসনে বসিতে নাই এবং সে সাহস কাহারও কর্তব্য নহে। তাঁহার বাক্য বেদবাণী, তাঁহার পাদধৌত জল অমৃত, তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য, তাঁহার দর্শনে জীবন সফল হয়। তিনি অপার সংসারসমুদ্রে বিচক্ষণ কর্ণধার। এই পবিত্র দীক্ষাগুরুর পদে বরণ করি কাকে। আমাদের দেশে যাঁহারা আজকাল গুরুগিরি ব্যবসা করিয়া থাকেন, গুরুদক্ষিণা লাভ যাঁহাদের লক্ষ্য, তাঁহাদিগকে কেহই সদগুরু বলিতে সাহস করিবেন না। কুলগুরু ত্যাগ করিতে নাই, এই সংস্কার আমাদের দেশের গুরুগণকে এত দুর্দশাগ্রস্ত করিয়াছে। দুই এক জন অবশ্য ভালো গুরুও থাকিতে পারেন তাঁহাদিগকে সকলেই শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিয়া থাকেন। যাঁহারা অশিক্ষিত, অসচ্চরিত্র, সাধনাবর্জিত তাঁহাদের দীক্ষা দিবার কি অধিকার আছে? যিনি নিজেই অন্ধ তিনি অন্যের চক্ষু উন্মীলিত করিতে গিয়া হয়তো শলাকাতে শিষ্যের চক্ষু উৎপাটিত করিয়া বসিবেন। তাঁহার তো শিষ্যকে চরাচরব্যাপী অখণ্ডমণ্ডলাকার পুরুষকে দেখাইবার ক্ষমতা নাই। যিনি নিজেই কখনও দেখেন নাই, তিনি অন্যকে কি প্রকারে দেখাইবেন, তবে কেবল সদগুরুর প্রাপ্য প্রণামীটা তাঁহারা ফাঁকি দিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন।

পৈতৃক বাগবাগিচা, গৃহসম্পত্তির ন্যায় তাঁহারা শিষ্য ঘরটা অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন। একবারও মনে ভাবেন না, যে দীক্ষা দেওয়া তামাসা নহে। শিষ্যকে সংসারসিন্ধু পার করিবার গুরুভার তাঁহাদিগের উপর নির্ভর করিতেছে; ভগবানের সম্মুখে তিনি শিষ্যের জন্য দায়ী। কিছু না জানিয়া শুনিয়া কোন সাহসে এই জ্বলন্ত আগুনে হাত দিতেছেন তাহা জানি না। হিন্দু হইয়া শাস্ত্র মানিয়া কি প্রকারে এমন ভয়ানক অন্যায় কার্য করিতেছেন তাহা বলিতে পারি না। গুরুর লক্ষণ কি তাহা প্রথমে জানা উচিত। তাহার পর দীক্ষা দিবার উপযুক্ত হইলে অবশ্য দিতে পারেন। যিনি সর্বশাস্ত্রদর্শী, কার্যদক্ষ, শাস্ত্রের যথার্থ মর্ম জ্ঞাত, সুভাষী, সুরূপ, বিকলাঙ্গ নহেন, যাঁহার দর্শনে লোকের কল্যাণ হয়, যিনি জিতেন্দ্রিয়, সত্যবাদী, ব্রহ্মণ্যশীল, ব্রাহ্মণ, শান্তিচিত্ত, পিতৃমাতৃহিত-নিরত, আশ্রমী, দেশবাসী এই রূপ গুণযুক্ত দেখিয়া গুরুপদে বরণ করা উচিত। এই প্রকার গুণবান হইয়া শিষ্যকে দীক্ষা দিলে উভয়েরই মঙ্গল। আজকাল গুরুগিরি চাকরি ও ব্যবসার ন্যায় অর্থ উপার্জনের পথ হইয়াছে। কর্ম দোষে গুরু পদকে লঘু করিতেছেন। শিষ্যকে উদ্ধার করিতে না পারিলে মহাপাপে লিপ্ত হইতে হয়।

মন্ত্র দীক্ষার পূর্বে গুরু এবং শিষ্য অন্তত ছয় মাস বা এক বৎসর একত্র বাস করিবেন। পরস্পর প্রীতিযুক্ত ও উপযুক্ত বোধ করিলে শিষ্য গুরুর নিকট জ্ঞান ভিক্ষা চাহিবেন তখন গুরু কৃপা করিয়া শিষ্যের ভবযন্ত্রণা নিস্তারের উপায় তত্বজ্ঞান উপদেশ দীক্ষা দান করিবেন। অনেক সময় শিষ্যের অমতে গুরু বলপূর্বক দীক্ষা দেন কিন্তু তাহা মহাপাপ। উপযাচক হইয়া দীক্ষা দেওয়া কেবল পয়সার লোভ ভিন্ন আর কিছু নহে। শিষ্য করজোড়ে প্রার্থনা না করিলে কোনও সদগুরুই দীক্ষা দিবেন না। শিষ্য মন্ত্র জপ করে কিনা, সাধনে কোনও বিঘ্ন হইতেছে কিনা, শিষ্য কতটুকু উন্নতি লাভ করিল গুরুর খবর রাখা আবশ্যক কিন্তু এখনকার গুরুগণ ভুলিয়াও একবার তাহা জিজ্ঞাসা করেন না। শিষ্য কত টাকা বেতন পায়, মাসে উপরি পাওনা কত টাকা তাহা জিজ্ঞাসা করিতে কখনও ভুল হয় না। অনেক শিক্ষিত লোকে আজকাল সেই জন্য কুলগুরুর নিকট দীক্ষা লইতে চাহেন না। যোগ্য গুরু পাইলেই দীক্ষা লইবার চেষ্টায় থাকেন।

ভালো গুরু না হইলে ঠিক পথ বলিয়া দিবার কাহারও ক্ষমতা নাই। ক্ষেত্র অর্থাৎ মনুষ্যের দেহ সকলকার সমান নহে। সেই জন্য সকল লোকের বীজমন্ত্র ঠিক করা বড়ই শক্ত। মহাপুরুষ ব্যতীত এই কার্য হইতেই পারে না। আমাদের কুলগুরু হইতে কিছু পাইবার আশাভরসা নাই। কারণ তাঁহারা নিজেই কোন পথে যাইবেন তাহা জানেন না। অন্ধ হইয়া অন্ধকে কেহ পথ দেখাইতে পারে না। সকল সংসারেই দেখা যায়,

এক বাড়িতে পাঁচটি ছেলে, তাহারা কেহ সৎ, কেহ অসৎ, কেহ ধার্মিক, কেহ অধার্মিক, কেহ নাস্তিক, কেহ পণ্ডিত; কিন্তু কুলগুরু, চিরকাল সকলেরই ইষ্টদেবতা এক, বীজমন্ত্রও একের যাহা অন্যেরও তাহা, কেবল নামের অক্ষর মিলন করণ মাত্র, এই প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়া দীক্ষা দিয়া থাকেন। সেই বীজে শিষ্যের ভালো হউক বা মন্দ হউক তাঁহার যেন কোনো দায়িত্ব নাই। গুরু যে কি বস্তু তাহা তিনি নিজেও জানেন না। শিষ্যকে দীক্ষা দিয়া বাৎসরিক এক টাকা বা দুই টাকা বার্ষিক পাইলেই আর কোনো কথা নাই। দীক্ষা লইয়া শিষ্যের কি উপকার হইল সে কথা জিজ্ঞাসা করিতে যেন ভয়, পাছে শিষ্য কিছু জিজ্ঞাসা করে। প্রথম হইতেই বাঁধা কথা একটা বলিয়া থাকেন—জন্ম-জন্মান্তর না হইলে ধর্ম উপার্জন হয় না, ইহা এক জন্মের কর্ম নহে। পূর্ব জন্ম পর্যন্ত এই কথা শুনিয়া আসিয়াছি, এই জন্মেও তাহাই শুনিলাম, পর জন্মেও তাহাই শুনিব, এই প্রকারে জন্মের পর জন্ম চলিয়া যাইতেছে ও যাইবে, সেইটা যে কোন জন্ম তাহা কাহারও বলিবার সাধ্য নাই। আর এই জন্ম নয় ও কেন নয়, তাহা বলিবার ক্ষমতা কাহারও নাই অথচ তাঁহারা গুরু বলিয়া মহা অভিমান করিয়া থাকেন।

চিটা ধান বা আগড়া অথবা পোড়া বীজ জমিতে রোপণ করিলে কখনওই অঙ্কুর বাহির হইবে না। সেই জন্য বীজ ঠিক করিয়া দীক্ষা গ্রহণ করা নিতান্ত আবশ্যক। বীজ ঠিক করা সদগুরু ভিন্ন হইতে পারে না। সদগুরু সহজে মিলে না। দীক্ষা গ্রহণ করা একটা সামান্য কাজ নহে। উপযুক্ত হইলে তাহার পর দীক্ষা লইবার চেষ্টা করা উচিত। সংসারে উপযুক্ত গুরু পাওয়া যায় না বলিয়া লোকের এ দুর্দশা হইয়াছে। কোনো কোনো স্থানে অল্প বয়স্ক বালকেই দীক্ষা দিয়া থাকে, আবার কোনো স্থানে স্ত্রীলোকও দীক্ষা দিয়া থাকেন। ইঁহাদের মধ্যে কেহই অবগত নহেন যে, দীক্ষা দেওয়া কী ভয়ানক কাজ। যাঁহারা এই প্রকার গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন, তাঁহারাও জানেন না দীক্ষা কি জন্য লইতে হয়। পূর্বকালে উপযুক্ত শিষ্য অনেক পাওয়া যাইত, সেইজন্য সদগুরুও সকলেই পাইতেন। ভগবানকে পাইবার জন্য যদি প্রাণ কাঁদিয়া ব্যাকুল হয়, তবে নিশ্চয় জানিবে, ভগবান স্বয়ং তোমার সহায় হইয়া সদগুরু মিলাইয়া দেন।

সদগুরু হাটেবাজারে, পথেঘাটে, নিকটে বা শহরে পাওয়া যায় না। ভগবানের জন্য যদি কেহ পাগল হয়, তাঁহাকে পাইবার জন্য যখন বিরহ হয়, তাঁহার দর্শন লালসা যখন খুব বলবতী হয় এবং তাঁহাকে না পাইলে আর কিছুই ভালো লাগে না তখন তাঁহারই কৃপায় সদগুরুর দর্শন পাওয়া যায়। সৎশিষ্য না হইলে সদগুরু কখনও পাওয়া যায় না, যেমন শিষ্য তেমনই গুরু সকলের ঠিক তাহাই মিলিবে। শিষ্য যদি গুরুর প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত হয়, দীক্ষা-মন্ত্রে ও ভগবানে যদি তাহার বিশ্বাস ও ভক্তি থাকে তবে নিশ্চয় জানিবে গুরু কাঁচা হইলেও শিষ্য পরমধামের অধিকারী হইবে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

শিষ্য যেমন উক্ত লক্ষণযুক্ত দেখিয়া উপযুক্ত ব্যক্তিকে গুরুপদে বরণ করিবে, গুরুও স্বভাবাদি না জানিয়া শিষ্য করিবেন না। শিষ্য পুণ্যবান, ধার্মিক, বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ, গুরুভক্ত, জিতেন্দ্রিয়, দানধ্যানপরায়ণ, ধীর স্বভাব এই প্রকার প্রকৃতি না হইলে সে শিষ্যকে কখনও দীক্ষা দিবেন না। অলস, মলিনবেশ, দাম্ভিক, কৃপণ, দরিদ্র অর্থাৎ যে ব্যক্তি অর্থের উপযুক্ত ব্যয় না করে, রোগী, অসন্তোষচিত্ত, লোভী, কর্কশভাষী, অন্যায় উপার্জনে ধনবান, পরস্ত্রীতে রত, অভিমানী, আচারভ্রষ্ট, খল, বহুভোক্তা, দুরাত্মা এবং যে গুরু-নিন্দা করে বা শ্রবণ করে ইত্যাদি প্রকার পাপিষ্ঠ নরাধম ব্যক্তিকে কদাচ শিষ্য করিবেন না। মন্ত্রীর পাপ রাজা, স্ত্রীর পাপ স্বামী এবং শিষ্যের পাপ গুরু নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হন।

গুরু যখন শিষ্যের বাড়িতে আসিবেন, শিষ্য অগ্রগামী হইয়া তাঁহাকে নিজ আলয়ে আনয়ন করিবে। তাঁহার প্রত্যাগমনকালীন পশ্চাৎ কিছুদূর গমন করিবে। বিনা অনুমতিতে তাঁহার সম্মুখে কোনো আসনাদিতে বসিবে না। তাঁহার সম্মুখে শাস্ত্রব্যাখ্যা অথবা প্রভুত্ব দেখাইবে না। শিষ্য ও গুরু এক গ্রামবাসী হইলে ত্রিসন্ধ্যা তাঁহাকে প্রণাম করিবে, গুরুভবন এক ক্রোশের মধ্যে হইলে প্রত্যহ একবার প্রণাম করিবে, দুই ক্রোশ মধ্যে হইলে মাসে চারি দিবস প্রণাম করিবে, চারি ক্রোশ বা তাহার অধিক হইলে চারি মাস অন্তর যাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করা উচিত।

গুরু আজ্ঞা অবশ্য পালন করিবে, তাহা না করিলে ধর্ম, কর্ম, জপ, পূজাদি সকলই বৃথা ও নীচগামী হয়। গুরুর সহিত কখনও ঋণদান কিংবা কোনো বস্তু ক্রয়বিক্রয় করিবে না। গুরুর প্রসাদ যে শিষ্য ভক্ষণ না করে তাহার বিপদ পদে পদে। ভক্তিপূর্বক গুরুর প্রসাদ ভক্ষণ করিলে তাহার সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়। দীক্ষা লইবার ইচ্ছা করিলেই নিম্নলিখিত কয়েকটি কথা সর্বতোভাবে পালন করা উচিত।

১) কখনও মিথ্যা কথা কহিবে না।

২) কখনও কাহাকেও হিংসা করিবে না।

৩) সকল জীবে সমান দয়া করিবে।

৪) যথাসাধ্য পরোপকার করিবে।

৫) রিপু সকলকে দমন অর্থাৎ আপন বশে আনিবে।

৬) পরশ্রীতে কাতর হইবে না বরং আনন্দিত হইবে।

৭) জ্ঞানকৃত কোনও প্রকার অন্যায় কার্য করিবে না।

৮) বৃথা ও বেশি কথা কহিবে না।

৯) লোভ ও বাসনা একেবারে ত্যাগ করিবে।

১০) কামনা ত্যাগ করিয়া উপাসনা করিবে।

১১) সদা সৎসঙ্গ করিবে।

১২) কোনো ধর্মে অশ্রদ্ধা করিবে না। সকল ধর্মই সমান, যাহার যে ধর্মে বিশ্বাস তাহার তাহাতেই মুক্তি, ভ্রমেও কখনও কাহারও বিশ্বাস ভঙ্গ করিতে চেষ্টা করিবে না।'

চিত্তশুদ্ধি : 'হিন্দুধর্মের সার চিত্তশুদ্ধি। যাঁহারা হিন্দুধর্মের অনুরাগী অথবা হিন্দুধর্মের যথার্থ মর্মের অনুসন্ধানে ইচ্ছুক তাঁহাদিগকে এই তত্ত্বের প্রতি বিশেষ মনোযোগ করিতে হয়। সাকার উপাসনা বা নিরাকার উপাসনা, একেশ্বরবাদ বা বহু দেব ভক্তি, দ্বৈত বা অদ্বৈত, জ্ঞানবাদ, কর্মবাদ বা ভক্তিবাদ সকলই ইহার নিকট অকিঞ্চিৎকর। চিত্তশুদ্ধি থাকিলে সকল মতই শুদ্ধ, চিত্তশুদ্ধির অভাবে সকল মতই অশুদ্ধ। যাঁহার চিত্তশুদ্ধি আছে তাঁহার আর কোনো ধর্মই প্রয়োজন নাই! যাঁহার চিত্তশুদ্ধি আছে তিনিই শ্রেষ্ঠ হিন্দু, শ্রেষ্ঠ মুসলমান, শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ ইত্যাদি। যাঁহার চিত্তশুদ্ধি নাই তিনি কোনো ধর্মাবলম্বীদিগের মধ্যে ধার্মিক বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না। চিত্তশুদ্ধিই ধর্ম এবং ইহা হিন্দু ধর্মেই প্রবল। যাঁহার চিত্তশুদ্ধি নাই তিনি হিন্দু নহেন বলা যাইতে পারে।

এই চিত্তশুদ্ধি কি তাহা অনেক প্রকার লক্ষণ ও কার্যের দ্বারা বুঝিতে পারা যায়। চিত্তশুদ্ধির প্রথম লক্ষণ ইন্দ্রিয়ের সংযম। ইন্দ্রিয়সংযম এই বাক্য দ্বারা এমন বুঝিতে হইবে না যে ইন্দ্রিয় সকলের একেবারে উচ্ছেদ বা ধ্বংস করিতে হইবে। ইন্দ্রিয়গণকে সংযত অর্থাৎ আপন বশে আনিতে হইবে। তাহাদের বশে যাইবে না, ইহারই নাম ইন্দ্রিয়সংযম জানিবে। ঔদরিকতা এক প্রকার ইন্দ্রিয়পরতা, কিন্তু এই ইন্দ্রিয়ের সংযম করিতে হইলে এমন বুঝিতে হইবে না যে, পেটে কখনও খাইবে না অথবা কেবল বায়ু ভক্ষণ করিবে কিংবা অর্ধাশন বা কদর্য আহার করিয়া দিনযাপন করিবে। শরীর এবং স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য যে পরিমাণে এবং যে প্রকার আহারের প্রয়োজন তাহা অবশ্য করিতে হইবে, তাহাতে ইন্দ্রিয় সংযমের কোনো বিঘ্ন হয় না। ইন্দ্রিয়সংযম তত কঠিন ব্যাপার নহে, কেবলমাত্র কোনো ইন্দ্রিয়ের বশবর্তী না হইয়া তাহাদিগকে আপন বশে আনা আবশ্যক; আর তাহা হইলে আহারাদি অবিধেয় নহে, যদি তাহাতে স্পৃহা না থাকে। স্থূল কথা এই যে, ইন্দ্রিয়ের আসক্তির অভাবই ইন্দ্রিয়সংযম। আত্মরক্ষার্থে বা ধর্মরক্ষার্থে অর্থাৎ ঐশিক নিয়ম রক্ষার্থে যতটুকু ইন্দ্রিয়ের চরিতার্থতা আবশ্যক, তাহার অতিরিক্ত যে ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তির অভিলাষ করে তাহারই ইন্দ্রিয়সংযম হয় নাই, যে না করে তাহার হইয়াছে। যাহার ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তিতে সুখ নাই, আকাঙ্ক্ষা নাই, কেবল ধর্ম রক্ষা আছে তাহারই ইন্দ্রিয় সংযত হইয়াছে।

এমন অনেক লোক আছেন যে, ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তিতে একবারে বিমুখ কিন্তু মনের কলুষ স্খলিত করেন নাই। লোকলজ্জায় বা লোকের নিকট প্রতিপত্তির জন্য কিংবা ঐহিক উন্নতির জন্য অথবা ধর্মের ভানে পীড়িত হইয়া তাঁহারা জিতেন্দ্রিয়ের ন্যায় কার্য করেন কিন্তু ভিতরে ইন্দ্রিয়ের দাহ বড় প্রবল। আজন্ম মৃত্যু পর্যন্ত তাঁহারা কখন স্খলিতপদ না হইলেও তাঁহারা ইন্দ্রিয় সংযম হইতে অনেক দূরে। যাঁহারা মুহুর্মুহু ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তিতে উদ্যোগী ও কৃতকার্য তাঁহাদিগের হইতে এইরূপ ধর্মাত্মাদের প্রভেদ বড় অল্প। উভয়কেই তুল্যরূপে ইহলোকের নরকের অগ্নিতে দগ্ধ হইতে হইবে। ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত করো বা না করো যখন ভ্রমেও ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির কথা মনে আসিবে না, আত্মরক্ষার্থ বা ধর্মার্থ ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিতে হইলেও তাহা দুঃখের বিষয় ব্যতীত সুখের বিষয় বোধ হইবে না, তখনই ইন্দ্রিয়ের সংযম হইয়াছে। তাহার অভাবে যোগ অভ্যাস, তপস্যা, উপাসনা, কঠোর কার্য সকলই বৃথা।

কেবল যোগ বা তপস্যা করিলে ইন্দ্রিয় সংযম হয় না। কার্য ক্ষেত্রেই সংসার ধর্মেই ইন্দ্রিয় সংযম হয়। প্রত্যহ অরণ্যে বাস করিয়া ইন্দ্রিয় তৃপ্তির উপাদান সকল হইতে দূরে গমন করত সকল বিষয়ে নির্লিপ্ত হইয়া মনে করা যায় বটে যে, আমি ইন্দ্রিয় জয়ী হইয়াছি, কিন্তু যে মৃৎপাত্র অগ্নিসংস্কৃত হয় নাই তাহা যেমন স্পর্শমাত্র টিকে না, তেমনই এই প্রকার ইন্দ্রিয়সংযমও লোভের স্পর্শমাত্র টিকে না। ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। স্বর্গ হইতে একজন অপ্সরা আসিল অমনি ঋষি ঠাকুরের যোগ ভঙ্গ হইল, আর ধৈর্য ধরিতে না পারিয়া নানা প্রকার গোলযোগ উপস্থিতকরণে প্রবৃত্ত হইয়া অবশেষে ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত করিয়া ক্ষান্ত হইলেন। যে দেশে যে দ্রব্য পাওয়া যায় না সেই দেশের লোক সেই দ্রব্য খায় না, ব্যবহার করে না, যদি কখনও পায় তবে অতি আগ্রহের সহিত খায়, ব্যবহার করে; তাহাকে ত্যাগ স্বীকার বলে না! যে প্রত্যহ ইন্দ্রিয় চরিতার্থ উপযোগী উপাদান সমূহের সংসর্গে আসিয়াছে তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া কখনও জয়ী, কখনও বিজিত হইয়াছে, সেই পরিশেষে ইন্দ্রিয় জয় করিয়াছে। পরাশর বা বিশ্বামিত্র ঋষি ইন্দ্রিয় জয় করিতে পারেন নাই, ভীষ্ম বা লক্ষ্মণ ইঁহারা ইন্দ্রিয় জয় করিতে পারিয়াছিলেন।

ইন্দ্রিয়সংযম অপেক্ষাকৃত তুচ্ছ কথা। চিত্তশুদ্ধির তাহার অপেক্ষা গুরুতর লক্ষণ আছে। অনেকের ইন্দ্রিয় সংযত কিন্তু অন্য কারণে তাহাদিগের চিত্তশুদ্ধ নয়। ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করিবে না কিন্তু আমি ভালো থাকিব, আমায় সকলে ভালোবাসিবে এই বাসনা তাহাদের মনে বড় প্রবল। আমার ধন হউক, আমার মান হউক, আমার সম্পদ হউক, আমার যশ হউক, আমার সৌভাগ্য হউক, আমি বড় হই, আর আমাকে সকলে ধার্মিক ও মহাত্মা বলিয়া মান্য করুক, তিনি সকল ভূতের আত্মা স্বরূপ হইয়া সকল প্রাণীতেই অবস্থিত আছেন। জীব যে পর্যন্ত সর্ব প্রাণীতে অবস্থিত "তাঁহাকে" আপন হৃদয় মধ্যে জানিতে না পারে, সে পর্যন্ত স্বকর্মে রত হইয়া উপাসনা বা জপ করিবে। যে ব্যক্তি আপনার ও পরের মধ্যে অত্যল্পও ভেদ দর্শন করে, যাহার আপনার দুঃখের তুল্য পরের দুঃখ অনুভব না হয়, তাহার ঈশ্বর কি এবং ব্রহ্মময় জগৎ কি প্রকার তাহা অনুভব হইতে পারে না। ঈশ্বর সর্বব্যাপী, তিনি সকল স্থানে অর্থাৎ বনে, গ্রামে, নগরে, জলে, শূন্যে, প্রস্তরে এবং সকল প্রাণীতে আত্মার স্বরূপ অবস্থিত রহিয়াছেন। কেবল মুখে ঈশ্বর সর্বব্যাপী বলিলে চলিবে না। ঈশ্বর সর্বব্যাপী এই কথা স্বীকার করিলেই ব্রহ্মময় জগৎ স্বীকার করিতে হইবে। যাঁহারা জ্ঞানের সহিত ঈশ্বর সর্বব্যাপী, ঈশ্বর সর্বান্তর্যামী বলেন তাঁহারা ব্রহ্মময় জগৎ কি প্রকার বেশ বুঝিতে পারিতেছেন। ঈশ্বর যে কি পদার্থ এবং তাঁহার আকারই কি প্রকার, আর কি করিলে বা কোন পথ অবলম্বন করিলে তাঁহাকে পাওয়া যায় তাহা প্রথমে ধারণা বা দৃষ্ট হয় না, কেবল বুঝিয়া লইতে হয়। বুঝিতে চেষ্টা করিলেই হৃদয়ঙ্গম হইয়া প্রথমে কারণ প্রত্যক্ষ হইয়া পরে দর্শন হয়। তিনি দিবারাত্রি সম্মুখেই আছেন আমার অন্তরের সহিত দেখিতে চাহি না বলিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাই না।'

ধর্ম : 'আজকাল সর্বত্র সকল লোকের মুখে বাহ্যিক বা আন্তরিক কেবল ধর্মের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। এমন পুস্তক, এমন পত্রিকা, এমন প্রবন্ধ নাই যাহাতে ধর্মের হুঙ্কারে লোকের কর্ণে তালা না লাগে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আজিকার মনুষ্যসমাজ এবং বঙ্গীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম বড়ই বিরল। সকল লোকের

মধ্যে কেবল হিংসা ও বিদ্বেষ পূর্ণ, কেবল ভাব-চুরি অর্থাৎ ভিতরে এক প্রকার, বাহিরে অন্য প্রকার। যিনি নিজে বলিতেছেন আজকাল কন্যাদায় বড়ই শক্ত ব্যাপার হইয়াছে, ইহা উঠিয়া যাওয়া নিতান্ত আবশ্যক, তিনিই নিজের পুত্রের বিবাহের সময় অতি অল্প করিয়া দশ হাজার টাকার কমে ঘাড় পাতেন না। কেবল মুখে ধর্ম ধর্ম করিয়া গগনভেদী রোল হইতেছে। কপটতার এত প্রাদুর্ভাব বোধহয় পৃথিবীতে আর কখনও হয় নাই। মনুষ্যসমাজের এমন দুরবস্থা আর কখনও হয় নাই। মনুষ্য আজ বড়ই অসুখী, তাই সুখদুঃখ তত্ব লইয়া এত ব্যস্ত হইয়াছে।

প্রথমে দেখা উচিত ধর্ম কোথা হইতে আসিল, কোন সময় হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহার সৃষ্টিকর্তাই বা কে? অনেকেই মনে করিতে পারেন এ কথার উত্তর বড় সহজ। খৃস্টিয়ান বলিবেন, মুসা ও যিশু ধর্ম আনিয়াছেন; মুসলমান বলিবেন, মহম্মদ ধর্ম আনিয়াছেন; বৌদ্ধ বলিবেন, তথাগত ধর্ম আনিয়াছেন; হিন্দু বলিবেন, ধর্ম স্বয়ং ভগবান আনিয়াছেন অর্থাৎ ইহা ভগবানবাক্য এবং ঋষিবাক্য। কিন্তু তাহা ছাড়া আরও ধর্ম আছে। পৃথিবীতে কত জাতীয় মনুষ্য আছে তাহার সংখ্যা নাই, সকলেরই এক একটা ধর্ম আছে। এই জগতে এমন কোনও জাতি নাই যাহাদের কোনও প্রকার ধর্ম নাই, তাহাদের ধর্ম কোথা হইতে আসিল? অথচ তাহাদের ধর্মস্রষ্টা কেহ নাই।

যাঁহারা বলেন, যিশু বা মহম্মদ, মুসা বা বুদ্ধ ইত্যাদি ধর্ম সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাদিগের ইহা ভয়ানক ভুল; ইঁহারা কেহই ধর্মের সৃষ্টি করেন নাই, কোনও প্রচলিত ধর্মের উন্নতি করিয়াছেন মাত্র। খ্রিস্টের পূর্বে ইহুদি ধর্ম ছিল, খ্রিস্ট ধর্ম তাহারই উপর গঠিত হইয়াছে। মহম্মদের পূর্বেও আরবে ধর্ম ছিল, ইসলাম ধর্ম তাহার উপর ও ইহুদি ধর্মের উপর গঠিত হইয়াছে। শাক্যসিংহের পূর্বে বৈদিক ধর্ম ছিল, বৌদ্ধ ধর্ম কেবল হিন্দু ধর্মের সংস্কার মাত্র। মুসার ধর্ম প্রচারের পূর্বেও এক ইহুদি ধর্ম ছিল, মুসা তাহার উন্নতি করিয়া গিয়াছেন। সেই সকল আদিম ধর্ম কোথা হইতে আসিল, তাহার প্রণেতা কাহাকেও দেখা যায় না। ধর্মের উৎপত্তি বুঝিতে গেলে সভ্য জাতির ধর্মের মধ্যে অনুসন্ধান করিলে কিছু পাওয়া যাইবে না, কারণ সভ্য জাতির ধর্ম পুরাতন হইয়াছে, সে সকলের প্রথম অবস্থা আর নাই; প্রথম অবস্থা ভিন্ন আর কোথাও উৎপত্তি লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না, যেমন গাছ কোথা হইতে হইল, অঙ্কুর দেখিলে বুঝা যায় না; প্রকাণ্ড বৃক্ষ দেখিলে বুঝা যায় না; অতএব অসভ্য জাতিদিগের ধর্মের আলোচনা করিলে ধর্মের উৎপত্তি বুঝা যায়।

মনুষ্য যতই অসভ্য হউক না কেন তাহারা সকলেই বেশ বুঝিতে পারে যে শরীর হইতে চৈতন্য একটা পৃথক সামগ্রী। একজন মানুষ চলিতেছে, কাজ করিতেছে, কথা কহিতেছে, খাইতেছে, সে মরিয়া গেলে আর কিছুই করে না, অথচ তাহার শরীর যেমন ছিল তেমনই আছে, হস্তপদাদির কিছুরই অভাব নাই, কিন্তু সে আর কিছুই করিতে পারে না। তাহার শরীরের একটা কিছু প্রধান বস্তু তাহার আর নাই সেইজন্য সে আর কিছু করিতে সক্ষম হয় না। তাহাতেই অসভ্য লোকেও বুঝিতে পারে যে, শরীর ছাড়া জীবে আর একটা কি পদার্থ আছে সেইটার বলে জীবত্ব, শরীরের বলে জীবত্ব নহে। সভ্য লোকে ইহার নাম দিয়াছে জীবন অথবা প্রাণ বা আর কিছু অসভ্য লোকে নাম দিতে পারুক আর নাই পারুক সকলেই বেশ জানে ইহা দেহের মধ্যে একটি প্রধান ও স্বতন্ত্র সামগ্রী।

আর একটু বুঝিয়া দেখিলে বেশ জানিতে পারা যায় যে, ইহা কেবল জীবের আছে তাহা নহে, গাছপালারও আছে; গাছপালাতেও ঐ জিনিসটা যতদিন থাকে, ততদিন গাছে ফুল ধরে, পাতা গজায়, ফলে ধরে, হ্রাসবৃদ্ধি পায়, আর তাহার অভাব হইলে আর ফুল ধরে না, পাতা গজায় না, ফলও ধরে না, গাছ শুকাইয়া মরিয়া যায়। অতএব গাছপালারও জীবন আছে। গাছপালার সঙ্গে আর জীবের সঙ্গে একটা প্রভেদ এই যে গাছপালা নড়িয়া বেড়ায় না, কথা কহিতে পারে না, ইচ্ছামতো কিছুই করিতে পারে না। অতএব মনুষ্য এক্ষণে জ্ঞান-সোপানে একপদ উঠিল; কারণ মনুষ্য বেশ জানিতে পারিল যে, জীবন ছাড়া জীবে আর একটা কিছু পদার্থ আছে যাহা গাছপালায় নাই, তাহাকেই লোকে চৈতন্য বলিয়া থাকে।

সকলেই দেখিতেছেন মানুষ মরিলে তাহার শরীর থাকে কিন্তু চৈতন্য থাকে না। মানুষ যখন নিদ্রা যায় তখন শরীর থাকে কিন্তু চৈতন্য থাকে না। মূর্ছাদি রোগ হইলে শরীর থাকে কিন্তু চৈতন্য থাকে না। এক্ষণে সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে, যে চৈতন্য শরীর ছাড়া একটি স্বতন্ত্র বস্তু। এক্ষণে আরও দেখিতে বা বুঝিতে হইবে যে শরীর হইতে চৈতন্য যদি পৃথক বস্তু হইল তবে এ শরীর না থাকিলে চৈতন্য থাকিতে পারে কিনা এবং থাকে কিনা! যদি থাকে তবে কোথায় ও কি ভাবে থাকে। মানুষ মাত্রেই প্রত্যহ দেখিতেছেন যে চৈতন্য দেহ ছাড়িয়া যথা ইচ্ছা তথা যাইতে পারে এবং যথা ইচ্ছা তথা থাকিতে পারে। তাহার প্রমাণ স্বপ্ন অবস্থায় শরীর এক স্থানে থাকিল, কিন্তু চৈতন্য আর এক স্থানে বেড়াইতেছে, সুখদুঃখ ভোগ করিতেছে, নানা প্রকার কার্যও করিতেছে। তাহা হইলে শরীর গেলেও চৈতন্য থাকে ইহাতে বোধ হয় আর কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না। জীব আপন ইচ্ছায় কার্য করিতে পারে, এই জন্য জীবের চৈতন্য আছে। নির্জীব ইচ্ছা অনুসারে কার্য করিতে পারে না, সেই জন্য অচেতন। এক্ষণে বোধ হয় সকলেই বেশ ভালোরূপ বুঝিয়াছেন, যে শরীর গেলেও চৈতন্য থাকে এবং এই বিশ্বাসই ধর্মের প্রথম সোপান। জ্ঞানই ধর্মের মূল, যাহার জ্ঞান নাই তাহার আর ধর্ম বা অধর্ম কি?

জড় পদার্থে চৈতন্য আরোপ করা ধর্মের দ্বিতীয় সোপান। ইহাকে ধর্ম না বলিয়া উপধর্ম বলা যাইতে পারে। আর উপধর্মই সত্য ধর্মের প্রথম অবস্থা। কোথা হইতে আকাশে মেঘ আসে, মেঘ আসিয়া কেন বৃষ্টি হয়, বৃষ্টি হইয়া কোথা যায়, মেঘ আসিলেই বা সকল সময়ে বৃষ্টি হয় না কেন, যে সময়ে বৃষ্টির প্রয়োজন, যে সময়ে বৃষ্টি হইলে শস্য হইবে সেই সময় সচরাচর বৃষ্টি হয় কেন, আবার এক সময় তাহাই বা হয় না কেন? এই সকল আকাশের ইচ্ছা, মেঘের ইচ্ছা, বৃষ্টির ইচ্ছা, এই জন্য আকাশ, মেঘ, বিদ্যুৎ ও সমুদ্র সম্বন্ধেও সেইরূপ। ঝড়, বৃষ্টি, বায়ু, বজ্র, বিদ্যুৎ ও অগ্নি ইহাদের অপেক্ষা আর বলবান কে? যদি ইহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেহ থাকে, তবে সূর্য, ইঁহার প্রচণ্ড তেজ, আশ্চর্য গতি, ফলোৎপাদন শক্তি, জীবোৎপাদন শক্তি আলোক, সকলই আশ্চর্য; ইনি জগতের রক্ষক বলিলেও হয়। ইনি যতক্ষণ উদয় না হন ততক্ষণ জগতের কাজকর্ম সকলই প্রায় বন্ধ থাকে।

এই সকল শক্তিশালী পদার্থের ক্ষমতা দেখিয়া উপাসনার উৎপত্তি হইয়াছে। ইহাকেই ধর্মের তৃতীয় সোপান বলা যাইতে পারে। এই জন্য সর্ব দেশে সূর্য, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, অগ্নি, আকাশাদির উপাসনা করিয়া থাকে। এই জন্য বেদে ইন্দ্রাদি, আকাশ, সূর্য, বায়ু ও অগ্নি প্রভৃতি দেবতার উপাসনা ব্যবস্থা আছে। মই, বাঁশ, সিঁড়ি, দড়ি প্রভৃতি নানা উপায়ে যেমন অট্টালিকার ছাদে উঠা যায়, সেই প্রকার ধর্মরাজ্যে যাইবারও নানাবিধ উপায় বা পথ আছে।

অহিংসা, ভক্তি ও ভালোবাসা ধর্মের মূল। সর্বত্র সকল লোকের মুখে বাহ্যিক বা আন্তরিক ভালোবাসার কথা শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু কেহ কাহাকেও বাস্তবিক অন্তরের সহিত ভালোবাসে না। যতদিন না আপন পর সমান বোধ হইবে ও প্রকৃত ভালোবাসিতে শিখিবে ততদিন ধর্মের ভান করা বৃথা ও বিড়ম্বনা মাত্র। সকলেই অবগত আছেন যে, ভালোবাসা দুই প্রকার। প্রথম স্বাভাবিক সম্বন্ধের বলে ভালোবাসা যেমন পিতা পুত্রে, স্বামী স্ত্রীতে। দ্বিতীয় গুণ দর্শনে, যেমন বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে। যথার্থ ভালোবাসার একটি প্রণালী আছে, সেই প্রণালীতে ভালোবাসিলে তবে সেই মহৎ এবং মনোহর ফল লাভ হইতে পারে। সম্পূর্ণরূপে আত্মবিস্মৃত হইয়া আপনাকে এবং সমস্ত পৃথিবীকে ও সমস্ত প্রাণীকে, সেই সচ্চিদানন্দের বিকাশ ভাবিয়া সমস্ত মনুষ্যকে, সমস্ত প্রাণীকে, জগৎকে ভালোবাসিতে শিক্ষা করিলে তবে প্রকৃত ভালোবাসা কাহাকে বলে জানিতে পারা যায়।

যাহাকে ভালোবাসিবে সে ভালো হউক বা মন্দ হউক তাহা আমার দেখিবার আবশ্যক নাই। সে ভালো হইলেও ভালোবাসিবে, মন্দ হইলেও ভালোবাসিবে, জগৎ ভালো কি মন্দ সে বিচার করিয়া জগৎকে ভালোবাসিতে শিক্ষা করা উচিত নহে। সমস্ত জগৎ সেই সচ্চিদানন্দ, অতএব সমস্ত জগৎ ভালোবাসার পাত্র। যে অনন্ত পুরুষের ধ্যানে আত্ম অভিমান বিনাশ করিয়া আপনাকে ভগবদ্ভাবে ভরাইয়া ফেলিয়াছে সেই সমস্ত

জগৎকে ভালোবাসিতে সক্ষম হইয়াছে এবং জগৎকে জগদীশ্বর বলিয়া ভালোবাসিতে পারিবে। আমার বিবেচনা হয় শিক্ষিত লোক মাত্রেই স্বীকার করিবেন যে, হিন্দু শাস্ত্রের কিছু সংস্কার হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। সকলেই জানেন যে, হিন্দুধর্ম অপেক্ষা সত্য ও উৎকৃষ্ট ধর্ম আর নাই। যদি কেহ ভগবান দর্শন ও মুক্তি পাইয়া থাকেন কিংবা মুক্তি চান, তাহা হইলে হিন্দু ধর্ম হইতেই অতি সহজে পাইয়াছেন ও পাইবেন। কেবল আমাদের পথ দেখাইবার বা বলিয়া দিবার লোক নাই। এক্ষণে অনেক বিষয়ের প্রকৃত ব্যাখ্যা করিবার তেমন পণ্ডিত নাই। এখানকার পণ্ডিতেরা অনেক বিষয় জানিয়া শুনিয়া সত্যমিথ্যা অথবা ভালোমন্দ বিচার না করিয়া তাঁহাদের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিতেছেন। আবার কেবল তাহাই নহে; অনেক মহাত্মা নিজে শ্লোক রচনা করিয়া হয়তো পুরাণের কথা বেদের মধ্যে দিয়া শাস্ত্রের দোহাই দিয়া কাটাইয়া দিতেছেন। সেই আসল বস্তু ঠিক রাখা নিতান্ত আবশ্যক।

কোনো প্রকার একটা পথ অবলম্বন না করিলে ধর্ম যে কি পদার্থ তাহা জানা যায় না। কোশাকুশি নাড়িলেই ধর্ম হয় না, প্রত্যহ কতকগুলি মন্ত্র উচ্চারণ করিলেও ধর্ম হয় না, নাকমুখ টিপিয়া ধর্মের ভান করত লোক ভুলাইলে ধর্ম হয় না, সর্বাঙ্গে হরিনামের ছাপ দিয়া, হরিনামের ঝুলি হস্তে রাস্তায় রাস্তায় বেড়াইলেও ধর্ম হয় না। ধর্মের নিকটে দ্বেষাদ্বেষ, ভেদাভেদ নাই। "আত্মবৎ সর্বভূতেষু" না হইলে প্রকৃত ধার্মিক হয় না। সমদর্শী না হইলে যখন সিদ্ধি হয় না, কলহদ্বেষ যখন জগতের পাপ-প্রসবতা, তখন ধর্ম কলহ বা সাম্প্রদায়িক ধর্ম যে একান্ত নিন্দনীয়, তাহার আর সন্দেহ কি? ঈশ্বর সকলের সমান, তাঁহার নিকট জাতিগত বা সম্প্রদায়গত ধর্ম নাই, ব্রাহ্মণ, শূদ্র, যবন, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ধনী, নির্ধন ইত্যাদি কোনও প্রকার ভেদ নাই। যে তাঁহাকে একমনে ভক্তিভরে ডাকে তিনি তাঁহার। তিনি সকলের, এমন উদার ভাব আনিয়া আমরা ধর্ম বিবাদ করি ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি আছে! তিনি এক এবং সকলের, সেইজন্য সমস্ত জগৎ এক, সমস্ত জগতের লোক এক এবং সমস্ত ধর্মই এক। ধর্মের পথ অতিশয় উদার, যাঁহার যে মতে বিশ্বাস তিনি সেই মতেই ধর্ম লাভে সমর্থ। কখনও কাহারও ধর্মে বিশ্বাস ভঙ্গ করা কোনও মতেই উচিত নহে।

অনেকে মনে করেন সংসার ছাড়িয়া বনে না যাইলে ধর্ম হয় না, ইহা ভয়ানক ভুল। যদি জগতের সমস্ত লোক বনে গমন করে তবে বনই সংসার হইয়া যায় অথবা সৃষ্টি থাকে না। সৃষ্টি না থাকিলে সংসার ও জীব সৃষ্টি হইবার কোনও কারণ ছিল না। ইহাতে ঈশ্বরের কার্যে হস্তার্পণ হয়। সংসারই ধর্মের প্রধান স্থান, সকল কার্যই করা চাই, কেবল বায়ুর মতো কিছুতে লিপ্ত হইবে না। সকলেই অবগত আছেন ধর্মের পথ সকলকার সমান নহে। গৃহী যদি বানপ্রস্থ অথবা ব্রহ্মচারীর পথ অবলম্বন করেন তাহার কোনও ফল হইবে না। ঘরে বসিয়া যদি কেহ কুম্ভক যোগী হইতে চেষ্টা করেন তাহারও কোনও ফল হইবে না। পথ ভিন্ন ভিন্ন বটে, কিন্তু কার্য একই, যেমন জলের সমষ্টি জলাশয়।

জগতে অনেক প্রকার সাধক আছেন তাহার মধ্যে দুই শ্রেণীর সাধক প্রধান। প্রথম শ্রেণীর সাধক, সংসারের মায়া বন্ধন ছেদন করিয়া নিজের মুক্তির জন্য নির্জন অরণ্য মধ্যে যোগ বা তপস্যা করত কালাতিপাত করেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর সাধক মানবমণ্ডলীকে আপন জ্ঞান করিয়া, তাহাদিগের মুক্তি নিজের মুক্তির সহিত সংযুক্ত করেন এবং তাহাদিগকে অতি প্রেমের সহিত ধর্মপথে আনয়ন করেন, পরের ইষ্ট নিজের ইষ্ট বোধ করেন এবং পরের জন্য পাগল; যেমন বুদ্ধদেব ও চৈতন্য।

যতদিন হইতে মানবের সৃষ্টি, যতদিন হইতে মানবেরা কথা কহিতে শিখিয়াছে, যতদিন হইতে মানবের বুদ্ধির উদয় হইয়াছে ততদিন হইতেই মানব সমাজে ধর্মও বিস্তৃত হইয়াছে। তখন ধর্মের নামকরণ না হউক, ধর্মের এত বন্ধন না থাকুক, কিন্তু একটা না একটা ধর্ম ছিল। যাহা সত্য তাহা অবিনশ্বর এবং তাহাই মানবের গ্রহণীয়। বেদোক্ত যে সনাতন ধর্ম, তাহা অবিনশ্বর এবং অনন্ত সত্যে গঠিত, সুতরাং তাহার অবলম্বন করা উচিত। এক্ষণে দেখা উচিত, সকলেই মুখে ধর্ম ধর্ম করেন বা বলেন কিন্তু আসল কথাটাই বা কী, আর তাহার কার্যই বা কী? মন স্থির করিয়া ভক্তিভাবে নিজের চৈতন্য বিশ্বচৈতন্যের সহিত যোগ করাই ধর্ম এবং যে পথ অবলম্বন করিলেই সেই সংযোগ করা যায় তাহারই নাম ধর্মপথ।

ধর্ম কী এবং তাহার আবশ্যকতাই বা কী? ধর্ম শব্দের অর্থ নির্ণয় করিলেই ইহার আবশ্যকতা জানিতে পারিবেন। ধর্ম শব্দ ধৃ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। যে ধারণ করে সেই ধর্ম, যে যাহাকে ধারণ করে সেই তাহার ধর্ম; দ্রব্যের স্বভাবকে ধর্ম বলে, যেমন সূর্যের ধর্ম তাপ, জলের ধর্ম রস, অগ্নির ধর্ম দাহন, সেই প্রকার জীবের ধর্ম আত্মজ্ঞান। যে বস্তুর অভাবে পদার্থের পদার্থত্ব থাকে না, সে বস্তু যে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় তা বোধ হয় আর বুঝাইতে হইবে না। ধর্ম জগতের প্রতিষ্ঠা স্বরূপ, ধর্ম দ্বারা পাপরাশি বিনষ্ট হয়, সেইজন্য ধর্ম সকলের শ্রেষ্ঠ। বিদ্যা, ধন, শরীর, সৎকুলে জন্ম, অরোগিতা ও মুক্তি ধর্ম হইতে হয়! ধর্ম বৃদ্ধি হইলে জীবের সকলই বৃদ্ধি হয় এবং হ্রাস হইলে সকলই হ্রাস হয়। মনুষ্য মাত্রেরই ধর্মকে আশ্রয় করা উচিত, নতুবা মনুষ্যের মনুষ্যত্ব অপগত হইয়া পশুত্ব অথবা কোনও হীন জাতিত্ব প্রাপ্ত হইতে হয়।

ধর্মের মূল : হৃদয়, মন ও শক্তির সহিত ভগবানে ভক্তি এবং বিশ্বাস। প্রতিবেশী, আত্মীয়গণ এবং সমস্ত জগৎকে আপনার জ্ঞান হওয়া, জ্ঞানকৃত কোনও অন্যায় কার্য না করা, জীবে দয়া, অহিংসা, লোভ সংবরণ, ক্রোধ সংবরণ, সত্যবাক, ক্ষমা, সৎসংসর্গ, জিতেন্দ্রিয়তা, শৌচ, গুরুভক্তি, সকল ভূতে ভ্রাতৃত্ব এবং ঈশ্বরে পিতৃত্ব এই সকল জ্ঞান ধর্ম।

শাস্ত্র অনন্ত কিন্তু আয়ু অতি অল্প, মনুষ্য জীবনে বিঘ্নও অনেক, অতএব সকল শাস্ত্রের সারমর্ম জ্ঞান হওয়াই কর্তব্য। ধর্ম লাভ সামান্য জ্ঞান দ্বারা হইতে পারে, সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন আবশ্যক করে না। যেখানে ধর্ম সেইখানে তেজঃকান্তি, যেখানে লজ্জা সেইখানে শ্রী, যেখানে সৎসঙ্গ সেইখানে সুবুদ্ধি, যেখানে ধার্মিক সেইখানে ভগবান বিরাজিত। ধর্ম লাভ জন্য মতাপেক্ষা করে না। যেভাবে যে-কেহ তাঁহাকে ভজনা করে, তিনি সেইভাবে তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। যেমন নদী নানা দিক দিয়া গমন করত পরিশেষে একমাত্র সাগরেই নিপতিত হয়, সেই প্রকার ভগবানকে যে ভাবেই উপাসনা করুক না কেন তাহা সেই ভাবগ্রাহী পরমব্রহ্মে অর্পিত হয়।'

উপাসনা—'উপাসনা কাহাকে বলে এবং আবশ্যক কি না তাহাই প্রথমে জানা আবশ্যক। যদি ঈশ্বরকে জানিবার বা পাইবার ইচ্ছা হয় তাহা হইলে উপাসনা করা আবশ্যক, নতুবা যাঁহার সে ইচ্ছা নাই তাঁহার উপাসনা করিবারও আবশ্যক নাই। ঈশ্বর কাহারও তোষামোদ চাহেন না। তাঁহার সকল জীবে সমান দয়া। উপাসনা বা আরাধনা ইত্যাদি উৎকোচ নহে, উহা ঈশ্বরের বিশুদ্ধ শক্তিজাল, আকর্ষণের যন্ত্র স্বরূপ। তাঁহাকে জানিবার আবশ্যক বিবেচনা হইলে যে পথ অবলম্বন করিলে তাঁহাকে জানিতে পারা যায় সেই পথের নামই উপাসনা।

মনুষ্য মাত্রেই কেবল সুখ ভোগ করিতে চাহে কিন্তু সুখ শব্দটি প্রকৃত কোন অবস্থার নাম তাহা এ পর্যন্ত কেহই অবগত হইতে পারেন নাই। দুঃখের পরম নিবৃত্তিই মহা সুখ। তাহা যে কোন কানন আলো করিয়া আছে, মনের সম্পূর্ণ শান্তি কোন সাগরগর্ভে লুক্কায়িত আছে, তাহার অনুসন্ধান কেহ করিতে চাহেন না। দুঃখ না থাকিলে সুখ যে কি প্রকার তাহা কেহই জানিতে পারিতেন না। কোনও প্রকার অন্যায় কার্য করিলেই কষ্ট ভোগ করিতে হয়। ঈশ্বর মনুষ্যকে যে কষ্ট দেন তাহা কেবল তাহারই সুখ ভোগের নিমিত্ত। তাঁহার ইচ্ছা মনুষ্য মাত্রেই সৎপথেই থাকিয়া চিরকাল সুখ ভোগ করুক। পাকা স্বর্ণ এক ভরির মূল্য পঁচিশ টাকা, তাহাতে যে পরিমাণ খাদ মিশ্রিত হয় সেই পরিমাণে মূল্য কম হয়। স্বর্ণকার তাহাকে রসায়ন দ্বারা পুড়াইয়া যতক্ষণ পর্যন্ত না পুনরায় পাকা স্বর্ণ হয় ততক্ষণ পেটাপেটি করে। সেই প্রকার জীব কোনও প্রকার অন্যায় কার্য করিলে ঈশ্বর তাহাকে কষ্ট ভোগ করাইয়া পুনরায় খাঁটি করেন এবং সোজা পথে লইয়া আসেন। জীবকে কষ্ট দেওয়া ইহাও তাঁহার পরম দয়ার পরিচয়, সেইজন্য মনুষ্য মাত্রেরই বুঝা উচিত যে, সুখ ও দুঃখ উভয়ই সমান বস্তু, সুতরাং কোনও অন্যায় কার্য করিয়া কষ্ট ভোগ করা অপেক্ষা তাহা না করাই ভালো। গায়ে কাদা মাখিয়া তাহা পরিষ্কার করিবার জন্য গা ধোয়া অপেক্ষা কাদা না মাখাই ভালো; ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।

উপাসনা করা নিতান্ত আবশ্যক, ইহা যখন বেশ বিবেচনা করিয়া স্থির সিদ্ধান্ত হইবে এবং মনের সহিত পাকা বিশ্বাস হইবে তখন প্রথমে আসনের প্রয়োজন। আসন অনেক প্রকার, তাহার মধ্যে সংসারী জীবের পক্ষে যাহা উপযুক্ত তাহাই সকলের জানা উচিত, সেই জন্য এখানে কেবল তাহাই প্রকাশ করা হইল—প্রথমে কুশাসন, তাহার উপর কম্বলাসন এবং এই দুই আসনের উপর বস্ত্রাসন উপরি উপরি পাতিয়া, সাধক তাহার উপর উত্তর মুখে নির্জন ও প্রশস্ত ঘরে, শরীর মস্তক ও গ্রীবা সমভাবে রাখিবে এবং দক্ষিণ জানু ও উরুর মধ্যে বাম পদতল, আর বাম জানু ও উরুর মধ্যে পক্ষিণ পদতল স্থাপন করিয়া সরলভাবে উপবেশন করিবে। তাহার পর নয়ন মুদ্রিত করিয়া, নাসিকাগ্র অর্থাৎ দুই ভ্রূর মধ্যস্থলে দৃষ্টি স্থাপন করত শান্ত ও স্থিরভাবে মনে মনে গুরুদত্ত বীজমন্ত্র জপ করিবে। ইহাতে ব্রাহ্মণ শূদ্র ভেদ নাই। প্রাতে ও সায়ংকালে প্রত্যহ দুইবার অর্ধ ঘণ্টা পরিমাণ সময় নিশ্চিন্ত মনে বসিতে হইবে যতদিন না আলোক দর্শন হয়, ক্রমে সময় বাড়াইতে হইবে। মন স্থির করিবার ইহা অপেক্ষা আর কোনও প্রকার সোজা পথ পাই। মন বড়ই চঞ্চল, বাহিরে গেলেই পুনরায় তাহাকে ধরিয়া আনিবে ও কার্যে লাগাইবে। কিছুদিন এই প্রকার করিতে করিতে মন ক্রমে ক্রমে আপন বশে আসিবে। মন দিয়াই মনকে বশ করিবে, আমি পারিব না, আমার হইবে না, ভুলক্রমেও এই ভাব মনে করিবে না, তাহা হইলে কোনো ফল হইবে না। সর্বদা মনে করিবে আমার এই প্রধান কার্য, এই কার্য আমাকে করিতেই হইবে, যতদিন না হইবে ছাড়িবে না। এই প্রকার দৃঢ় হইয়া কার্য করিলে তবে নিশ্চয় ফল পাওয়া যায়। মন স্থির না হইলে কোনও প্রকার সাধনা হইতে পারে না। মন স্থির হইলে আর আসন আবশ্যক করে না।

বুদ্ধি, মন, প্রাণ, দেহ, অহংকার এবং ইন্দ্রিয়সকল হইতে বিভিন্ন চিৎস্বরূপ আত্মা আছেন ইহা নিশ্চয় জানিবে। সেই আত্মাই ঈশ্বর, নিরাকার, নির্মল ও জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধি বর্জিত। তিনি চিন্ময়, আনন্দময়, অশরীরী, পূর্ণ, জ্যোতির্ময়, নিত্য এবং শুদ্ধ জ্ঞানাদিময়, সর্ব দেহগত, সর্বাতীত, একাগ্রচিত্তে আত্মাকে নিত্য এই প্রকার চিন্তা করিবে। কেহ কেহ নাস্তিক হইয়া আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করেন যে, ঈশ্বর নাই, স্বভাব হইতে সমস্ত হইতেছে। তাহাদের মতো মূর্খ ও অজ্ঞানী জগতে আর নাই! যদি ঈশ্বর এক মুহূর্তের জন্য দেহ ছাড়া হন, তখনই নয়ন মুদিত করিয়া এ জীবনের লীলা সমাপ্ত করিতে হইবে। আজকাল ধর্মপিপাসা কোনো কোনো লোকের একটু জন্মিয়াছে বটে কিন্তু পরিশ্রম করিতে কেহ রাজি নহেন। দুই চারি দিন চক্ষু মুদিয়া বসিয়া যদি কিছু না পান তবে অমনি বুঝিলেন সকলই মিথ্যা, বৃথা পরিশ্রম করিয়া ফল নাই। উইল ফোরস (will force) করিয়া যদি কেহ খানিকটা ঈশ্বর তাহাদের পেটের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিতে পারেন, তবে তাহাদের বিশ্বাস হয়। তাহাদের বিশ্বাস হউক বা না হউক জগতের তাহাতে কিছু মাত্র ক্ষতি নাই। পতিত জমিতে বন ও জঙ্গল আপনিই হইয়া থাকে। সেই সকল লোকের নিকট হইতে তফাতে থাকা উচিত। যখন তাহাদের ঘুম ভাঙিবে তখন নিজেই সোজা পথে আসিবেন।

প্রথমত, অরুণের ন্যায় জ্যোতি ও সেই সঙ্গে জ্ঞান উদয় হইয়া অজ্ঞান অন্ধকারকে হরণ করে, পরে আত্মা সূর্যের ন্যায় স্বয়ং প্রকাশিত হন। যে প্রকার ভ্রান্তিজ্ঞানে মুড়ো গাছকে মানুষ বলিয়া বোধ হয়, সেই প্রকার ভ্রান্তির দ্বারা ব্রহ্মকে জীব বলিয়া বোধ হয়, ঐ ভ্রান্তি নাশ হইলে, জীবের যথার্থ স্বরূপ দৃষ্ট হয় এবং জীবত্ব ব্যবহার নিবৃত্ত হয়। যেমন যথার্থ জ্ঞান হইতে দিকভ্রম নষ্ট হয়।

চিত্তের উন্নতি সাধন করিতে হইলে মনুষ্যের উন্নত দশার চরম আদর্শ স্বরূপ কোনও মহাপুরুষের আদর্শ চিন্তা দ্বারা, সেই আদর্শ অনুযায়ী উন্নত হইবার চেষ্টা করা উচিত। আমাদের মন বড় অস্থির, কোনও আদর্শ চরিত্র মনোমধ্যে সদাসর্বদা ধরিয়া রাখা বড় সহজ কথা নহে। সেই জন্য এই আদর্শ পুরুষের সঙ্গে আমাদের মনকে কোনো বন্ধনে বদ্ধ রাখা উচিত। মহাপুরুষের সহিত বন্ধন দৃঢ় করিতে হইলে দৃঢ় ভক্তির প্রয়োজন। এইজন্য ভক্তি ব্যতীত ঈশ্বর উপাসনার পথে অগ্রসর হওয়া যায় না।

সম্পূর্ণ জ্ঞান বিশিষ্ট যোগী জ্ঞান-চক্ষু দ্বারা স্বীয় আত্মাতে সমস্ত জগৎকে এবং সেই এক আত্মাকে সমস্ত জগৎ রূপে দেখেন। এই সমুদয় জগৎই আত্মা, আত্মা ভিন্ন কোনও বস্তু নাই। যে প্রকার সমুদয় ঘট, কলস,

হাঁড়ি, গামলা ইত্যাদি বস্তু সকলই কেবল মৃত্তিকা মাত্র, মৃত্তিকা ভিন্ন ঘটাদি কোনও বস্তুই নাই, সেই প্রকার জ্ঞানী ব্যক্তি স্বীয় আত্মাকেই সমুদয় দেখেন।

জ্ঞানী ব্যক্তি বাহ্য অনিত্য সুখে আসক্তি পরিত্যাগপূর্বক আত্মসুখে পরিপূর্ণ হইয়া ঘটের মধ্যস্থিত দীপের ন্যায়, নির্মলরূপে অন্তরেই প্রকাশ পান, আর মৌনী হইয়া বিচরণ করেন, যেমন বায়ু সর্বত্রগামী হইয়াও কোনও বস্তুতে লিপ্ত হয় না। সেই মৌনী পুরুষ, উপাধির বিনাশ হইলে, সর্বব্যাপী পরমাত্মাতে প্রবেশ করেন; যে প্রকার জলে জল, তেজে তেজ, আকাশে আকাশ মিলিত হয়। যে প্রকার কাঁচপোকা তেলাপোকাকে ধরিলে, তেলাপোকা কাঁচাপোকাকে অবিশ্রান্ত চিন্তা করিতে করিতে, আপনার স্বরূপ পরিত্যাগ করিয়া কাঁচপোকা স্বরূপ ধারণ করে; সেই প্রকার আত্মজ্ঞ ব্যক্তি আত্মার সচ্চিদানন্দ স্বরূপ চিন্তা করিতে করিতে আপনার পূর্বস্থিত উপাধি ও গুণ সকল পরিত্যাগ করিয়া স্বকীয় সচ্চিদানন্দ ভাব প্রাপ্ত হন। এমন ব্যক্তিকে জীবন্মুক্ত পুরুষ বলা যায়।

সেই জ্যোতির্ময়, পরমব্রহ্ম, আনন্দময়ের আনন্দের কণা মাত্রে আশ্রিত হইয়া ব্রহ্ম হইতে ক্ষুদ্র জীব পর্যন্ত সকলেই তারতম্য রূপে আহ্লাদিত রহিয়াছে। যে প্রকার দুগ্ধমাত্রেই ঘৃত আছে, সেই সকল বস্তুই ব্রহ্মতে অন্বিত, সুতরাং সাংসারিক ব্যবহারও তাহা হইতে ভিন্ন নহে। জীব শ্রবণ, মনন, অজ্ঞান ও কুবাসনা দ্বারা বিষয়ে আকৃষ্ট। তাহাকে বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া আত্মাতে স্থায়ীকরণ দ্বারা উদ্দীপ্ত এবং জ্ঞানাগ্নি দ্বারা পরিতাপিত করিলে, সমুদয় উপাধি মালিন্য হইতে মুক্ত হইয়া স্বয়ং আত্মা স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া প্রকাশ পান।

সর্বব্যাপী ও সকলের আধার যে আত্মা, হৃদাকাশাদি হইতে জ্ঞান-সূর্যরূপ উদিত হইয়া, অজ্ঞান তমঃকে হরণ করত সমুদয় বস্তু প্রকাশ করেন। যে ব্যক্তি বিশেষরূপে নিষ্ক্রিয়, দিগদেশ কালাদির অপেক্ষা রহিত; শীত উষ্ণাদির বিনাশক, সর্বব্যাপী এবং নিত্য সুখস্বরূপ স্বীয় আত্মাতীর্থকে ভজনা করেন, তিনি সর্বব্যাপী সর্বজ্ঞ ও অমৃত হন।

ধর্ম হইতে ভক্তি, ভক্তি হইতে জ্ঞান, জ্ঞান হইতে মুক্তি পাওয়া যায়। ঈশ্বরে মনপ্রাণ অর্পণ করাই ধর্ম। অতএব মুমুক্ষু ব্যক্তি ধর্মের জন্য এইরূপ আশ্রয় করিবে। সচ্চিদানন্দ স্বরূপ একমাত্র ব্রহ্মই সর্বময়। দেবগণের দেহও তাঁহারই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ। মুমুক্ষু ব্যক্তি বিধিবিহিত কার্য এই প্রকারে অনুষ্ঠান করিয়া, চিত্তশুদ্ধি হইলে, সতত আত্মজ্ঞানে উদ্যোগী হইবে। কামাদি ষড়বর্গ পরিত্যাগ করিবে এবং হিংসা একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইবে; ইহারা ধর্মপথের ভয়ানক অনিষ্টকর বলিয়া জানিবে। যাহারা যত্নবান হইয়া ইহা করিতে পারিবে তাহাদিগের তত্বজ্ঞান হইবে সন্দেহ নাই। তত্বজ্ঞান হইলে আত্ম-প্রত্যক্ষ হইলেই মুক্তি লাভ হয়।

মনঃসংযমই সাধনার প্রধান লক্ষণ। বাহ্য বিষয়ে যিনি আসক্তিশূন্য এবং অন্তরে যিনি পরমানন্দ ভোগ করেন, তিনি ব্রহ্মসংযুক্ত হইয়া অক্ষয় সুখ প্রাপ্ত হন। প্রজাপালক, প্রজারঞ্জক রাজা ও রণজয়ী যোদ্ধা অপেক্ষাও, যিনি মনকে বশীভূত করিয়াছেন তিনিই মহাপুরুষ। সন্তরণ দ্বারা সমুদ্র পার হওয়া সম্ভব হইতে পারে কিন্তু মন জয় করা বড়ই শক্ত। মন জয় করা সহজ হইতে পারে যদি ভক্তি, বিশ্বাস ও দৃঢ়তা সহকারে কার্য করা যায়।

দয়াই সাধনার মূল ভিত্তি আর অভিমান নরকের প্রশস্ত পথ। যে ব্যক্তি অহংকারশূন্য, ক্ষমাশীল, সুখ দুঃখে সমভাব, সর্বদা সন্তোষযুক্ত; যিনি ভগবানে মন বুদ্ধি অর্পণ করিয়াছেন, যিনি কাহাকেও সন্তাপ প্রদান করেন না, যিনি ক্রোধ ও ভয় হইতে বিমুক্ত, যিনি আকাঙ্ক্ষাশূন্য, যিনি হর্ষে সন্তুষ্ট ও বিষাদে ক্লেশযুক্ত নহেন, যিনি পাপ-পুণ্য পরিশূন্য, যিনি শত্রু মিত্র মান অপমান সকলেই সমভাব, যাঁহার নিন্দা ও স্তুতি সমান জ্ঞান, শরীর রক্ষার্থ যাহা কিছু সংস্থান তাহাতেই সন্তুষ্ট, যিনি ঈশ্বরপরায়ণ, শ্রদ্ধাযুক্ত, ভক্তিপরায়ণ, তিনিই ঈশ্বরকে পাইবেন এবং তাঁহার মুক্তি নিশ্চয়।

অন্য সকল সাধনা অপেক্ষা কেবল জ্ঞানই মুক্তির প্রতি সাক্ষাৎ কারণ, যেমন অগ্নি ব্যতীত পাক সম্পাদন হয় না। পরিচ্ছন্ন আত্মাকে অজ্ঞানবশত অপরিচ্ছন্ন বোধ হয়। যদি অজ্ঞানের নাশ হয় তবে কেবলমাত্র আত্মাই

স্বয়ং প্রকাশিত হন, যে প্রকার মেঘের বিনাশ হইলে সূর্য স্বয়ং প্রকাশিত হন। অজ্ঞানরূপ মালিন্যযুক্ত যে জীব, তাহাকে জ্ঞানাভ্যাসের দ্বারা নির্মল করিয়া জ্ঞান স্বয়ং নষ্ট হয়। যে প্রকার স্বপ্নাবস্থায় স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুসকল সত্যের ন্যায় প্রকাশ পায় এবং জাগ্রত অবস্থায় তাহা মিথ্যা বলিয়া বোধ হয়, সেই প্রকার রাগদ্বেষাদি-সঙ্কুল এই সংসার স্বপ্নের ন্যায় অজ্ঞান অবস্থায় সত্য বোধ হয় এবং অজ্ঞান বিনাশ হইলে তাহা মিথ্যা বলিয়া প্রতীত হয়।

ঈশ্বর কেবল নিরাকার নহেন, তিনি রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ এবং ভক্তি, দয়া ইত্যাদি গুণের অতীত। আজকাল যাঁহারা নিরাকার উপাসনা করেন, তাঁহারা নিজেরাই বলিতে পারেন না যে ঠিক উপাসনা হইতেছে কিনা। তাঁহাদিগের ভক্তি-বৃত্তির চর্চায় কিছু মানসিক উপকার হইবে, আসল ফলে ইহার বেশি কিছু হইবে না। যখন বুঝিব নিরাকার সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের জন্য ভক্তি ও মানসিক বৃত্তির স্ফুরণ প্রয়োজন, তখন যদি ঈশ্বরতত্ব জ্ঞান লাভ করিবার জন্য কোনও সাকার পদার্থের অবলম্বন ব্যতীত সেই সকল বৃত্তির স্ফুরণের ইচ্ছা করি তখন তাহাই নিরাকারের নিরাকার উপাসনা। ঈশ্বরতত্ব জ্ঞান লাভ করিবার জন্য কোনও সাকার চিন্তার রূপ অবলম্বন করিলে তাহাকে সাকার উপাসনা বলে, আর সাকার চিন্তা ব্যতীত, জগৎব্যাপী ঈশ্বরের মহিমা, গুণ ইত্যাদি হৃদয়ঙ্গম করাই নিরাকার উপাসনা। নির্গুণ ঈশ্বরের সগুণ উপাসনা ভিন্ন অন্য কোনো রূপ উপাসনা হইতে পারে না।

উপাসনা চারি প্রকার—প্রথম ঈশ্বর উপাসনা, দ্বিতীয় দেবদেবীর উপাসনা, তৃতীয় শক্তিশালী পদার্থের উপাসনা, যেমন সূর্য, অগ্নি ইত্যাদি; চতুর্থ ধার্মিক মনুষ্যের উপাসনা। গাভীর উপাসনা, বৃক্ষের উপাসনা, শস্যের উপাসনা ইত্যাদিও এক জাতীয় উপাসনা। এই উপাসনার বশবর্তী হইয়া হিন্দু সূত্রধর বাইস বাটালি পূজা করে, কর্মকার হাতুড়ি, নেহাই পূজা করে, কুম্ভকার চাক পূজা করে, ব্রাহ্মণ পুঁথি পূজা করে। উপাসনার সময় অচেতন উপাস্যকে সচেতন মনে করিয়া উপাসনা করা যাইতে পারে। আদিম মনুষ্য তাহাই করিয়া থাকে। অন্য প্রকার উপাসনায় অচেতনকে অচেতন বলিয়া জ্ঞান থাকে, এই জাতীয় উপাসনাকে জড় উপাসনা কহে। ইহা অহিতকর নহে, কারণ ইহা দ্বারা কতকগুলি চিত্তবৃত্তির স্ফূর্তি সাধিত হয়।

ঈশ্বরকে আমরা দেখিতে পাই না, তবে তাঁহাকে আমরা জানিতে পারি তাঁহার কার্য দেখিয়া, তাঁহার শক্তি দেখিয়া ও তাঁহার দয়ার পরিচয় পাইয়া। সাকার বা দেবদেবী ব্যতীত যে উপাসনা তাহা কেবল পত্রহীন বৃক্ষের ন্যায় অঙ্গহীন উপাসনা। হিন্দুধর্মে যে প্রকার উপাসনা পদ্ধতি আছে, তাহা বেশ ভালোরূপ বুঝিয়া দেখিলে উহা হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতার লক্ষণ বলিয়া জানা যায়। দুর্ভাগ্যবশত ক্রমে হিন্দুধর্মের বিকৃতি হইয়াছে, হিন্দুধর্মে যে কেবল একমাত্র ঈশ্বর ভিন্ন দেবতা নাই, ইহার অনেক প্রমাণ আছে। হিন্দুধর্মের যে সার কথা এবং উচ্চ ও উদার ভাব আছে তাহা আর দেখিতে পাওয়া যায় না! ঈশ্বর বিশ্বরূপ, যেখানে তাঁহার রূপ দেখা যায় সেইখানে তাঁহার পূজা করা হয়।

যে প্রণালী দ্বারা সেই অজ্ঞান-অন্ধকার হইতে মুক্ত হওয়া যায়, সেই প্রণালী অবলম্বনই প্রকৃত ঈশ্বর উপাসনা। ঈশ্বরের অস্তিত্ব অন্তরে অনুভব করার নাম ঈশ্বর উপাসনা। যাহা দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ, উন্নত ও নির্মল হয় তাহারই নাম ঈশ্বর উপাসনা। যেমন অপরিষ্কৃত দর্পণে কোনো প্রতিবিম্ব স্পষ্ট পড়িতে পায় না, সেইরূপ চিত্ত নির্মল না হইলে ঈশ্বরের জ্যোতি প্রতিবিম্বিত হয় না। যদি চিত্তের নির্মলতা সম্পাদন জন্য কেহ কোনো দেবদেবীরূপ সূক্ষ্ম শক্তির সাহায্য অবলম্বন করেন, তবে সেই দেবদেবীর আরাধনাকেও ঈশ্বর উপাসনা বলিতে হইবে।

ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে হিন্দু শাস্ত্রকারগণ ঈশ্বরকে নিরাকার, নির্গুণ, বিশ্বব্যাপী, বিশ্বরূপ, অনাদি, অনন্য সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ, শুদ্ধ, জরারহিত, অমর, শান্ত, নির্মল, অন্তর্যামী, বিশ্বকর্তা, বিশ্ববেত্তা, আত্মার জন্মস্থান, সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় ও উদ্ধারের কারণ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন এবং তিনি বাক্য ও মনের অগোচর। ইহার অর্থ ভালোরূপে বুঝা উচিত, প্রথম নিরাকার শব্দটিতে কি অর্থ বুঝায়; রূপ ও আকার এই দুই শব্দ অনেক সময়ে একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। দ্রব্যের বর্ণ গুণকে রূপ বলে, যাহা দ্রব্যের আকার

তাহাও রূপ। অনেকে মনে করেন যাহা আমাদের চক্ষুর অগোচর তাহার কোনো আকার নাই, অনেক দ্রব্যের আকারকে চক্ষু ইন্দ্রিয়ের বিষয় বলিয়া মনে করেন। বায়ু চক্ষুর অগোচর কিন্তু বায়ুরও আকার আছে। শব্দ, গন্ধ, অতি ছোট ছোট কীট যাহা জলে থাকে এই সকল চক্ষুর অগোচর হইলেও ইহাদের আকার আছে।

কেবল মুখে ঈশ্বর ঈশ্বর করিলে তাঁহার উপাসনা করা হয় না। উপাসনা করিবার অগ্রে ঈশ্বর কথাটির প্রকৃত অর্থ কি, তাহা হৃদয়ঙ্গম করা উচিত। এই যে বিশ্বব্যাপী জগৎ, যাহা এক শক্তির দ্বারা চালিত হইতেছে, তাহাই ঈশ্বরের অনন্ত শক্তি। কি স্থূল, কি সূক্ষ্ম জগতে যত প্রকার শক্তির ক্রিয়া দেখা যায়, তাহাই ঈশ্বরের অনন্ত শক্তি এবং এই শক্তিই চৈতন্যশক্তি বলিয়া জানিবে। যিনি তাঁহার নিজ শক্তি এই শক্তির সহিত এক তানে মিলাইতে পারেন, তিনি ঈশ্বর কী তাহা বেশ বুঝিতে ও জানিতে পারেন। এই সমস্ত জগতের সমষ্টিভাবই ঈশ্বর, ইহা স্পষ্ট বুঝিলে ঈশ্বর নিরাকার, নির্গুণ, সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, আনন্দ-স্বরূপ। তিনি বিশ্বরূপ ও অনন্ত এই সকল শব্দগুলির অর্থ স্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। ঈশ্বরকে তাঁহার কার্য, তাঁহার শক্তির বিষয়, ভক্তিভাবে আলোচনা করিলেই ক্রমে ক্রমে সমস্ত জানিতে পারা যায়।

সৃষ্টিকর্তাকে জানিতে হইলে সৃষ্টির বিষয় অধ্যয়ন এবং ভাব গ্রহণ প্রয়োজন। প্রলয়কর্তাকে জানিতে হইলে প্রলয়তত্ব বুঝিতে হইবে, আর পালনকর্তাকে জানিতে হইলে, পালনতত্ব বুঝিতে হইবে। সংহারকর্তা বিষয়ক জ্ঞান যে ঐশ্বরিক এক শক্তির বিষয় ইহা বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইবে। সেই অনাদি কারণের স্বরূপ আগ্রহ-চিত্তে জানিবার চেষ্টাই তাঁহার উপাসনা। যদি ঈশ্বর-তত্বজ্ঞান লাভ বাসনা না থাকে তবে নিজের জন্য মন্দিরে অথবা দেবালয়ে বসিয়া প্রার্থনা করো বা কোনো দেবদেবীর ভজনা করো তাহা ঈশ্বর উপাসনা নহে। কালিকা দেবীর অসীম ক্ষমতা, ভক্তিভাবে তাঁহার উপাসনা করিলে ঐহিক পারত্রিক অনেক ফল লাভ হয়, সেই বিশ্বাসে যদি কালিকা দেবীর মূর্তি সম্মুখে রাখিয়া কালীর উপাসনা করো, তবে তাহা কালিকা দেবীর উপাসনা করা হইল, কিন্তু ঈশ্বরের উপাসনা করা হইল না। যদি কোনো সাকার পদার্থকে ঈশ্বরের স্বরূপ জ্ঞান করিয়া ভক্তিভরে উপাসনা করা যায় তাহা হইলে উহা ঈশ্বর উপাসনা করা হইল।

কোনো সাকার পদার্থকে ঈশ্বর জ্ঞান করিলে, ঈশ্বরের মহিমা খর্ব করা হয় এবং উপাসক ভ্রান্ত পথের পথিক হন। যদি আমি কালিকা দেবীর রূপকে ঈশ্বরের রূপ জ্ঞান করিব এবং যখন কালী-রূপ অন্তরে অনুভব করিতে পারিব, তখনই আমি ঈশ্বরের স্বরূপ বুঝিয়াছি ইহাই বুঝিতে হইবে। এইরূপ উপাসনায় কোনো ফল নাই, তাহা কেহ বলিতে পারিবেন না। তবে এই প্রকার সাকার উপাসনা দ্বারা নিরাকার, সর্বব্যাপী, নির্গুণ ঈশ্বরের মহিমা বুঝিতে পারা যায় না।

মনুষ্যের কর্মের ফলদাতা শক্তির নামই দেবদেবী। দেবদেবীগণ অনিত্য সুখের প্রলোভনে মানুষকে মুগ্ধ করিয়া রাখেন। সেইজন্য মানুষ ঈশ্বর সম্বন্ধে ঘোর অন্ধকারে পড়িয়া থাকে। যতদিন সামান্য অনিত্য সুখের কামনা মনুষ্য হৃদয়ে প্রবল থাকিবে, ততদিন তিনি নিত্য সুখদাতা ঈশ্বর যে কি পদার্থ তাহা জানিতে পারিবেন না। ভগবানকে পাইব বা দেখিব এই আশা করিলে প্রথমেই কামনা ত্যাগ করা চাই। সকাম কর্মই দেবদেবীর উপাসনা এবং নিষ্কাম কর্মই ঈশ্বর উপাসনা।

যে সমস্ত অজ্ঞান ব্যক্তি মৃত্তিকা, শিলা, ধাতু ইত্যাদি দ্বারা নির্মিত বিগ্রহকে ঈশ্বর মনে করেন, তাঁহারা কেবল ভ্রমে পতিত হইয়া থাকেন। কল্পিত মূর্তি যদি ঈশ্বর হন, তাহা হইলে স্বপ্নলব্ধ রাজ্য প্রাপ্তিও সম্ভব হইতে পারে। ঈশ্বরকে আমরা সহজে জানিতে পারি না, সেই কারণে অজ্ঞানবশত তাঁহার স্বরূপ নির্মাণ করিয়া তাহা পূজা অর্চনা করত মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করি। এই মূর্তি তাঁহার শক্তি বা স্বরূপ বলিয়া জানিতে হইবে, কিন্তু ঐ মূর্তি কখনও ঈশ্বর হইতে পারেন না। তাঁহার শক্তি সকল স্থানেই বিদ্যমান আছে।

মনুষ্যের কর্মই শুভাশুভ ফল প্রদান করিয়া থাকে, এই কর্মাত্মক শক্তিই দেবদেবী জানিবে। বেদান্ত শাস্ত্রের ব্রহ্ম, সাংখ্যের নির্গুণ পুরুষ, আর যোগ শাস্ত্রের নির্বিকল্প সমাধি দ্বারা গন্তব্য পথে যাইতে হয়। সেই ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার ব্যতীত নিত্য সুখ এবং নির্মাণ মুক্তি পাওয়া যায় না। দেবদেবীর উপাসনা দ্বারা ভোগ ঐশ্বর্য লাভ হয় এবং সেই জন্য সমাধিসুখে বঞ্চিত থাকিতে হয়। একাগ্র চিত্তে যে যেরূপ কামনা করে, তাহার

একাগ্রতার জন্য সে সেই কামনানুযায়ী শক্তির সাহায্য প্রাপ্ত হয়। ভোগৈশ্বর্য কামনা থাকিলে ভোগ ঐশ্বর্য ফলদাতা শক্তি অর্থাৎ দেবদেবীর সাহায্য পাইবে, আর যদি নিষ্কাম হয় অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত অন্য কোনও কামনা না থাকে তবে নির্গুণ নিরাকার শক্তির সাহায্য পাইবে। ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার সকাম কর্মই, দেবদেবীর উপাসনা আর নিষ্কাম কর্মই ঈশ্বর উপাসনা। ব্রহ্মজ্ঞান পিপাসু হইয়া সাকার উপাসনা এবং ভোগ ঐশ্বর্য কামনা-রহিত হইয়া করিলে যথার্থ ঈশ্বর উপাসনা করা হয়।

কর্ম কথাটির কি অর্থ বুঝায়? যাহা করা যায় তাহারই নাম কর্ম। কর্ম দুই প্রকার স্থূল ও সূক্ষ্ম। আমি কলিকাতা যাইব মানস করিয়া তথায় গমন করিলাম, ইহা স্থূল জাতীয় কর্ম; দৈহিক অঙ্গ চালনায় শক্তির ব্যয় করা হইল। আর কলিকাতা যাইব মানস করিয়া গেলাম না ইহা সূক্ষ্ম জাতীয় কর্ম, কারণ ইহাতে কেবল মানসিক শক্তির ব্যয় করা হইল। চিত্তের একাগ্রতায় কর্মরূপে যে বীজ উৎপন্ন হয় তাহা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। বেদের কর্মকাণ্ড যাহা, দেবদেবীর উপাসনা তাহা। ঈশ্বর নিষ্কাম, সুতরাং তুমিও নিষ্কাম, সেই জন্য কামনারহিত হইয়া উপাসনা করিলে তবে ঈশ্বরকে পাইবে। কামনা ও আশা থাকিতে তাঁহাকে পাইবার আশা নাই। হিন্দুমাত্রেই ঈশ্বরের নিকট মোক্ষ ভিন্ন আর কিছুই প্রার্থনা করেন না। নিত্যপদার্থ ঈশ্বর নিত্যফল মোক্ষসুখ ভিন্ন অন্য ফল প্রদান করিতে জানেন না। আর ঈশ্বর জগৎ রচয়িতা, তিনি অদ্বিতীয়, দয়াময়, সর্বশক্তিমান, অচিন্ত্য, অব্যক্ত এই প্রকার কথাগুলি বলিতে পারিলেই যে ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মিয়াছে বলিতে হইবে তাহা কখনওই নহে।

রাগদ্বেষাদি দোষ হইতে শুভাশুভ কর্মের উৎপত্তি, সেই কর্ম হইতে সংসার। অতএব অবিদ্যা পরিত্যাগ করা সর্বতোভাবে কর্তব্য। কেহ অপকার করিলে অপকৃত ব্যক্তি প্রথমেই বিচার করিবে কাহার অপকার করিল, এই বিষয়টি বিচারিত হইলে আর দ্বেষই হইতে পারে না। আত্মাকে ছাড়িয়া দিলে পঞ্চ ভূতময় দেহ তো জড় পদার্থ মাত্র, জ্ঞান চৈতন্য কিছু নাই, তখন অগ্নিদগ্ধ হউক, আর শৃগালাদি কর্তৃক ভক্ষিতই ইউক, সে নিজে কিছুই জানিতে পারে না, তাহার সেই জড় দেহের আবার অপমান কী?

আমার আত্মার সহিত জগতের আত্মার একতানে মিলন করাই যোগ। এই প্রকার যোগযুক্ত আত্মাই আপনাকে সর্বভূতস্থ জ্ঞান করিয়া থাকেন। জনতা হইয়া কোনও প্রকার মহা গোলমাল হইলে, প্রত্যেকের আলাহিদা শব্দ শ্রবণ গোচর হয় না, কেবল হো হো একটি শব্দ শুনা যায়, তাহারই নাম যোগ। যেমন অনেকগুলি সুর একতানে মিলাইয়া বাজাইলে শ্রোতৃগণ কেবল একটি মাত্র শব্দ শুনিতে পান, সেই সুরই যোগ। সেই প্রকার সমস্ত জগতের ভিন্ন ভিন্ন ভূতের চৈতন্য যিনি অনুভব করিতে পারেন, তিনিই জানিতে পারেন চৈতন্য অথবা যোগ কি প্রকার। এই চৈতন্যই জগতের আত্মা।

উপাসনা দ্বারা উপাস্য দেবতা সম্বন্ধে "সোহহম" সেই আমি এই জ্ঞান যাহাতে জন্মায় তিনি ঠিক বুঝিতে পারেন আমি কে। আমার সহিত আহার হস্তপদাদির ও মনের সহিত একটি নিতান্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে এবং তাহা অনুভব করিতে পারি বলিয়া আমার হস্তপদাদি ও মনে অহং জ্ঞান জন্মিয়াছে। মনুষ্য যতই উন্নত হইতে থাকিবে, ততই স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে যে আমার সহিত সমস্ত বিশ্বের ঠিক এই প্রকার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। অনুভবশক্তির বিকাশে মানব সেই সম্বন্ধ স্পষ্ট অনুভব করিতে পারিবে। নিজের অহংজ্ঞানের সহিত জগতের যোগই প্রকৃত যোগ। যে সকল ভিন্ন ভিন্ন ঐশ্বরিক শক্তিতে জগৎ চলিতেছে, সেই সকল শক্তির ক্রিয়া মানব চেষ্টা করিলে আপনাতেই সমস্ত দেখিতে পান। এই জন্য মনুষ্যকে ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড বলিয়া থাকে।

পূর্বজন্ম ও পরজন্ম : 'পূর্বজন্ম ও পরজন্ম বা পরকাল আছে কিনা তাহা জানিবার ইচ্ছা হইলে স্থিরচিত্তে বেশ বিবেচনা করিয়া দেখিলেই পূর্বজন্ম, বর্তমান জন্ম ও ভবিষ্যৎ জন্ম এই তিন জন্ম স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্বজন্মে আমি যে প্রকার কার্য করিয়াছি এবং যে প্রকার স্বভাবের লোক ছিলাম, মৃত্যুর পর কর্মফল অনুসারে সেই সকল পরমাণু লইয়া এই বর্তমান দেহ তৈয়ার হইয়াছে। বর্তমান জীবনে আমি নিজে ভালোমন্দ কার্য যাহা কিছু করিয়াছি, তাহা সমস্তই আমি বেশ জানি। ভালো কার্য করিলে ভালো ফল এবং মন্দ কার্য করিলে মন্দ ফল ভোগ করিতে হয়, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। এক্ষণে যিনি বিচার

করিয়া দেখিবেন, তিনিই জানিতে পারিবেন যে বর্তমান জীবনে আমি কী প্রকার লোক তৈয়ার হইতেছি এবং আমার এই সকল কার্য অনুসারে ভবিষ্যৎ জীবনে কী প্রকার স্বভাব ও কী প্রকার অবস্থার লোক হইব। যাহা চেষ্টা করিলে নিজে জানা যায়, তাহা জানিবার জন্য পরের সাহায্য আবশ্যক করে না।

বর্তমান জন্মের যেটি ইহলোক, তাহাই পূর্বজন্মের পরলোক আর বর্তমান জন্মের পরলোকই ভবিষ্যৎ জন্মের ইহলোক। এই স্থূল দেহের ভিতর অন্য দেহ আছে তাহার নাম সূক্ষ্ম দেহ এবং তাহার ভিতরেও আর এক দেহ আছে তাহার নাম কারণ দেহ। কদলী ত্বকের ন্যায় অবস্থিত এই ত্রিবিধ দেহই সংসার সংজ্ঞায় বিরাজমান। মানবদেহের গঠন, আকৃতি, বর্ণ, স্বভাব, সুশ্রী বা কদাকার, বিদ্বান অথবা মূর্খ, কর্কশ বা নম্র, ধার্মিক বা অধার্মিক, সাধু অথবা চোর, সরল বা কুটিল, রাজা অথবা জমিদার, মধ্যবিত্ত অথবা গরিব, উচ্চ বংশে জন্ম অথবা নীচ বংশে জন্ম এই সমস্তই পূর্বজন্মের কর্মফল অনুসারে এই বর্তমান দেহ তৈয়ার হইয়াছে। এই প্রকার পুনরায় এই জীবনের কর্মফল লইয়া পরজন্মের দেহের আকৃতি হইবে।

জীব ভূমিষ্ঠ হইতে লয় পর্যন্ত যে সময়, তাহাই তাহার পরমায়ু। যদি আধ্যাত্মিক অর্থে ধরা যায় তবে জীবের পরমায়ু অনন্ত, জীব অক্ষয় ও অমর। জীব ধ্বংস হইলেও তাহার উপকরণ কখনওই নষ্ট হয় না। বাস্তবিক জীবের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত যে সময় সে জীবিত থাকে সেই সময়টুকু তাহার পরমায়ু। সাধারণের বিশ্বাস যে জীব যত পুণ্যবান, তাহার পরমায়ু তত অধিক, সে ততদিন জীবিত থাকে; কিন্তু তাহা ভুল। সংসার হইতে জীব যত দূরে থাকিবে, পাপ তাহাকে তত স্পর্শ করিতে পারিবে না। জীব কর্মফল ভোগ করিবার জন্য সংসারে আগমন করে, কারণ সংসারই কর্মফল ভোগ করিবার স্থান। যে পুণ্যবান সে কখনও কর্মফল ভোগ করে না; সুতরাং যতদিন জীবের কর্মফল ভোগ সমাপ্ত না হয়, যতদিন জীব পাপ হইতে মুক্ত না হয়, ততদিন তাহাকে সংসারে থাকিতে হয়। যে পুণ্যবান সে অধিক দিন সংসারবাসী হয় না, যে যত পাপী সে ততদিন সংসারে থাকিয়া কর্মফল ভোগ করিতে থাকে। যাহার কর্মফল শেষ হয়, সে সংসার হইতে অপসৃত হয়, তাহার জীবন যত শীঘ্র লয় প্রাপ্ত হয়, সে তত পুণ্যবান তাহার আয়ু অসীম, যতদিন ঈশ্বরের সত্তা বর্তমান থাকিবে ততদিন তাহার সত্তা বর্তমান থাকিবে।

মনুষ্য যেমন পরপর পাপপুণ্য করিয়া থাকে তাহার ফলভোগও দিবা রাত্রির ন্যায় পরপর হইয়া থাকে। সে জন্য কর্মফল শেষ না হইলে পুনঃ পুনঃ সংসারে আসিতে হয়। এই যে পঞ্চভূতের পুত্তলি মানব, মৃত্যুর পর কি কোনও স্থানে গমন করে, কি মৃত্যুই মানবের শেষ? ইংরেজরা বলেন, মনুষ্যের কর্মফল ইহজন্মের ভোগ হয় এবং মৃত্যু শেষ। ইহা যে সম্পূর্ণ ভুল তাহা আর কাহাকেও বুঝাইতে হইবে! ঈশ্বর আছেন স্বীকার করিলেই পরজন্ম আছে তাহা অবশ্যই মানিতে হইবে। যদি ঈশ্বর থাকেন তবে মনুষ্যের আত্মা আছেই; ঈশ্বরের ধ্বংস নাই সুতরাং ঈশ্বরের শক্তি আত্মারও বিনাশ নাই। যদি পরজন্ম না থাকে তবে ঈশ্বরকে দয়াময় কখনও বলা যাইতে পারে না, কারণ এই জীবনে কেহ রাজা, কেহ প্রজা, কেহ ধনী, কেহ দরিদ্র, কেহ অন্ধ, কেহ খঞ্জ, কেহ ভদ্র বংশে, কেহ নীচ বংশে ইত্যাদি জন্মগ্রহণ করে কেন? ইহার স্পষ্ট প্রমাণ পূর্বজন্মে যে যে প্রকার কর্ম করিয়াছে তাহার ভোগ শেষ হওয়াতে জীব কর্মফল অনুসারে পুনরায় দেহ ধারণ করিয়াছে। যে জন্মান্ধ সে এই জীবনে কিছুই দেখিতে পাইল না কিন্তু আর সকলে বেশ দেখিতে পাইতেছে, ইহার কি কোনও কারণ নাই? বোধহয় কেহই অস্বীকার করিবেন না, ইহা পূর্বজন্মের পাপের ফল ভোগ হইতেছে। এই জীবনের দেহ আকৃতি গঠন স্বভাব জ্ঞান ইত্যাদি সকলই জানিবেন পূর্বজন্মের কর্মফল অনুসারে ঠিক সেই প্রকার গঠিত হইয়াছে। যে যে প্রকার কর্ম করিয়াছে তাহার আকৃতি, স্বভাব ঠিক সেই প্রকার হইয়াছে। যে দস্যুবৃত্তি করিয়া জীবন কাটাইতেছে, পরজন্মে তাহার আকৃতি ও স্বভাব ঠিক দস্যুর মতোই রুক্ষ হইবে। যিনি ধর্ম আলোচনা করিয়া জীবন কাটাইতেছেন তাঁহার আকৃতি সৌম্য ও স্বভাব অতি কোমল হইবে।

একজন মনুষ্য সমস্ত জীবন ধর্ম আলোচনা করিয়া হয়তো সুখী হইল না, সংসারে নানা প্রকার কষ্ট পাইল, আর একজন অতি ঘৃণিত কার্য লাম্পট্য বা দস্যুবৃত্তি করিয়া হয়তো জীবন বেশ সুখে কাটাইল, পূর্বজন্মই ইহার স্পষ্ট প্রমাণ। যদিও এক ব্যক্তি ধর্ম আলোচনা করিয়া এই জীবনে কষ্ট পাইল ইহার সুখ এক সময় সে

নিশ্চয় ভোগ করিবে, আর এই জীবনে যে কষ্ট পাইল তাহা পূর্বজন্মের মন্দ ফল, যাহা এই ভোগ করিবার সময় উপস্থিত বলিয়া কষ্ট ভোগ করিল। আর অপর ব্যক্তির এক্ষণে পূর্বজন্মের শুভ ফল ভোগ করিবার সময় উপস্থিত বলিয়া সুখে জীবন কাটাইল কিন্তু ইহার পরই তাহাকে মহা কষ্ট ভোগ করিতে হইবে। অনেকে বলিয়া থাকেন পাপ কর্ম করিতে প্রবৃত্তি তাহাও ঈশ্বরের ইচ্ছা এবং পুণ্য কর্ম করিতে অপ্রবৃত্তি তাহাও ঈশ্বর দিয়া থাকেন, ইহা নিতান্ত অজ্ঞানের কথা; রিপু ও ইন্দ্রিয় সকল ভালো মন্দ কার্য করাইয়া থাকে। রাগ করিলেই অনিষ্ট হইবে, কামনা হইলেই প্রাপ্তি ইচ্ছা হইবে, লোভ করিলেই পরদ্রব্য অপহরণের চেষ্টা হইবে, অহংকার হইলেই পরের অনিষ্ট চিন্তা হইবে ইত্যাদি যাহার যে ধর্ম সে তাহার কার্য করিয়া থাকে। এই জন্যই মনুষ্যকে হিতাহিত জ্ঞান দিয়াছেন এবং সকল জীবের শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন। মৃত্যুই কখনও শেষ হইতে পারে না, তাহা হইলে ঈশ্বরকে প্রত্যহ রাশি রাশি আত্মা সৃজন করিতে হয়। মনুষ্য অপেক্ষা তাঁহার কার্য কত বেশি হয় এবং বড় কষ্টের জীবন হইয়া পড়ে। তিনি যে সর্বশক্তিমান।

দেহ বিচ্ছিন্ন হইলেও আত্মার অপকার হয় না যেমন গৃহ দগ্ধ হইতে থাকিলে গৃহ অভ্যন্তরস্থ আকাশের কিছু ক্ষতি হয় না। আত্মা হন্তাও হয় না। আত্মা হতও হয় না। দ্বেষই সন্তাপের মূল, দ্বেষই সংসারের বন্ধন, দ্বেষই মুক্তির প্রতিবন্ধক, অতএব যত্নপূর্বক দ্বেষ পরিত্যাগ করিবে। সুখ দুঃখ দেহের নাই, আত্মারও নাই। আত্মা বায়ুর মতো নির্মল ও নির্লেপ তথাপি ইনি ঈশ্বরের মায়ায় মোহিত হইয়া আমি সুখী আমি দুঃখী আপনিই এই প্রকার বোধ করেন। বিশ্বমোহিনী সেই অনাদি অবিদ্যার নামই মায়া। জন্মিবামাত্র জীবেরই সেই অবিদ্যা অর্থাৎ মায়ার সহিত সম্বন্ধ হয়, তাহাতেই এই সংসারবন্ধন হইয়া থাকে। বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদির সমীপে অবস্থিতি হেতু আত্মা নির্মল হইলেও তত্তৎ পদার্থের সমগুণসম্পন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হন। মন, বুদ্ধি ও অহংকার জীবের সহকারী আপনাদিগের কৃতকর্মফল আপনাদিগের ভোগ করিতে হয় অর্থাৎ যাহার যেমন কর্মফল তাহাকে সেই প্রকার ভোগ করিতে হয়। পুনঃ সৃষ্টি সময়ে জীব ও মন প্রভৃতির সহিত সম্বন্ধ লইয়া দেহ ধারণ করিতে বাধ্য হন। যতদিন না জীব মুক্ত হয় ততদিন পর্যন্ত তাহাকে এইরূপে ভ্রমণ করিতে হয়। দেহ মনস্তাপের মূল, দেহ সংসারের কারণ, কর্মফল হইতেই সেই দেহের উৎপত্তি। কর্ম দুই প্রকার—পাপ ও পুণ্য, সেই পাপ পুণ্যের অংশ অনুসারেই দেহীর সুখ দুঃখ হইয়া থাকে; যতটুকু পাপ ততটুকু সুখ ভোগ করিতে হয়। এই সুখদুঃখ দিবা রাত্রির ন্যায় পরস্পর সাপেক্ষ এবং ভোগ না করিলে শেষ হয় না। ভোগ শেষ না হইলেও মুক্তি হয় না।

আত্মা শরীরের কর্তা, যে বস্তু জীবদেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে জীবের জীবন থাকে না, ইন্দ্রিয়াদি আর কেহই কার্য করিতে পারে না, সেই বস্তুই জীবের আত্মা। আত্মাহীন দেহে সুখ দুঃখ কিছুরই অনুভব হয় না। রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ, জ্ঞান কিছুই থাকে না সুতরাং ইহা নিশ্চয় যে আত্মাই দেহের কর্তা। সুখ দুঃখ জ্ঞানের দ্বার স্বরূপ; আত্মাকে তিরস্কার বা পুরস্কার দিতে হইলে সেই আত্মার বাসস্থল দেহের প্রয়োজন, ক্লেশ ও বিষাদ শরীরের সাহায্য না পাইলে আত্মার বোধগম্য হইতে পারে না। আত্মা একাকী চলিয়া যায়, দেহ তাহার সঙ্গে যায় না সুতরাং আত্মার শান্তি অসম্ভব। প্রত্যেক জীবদেহে ঈশ্বর আত্মারূপে বর্তমান আছেন। জীবাত্মা পরমাত্মার অংশ। পাপ যেমন অনেক প্রকার তাহার শাস্তিও সেইরূপ অনেক প্রকার, পুণ্যও অনেক প্রকার, হর্ষও অনেক প্রকার, অনুতাপই পাপের প্রধান দণ্ড, হর্ষই পুণ্যের প্রধান পুরস্কার। মনুষ্য হৃদয় পাপ পুণ্য নিরাকরণের তুলাদণ্ড। পুণ্যে হর্ষ ও পাপে অনুতাপ, আপনা হইতে মানব হৃদয়ে উদিত হইয়া তাহার কৃতকার্যের উপযুক্ত পুরস্কার দান করিয়া থাকে, এই দণ্ড দেখিয়াই যিনি বুদ্ধিমান তিনি নিজেই পাপ হইতে অপসৃত হইতে শিক্ষা করেন। পাপ-পুণ্যের বিচার ও ফলভোগ এই পৃথিবীতেই হইয়া থাকে। পঞ্চভূত কেবল পরমাণু সমষ্টি মাত্র, পরমাণু অবিনশ্বর। সুতরাং ভূতসমষ্টিরও বিনাশ নাই। মৃতদেহ পুনরায় সেই পঞ্চভূতেই মিশায়। যে মানব আজ তোমার সম্মুখে বিরাজমান তাহার শরীর পূর্বজন্মে কোনও জীবের পরমাণু দ্বারা নির্মাণ হইয়াছে। সুতরাং সেই ভূতপূর্ব জীবের পুনর্জন্মের ফল তোমার সম্মুখস্থ মানব।

যে আত্মা যে পরিমাণে পাপ হইতে নির্মুক্ত, যে আত্মা যে পরিমাণে বিষয়-বাসনা শূন্য, সেই আত্মা সেই পরিমাণে উন্নত। ধার্মিকের আত্মা, পাপাত্মার আত্মা হইতে অনেক উন্নত। সেই উন্নতিশীল আত্মা দেহত্যাগ করিলেও তাহার সেই উন্নত স্বভাব নষ্ট হয় না; বরং সংসারের যাহা কিছু বাসনা, যাহা একটু প্রবৃত্তি ছিল তাহা বন্ধ হইয়া আত্মা ক্রমশ উন্নতির পথে গমন করিতে লাগিল। আত্মা পুরুষ ও দেহ প্রকৃতি। এই আত্মা যে পর্যন্ত না প্রকৃতিতে সংযুক্ত হন সেই পর্যন্ত তিনি নিষ্ফল ও নির্গুণ অবস্থায় থাকেন, প্রকৃতির মিলনে তাঁহার ইচ্ছা প্রবৃত্তি জন্মাইয়া থাকে এবং প্রকৃতি হইতে ভিন্ন হইলে, পুনর্বার তিনি পূর্ববৎ স্বভাব অর্থাৎ নির্গুণ ও নির্লিপ্ত ভাব প্রাপ্ত হন। ইহার তাৎপর্য এই যে পর্যন্ত প্রবৃত্তি বাসনাদি বর্তমান থাকে যে পর্যন্ত আত্মা পাপ দেহকে আশ্রয় করিয়া থাকেন, সেই পর্যন্ত তিনি সগুণ, সর্ব বিষয়ে লিপ্ত, বাসনাদি সংযুক্ত; আর দেহ পরিত্যাগ করিলে পুনর্বার তিনি পূর্ব ভাব প্রাপ্ত হন। আত্মা প্রথমে নির্গুণ থাকিলেও দেহ আশ্রয় হইতেই গুণসম্পন্ন হইতে হয় এবং যে পর্যন্ত তিনি মোক্ষ লাভে সমর্থ না হন, সে পর্যন্ত পাপের ফল ভোগ করিতে হয়।

পশ্বাদি দেহ হতে মনুষ্য দেহ লাভ করিতে হইলে প্রকৃতির পরিবর্তন জন্য অতিশয় চেষ্টা করিতে হয়, পশু হইতে মনুষ্য হওয়া যত কঠিন, মনুষ্য হইয়া মনুষ্যত্ব লাভ করা তাহা অপেক্ষা কঠিন। মনুষ্য হইতে দেবতা হওয়া যত কঠিন, মনুষ্য হইয়া মনুষ্যত্ব লাভ করা তাহা অপেক্ষাও কঠিন। শুভ কার্যের অনুষ্ঠান দ্বারা মনুষ্য দেবত্ব পাইতে পারে না। সমস্ত ভোগ আশা ত্যাগ করিতে না পারিলে মুক্তির দ্বার উদঘাটিত হয় না। সকাম শুভ কার্য সাধন দ্বারা মুক্তির পথ আরও দুর্গম হইয়া ওঠে। জীব দেবলোকে ঐশ্বর্য ভোগে মত্ত হইয়া ভোগাবসানে মর্ত্যলোকে আসিবার উপযুক্ত হইয়া পড়ে। সুতরাং মহাপুরুষ কখনও দেবধাম কামনা করেন না, কারণ তাহা কর্মফল জন্য চিরস্থায়ী নহে। প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিতে হইলে, ইন্দ্রিয়সকলের বেগ সংবরণ করিতে হয়। রিপু-বর্গের বশীকরণ, অন্তঃকরণকে বিশুদ্ধকরণ, সর্বভূতে সমদর্শন, অভিমান ত্যাগ ইত্যাদি মনুষ্যত্ব লাভের প্রধান উপাদান। তাহা ছাড়া শমদমাদি, অর্থাৎ শম, দম, তিতিক্ষা, সমাধান, শ্রদ্ধা এবং উপরতি; শম অর্থাৎ ঈশ্বরবিষয়ক শ্রবণ মনন ব্যতীত বিষয় হইতে অন্তরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহ, দম অর্থাৎ শ্রবণাদি ভিন্ন বিষয় হইতে বাহ্যেন্দ্রিয়ের দমন, তিতিক্ষা অর্থাৎ শীত উষ্ণ সহন, সমাধান অর্থাৎ ঈশ্বর বিষয়ক শ্রবণাদিতে মনের একাগ্রতা, শ্রদ্ধা অর্থাৎ গুরুবাক্য এবং বেদান্ত বচনে বিশ্বাস, উপরতি অর্থাৎ মোক্ষ ইচ্ছা, এই কয়েকটি গুণও মানবের থাকা উচিত।

মনুষ্যত্ব লাভ হইলেও মুক্তি-ইচ্ছা সহজে হয় না। বিষয়ভোগে যতদিন না ক্লেশ উপলব্ধি হয় ততদিন জীব মহা জিতেন্দ্রিয় ও যোগীন্দ্র হইলেও মুক্তি লাভ করিতে পারে না। বাসনা ত্যাগই মুক্তির প্রধান উপায়। মুক্তির ইচ্ছা হইলেই যে মুক্তি পদ লাভ করিবে তাহা নহে। মহাপুরুষদিগের সহিত সদা সঙ্গ না করিলে মুক্তির পথ দেখাইবে কে? সৎপুরুষ সহবাস জীবের সৌভাগ্যসাপেক্ষ। ইচ্ছা করিলেই সাধু দর্শন হয় না। সাধুগণ প্রায় নির্জন স্থানে থাকেন, কখনও দৃষ্টিগোচর হইলেও সহজে চিনিয়া লওয়া যায় না। চিনিতে পারিলেও নিকটে রাখিতে চাহেন না। নিকটে থাকিবার অধিকার পাইলেও তাঁহাদের নির্মল হৃদয়ের ভাব আমরা বুঝিতে পারি না। নদী পারের জন্য যেমন নাবিকের নিকট নৌকা লইতে হয়, সেইরূপ সংসার পার হইবার জন্য মহাপুরুষ সংসর্গ করিয়া উপায় লাভ করিতে হয়। সৎসঙ্গ দ্বারা সমস্তই সুলভ হইয়া পড়ে। ধার্মিকের আত্মা ধর্মবলে ক্রমশ উন্নত হইয়া অবশেষে মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। এই উন্নতি এক মাসে বা এক বৎসরে হয় না। বহুকাল চেষ্টা করিলে তবে মোক্ষ প্রাপ্তি হয়। সেই প্রকার পাপীর আত্মাও ক্রমে অধোগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। স্বর্গ ও নরক বাস আর কিছুই নহে, কেবল আত্মার উন্নতি ও অবনতি মাত্র, আত্মার উন্নতি ও অবনতির সহিত আত্মার অবস্থান্তর প্রাপ্তির জন্য তাহার নানা স্থানে নানা প্রকার জন্ম হইয়া থাকে।

এ বিশাল বিস্তৃত জগতে কে কোথায় কিভাবে পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হইল তাহার অনুসন্ধান হয় না বলিয়াই পুনর্জন্ম সাধারণে বিশ্বাস করে না। পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হইয়াছে এমন কেহ সাক্ষাতে আসিয়া বলে নাই; কেবল অনুমান ও যুক্তির দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়া তাহাতে বিশ্বাস করিতে হয়, নতুবা ধর্মাধর্ম পাপপুণ্য কিছুরই পার্থক্য

থাকে না। লোকে পাপ করিতে ভীত হয় কেন? কেবল পরকালে বিশ্বাস আছে বলিয়া এবং পরকালে ঘোর নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে সেই ভয় থাকার জন্য ইহ জীবনে কেহ বিদ্বান, কেহ মূর্খ, কেহ পণ্ডিত, কেহ জ্যোতিষী, কেহ উচ্চ অঙ্গের গায়ক, কেহ বাদ্যযন্ত্রে মহা পটু; ইহার কারণ কেবলমাত্রই পূর্বজন্মে তাহারা সেই সেই বিদ্যায় পটু ছিল, ইহজন্মে সেই আত্মাই আছেন, দেহ মাত্র প্রভেদ, সুতরাং তাহাদের সেই সকল বিষয় অতি সহজে অভ্যাস হয়, শিখিতে আর তত কষ্ট পাইতে হয় না। যদি কর্মফল না থাকিত তবে এত প্রকার অবস্থার ভেদ হইত না। ভালোমন্দ কার্যের জন্যই জীবনকে নানা প্রকার অবস্থায় পতিত হইতে হয়। ভালো কার্যে আত্মার উন্নতি অর্থাৎ ঊর্ধ্বগতি হয়, মন্দ কার্য করিলে আত্মার অবনতি অর্থাৎ আত্মা নীচগামী হয়।'

আত্মবোধ : 'আত্মবোধ অর্থাৎ আপনাকে চিনিয়া লওয়া। আমি যদি আমাকে জানিতে পারি, তবে আমি ভগবানকেও জানিতে পারি। আমি যতদিন আমাকে না জানিব, ততদিন ভগবানকে জানিবার জন্য চেষ্টা করিলেও জানিতে পারিব না। আমি কী, ইহা জানিতে হইলেই আত্মা, মন বা বুদ্ধি এই তিন পদার্থর তত্ব জানা আবশ্যক, এক আত্মা শরীরের প্রধান জিনিস বা মালিক অর্থাৎ কর্তা ইহা নিশ্চয়। পৃথিবীর সূর্য যেমন কর্তা ও আলোক প্রদান করাতে জীবসকল সেই আলোকের আশ্রয়ে কার্য করে কিন্তু সূর্য নিজে কিছুই করে না। মনুষ্যশরীরে আত্মাও সেই প্রকার সূর্যের স্বরূপ কর্তা ও আলোক প্রদান করিয়া থাকেন, সেই আলোকের আশ্রয়ে ইন্দ্রিয়গণ কার্য করিয়া থাকে কিন্তু আত্মা নিজে কিছু করেন না। এক্ষণে দেখা উচিত আত্মা সাকার কি নিরাকার এবং দেহের কোন স্থানে কিভাবে থাকেন। যাহাকে আত্মা বলা যায় তাহা অবশ্যই দেশব্যাপী কিন্তু তাহার কোনও বিশেষ আকার নাই যাহার সহিত তুলনা করা যায়। তোমার আত্মা ও আমার আত্মা একই পদার্থ। যেমন একখানি কাগজের উপর নানা প্রকার চিত্র আঁকা থাকিলে ওই ভিন্ন ভিন্ন চিত্রের আধার সেই একমাত্র কাগজ, সেইরূপ এই জগতে সকলের আত্মাই এক। কিছুদিন একমনে আত্মাকে জানিবার চেষ্টা করিলে নিশ্চয়ই দেখিতে পাইবে যে আত্মা অগ্নিকণা তুল্য হৃদয়মধ্যে বিরাজ করিতেছেন। আত্মা থাকিলেই পরমাত্মা আছেন ইহা নিশ্চয়, যিনি পরমাত্মা তিনিই ঈশ্বর। ইহা নিশ্চয় জানিবে যে, আত্মা রূপবিশেষ, সেইজন্য চেষ্টা করিলে নিশ্চয় দেখিতে পাওয়া যায়; অনেক মহাপুরুষ দেখিতে পাইয়াছেন ও পাইতেছেন, সুতরাং আত্মা সাকার তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আত্মাকে জানিতে পারিলে আপনাকে জানা যায় এবং পরমাত্মাকে জানিলেই ভগবান বা ঈশ্বরকে জানা যায়। আত্মা পরমাত্মার অংশ বলিয়া জানিবে। আত্মাকে জানিলেই পরমাত্মাকে জানা যায়।

মন ও বুদ্ধি ইহারা সাকার কি নিরাকার ইহা অনেকের জানিবার ইচ্ছা হইতে পারে। মন বিশ্বব্যাপী নহে, মন অবশ্যই কোনো সীমাবদ্ধ স্থান ব্যাপিয়া আছে। তাহা হইলে মন নিশ্চয়ই বস্তু বিশেষ। সকলেই বলেন আমার মন তোমার মন ইত্যাদি এবং প্রত্যেক মনুষ্যের কার্যও পৃথক বেশ বোঝা যায়, আর মনের কার্যও যে সম্পূর্ণ ভিন্ন তাহা ভাবিয়া দেখিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়, সুতরাং মন সাকার। যদি মনের স্থানব্যাপকতা ধর্ম অস্বীকার করা যায় তবে মনকে আর বস্তু বলিতে পারা যায় না, তাহা হইলে মনকে কোনো প্রকার স্থানব্যাপকতা ধর্ম বিশিষ্ট বস্তুর গুণমাত্র বলিতে হইবে। সাধারণত স্থূল ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতীত দ্রব্যের আকার উপলব্ধি করিতে পারা যায় না এবং স্থূল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধি হয় না বলিয়া মনের আকার কিরূপ তাহা সহজে বুঝিতে পারা যায় না। আকার কথার যথার্থ যাহা অর্থ তাহা জ্ঞাত হইলে কাহারও মনে আর গোল থাকিবে না। একবার ভাবিয়া দেখ যে, তোমার মন তোমার দেহ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু অথচ উহা কোনও স্থান ব্যাপিয়া নাই এরূপ ধারণা তুমি কখনওই করিতে পারিবে না, সুতরাং মন সাকার নিশ্চয়। সেইজন্য মনের কার্য পৃথক তাহা চেষ্টা করিলেই সহজে উপলব্ধি হইয়া থাকে।

বুদ্ধি জগৎব্যাপী নহে, নিশ্চয়ই কোনো সীমাবদ্ধ স্থান ব্যাপিয়া আছে, তাহা হইলে বুদ্ধি বস্তু বিশেষ। বুদ্ধি প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন এবং সেই জন্যই বলিয়া থাকে সকলের বুদ্ধি সমান নহে, আর যাহার বুদ্ধি কম, তাহাকে লোক বোকা বলে; তাহা হইলে বুদ্ধির স্থানব্যাপকতা শক্তি আছে সুতরাং বুদ্ধি সাকার, ইহাতে আর

সন্দেহ করিবার কারণ নাই। আর ভালো মন্দ বিচার করা বুদ্ধির কার্য তাহা বেশ সহজেই বুঝিতে পারা যায়। মন ও বুদ্ধির থাকিবার স্থান মস্তক, তাহা সামান্য চেষ্টা দ্বারা জানিতে পারা যায়। বুদ্ধি জীব শরীরের দর্পণের স্বরূপ!

এক প্রণব মন্ত্র হইতে এই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় কার্য চলিতেছে, এই প্রণব মন্ত্রের দেবতা অগ্নি। হিন্দুরা বুঝিয়াছিলেন যে এই অগ্নিগত শক্তি হইতেই এই জগৎচক্র ঘুরিতেছে কিন্তু এই অগ্নিগত শক্তি যে চৈতন্যসম্বন্ধ-রহিত, ইহা কখনও তাঁহারা ভাবিতেন না। হিন্দুদিগের কাছে প্রণব মন্ত্রের লক্ষ্য অগ্নিগত শক্তি ব্রহ্ম-চৈতন্য চেতনাযুক্ত।

যতক্ষণ আমার অঙ্গুলিটি বিচ্ছিন্ন নহে ততক্ষণ ঐ অঙ্গুলিটি চেতনাময়; অঙ্গুলিটি কাটিয়া ফেলিলেই উহা আমা হইতে বিচ্ছিন্ন হইল তখন আর উহাতে চেতনা থাকে না, তখন উহা অচেতন জড় পদার্থ। এই সমগ্র বিশ্ব, চৈতন্যময় এক পুরুষের দেহ; ভিন্ন ভিন্ন শক্তির আধার সকল যথা অগ্নি, বায়ু, নদী, পর্বত ও মৃত্তিকা ইত্যাদি সেই দেহের অঙ্গবিশেষ। অগ্নিকে যদি সেই এক চৈতন্যময় পুরুষ হইতে বিচ্ছিন্নভাবে না দেখি, তবে অগ্নির চেতনা আছে বলিয়া বুঝিব। আর যিনি অগ্নির সহিত সেই চৈতন্যময়ের কোনো সম্বন্ধ দেখিতে না পান তাঁহার নিকট অগ্নি জড় পদার্থ।

আত্মা সর্বদা সর্বগত হইয়াও সর্বত্র প্রকাশিত হন না, কেবল নির্মল বুদ্ধিতেই প্রকাশিত হন। ইন্দ্রিয়সকল স্বীয় স্বীয় কার্যে ব্যাপৃত হওয়ায়, অবিবেকীদিগের বোধ হয় যেন আত্মাই সকল কার্যে ব্যাপৃত হন, যে প্রকার মেঘসকল ধাবমান হইলে চন্দ্রকে ধাবমান বলিয়া বোধ হয়। শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি ইহারা চৈতন্য স্বরূপ আত্মাকে আশ্রয় করিয়া কার্যে প্রবৃত্ত হয়, সে প্রকার সূর্যের আলোকের আশ্রয়ে মনুষ্যগণ কার্য করে।

রাগ, ইচ্ছা, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি বৃত্তি সকল বুদ্ধিরই হইয়া থাকে, এ সকল আত্মার হয় না, কারণ প্রত্যক্ষ বোধ হয় যে সুষুপ্তিকালে আত্মা থাকেন কিন্তু বুদ্ধি না থাকাতে রাগ, ইচ্ছা প্রভৃতি তৎকালে কিছুই থাকে না। যে প্রকার সূর্যের স্বভাব প্রকাশ, জলের স্বভাব শৈত্য এবং অগ্নির স্বভাব উষ্ণতা, সেই প্রকার আত্মার স্বভাব সত্য, চৈতন্য, আনন্দ, নিত্যতা এবং নির্মলতা। আত্মার বর্তমানতা, চৈতন্যের অংশ আর বুদ্ধিবৃত্তি, এই তিনের সংযোগে অবিবেকের দ্বারা আমি জানিতেছি, আমি করিতেছি, এই প্রকার প্রবৃত্তি হয়।

আত্মার যে বিকার নাই তাহা বুদ্ধি কদাপি বোধ করিতে পারে না। এই জন্য জীব সমুদয় বস্তুকে জানিয়া আমি জ্ঞাতা, আমি দ্রষ্টা এইরূপ জ্ঞানে মুগ্ধ হইতেছে; যে প্রকার রজ্জুকে সর্প জ্ঞান হইলে, সর্প জন্য ভয় হয় কিন্তু রজ্জু জ্ঞান হইলে আর ভয় থাকে না, সেই প্রকার জীবের আত্মাকে জীব জ্ঞান হওয়াতে ভয় হইতেছে, আমি জীব নহি, আমি পরমাত্মা এই প্রকার জ্ঞান হইলে আর ভয় থাকে না।

এক আত্মা, বুদ্ধি প্রভৃতি ও ইন্দ্রিয়সকলকে প্রকাশ করেন। অচেতন এই বুদ্ধি প্রভৃতি ও ইন্দ্রিয়সকল আত্মাকে প্রকাশ করিতে পারে না; যেমন দীপ সমস্ত বস্তুকে প্রকাশ করে কিন্তু কোনো প্রকার বস্তু দীপকে প্রকাশ করিতে পারে না। আত্মার-স্বরূপ বোধ হইলে তাহার জ্ঞান স্বভাব প্রযুক্ত অন্য জ্ঞানে ইচ্ছা থাকে না যে প্রকার দীপের স্বীয় রূপ প্রকাশ হইলে অন্য দীপ ইচ্ছা হয় না।

অবিদ্যা হইতে উৎপন্ন শারীরাদি যে সকল দৃশ্য বস্তু ইহারা বুদ্বুদের ন্যায় বিনাশী। এই সকল বস্তুর অতীত যে নির্মল ব্রহ্ম তিনিই আমি এই প্রকার জ্ঞান করিবে। আমি দেহ নহি ও আমার দেহ নহে, দেহ হইতে আমি পৃথক, এই জন্য জন্ম জরা, কৃশতা ও মৃত্যু আদি যে সকল দেহধর্ম তাহা আমার নহে এবং ইন্দ্রিয়সকলও আমার নহে, সুতরাং তাহাদিগের বিষয় ও কার্য সকলের সহিত আমার কোনো সংস্রব নাই।

আমার মন নাই এই জন্য দুঃখ, রাগ, দ্বেষ, ভয় প্রভৃতি যাহা কিছু মনের কার্য তাহা আমার নহে। আমি অপ্রাণ, আমি অমল এবং শুদ্ধ আত্মা স্বরূপ ইহা বেদ-প্রসিদ্ধ। নির্গুণ, ক্রিয়ারহিত, নিত্য যে আত্মা তিনিই আমি। আমার কোনো আকার কি বিকার নাই, আমি চিরকাল মুক্ত। আমার যখন কোনো ক্ষয় ও কোনো সংসর্গ নাই তখন আমি অচল, সর্বদা শুদ্ধ ও নির্মল এবং আকাশের ন্যায় সমভাবে সকল বস্তুর বাহিরে এবং অন্তরে আছি। যে ব্যক্তি ব্রহ্মই আমি এইরূপ সর্বদা বাসনা করেন, তাহার নিকট সমুদয় দৃষ্ট বস্তু বিনষ্ট হয়।

জ্ঞাতা ও জ্ঞান এবং জ্ঞেয় এই সকল প্রভেদ পরমাত্মাতে নাই, চৈতন্যময় আনন্দ স্বরূপের একরূপ জন্য তিনি স্বয়ং দীপ্যমান আছেন।

যে প্রকার এক আকাশকে ঘটাদি উপাধি প্রভেদে ঘটাকাশ প্রভৃতি বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন বোধ হয় এবং ঘটাদি ভগ্ন হইলে যে এক আকাশ আছে, তাহাই থাকে, আকাশ ভিন্ন ভিন্ন নহে, সেই প্রকার এক পরমাত্মা নানা উপাধি প্রভেদে ভিন্ন ভিন্ন বোধ হয়, উপাধি বিনাশ হইলে যে এক পরমাত্মা তাহাই থাকেন, পরমাত্মা ভিন্ন ভিন্ন নহেন। যে প্রকার লবণাদি রস, কিংবা রক্তাদি বর্ণ, জলে মিশ্রিত হইলে ওই লবণাদি রস কিংবা রক্তাদি বর্ণ প্রভেদে জলে ঐ লবণাদি রসের কিংবা রক্তাদি বর্ণের আরোপ হয়, সেই প্রকার নানা প্রকার উপাধিবশত জাতি, নাম ও আশ্রয় প্রভৃতি সমুদয় বস্তু পরমাত্মাতে আরোপিত হয়।

যে প্রকার ধান্যাদিকে অবঘাতের দ্বারা তুষাদি কোষ হইতে পৃথক করিলে তাহার স্বরূপ তণ্ডুল মাত্র প্রকাশিত হয়, সেই প্রকার শরীরাদিতে আবৃত পরমাত্মাকে যুক্তি দ্বারা শরীরাদি হইতে পৃথক করিয়া ভাবিলে তাঁহার শুদ্ধ স্বরূপ প্রকাশিত হয়। যে প্রকার উষ্ণতা বহ্নিকে আশ্রয় করিয়া আছে, সেইরূপ ইন্দ্রিয়াদি জড় বস্তুসমূহ যে অদ্বিতীয়, নিশ্চয় ও নিত্য জ্ঞান স্বরূপ আত্মাকে আশ্রয় করিয়া স্ব স্ব কার্যে প্রবৃত্ত হয়; তাঁহাকে সেই সর্ব অন্তর্যামী জ্ঞানময় নিত্য আত্মা বলিয়া জানিবে। অতএব আত্মাই আমি, আমি বলিতে আর কোনো পদার্থকে বুঝায় না। আমিই তিনি, অথবা তিনিই আমি, আমি কিছুই নহি, আমার কিছু নাই, সমস্তই তিনি এবং সমস্তই তাঁহার।

মানবরূপ তৃণনিচয় বাসনা বায়ু দ্বারা ইতস্তত পরিচালিত হইয়া জন্ম-জন্মান্তরে সে সকল দুঃখ উপভোগ করে, তাহা বচনাতীত ইহা আমার, ইহা আমার নহে, ইত্যাদি প্রকার ভ্রম জ্ঞানই সংসারবন্ধনের কারণ এবং আমি বলিতে আত্মা ভিন্ন আর কিছু নহে, সকলই সেই ব্রহ্ম এই জ্ঞান জন্মিলেই মুক্ত হওয়া যায়। এইরূপ উপায়ও নিজের অধীন সুতরাং এইরূপ স্বাধীন উপায় থাকিতে যে অসীম সংসারযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, ইহা কি সামান্য আক্ষেপের বিষয় নহে?'

তন্ময়ত্ব : 'জীবনের প্রত্যেক সময় এক একটি কার্যের জন্য নির্দিষ্ট আছে। মানব-জীবনের সেই সময় অনুসারে কার্যের অনুষ্ঠান করা উচিত। তাই বলিয়া এক সময়ের কার্য অন্য সময়ে হয় না তাহা নহে। এক বয়সে যে কার্য নির্দিষ্ট আছে অন্য বয়সে সেই কার্য সম্পাদিত হইতে পারে। সময়ানুরূপ কার্য অনুষ্ঠান করিলে তাহা কখনও বিফল হয় না, অসময়ে কার্য করিলে প্রায় বিফল হইতে হয়, দুই একটি সফল হইলেও তাহা সম্পূর্ণ হয় না, কিয়দংশ মাত্র হয়। যোগের সময় বার্ধক্য, যখন চিত্তে কোনো কুভাব উদিত হয় না, মানবের ইন্দ্রিয়সমূহ শিথিল হইয়া আইসে সেই সময় যোগ বা উপাসনার উপযুক্ত। যৌবনে উত্তেজিত বৃত্তিসমূহ প্রতিনিবৃত্ত করিবার ক্ষমতা যাহার আছে, তিনিও যোগশিক্ষার উপযুক্ত। যৌবনে প্রবৃত্তিকে নিবৃত্ত করিতে পারিলেই যোগ শিক্ষার উপযুক্ত পাত্র হইল।

যোগ সাধন করা নিতান্ত সহজ কথা নহে, যোগ শব্দে তন্ময়। এই তন্ময়ত্ব ভাব হৃদয়ে না হইলে যোগ শিক্ষা হইবে না, হইলেও তাহা কোনো কার্যকরী নহে। যদি তন্ময় হইতে পারা যায়, যদি ঈশ্বরে ও তোমাতে কোনো প্রভেদ পরিলক্ষিত না হয় তাহা হইলে তুমি যোগ শিক্ষা করিয়া সুফল পাইবে ও তুমিই যোগ শিক্ষার প্রকৃত অধিকারী। যোগ সম্বন্ধে যতগুলি নিয়ম আছে তাহার মধ্যে ষটচক্র ভেদ সর্বপ্রধান। ষটচক্র ভেদ করিতে পারিলে, অন্য সাধনার কোনো প্রয়োজন হয় না। কেবলমাত্র ষটচক্র ভেদ করিতে পারিলে, স্বর্গরাজ্য অধিকার করিতে সমর্থ হয়। ষটচক্র যোগ শাস্ত্রের সর্বপ্রধান। যাঁহারা ষটচক্র ভেদ করিতে পারেন, নির্বাণমুক্তি তাহাদিগের পক্ষে অতি সহজ। ষটচক্র ভেদ করিয়া সেই চিদানন্দ স্বরূপ পরমব্রহ্মকে সাক্ষাৎ করিতে হইলে, মানসিক যে সমস্ত বৃত্তির প্রয়োজন তাহার বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রমে ইহা সাধিত হয় না। উপযুক্ত ব্যক্তি বিনা চেষ্টায় ষটচক্র ভেদ করিতে পারেন। অগ্রে ষটচক্র কী তাহা জানা আবশ্যক, তাহার পর ক্ষমতা হইলে ভেদ করিবার চেষ্টা করা উচিত এবং তখন তাহার মহত্ব ও আবশ্যকতা বুঝিতে সক্ষম হইবে।

জীবদেহে অন্নময় কোষ অবলম্বন করিয়া মনোময় কোষ; মনোময় কোষ অবলম্বন করিয়া প্রাণময় কোষ; প্রাণময় কোষ অবলম্বন করিয়া বিজ্ঞানময় কোষ; বিজ্ঞানময় কোষ অবলম্বন করিয়া আনন্দময় কোষ অবস্থিতি করেন। অন্তোঙ্গুষ্ঠ পরিমিত জীবাত্মা এই আনন্দময় কোষকে অবলম্বন করিয়া অবস্থিতি করেন। এই অবস্থান চারি অবস্থায় নিষ্পন্ন হয়। প্রথম বৈশ্বানর, তিনি শরীরস্থ হইয়া চালনা করেন, ইহাই জীবের চেতনাবস্থা, দ্বিতীয় অবস্থা তৈজস, উহা জীবের স্বপ্নাবস্থা, তৃতীয় প্রজ্ঞা, ইহা জীবের নিদ্রাবস্থা, চতুর্থ ব্রহ্ম, সকল প্রাণীতে সর্বাবস্থায় ব্রহ্ম জীবশরীরে অবস্থিত আছেন তাহা জ্ঞাত হওয়া। এই চতুর্বিধ অবস্থা অ, উ, ম এবং ওম মন্ত্র দ্বারা সাধিত হয়। নাড়ীসমূহের মধ্যে নিরন্তন যে বায়ুরাশি প্রবাহিত হইতেছে তাহা অবলম্বন করিয়া পঞ্চ বায়ুর অবস্থান। এই সকলের মধ্য দিয়া নাড়ীপ্রধানা সুযুম্না অন্তরের ঊর্ধ্ব হইতে উৎপন্ন হইয়া মস্তিষ্কের ভিতর দিয়া কেশমূল পর্যন্ত প্রলম্বিত আছে। এই নাড়ীতে প্রবেশ করিয়া জ্ঞান ও আনন্দময় অন্তরাকাশে পদ্মবৎ গুহামধ্যে আত্মা বাস করিতেছেন। ভূর্ভূবঃ প্রভৃতি সকলই তথায় অবস্থিত। এই ষটচক্র ভেদ করিয়া নাড়ীপ্রধানা সুযুম্নার মধ্যে সংযমিত আত্মাকে প্রবেশ করাইয়া সেই সচ্চিদানন্দের সহিত মিলিত হইতে হয়, এই সম্মিলনই ষটচক্রভেদ।

কঠিন যোগ অপেক্ষা সরল যোগ সহজ এবং অধিক ফল প্রদান করে। কঠিন যোগ শারীরিক ও মানসিক শিক্ষা; সরল যোগ কেবলমাত্র মানসিক শিক্ষা। মানসিক শিক্ষা সমাধা হইলে শারীরিক শিক্ষার প্রয়োজন নাই। কঠিন যোগ কুম্ভক, বিকুম্ভক, আনুমীন, উৎক্রান্তি ও দাষ্টি। সরল যোগ সত্য, সৎ ও নির্বিকার। সরল যোগ সহজসাধ্য এবং সাধারণের গ্রহণযোগ্য। কঠিন যোগ সাধন সাধারণের ভাগ্যে ঘটে না। সরল যোগ শিক্ষার্থে অরণ্যবাস, কায়িক ক্লেশ, কিছুই গ্রহণ করিতে হয় না, কেবলমাত্র চিত্তবৃত্তি আপন বশীভূত ও সৎমার্গে অনুগমন করাইবার ক্ষমতা হইলেই তদ্দ্বারা মহাফল লাভ করা যায়। কায়িক ক্লেশ, তীর্থ পর্যটন, উপবাস কিছু প্রয়োজন হয় না, যদি চিত্তে চিন্ময়ের মূর্তি প্রতিফলিত করিতে পারা যায়। সদবৃত্তির আলোচনায় ও সদবৃত্তির অনুশীলনে যে ফল, তীর্থ-পর্যটনে তাহা হয় না। মন পরিশুদ্ধ হইলে, জীব আত্মশুদ্ধ হইলে, চিত্ত যখন নির্মল হইবে, তখন সে আপন হৃদয়ে সকল তীর্থ পরিদর্শন করিতে সমর্থ হয়। যাবতীয় তীর্থ মানবের শরীরে আছে। গঙ্গা নাসাপুটে, যমুনা মুখে, বৈকুণ্ঠ হৃদয়ে, বারাণসী কপালে, হরিদ্বার নাভিতে ইত্যাদি স্বর্গ, মর্তের যাবতীয় তীর্থক্ষেত্র মানবশরীরে বর্তমান আছে। যে পুরীতে প্রবেশ করিতে কোনো প্রকার কুণ্ঠা অর্থাৎ সংকোচ হয় না তাহাই বৈকুণ্ঠ। পাপ আশঙ্কার মূল। যে পাপী, সে সকল কাজেই সংকুচিত হয়, যে নিষ্পাপ তাহার কোথাও শঙ্কা নাই, সর্বদাই যে কুণ্ঠাশূন্য, সুতরাং সে বৈকুণ্ঠপুরী গমনে অধিকারী। তাহার হৃদয়ে চিৎস্বরূপ আনন্দময় সৎস্বরূপ বৈকুণ্ঠনাথ বিরাজিত।

বৈকুণ্ঠের অর্থাৎ হৃদয়ের নিম্নে, ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ী অথবা চন্দ্র ও সূর্য অর্থাৎ গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গম। এই সঙ্গমে স্নান করিতে পারিলে জীবের সকল পাপ ধ্বংস হয়। গঙ্গা-যমুনাসঙ্গম হৃদয়ের নিম্নে, ইড়া আত্মজ্ঞান ও পিঙ্গলা বিবেক নামে কথিত। গঙ্গা যমুনার যে প্রকার সম্বন্ধ ইড়া ও পিঙ্গলার ঠিক সেই সম্বন্ধ, পিঙ্গলা অর্থাৎ বিবেক হইতে ইড়া অর্থাৎ আত্মজ্ঞানের উৎপত্তি, মনকে এই পিঙ্গলা পথে প্রবেশ করাইয়া ক্রমশ নিবৃত্তি দ্বারা ইড়ায় সম্মিলিত করিতে হয়। পরে ইড়া এবং পিঙ্গলা যেখানে সংযোগ হইয়াছে অর্থাৎ যে স্থানে আত্মজ্ঞান ও বিবেক একত্র হইয়াছে, মনকে সেই স্থানে লইয়া স্নান করাইলে অর্থাৎ মনকে আত্মজ্ঞান-রূপ সলিলে নিমজ্জিত করিলেই মহা ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। আত্মজ্ঞান জন্মিলে যোগ তাহার নিকট অতি সহজসাধ্য। আত্মজ্ঞান লাভই যোগের কারণ। সেই আত্মজ্ঞান লাভকরণার্থ যোগ শিক্ষা করিতে হয়। তজ্জন্য গৃহত্যাগ বা অরণ্যবাসের কোনো আবশ্যক হয় না। এমন কতকগুলি নিয়ম আছে যাহা কেবল মাত্র চিন্তা ও তদনুরূপ আচরণ করিতে পারিলে যোগ ফল ও আত্মজ্ঞান লাভ করা যায়। আত্মজ্ঞান লাভ করিবার জন্য অন্য কোনো প্রকার কঠিন সাধন করিতে হয় না, কেবল সেইগুলির অনুধ্যান করিলে যোগ ফল লাভ করা যায়, সেগুলিকেও সরল যোগ বলা যায়। যোগ ফল লাভ করিতে হইলে, যে সমস্ত বৃত্তি নিরোধ করিবার একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়ে, যাহা সংসাধিত না হইলে যোগ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সেই নিয়ম ও আকারগুলি

সেই নিয়মাবলীর মধ্যে স্থান পাইয়াছে। সেইরূপ আচরণ ও হৃদয়ে সেইরূপ ভাব গ্রহণে সমর্থ হইলে, নিশ্চয়ই যোগ ফল লাভ করা যায়। নিয়মগুলি যথা—

১) অসন্তুষ্ট ব্যক্তি কাহাকেও সন্তুষ্ট করিতে পারে না; সর্বদা যিনি সন্তুষ্ট থাকেন, তিনি সকলকে প্রফুল্ল করিতে পারেন।

২) জিহ্বা পাপ কথা কহিতে বড়ই তৎপর তাহাকে সংযত করা আবশ্যক।

৩) আলস্য সকল অনর্থের মূল, যত্নপূর্বক আলস্য পরিত্যাগ করিবে।

৪) সংসার ধর্মাধর্মের পরীক্ষার স্থল, সাবধান হইয়া ধর্মাধর্ম পরীক্ষা করিয়া কার্য অবলম্বন করিবে।

৫) কোনো ধর্মের প্রতি অশ্রদ্ধা করিবে না, সকল ধর্মই সার এবং তাহাতে অবশ্যই সত্য নিহিত আছে।

৬) দরিদ্রকে দান করিবে, ধনীকে দান করা বৃথা, কারণ তাহার আবশ্যক নাই, সেই জন্য সে আনন্দিত হয় না।

৭) সাধু সহবাসই স্বর্গ ও অসৎ সঙ্গই নরকবাসের মূল।

৮) আত্মজ্ঞান, সৎপাত্রে দান ও সন্তোষ আশ্রয় করিলেই মোক্ষ প্রাপ্তি হয়।

৯) যিনি শাস্ত্র পাঠ করত তাহার মর্ম অবগত হইয়া তাহা অনুষ্ঠান না করেন, তিনি পাপী হইতেও অধম।

১০) যে-কোনো কার্য অনুষ্ঠানের মূলে ধর্ম থাকা চাই, নতুবা সিদ্ধি হয় না।

১১) কখনও কাহাকেও হিংসা করিবে না, সৎ বা অসৎ উদ্দেশ্যে কখনও কোনো প্রাণী বধ করিবে না।

১২) যে ব্যক্তি পাপ-কলঙ্ক প্রক্ষালিত না করিয়া মিতাচারী ও সত্যানুরাগী না হইয়া, রঙিন বস্ত্র পরিধান করত ব্রহ্মচারী হয়, সে ব্যক্তি ধর্মের কলঙ্কস্বরূপ।

১৩) ছাদহীন গৃহে যেমন বৃষ্টিধারা পতিত হয়, চিন্তাহীন মনেও সেইরূপ রিপুগণ প্রবেশ করেন।

১৪) পাপী লোকে ইহকালে অনুতাপানলে দগ্ধ হয়, যখনই সে নিজের কুকার্য মনে করে তখনই তাহার প্রাণে অনুতাপ জাগিয়া ওঠে।

১৫) (ক) চিন্তাশীলতা অমরত্ব লাভের পথ, চিন্তাহীনতা মৃত্যুর পথ। (খ) গর্বিত হইবে না, কাম উপভোগ চিন্তা করিবে না।

১৬) শত্রু শত্রুর যত অনিষ্ট করিতে না পারে, কুপথগামী মন তাহা অপেক্ষাও অধিক অনিষ্ট করে।

১৭) মধুমক্ষিকা যেমন পুষ্পের সৌন্দর্য অথবা সুগন্ধির অপচয় না করিয়া মধু সংগ্রহ করে তুমিও সেই প্রকার পাপে লিপ্ত না হইয়া জ্ঞান লাভ করিবে।

১৮) এই পুত্র আমার, এই ঐশ্বর্য আমার, অতি অজ্ঞানী লোকে এই প্রকার চিন্তা করিয়া ক্লেশ পায়। সে নিজে তাহার নিজের নয়, পুত্র বা সম্পত্তি তাহার কি প্রকার হইতে পারে?

১৯) অল্প লোকেই পরপারে উত্তীর্ণ হয়, অধিকাংশ লোকেই ধর্ম ভান করিয়া উপকূলে দৌড়াদৌড়ি করে।

২০) সংগ্রামে যে ব্যক্তি লক্ষ লোক জয় করিয়াছে সে ব্যক্তি প্রকৃত বিজয়ী নহে। যে আপনাকে জয় করিয়াছে সেই প্রকৃত বিজয়ী।

২১) পাপ আমাকে আক্রমণ করিবে না এই ভাবিয়া নিশ্চিন্ত থাকিয়ো না। ফোঁটা ফোঁটা জলে জলপাত্র পূর্ণ হয়, নির্বোধ লোকে ক্রমে ক্রমে পাপময় হইয়া যায়।

২২) কাহাকেও কর্কশ কথা বলিও না; কর্কশ কথা বলিলে কর্কশ কথা শুনিতে হইবে। আঘাত করিলে আঘাত সহ্য করিতে হইবে। কাঁদাইলে কাঁদিতে হইবে।

২৩) যাহারা বাসনা জয় করিতে পারে নাই, উলঙ্গ দেহ, জটা ধারণ, ভস্ম লেপন, উপবাস, মৃত্তিকা শয্যা ইত্যাদি তাহাদের মন পবিত্র করিতে পারে না।

২৪) অন্যকে যেরূপ হইতে উপদেশ দাও, নিজেও সেইরূপ হও। যে আপনাকে বশীভূত করিয়াছে, সে অন্যকেও বশীভূত করিতে পারে, আপনাকে বশ করাই কঠিন।

২৫) পাপ ও পুণ্য সকলই নিজের কৃত, এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে পবিত্র করিতে পারে না।

২৬) এই জগৎ জলবুদ্বুদ, মরীচিকা সদৃশ, যে এই জগৎকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতে পারে, মৃত্যু তাহাকে দেখিতে পায় না।

২৭) ধাবমান শকটের ন্যায় উত্তেজিত ক্রোধকে যে সংযত করিতে পারে সেই প্রকৃত সারথি, অন্য লোকে কেবল বলগা ধারণ করিয়া থাকে।

২৮) প্রেমবলে ক্রোধ জয় করো, মঙ্গল দ্বারা অমঙ্গল জয় করো, নিঃস্বার্থতা দ্বারা স্বার্থ জয় করো এবং সত্য দ্বারা মিথ্যা জয় করো।

২৯) গুরু যাহা উপদেশ দিবেন তাহা মনোযোগ পূর্বক শ্রবণ করিয়া পালন করিবে।

৩০) বৃথা বাক্যব্যয় করিবে না। যে অধিক কথা কহে সে নিশ্চয় অধিক মিথ্যা কথা বলে। যতদূর সাধ্য কথা কম কহিতে চেষ্টা করিবে, সঙ্গে সঙ্গেই শান্তি মিলিবে।

যোগ শিক্ষার জন্য অরণ্যবাস অথবা অনাহারী থাকিতে হয় না। চিত্তবৃত্তির নিরোধের নাম যোগ। চিত্তের বশীভূত ইন্দ্রিয়াদিকে ইষ্ট সাধনে নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা যাহার আছে তাহার লোকালয় বা অরণ্য সকলই সমান। একাগ্রতা যোগের প্রাণ, এই একাগ্রতা নিবন্ধন যখন জীবাত্মা ও পরমাত্মা একীভূত হইবে, জীবাত্মায় ও পরমাত্মায় কোনো প্রভেদ লক্ষিত হইবে না, তখনই প্রকৃত যোগ। ঈশ্বর লাভার্থ যোগাঙ্গ অবলম্বন করিতে হয় না, ভক্তি দ্বারাই তিনি ঈশ্বরে সমাহিত হইতে পারেন। ভক্ত ভক্তি দ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহাতে সমাহিত হন; তাহাকেই সমাধি বলে।

সমাধি অর্থে ব্রহ্মে মন স্থিরকরণ, পরমাত্মায় ও জীবাত্মায় একীকরণ সুতরাং সমাধি যোগের ফলস্বরূপ। চিত্ত বশীভূত করিয়া সকল কার্যে নিস্পৃহ হইয়া আত্মাতেই যখন অবস্থান করে তাহাকেই সমাধি বলে। যে অবস্থায় বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ দ্বারা আত্মাকে অবলোকন করিয়া আত্মাতেই পরিতৃপ্ত, বুদ্ধি মাত্র লভ্য, অতীন্দ্রিয়, আত্যন্তিক সুখ উপলব্ধ হয়; যে অবস্থায় অবস্থান করিলে আত্মতত্ব হইতে পরিচ্যুত হইতে হয় না, যে অবস্থা লাভ করিলে অন্য লাভকে লাভ বলিয়া বোধ হয় না, যে অবস্থায় উপস্থিত হইলে গুরুতর দুঃখও বিচলিত করিতে পারে না, সেই অবস্থার নামই যোগ। মনকে আত্মাতে নিহিত করিয়া স্থির বুদ্ধির দ্বারা অল্পে অল্পে বিরতি অভ্যাস করিবে, অন্য কিছু চিন্তা করিবে না। চঞ্চল স্বভাব মন যে যে বিষয়ে বিচরণ করিবে সেই সেই বিষয় হইতে তাহাকে প্রত্যাহরণ করিয়া আত্মায় বশীভূত করিবে। রজঃ এবং তমঃ বিহীন যোগীগণ এই প্রকারে মনকে সর্বদা বশীভূত করিয়া অনায়াসে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার রূপ সর্বোৎকৃষ্ট সুখপ্রাপ্ত হন; সর্বত্র ব্রহ্মদর্শী, সমাহিত চিত্তে সকল ভূতে আত্মাকে ও আত্মাতে সকল ভূতকে অবলোকন করেন। কামনাশূন্য হইয়া যিনি যোগ অভ্যাস করেন তিনিই সমাধিস্থ বা মুক্ত হইবার যোগ্য। ঈশ্বরলীন হইয়া জীবাত্মায় ও পরমাত্মায় মিলনের নাম মুক্তি।

সমাধি অর্থাৎ তন্ময় ভাব। যখন জীবাত্মায় ও পরমাত্মায় পৃথক জ্ঞান না থাকে, যখন জীব বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়, আর বহিরিন্দ্রিয়সকল অচল হইয়া যায় সেই সময়ের নাম সমাধি। মনকে ইন্দ্রিয়ের বশীভূত না করিয়া ইন্দ্রিয়সমূহকে মনের বশীভূত করা যোগ শিক্ষার প্রধান উপায়। প্রথমে ইন্দ্রিয়-উৎপন্ন চিত্তের বৃত্তিসমূহকে সংযত ও চিত্তের বশীভূত করিতে হইবে, পরে চিত্তকে চিত্তের বশীভূত অর্থাৎ সাংসারিক ও ইন্দ্রিয়বৃত্তির বশীভূত চিত্তকে কামনাশূন্য চিত্তে সমাহিত করিতে হইবে; বিবিধ লক্ষ্য হইতে চিত্তকে বিচ্যুত করিয়া কাম্য লক্ষ্যের পন্থাগামী করিতে হইবে, বিবিধ চিন্তা হইতে ক্রমে ক্রমে সংযত করিয়া সর্বদা আত্মচিন্তায় নিযুক্ত করিতে হইবে। যোগ দুই প্রকার সকাম ও নিষ্কাম। সকাম যোগী মোক্ষপ্রাপ্ত হয় না, নিষ্কাম যোগীই মোক্ষপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। নিষ্কাম ধর্ম পালনই যোগের মূল।

তন্ময়ত্ব যোগের আর একটি প্রধান অঙ্গ ও যোগের ফলস্বরূপ। তন্ময়ত্ব ভাব উপস্থিত হইলে আর কোনো অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হয় না; যোগের সিদ্ধি এই তন্ময়ত্ব ভাব; এই ভাব উপলব্ধি হইলে কাম্য বস্তুর প্রতিই কেবল একমাত্র দৃষ্টি থাকে, অন্য কোনো বস্তুর প্রতি দৃষ্টি থাকে না, অন্য চিন্তার ধারণা থাকে না, হৃদয়ে কেবল সেই একমাত্র বস্তুর অস্তিত্বই উপলব্ধ হয়। মন ও অভীষ্ট বস্তুর মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না, মনে

সেই কাম্য বস্তু এবং সেই কাম্য বস্তুতে কেবল মনমাত্র থাকে, কাম্য বস্তু ভিন্ন মনের অন্য চিন্তা থাকে না, জগতের অন্য কিছুই দেখিতে পায় না, সেই অভীষ্ট বস্তুই হৃদয় পূর্ণ করিয়া রাখে, তখন সে জগতে থাকিয়াও জগৎবাসী নহে। কাম্য বস্তুতেই তাহার অস্তিত্ব, কাম্য বস্তুর অবর্তমানে বুঝি তাহার অস্তিত্ব থাকে না, কাম্য বস্তুর সহিত মিলিয়া যায়, ইহারই নাম তন্ময়ত্ব। যে-কোনো কার্যের অনুষ্ঠান করিবার সময় সর্বাগ্রে সেই কার্যে তন্ময় হওয়া আবশ্যক তাহা হইলে সে কার্যে কখনও বিফল-মনোরথ হইবার সম্ভাবনা থাকে না, তাহার সিদ্ধি নিশ্চয়। যাহার যেরূপ ভাবনা সে কার্যেও সেইরূপ সিদ্ধি লাভ করিবে। যে ব্যক্তি অভীষ্ট বিষয়ে যে পরিমাণে মনোযোগ দিবে, সে ব্যক্তি সেই কার্যে ততটুকু সিদ্ধি লাভ করিবে। কোনো কার্যে সম্পূর্ণ সিদ্ধি লাভ করিতে হইলে সেই কার্যে সম্পূর্ণ তন্ময় হইবার প্রয়োজন। তন্ময়ত্ব একাগ্রতা না হইলে হয় না, কোনো কার্যে প্রস্তুত হইতে হইলে একাগ্রতা শিক্ষা করিতে হয়, একাগ্রতা না হইলে সে কার্যে তন্ময়ত্ব ভাব জন্মায় না। কার্যে কিশ্বাস না করিলে বা না জন্মিলে, সিদ্ধিলাভে কৃতনিশ্চয় না হইলে, সে কার্যে কখনও অগ্রসর হইবে না, কারণ তাহার সিদ্ধি হইবে না। অগ্রে কার্যে বিশ্বাস স্থাপন করিবে, কারণ বিশ্বাসই সিদ্ধি-লাভের মূল। তন্ময়ত্ব, একাগ্রতা, সিদ্ধিলাভ সকলের মূলেই বিশ্বাস।

সৃষ্টিকালে ভগবান সর্ব প্রথমে মায়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেই মায়া জ্ঞতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞানরূপা এবং কার্যকারণরূপা ও সত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন গুণ বিশিষ্টা। তাহার দুই শক্তি, একটি আবরণ অর্থাৎ মায়া দ্বারা জীব আচ্ছন্ন হওয়াতে নিত্য সত্য পরমাত্মাকে দেখিতে না পাইয়া আপনাকে অহংকার সাহায্যে তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র মনে করে, অপরটি বিক্ষেপ, যাহা দ্বারা জীব অসত্য বস্তুতে সত্যারোপ করত জগৎকে নিত্য এবং সত্য মনে করে, আর পরমাত্মাকে ভুলিয়া অনিত্য বিষয়বস্তুতে মত্ত থাকে।

তন্ত্রমতে ষটচক্র ভেদ—ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ীর মধ্যস্থিতা, সত্ব রজঃ তমঃ গুণ বিশিষ্টা, চন্দ্র, সূর্যাগ্নি রূপা, ধূস্তুর কুসুমের ন্যায় শুভ্রা, সুষুম্না নাড়ী আছে; ঐ নাড়ী চারিদল বিশিষ্টা, মূলাধার পদ্ম হইতে মস্তকে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত গিয়াছে। এই সুষুম্না নাড়ীতে গ্রথিত গুহ্যে, লিঙ্গে, নাভিতে, হৃদয়ে, কণ্ঠে, ভ্রূমধ্যে এবং মস্তকে; মূলাধার স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞাক্ষ এবং সহস্রার নামে সাতটি পদ্ম আছে। এই সুষুম্না নাড়ীর মধ্যে মণির ন্যায় প্রভা বিশিষ্টা দেদীপ্যমানা বজ্রা নাম্নী নাড়ী আছে, আবার তাহার অভ্যন্তরে চন্দ্র সূর্য অগ্নি স্বরূপ ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব যুক্ত, ঊর্ণনাভ (মাকড়সার) সূত্রের ন্যায় চিত্রা নাড়ী আছে। নির্মল জ্ঞানোদয় না হইলে এই নাড়ীকে কেহ জানিতে পারে না। আবার এই চিত্রা নাড়ীর মধ্যে ব্রহ্ম নাড়ী নামে অতি সূক্ষ্ম বিদ্যুন্মালার ন্যায় উজ্জ্বল আর একটি নাড়ী আছে, ইহার ছিদ্র দিয়া ব্রহ্মরন্ধ্রস্থ পদ্ম হইতে সুধা ক্ষরিত হয়; যোগীগণ সেই সুধা মূলাধার পদ্মস্থ কুণ্ডলিনীশক্তি দ্বারা পান করিয়া সিদ্ধানন্দ ভোগ করেন।

১) মূলাধার চক্র গুহ্যে আছে, ইহা চতুর্দল, রক্তবর্ণ, স্বর্ণাভ, অধোমুখ পদ্ম (সাধক ধ্যানকালীন ঊর্ধ্বমুখ চিন্তা করিবেন)। ইহার চারটি দলে বং, শং, ষং, সং এই চারটি বর্ণ আছে, কর্ণিকাতে চতুষ্কোণ পৃথ্বী চক্র আছে, ঐ চক্র উদ্দীপ্ত পীত বর্ণ অষ্টশূলযুক্ত তাহার মধ্যে লং অর্থাং পৃথিবী বীজ আছে এবং তৎসহ লক্ষ্মীবীজ আছে। ঐ চক্রের দেবতা ইন্দ্র, তাঁহার ক্রোড়ে চতুর্ভুজ ব্রহ্মা, ভৌতিক পদার্থাদি সৃষ্টি করিতেছেন এবং চতুর্বেদ পাঠ করিতেছেন। ঐ চক্রে রক্তবর্ণ, চতুর্বাহু, দ্বাদশ সূর্যতুল্য, ডাকিনী শক্তি আছেন। বজ্রা নাড়ীর মুখে কামরূপ নামে পীঠ আছে, তাহার মধ্যে ত্রিকোণ যন্ত্র আছে। ওই যন্ত্রোদ্ভুত কন্দর্প বায়ু জীবাত্মাকে আয়ত্ত করিয়া রাখিয়াছে। ঐ ত্রিকোণ যন্ত্র মধ্যে শরদিন্দুসন্নিভ লিঙ্গরূপী স্বয়ম্ভু আছেন। ঐ লিঙ্গের গাত্রে সার্ধ-ত্রিপাক বেষ্টন করিয়া ব্রহ্ম নাড়ীর মুখের কাছে মুখ দিয়া কুণ্ডলিনী শক্তি নিদ্রিতা আছেন, ইনি বিদ্যুৎরূপিণী মহামায়া, ইনি ভ্রমরের ন্যায় মধুর গুন গুন নাদ করিতেছেন, ইনিই শব্দজননী, ইনিই শ্বাসপ্রশ্বাস বিভাগ দ্বারা প্রাণীগণের জীবন রক্ষা করিতেছেন। এই কুণ্ডলিনীর দেহ মধ্যে পরমাকলা ত্রিঅংশরূপা প্রকৃতি নিখিল ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ করিতেছেন।

২) স্বাধিষ্ঠান চক্র লিঙ্গ মূলে। ষড়দল অরুণবর্ণ পদ্ম আছে। ইহার ষড়দলে ষড় বর্ণ, বং, ভং, মং যং, রং, লং আছে। তন্মধ্যে শ্বেতপদ্মাকার বরুণ দেবতার চক্র আছে, এই চক্রমধ্যে শরচ্চন্দ্রদ্যুতি, মস্তকে অর্ধচন্দ্রধারী,

মকরারোহী, বং বীজ রূপ বরুণ দেবতা আছেন। ঐ দেবতার ক্রোড়ে চতুর্বিংশতি লক্ষণযুক্ত পীতাম্বর নারায়ণ আছেন। এই চক্রের শক্তি লক্ষ্মীরূপা রাকিণী।

৩) মণিপুর চক্র নাভিমূলে। দশ দল নীল বর্ণ পদ্ম আছে। দশ দলে ডং, ঢং, ণং, তং, থং, দং, ধং, নং, পং, ফং দশ অক্ষরযুক্ত বর্ণ আছে। তাহার ঠিক মধ্যে রং কারাত্মক ত্রিকোণ বহ্নি বীজ আছে। স্বস্তিমণ্ডল তাহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। ঐ বহ্নি দেবতা চতুর্বাহু, আরক্ত সূর্য সম এবং মেষবাহন। তাঁহার ক্রোড়ে ইষ্টদাতা এবং সংহারকারী মহাকাল আছেন। এই চক্রের শক্তি লাকিনী, ইনি শ্যামবর্ণা।

৪) অনাহতচক্র হৃদয়ে। সিন্দূরবর্ণ দ্বাদশ দল পদ্ম আছে। দ্বাদশ দলে কং, খং, গং, ঘং, ঙং, চং, ছং, জং, ঝং, ঞং, টং, ঠং বর্ণযুক্ত পদ্ম আছে, তাহার মধ্যে ষটকোণ ধূম্রবর্ণ বায়ুমণ্ডল আছে, তন্মধ্যে যং-কারাত্মক বায়ু বীজ দেবতা, কৃষ্ণসার মৃগারূঢ়া হইয়া আছেন। ঐ বীজের মধ্যে হংসের ন্যায় শুভ্রবর্ণ অভয় বরদাতা ঈশান মহাদেব আছেন। এই চক্রের শক্তি কাকিনী, ইনি পীতবর্ণা আনন্দময়ী। ঐ পদ্মের কর্ণিকা মধ্যে অতি কোমল ত্রিকোণ শক্তি আছে। ঐ শক্তির মধ্যে সুবর্ণবর্ণ বাণলিঙ্গ মহাদেব আছেন। অধিকন্তু ঐ পদ্মমধ্যে আর একটি দ্বিতীয় অষ্টদল পদ্ম আছে, তাহাতে এক কল্পতরু আছে তাহার তলায় মণিপীঠে হংসরূপী জীবাত্মা আছেন। সাধক এই স্থানে গুরু উপদিষ্ট ইষ্ট দেবতাকে ধ্যান করিবেন, তাহা হইলে আত্মদর্শন হইবে।

৫) বিশুদ্ধ চক্র কণ্ঠদেশে। ধূম্রাভ ষোড়শ দল বর্ণ অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ, ঌ ৡ এ ঐ ও ঔ অং অঃ ষোড়শ-স্বরযুক্ত পদ্ম আছে। কর্ণিকার মধ্যে সুধা কর্ষণ উজ্জ্বল শরীরধারী শুভ্রবর্ণ, করীপৃষ্ঠে শুক্লাম্বর-পরিধৃত, গোলাকার আকাশ চক্রধারী আছেন। ঐ চক্র মধ্যে হংসাকার, পাশাঙ্কুশধারী দ্বিভুজ এবং অভীতিবরপ্রদ আকাশবীজ আছেন। তাঁহার ক্রোড়ে, পঞ্চমুখ, ত্রিনেত্র, দশবাহু হরগৌরী আছেন। উক্ত কর্ণিকার মধ্যে চন্দ্রমণ্ডলের সুধাপানাসক্তা, পীতবর্ণা, চতুর্ভুজা সাকিনী শক্তি আছেন।

৬) আজ্ঞাচক্র ভ্রূযুগল মধ্যে। ধ্যানের নিকেতন শুক্লবর্ণ দ্বিদল হ-ক্ষ-বর্ণযুক্ত আছে। এই স্থানে ইড়া, পিঙ্গলা, বরুণা অসীরূপে মিলিত হইয়া বারাণসী তীর্থ হইয়াছে। ঐ পদ্মে শুক্লবর্ণা ষড়মুখী হাকিনী শক্তি আছেন। তাঁহার চতুর্ভুজে পুস্তক, কপাল, ডমরু এবং জপমালা আছে। এই পদ্মধ্যানে ব্রহ্মজ্ঞান হয়। এই পদ্ম মধ্যে মন এবং কর্ণিকাতে ত্রিকোণ যন্ত্র আছে। এই স্থান পরম লয়ের স্থল, তথায় শুক্ল নামে মহাকাল এবং ইতয়াক্ষ সিদ্ধলিঙ্গ বিরাজমান আছেন। এই শিব অর্ধনারীশ্বর নামে প্রখ্যাত। আজ্ঞাচক্রের জ্ঞান জন্মিলে জীব অদ্বৈতবাদী হয়।

আজ্ঞাচক্রের কিঞ্চিৎ ঊর্ধ্বে শুদ্ধ, জ্ঞান, জ্ঞেয়, প্রদীপশিখাবৎ, জ্যোতির্ময়, ওঁকারাত্মক অন্তরাত্মা নিরন্তর বাস করেন। তাহার উপর অর্ধচন্দ্র তদুপরি বিন্দুরূপী নাদ, তথায় শক্তিরূপাধার স-কারাত্মক পূর্ণ শশধরের ন্যায় উজ্জ্বল শিবলিঙ্গ আছেন। ঐ ওঁকারের ঊর্ধ্বভাগে আকাশ এবং নিম্নভাগে পৃথিবী, তন্মধ্যে নিরলম্ব ভগবান আছেন। ঐ ওঁকারের উপরিভাবে দ্বিভুজ মহানাদ নামে শিবাকার বায়ুর লয় স্থান আছে। উক্ত আজ্ঞাচক্রের ঊর্ধ্বদেশে শঙ্খিনী নাম্নী নাড়ীর অগ্রে আকাশে বিসর্গরূপ যুগল বিন্দু আছে। তাহার অধঃস্থলে পূর্ণেন্দুর ন্যায় শুভ্রবর্ণ, তরুণতপন-রশ্মি সদৃশ কেশরযুক্ত সহস্রদল পদ্ম অধোমুখে আছে। তাহাতে যথাস্থানে পঞ্চাশৎ মাতৃকা বর্ণ আছে। ঐ স্থানে নির্মল শশঃ ও চন্দ্র বিরাজ করিতেছেন। ঐ চন্দ্র-অভ্যন্তরে বিদ্যুৎ-আকার ত্রিকোণ যন্ত্র আছে; ওই যন্ত্রের মধ্যে গুহ্যতম চিদ্রুপাকার শূন্য স্থান আছে, তথায় পরমাত্মার স্বরূপ পরম শিব বিরাজ করিতেছেন। তিনি যোগানন্দ জ্ঞান এবং মঙ্গলদাতা। ইঁহাকে পরমহংসও কহে। এই স্থানেই শৈবের কৈলাস, বৈষ্ণবের গোলক, শাক্তের মহাশক্তির নিজাবাস। এই সহস্রদল পঙ্কজাভ্যন্তরে প্রাতঃ তপনের ন্যায় লোহিতবর্ণ, মৃণাল সূত্রবৎ অতি সূক্ষ্ম এবং বিদ্যুন্মালার ন্যায় জ্যোতিবিশিষ্টা, শুদ্ধা বিকারবর্জিতা এবং নিত্য-প্রকাশা, ক্ষয়োদয়-রহিতা, অধোমুখী এবং পূর্ণানন্দ শ্রেণী হইতে যে অমৃতধারা ক্ষরণ হইতেছে তাহা ধারণশীলা, একভূতা অমা নাম্নী শশিকলা আছে। উহার মধ্যে কেশাগ্রের সহস্রাংশ পরিমিত এবং অর্ধ চন্দ্রকার, দ্বাদশাদিত্য-প্রভা-বিশিষ্টা, প্রাণীগণের ইষ্ট দেবতা, নির্বাণ নাম্নী কলার মধ্যে কোটিসূর্য-কান্তিমতী শিবলিঙ্গ

হইতে প্রেমধারা বিলাসিনী কর্মফলদায়িনী নির্বাণ শক্তি আছেন। ঐ নির্বাণ শক্তির মধ্যভাগে যোগী ও মহাত্মাদিগের চিন্তনীয় পরম সুখময় নিত্যানন্দ স্বরূপ শাশ্বত তুরীয় ব্রহ্ম আছেন।

নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, তপস্যা প্রভৃতি দ্বারা যোগী দীর্ঘ জীবন, ব্যোম-গমন ক্ষমতা, অন্তর্ধান শক্তি, অন্য দেহে প্রবেশ-পটুতা, দূরদর্শন এবং ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান ত্রিকাল দর্শন এবং অষ্ট সিদ্ধি, অণিমা, লঘিমা, মহিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, ঈশিত্ব এবং কামাবশায়িতা লাভ করিতে পারেন। অণিমা অর্থাৎ অণু তুল্য ক্ষুদ্র দেহ ধারণ ক্ষমতা। লঘিমা অর্থাৎ লঘুত্ব হেতু ঊর্ধ্ব গমন ক্ষমতা। মহিমা অর্থাৎ বৃহৎ এবং মাহাত্ম্যযুক্ত হওয়া ক্ষমতা। প্রাপ্তি অর্থাৎ বিশ্বের তাবৎ জিনিস করতলস্থ হওয়া। প্রাকাম্য অর্থাৎ যথেচ্ছাকারিত্ব। ঈশিত্ব অর্থাৎ প্রভুত্ব। বশিত্ব অর্থাৎ সকলকে বশে রাখিবার ক্ষমতা। কামাবশায়িতা অর্থাৎ সকল প্রকার কামের পরিপূরক করিয়া শেষে নিষ্কাম হওয়া। ভক্তি না জন্মিলে সাধক পুরুষকার সাধন দ্বারা যতই উন্নত হউক তথাপি তাহার পতন হইবার সম্ভাবনা থাকে। তপস্যার উচ্চ সোপানে উঠিয়াও তপস্বীর কখনও কখনও অবিশ্বাস এবং নৈরাশ্য উপস্থিত হইয়া থাকে, কিন্তু ঐ সঙ্গে একবার ভক্তি জন্মিলে আর অবিশ্বাস কখনও আসিতে পারে না। যোগীগণ তখন অনায়াসে মুক্তিলাভ করেন। আত্মার সহিত পরমাত্মার যে যোগ তাহাই তন্ময়ত্ব। কোনো বিষয়ে গভীর মনোযোগ করিয়া অন্যমনা হইলেই তন্ময়ত্ব। তন্ময়ত্ব হইলে বন্ধনমোচন হইয়া মুক্তিলাভ হয়।

কয়েকটি সার কথা : 'শিষ্য। পৃথিবীতে সৃষ্টির আদিতে কী ছিল?
গুরু। পঞ্চভূত ও ঈশ্বর।
শিষ্য। পৃথিবী এবং জীব সৃষ্টি কে করিয়াছেন?
গুরু। ঈশ্বর।
শিষ্য। সৃষ্টি বৃদ্ধি করেন কে?
গুরু। ব্রহ্মা।
শিষ্য। ব্রহ্মা কে?
গুরু। ঈশ্বরের শক্তি।
শিষ্য। সৃষ্টি পালন করেন কে?
গুরু। বিষ্ণু অর্থাৎ নারায়ণ।
শিষ্য। বিষ্ণু কে?
গুরু। ঈশ্বরের শক্তি।
শিষ্য। সৃষ্টি ধ্বংস বা লয় করেন কে?
গুরু। মহেশ্বর অর্থাৎ মহাদেব।
শিষ্য। মহাদেব কে?
গুরু। ঈশ্বরের শক্তি।
শিষ্য। ব্রহ্মাণী কে?
গুরু। ব্রহ্মার শক্তি।
শিষ্য। লক্ষ্মী কে?
গুরু। বিষ্ণুর শক্তি।
শিষ্য। দুর্গা কে?
গুরু। মহাদেবের শক্তি।
শিষ্য। সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার করেন কে?
গুরু। ঈশ্বর।
শিষ্য। বন্ধন কাহাকে বলে?

গুরু। বিষয়ে অনুরাগ।
শিষ্য। মুক্তি কাহাকে বলে?
গুরু। বিষয়ে বিরক্তি ও ঈশ্বরে লয়।
শিষ্য। ঘোর নরক কী?
গুরু। স্বীয় দেহ।
শিষ্য। স্বর্গ কোথায়?
গুরু। আশা ক্ষয় হইলে এই পৃথিবীই স্বর্গ।
শিষ্য। সংসার-বন্ধন কীসে যায়?
গুরু। আত্মবোধ হইলে।
শিষ্য। কী করিলে মুক্তি হয়?
গুরু। তত্বজ্ঞান হইলে।
শিষ্য। নরকের কারণ কী?
গুরু। নারী।
শিষ্য। স্বর্গের কারণ কী?
গুরু। অহিংসা।
শিষ্য। মনুষ্যের শত্রু কে?
গুরু। তাহাদের ইন্দ্রিয়সকল।
শিষ্য। মনুষ্যের মিত্র কে?
গুরু। বশতাপন্ন ইন্দ্রিয়সকল।
শিষ্য। দরিদ্র কে?
গুরু। যে অতিশয় লোভী।
শিষ্য। ঐশ্বর্যশালী কে?
গুরু। যে সর্বদা সন্তুষ্ট।
শিষ্য। জীবন্মৃত কে?
গুরু। উদ্যমহীন পুরুষ।
শিষ্য। মায়া কী?
গুরু। অতিশয় ভালোবাসা।
শিষ্য। মহাঅন্ধ কে?
গুরু। কামাতুর।
শিষ্য। মৃত্যু কী?
গুরু। অপযশই মৃত্যু, মনুষ্য অমর।
শিষ্য। চিররোগ কী?
গুরু। সংসার।
শিষ্য। ঐ রোগের ঔষধ কী?
গুরু। নির্লেপ হইয়া বাস করা।
শিষ্য। প্রধান তীর্থ কী?
গুরু। স্বীয় পবিত্র মন।
শিষ্য। ত্যাজ্য কী?
গুরু। অর্থ, দুরাশা।

শিষ্য। শ্রোতব্য কী?
গুরু। গুরুর নিকট বেদবাক্য।
শিষ্য। ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপায় কী?
গুরু। সৎসংসর্গ।
শিষ্য। সাধু কে?
গুরু। যাহার মোহ ও অনুরাগ নাই।
শিষ্য। জীবের জ্বর কী?
গুরু। চিন্তা।
শিষ্য। মূর্খ কে?
গুরু। বিবেকহীন ব্যক্তি, নাস্তিক।
শিষ্য। নাস্তিক কে?
গুরু। যে অতি মূর্খ।
শিষ্য। পণ্ডিত কে?
গুরু। জ্ঞানী।
শিষ্য। ধার্মিক কে?
গুরু। যথার্থ পণ্ডিত।
শিষ্যা। কর্তব্য কার্য কী?
গুরু। ঈশ্বরে ভক্তি।
শিষ্য। বিদ্যা কী?
গুরু। যাহা দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান হয়।
শিষ্য। লাভ কী?
গুরু। ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তি।
শিষ্য। জগৎজয়ী কে?
গুরু। যিনি মনকে জয় করিয়াছেন।
শিষ্য। বিষ কী?
গুরু। বিষয়।
শিষ্য। দুঃখী কে?
গুরু। বিষয়ানুরাগী।
শিষ্য। সুখী কে?
গুরু। যাহার কোনো চিন্তা নাই।
শিষ্য। ধন্য কে?
গুরু। পর-উপকারী।
শিষ্য। পূজনীয় কে?
গুরু। তত্বজ্ঞানী ব্যক্তি।
শিষ্য। কর্তব্য কর্ম কী?
গুরু। ধর্ম-উপার্জন।
শিষ্য। অকর্তব্য কী?
গুরু। স্নেহ ও পাপ।
শিষ্য। বুদ্ধিমান কে?

গুরু। যাহাকে নারী বশ করিতে পারে নাই।
শিষ্য। উত্তম ব্রত কী?
গুরু। সৎপাত্রে দান।
শিষ্য। শৃঙ্খল কী?
গুরু। নারী।
শিষ্য। কী জানিতে সকলেই অশক্ত?
গুরু। নারীর মন ও চরিত্র।
শিষ্য। পশু কে?
গুরু। মূর্খ।
শিষ্য। কাহার সহিত সংসর্গ করিবে না?
গুরু। মূর্খ, পাপী, খল ও নীচ লোকের সহিত।
শিষ্য। ছোট কে?
গুরু। যে যাচ্ঞা করে।
শিষ্য। বড় কে?
গুরু। যে কিছু চাহে না।
শিষ্য। জন্মিয়াছে কে?
গুরু। যাহাকে আর জন্মগ্রহণ করিতে হইবে না।
শিষ্য। মরিয়াছে কে?
গুরু। যে আর মরিবে না।
শিষ্য। বিশ্বাসী কে?
গুরু। তত্বজ্ঞানী ব্যক্তি।
শিষ্য। অবিশ্বাসী কে?
গুরু। নারী।
শিষ্য। কী করিলে শোক হয় না?
গুরু। ধর্ম ও উপাসনা।
শিষ্য। আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি হয় না কাহার?
গুরু। রিপুসকলের।
শিষ্য। দুঃখের মূল কী?
গুরু। মায়া।
শিষ্য। দেয় কী?
গুরু। অভয়।
শিষ্য। মনের বিনাশ কী?
গুরু। মোক্ষ।
শিষ্য। কোথায় কোনো ভয় নাই?
গুরু। মুক্তিতে।
শিষ্য। কী করিলে মৃত্যুভয় হয় না?
গুরু। ঈশ্বর চিন্তায় মগ্ন হইলে।
শিষ্য। দস্যু কে?
গুরু। কুবাসনা।

শিষ্য। কোন বস্তু দান করিলে বৃদ্ধি হয়?
গুরু। বিদ্যা।
শিষ্য। কোন বস্তু দিন দিন কমিতেছে?
গুরু। পরমায়ু।
শিষ্য। চিরস্থায়ী কী?
গুরু। কাল।
শিষ্য। কাহাকে ভয় করা উচিত?
গুরু। লোকাপবাদ।
শিষ্য। প্রকৃত বন্ধু কে?
গুরু। যে বিপদকালে সহায়।
শিষ্য। পিতা-মাতা কে?
শিষ্য। প্রতিপালন কর্তা।
শিষ্য। কী জানিলে আর কিছু জানিতে হয় না।
গুরু। পূর্ণজ্ঞান-স্বরূপ ব্রহ্ম।
শিষ্য। দুর্লভ কী?
গুরু। সদগুরু ও আত্মজ্ঞান।
শিষ্য। মিত্র অথচ শত্রু কে?
গুরু। পুত্র-কন্যা প্রভৃতি।
শিষ্য। চঞ্চল কী?
গুরু। মন, ধন, যৌবন ও আয়ু।
শিষ্য। উত্তম দান কী?
গুরু। তত্বজ্ঞান।
শিষ্য। কী কার্য করিবে না?
গুরু। পাপ কর্ম।
শিষ্য। কী কার্য প্রাণপণে করিবে?
গুরু। ঈশ্বরের উপাসনা।
শিষ্য। কোন ধর্ম ভালো?
গুরু। যাহা ঈশ্বরের প্রীতিজনক।
শিষ্য। কিসে যত্ন করিবে না?
গুরু। সংসারে।
শিষ্য। দিবা রাত্র কী চিন্তা করিবে?
গুরু। সংসার মিথ্যা ও আত্মতত্ব।
শিষ্য। ঈশ্বর আছেন কি না কীরূপে জানিব?
গুরু। তুমি নিজে আছ কি না যেরূপে জানিতেছ।
শিষ্য। যাঁহার আকার নাই তাঁহাকে কীরূপে বুঝা যায়?
গুরু। জীবন, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি আছে কী না কীরূপে জানা যায়?
শিষ্য। আমার জীবন আছে ইচ্ছা মতো সকলই করিতে পারি, তাই আমি জানি।
গুরু। যে ব্যক্তি আপনাকে জানে সে ঈশ্বরকেও জানে।
শিষ্য। যাহা দেখা যায় না তাহা সহজে বিশ্বাস হয় না।

গুরু। বায়ু, সৌরভ ইহাদের আকার নাই, কোন জ্ঞানে তাহা অনুভব করো?

শিষ্য। বায়ু, সৌরভ আছে বিশ্বাস হয় তাহাদের কার্য দেখিয়া।

গুরু। তুমি এবং বায়ু উভয়ই ঈশ্বরের কার্য নয় কি? এখন ভাবিয়া দেখ ঈশ্বর আছেন কি না?

শিষ্য। বুঝিলাম ঈশ্বর আছেন, তাঁহাকে ভক্তি বা উপাসনা করিব কেন?

গুরু। তুমি সন্তানকে স্নেহ করো কেন এবং পিতামাতাকে ভক্তি করো কেন?

শিষ্য। স্নেহ নীচগামী এবং ভক্তি ঊর্ধ্বগামী।

গুরু। সেই জন্য ঈশ্বরকে ভক্তি করা উচিত। চক্ষু পাইয়াছ দেখিবার, শক্তি কোথায় পাইলে, দেখিবার জিনিস না পাইলে চক্ষু কোন কার্যে আসিত? তোমার প্রপিতামহকে তুমি দেখ নাই, তিনি ছিলেন কোন জ্ঞানে জানিতেছ। আকার না থাকিলেও জিনিস আছে তাহা নিশ্চয়।'

তত্বজ্ঞান : 'তত্বজ্ঞান অর্থাৎ পরমাত্মা বা ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞান। ঈশ্বর আছেন যদি বিশ্বাস হয় তবে তাঁহার অনুসন্ধান করা উচিত, আর যদি সে বিশ্বাস না থাকে তবে বৃথা তর্ক করিয়া বাজে কথায় কাহারও সহিত বিবাদ অথবা নিজের মত বহাল রাখিবার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র। যাঁহার সে বিশ্বাস আছে এবং যিনি তাঁহাকে পাইবার পথ অনুসন্ধান করিতেছেন, তাঁহার প্রথমে ''আমি কে'' তাহা অবগত হওয়া উচিত, তাহার পর আরও সাতটি বিষয় বিশেষরূপে অবগত হওয়া আবশ্যক। প্রণালী অনুসারে বিশ্বাস ও ভক্তির সহিত কার্য করিলে তিন মাস মধ্যে নিশ্চয় আত্মদর্শন হয়। আত্মদর্শন হইলে মনুষ্য শান্ত ও মুক্তির পথে অগ্রসর হয়। যতদিন না আত্মা পরমাত্মায় যোগ করিতে পারিবে ততদিন মুক্তির আশা নাই। যোগ হইলে সূক্ষ্ম দেহ ধারণ করিয়া, যথা ইচ্ছা গমনাগমন করিতে পারা যায়। ঐশ্বরিক বল ও শক্তি পাওয়া যায়, যাহা দ্বারা অবশেষে সর্বজ্ঞ হইয়া থাকে।

আমি কে : পঞ্চভূত, পঞ্চপ্রাণ, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি। ঐ সকল ভিন্ন, নাড়ী চতুষ্টয় যথা ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না ও চিত্রা—ছয় রিপু এবং চিত্ত, বাসনা, চিন্তা, তৃষ্ণা, মায়া ও আশা, এই সকল উপাদান লইয়া দেহের গঠন হইয়াছে। তাহা ব্যতীত জ্ঞান, চৈতন্য, আত্মা বা জীবাত্মা এবং পরমাত্মা আসে। এই সকল বিষয়ের তত্ব অবগত হইতে পারিলেই আমি কে এবং মানবদেহে সর্বদা বিরাজমান আছেন কি না বেশ জানিতে পারা যায়। আমি যদি আমাকে চিনিতে পারি তবে নিশ্চয়ই ঈশ্বরকে জানিতে পারিব। যদি ঈশ্বর আছেন বিশ্বাস হয় তবে তিনি অতি নিকটে আছেন জানিবে। আর যদি বিশ্বাস না হয় তবে তিনি বহুদূরে এবং কোনো কালে সাক্ষাৎ হইবে কিনা তাহা বলা যায় না।

পদ হইতে মস্তক পর্যন্ত বিচার করিয়া দেখিলে আমি নামে কাহাকেও পাওয়া যায় না। একমাত্র জ্ঞান স্বরূপই আমি, কেবল বিশুদ্ধ চৈতন্যই আমি রূপে প্রকাশিত। দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও চৈতন্য একত্র দৃষ্ট হইলেও তাহাদের পরস্পর কোনো সম্বন্ধ নাই। সমুদয় অঙ্গ থাকিতেও শব কী জন্য দর্শন স্পর্শনাদি করিতে পারে না, দেহ ও শব একই পদার্থ; আমার চৈতন্য আছে বলিয়া দেখিতে ও শুনিতে পাই, সুতরাং আমি দেহ নহি, ইহাতে আর কোনো প্রকার সন্দেহ থাকিতে পারে না; অতএব আমি দেহ হইতে ভিন্ন, নিত্য এবং স্বপ্রকাশ। যে স্থানে আত্মা বিদ্যমান, তথায় মনও থাকে না, ইন্দ্রিয়ও থাকে না, বাসনাও থাকে না; রাজার নিকট ক্ষুদ্র পামর ব্যক্তি বসিতে পারে না। যেমন তৈল তিল হইতে পৃথক হইলে খৈল ও তিলের সহিত আর কোনো সম্বন্ধ থাকে না সেইরূপ দেহ, মন ও ইন্দ্রিয়াদির সহিত আমার কোনো সম্বন্ধ নাই। এই মনও আমি নহি, জীবও আমি নহি, কারণ ইহারা চৈতন্য কৃত বোধ্যমান হইয়া থাকে। জীবের নিজের কোনো ক্ষমতা নাই, কেবল সাক্ষীমাত্র। অতএব আমি সেই অনন্ত আত্মা। যেমন মুক্তাহারের সূত্র প্রত্যেক মুক্তাতেই গ্রথিত সেইরূপ এই ভগবান আত্মায় জীব সমুদয় গ্রথিত। সূত্রে ও মুক্তায় কোনো সম্বন্ধ নাই, সেই প্রকার দেহ ও আত্মার কোনো সম্বন্ধ নাই; দেহ জড় পদার্থ মাত্র, আমি অমর। মৃত্যুই বা কী, জীবিত বা কে, ইহা কেবল ভ্রম মাত্র। আমি শব্দই আত্মা ভিন্ন আর কিছু নহে, জ্ঞানের উদয় হইলে ইহা জানা যায়।

বাহ্য জগৎ আমি নহি, অনিত্য দেহ আমি নহি, পঞ্চ প্রাণবায়ু আমি নহি, কারণ ইহারা অচেতন, আমি চেতন। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় আমি নহি, বাক্য, শব্দ, স্পর্শ, ঘ্রাণ, রূপ, রস, এই সমস্তও আমি নহি, তবে আমি কে? আমি মনন-শূন্য নির্মল শান্ত বিশুদ্ধ চেতন স্বরূপ; আমি বাহ্য অভ্যন্তর সর্বস্থানব্যাপী, আমিই দীপবৎ সকল পদার্থ প্রকাশ করিতেছি, আমি সর্বগামী আত্মা। যেমন অন্ধকারে দীপ সাহায্যে সাদা কালো দ্রব্যাদি চিনিতে পারা যায়, সেইরূপ আমাতেই অর্থাৎ আমার আত্মাতেই সকল পদার্থের বস্তুত্ব প্রতিপন্ন হয়। দর্পণ যেমন সকল বস্তুর প্রতিবিম্বের বিশ্রাম স্থান, সেই প্রকার আমিই সকল জাগ্রত পদার্থের অনুভব স্থল। আদি, অনাদি, অনন্ত, সর্বগামী, চিন্ময় সেই আত্মা। আমার এই স্থাবর জঙ্গম বহু শরীর। ইহার পরিমাণ যে কত তাহার ইয়ত্তা করা যায় না, কোন সময়ে হইয়াছে এবং কত কাল থাকিবে তাহার সীমা নাই, ইহা কতদূর ব্যাপী তাহারও নিরাকরণ নাই।

আমি স্বয়ং স্বপ্রকাশ। আমি কুসুমে সৌরভ, বীজে বৃক্ষ, জলে শৈত্য, অগ্নিতে তেজ, সূর্যে কিরণ, দীপে আলোক, কান্তিতে রূপ ও রূপে অনুভব হইয়া অবস্থান করিতেছি। যেমন দুগ্ধে ঘৃত, জলে রস, তিলে তৈল, চিনিতে মিষ্টতা বিদ্যমান; আমিও সেইরূপ নিখিল পদার্থে শক্তি রূপে বর্তমান আছি। আমি আত্মা বলিয়াই কাহারও নিকট প্রার্থনা না করিয়া এই বিশাল জগৎ অনায়াসে প্রাপ্ত হইয়াছি। তুমি বা আমি এবং আমার ইত্যাদি ইহা সমস্তই মিথ্যা ভ্রম মাত্র।

মন : মন কোথাও কিছু পায় না বলিয়া দূর-দূরান্তরে ঘুরিয়া বেড়ায়। মনের বৃত্তিতরঙ্গের ন্যায় চঞ্চল, মনের তেজ অগ্নি অপেক্ষা বেশি; ইহাকে অতিক্রম করা, পর্বত অতিক্রম অপেক্ষাও কষ্টকর। মনকে বশ করা, সমুদ্র পান, সুমেরু পর্বত উৎপাটন এবং অনল ভক্ষণ অপেক্ষাও কঠিন, মন ক্ষীণ অর্থাৎ বাসনা শূন্য হইলে জগৎ নষ্ট হয়। এই যে শত শত সুখ দুঃখ বৃহৎ বৃহৎ পর্বত হইতে অরণ্যের ন্যায় মন হইতেই উৎপন্ন হয়; বিবেক বশে মন ক্ষীণ হইলে সেই সকল সুখ দুঃখ বিনষ্ট হয়। মন নটের ন্যায় সকল বিষয়েই ক্ষণিক আনন্দ, ক্ষণিক বিষাদ এবং ক্ষণিক প্রসন্নতা অনুভব করে। নির্মল বুদ্ধিযোগে এখন যদি মনের চিকিৎসা না করা যায়, তাহা হইলে ইহার পর আর তাহার প্রতিকার করিবার সময় পাইবে কোথায়? মন, চিত্ত, বাসনা, কর্ম ও দৈব ইহারা সংজ্ঞা রূপে কথিত হইয়া থাকে। মনের সত্তাতেই দৃশ্য দর্শন হইয়া থাকে, মনের উচ্ছেদ হইলে দৃশ্য দর্শনেরও উচ্ছেদ হয়। মনই জগৎকর্তা, মনই পুরুষ, মনের নিশ্চয়ে যাহা সম্পাদিত হয় তাহা মনের প্রতিবিম্ববৎ; এই আকাশ বিস্তৃত এবং অনন্ত, মনও সেই প্রকার বিস্তৃত চিদাকাশ; এই বিস্তৃত মনের যে যে অংশ চৈতন্যের প্রতিবিম্ব প্রাপ্ত হয়, তাহাই প্রকাশিত হইয়া স্থিরতা প্রাপ্ত হয়।

মনের শক্তি এত প্রবল যে, এক মনে যাহা করিবে তাহা নিশ্চয়ই সফল হইবে, এমনকী স্বয়ং ব্রহ্মও হইতে পারা যায়। মন চৈতন্যশক্তি হইতে চৈতন্যভাব প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মভাবাপন্ন হয়। মন ও দেহ অভিন্ন, আত্মাই মন ও দেহ, মন দেহের সকল চেষ্টাই সফল হইয়া থাকে। মন যাহার অনুসন্ধান করে তাহা প্রাপ্ত হয়। মন দ্বারা আপনিই আপনাকে পবিত্র পথে নিযুক্ত করিতে হয়। মন যাহার অনুসন্ধান করে, কর্মেন্দ্রিয় সমুদয় তাহাই স্পন্দন করে। মালিন্যযুক্ত চিত্তকে মন বলা যায়। মন ও চিত্ত আত্মার স্বরূপ ভিন্ন আর কিছুই নহে, বাসনা চিত্তের অংশ মাত্র। মনই আপনার বিনাশ ক্রিয়া আপনিই সাধন করে, মন কেবল আপনার বিনাশের নিমিত্তই আত্মদর্শন করিয়া থাকে। মনের নাশই সকল দুঃখ নিবারণের মূল। বিবেক দ্বারা সংস্কৃত হইলে মনের নাশ হয়।

মন যে কতদূর শক্তি ধারণ করে তাহা সহজেই প্রত্যক্ষ করা যায়। তোমার মন যদি অন্যত্র আসক্ত থাকে তাহা হইলে ভক্ষ্য দ্রব্য চর্বণ করিলেও তাঁহার কিছুই আস্বাদ পাইবে না। মন অন্য স্থানে আসক্ত থাকিলে দর্শন করা যায় না, শ্রবণ করা যায় না, দেহ পর্যন্ত যেন অকর্মণ্য হইয়া স্থিরভাবে থাকে। মন ও চিত্ত পরস্পর পরস্পরের সাহায্যে সাকার হওয়ায় উভয়েই সমান, তথাপি মন উৎকৃষ্ট, কেন না মন হইতে চিত্তের উৎপত্তি; চিত্ত হইতে মনের উৎপত্তি নহে। সুখকে দুঃখ জ্ঞান ও দুঃখকে সুখ অনুভব করা একমাত্র মনেরই কার্য। মন দর্শন করে নাই এমন কোনো বস্তুই নাই। যেমন অঙ্কুর হইতে বৃক্ষ, লতা, পত্র, পুষ্প উৎপন্ন হয়,

তেমনই মন হইতে এই জগৎ, স্বপ্ন, বাসনা, চিন্তা, বিলাস ইত্যাদি সমুদয় আবির্ভূত হয়। যেমন নাট্যালয়ে একজন নটই নানা প্রকার বেশ ধারণ করিয়া নানা প্রকার ভাবভঙ্গি প্রকাশ করে, সেই প্রকার আপনার মনই জাগ্রত ও স্বপ্নরূপে সমুদিত হইয়া সর্বদাই নানা প্রকার চিন্তা করে। মন নিজে নিরাকার হইলেও সাকার হইয়া চিত্ত অভ্যাসবশে জীবভাবাপন্ন হইয়া জাত ও মৃত হইয়া থাকে। তিলে যেমন তৈল আছে মনেও তেমনই সুখ দুঃখ নিয়তই আছে; কালবশত কখনও বৃদ্ধি কখনও হ্রাস হইয়া থাকে। যাহার মন নিশ্চল, এক বিষয়গামী হইতে শিক্ষা করিয়াছে তিনিই পরমব্রহ্মের ধ্যানে সমর্থ হইয়াছেন।

মন সংযমে সংসার বিলাসের শান্তি হইয়া থাকে। অনুদ্বেগ হইতে জীবের মনোজয় হয়। মনোজয় করিতে পারিলে ত্রিলোক বিজয়ও তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়। মনোজয় আর কিছুই নহে, কেবল স্ব স্ব ভাবে অর্থাৎ পূর্ণব্রহ্ম রূপে অবস্থিতি মাত্র। চাপল্যই মনের রূপ; যেমন অগ্নির ধর্ম উষ্ণতা, তেমনই মনের ধর্ম চঞ্চলতা যেমন স্পন্দন ব্যতিরেকে মনের বায়ুর সত্তা উপলব্ধি হয় না, সেইরূপ চঞ্চলতা ব্যতিরেকে মনের অস্তিত্ব জানা যায় না। চাঞ্চল্যহীন মনের অবস্থাকে মোক্ষ বলিয়া জানিবে। মনের নাশ হইলেই দুঃখের শান্তি হয়। মনের চাঞ্চল্যই অবিদ্যা ও বাসনা বলিয়া জানিবে, বিচারকালে বাসনা বিনাশ করিতে পারিলেই মোক্ষ প্রাপ্তি হয়। সৎ ও অসতের মধ্যভাগ চিন্ময়ত্ব আর চিন্ময়ত্ব ও জড়ত্বের মধ্যভাগ অবস্থাকে মন বলিয়া জানিবে, জড়তার অভ্যাস বশে মন জড় হয়, বিবেকের অভ্যাসবশে মন চৈতন্যরূপ হয়। ভাবনাগ্রস্ত অস্থির মনকে বিবেক মন দ্বারা বলপূর্বক উদ্ধার করিতে হয়। রাজা ব্যতীত অন্য কেহ রাজাকে পরাজিত করিতে পারে না; সেই প্রকার মন ভিন্ন মনকে আর কেহ জয় করিতে পারে না। আত্মাকে মুক্ত করিবার জন্য মন জয় করা ভিন্ন অন্য উপায় নাই। মনই কর্মফল ভোগ করে, মনেরই এই অনন্ত সুখ ও দুঃখ হইয়া থাকে, শরীরের কিছুই হয় না। জড় দেহ সুখ দুঃখ ভোগ করিতে পারে না, মনই কর্তা। সুতরাং মনকেই মানব বলিয়া জানিবে।

মনের আদি ও অন্ত যখন বিনশ্বর তখন তাহার মধ্যভাগও অসৎ বলিতে হইবে। মনের এই অসৎরূপতা যিনি অবগত নহেন তাঁহার দুঃখ ভোগ অনিবার্য। মন যাহা করে তাহা কৃত হয়; যাহা করে না তাহা কৃত হয় না। এই বিশ্ব মনোবৃত্তি স্বরূপ। মনই সকল কর্ম, সকল চেষ্টা, সকল ভাব ও সকল আকার গতির বীজ স্বরূপ। সেই মনকে পরিত্যাগ করিতে পারিলে সমুদয় কর্ম পরিত্যক্ত হয়, নিখিল দুঃখের ক্ষয় হয়, সমুদয় কর্মও লয় প্রাপ্ত হয়।

কোষকার কীট যেমন আপনার অবস্থিতির জন্য কোষ নির্মাণ করে মনও সেইরূপ স্বীয় অবস্থিতির জন্য এই শরীর নির্মাণ করিয়াছে। যেমন, কোষকার কীটের কোষ, কোষকার হইতে অভিন্ন সেইরূপ মন ও শরীরের কোনো পার্থক্য নাই, মনই শরীরের উপাদান, মনে সমস্তই সম্ভব। এমন কোনও শক্তিই নাই যাহা মনে উদয় হয় না। মনই চিৎ প্রতিবিম্ববশত জীব হইয়া ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান কালাত্মক জগৎ রূপ স্বকল্পিত এই বিশাল নগরের নির্মাণ, পরিমর্তন ও বিনাশ করত স্ফুরিত হইতেছে। তণ্ডুলের যেমন তুষ আবরক অবস্থিত, এই সংসারও সেইরূপ আবরক সত্য ব্রহ্মে অবস্থিত। এই জড় জগতের অস্তিত্ব নাই। দুঃখ হর্ষাদি আত্মারই মতো পুনরায় কর্তৃত্বেই উহাদের লয় হয়।

মনই পুরুষ অতএব তাহাকে শুভ পথে নিয়োগ করিবে, চিৎ প্রকৃতির স্বরূপ হয়, তাহা মনন ধর্ম বিশিষ্ট হইলে মন হয়, দর্শন বিশিষ্ট হইলে চক্ষু, শ্রবণশক্তি বিশিষ্ট হইলে শ্রোত্র হয়; এই জন্য মনকে কর্মবীজ বলা হয়। বর্তমান শরীরেই মন সর্ব বস্তুতে আসক্ত হইয়া নর নামে অভিহিত হয়। মনই জীব, মনই আকার প্রাপ্ত হইয়া নির্মলতা গুণে পরমব্রহ্ম সাক্ষাৎ করিতে পারে তাহাতে সন্দেহ নাই।

মনুষ্য মনোময় ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই সংসারে মনই জন্মগ্রহণ করে, মনেরই হ্রাস বৃদ্ধি হয়; প্রকৃতভাবে দর্শন করিলেই বুঝা যায় যে, মোক্ষও মনেরই হইয়া থাকে। মনই বাস্তবিক সংসারী, জরা ও মরণ প্রকৃতভাবে মনেরই হইয়া থাকে। এই মনই চিরদিন সকলের সর্বনাশ করিয়া থাকে। জ্ঞান উদয় হইলে সেই মনের নাশ হয়, যেমন দর্পণ-সন্নিহিত দ্রব্যের অপসরণে ছায়ার অভাব হয়, সেইরূপ প্রাণশক্তির নিরোধ হইলে মনের নাশ হয়। কারণ, মন প্রাণেরই রূপান্তর মাত্র। প্রাণই নিজ স্পন্দনশক্তি সাহায্যে দেশান্তরের দ্রব্য

সমুদয় হৃদয়ঙ্গম করত তাহা অনুভব করিতে পারে, সেইজন্য মন সংজ্ঞায় অভিহিত নন। যেমন শিলার কখনও জ্বলন শক্তি হইতে পারে না, সেইরূপ মনেরও কখনও অনুভব শক্তি নাই। অনুভব শক্তি প্রাণ বায়ুর হইয়া থাকে, প্রাণ বায়ু ও আত্মার উভয় শক্তির সমাবেশকেই মন কহে। মনই কর্তা, মনই যাহা সংকল্প করে তাহাই হয়, যেখানে মন সেই স্থানে আশা ও সেই স্থানেই সুখ দুঃখ সন্নিহিত থাকে। মন ধাতুর অর্থ মনন, সেই মন কল্পনাকারী বলিয়া মন নামে অভিহিত হইয়াছে। মন জড় দৃষ্টি ও চেতনা দৃষ্টির মধ্যবর্তী থাকিয়া জীব, বুদ্ধি, চিত্ত প্রভৃতি নানা সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকে। যে পর্যন্ত মনের লয় না হইবে তাবৎ বাসনাক্ষয়ের সম্ভাবনা নাই।

চিত্ত : চিত্তের স্বাভাবিক ধর্ম বিষয়ানুরাগ। তীরস্থ বৃক্ষকে যেমন তরঙ্গসঙ্কুল নদী গ্রাস করে, সেইরূপ বৃত্তিশালী চিত্ত মনুষ্যকে গ্রাস করিতেছে। জলপ্রবাহ যেমন সেতুর দ্বারা আবদ্ধ হয়, মনুষ্য চিত্ত কর্তৃক সেই প্রকার হইতেছে। টাঙানো দড়ি যেমন ঊর্ধ্ব অধোগামী দুইই হয়, মনুষ্য সেই প্রকার চিত্ত ও মন দ্বারা কখনও ঊর্ধ্ব কখনও অধোগমন হয়। চিল যেমন সহসা লোভনীয় মৎস্য আহরণ করে, সেই প্রকার চিত্ত সহসা বিষয়ে আসক্ত হয়। চঞ্চল চিত্ত কোনো একটি বিষয়ে একাগ্র থাকিতে পারে না। বুদ্ধিস্থ আত্মাই চিত্ত। যখন চিত্তের বাসনা ক্ষীণভাবে থাকে তখন চিত্ত জীব নামে কথিত হয়, যখন ভ্রম বাহুল্য প্রাপ্ত হয় তখন দেহ; যখন চিত্তের কল্পনা শান্ত হয় তখন উহাকে পরমব্রহ্ম বলিয়া জানিতে হইবে।

বিষয়বাসনা-জড়িত চিন্মাত্রে অবস্থিত ঈষৎ বিকল্প কলুষিত চিৎতত্ত্বই জীব নামে অভিহিত হন। এই দৃশ্যের প্রপঞ্চময়তাই চিত্তের স্বরূপ বলিয়া জানিবে। ভোগাসক্তচিত্ত অজ্ঞ ব্যক্তি কোনো কার্য না করিলেও সে তাহার কর্তা হয়। চিত্ত হইতে এই সংসার আগত হইয়াছে, এই সংসার চিত্তময়, চিত্তেই এই সংসার অবস্থিত। চিত্ত যেরূপ হইবে, পুরুষও সেইরূপ হইয়া থাকে ইহাই সিদ্ধান্ত জানিবে। আত্মাই চিত্ত; তিনি চিত্ত হেতু এবং সেই চিত্ত হইতে সমুদয় কর্মময়ী, বাসনাময়ী ও মনোময়ী শক্তি সঞ্চয় করেন, সমুদয় দৃশ্য করেন, উপভোগ দ্বারা ধারণ করেন এবং উৎপাদন করেন। সমুদয় জীব ও সমগ্র পদার্থ ব্রহ্ম হইতেই সতত উৎপন্ন হইতেছে। পরমাত্মা হইতে সমুদয় ভাব অবগত হইয়া আবার তাঁহাতেই বিলীন হইতেছে।

চিত্তই জরা, মৃত্যু, মোহের অন্তর্ভূত ভাবনায় ব্যথিত হন। কমলরূপ তরুবনের অঙ্কুর, ইচ্ছা বিকৃতি ঐ চিত্ত, স্বীয় উৎপত্তি হেতু ভূত আত্মপদ বিস্মৃত হইয়া কল্পনাপ্রসূত অনর্থের হেতু হয়। কোষাকার বন্ধন প্রাপ্ত হইয়া চিত্ত কোষাকারে পরিণত হয়। শব্দাদি তন্মাত্রসমূহ উহার অবয়ব স্বরূপ; ঐ চিত্তই জরা মৃত্যুরূপ শাখাপরিবৃত সংসার বিষবৃক্ষ। যেমন ক্ষুদ্র বীজ মধ্যে প্রকাণ্ড বট বৃক্ষ অবস্থিত থাকে সেইরূপ আশপাশ বিধানকারী ফলবিহীন এই নিখিল সংসার ওই চিত্ত মধ্যে অবস্থিত থাকে। ঐ চিত্ত চিন্তারূপ অনলের শিখায় দগ্ধ, কোপরূপ অজগর কর্তৃক চর্বিত ও কামসমুদ্রের তরঙ্গে আহত হইয়া আত্মরূপ পিতামহকে (মূল কারণ) বিস্মৃত হইয়া যায়। শোকে বিলুপ্ত চৈতন্যও বিষয়ানলে পতঙ্গবৎ দগ্ধ হইতে থাকে। ঐ চিত্ত যখন স্বীয় নিবাস স্বরূপ এক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হয় তখন তদ্দেহ বিশেষের বিচ্ছেদ নিতান্ত কাতর হয়। বিষয়, দেহ ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি বিচিত্র শত্রুগণ মধ্যে কেমন বিশ্বস্ত হইয়া বাস করে। এই দৃশ্যপ্রপঞ্চময়তাই চিত্তের স্বরূপ বলিয়া জানিবে, ইহা ব্যতীত চিত্তের আর কোনো স্বরূপ নাই। এই জগৎপ্রপঞ্চ সমস্তই একমাত্র আত্মা এইরূপ বোধ না হইলে এই দৃশ্য জগৎ দুঃখপ্রদ হইয়া থাকে আর বোধ হইলে ইহা মোক্ষসুখ প্রদান করে। দ্রষ্টা ও দৃশ্যের মধ্যবর্তী তাহাই চৈতন্য বলিয়া জানিবে।

যখন চিত্ত কল্পনাকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পায় তখন উহা আপনার চিৎস্বরূপ ভুলিয়া যায় এবং জড়তা আসিয়া উহাকে আক্রমণ করে। যেমন চিত্রিত রাজমূর্তি কখনও ভীষণ যুদ্ধ করিতে পারে না, মৃতদেহ যেমন কোনো স্থানে ধাবিত হইতে পারে না, কৃত্রিম সূর্য হইতে যেমন কদাচ অন্ধকার নষ্ট হয় না, সেইরূপ অলীক ভ্রমোৎপন্ন চিত্ত কোনো কার্য করিতে পারে না। বাস্তবিক যাহা করে বলিয়া মনে হয় তাহা কেবল দেহমধ্যবর্তী প্রাণাদি বায়ুসমুদয়ের ক্রিয়া মাত্র। যেমন অন্ধকারে আলোক উপস্থিত হইলে অন্ধকার ক্ষয়প্রাপ্ত হয় সেইরূপ পরমাত্মার সাক্ষাৎকার সময়ে চিত্তের অস্তিত্ব থাকে না বলিয়া তথায় পৃথক রূপের চিত্তের প্রকাশ হয় না।

আমি আত্মা, এই জীবই আমি, এই জ্ঞানের নামই চিত্ত; এই চিত্তই অনাদি অনন্ত দুঃখের বিস্তার করিয়া থাকে, যদি চিত্তের উপশম ইচ্ছা করো তবে অগ্রে সেই চিত্তের বৃত্তিসমুদয়কে ধ্বংস করো তাহা হইলে সহজেই চিত্ত ক্ষয় হইবে।

ঘটের মধ্যে যেমন ঘটাকাশ সেইরূপ চিত্ত মধ্যেই সংসার। ঘট নাশে যেমন ঘটাকাশ থাকে না, সেইরূপ চিত্ত নষ্ট হইলে সংসার থাকে না। চিত্তের উচ্ছেদ নিমিত্ত পৃথক যত্ন করিতে হয় না, অজ্ঞান দূর করিতে পারিলেই চিত্তের উচ্ছেদ হয়। যতদিন অজ্ঞান-সমাচ্ছন্ন থাকা যায় ততদিন চিত্ত ঘনীভূত হইয়া থাকে। যখন হইতে অজ্ঞান অনুভব ধারণ করিতে থাকে, চিত্তও সেই সময় হইতে ক্ষীণ হইতে থাকে। উপদেশ দ্বারা চিত্তের কিছুই হয় না, চিত্ত মিথ্যা, যদি থাকে তাহাও বিচারে বিনাশী। চিত্ত যাহা করে তাহাই তুমি অনুভব কর, চিত্ত যাহা না করে তাহা তোমার অনুভব হয় না। চিত্তের যোগে আমরা স্বস্থান লাভে অসমর্থ হইয়া পক্ষিগণ যেমন ভ্রান্তিবশত জালে পতিত হয়, সেই প্রকার চিন্তাকালে বিমুগ্ধ ভাবে নিপতিত হইতেছি।

বাসনা : নিশ্চয়াত্মিকা অন্তরস্থিত মনোবৃত্তিই কর্তৃত্ব, ইহাকেই বাসনা বলা যায়। পুরুষ কোনো কার্য করুক বা না করুক, মনের যাদৃশ ইচ্ছা হইবে তদনুরূপ স্বর্গ বা নরক ফল অনুভব হইবে। যিনি তত্ব জ্ঞাত হইয়াছেন তাঁহার বাসনা শিথিল হইয়াছে, তিনি প্রাপ্ত কর্মফল সমুদয়কে আত্মা হইতে বিচ্ছিন্ন অনুভব করেন। বাসনাতেই এই জগৎজাল অবস্থিত। বাসনা-আকৃষ্ট চিত্তে অন্তরে কি না দর্শন করে? বাসনা যাহার হৃদয়ে কখনও স্থান পায় না, তিনি ত্রিভুবনকে সামান্য তৃণ বলিয়া বিবেচনা করেন। বাসনা ক্ষয় না হইলে কিছুতেই চিত্তের উপশম হইতে পারে না। বাসনা নাশ যে পর্যন্ত না হইবে তাবৎ তত্বজ্ঞান কিছুতেই হইতে পারে না, অথচ তত্বজ্ঞান, চিত্তনাশ ও বাসনা ক্ষয়, ইহারা পরস্পরেই পরস্পরের প্রকাশ্যে অসাধ্য হইয়া অবস্থান করিতেছে। বাসনাক্ষয়, চিত্তনাশ ও তত্বজ্ঞান ইহারা এক সময়েই ইষ্ট ফল প্রদান করিয়া থাকে যদি ইহাদের সকলের এক সঙ্গে উচ্ছেদ চেষ্টা করা হয়।

বুদ্ধি : বুদ্ধি জগৎব্যাপী নহে, নিশ্চয়ই কোনো সীমাবদ্ধ স্থান ব্যাপিয়া আছে, তাহা হইলে বুদ্ধি বস্তুবিশেষ, বুদ্ধি প্রত্যেকের ভিন্ন। বুদ্ধি কম বেশি সকলেরই আছে। যাহার বুদ্ধি কম তাহাকে লোকে নির্বোধ বলে, এই জন্য বুদ্ধির স্থানব্যাপকতা, শক্তি আছে, তাহা হইলে বুদ্ধি যে সাকার তাহাতে আর কোনো সন্দেহ করিবার কারণ নাই। বুদ্ধি ভালোমন্দ বিচার করে, উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট পছন্দ করে এবং নানা প্রকার নূতন বস্তুর আবিষ্কার করিয়া থাকে। যদি বিদ্যাহীন হয় এবং বুদ্ধি থাকে তাহা হইতে সে সকল কার্য করিতে পারে, আর যদি বুদ্ধি না থাকে তাহার বিদ্যা হয় না, যদি অনেক কষ্টে কিছু পরিমাণে হয় তাহা বিশেষ কার্যকর হয় না। বুদ্ধি জীব-শরীরের দর্পণস্বরূপ।

তৃষ্ণা : তৃষ্ণা মনুষ্যকে এত দগ্ধ করে যে অমৃত দ্বারাও সেই দাহ নিবারণ হয় না। তৃষ্ণাই মনুষ্যকে ভীত, দুঃখিত ও অন্ধ করিয়া রাখে। তৃষ্ণা অপ্রাপ্য বস্তুতেও আসক্ত হয়, অভাব না থাকিলেও বিষয় আকাঙ্ক্ষা করে এবং ইহা এক স্থানে স্থায়ী নহে। তৃষ্ণাই একমাত্র সংসার মধ্যে চির দুঃখ প্রদান করিয়া থাকে। অন্তঃপুরে যাহার অবস্থান তাহাকেও অতি দুর্গম স্থানে লইয়া যায়। তৃষ্ণাই আত্মতত্ব আবরণপূর্বক মানবের অজ্ঞানাধিক্য জন্মাইতেছে। তৃষ্ণাতেই মন গ্রথিত আছে; উভয়েরই বিচিত্র বর্ণ, শূন্যাশ্রয়, বিবিধ বিষয় রাগে রঞ্জিত, নানা প্রকার রূপবিশিষ্ট, শূন্য, অস্তিত্বহীন পদার্থ। তৃষ্ণাই মোহরূপ হস্তীকে শৃঙ্খলের ন্যায় বাঁধিয়া রাখিয়াছে; তৃষ্ণাই জরা মরণ দুঃখের আকর।

চিন্তা : চিন্তাত্যাগ করিলেই মানব সকল দুঃখ হইতে অব্যাহতি পায়। চিন্তা অনন্ত সময় পর্যন্ত সকল বিষয়েই আসক্ত থাকে। চিন্তা ছেদন করা দুঃসাধ্য হইলেও জ্ঞানীগণ বিবেকরূপ শাণিত খড়গ দ্বারা তাহাকে ছেদন করেন। যাবৎ তত্বজ্ঞানের উদয় না হয়, তাবৎ চিন্তা যাইতে পারে না, অথচ চিন্তার শান্তি না হইলে তত্বজ্ঞান জন্মাইতে পারে না। চিন্তার সহোদর অর্থ, কি প্রকারে ধনবান হইব, কোন উপায় অবলম্বন করিয়া অর্থ উপার্জন করিব, সেই চিন্তায় সকল মনুষ্যেরই দেহ জীর্ণ হইয়া যাইতেছে। চিন্তা চিরকালই অস্থির, একের পর আর এক চিন্তা কোথা হইতে আনয়ন করে তাহার কিছু ঠিক নাই, সেইজন্য চিন্তার শেষ নাই, চিন্তাশূন্য

মনুষ্য নাই। এমন কোনো দিন নাই যে দিন কোনো ব্যক্তি কোনো প্রকার চিন্তা করে নাই। যিনি চিন্তা না করেন তিনিই মহাসুখী। চিন্তায় শরীর জীর্ণ হয়, চিন্তার শেষ হইলে মুক্তির পথ সুগম হয়।

মায়া : মায়া জগদুৎপত্তি করিয়া থাকে, বিবেক এই মায়ায় আচ্ছন্ন থাকে। এই মায়া যে কি তাহা জানা যায় না। এই জগৎ অতি অদ্ভুত, বিচার করিয়া না দেখিলে মায়ার স্ফুরণ হয়, বিবেক দৃষ্টিতে কিছুই থাকে না। এই মায়ার স্বরূপ অবগত না হইলে ইহার মাহাত্ম্য অনুভূত হয় না। সংসার বন্ধন হেতু মায়া অতি আশ্চর্য, সেহেতু এই মায়া নিতান্ত অসতী হইলেও অতি সত্যবৎ অনুভূত হইয়া থাকে। এই সংসার-মায়া অত্যন্ত অভিন্ন, সেই পরমপদে বিস্তৃত ভেদ রচনা করিয়া থাকে। এই মায়ার পারমার্থিক সত্তা নাই, সেই প্রকার প্রদীপ্ত ভাবনাবলে তুমি তত্বচিত্ত হইয়া আত্মার বাস্তব স্বরূপ অবগত হইতে পারিলে সকল বিষয়ের মর্মার্থ বুঝিতে পারিবে। মায়া কোথা হইতে উৎপন্ন হইল এই প্রকার বিচার করিবার আবশ্যক নাই, আমি এই মায়াকে কিরূপে বিনষ্ট করিব, এই বিষয় বিচার করা উচিত। যখন এই মায়া ক্ষীণপ্রায় হইয়া একেবারে হস্তগত হইবে, তখন বুঝিতে পারিবে যে মায়া কোথা হইতে জন্মিল, ইহার আকৃতি কি প্রকার এবং কিরূপে নষ্ট হইল। বস্তুত এ মায়া অসতী, দেখিতে গেলে ইহাকে পাওয়া যায় না। এই যে মায়া আকৃতি বিস্তার পূর্বক সত্যবৎ প্রতিভাত হইতেছে, ইহা দোষ ব্যতীত কোনো গুণের জন্য নহে, অতএব ইহাকে বলপূর্বক বিনাশ করিয়া তাহার পর ইহার তত্ব অবগত হইবে। মায়া দ্বারা এই জীবসমূহ এই জগৎরূপ অতি মহৎ ইন্দ্রজাল বিস্তার করিতেছে। যাবৎকাল মূঢ় হইয়া আত্মার দর্শনে সমর্থ না হয় তাবৎকাল জলে আবর্তরাশির ন্যায় জীবগণ সংসারে ভ্রমণ করিয়া থাকে, যখন আত্মদর্শনে সমর্থ হয় তখন অসৎ দৃশ্য পরত্যাগ করিয়া সত্যসংবিৎ প্রাপ্ত হইয়া যথাকালে মায়াপাশ কাটাইয়া পরমপদ প্রাপ্ত হয়।

ঈদৃশ মায়াময় সংসারেও যাহাদের অসার সুখ ভাবনা, কাল তাহাদিগকেও ছেদন করিয়া থাকে। জগতে উৎপন্ন এমন কোনো বস্তু নাই যাহা কালের করাল গ্রাসে পতিত না হয়। কাল কোথাও বা গাঢ় অন্ধকারের ন্যায় শ্যমবর্ণ, কোথাও বা কমনীয় বর্ণ, কোথাও বা তদ্বিবর্জিত কার্য উৎপাদন করত অবস্থিতি করিতেছে। কালের গতি, স্থিতি, উদয় ও অস্ত কিছুই নাই। কেহ বুদ্ধির কৌশলে কালের মহিমা অবগত হইতে সমর্থ নহে এবং সমুদয় জীবলোকের মধ্যে একমাত্র কালই সমধিক বলবান।

লোকের দৃষ্টি রজোগুণে কলুষিত, তমোগুণ অনবরত বর্ধিত হইতেছে, সত্বগুণ দূরে পলায়ন করিয়াছে সেইজন্য তত্বজ্ঞান কাহারও না। জীবন অস্থির, মৃত্যু আগমনোন্মুখ, ধৈর্য বিফল, আসক্তি কেবল অসার বিষয়ে, সুখে মত্ত, বুদ্ধি মূর্খতা দোষে মলিন, শরীর বিনাশের বশীভূত, জরা এই শরীরে যেমন জড়াইতেছে, পাপ অনবরত স্ফূর্তি পাইতেছে, যৌবন যত্ন করিলেও থাকে না, সৎসঙ্গ দূরপরাহত সত্যের উদয় কোথাও নাই, অন্তঃকরণ মোহজালে আচ্ছন্ন, সন্তোষ দূরে পলায়ন করিয়াছে, উজ্জ্বল করুণাবৃত্তি উদিত হয় না, কেবল নীচতাই নিকটে আসিতেছে, ধীরতা অধীর হইয়াছে, সাধুসঙ্গ দুর্লভ হইয়াছে, বিষয়বাসনাই বন্ধনের হেতু হইয়াছে, মৃত্যু এই জীবসমূহকে নিত্য কোথায় লইয়া যাইতেছে। সিদ্ধগণও বিনষ্ট হন, তবে আমাদের মতো লোকের স্থায়িত্বে বিশ্বাস কি? ধ্রুবের জীবনও চিরস্থায়ী নহে, অমরকুলেরও মৃত্যু আছে, ব্রহ্মারও সমাপ্তি আছে, অগ্নিও চিরকালের নিমিত্ত নির্বাপিত হয়, হরিও সংহারদশা প্রাপ্ত হন, হরও অভাব প্রাপ্ত হন, কালের কাল নিয়তির বিলয় হয়, আকাশেরও বিনাশ হইয়া থাকে, মাদৃশ অসার লোকের প্রতি অবস্থা কি? এমন এক বস্তু আছেন যাহা আপনিই আপনাতে আপনার ভ্রমদায়িনী মায়া শক্তি দ্বারা বিশ্বভুবন দেখাইতেছেন। ত্রিলোক মধ্যে এমন কিছুই নাই যাহা তাঁহার মধ্যে নাই; স্বর্গে দেবগণ, পৃথিবীতে মনুষ্যগণ, পাতালে ভুজঙ্গগণ তাঁহারই কল্পমাত্র সমুৎপন্ন ও বিনষ্ট হইয়া থাকে।

সমুদ্রে পতিত হইলে যেমন অঙ্গে জল লাগিবে না এমন ভাবে ভাসা যায় না, তদ্রুপ সংসারে পড়িয়া ব্যবহার কার্য করিতে হইবে না এরূপ ভাবে থাকা যায় না। অনলের যেমন দাহহীন শিখা নাই, সেইরূপ রাগদ্বেষ শূন্য, সুখদুঃখ বিবর্জিত, সদনুষ্ঠানও সংসারে অসম্ভব। কেবল অস্তিত্বের অবসান তত্ববোধ যুক্তি ও উপাসনা ব্যতীত হয় না। এই অসার সংসার অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন এবং অজ্ঞান নাশে ইহারও অবসান হয়;

জগতে প্রকৃতপক্ষে অস্তিত্ব পুরুষেরই আছে, আর সমস্তই অস্তিত্বহীন। অখণ্ড চৈতন্য পুরুষের স্বরূপ এবং তিনি অদ্বিতীয়। পুরুষ শব্দে আত্মা—ব্রহ্ম, তিনিই জীবনরূপে অজ্ঞানবশে সংসার বদ্ধ হন; এবং অজ্ঞান ক্ষয়ে স্বরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হন।

যে ব্যক্তি যে বস্তু প্রার্থনা করে, তাহা প্রণালী অনুসারে যদি চেষ্টা করে, তাহা হইলে অবশ্যই সেই বস্তু তাহার প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ত্রৈলোক্যের আধিপত্য হইতে যে ইন্দ্রত্বের এত গৌরব, কোনো কোনো জীব বিশেষ পুরুষকার নামক প্রযত্নের ফলে সেই ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। কোনো জীব বিশেষ পুরুষকার নামক প্রযত্নের ফলে কমলাসনের ব্রহ্মপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। স্বীয় কর্মের ফল প্রাপ্ত হইলে, এই কর্মের এই ফল, এই প্রকার বাক্যই দৈব নামে প্রসিদ্ধ। পূর্বতন কুকার্য যেমন সৎকার্য দ্বারা বিনাশ হইয়া শুভে পরিণত হয়, সেইজন্য যত্নপূর্বক সৎকার্যে চেষ্টিত হওয়া কর্তব্য।

শরীরের মধ্যে যিনি কর্তা হইয়া কার্য সম্পাদন করেন তিনিই কর্মফল ভোগ করেন। যাহাকে দৈব বলে তাহা কর্ম, সেই কর্ম মন, সেই মন পুরুষ। অতএব পুরুষ বা আত্মা ভিন্ন সকলই অনিত্য। সুতরাং দৈব নাই ইহা নিশ্চয়। জীবের এই সংসার হইতে উদ্ধার হইবার কেবলমাত্র উপায় জ্ঞান। দান, তপস্যা, কঠোর ব্রত বা তীর্থ পর্যটন ইহারা উপায় নহে। এই সংসারে দুঃখই অনন্ত সুখ, অতএব সুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিবে না। বিবেক আশ্রয় করিয়া বৈরাগ্য অভ্যাস করিতে পারিলে এই ঘোর সংসার-নদী বা সাগর হইতে উদ্ধার হওয়া যায়। ধন, মিত্র, বান্ধব, দেশান্তর গমন, কায়ক্লেশ, কাতরতা অথবা কতকগুলি মন্ত্র উচ্চারণ করিলে সেই পদ প্রাপ্ত হওয়া যায় না, কেবল একমাত্র মনোজয়েই ওই পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শম, সৎসঙ্গ, বিচার ও আনন্দ এই চারিটি মোক্ষের চারি দ্বারপাল। প্রথম বৈরাগ্য, দ্বিতীয় মুমুক্ষা, তৃতীয় উৎপত্তি, চতুর্থ স্থিতি, পঞ্চম উপশান্তি, ষষ্ঠ নির্বাণ। যাহা প্রকৃত সত্য তাহার কারণ অর্থাৎ মূল নাই। যাঁহার কারণ নাই তিনিই পরমার্থ সৎ, সেই বস্তুই ব্রহ্ম। যেমন পদ্ম হইতে সরোবরের শ্রীবৃদ্ধি এবং সরোবর হইতে পদ্মের শ্রীবৃদ্ধি হয়, সেইরূপ জ্ঞান হইতে শম-দমাদির বৃদ্ধি এবং শম-দমাদি হইতে জ্ঞানের বৃদ্ধি হয়। আত্মার স্বরূপ আকাশবৎ নিরাকার এবং চৈতন্য স্বরূপ, তিনি জীবরূপ হইয়া জগৎ দর্শন করিতেছেন। এই জগৎদর্শন স্বপ্নদর্শনের তুল্য। তুমি আমি ইত্যাদি রূপ প্রতীয়মান জগৎসংসার স্বপ্ন উপমায় উপমেয়। জগৎদর্শন সত্য কিন্তু জগৎ মিথ্যা, যেমন স্বপ্নদর্শন সত্য কিন্তু স্বপ্নদৃষ্ট বিষয় সমস্ত মিথ্যা। এই জগতে যে জন্মগ্রহণ করে, সেই বৃদ্ধি পায়, সেই নষ্ট হয়, সেই মুক্ত হয় এবং সেই স্বর্গ বা নরক ভোগ করে।

পরমাত্মার সহিত একতা সিদ্ধি জ্ঞান যোগেই লাভ করা যায়, অন্য ক্লেশকর অনুষ্ঠানাদিতে তাহা হয় না। পরমাত্মা দূরস্থ নহেন, নিকটস্থও নহেন, সুলভ নহেন, দুর্লভও নহেন। সেই পূর্ণানন্দ ব্রহ্মকে নিজ শরীরেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। স্বরূপে অবস্থান ব্যতীত ইহার অন্য উপায় নাই। যিনি আত্মা যোগে সেই পরমাত্মাকে জানিতে পারেন তাঁহাকে আর মরণাদি আক্রমণ করিতে পারে না। কামাদি পরিত্যাগ ব্যতীত কিছু ফলদায়ী হয় না। রাগাদি বশীভূত হইয়া বঞ্চনা করিয়া যে ধর্ম উপার্জন করা হয় তাহা দান করিলে পূর্ব স্বামীই ফলভাগী হয়। রাগাদির বশীভূত হইয়া কোনো ধর্ম কার্য করিলে তাহাতে কিছুমাত্র ফল হয় না। তত্বজ্ঞান ভিন্ন ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হয় না। তত্বজ্ঞানের জন্য প্রথমে লোকে শাস্ত্রের অবিরোধী হইবে, যথাসম্ভব জীবিকায় সন্তুষ্ট থাকিবে, ভোগ বাসনা পরিত্যাগ করিবে, উদ্যোগী হইয়া সাধুসঙ্গ ও সৎশাস্ত্রের অনুশীলন করিবে। যে শাস্ত্রে তত্বজ্ঞানের কথা আছে তাহাই সৎশাস্ত্র।

পরমাত্মা অতি সন্নিকটে, আমাদের শরীর মধ্যেই চৈতন্য রূপে অবস্থিত আছেন। পূর্ব স্বভাব ও নিত্য চেতন আত্মার চেত্য দর্শন অর্থাৎ জগৎদর্শন নিবৃত্তি হইলে বহির্মুখী গতি রুদ্ধ হইয়া অন্তর্মুখী গতি উৎপন্ন হইলে, তাঁহার তৎকালীন যে পূর্ণাবস্থা প্রকাশ পায় তাহার নাম তত্ব-সাক্ষাৎকার। সেই পরাৎপর ব্রহ্মকে যিনি জানিতে পারেন তাঁহার হৃদগ্রন্থি অর্থাৎ মায়া মোহ বিচ্ছিন্ন হয়, সমুদয় সন্দেহ দূর হয় এবং সঞ্চিত কর্ম লয় প্রাপ্ত হয়। চিত্ত নিরোধ করিলে চেত্য (দৃশ্য) দর্শন লুপ্ত হয় না, একমাত্র দৃশ্য সকল মিথ্যা ভ্রান্তির পরিণাম এবং দৃশ্য মাত্রই মিথ্যা জ্ঞান হয়। যেমন রূপহীন আকাশে নীলাদি গুণ দেখা যায় তেমনই চিন্ময় ব্রহ্মে এই

ভ্রমজগৎ দৃষ্ট হইতেছে, এই জ্ঞানের উদয় হইলেই ব্রহ্ম স্বরূপ জ্ঞাত হওয়া যায়। দেখা যাইতেছে ও দেখিতেছি এই বোধের বিনাশ হইলে চৈতন্যমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে। এই যে বিপুল ব্রহ্মাণ্ড যাহা দেখা যাইতেছে ইহা কখনও উৎপন্ন হয় নাই, ইহা সেই নির্মল ব্রহ্মচৈতন্যেই কল্পিত অর্থাৎ তাঁহারই স্বরূপ। যখন এই জগৎ আদৌ উৎপন্ন হয় নাই তখন ইহার অস্তিত্ব কোথায়? যেমন আকাশে কদাচ বৃক্ষের সম্ভব হয় না সেই প্রকার জগৎ কিছুই নহে। যিনি বাহিরে রাগ, দ্বেষ ও ভয়াদির অনুরূপ ব্যবহার করিয়াও অন্তরে আকাশের ন্যায় স্বচ্ছ চিৎস্বরূপে অবস্থান করেন তিনি জীবন্মুক্ত। যাহা হইতে লোকের উদ্বেগ হয় না ও যিনি লোক হইতে উদ্বিগ্ন হন না এবং শোক বা আনন্দ যাঁহাকে আশ্রয় করেন না তিনিও জীবন্মুক্ত। যেমন জলপ্রবাহ জল ভিন্ন আর কিছু নহে, স্পন্দন বায়ু হইতে ভিন্ন নহে, আকাশ শূন্য হইতে ভিন্ন নহে, আলোক তেজ হইতে ভিন্ন নহে, সেইরূপ এই ত্রিভুবনও সেই পরম ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে। যাঁহা হইতে দৃশ্য জগৎ দৃষ্ট হয়, কালের উৎপত্তি হয়, তেজের প্রকাশ হয়, চেতনাদি যাহা কিছু জানিতেছ এই সকলই সেই ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছু নহে। যাঁহার প্রভাবে জানিতেছ ও বোধগম্য হইতেছে সেই জ্ঞানই তত্বজ্ঞান এবং এই জ্ঞানই ব্রহ্ম।

যেমন হিমের সহিত শৈত্যের পার্থক্য নাই, অগ্নির সহিত উষ্ণতার পার্থক্য নাই, আকাশের আকাশত্ব ব্যতীত পৃথক শূন্য পদার্থ নাই, সেইরূপ ব্রহ্মের সহিত জগতের পার্থক্য নাই। যে জগৎ, কারণের অভাববশত অগ্রে ছিল না, বর্তমানেও নাই, ভবিষ্যতেও থাকিবে না, তাহার আবার নাশ কোথায়? সেই আদি কারণ ব্রহ্ম, তিনিই কার্যরূপে বিশ্বাকারে অবস্থিত আছেন। যদিও অজ্ঞান, বিশ্বের কারণ হইতেছে, কিন্তু উহা হইতে বিশ্বের সৃষ্টি হইতেছে না। স্বপ্নকালীন বস্তু দর্শনের ও কার্য করার ন্যায় এই জাগ্রত অবস্থায় জগৎ দৃষ্ট হইতেছে। যেমন স্বপ্নে সমুদয় প্রত্যক্ষ হইলেও, সেই সকল কিছুই নহে সমস্তই ভ্রম, ব্রহ্মে জগৎরূপ বস্তু না থাকিলেও অজ্ঞানবশতই দৃষ্টিগোচর হয়। যাহা কিছু দেখা যাইতেছে, এই সমস্ত জগৎই পরমাত্মায় নিত্য অবস্থিত আছে, ইহা কখনও উদয় বা অস্ত প্রাপ্ত হয় না। যেমন সলিল দ্রবভাবে, বায়ু স্পন্দন রূপে, প্রকাশ প্রভার আকারে অবস্থান করে; সেই প্রকার ব্রহ্মও ত্রিভুবনাকারে অবস্থিত আছেন। যেমন স্বপ্নদ্রষ্টার অন্তরে বিজ্ঞানই নগরাদি রূপে পরিণত হয়, সেইরূপ স্বীয় আত্মাই ব্রহ্মে জগদাকারে শোভা পান। দৃশ্য থাকিলেই দ্রষ্টা থাকে এবং দ্রষ্টা থাকিলেই দৃশ্য থাকে, একটি থাকিলেই উভয়ের বন্ধন থাকে এবং একের অভাবে উভয়েই মুক্ত হয়। ভগবান আত্মভাব বিস্মৃত ও পরমপদ ত্যাগ করত সংসার-উপাধি, জীবভাব প্রাপ্ত হন। এই দৃশ্যজগৎ চিদাকাশ ব্যতীত আর কিছু নহে। যেমন নির্মল আকাশে মুক্তা ভ্রম হয়, সেইরূপ নির্মল আত্মায় জগৎ ভ্রম হয়। এই জগৎ অজ্ঞান দৃষ্টিতে স্থূল হইলেও গবাক্ষ ছিদ্রে নিপতিত সূর্য কিরণের সাহায্যে পরমাণু সমষ্টির ন্যায় জ্ঞানীর জ্ঞানদৃষ্টিতে পরমাণু অপেক্ষা সূক্ষ্মরূপে প্রতীয়মান হয়। যেমন গবাক্ষ দ্বারা নিঃসৃত সূর্য কিরণের অভাবে পরমাণুনিচয় দৃষ্টিগোচর হয় না, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত এই জগতের সূক্ষ্মভাব জ্ঞাত হওয়া যায় না।

জ্ঞান-শক্তি, ইচ্ছা-শক্তি এবং ক্রিয়া-শক্তি, এই তিনটি কারণ সূক্ষ্ম ও স্থূল শরীরের ধর্ম। এই স্থূল শরীর ক্রিয়ার আশ্রয়, সূক্ষ্ম শরীর ইচ্ছার আশ্রয়, কারণ শরীর জ্ঞানের আশ্রয়। চিৎ বা চেতনা ব্রহ্মের স্বরূপ এবং ব্রহ্মের এই বিশাল শক্তি আকাশ হইতে সূক্ষ্ম। এই দৃশ্য জগতে, আকাশে যেমন সূর্যালোক প্রতিভাত হয়, সেইরূপ জগৎও চিন্ময় ব্রহ্মে প্রকাশ পাইতেছে। চিত্তাকাশ, চিদাকাশ ও আকাশ এই ত্রিবিধ আকাশের মধ্যে চিদাকাশকে শূন্যতর জানিবে। ঐ চিদাকাশ কোষেই মৃত্যুর পর পুণ্যাত্মার আত্মা অবস্থান করে। তথায় গমন করিতে পারিলে সমস্ত অনুভব হয়। নিমেষ সময় মধ্যে চিত্ত দূর প্রদেশ গমন করে। চিত্তের সমুদয় বাসনা পরিত্যাগ করিয়া চিদাকাশে স্থিতিলাভ করিতে পারিলে নিঃসন্দেহে সর্বাত্মক পরমতত্ব লাভ হয়। যেমন কল্পনারচিত কোনো বস্তু অন্য লোকে দেখিতে পায় না, সেই প্রকার তত্বজ্ঞান ব্যতীত কেহ ব্রহ্ম দর্শন করিতে পারে না। জ্ঞানচক্ষু ফুটিলেই সমস্ত দর্শন হয়।

স্বপ্নে যেমন জাগ্রত দশার স্মৃতি বিলুপ্ত হয়, তেমনই মরণ হইল পূর্বস্মৃতি কিছুই মনে থাকে না। জীব ক্ষণকাল মিথ্যা মরণ মোহ অনুভব করিয়াই প্রাক্তন সংসার বিস্মৃত হইয়া অন্য রূপ অবলোকন করে। তখন চিদাকাশে আকাশরূপী জীব বিবেচনা করে এই আমি আধেয় হইয়া এই আধারে রহিয়াছি। একমাত্র চিদাকাশই স্বপ্রভাবে জগদাকারে দৃষ্ট হইয়া থাকে। দৃশ্য পদার্থ কিছুই নাই বলিয়া দ্রষ্টা ও দৃশ্যবোধ কিছুই নাই। যেমন জীবের মরণরূপ মোহের নিমেষ কাল মধ্যে ত্রিভুবনরূপ দৃশ্য প্রতিভাত হয়, তাহার পূর্বস্মৃতি অনুসারে অর্থাৎ জীব পূর্বে যেমন কালক্রমে জগৎ দেখিয়াছিল এবং পূর্বে পিতা, মাতা, বন্ধু, ভৃত্য, বর্ণ, জ্ঞান, চেষ্টা, ক্ষয়, উদয় এই সমস্ত যেমন যেমন ছিল, চিৎ শরীরে জন্মলাভ করিয়া ঐ সমুদয় সেইরূপই অনুভব করে। এই আমি জন্মলাভ, আমি বালক ছিলাম, ইনি আমার মাতা ও ইনি পিতা, এই প্রকার বোধ তাহার পূর্বস্মৃতি বলেই হইয়া থাকে এবং পরে পুষ্প হইতে ফলোৎপত্তির ন্যায় তখন তাহার পূর্বস্মৃতি হয়, তখন হরিশ্চন্দ্র যেমন এক রাত্রিকে দ্বাদশ বৎসর বোধ করিয়াছিলেন, তাহারও সেইরূপ হয়। যেমন চক্ষুরুন্মীলন করিলে নানা প্রকার রূপ দেখিতে পাওয়া যায়, সেই প্রকার জীবের মরণ ও মূর্ছার পরক্ষণেই অসংখ্য দৃশ্যজগৎ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। দিক, কাল, আকাশ, ধর্ম, কর্ম ও কল্পনান্তস্থায়ী অসংখ্য বস্তুনিচয় সেই চিদাত্মায় প্রস্ফুরিত হইয়া থাকে। জীব যাহা কখনও অনুভব করে নাই, দেখে নাই স্বপ্নে নিজ মৃত্যুর ন্যায় সেই সকলও তৎক্ষণেই স্মরণপথে উপস্থিত হয়। এই সংসারে অনন্ত বিস্মৃতিই মুক্তি। তত্বজ্ঞানই মুক্তির কারণ, ওই জ্ঞান জন্মিলে অসীম সংসারকে পরমব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই বোধ হইবে না।

তিনি একমাত্র হইয়া কার্য ও কারণের সারূপ্য আশ্রয় করত চিদাকাশে অবস্থান করিতেছেন। অগ্রে সমাধি প্রভাবে স্থূল দেহ পরিত্যাগপূর্বক অচেতা চিদ্রূপময়ী পবিত্র দৃষ্টি অবলম্বন করিয়া অমলা হইলে তাহার পর মর্ত্যবাসী জীব যেরূপ কল্পনাবলে অন্তরীক্ষে নগর দর্শন করে, সেইরূপ চিদাকাশস্থিত ব্যোমাত্মস্বরূপ সৃষ্টি দর্শন করে। এই প্রকার করিতে পারিলেই লোকে তখন স্বর্গ দেখিতে পায়। এই স্থূল দেহই সৃষ্টি দর্শনের প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে। ব্রহ্মই ব্রহ্মকে দেখিতে পান, যিনি ব্রহ্ম নহেন তিনি ব্রহ্মকে দেখিতে পান না। এই স্বভাব যে তিনি নিজ-কল্পিত সৃষ্টি জগদাদি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ব্রহ্মে জগতের কার্য বা কারণের উদয় নাই। অভ্যাসযোগে যাবৎ তোমার ভেদজ্ঞান দূর না হইবে তাবৎ তুমি ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্ম দর্শন করিতে পারিবে না। তুমি যখন নিজ দেহেই নিজের সংকল্পিত নগর দেখিতে পাইতেছ না, তখন কিরূপে অন্য দেহ আশ্রয় করিয়া অন্যের সংকল্পিত নগর দেখিতে পাইবে, সুতরাং দেহ ত্যাগ করিয়া চিন্ময়ের স্বরূপ আশ্রয় কর, তাহা হইলে তুমি ঐ সংকল্পিত নগর শীঘ্র দেখিতে পাইবে। সমাধিস্থ হইলেই নিজ দেহ এই স্থানে রাখিয়া, বিশুদ্ধসত্য স্বরূপ চিত্ত মাত্র অবলম্বন করিয়া তথায় যাইতে হয়। দেবদেবীর আকার ও দেহ আকাশময় জানিবে। মূর্তিশূন্য হইলেই আর কোনো প্রতিবন্ধক হয় না। ঐ সকল দেহ শুদ্ধ সত্বগুণে নির্মিত বলিয়াই চিৎ স্বরূপের প্রতিভাব মাত্র, সুতরাং পরমব্রহ্মের সহিত কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। যেমন গন্ধের সহিত বায়ু, জলের সহিত জল, অগ্নির সহিত অগ্নি, বায়ুর সহিত বায়ু মিলিত হয়, সেইরূপ তাহাদের মনোময় দেহ, অন্য মনোময় দেহের সহিত মিলিত হয়। মরণের পর জীবমাত্রেই আতিবাহিক দেহ পাইয়া থাকে, কিন্তু সেই আতিবাহিক দেহকে কেহই উৎপন্ন হইতে দেখিতে পায় না, লোকে কেবল মৃত জীবের স্থূল দেহই দর্শন করিয়া থাকে। যেমন স্বপ্ন দর্শন কালে গৃহে থাকিয়া উজ্জ্বল নগর দর্শন করা যায়, সেইরূপ চিৎপদার্থে এই সংসার অসৎ হইলেও সৎ ও উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হয়। যেমন আকাশে বায়ু ও অনিলে সৌরভ অদৃশ্যভাবে থাকে, সেইরূপ মৃত্যুর পর জীব জীবাকাশ হইয়া গৃহাকাশে অদৃশ্যভাবে অবস্থান করে। অঙ্গুষ্ঠমাত্র আকাশেই অনেক রাজ্য অবস্থিত কিন্তু ভ্রান্তিবশত উহা কোটি যোজনব্যাপী বলিয়া বোধ হয়। পরমাকাশের আদি, মধ্য ও অন্ত নাই, পরমাকাশ মহান আত্মায় অবস্থিত, ঐ নির্মল আকাশের সীমা নাই। প্রমাণ বর্জিত সেই পরমাকাশে এই বিশাল জগৎ এবং অণ্ডপ্রমাণ অপর অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড আছে।

চেষ্টা চিত্তের অনুগামী, চিত্ত চৈতন্যের অনুগামী। যাহার প্রকৃত আকার আকাশের সদৃশ কিরূপে তাহা অবরুদ্ধ হইতে পারে। চিত্তাকৃতি আতিবাহিক দেহ কোনো প্রকারে অবরুদ্ধ হইতে পারে না; জ্ঞান প্রভাবে

এই ভৌতিক শরীর আতিবাহিক দেহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই চিত্ত শরীর এত সূক্ষ্ম যে তাহা ত্রসরেণু মধ্যে অবস্থিত, গগনোদরে অন্তর্হিত, অঙ্কুর মধ্যে ও পল্লব মধ্যে রস রূপে অবস্থিতি করে, যথেচ্ছায় আকাশ যাইতে পারে এবং পর্বতের জঠরেও যাইয়া থাকে, এই শরীর অনন্ত আকাশব্যাপী হইয়াও পরমাণু হইয়া থাকে। প্রত্যেক চিত্তই ঐরূপ শক্তিসম্পন্ন এবং প্রত্যেক চিত্তই পৃথক পৃথক জগদভ্রম ধারণ করে। এই জগতে মরণ মূর্ছা সকলেই অনুভব করিয়া থাকে, ঐ মূর্ছা মহাপ্রলয়ের যামিনী স্বরূপ, সেই প্রলয় রাত্রি প্রভাব হইলে সকলেই পৃথক পৃথক সৃষ্টি বিস্তার করে। যাহার যেমন জ্ঞান ও যেমন কর্ম সে তদনুরূপ সৃষ্টি দর্শন ও অনুভব করে, প্রাক্তন সংস্কারই জন্মমৃত্যুর কারণ। মরণ মূর্ছার পরেই জীবের অন্তরে যে অল্প সৃষ্টিভাব উদয় হয় তাহাই সৃষ্টির প্রকৃতি। সূক্ষ্ম বুদ্ধিময় ইন্দ্রিয়পঞ্চক তাহাই জীবের আতিবাহিক শরীর; অনেক কল্প পরে সেই আতিবাহিক দেহ, আমি স্থূল এই কল্পনা দ্বারা পরিপুষ্ট আধিভৌতিকতা প্রাপ্ত হয়; তখন স্থূল দেহাশ্রিত চক্ষুরাদির বশবর্তিতাবশত তত্তদ্দেশকালগত পদার্থ সকল, বায়ুর স্পন্দন ক্রিয়ার ন্যায় তাহারই অধীনে তাহাতেই মিথ্যা ভাব উৎপন্ন হইয়া থাকে, এই প্রকার ভুবন ভ্রান্তি বৃথাই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, স্বপ্নে অঙ্গনা সম্ভোগের ন্যায় অনুভূত হইয়া অসত্য হইয়া যায়। জীব যেখানে মরে সেই স্থানেই তৎক্ষণাৎ তাহার উক্ত প্রকার জ্ঞান হয়, সুতরাং সেই স্থানেই ভুবন দর্শন ঘটিয়া থাকে। ঐ প্রকার আকাশসম সূক্ষ্ম জীব বাস্তব জন্মাদি শূন্য হইলে আগন্তুক দেহাদি ভাবনার বশবর্তী হইয়া জন্মিয়াছি, আমি জগৎ দেখিতেছি এই প্রকার বিভিন্ন বিবিধ ভ্রম অনুভব করে।

এই স্থূল বিশ্ব মনন ব্যতীত আর কিছুই নহে। যদি বল মন চঞ্চলস্বভাব আর স্থূল বিশ্ব স্থিরস্বভাব, বিচার করিয়া দেখ ইহাও চঞ্চল, ক্ষণভঙ্গুর। যাহাকে চিদাকাশ বলা হইয়াছে তাহাই মনন অর্থাৎ মনের আশ্রয়, যাহা চিদাকাশ তাহাই পরমপদ, যাহা জল তাহাই আবর্ত, যাহা দৃশ্য তাহাই দ্রষ্টা। মিথ্যারূপী অনাদি মায়া চিদাকাশে অথবা চিত্তাকাশে নাম রূপাদি সম্পন্ন বিবিধ বস্তু দর্শনকারী জীব ভাবের স্ফুরণ করাইয়া থাকে, চিত্তের সেই সেই স্ফুরণ এক্ষণে জগৎ। একমাত্র আমি, এই জ্ঞান থাকিলেই জগৎ শব্দ পরমার্থ স্বরূপে অনুভূত হয় কিন্তু এইরূপ জ্ঞান দ্বারা জগৎ শব্দ আরোপিত বলিয়া বোধ হয়। চিদবস্তু সর্বগামী এবং তাহাতেই যথার্থ জ্ঞানের উদয় আর তাহা আতিবাহিক ও সূক্ষ্ম, অতএব এমন কোনো বস্তু নাই যাহা দ্বারা তাদৃশ সূক্ষ্ম ও সর্বতোগামী আতিবাহিক দেহকে অবরোধ করিতে পারে।

এই জগৎ সমুদয় আত্মাই, ইহাতে দেহাদি কল্পনা কিরূপে হইতে পারে? যাহা কিছু দেখিতেছ সমুদয়ই আনন্দরূপ চিন্ময় ব্রহ্ম। আধিভৌতিক জ্ঞান হইলে দেহও তুলাবৎ লঘুতা প্রাপ্ত হয়। জ্ঞানোদয় হইলে এই স্থূল দেহ আকাশ-গমন যোগ্য হইয়া থাকে। রজ্জুতে ভুজঙ্গ ভ্রমের ন্যায় এই স্থূল দেহ-অনুভব ভ্রান্তি মাত্র। যেমন স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু জাগরণের পর কোথায় যায় জানা যায় না, সেইরূপ বিচারক্ষম জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের নিকট এই আধিভৌতিক দেহ অসত্য হইয়া যায়। স্বপ্ন ও জগৎ পদার্থ সমস্তই এক প্রকার এ বিষয়ে সন্দেহ নাই; জাগ্রত হইলে যেমন স্বপ্নের সমস্ত অসত্য হইয়া যায়, সেইরূপ জ্ঞান হইলে এই স্থূল দেহাদি আকাশে পরিণত হয়।

আতিবাহিক দেহ প্রাপ্ত হইলে আধিভৌতিক দেহের অবস্থা কিছুই মনে থাকে না। যেমন পত্র পুষ্প ফলরূপে বৃক্ষ একই পদার্থ সেই প্রকার এই অসীম জগৎ সমস্ত পদার্থ সহিত একই ব্রহ্ম। যেমন বরফ জল হইতে পৃথক নহে, স্ফটিক শিলা হইতে পৃথক নহে, সেইরূপ জগৎও ঈশ্বর হইতে ভিন্ন নহে। সর্বপ্রাণীর অন্তরে যুগপৎ সে পরমব্রহ্মে ব্রহ্ম মাত্র; স্বরূপের যে জ্ঞান তাহাই জগৎ ও আমি নানা প্রকারে ভাসমান হয়। স্ফটিক শিলা হইতে অভিন্ন এবং আলোক দীপ হইতে অভিন্ন হইলেও পৃথক সন্নিবিষ্ট বলিয়া বোধ হয় সেইরূপ চিন্ময় পরমেশ্বর এই জগৎ ও আমি অভিন্ন রূপ দৃষ্ট হয়। যেমন জলে তরঙ্গ উঠিতেছে অথচ এই তরঙ্গ জল ভিন্ন আর কিছুই নহে, সেইরূপ পরমেশ্বরে এই সৃষ্টিপ্রপঞ্চ উত্থিত ও বিলীন হইতেছে তাহা হইতে পৃথক কিছুই নহে। যেমন তেজ ও আলোক অভিন্ন, কেবল ভেদ মাত্র, সেই প্রকার চিদব্রহ্মে প্রকার ভেদ এই

বিশ্ব। যেমন, হস্ত পদাদি দেহ হইতে ভিন্ন নহে সেইরূপ ব্রহ্ম জগৎ ছায়া নহে। যেমন অগ্নির উষ্ণতা, তুষারের শীতলতা, আত্মার জ্যোতি, মনের চঞ্চলতা, জীবত্বও সেইরূপ।

এই বিশ্ব দীর্ঘ স্বপ্ন বলিয়া জানিবে। এই বিশ্বরূপ স্বপ্নপুরে দর্শক যাহাকে পুরবাসী নরগণ বলিয়া জানে, তাহার নিকট ক্ষণকালের জন্য সে নর বলিয়া প্রতিভাত হয়। দ্রষ্টার স্বরূপ চৈতন্য স্বপ্নাকাশের অন্তরে অবস্থিত; সেই চৈতন্য স্বপ্নদ্রষ্টার বাসনার আধার চিত্তের সহিত এক হইয়া প্রকাশ পায়। সেই চৈতন্যের ঐক্য প্রভাবেই নরত্ব বোধ হয়। এই জগৎ সৎ নহে, অসৎও নহে, কেবল ভ্রান্তিমাত্র বিরাজ করে। এই ব্রহ্মই জগৎ, তন্মধ্যে সৃষ্টি নামিকা এই ভ্রান্তিই রহিয়াছে। যেমন জলে তরঙ্গ তেমনই ব্রহ্মে সৃষ্টিসূর্য উদয় হইলে ত্রসরেণু সকল ভ্রমণ করিতেছে দেখা যায়, সেইরূপ পরমাত্মাকাশে এই ব্রহ্মাণ্ড রূপ ত্রসরেণু সকল ভ্রমণ করিতেছে। সর্বগামী ব্রহ্ম, যে স্থানে যেরূপ বাসনা উদিত হয় স্বপ্নলব্ধের ন্যায় তথায় সেইরূপ দৃশ্য হন। আত্মা সর্বব্যাপী ও সর্বশক্তিমান; দৃঢ় অভিনিবেশ-বাসনায় যখন যে শক্তির উদয় হয় তখন তাহারই অনুরূপ দৃশ্য হন, অবস্থিতি করেন ও প্রকাশিত হন।

মনুষ্য ত্রিবিধ—মূর্খ, ধারণাভ্যাসী ও যুক্তিবান। অভ্যাসবশে যাহারা ধারণানিষ্ঠ হইয়াছে ও যাহারা যুক্তিযুক্ত তাহারা সুখে দেহ পরিত্যাগ করে। যাহার ধারণা অভ্যস্ত হয় নাই ও যুক্তিযুক্ত নহে সেই মূর্খ। বিষয়াসক্ত ব্যক্তি বাসনার আবেশে বশীভূত হইয়া মৃত্যুকালে অশেষ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে, দিক সকল অন্ধকারময় দেখে, চারিদিক গাঢ় মেঘাচ্ছন্ন দেখে, দিবাতেও তারার উদয় দেখে; তখন তাহার মর্মব্যথায় বসুধাকে আকাশের ন্যায় দেখে, আকাশকে বসুধার ন্যায় দ্যাখে, কখনও আকাশে নীত, কখনও অন্ধকূপে পতিত বোধ করে, কিছু বলিবার ইচ্ছা থাকিলেও বাক্যের জড়তাবশত কিছুই বলিতে পারে না, মনে করে অনবরত ঊর্ধ্ব হইতে পড়িতেছে ও উঠিতেছে, স্বীয় নিশ্বাসধ্বনি শ্রবণ করিয়া ব্যাকুল হয়, স্মৃতিশক্তি ক্ষীণ হইয়া যায়, পূর্বাপর থাকে না।

যাহার এক বিষয়ে অত্যন্ত অনুরাগ তাহার বিষয়গতি হয়; এক বস্তুতে অত্যাসক্ত হইলে অন্য বিষয়ের জ্ঞান বিনষ্ট হইয়া যায়। মূঢ় ব্যক্তি কেবল ইহলোকের আত্মনাশের নিমিত্ত ও পরলোকে দুঃখ ভোগের নিমিত্ত জীবন ধারণ করে। যে ব্যক্তি স্বীয় আত্মদর্শনে অসমর্থ, তাহার জীবন মরণ একই কথা। আত্মা সর্বাত্মক, এই হেতু যখন উহার সাক্ষাৎ হয় তখন কেবল তিনিই অবশিষ্ট থাকেন, যাহা কিছু সমুদয় সেই আত্মা, অপর কিছুই থাকে না। এই আত্মা পরমাকাশ ও সূক্ষ্ম বলিয়া ইহা লক্ষ্য হয় না, সর্বাত্মক বলিয়া উহা কদাচ শূন্য হয় না, তথাপি নাই বলিয়া উহার অপলাপ করা যায় না, কারণ আছে কিংবা নাই ইহা যিনি বলেন বা বোধ করেন তিনিও সেই আত্মা। যেমন সুবর্ণ হইতে যত প্রকার অলংকার প্রস্তুত হয়, ততই ভিন্ন ভিন্ন নাম হইয়া থাকে কিন্তু সুবর্ণ একই। কোনো প্রকার যুক্তি দ্বারা আত্মার অসত্তা প্রতিপাদিত হইতে পারে না। কর্পূর যেমন সিন্ধুক মধ্যে আবৃত থাকিলেও গন্ধ দ্বারা উহা প্রত্যক্ষ হয়, সেইরূপ প্রত্যেক রূপেতে আচ্ছন্ন থাকিলেও সর্বময় আত্মা প্রত্যক্ষ গোচর হন। চিৎ ও দেহ পরস্পর অভিন্ন, তিনিই ইন্দ্রিয়গণের সার, অতএব তিনিই প্রত্যক্ষ, তিনিই দৃশ্যরূপ সমুত্থিত হন বলিয়া প্রত্যক্ষ। যাবৎকাল বলয়জ্ঞানে সত্তা থাকে, তাবৎকাল সুবর্ণ জ্ঞান থাকে না; সেই প্রকার যাবৎকাল দৃশ্য জ্ঞান থাকে, তাবৎকাল দর্শন অর্থাৎ আত্মচৈতন্য জ্ঞান থাকে না; যেমন বলয় জ্ঞান নাশ হইলে সুবর্ণ জ্ঞান, সেইরূপ দৃশ্যজাল তিরোহিত হইলেও সেই এক পরমব্রহ্ম পরমেশ্বর প্রতিষ্ঠিত হন। যেমন বীজের মধ্যে বৃক্ষ অতি সূক্ষ্ম আকার তুল্য সেই রূপ ব্রহ্মের অন্তর্গত জগৎ ও চিৎ অতি সূক্ষ্ম। এই বায়ুসম চঞ্চল জগৎ চৈতন্য ভিন্ন অন্য কিছুই নহে, একমাত্র আত্মা আভাসরূপে সর্বত্র সর্বপ্রকারে প্রকাশমান রহিয়াছেন, তিনি ভিন্ন জগতে কোনো পদার্থ নাই।

তিনি আপনাকে গোপন করিতে অশক্ত হইয়া ছিদ্ররূপে অণু বিস্তারপূর্বক তদ্দ্বারা এই জগৎ আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছেন। হস্তী যেমন দূর্বাক্ষেত্রে লুকাইয়া থাকিতে পারে না, সেই পরমব্রহ্ম আকাশাত্মা কোনো স্থলেই অপ্রকাশিত থাকিতে পারেন না, আকাশ সদৃশ শরীরবিহীন চিত্তই স্বীয় অন্তরে ত্রিজগৎ ধারণ করিতেছেন, চিত্তই অহংকার রূপে দেহাতীত ব্যাপ্ত আছেন। যাহা চিত্তের চিদভাগ অর্থাৎ চৈতন্য ভাগ

তাহাই সর্বপ্রকার কল্পনার বীজ, যাহা জড় ভাগ তাহাই ভ্রান্তিময় জগৎ; চিন্ময় ব্রহ্ম যখন সর্বময় তখন এই সমস্ত জড় পদার্থ উক্ত ব্রহ্ম স্বরূপ বলিয়া চিন্ময় বলিতে হইবে। এই জীব সমুদয় ব্রহ্ম, ভ্রান্তি জ্ঞানে পৃথক, বলিয়া বোধ হয়। জীবদেহ পরম পদ হইতে উৎপন্ন পুষ্প ও সৌরভ পরস্পর অভিন্ন, যেমন বৃক্ষে নানাবিধ পল্লবের উৎপত্তি ও অবস্থিতি, সেইরূপে ব্রহ্মেই সহস্র সহস্র জীবদেহের উৎপত্তি ও তাহাতে স্ফূর্তি হইতেছে। যেমন বসন্তকালে নূতন নূতন অঙ্কুরের উদ্ভব হয়, সেইরূপ অদ্যাবধি জীবসমূহ সেই ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত হইতেছে এবং তাহাতেই বিলীন হইতেছে। যেমন বহ্নি ও উষ্ণতার পৃথক সত্তা নাই সেইরূপ জীব ও মনের পৃথক সত্তা নাই। যে স্থানে যাহার বাসনা যেরূপ আরোপিত হয়, তথায় সেইরূপ তাহা ফল রূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যেমন বীজ মধ্যে ফল, পুষ্প, লতা, পত্র, শাখাদিসহ বৃক্ষ অবস্থান করে, সেই রূপ ব্রহ্ম মধ্যে এই জগৎ সমুদয় অবস্থিত। যেমন সমুদ্রে তরঙ্গাকারে জলই আবর্তিত আছে, যেমন সাগরে জল ব্যতীত আর কিছু নাই; সেইরূপ এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় সত্তা আর কিছুই নাই। জ্ঞানাবৃত পরমব্রহ্মই চিত্ত ও জীব জানিবে, ব্রহ্মই জ্ঞানাবৃত হইয়া আপনাকে জীব রূপে প্রকাশ করিতেছেন।

মেঘের সহিত বায়ুর যেমন সম্বন্ধ, শরীরের সহিত আত্মার সেইরূপ সম্বন্ধ। আত্মা কোথাও গমন করেন না, দেহ ক্ষয় হইলে অনন্ত আকাশে বিলীন হন অর্থাৎ পরমাত্মায় অবস্থান করেন। দেহ কেবল মৃত্যুরূপ পট দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে। আত্মার তিরোধানই মরণ শব্দে অভিহিত হয়। সুবর্ণ নির্মিত প্রতিমা যেমন সুবর্ণ হইতে পৃথক নহে, জাগ্রত ও স্বপ্ন এই দুই অবস্থার ক্রিয়াও তদ্রূপ চিত্ত হইতে পৃথক নহে। যেমন সমুদ্রের উর্ধ্বে ও অধোদেশে কিছু নাই কেবল তাহার মধ্যভাগে জল থাকে, তেমনই পরমব্রহ্মের আদি ও অন্ত নাই। অব্যক্ত পূর্ণ চৈতন্যস্বরূপ সেই পরম পদের মধ্যভাগে এই জগৎ দৃষ্ট হইতেছে। এই যে সৃষ্টি দেখিতেছ ইহা ব্রহ্মে ব্রহ্ম অবস্থিতি করিতেছেন, এই সৃষ্টি সেই জন্য ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। বৃহ্ম হতে পৃথক আকার ধারণ করে, কিন্তু তাহা পদার্থ একই। সর্বপ্রকার পদার্থময় এই বিশ্বকে সৎ স্বরূপ ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে, যেহেতু অনন্ত ব্রহ্মই সর্বপ্রকারে সর্ব রূপে প্রতিভাত হন।

সমস্ত পদার্থের শক্তি, দুগ্ধে ঘৃতের ন্যায়, মৃত্তিকায় ঘটের ন্যায়, সূত্রে তুলার ন্যায় ও বীজে বৃক্ষের ন্যায়, আত্মাতে অবস্থিত আছে। ঐ শক্তি সমুদয় ক্ষীরাদি হইতে ঘৃতাদির ন্যায় আত্মা হইতে প্রকাশিত হইয়া ব্যবহার দশা প্রাপ্ত হয়। এই জগৎ বাস্তবিক বিরচিত নহে, জলতরঙ্গবৎ উহা স্বতঃ সম্ভূত। এই জগতের কেহই কর্তা ভোক্তা বা বিনাশয়িতা নাই। আত্মা কেবল সাক্ষী মাত্র হইয়া অবস্থান করিতেছেন। যেমন প্রদীপ থাকিলেই আলোক উদ্ভূত হয়, সূর্যোদয় হইলে দিবসের আবির্ভাব হয় এবং পুষ্প থাকিলেই সৌরভ বিস্তৃত হয়, সেইরূপ জগৎও স্বতঃ সম্ভূত। আলোকাদি প্রকাশে দীপাদির যেমন কোনো চেষ্টাই নাই সেইরূপ এই জগৎ সম্পাদনে ঈশ্বরের কোনো চেষ্টাই নাই; যাহা কিছু পরিদৃষ্ট হইতেছে তৎসমুদয়ই আভাস মাত্র, উহা সমীরণের স্পন্দনবৎ সৎও নহে, অসৎও নহে। যেমন আকাশে তারকারূপ কুসুমরাশি কখনও প্রকাশিত, কখনও অপ্রকাশিত ও কখনও অল্প প্রকাশিত হইয়া থাকে, সেই প্রকার যাহা আত্মায় আত্মাস্বরূপ তাহা কিরূপে নষ্ট হইবে?

এক ব্রহ্ম হইতে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বা অসংখ্য এই জীব পূর্বে কতই জন্মিয়াছে,. এখনও জন্মিতেছে, পরেও জন্মিবে। ঐ জীবসমূহ নিজ বাসনা দশার আবির্ভাবে বিবশ ও অতি বিচিত্র বিবিধ দশায় আপনিই নিপতিত হইয়া নিরন্তর চতুর্দিকে, দেশে দেশে ও জলে জলে জলবুদ্বুদের ন্যায় উঠিতেছে ও বিলীন হইয়া যাইতেছে। এই জীবসমূহের কেহ কেহ কৈবল্য প্রাপ্ত হইয়াছে, কেহ কেহ সহস্র কল্প কেবল বারংবার জন্মগ্রহণ করিতেছে, কেহ কেহ এক যোনিতেই অবস্থিত, কেহ বা অন্য যোনি প্রাপ্ত হইয়াছে, কেহ কেহ নারকী হইয়া দুঃসহ দুঃখ সহ্য করিতেছে, কেহ বা মত্ত হইয়া কিঞ্চিৎ সুখ ভোগ করিতেছে; কেহ সূর্য, কেহ ইন্দ্র, কেহ বরুণ, এবং কেহ ব্রহ্মা, কেহ বিষ্ণু, কেহ মহেশ্বর হইয়া রহিয়াছেন, কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ ক্ষত্রিয়, কেহ বৈশ্য, কেহ শূদ্র হইয়া রহিয়াছে, কেহ চণ্ডাল, কেহ কোল, কেহ ভিল, কেহ নাগা হইয়া রহিয়াছে, কেহ তৃণ, কেহ ফল, কেহ পতঙ্গ, কেহ কীট হইয়া জলে স্থলে রহিয়াছে, কেহ কেহ শাল, কদম্ব, জম্বীর,

তাল ও তমাল বৃক্ষ হইয়া অবস্থিত রহিয়াছে, কোনো কোনো জীব বৈভবশালী, কেহ ভূপতি, কেহ মন্ত্রী, কেহ সামন্ত হইয়া রহিয়াছে, কেহ চীরাম্বরধারী মৌনাবলম্বী মুনি হইয়া অবস্থিত, কেহ নাগ, কেহ অজগর সর্প, কেহ কৃমি, কেহ পিপীলিকা হইয়াছে, আবার কেহ সিংহ, কেহ ব্যাঘ্র, কেহ হরিণ, কেহ মহিষ, কেহ গাভী, কেহ ঘোটক, কেহ হস্তী, কেহ ছাগ, কেহ মৃগ হইয়া রহিয়াছে, কেহ বায়ু, কেহ আকাশ হইয়া রহিয়াছে, কেহ কেহ জীবন্মুক্ত হইয়া পরম কল্যাণভাজন হইয়া বিচরণ করিতেছে, কেহ চিরন্মুক্ত, কেহ বা পরমাত্মায় পরিণত হইয়াছে, কাহারও মুক্তিলাভের অনেক বিলম্ব, কোনো কোনো জীব বিষয়লম্পট কেহ বা আত্মার মুক্তির প্রতি দ্বেষ করিতেছে, কেহ কেহ বিশাল গিরি হইয়া রহিয়াছে। কেহ কেহ মহা বেগবতী নদী হইয়া রহিয়াছে, কেহ কেহ সমাধি পর্যন্ত লাভ করিয়াছে। এই সকল স্বীয় বীর বাসনা বলেই আবদ্ধ ও বিবশ এই প্রকার অবস্থান করিতেছে। জীবসমূহ বাসনারূপ শরীরাদি ধারণ করত আশপাশ দ্বারা আবদ্ধ হইয়া বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে পক্ষীগণের ন্যায় এক শরীর হইতে অন্য শরীরে গমনাগমন করিতেছে।

কেহ কেহ আত্মদর্শনের শক্তি প্রাপ্ত হইয়াও তুচ্ছ বুদ্ধিতে বিফলমনোরথ হইয়া অধোগামী হয় এবং তাহার পর নরকে গমন করে; কেহ বা ঐ শক্তি বলে দেবভাব প্রাপ্ত হইতেছে। এই ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে জীবগণ যাদৃশ্য ব্যবহার সম্পন্ন হইয়া রহিয়াছে, আকৃতি ও প্রকৃতিতে বৈলক্ষণ্য প্রাপ্ত হইয়া অসংখ্য জীব তাদৃশ অবস্থান করিতেছে। সেই পরমব্রহ্ম হইতে অসংখ্য জীবরাশি অনবরত নির্গত হইতেছে। এই জীবরাশি দীপ হইতে আলোকের ন্যায়, সূর্য হইতে মরীচির মতো, উত্তপ্ত লৌহ হইতে কণার ন্যায়, অগ্নি হইতে স্ফুলিঙ্গের ন্যায়, কাল হইতে ঋতু বিভাগের ন্যায় এবং কুসুম হইতে সৌরভের ন্যায়, বর্ষা জলপ্রবাহ হইতে তুষারের ন্যায় এবং সাগর হইতে তরঙ্গের ন্যায়, সেই পরমপদ হইতে অবিরত উৎপন্ন হইতেছে এবং এই দেহপরম্পরা ভোগ করত যথাকালে আবার সেই পরমপদে লীন হইতেছে।

এই জগৎ এক প্রকার দীর্ঘ স্বপ্ন; দেখিতে গেলে উহা ভ্রান্তিদৃষ্ট দ্বিতীয় চন্দ্রের ন্যায় মিথ্যাই প্রতিপন্ন হইবে। যাহার অজ্ঞান নিদ্রা ভাঙিয়াছে এবং বাসনা সমূহও বিগলিত হইয়াছে, তাদৃশ প্রবুদ্ধ চিত্ত ব্যক্তি এই সংসারে স্বপ্ন দেখিতে গেলে দেখিতে পায় না। মোক্ষ পদ প্রাপ্ত হওয়ার পরেও জীবগণের স্বভাব কল্পিত এই সংসার পরমাত্মায় সর্বদা সূক্ষ্মরূপে বিলীন থাকে। নিখিল জগৎ একমাত্র ব্রহ্ম স্বরূপ, ইহাতে আবার সুখ দুঃখ কি যাহা অসৎ তাহার আবার বৃদ্ধি কি প্রকার? বৃদ্ধি যখন নাই তখন হ্রাসের কারণ নাই। অতীতে ও ভবিষ্যতে যাহার অস্তিত্ব নাই বর্তমানেও তাহা সেইরূপ অস্তিত্ববিহীন। মৃত্তিকারাশিতে যেমন ভাবী ঘট বিদ্যমান, সেইরূপ পরমব্রহ্মেও আরও কত ভাবী জীব অবস্থিত রহিয়াছে। বৃষ্টি যেমন জল হইতে পৃথক নহে, এই সৃষ্টি সমুদয়ও সেইরূপ পরমব্রহ্ম হইতে পৃথক নহে, এই সংসার মনেরই বিকাশমাত্র, যেমন চন্দ্র হইতে উৎপন্ন চন্দ্র কিরণ। সংকল্প দৃঢ় করাই মুক্তিলাভের একমাত্র উপায়, এই জগৎ সংকল্প ব্যতীত আর কিছুই নহে, দুঃখ ব্যতীত ইহাতে সুখ কদাচ নাই। সংকল্প দ্বারা সংকল্পকে এবং মন দ্বারা মনকে ছেদন করিয়া কেবল স্ব আত্মাতে অবস্থিতি কর, তাহা হইলে নিখিল সংসার দুঃখ সমূলে বিনষ্ট হইবে। সংকল্প, মন, চিত্ত, বুদ্ধি, বাসনা ও জীব একই পদার্থ, কেবল নামমাত্র প্রভেদ।

সকল পদার্থে যখন বাধা বিদ্যমান, তখন ভাবনা কোথায় থাকিবে? সত্য বলিয়া যাহার উপর আস্থা ছিল, তাহা যদি অসত্য হইল, তবে বাসনা কি প্রকারে থাকিবে? ভাবনা ক্ষয় হইলে আত্মলাভ সিদ্ধি হয়। অভ্যাস বলে যখন দৃশ্য পদার্থের প্রতি অবহেলা দৃঢ়তর হইবে, তখন জানিবে সকলেই অসৎ। পরমাত্মা উদাসীন বলিয়া কিছুই ভোগ করেন না, আবার সকলেরই প্রকাশকারী বলিয়া ভোগ করেন এবং ক্রিয়াও করেন; আত্মাই আত্মাকে জানেন। বাসনা ক্ষয়কেই মোক্ষ কহে। যাঁহার মন বাসনাশূন্য হইয়াছে তাঁহার প্রাণায়ামকর্ম, সমাধি বা জপ কিছুই প্রয়োজন নাই। আত্মসাক্ষাৎকার ভিন্ন জগতে এমন কোনো সুখ নাই যাহাতে একেবারে দুঃখ নাই। বহ্নিশিখার প্রান্তে যেমন কজ্জল অবস্থিত সেইরূপ সকল সুখের অন্তে দুঃখ অবস্থিত।

তুমি যে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ দেখিতেছ ইহা সেই পরমব্রহ্মের প্রকাশ মাত্র, বাস্তবিক কিছুই নহে। মনোময় দেহই সুখ দুঃখের আকর, মাংসময় দেহ নহে। জগতের উৎপত্তি ও বিনাশ কিছুই নাই, উহা ভ্রান্তি

মাত্র। প্রাণীগণেরই আত্মা জাগ্রত স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই ত্রিবিধ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, উহাতেও দেহ কারণ নহে, অর্থাৎ দেহ উহার কিছুই প্রাপ্ত হয় না। আত্মাই জীবভাব প্রাপ্ত হইলে আত্মাতেই দেহভাব প্রকাশ হইতে থাকে, বিচার করিয়া দেখিলে পৃথক দেহ প্রকাশ হয় না। চিৎশক্তির সর্বগামিত্ব আছে বলিয়া অপর মনোময় জগতে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। কদলী বৃক্ষের আবরণকোষের ন্যায় জগৎসমূহ বিরাজমান আছে। ব্রহ্ম বাহ্য ও আন্তর অখিল জগৎপুঞ্জের অদূরবর্তী, অর্থাৎ সর্বত্রই সমভাবে বিরাজমান আছেন। ইতস্তত বিস্তীর্ণ পত্রসমূহ দ্বারা কদলী স্তম্ভ যেরূপ প্রকাণ্ড বলিয়া লক্ষিত হয়, ব্রহ্মও সেইরূপ জগৎসমূহ দ্বারা প্রকাণ্ড। যেমন কদলী তরু ও পত্র সমূহে কোনো পার্থক্য নাই, সেইরূপ ব্রহ্মতত্ব ও সৃষ্টি সমূহে কোনো পার্থক্য নাই; যেমন একমাত্র বীজই জল হইতে বৃক্ষাদি ভাব প্রাপ্ত হইয়া পুনর্বার বীজরূপে পরিণত হয়, সেইরূপ একমাত্র ব্রহ্ম অজ্ঞানবশত মনোরূপে পরিণত হইয়া পরে জ্ঞানবলে পরমব্রহ্ম রূপে পরিণত হইয়া থাকে। সরস বৃক্ষ বীজ যেমন বীজগত রসের সাহায্যে ফল রূপে প্রকাশিত হয়, সেইরূপ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন জীবই জগদাকারে প্রকাশিত হয়। বীজ বীজাকার পরিত্যাগ করিয়া বৃক্ষ ও ফল ভাব প্রাপ্ত হয়, কিন্তু ব্রহ্ম স্বকীয় আকৃতি ত্যাগ না করিয়া জগদভাব ধারণ করেন। বীজ ফলাকারে বিদ্যমান থাকে, বীজের আকৃতি অনুসারে সমুদয় অঙ্কুরাদি উৎপন্ন হয়, কিন্তু ব্রহ্মের কোনো প্রকার আকৃতি নাই। সুতরাং বীজের সহিত ব্রহ্মপদের তুলনা হইতে পারে না।

চিৎস্বপ্নকালে স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থ সত্যরূপে অনুভব করে, চিদাণুর মধ্যে সূক্ষ্ম জগদাকার বাসনা অবস্থিত, যেমন বীজের মধ্যে পত্র, লতা, পুষ্প ও ফলের অণু বিদ্যমান থাকে। চিৎ ও জগৎ পরস্পরের অন্তরে প্রবিষ্ট, জীবের বীজস্বরূপ পরব্রহ্ম, আকাশের ন্যায় সর্বত্র অবস্থিত, সুতরাং জীবের উদরগত জগতেও অনেক প্রকার জীব থাকিতে পারে। যাহাতে স্থির প্রতীতি থাকে তাহাই জাগ্রত, যাহাতে অস্থির প্রতীতি থাকে তাহাকেই স্বপ্ন কহে। যে জাগ্রত দৃষ্ট পদার্থ ক্ষণস্থায়ী তাহা স্বপ্ন আর যে স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থ কালান্তরস্থায়ী তাহা জাগ্রত ভাবে পরিচিত। অস্থিরত্ব ব্যতীত জাগ্রত ও স্বপ্ন দশার ভেদ নাই। জাগ্রত ও স্বপ্নকালীন সমস্ত অনুভবই সমান। সুষুপ্তি অবস্থায় প্রাণ সৌম্যভাবাপন্ন হয়। আত্মজ্ঞানেই অশেষবিধ সুখদুঃখ দশার মূলোচ্ছেদ করিয়া থাকে। অচঞ্চল আত্মাতে চঞ্চল চিত্তই চমৎকার প্রদর্শন করিয়া থাকে। সেই চিৎশক্তির চমৎকারিত্বই জগৎ স্বরূপে বোধগম্য হইতেছে। অন্তরে যাবৎকাল চিৎজ্যোতি অহংকার মেঘে আবৃত থাকে তাবৎকাল পরমার্থ কুমুদ্বতী বিকাশ পায় না। অহংকার মেঘ চৈতন্য সূর্যকে আবরণপূর্বক অবস্থিত থাকিলে জড়তারই প্রাদুর্ভাব হয়, কোনো ক্রমেই আলোক প্রকাশ পায় না। এই শরীর অসৎ, ইহা কিছুই নহে, একমাত্র শুদ্ধ চিৎ সত্তাই আত্মাতে বিদ্যমান, আমিও নাই এবং অন্য কেহও নাই, ইহাই স্থির জানিবে। বাসনাবিহীন হইলেই মুক্তি হইয়া থাকে, বিবেক বলে বাসনা ত্যাগ কর! কলুষিত চিৎতত্বই জীব নামে অভিহিত হয়। সর্বগামী স্বচ্ছ একমাত্র আত্মা বিদ্যমানে এই দেহই আমি ইত্যাকার যে ভাবনা তাহাই বন্ধন শব্দে অভিহিত জানিবে।

সংসার অপেক্ষা দুঃখের স্থান আর কিছু নাই। এমন মূর্খ কে আছে যে শ্মশানে পতিত শবের সহিত আলাপ করে। কোনো বিষয় সন্দেহ হইলে মূর্খকে কেহই জিজ্ঞাসা করে না। দেহীর দেহ মধ্যে নানা প্রকার কীটাদি জন্মগ্রহণ করিতেছে এবং সেই দেহীর ত্যাজ্য বিষ্ঠাতেও নানাবিধ কীটের জন্ম হয়, এইরূপে জীবের নানা অবস্থার জন্ম ও কষ্টভোগ ব্যতীত আর কিছু নাই। অজ্ঞান ভাবে দিন না কাটাইয়া সর্বদা বিচার চর্চার কর্তব্য। বিষয়াসক্ত ব্যক্তির সহিত পশুদিগের কিছুমাত্র প্রভেদ নাই, কারণ পশুরা রজ্জু দ্বারা আকৃষ্ট হয় আর অজ্ঞ ব্যক্তিদিগের অবশ্য চিত্তই বিষয় দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া থাকে। আত্মা হইতে পৃথক হইয়া চিত্ততা লাভ করিলেই মনের উৎপত্তি হয় এবং যদি তাহার পৃথক জ্ঞান না হয় তবে মনের উৎপত্তি হইতে পারে না। আমি আত্মা, জীব নহি, যখন এই জ্ঞানের প্রকাশ হয় তখন চিত্তের শান্ত অবস্থা বলিয়া জানিবে। যেমন কাষ্ঠ সংযোগে অনলের বৃদ্ধি হয় সেইরূপ চিন্তা করলেই চিন্তার বৃদ্ধি হয়। কাষ্ঠ অভাবে অনল নির্বাণ হয়, চিন্তার অভাবে চিন্তা নষ্ট হয়। বিষয় চিন্তাকেই চিত্তের বৃত্তি কহে। ঐ চিন্তা ব্যাপারে চিত্ত আশার সহিত প্রকাশ পায়, সুতরাং

আশা ত্যাগ করিলেই চিত্ত নাশ হয়। আশাই জীবের বন্ধন সাধন করে, সেই বন্ধন ছিন্ন হইলে কোনো ব্যক্তি মুক্তিলাভ না করিয়া থাকে।

এই জগতে মোক্ষ নামে একটি দেশ আছে। ভগবান আত্মাই তথাকার রাজা এবং মনই তাঁহার মন্ত্রী, যেমন মৃত্তিকা মধ্যে ঘট এবং ধূমের মধ্যে মেঘ সেইরূপ ঐ মনের মধ্যে এই বিশ্ব বাসনারূপে পরিণত হইয়াছে। সেই মনকে জয় করিতে পারিলেই সমস্তই জয় করা হয় ও সমস্তই পাওয়া যায়। সেই মনকে দুর্জয় বলিয়া জানিবে, কেবল যুক্তিতে উহার বিনাশ হয় এবং বিষয়ে অনাস্থা, ইহাই মনোজয়ের যুক্তি। এই দৃশ্যমান বিষয়ের বৈরাগ্য ক্রমে অভ্যাস করিতে হয়। সকলে মোক্ষ ইচ্ছা করে কেন, কে তাহাদের বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে? কেহই বদ্ধ নহে অথচ মোক্ষের ইচ্ছা ইহাই আশ্চর্য। যে বদ্ধ নহে তাহার আবার মোক্ষ কি? জ্ঞান উদয় হইলেই দেখিবে কেহই বদ্ধ নহে। ধ্যান করিয়া কি ফল আর ধ্যান না করিয়াই বা কি ফল? মনুষ্য মৃতও নহে, জীবিতও নহে; এই জগৎ কাহারও নহে, কোনো বস্তুই কাহারও নহে এবং মনুষ্যও জগতের নহে, কোথাও কাহারও কিছু নাই। বায়ু যেমন পুষ্প সৌরভ গ্রহণ করে, জীবের সেই প্রকার আত্মায় অবস্থান করা উচিত। আত্মদর্শন লাভ করিতে হইলে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতে হয় না, আপনার দেহ মধ্যেই তাঁহাকে পাওয়া যায়। প্রণবের উচ্চারণ দ্বারা তাঁহাকে স্মরণ করিলেই তিনি ক্ষণকাল মধ্যেই সম্মুখবর্তী হইয়া থাকেন। যাবৎ আত্মার অজ্ঞান তাবৎ দেহ।

অজ্ঞানই পাপ বলিয়া কথিত হয়, ঐ পাপ বিচার বলে বিদূরিত হয়, অতএব পাপ মূলোচ্ছেদকারী বিচারকে কখনও পরিত্যাগ করিবে না। হরি নিখিল জীবের আত্মা, সেই আত্মায় যখন যাহা প্রতিবিম্বিত হয়, জীব তখনই তাহা দর্শন বা মনন করিয়া থাকে। তুমি এই জগৎকে মহা ভ্রম দর্শন করিতেছ, বাসনাবশত তুমি ইহার তত্ব দর্শনে অসমর্থ, ইহা চিত্তভাবাপন্ন আত্মারই রূপ। বীজের বৃক্ষের ন্যায় স্বীয় চিত্ত মধ্যে সমস্তই বিদ্যমান আছে। যেমন অঙ্কুর হইতে বহির্গত হইয়া বৃক্ষপত্রাদি সহিত বাহিরে স্বীয় ভাব ধারণ করে সেইরূপ পৃথিবী প্রভৃতি সমস্ত পদার্থ হইতে উৎপন্ন হইয়া বাহিরে প্রকাশিত হইতেছে; প্রকৃতপক্ষে পৃথিবী চিত্ত আদির মধ্যেই অবস্থিত। যেমন ভূমিতল হইতে উৎপাটিত বৃক্ষের আর পত্রাদি ফুল হয় না, সেইরূপ বাসনাবিমুক্ত জীবেরও আর জন্ম হয় না। অগাধ জলে রত্ন পতিত হইলে প্রকাশমান সেই রত্নই অর্থাৎ, সেই রত্নের প্রভাবেই সেই রত্ন দৃষ্টিগোচর হয়, সেইরূপ এই জগৎ পূর্ণ, স্বপ্রকাশ প্রশান্ত, একমাত্র ব্রহ্ম ব্যতীত কস্মিনকালেও অপর কিছুরই সত্তা নাই; আত্মাই আত্মার বন্ধু, আত্মার দ্বারা বিবেকবলে আত্মাকে উদ্ধার করিতে হইবে; যাহাতে আর জন্মগ্রহণ করিতে না হয়, তাহা হইলেই আত্মার উদ্ধার হইল।

সর্বদা সঙ্গী একমাত্র মনের সহিত বিচারে আত্মার উদ্ধার হয়। যেমন অন্ধকারের উচ্ছেদ হইলে স্বয়ং আলোক দর্শন হয় সেইরূপ কেবলমাত্র অহংভাব দূরীভূত হইলে আপনায় আত্মার দর্শন হয়। আমি, আমার এই ভাব ত্যাগ করিয়া মনের দ্বারা মনের উচ্ছেদ করিলে আত্মদর্শন হয়। পুরাতন রথ ভাঙিয়া গেলে সারথির ক্ষতি কি? জলের সহিত পাষাণের সম্বন্ধ কি? পাষাণের সহিত কাষ্ঠের সম্বন্ধ কি? এই ভোগবিষয়ের সহিত পরমাত্মার সম্বন্ধ কি? সমুদ্র মধ্যে পর্বত থাকিলে তাহার সহিত সমুদ্রের সম্বন্ধ কি? সেইরূপ পরমাত্মা ও সংসারের সম্বন্ধ কি? এই শরীর পরমাত্মার কে? যেমন কাষ্ঠ ও সলিলের পরস্পর আঘাতে উচ্চ জলের ছিটা উৎপন্ন হয় সেইরূপ দেহ ও আত্মার সংযোগে চিত্তবৃত্তি উদিত হয়। যেমন জলোর নিকট কাষ্ঠ লইয়া গেলে জলে প্রতিবিম্ব পড়ে সেইরূপ প্রতিবিম্ব রূপে পরমাত্মায় এই শরীর দর্শন হইতেছে। যেমন জলে বা দর্পণে নিপতিত বস্তুর প্রতিবিম্ব সত্যও নহে, মিথ্যাও নহে, আত্মাতেও শরীর এইরূপ জানিবে। যেমন কাষ্ঠ, পাষাণ, জল, পরস্পর সংযোগ বা বিয়োগ হইলে কাহারও কোনো প্রকার সুখদুঃখ হয় না, সেইরূপ দেহাদি আকারে পরিণত এই পঞ্চ ভূতের পরস্পর যোগ বা বিয়োগ হইলে কোনো ক্ষতি হয় না। অজ্ঞান দূর হইলে একমাত্র আত্মাই অবশিষ্ট থাকেন। দর্পণ ও প্রতিবিম্বের যে সম্বন্ধ, দেহ ও আত্মার সেই সম্বন্ধ কিন্তু যেখানে দেহ সেইখানে আত্মা, যেমন যেখানে পুষ্প সেইখানে সৌরভ। সূর্যের সহিত অন্ধকারের যেমন কোনো সম্পর্ক নাই, সেইরূপ দেহাদির সহিত আত্মারও কোনো সম্পর্ক নাই। অন্ধকারের সহিত আত্মার সম্বন্ধ কোনো

রূপেই হয় না। শীতের সহিত উষ্ণের সম্বন্ধ হয় না, জড়দেহের সহিত চেতন আত্মার সম্বন্ধ কিছুতেই হইতে পারে না। যেমন দাবানলে সমুদ্র আছে একথা অসম্ভব সেইরূপ দেহের সহিত আত্মার সম্বন্ধ অতি অসম্ভব। মৃতদেহে আত্মা থাকে না বলিয়া স্পন্দন হয় না, সুতরাং আত্মা ও দেহের সম্বন্ধ আছে, এই সিদ্ধান্ত নিতান্ত ভ্রম। প্রাণাদি বায়ুর সম্পর্কেই দেহের স্পন্দনাদি হয় ও অন্নাদি বস্তুর সামর্থ্যে স্থূলতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সুতরাং সেই আত্মার সহিত কোনো সম্পর্ক নাই। কার্পাসে ও পাষাণে যেরূপ পার্থক্য, পরমাত্মায় ও শরীরে সেই পার্থক্য।

দেহ বায়ুবশে চলিতেছে, আসিতেছে, যাইতেছে, উঠিতেছে, বসিতেছে এবং বায়ু বলেই শব্দ করিতেছে, যেমন বাদ্য যন্ত্রে বায়ু প্রবেশ করিলে শব্দ বাহির হয়, দেহের কণ্ঠাদি স্থান হইতে বায়ুর ক্রিয়াতেই এবং মন ও চিত্তের চালনাকে ক-বর্গ, চ-বর্গ ইত্যাদি শব্দ সমুদয় নিঃসৃত হয়, আর চক্ষু স্পন্দন হেতু তাহার স্পন্দনও বায়ু হইতে সম্পন্ন হয়, এই প্রকার সকল ইন্দ্রিয় কার্য বায়ু দ্বারা চিত্তেই হইতেছে। দর্পণ মধ্যে প্রতিবিম্বের মতো চিত্তেই সমস্ত অনুভব হইয়া থাকে, এই চিত্তের আবাস শরীর পরিত্যাগ করিয়াই স্বীয় বাসনাবলে যথায় গমন করে, তথায় আত্মা অনুভূত হইয়া থাকেন। যেমন দীপ যেখানে আলোকও সেইখানে থাকে, সেইরূপ যেখানে চিত্ত সেই স্থানে আত্মা বিদ্যমান থাকেন। আকাশ যেমন সর্বত্র বিদ্যমান থাকিয়াও দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয়, সেইরূপ আত্মা সর্বব্যাপী হইয়াও চিত্ত মধ্যে দৃষ্ট হন। যেমন ভূতলে নিম্নস্থান জলের আশ্রয় হয়, সেইরূপ অন্তঃকরণ আত্মার বিম্বিত আত্মা এই সত্যাসত্য জগৎ বিস্তার করিয়া থাকেন।

দেহ ক্ষয় হইলে দেহীর ধ্বংস হয় না, কারণ ঐ আত্মা বাসনাপন্ন হইলে তখন বাসনায় ও বাসনাবিহীন হইলে অন্তরীক্ষে আত্মস্বরূপে অবস্থান করেন। জীবকে দেশ এবং কালে অন্তর্হিত হইয়া পুনঃ পুনঃ দেহান্তর গ্রহণ করিতে হয়। বাসনাবলে এইরূপ জীবকে চিরদিন ইতস্তত ভ্রমণ করাইয়া থাকে, জীবগণ বাসনার বশবর্তী হইয়া অতি জীর্ণ হইলেও, নানা প্রকার দুঃখ ভোগ এবং নানা প্রকার দেহান্তর দ্বারা চিরদিন কষ্ট ভোগ করে। যেমন শিলাময় পুত্তলিকাসকল পরস্পর স্নেহসূত্রে আবদ্ধ হয় না, সেইরূপ দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, আত্মা, ইহারাও পরস্পর স্নেহবান নহে। আত্মার আদি নাই বলিয়া জন্মবিহীন এবং জন্মশূন্য বলিয়াই ক্ষয় নাই।

এই দেহ মধ্যে যাবতীয় নাড়ীতে যে বায়ু উভয় পার্শ্বে চালিত হইয়া থাকে তাহাই প্রাণ সংজ্ঞায় অভিহিত হন। যখন ভ্রূর মধ্যস্থলে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের অবস্থান হয় তখনই পরমেশ্বরকে আত্মস্বরূপে অবগত হওয়া যায়, সেই সময় ঐ প্রাণের নিরোধ হইয়া থাকে। প্রাণ-স্পন্দনকেই মনের রূপ বলিয়া জানিবে, উহা হইতে সংসারভ্রম উৎপন্ন হইতেছে, উহার উপশম হইলেই সংসারভ্রান্তি দূর হইয়া থাকে। যাহাতে সমস্ত, যাহা হইতে সমস্ত, যিনি সমুদয় ও সমুদয় হইতে যিনি, অথচ যাহাতে কিছু নাই, যাহা হইতে কিছু নহে, যে পরমাত্মার সদৃশ দৃষ্টান্ত কিছুতেই হয় না, তথাপি জ্ঞানী লোক তাঁহার পরিচয় জানিতে পারেন। তুমি সুখ ও দুঃখের কারণ বলিয়া আত্মা হইতে নিতান্ত পৃথকভাবে আছে। যেমন আকাশে কুসুম হয় না; সেইরূপ আত্মারও কোনো কর্তৃত্ব নাই। আকাশে মৃত্তিকা সম্পর্কের ন্যায় আত্মায় কোনো প্রকার কল্পনা স্পর্শ করিতে পারে না। অন্তরীক্ষের অবয়বের ন্যায় আত্মার কোনো রূপ কর্তৃত্ব নাই। অন্ধকার-নাশক প্রভাসম্পন্ন দীপ দ্বারা যেমন বস্তুকে সম্পূর্ণ দেখা যায় সেইরূপ অন্ধকার-নাশক বিচার দ্বারাও শীঘ্রই সেই বিমল ব্রহ্মস্বরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। সূর্যদেব প্রভা বিস্তার করিলে যাবৎ অন্ধকারের ধ্বংস হয় সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞান উপস্থিত হইলে তাবৎ দুঃখেরই ধ্বংস হইয়া থাকে। সূর্য উদয় হইলে যেমন আলোক প্রকাশ হয় সেইরূপ জ্ঞানের উদয় হইলে সেই ব্রহ্মস্বরূপ জ্ঞেয় বস্তু স্বয়ংই প্রকাশ পাইয়া থাকেন। যেমন কেহ নিজ মাংস আস্বাদন করিতে চাহে না সেইরূপ তিনি যাবৎ পদার্থেই অভিলাষশূন্য হন। স্থির মনে চিন্তা করিয়া দেখিলেই জানিতে পারা যায় যে, ভগবান মনুষ্যকে মনের মতো গঠন করিয়া তাঁহার নিজের সমস্ত শক্তি তাহাতে প্রদান করিয়া মনুষ্য শরীরের ভিতরে ও বাহিরে মাখামাখি হইয়া রহিয়াছেন।'

১১

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।

এসেছিলেন মনের একটি দ্বিধা ও সন্দেহ দূর করতে। ঠিক ছিল সেই প্রশ্নের উত্তর জেনেই তিনি চলে যাবেন হরিদ্বারে। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা ছিল অন্যরকম। তিনি চিরতরে বাঁধা পড়ে গেলেন শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণে।

গুরুদেব ত্রৈলঙ্গস্বামীর মহাপ্রয়াণের পর শিষ্য মহর্ষি উমাচরণ মুখোপাধ্যায় মানসিকভাবে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি লিখছেন, 'সিন্দুক জলে ডুবে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার সমস্ত আশাভরসা সব শেষ হয়ে গেল। দুঃখে বুক ফেটে যেতে লাগল। আমার সমস্ত বিচারবুদ্ধি লোপ পেল।'

গুরু সম্পর্কে উমাচরণবাবুর উপলব্ধি! লেখাটি পড়লেই বোঝা যায় তিনি সম্পূর্ণরূপে গুরুদেবে নিমজ্জিত ছিলেন। তিনি তাঁর সমস্ত কিছুর ভার অর্পণ করে দিয়েছিলেন গুরুদেবের ওপরে। অর্থাৎ তাঁর জীবননৌকার হালটি তুলে দিয়েছিলেন গুরুদেবের হাতে। তিনি যেভাবে চালাবেন সেইভাবেই চলব—এই ছিল উমাচরণ মুখোপাধ্যায়ের মনোভাব।

কাশীর সচল বিশ্বনাথ গুরুবর ত্রৈলঙ্গ স্বামীজি সম্পর্কে উমাচরণবাবুর উপলব্ধি ও শ্রদ্ধা এই লেখার প্রতি ছত্রে ফুটে উঠেছে। তিনি লিখছেন—'মহাত্মা ত্রৈলঙ্গ স্বামী সর্বদাই লোকের হিতাকাঙ্ক্ষা করিতেন। যে-কোনো ব্যক্তি যে-কোনো বিষয় মনে করিয়া তাঁহার নিকট মীমাংসা করিতে যাইতেন, প্রশ্ন করিবার পূর্বেই তিনি তাহা সুচারুরূপে বুঝাইয়া দিতেন! হিন্দুধর্মের চরম ফল আত্মতত্ব নিরূপণ ও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে না পারায় আধুনিক হিন্দুগণ প্রায়ই স্বীয় ধর্মে অনাস্থা প্রদর্শন করিতেছেন। মহাত্মা ত্রৈলঙ্গ স্বামী সাধনসিদ্ধ জীবন সেই অভক্তির কারণ উন্মূলিত করিয়া সকলকেই শিক্ষা দিতেছেন যে, তোমরা হতাশ হইয়ো না, শাস্ত্রাদিতে যাহাকে চরম সীমা বলিয়া জানিতে পার চেষ্টা করিলে এখনও তাঁহার মতো উক্ত তত্বের অধিকারী হইতে পারিবে। এই সকল অলৌকিক কার্যকলাপ ও ঐশ্বরিক শক্তিসম্পন্নতা দেখিয়া সকলেই জানিতে পারিবেন যে তিনি জীবন্ত ঈশ্বর ছিলেন।

তিনি জগৎকে অধিকারী অনুযায়ী তত্বজ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্য স্বয়ং দেবদেবী মূর্তি আদির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। মনের সামর্থ্য অনুসারেই জীব ঈশ্বরের সত্তাকে অনুভব করিয়া থাকে। ত্রৈলঙ্গ স্বামী হিন্দু এবং জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন, হিন্দু রীতিতে তাঁহার পবিত্র জীবন গঠন করিয়া হিন্দু ধর্মেরই চরম উৎকর্ষ দেখাইয়াছেন। তিনি অন্য কোনো ধর্মের দোষগুণ বিচার করেন নাই। অন্য ধর্মকে বিদ্বেষ চক্ষে না দেখিয়া শান্ত ভাবে স্বধর্মের সেবা করিয়াছেন, ইহা তাঁহার সুদীর্ঘ জীবন সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। তাঁহার অসীম ক্ষমতা থাকা সত্বেও তিনি সকল বিষয়ে উদাসীন ছিলেন। মান অপমান সমান জ্ঞান করিতেন। সেই জন্য তাঁহার দ্বেষ হিংসা কিছুমাত্র ছিল না; তাঁহার কার্যকলাপ এবং জ্ঞান অনুভব করিলে সকলেই মনুষ্য পদবাচ্য হইতে পারে।

হে ভারতবাসী হিন্দু সন্তান! তোমরা একবার মহাত্মা ত্রৈলঙ্গ স্বামীর জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত কর, তিনি কি প্রকার নিঃস্বার্থভাবে স্বীয় মুক্তির পথ অনুসন্ধান করিয়া জীবন্মুক্ত হইয়াছিলেন। তোমার বা আমার উপাস্য দেবতায় এবং তাঁহার উপাস্য পরম ব্রহ্মে কিছুই প্রভেদ দেখিতেন না; কারণ ঈশ্বর একটি ভিন্ন দুটি নাই। তবে সহজ জ্ঞানে ও সন্তুষ্ট মনে যিনি যাঁহার উপাসনা করিয়া দিব্যজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হন তাহাতে বিরুদ্ধ মতাবলম্বী অথবা ভিন্নাকৃতি দেবদেবীর প্রতি অশ্রদ্ধা করা কাহারও কোনো মতে উচিত নহে। মহাত্মা ত্রৈলঙ্গ স্বামী জগতের সুখ-দুঃখের প্রতি একবারও দৃষ্টিপাত করেন নাই, কারণ তাঁহার হৃদয়ে সুখ দুঃখের

কোনো একটি বৃত্তিই স্বতন্ত্র স্থান পায় নাই। তিনি যখন তত্বজ্ঞান লাভ করেন তখন তাঁহার হৃদয়ে সেই পরমানন্দজনক ব্রহ্মদর্শনসুখ ব্যতীত অন্য কিছুই ছিল না, তিনি যখন জগৎকে ব্রহ্মময় দেখিতেন, দুঃখ বলিয়া কোনো পদার্থ আছে তাহা তাঁহার জানিবার কোনো কারণ থাকিত না। তিনি জীবন্মুক্ত হইয়া আজীবন একইভাবে সুস্থ শরীরে সময় অতিবাহিত করিয়াছেন। এই সুদীর্ঘ ২৮০ বৎসর পরমায়ুর মধ্যে তিনি কখনও পীড়ায় আক্রান্ত হন নাই। তাঁহার এই অবস্থাকে নিরবচ্ছিন্ন সুখই বলুন আর দুঃখই বলুন তিনি আপনভাবে আপনিই মত্ত হইয়া জীবন্মুক্ত ছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে ভক্তিই মূল পদার্থ। ভক্তিই ভগবৎলাভের প্রকৃত পথ। সাধারণত দেখিতে পাওয়া যায় যে, কতকগুলি প্রবৃত্তির উপর জীবনের জীবত্ব নির্ভর করিতেছে। এই সকল প্রবৃত্তির চরিতার্থতা তাহাদের সুখ। যে নীতি-বলে তাহাদের এই সকল প্রবৃত্তির চরিতার্থতা লাভ হয় সেই সকল নীতিই তাহাদের সেই জীবত্ব ধারণ করে। তাহাই তাহাদের জীবধর্ম! সুতরাং যে সকল শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক প্রবৃত্তির উপর জীবের এই জীবত্ব নির্ভর করে তাহাদের চরিতার্থতা ও স্ফুরণই প্রকৃত ভগবৎ ভাব। ভক্তি সেই ভাব স্ফুরণের সাহায্যকারী। বস্তুত ভক্তি হইতে নির্ভরতা জন্মে এবং সম্পূর্ণরূপে নির্ভরতা জন্মিলেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলেই নিষ্কাম জ্ঞানের উদয় হয়। নিষ্কাম জ্ঞানের উদয়ই ভগবৎলাভ।

তিনি বলিতেন, মনের স্থূলভাব ঈশ্বরের স্থূলভাব, মনের তনুতায় ঈশ্বরের সূক্ষ্মভাব ও মনের বিলয়ে ঈশ্বরের স্বরূপ ভাব উপলব্ধি হইয়া থাকে। মন থাকিতে কেহ নিরাকার বা নির্গুণ পদার্থের ধারণা করিতে পারে না। ভাব স্ফুরণের সঙ্গে সঙ্গে ভাবময় ভগবানের বিবিধ মূর্তির বিকাশ হইয়া থাকে। ভাবের ঘনতা হইলেই মূর্তি প্রকাশিত হয়। যিনি মনের বিশুদ্ধ সত্তার সরল ভাবের অধিকারী হইয়াছেন, তিনিই প্রেম ও ভক্তির আবেগে ভগবানকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন।'

ত্রৈলঙ্গ স্বামীজি, দুশো আশি বছরের সুদীর্ঘ মহাজীবন। সেই সুদীর্ঘ, অলৌকিক মহাজীবনের অধিকারী মানুষটিকে ঘিরে বিরূপ কথা থাকবে না! তা কি হতে পারে। তবে তাঁর শরীর-স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নানা গাল-গপ্পো সেইসময় বা পরবর্তীকালে শোনা যেত। শঙ্করী মাতাজির গ্রন্থের অনুলেখক পরমানন্দ স্বামী বা গ্রন্থটির প্রকাশক অমরনাথ পোদ্দার মহাশয় এই ব্যাপারে তাঁদের তীব্র প্রতিবাদ এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁরা যুক্তি ও প্রমাণ দিয়ে সেসব অভিযোগ খণ্ডন করেছেন—

১) ৺কুলদানন্দ ব্রহ্মচারীজি তাঁর 'শ্রীশ্রী সদগুরুসঙ্গ' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে লিখছেন—'শরীর (ত্রৈলঙ্গ স্বামীর) স্থুল হয়ে পড়ল; বাত হল। তার উপরে তাঁকে জীবন্ত শিব মনে করে সকলে তাঁর মাথায় দুধ গঙ্গাজল ঢালতে লাগলেন। রাত চারটা হইতে বেলা বারটা পর্যন্ত পৌষ মাসের শীতেও এই জল ঢালার বিরাম ছিল না। দেহের ধর্ম্ম শেষ কালে ঘা হয়ে দেহটি পচে গেল। একভাবে নির্ব্বিকার অবস্থায় থেকে দেহটি ছেড়ে দিলেন। গঙ্গায় তাঁকে জল সমাধি দেওয়া হয়।'

এই তথ্যকে নসাৎ করার জন্য তাঁরা যে যুক্তি ও প্রমাণ পেশ করেছেন—আমাদের ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব দেহ ত্যাগ করেন ১৫ আগস্ট ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে। তার ঠিক একবছর বাদে ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ব্রহ্মে লীন হন ত্রৈলঙ্গ স্বামীজি। ফলে তাঁকে যাঁরা স্বচক্ষে দেখেছিলেন তাঁদের সঙ্গে উনিশ শতকের বহু মানুষের পরবর্তীকালে দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে। এই মহাপ্রয়াণের ব্যাপারে ও স্বামীজি সম্পর্কে পরবর্তী প্রজন্ম তাঁদের কাছ থেকে অনেক কথাই জানতে পেরেছিলেন। তাঁরা কেউই এইরকম ভয়াবহ তথ্য অর্থাৎ দেহ পচে-গলে গিয়েছিল বলে জানাননি।

তা ছাড়া শঙ্করী মাতাজি প্রায় একষট্টি বছর তাঁর গুরুদেবের সঙ্গ লাভে ধন্য হয়েছিলেন। স্বামীজি অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী ছিলেন বলেও তিনি কখনও কাউকে কিছু জানাননি। আবার ত্রৈলঙ্গ স্বামীজির গৃহস্থ শিষ্য উমাচরণবাবু তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন, 'তিনি জীবন্মুক্ত হইয়া আজীবন একইভাবে সুস্থ শরীরে সময় অতিবাহিত করিয়াছেন। এই সুদীর্ঘ দুই শত আশি বৎসর পরমায়ুর মধ্যে তিনি কখনও পীড়ায় আক্রান্ত হন নাই। দেড়শত

বৎসর কাল কাশীধামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা নিত্য স্বামীজিকে দর্শন করিয়াছেন। তাঁহাকে রোগ শয্যায় কেহ কখনও দেখিতে পান নাই। তিনি সদা বিশালকায়রূপে বিরাজিত ছিলেন।'

স্বামীজি কাশীধামেই তাঁর জীবনের দেড়শো বছর কাটিয়েছিলেন। এর মধ্যে শেষ আশি বছর তিনি মঙ্গল ভট্টজির বাড়িতেই থাকতেন। অর্থাৎ তিনি ভট্ট পরিবারকে তাঁর সেবা করার সুযোগ দিয়ে ধন্য করেছিলেন। এই বাড়ির সদস্যসংখ্যা ছিল চারজন। অম্বাদেবী ও তাঁর তিন পুত্র। এ ছাড়াও শঙ্করী মাতাজি ও তাঁর মাতাও স্বামীজির পাশে সব সময় থাকতেন। তাঁরা সবসময় শুধু পাশে থাকতেন না, স্বামীজিকে যাতে কেউ বিরক্ত করতে না পারেন সে ব্যাপারেও তাঁরা ছিলেন সদা সতর্ক। ফলে তাঁদের অনুমতি ভিন্ন কেউই স্বামীজির ধারে কাছে যেতে পারতেন না।

যাঁরা যাওয়ার অনুমতি পেতেন তাঁরা স্বামীজিকে প্রণাম করা মাত্র তিনি স্বয়ং ইঙ্গিতে বা ইশারায় চলে যেতে বলতেন। যদি কেউ জেদ করে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতেন তাহলে তাঁর কপালে 'অর্ধচন্দ্র' জুটত। ভট্টভাইদের যে কোনো একজন তাঁকে বলপ্রয়োগ করে বাইরে বের করে দিতেন। উমাচরণবাবুর ক্ষেত্রেও এই ঘটনা বার দুয়েক ঘটেছে। বাইরে জুতো ছেড়ে এসেছি এই ভাবনায় আপ্লুত এক বাঙালি যুবককে স্বামীজির আদেশে প্রথমে মঙ্গল ভট্টজি ও পরে গোসেবক বলপ্রয়োগ করে বাইরে বের করে দিতে চেয়েছিলেন। অবশ্য স্বামীজি বলপ্রয়োগ করতে বলেননি।

যাঁর জন্য এত সতর্কতা, যাঁকে ঘিরে সদাসর্বদা এত কড়া পাহারা, সেখানে ভোর চারটে থেকে দুপুর বারোটা পর্যন্ত ঘড়া ঘড়া জল ও দুধ তাঁর মাথায় এলাম, গেলাম, ঢেলে দিলাম—ব্যাপারটা মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। এইরকম ঘটনা যদি সত্যিই ঘটত তাহলে মঙ্গলদাসজিরা তাঁদের এমনি এমনি ছেড়ে দিতেন না। মানে জলের ঘড়া নিয়ে তাঁরা স্বামীজির কাছে ঘেঁষতে পারতেন না। ফলে এটিকে গল্পকথা ভেবেই হিমঘরে পাঠিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

আবার কুলদানন্দ ব্রহ্মচারীর কথার সঙ্গে পরবর্তী সময়ে সহমত পোষণ করেছেন শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীজি। কিন্তু পরমানন্দ স্বামী বা প্রকাশক ভদ্রলোক গোস্বামীজিকে দায়ী বা দোষী সাব্যস্ত করেননি। তাঁরা বলেছেন, এই ধরনের উক্তি গোস্বামীজি করেননি, বা করতে পারেন না। কারণ তিনি স্বামীজিকে অত্যন্ত ভক্তি, শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর দেহশুদ্ধি করেছিলেন স্বয়ং ত্রৈলঙ্গ স্বামীজি। শুধু তাই নয়, প্রয়াগের কুম্ভমেলায় খুব বিপদে পড়েছিলেন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীজি। সেই বিপদ থেকে বালক সাধুর রূপ ধরে স্বয়ং ত্রৈলঙ্গজি তাঁকে উদ্ধার করেন। ফলে গোস্বামীজি এরকম উক্তি করতে পারেন না বলেই তাঁরা মনে করেন।

এবার উমাচরণ মুখোপাধ্যায়। তাঁর গ্রন্থেও দুটি ছোট ভুল অনিচ্ছাকৃতভাবে রয়ে গিয়েছে। প্রথম ভুল—স্বামীজি বললেন, যাও ওপরে গিয়ে আমার মাকে দেখে এসো। উমাচরণবাবু দেখে এসে লিখছেন, 'সবই ঠিক আছে কেবল জিহ্বা বাইরে নাই, এবং পদতলে মহাদেব নাই।' এক্ষেত্রে 'কেবল' কথাটিকে বাদ দিতে হবে। কারণ স্বামীজির আদিষ্ট মূর্তি এখনও বেদীর পশ্চিমদিকে বর্তমান। মায়ের নাম 'মঙ্গলা গৌরী মা'। যেহেতু তাঁর পদতলে শিব শায়িত নন, তাই তাঁর জিহ্বা বাইরে নয়, ভিতরে। কথিত আছে, স্বামীজি গঙ্গাগর্ভ থেকে এই কালীমূর্তি ও প্রকাণ্ড শিবলিঙ্গ আদিষ্ট হয়ে উদ্ধার করে নিজের হাতে ভট্টজির গৃহ প্রাঙ্গণে প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে এই শিবলিঙ্গ 'ত্রৈলঙ্গেশ্বর শিব' নামে প্রসিদ্ধ।

দ্বিতীয় সমস্যা—উমাচরণবাবু স্বামীজির পাঁচজন শিষ্য ছিল বলে জানিয়েছেন। শঙ্করী মাতাজি স্বামীজির কুড়িজন শিষ্যের কথা বলেছেন। এছাড়াও শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, বেণীমাধব গাঙ্গুলি ও সিদ্ধ ফকির আবদুল গফুর খান স্বামীজির শিষ্য ছিলেন। আবার লেখক রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় তাঁর হরিদাস (সাধু) গ্রন্থে লিখেছেন, এই সাধুও স্বামীজির শিষ্য ছিলেন। তাহলে আমরা এখন পর্যন্ত স্বামীজির চব্বিশজন শিষ্যের কথা জানতে পারলাম।

এইরকম বেশ কিছু ভুল সংশোধন করেছেন তাঁরা। মহাপ্রয়াণ, স্বামীজিকে জলসমাধি দেওয়ার পূর্বে তাঁকে সিন্দুকের ভেতর শুইয়ে দেওয়া হয় বলে জানিয়েছেন। পরমানন্দ স্বামী এই তথ্য ঠিক নয় জানাচ্ছেন। তিনি

লিখছেন, শুয়ে নয়, স্বামীজিকে সিন্দুকের ভেতর বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

এছাড়াও স্বামীজি বিবাহিত এবং তাঁর মাতৃবিয়োগ হয়েছিল আটাশ বছর বয়েসে। এইসব কথাও যে ঠিক নয় তাও তাঁরা জানিয়েছেন।

একথা সত্য, স্বামীজির পার্থিব কোনও বিষয়ে বিন্দুমাত্র মোহ ছিল না। তিনি নিজে কখনও কোনও আশ্রম বা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে যাননি। তিনি দেহে থাকাকালীন কেবলমাত্র ভক্তদের অনুরোধে তিনি তাঁর মূর্তি তৈরির ব্যাপারে অনুমতি দিয়েছিলেন। মঙ্গল ভট্টজির গৃহে এখনও সেই মূর্তি বিদ্যমান। ফলে মানুষ মনে করে ওই গৃহেই স্বামীজি তাঁর মঠ বা আশ্রম স্থাপন করেছেন। এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। তাঁর তিরোধানের পর গৃহস্থ ভক্তরা বাড়ির বাইরে তাঁদের গুরুদেবের নাম ও মঠ কথাটি লিখে টাঙিয়ে দিয়েছিলেন। স্বামীজির জন্মগ্রাম হোলিয়া নগর নিয়েও কিছু মতান্তর রয়েছে। অনেকে বলেন হোলিয়া নগরের কোনও অস্তিত্ব নেই।

১২

বন্দরের কাজ হল যে সাঙ্গ, এবার ভাসার পালা, খোলো পাল, তোলো নোঙর, বদ্ধ জীবন ছাড়ব—তুমি তোমার বিদায়ের দিনক্ষণ বহু আগেই ঠিক করে ফেলেছিলে। ১২৯০ সালের কথা। এক পড়ন্ত বিকেলে তুমি তোমার কতিপয় ভক্ত ও শিষ্যকে ডেকে বলেছিলে—আর পাঁচ বছর, তারপর আমি চিরতরে চলে যাব, এবার যাওয়ার পালা। তুমি তোমার অপ্রকট হওয়ার খবর পাঁচ বছর আগেই জানিয়ে দিয়েছিলে।

তুমি তো তোমার প্রিয় শিষ্য উমাচরণকেও একই কথা বলেছিলে। তুমি বললে, আমায় এবার যেতে হবে। কবে যাব তা আমি তোমাদের চিঠি দিয়ে আগেই জানাব। তোমরা সেই চিঠি পেয়ে অবশ্যই চলে আসবে। তুমি নির্দিষ্ট সময়ে প্রত্যেককেই খবর দিয়েছিলে। উমাচরণবাবুকে তোমার অপ্রকট হওয়ার দিনটি জানিয়ে লিখেছিলে—তুমি ছুটির জন্য দরখাস্ত করো। ছুটি মঞ্জুর হয়ে যাবে।

১২৯৪ সনের অগ্রহায়ণ মাস, তুমি কাশীধামের তোমার ভক্ত ও শিষ্যদের ডেকে ভয়ঙ্কর সেই সংবাদটি আবার জানালে। মহাযোগেশ্বর তুমি বলেছিলে—ঠিক একমাস বাদে আমার আগামী জন্মতিথিতে আমি দেহত্যাগ করব! ধন্য তুমি!

তোমার সঙ্গে তো মা গঙ্গার অদ্ভুত, সুন্দর এক সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। তুমি ছিলে মাগঙ্গার অত্যন্ত প্রিয় সন্তান। তুমি তোমার মায়ের বুকে বসে, কোলে শুয়ে কত না অলৌকিক কাণ্ড ঘটিয়েছ। তোমার মানসপুত্রী শঙ্করী মাতাজি ও প্রিয় শিষ্য উমাচরণবাবুও মাতা-পুত্রের অলৌকিক লীলা খেলার সাক্ষী হয়েছেন। তুমি তাঁদের সেই সুযোগ করে দিয়েছিলে। উমাচরণ মুখোপাধ্যায় তো তোমার মতো অত দীর্ঘসময় জলে থাকতে পারতেন না। কিন্তু তুমি কখনও গঙ্গাবক্ষে যোগাসনে বসে ধ্যানস্থ হয়ে ভেসে গেছ এদিক থেকে ওদিকে। স্রোতের প্রতিকূলে ভেসে যেতেও তোমার কোনও সমস্যা হত না। তাই তো তোমার শিষ্য, ভক্ত এবং যাঁরা তোমায় দর্শন করে জীবন ধন্য করেছেন—তাঁরা প্রত্যেকেই তোমায় 'গঙ্গানন্দন' জ্ঞানে ভক্তি শ্রদ্ধা করতেন। 'শ্রীশ্রীত্রৈলঙ্গাষ্টকম' স্তোত্রে তোমাকে তো গঙ্গানন্দন ভীষ্মদেব রূপেও অভিহিত করেছি আমরা। তুমি ছিলে মহাভারতের ভীষ্মদেবের মতো চিরকুমার, অখণ্ড ব্রহ্মচারী। তুমিও তো তাঁরই মতো সমস্ত পৈতৃক সম্পত্তি তুলে দিয়েছিলে নিজের ভাইয়ের হাতে। দুজনের মধ্যে কত মিল! তুমিও তো ভীষ্মের মতো স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করেছিলে। শুধু কি তাই, তুমি তোমার শেষদিনে সেই মা গঙ্গার বুকেই চির আসন পাতলে।

তোমায় যে গঙ্গানন্দন বলা হত তুমি কি তা ভুলে গেছ? ঠিক আছে আবার তোমায় একবার মনে করিয়ে দিই। শোনো ভালো করে, মন দিয়ে শোনো—তোমাকে উদ্দেশ্য করে, তোমাকে পূজা করার জন্য রচিত হয়েছিল এই শ্রীশ্রীত্রৈলঙ্গাষ্টকম স্তোত্র—

'বন্দেদেবং জঙ্গমতীর্থং যতিরাজং জীবন্মুক্তধ্যাননিযুক্তং গুণমুক্ত
সৌম্যশান্তং দান্তমশেষাশিবদানম। মায়তিতং মানবিহীনং জনমান্যম।
শুদ্ধং বুদ্ধং মুক্তমনন্তং ভগবন্তং ব্রহ্মানন্দং সুস্থিতবুদ্ধিং ধৃতমৌনং
শ্রীত্রৈলঙ্গ খ্যাত-বিবেকং শিবরামম শ্রীত্রৈলঙ্গ দীনদয়ার্দ্রং শিবরানম।।
ভীমং কান্তং নগ্নমনূঢ়ং চিরসুস্থং সত্যাবিষ্টং জ্ঞানগরিষ্ঠং গতমোহং
প্রাণারামং শ্যামলকান্তিং সুবিশালম স্বেচ্ছামৃত্যুং নির্ম্মিজ্জতকামং নতবামম
জ্যোতিপুঞ্জং যোগবিলাসং গুণবাসং গঙ্গানন্দং মঙ্গলকন্দং সুকুমারং
শ্রীত্রৈলঙ্গ পুণ্যনিকুঞ্জং বিমলাঙ্গম শ্রীত্রৈলঙ্গ কীর্ত্তিকিরীটং কলিভীষ্মম।।
নানাশাস্ত্রৈর্ব্বেদ কদম্বৈরনবদ্যং বারাণস্যাং লোকহিতার্থং নিবসন্তং
স্বস্থংধীরং ভাবগভীরং বরণীয়ম সংখ্যাতীতৈ ভক্তসমূহৈঃ শতবর্ষম।

শুদ্ধ শান্তং জন্মবিবিক্তং গতমায়ং নিত্য ভক্ত্যা পূজিতপাদাম্বুজযুগ্মং
শ্রীত্রৈলঙ্গং মূর্ত্তবিরাগং শুচিশীলম।। শ্রীত্রৈলঙ্গ তাপসসূর্য্যনববর্ষ্যম।।
ভাবাভাব-প্রত্যয়হীনং গৃহশূন্য কো বা জ্ঞাতুত্বামতিমানং গতমানং
দ্বন্দ্বতীতং পূর্ণমনীহং নিরপেক্ষম। মায়াসক্তো তপস শক্তো সুনিমান্যম
নিত্যানন্দং প্রেমবিগাহং সমচিত্তং লোকনাংনো লৌকিকমানৈরভিগম্যং
শ্রীত্রৈলঙ্গং ত্যক্ত বিকল্পং শিবকল্পম।। বন্দে দেবং মূর্ত্তমহেশঃ ভজনীয়ম।।
ভক্তি শ্রদ্ধাভাবসমেতৈঃ পঠনীয়ং
স্তোত্রং পুণ্যংজ্ঞাননিধানং জনবৃন্দৈঃ
ধ্যাত্বা ধ্যাতা পাতকদোষাৎ সুখমুক্ত
সদ্যো গচ্ছেদ্দেহবিয়োগে শিবলোকম।।

মনে পড়েছে তোমার! সেই শ্মশানে বসে তুমি তোমার ভাই শ্রীধরকে বলেছিলে, 'আমি আর সংসারে ফিরব না। তুমি সমস্ত সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করে সুখে থাকো।' তুমি অনায়াসে সুখের জীবন কাটিয়ে আর দশটা মানুষের মতো একদিন পুট করে মারা যেতে। কিন্তু তুমি তখন অন্য জগৎ, অন্য জীবনের স্বাদ পেয়ে গেছ। তোমার প্রথম গুরু মাতা বিদ্যাবতী তোমাকে সেই পথের সন্ধান দিয়েছিলেন, চিনিয়েছিলেন সেই দুর্গম রাস্তাটিকে, যে রাস্তা ধরে হাঁটলে অবশ্যই একদিন ঈশ্বরের কাছে যাওয়া যায়। তুমি সেই পথে হেঁটে সত্যিই একদিন ঈশ্বরের কাছে পৌঁছোলে, শুধু পৌঁছোলে না, দেবাদিদেব মহেশ্বরকে বাধ্য করলে তোমার শরীরে অবস্থান করতে। ধন্য তুমি! ধন্য তোমার তপস্যা!

শেষলগ্নে এসে তুমি কিন্তু বড়ই নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছিলে। কারও মনের কথা, মনের ব্যথা তুমি একদম বুঝতে চাইছিলে না। তোমায় যাঁরা পূজা করেন তাঁদের আঘাত দিতেও তুমি এতটুকু দ্বিধা করোনি; তা না হলে নিজের সৎকারের আদেশ কি ওভাবে দেওয়া সম্ভব! তুমি কী আদেশ করলে! প্রথমে তোমার মানসপুত্রী, প্রিয় শিষ্যা শঙ্করী মায়ের শরণাপন্ন হই। তুমি শোনো! তুমি যে কী পরিমাণ নিষ্ঠুর আচরণ করেছিলে তা এতদিন বাদে নিশ্চয় উপলব্ধি করতে পারবে। শঙ্করী মাতাজি বলছেন, 'এদিকে ক্রমে ক্রমে সেই এক মাসও ফুরাইয়া আসিল, আর এখন মাত্র দশদিন বাকী। কালিকানন্দ স্বামী, সদানন্দ স্বামী, ব্রহ্মানন্দ স্বামী, ভোলানন্দ স্বামী, ব্রহ্মচারী মঙ্গল ভট্টজি, অম্বাদেবী, অম্বালিকাদেবী, উমাচরণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি শিষ্যগণ সকলেই এই সময়ে উপস্থিত আছেন। স্বামীজি প্রত্যহ রাতে আমাদের সকলকে সস্নেহে নিকটে ডাকিয়া বিবিধ উপদেশ দিতে লাগিলেন। যাঁহার যাঁহা জিজ্ঞাস্য অকপটে শ্রীশ্রীগুরুদেবের নিকট নিবেদন করিয়া তাঁহারা সকলে তাঁহাদের নিজ নিজ সমস্ত সমস্যার মীমাংসা করিয়া নিতে একে একে আরম্ভ করিলেন। সাক্ষাৎ জ্ঞানের অবতার স্বামীজিও সকলের সর্বপ্রকার সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দিতে লাগিলেন। অন্যান্য বহু সাধু, সন্ন্যাসী, পরমহংসগণও স্বামীজির নিকট ধর্মবিষয়ক জটিল তত্বসমূহের আলোচনা করিয়া প্রকৃত সিদ্ধান্ত তখনই জানিয়া লইলেন।

আর একদিন মাত্র বাকী। বাবা ত্রৈলঙ্গ স্বামীজি শিষ্যগণকে তাঁহার শেষকালীন দেহ সৎকার করার বিষয়ে আদেশ দিলেন।' তুমি কী আদেশ দিয়েছিলে! তুমি বললে—'আমি উপবেশন করিতে পারি, এই মাপের একটি প্রস্তরের সিন্দুক প্রস্তুত করিয়া আনিবে। দেহরক্ষা করিবার সময় আমার দেহ ঐ সিন্দুকের ভিতর বসাইয়া রাখিয়া বাহিরে তালাবন্ধ করিয়া পঞ্চগঙ্গা ঘাটের নিকটবর্তী 'আদি-সন্ন্যাসীগুরু-দত্তাত্রেয়' মন্দিরের সম্মুখে জলসমাধি দিবে। অন্য সৎকারের আবশ্যক নাই। দুইখানি নৌকা ভাড়া করিয়া পাশাপাশি রাখিয়া তাহাতে সিন্দুকটি তুলিয়া দক্ষিণে অসিঘাট পর্যন্ত নিয়ে পরে ঘুরাইয়া উত্তরে বরুণা নদী পর্যন্ত নৌকা নিয়া আবার ঘুরাইয়া আনিয়া আমার দেহরক্ষিত সিন্দুকটি নির্দিষ্ট স্থানের মাঝগঙ্গায় নিক্ষেপ করিতে হইবে।'

তুমি সেদিন বলেছিলে, 'আগামীকাল আমি আর বিশেষ কথা বলব না। যার যা ইচ্ছা তা আজ রাতেই তোমরা জেনে নিও।' লৌকিক জীবনের শেষ রাত। শিষ্যদের কাতর প্রার্থনা—'যেও না রজনী আজি লয়ে তারাদলে।' তুমি তোমার পালিতা কন্যা সন্ন্যাসিনী শঙ্করী মাতাজিকে কাছে ডেকে বলেছিলে—'তোমাকে অনেক কাজ করতে হবে, সেই কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তোমার মুক্তি হবে না। তুমি ভারতবর্ষের বিভিন্ন দেশ ও তীর্থ পরিভ্রমণে এরপর বেরোবে। ভয় পেও না, আমি সূক্ষ্ম দেহে সর্বদাই তোমার সঙ্গে থাকব।'

কাতর ও ব্যথিত উমাচরণ মুখোপাধ্যায় তোমার চরণদুটি ধরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাবা আমার কী গতি হবে?' উত্তরে তুমি বলেছিলে, বাবা উমাচরণ, তুমি যেমন কাজকর্ম করছ সেইরকমই করবে। কখনও খুঁটি ছাড়বে না। এরপর তুমি কালীচরণ স্বামীকে কাছে ডেকে বলেছিলে, তুমি উমাচরণের ওপর সবসময় নজর রাখবে। আমার এই আদেশ কখনও অগ্রাহ্য কোরো না। যদি প্রয়োজন হয় তাহলে ওর বাড়ি গিয়ে ওকে সাহায্য কোরো। যাতে ও সহজে অগ্রসর হতে পারে। উমাচরণের মুক্তির ভার তোমার ওপর রইল।'

তুমি আর আমাদের মাঝে থাকবে না, যে-কোনও সমস্যার সমাধান এবার কে করবেন! তুমি মহাপ্রস্থানের যাত্রী—খবরটা কাশীময় রাষ্ট্র হয়ে গেল। প্রত্যেকেই বিষণ্ণ এবং শোকার্ত। প্রত্যেকেই তোমায় শেষবারের মতো দর্শন করতে চান। পঞ্চগঙ্গার ঘাটে সেদিন সকাল থেকে তিলধারণের জায়গা নেই। অনেকে আবার নৌকো ভাড়া পর্যন্ত করে রেখেছেন, তোমার শেষ বিদায়ের সঙ্গী হবেন বলে। কিন্তু তুমি! নির্বিকার, নির্বিকল্প। তুমি যে মহাযোগেশ্বর। কোনও শোক, তাপ যে তোমাকে স্পর্শ করে না! কিন্তু দীর্ঘ দুশো আশি বছর তুমি এই পৃথিবীর বুকে কত অলৌকিক কাণ্ড ঘটালে, তোমার লীলাচ্ছটায় ধন্য হল এই ধরা। সেই পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিতে তোমার কি এতটুকু কষ্ট হয়নি! আসলে তুমি মহাসাধক, জন্ম ও মৃত্যুর আসল গোপন রহস্যের কথা তুমি তো বহু বহু বছর আগেই জেনে ফেলেছিলে। তুমি তো জানতে—আজ আমি আমার এই পুরোনো পোশাকটা খুলে ফেলব, কিন্তু আমার ভেতরের আসল আমিটা তো চিরদিনই জীবিত থাকবে। তাই তো তুমি তোমার মানসকন্যাকে বলেছিলে, 'তুমি ভারত পরিভ্রমণে বেরিও, ভয় নেই আমি সূক্ষ্ম দেহে সর্বদা তোমার সঙ্গে থাকব।' আশা করি, তোমার যাঁরা এখনও পুজো করেন, ভক্তি করেন, তাঁদের বিপদে তুমি নিশ্চয়ই সূক্ষ্ম শরীরে পাশে থাকো!

তোমার শিষ্য ও ভক্তদের ব্যস্ততা এই ক'দিন ভয়ঙ্কর বেড়ে গিয়েছিল। তোমার শেষযাত্রার প্রস্তুতির কাজে তাঁরা সবাই ব্যস্ত। তোমার মাপের পাথরের সিন্দুক তৈরি করানো হল। সেই সিন্দুকের ভেতরে প্রথমে গদি পাতলেন তাঁরা। এরপর চাদর, বালিশ দিয়ে তোমার আরামদায়ক বসার স্থান তাঁরা তৈরি করে ফেললেন। ফুল, চন্দন, মালা দিয়ে সাজানো হয়েছিল সিন্দুকটি। তুমি সেদিন সকাল আটটা নাগাদ বেদির নীচে অবস্থিত সেই ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে তোমার আসনে উপবেশন করে বললে, 'বাবা, তোমরা এই ঘরের দরজা বন্ধ করে দাও। আমি দরজায় আঘাত করিলে পরে তাহা খুলিয়া দিও। দরজায় শব্দ না হইলে কেহ তাহা খুলিও না। আর আমাকে তোমরা কেহ ডাকিও না।'

বেলা তিনটের সময় তুমি দরজায় আঘাত করলে। অর্থাৎ সময় আসন্ন। তোমার শিষ্যরা দরজা খুলে দিলেন। তুমি শেষবারের মতো পার্থিব শরীরে বারান্দায় এসে দাঁড়ালে। ওইখানে বেশ কিছুক্ষণ হয়তো দাঁড়িয়েছিলে। তখন তুমি মৌনী। সিন্দুকটিকে পঞ্চগঙ্গার ঘাটে নিয়ে যেতে বললে, ভক্তরা তোমার ইশারা বুঝতে পেরেছিলেন। ঘাটে সিন্দুকটি নিয়ে যাওয়া হল। তুমি এরপর কী করলে! সিন্দুকের ভেতর প্রবেশ করে যোগাসনে বসলে। বন্ধ করা হল সিন্দুকের ছিটকিনি, লাগানো হল তালা। তারপর কী হল! অবিস্মরণীয় সেই দৃশ্য। প্রবল আলোকচ্ছটায় চতুর্দিক ছেয়ে গেল। কী তার তেজ, কিন্তু কী সুন্দর তার বর্ণ! তুমি 'আগ্নেয়ীযোগ ধারণ' পূর্বক নিজের দেহকে ভস্মীভূত করে অমরধামে চলে গেলে। ব্রহ্মে ব্রহ্ম মিশে গেল, তুমি অনন্তে মিলে গেলে।

সূর্য তখন পশ্চিমাকাশে। তিনিও তোমাকে শেষবিদায় জানাবার জন্য বোধহয় থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন। বহুকাল আগে একদিন এই কাশীধামের লোলার্ক কুণ্ডে তার কর্ণকুণ্ডল খুলে পড়েছিল। লোলার্ক অর্থাৎ সূর্য।

সেদিন অস্তগামী সূর্যদেবতা তাঁর কুণ্ডলটি চিরতরে হারান। আজও তিনি অস্তাচলে। তোমাকে শেষবিদায় জানাতে গিয়ে তাঁরও চোখ থেকে গড়িয়ে পড়েছিল অশ্রুবিন্দু। এতকাল তিনি বহুবার কেঁদেছেন। কিন্তু সেদিন! বোধহয় তাঁর প্রখর তেজকে উপেক্ষা করে অশ্রুবিন্দু বাষ্প না হয়ে ঝরে পড়েছিল তোমার ওই সিন্দুকের ওপর। প্রখর বর্ণময় তেজপুঞ্জে মিশে গিয়েছিল লোলার্কদেবের সাতরঙা অশ্রু।

১২৯৪ সনের পৌষ মাসের শুক্লা একাদশী তিথি, রোহিণী নক্ষত্রে (ইংরেজি ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দ) সন্ধের কিছু আগে কাশীর সচল বিশ্বনাথ তুমি কাশীধাম ত্যাগ করলে। তোমার আগে আগ্নেয়ীযোগ ধারণ করে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ফিরে গিয়েছিলেন স্বধামে। তোমাকে শেষবিদায় জানাতে যে মন চাইছে না। আর একটু ঘুরে আসি স্বামী পরমানন্দের কাছ থেকে। তিনি লিখছেন, ১) শাস্ত্রে বর্ণিত আছে স্বেচ্ছামৃত্যু যোগীগণ সাধারণত 'আগ্নেয়ীযোগ ধারণ' দ্বারা নিজ দেহকে ভস্মীভূত করিয়া লোকান্তরে গমন করেন। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তা করেননি। শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লেখ আছে—

'লোকাভিরামাং স্বতনুং ধারণাধ্যানমঙ্গলম।
যোগধারণয়াগ্নেয্যাহদগ্ধা ধামাবিশৎস্বকম।।'

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ (দ্বাপর যুগে) ধ্যান ধারণার বিষয়ীভূত স্বীয় শ্রীবিগ্রহ আগ্নেয়ীযোগ ধারণ দ্বারা দগ্ধ না করিয়াই স্বধামে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন।

২) ভক্তপ্রবর ধ্রুবও সশরীরে নিত্যধামে গমন করেছিলেন।

৩) রাজা যুধিষ্ঠিরও হিমালয়ের সৎপথ থেকে সশরীরে স্বর্গে গমন করেন। মীরাবাঈয়ের ক্ষেত্রেও একই কথা শোনা যায়।

৪) মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের ক্ষেত্রেও বলা হয় তিনি জগন্নাথ ধামে অপ্রকট হয়েছিলেন। (তবে তাঁকে নিধন করা হয়েছিল বলেও অনেকে মনে করেন)।

আবার ফিরে যাই পঞ্চগঙ্গার ঘাটে। উমাচরণ মুখোপাধ্যায় চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন তোমার সিন্দুকের পাশে। তিনি পরবর্তীকালে লিখবেন, 'আমরা কয়েকজন তাঁহাকে সিন্দুকের ভিতর বিছানায় শয়ন করাইয়া স্ক্রু আঁটিয়া এবং চাবি বন্ধ করিয়া পঞ্চগঙ্গার নৌকায় তুলিয়া অসীঘাট হইতে বরুণা পর্যন্ত ভ্রমণ করিতে বাহির হইলাম।'

উমাচরণবাবুর বর্ণনার সঙ্গে শঙ্করী মাতাজির লেখা 'শেষ দৃশ্যের' কিছু ব্যতিক্রম লক্ষ করা যাচ্ছে। উমাচরণবাবু লিখছেন স্বামীজিকে শয়ন করানো হল, কিন্তু শঙ্করী মাতাজি বলেছেন শয়ন নয়, তিনি উপবেশন করেছিলেন। সন্ন্যাসীদের ক্ষেত্রে খুব সম্ভবত শয়ন করিয়ে সমাধি দেওয়া হয় না বলেই মনে হয়।

শঙ্করী মাতাজির গ্রন্থে যা রয়েছে এবার সেটা আপনাদের শোনাই। তোমার আদেশ মতো সেদিন সবকিছুই ঠিকঠাকভাবে করা হয়েছিল। নৌকা যাত্রা করেছিল নির্দিষ্ট পথে, আবার ফিরে এসেছিল 'আদি-সন্ন্যাসীগুরু-দত্তাত্রেয়' মন্দিরের সামনে। কিন্তু শেষ বিদায় জানাতে যে মন চাইছিল না। আর একবার, শেষবারের মতো তোমাকে দর্শন করার জন্য সবারই মন খুব উতলা হয়েছিল। অনেক আলাপ আলোচনার পর খোলা হল সিন্দুকের ডালা। কিন্তু তুমি কোথায়! সিন্দুক শূন্য! ফুল-মালা-আসন—সবই সুন্দর করে সাজানো আছে। কেবল তুমি নেই! শোকবিহ্বল ভক্তগণ সেদিন তোমার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে মেনেছিলেন। তুমি চেয়েছিলে জলসমাধি। তাই তো হল সেই বিষণ্ণ সন্ধ্যায়। দুটি নৌকা সরে গেল দুদিকে। প্রস্তরের সেই সিন্দুক ছপাং করে জলে পড়ল। একটা আলোড়ন, কিছুটা জলোচ্ছ্বাস। ভক্তদের অশ্রুবিন্দু মিলে গেল সেই জলবিন্দুর সঙ্গে। অশ্রুজল ও গঙ্গাজল এক হয়ে গেল। শেষবারের মতো তোমার অনুরোধে মা গঙ্গা তাঁর স্নেহস্পর্শে ধুয়ে দিলেন আমাদের শোকবিন্দু। মা গঙ্গা বহুক্ষণ অপেক্ষা করেছিলেন তোমার জন্য। তিনি দুহাত বাড়িয়ে

তোমাকে লুফে নিলেন নিজের অঙ্কে। ঘরের ছেলে ফিরে এলেন ঘরে। সেই দিব্যধামে তুমি তোমার চিরআসন পাতলে। দিব্য ফুল সমূহ ভেসে গেল অন্ত থেকে অনন্তের দিকে।

'মহাদেব মহাত্রাণ মহাযোগিনমীশ্বরম।
মহাপাপহরং দেব মকারায় নমো নমঃ।।'
ওঁ শিবায় নমঃ!

জীবন্মুক্ত মহাত্মা

ত্রৈলঙ্গস্বামী বিরচিত

মহাবাক্য-রত্নাবলী

ও

তাহার সরল বঙ্গানুবাদ

উমাচরণ মুখোপাধ্যায়

উৎসর্গ

যাঁহার অপরিসীম দয়া ও অসীম স্নেহের গুণে হৃদয়ের
আবিলতা দূর হইয়া
ভক্তিভাব প্রস্ফুরিত হইয়াছে,
যিনি অজ্ঞানান্ধকার নাশ করিয়া
হৃদয়ে নির্ম্মল ও পবিত্র জ্ঞানালোক সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছেন
যিনি সংসার সমুদ্রের অগাধ সলিলরাশির ভীষণ আবর্ত্তে
একমাত্র কর্ণধার হইয়া
পথ নিদর্শন করিয়া দিতেছেন,
যিনি কৃপা করিয়া নিজ করুণাকল্পতরুর সুশীতল ছায়ায়
এ অধমকে আশ্রয় দান করিয়া
চিরশ্রান্তি বিদূরিত করিয়া দিয়াছেন,
যিনি আমার মেঘাচ্ছাদিত ঘোরান্ধকারময় হৃদয়াকাশে
ধ্রুবতারা রূপে সর্ব্বক্ষণ বিরাজিত,
যাঁহার পবিত্র করস্পর্শে
আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত,
সেই পরমারাধ্য, শ্রদ্ধাস্পদ, ভক্তিভাজন শ্রীমৎ গুরুদেবের
শ্রীচরণ কমলে,
এই অমূল্যরত্ন ভক্তি পুষ্পাঞ্জলিরূপে
উৎসর্গীকৃত
হইল।

''দাসানুদাস উমাচরণ''

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

জীবন্মুক্ত মহাত্মা তৈলঙ্গস্বামীর নাম অনেকেই বিদিত আছেন, এমনকী তাঁহার অলৌকিক ঘটনাবলি নিজ চক্ষে দেখিয়াছেন এরূপ লোকও এখনও জীবিত আছেন। সেই মহাত্মার জীবনচরিত ও তত্ত্বোপদেশ লেখক এবং এই গ্রন্থের প্রকাশক তাঁহার অন্যতম শিষ্য শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত উমাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার অধিকাংশ অমানুষিক ঘটনাবলি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। যখনই সংসারে প্রবল অধর্ম্মের উদয় হয়, তখনই ভগবান স্বয়ং এইরূপ মহাপুরুষের দেহে আবির্ভূত হয়েন। 'ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি'—ব্রহ্ম-বেত্তা পুরুষ স্বয়ং ব্রহ্ম হয়েন, এই শ্রুতিবাক্যের যথার্থতা মহাত্মা তৈলঙ্গস্বামীই দেখাইয়াছেন। এইরূপ শ্রুতিস্মৃতিভ্রষ্ট অধর্ম্মবহুল সময়ে মহাত্মা তৈলঙ্গস্বামীর জবিনচরিত ও তাঁহার উপদিষ্ট তত্ত্বোপদেশ এবং তাঁহার বিরচিত মহাবাক্যরত্নাবলি ও তাহার বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়া শ্রীযুক্ত উমাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় জগতের যে কী উপকার করিলেন, তাহা আমি সামান্য লেখনী দ্বারা কী লিখিব? তাঁহার উক্ত গ্রন্থাবলি ত্রিতাপে তাপিত মানবগণের ভবরোগ নাশের পরম ভেষজস্বরূপ এবং সংসারানলে দগ্ধ হৃদয়ের অমৃতবারিস্বরূপ। আমার বিশ্বাস, উক্ত গ্রন্থনিচয়ে ভগবানকে পাইবার সহজ উপায় নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এই মহাবাক্যরত্নাবলিখানি সমুদ্রমন্থনের সার অমৃতের ন্যায় ঈশাদিন ১০৮ (একশত আট) উপনিষদের সার সঙ্কলন। দুর্ব্বোধ উপনিষদকে অজ্ঞলোকের সহজে বোধগম্য করাইবার জন্য জীবন্মুক্ত পরম কারুণিক তৈলঙ্গস্বামী কৃপাপরবশ হইয়া এই মহাবাক্যরত্নাবলিতে সমস্ত উপনিষদের সার সংগ্রহ করিয়াছেন—ইহা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আমার বিশ্বাস শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া এই মহাবাক্যরত্নাবলির পুনঃপুনঃ পাঠে বেদান্তের যাবতীয় বিষয়ই অতি সহজে সকলের হৃদয়ঙ্গম হইবে, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। মুমুক্ষু গৃহস্থ এবং সন্ন্যাসীর ইহা যে পরম আদরের ধন হইবে, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। শাস্ত্র বলিতেছেন, 'যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়োপনিষদা তদেব বীর্য্যবত্তরং ভবতি।' সকল কার্য্যেই শ্রদ্ধার প্রয়োজন। শ্রদ্ধাসম্পন্ন মনুষ্যই কার্য্যে সফলতা লাভ করে।

যাঁহারা শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া এই মহাবাক্যরত্নাবলি নামক বেদান্ত গ্রন্থখানি পুনঃপুনঃ অনুশীলন করিবেন, তাঁহাদের অবিদ্যাগ্রন্থি ছিন্ন হইয়া মুক্তির পথ প্রশস্ত হইবে ইহা ধ্রুব। মনুষ্যের ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের মধ্যে মোক্ষই একমাত্র প্রার্থনীয়।

সেই মোক্ষ আবার ব্রহ্মজ্ঞানসাপেক্ষ, সেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপায়স্বরূপ শ্রুতিতে বেদান্তবাক্য সকলের (মহাবাক্য সকলের) শ্রবণ মনন এবং নিদিধ্যাসন উক্ত হইয়াছে। শ্রবণাদি বিষয়ে শ্রুতির উপদেশ, 'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়ি; আত্মনো বা দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেনেদং সর্ব্বং বিদিতম।'

হে মৈত্রেয়ি সর্ব্বাধিক প্রিয় পরমাত্মাকেই দর্শন করিবে। ব্রহ্মবেত্তা এবং আচার্য্যের উপদেশ হইতে ব্রহ্মের স্বরূপ শ্রবণ করিবে বা জ্ঞাত হইবে, তদনন্তর উক্ত উপদেশ সকলের শাস্ত্রাবিরোধ তর্ক দ্বারা অনুসন্ধানতৎপর হইয়া মনন অর্থাৎ স্বরূপ অবধারণ করিবে। তাহার পর নিদিধ্যাসন অর্থাৎ নিঃসংশয়রূপে ব্রহ্ম স্বরূপের ধ্যান করিবে। হে মৈত্রেয়ি, আত্মার দর্শনে, শ্রবণে, মননে ও নিদিধ্যাসনেই ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হয় এবং তখন সেই ব্রহ্মবেত্তা পুরুষের কিছুই অবিদিত থাকে না। এক্ষণে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, শ্রদ্ধাসম্পন্ন সহৃদয়গণ এই মহাবাক্যরত্নাবলিরূপ অমৃতফল আস্বাদন করিয়া যেন তাঁহারা অমৃতস্বরূপই হন।

শ্রীসত্যচরণ শর্ম্মা সাংখ্যবেদান্ততীর্থ।

কলিকাতা
১৬নং অদ্বৈতচরণ মল্লিক লেন,

রামবাগান।

ভূমিকা

মহাত্মা ত্রৈলঙ্গস্বামী ভারতের সাধনগগনে এক বিস্ময়কর জ্যোতিষ্ক। বহু সাধকের বহু সাধনায় ধন্য এই পুণ্যভূমি। ত্রৈলঙ্গ মহারাজ এক ব্যতিক্রম। প্রথম বিস্ময় তাঁর দীর্ঘ অকল্পনীয় আয়ু। ২৮০ বছর। তাঁর জীবৎকালে কত ঘটনা ঘটে গেছে! বিধাতা পুরুষের মতো তিনি সাক্ষী। মুঘল যুগের অবসান। ইংরেজ অভ্যুত্থান। সমাজ জীবনের ধীর রূপান্তর। আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি ক্রমশই গুটিয়ে আসছিল হিমালয়ের কোলে। বেদান্ত গুহাবাসী। তবে ভারতের আধ্যাত্মিক প্রাণকেন্দ্র কাশীর মাহাত্ম্য ম্লান হয়নি। শিবভূমি। ত্রৈলঙ্গস্বামীর সাধন ক্ষেত্র। দিগম্বর মৌনী মহাদেব। রূপ-অরূপের ঊর্ধ্বে ব্রহ্মস্বরূপ। এই অবস্থায় কোন পথে উপনীত হয়েছিলেন তা বলা যায় না। তাঁর জীবনের অনেকটাই রহস্যাবৃত। এই গ্রন্থটি পাঠ করলে বোঝা যায় তিনি ব্রহ্ম লাভ করেছিলেন। তাঁরই বলা সাজে অহং ব্রহ্মাস্মি। আমিই ব্রহ্ম।

ত্রৈলঙ্গ মহারাজের শিষ্য-শিষ্যা সংখ্যা বেশি না হওয়ার একটিই কারণ। তিনি আধার দেখতেন। ব্রহ্ম-সাধন সহজ নয়। জ্ঞান যোগ। ভিত্তি উপনিষদ। মুণ্ডকোপনিষদ বলছেন,

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো
ন চ প্রমাদাত্তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ।

এই আত্মা বলহীনের দ্বারা লভ্য নহেন, প্রমাদের দ্বারা বা সন্ন্যাসরহিত জ্ঞানের দ্বারাও লভ্য নহেন। তাহলে? 'আমি পরমাত্মা' এই অভেদ অনুসন্ধানই একমাত্র পথ।

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।

বহু শাস্ত্র অভ্যাস করে আত্মাকে পাওয়া যায় না। মেধার দ্বারা পাওয়া যায় না। বহু শ্রবণের দ্বারাও পাওয়া যায় না। কিন্তু পেতেই হবে। ত্রৈলঙ্গস্বামী সেই পাওয়ার সাধনাই করতে বলছেন। তাঁর অস্ত্র তাঁর গুরু হলেন উপনিষদসমূহ। সাধারণের মধ্যে অপ্রচলিত বহু উপনিষদ সাধন জগতের অন্তরালে আছে, যাতে আছে ব্রহ্মলাভের দিগনির্দেশ। যেমন পৈঙ্গলোপনিষদ, পরমহংসপরিব্রাজকোপনিষৎ, নারদ পরিব্রাজকোপনিষৎ, যোগতত্ত্বোপনিষৎ, তেজোবিন্দূপনিষৎ, শাট্যায়নীয়োপনিষৎ, ত্রিশিখিব্রাহ্মণোপনিষৎ, বরাহোপনিষৎ, নিরালবোপনিষৎ, ব্রহ্মবিন্দূপনিষৎ, ধ্যানবিন্দূপনিষৎ, সন্ন্যাসোপনিষৎ, অন্নপূর্ণোপনিষৎ, যোগকুণ্ডল্যুপনিষৎ ইত্যাদি। এই সব উপনিষদ সাধক সন্ন্যাসীদের জন্যে। মুক্তি পথের সন্ধান দেয়। সাহসের প্রয়োজন। জীবন বিশাল, বিরাট, স্বরাট ইত্যাদি মহৎ উদ্দীপক কথা বৈঠকখানার বসে দাঁড়ের টিয়ার মতো কপচাতে ভালোই লাগে, কিন্তু 'পরমহংস পরিব্রাজক উপনিষদে' বলা হয়েছে,

'আশাম্বরো নমস্কারো নস্বকাকারো।।
ননিন্দাস্তুতির্যাদৃচ্ছিকো ভবেৎ।।'

দিগম্বর এবং কাহাকেও নমস্কার যজ্ঞাদি বিষয়ে স্বাহা ও স্বধাকার এবং নিন্দাস্তুতি বর্জ্জিত হয়ে যদৃচ্ছাভাবে নিজের ব্রহ্মস্বরূপের বিচরণ করবে।

ত্রৈলঙ্গস্বামী এই উপদেশই দেবেন শিষ্যকে। 'নারদপরিব্রাজকোপনিষদ' অনুসারে বলবেন, 'তোমার প্রারব্ধই তোমার মিথ্যাজ্ঞানের উৎস। এই মিথ্যাজ্ঞান নাশ করে ব্রহ্মস্বরূপকে দর্শন করাই সাধনা। স্বরূপ অনুসন্ধান ছাড়া আর কোনো কাজ তোমার নেই। জীবন্মুক্তিই তোমার লক্ষ্য।

তাঁর কুড়ি জন শিষ্যের মধ্যে উমাচরণ মুখোপাধ্যায় নিজগুণে অগ্রগণ্য। মহাপুরুষ তাঁকে আপাদমস্তক পরীক্ষা করে গ্রহণ করেছিলেন। সিদ্ধ বিদ্যার অধিকার প্রদান করেছিলেন। গুরু ত্রৈলঙ্গস্বামী তাঁর শিষ্যদের জন্য উপনিষদ মন্থন করে এই অমূল্য শাস্ত্রটি সাধন নির্দেশিকা হিসেবে সঙ্কলিত করে দিয়েছিলেন। অনুলিখন

করেছিলেন উমাচরণ মুখোপাধ্যায়। অনুবাদও তাঁর। অতি সুন্দর প্রাঞ্জল। উপসংহার সহ একুশটি অধ্যায়। স্তরে স্তরে সাধক এগোবেন পরম প্রাপ্তির দিকে। ব্রহ্মলাভ। অর্থাৎ সেই অবিনাশী আত্মা বা ব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়া। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেমন বলেছেন,

অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্বমিদং ততম।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্তুমর্হতি।।

যিনি এই সমগ্রজগৎ পরিব্যাপ্ত করে আছেন, তিনিই অবিনাশী আত্মা, অব্যয়। মুণ্ডকোপনিষৎ বলছেন,

ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদব্রহ্ম পশ্চাদব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ।

সেই অমৃতস্বরূপ ব্রহ্ম পুরোভাগে পশ্চাদভাগে দক্ষিণ এবং উত্তর দিকে অবস্থিত। সেই ব্রহ্ম অধঃ এবং ঊর্ধ্বদিকে ব্যাপ্ত। এই বিশ্ব বরণীয় ব্রহ্মস্বরূপ।

এই বিশ্ব ভোগীর দৃষ্টিতে একরকম যোগীর দৃষ্টিতে আর একরকম। ভোগের ইচ্ছাই মানুষকে মায়ার ফাঁদে ফেলে। আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে সংসার। ব্রহ্মে অবস্থান করেও ব্রহ্ম থেকে বহু দূরে। ত্রৈলঙ্গস্বামীর 'মহোপনিষৎ' থেকে এই শ্লোকটি চয়ন করেছেন—

যস্য স্ত্রী তস্য ভোগেচ্ছা নিস্ত্রীকস্য ক্ব ভোগভূঃ।।
স্ত্রিয়ং ত্যক্ত্বা জগত্যক্তং জগত্যক্ত্বা সুখী ভবেৎ।।

যাহার স্ত্রী আছে তাহারই স্ত্রী সম্ভোগেচ্ছা সম্ভব, যাহার স্ত্রী নাই তাহার স্ত্রী সম্ভোগের উৎপত্তি কোথায়? স্ত্রী সম্ভোগেচ্ছা ত্যাগ করলেই জগৎ ত্যাগ করিতে সমর্থ হয় এবং জগৎ ত্যাগ করিলেই মানুষ সুখী হয়।

চিত্ত এবং পুরুষার্থ পরস্পর জড়িত। পুরুষার্থের কারণেই চিত্ত। চিত্ত থাকলেই ত্রিজগৎও থাকবে। চিত্ত ক্ষীণ হলে জগতের, জাগতিক বিষয়ের ক্ষয় হয় অতএব চিত্তব্যাধির চিকিৎসা যত্ন সহকারে করবে। সেই চিকিৎসাটা কি? কে করবে? নিজেকেই করতে হবে। নিদ্রা থেকে নিদ্রার মধ্যবর্তী যেটুকু জাগরণের কাল, সেই সময়টায় তুমি আর কিছু ভেবো না শুধু ব্রহ্মকেই ভাবো। যে অবস্থায়, যেভাবেই থাকো ব্রহ্ম ভাবনা থেকে বিচ্যুত হয়ো না।

মননশীল মানুষের পথ ধ্যান। মনে করো তুমি ব্রহ্মে আছ। ব্রহ্মেই তোমার বসবাস। আর যদি যোগী হও তাহলে ভ্রূমধ্যে ব্রহ্মের জ্যোতির্ময় স্বরূপকে ভাববে। আত্মস্বরূপই ব্রহ্ম। দূরে নয় অন্তরে। অন্দরে। কিন্তু সাধন চাই। সব ত্যাগ করে একাকী নিস্পৃহ অবস্থান। মৌনী। সন্ন্যাস গ্রহণ করতে হবে। কৌপীনধারী অথবা নগ্ন। কোনো বাসনা নেই, প্রার্থনা নেই। পরমাত্মাই আমার একমাত্র অবলম্বন, আমার আশ্রয়।

'নারদ পরিব্রাজকোপনিষৎ' উদ্ধৃত করেছেন,

সন্দিগ্ধঃ সর্বভূতানাং বর্ণাশ্রমবিবর্জিতঃ।।
অন্ধবজ্জবচ্চাপি মূকবচচ মহীং চরেৎ।।

সকলের কাছ থেকে আত্মগোপন করে থাকবে। বর্ণাশ্রম রহিত, অন্ধের ন্যায়, জড়ের ন্যায়, বোবার ন্যায় পৃথিবীতে ভ্রমণ করবে।

যদযৎ পশ্যতি চক্ষুর্ভ্যাং তত্তদাত্মেতি ভাবয়েৎ।।
যদয়চ্ছৃণাতি কর্ণাভ্যাং তত্তদাত্মেতি ভাবয়েৎ।।
লভতে নাসয়া যদযওত্তদাত্মেতি ভাবয়েৎ।।
জিহ্বয়া যদ্রসং হ্যত্তি তত্তদাত্মেতি ভাবয়েৎ।।
ত্বচা যদযৎ স্পৃশেদযোগী তত্তদাত্মেতি ভাবয়েৎ।।

[যোগতত্ত্বোপনিষৎ]

সাধন পদ্ধতি হল তীব্র নিবিড় ভাবনা। 'চক্ষুদ্বারা যাহা দর্শন করিবে তাহা ব্রহ্মস্বরূপ ভাবনা করিবে। কর্ণ দ্বারা যাহা শ্রবণ করিবে তাহাও ব্রহ্মস্বরূপ ভাবনা করিবে। নাসিকা দ্বারা যে গন্ধ গ্রহণ করিবে এবং জিহ্বা

দ্বারা যে রস আস্বাদন করিবে তাহাও ব্রহ্ম বলিয়া ভাবনা করিবে। ত্বক দ্বারা যাহা স্পর্শ করিবে তাহাও ব্রহ্মময় বলিয়া ভাবিবে।'

অবশেষে 'তেজোবিন্দূপনিষদের নির্দেশ,

দৃষ্টি জ্ঞানময়ীং কৃত্বা পশ্যোদব্রহ্মময়ং জগৎ'

নিজের দৃষ্টিকে জ্ঞানময়ী করিয়া সমস্ত জগৎ ব্রহ্মময় দর্শন করিবে। যাবৎ ব্রহ্মেতে মন একাগ্র না হয় তাবৎ রেচক পূরক এবং কুম্ভকাত্মক প্রাণায়াম অভ্যাস করতে হবে। ব্রহ্ম ভিন্ন অন্যত্র মনোবৃত্তিকে সংযুক্ত করবে না। ব্রহ্ম ভাবনা, ব্রহ্মে বিহার আহার শয়ন সুপ্তি জাগরণ। প্রকৃতই রত্নখনি এই মহাকাব্য রত্নাবলী। অক্ষর ব্রহ্ম অক্ষর গুরু সাধকের সাথ সঙ্গী হওয়া উচিত। হওয়া উচিত গৃহীর ধ্যান জ্ঞান। জগৎকারাগার হতে মুক্তির 'স্বর্ণচাবি'। এই চাবিটিকে পরম যত্নে রক্ষা করা উচিত। মানব সংস্কৃতির সেই স্বর্গদ্বার উন্মোচিত হবে।

সূচিপত্র

মঙ্গলাচরণ।

পঞ্চশান্তয়ঃ

বাক-পূর্ণ-সহনাপ্যায়ং-ভদ্রং কর্ণেভিরেব চ!
পঞ্চশান্তীঃ পঠিত্বাদৌ পঠেদ্বাক্যান্যনন্তরম।।

(বাক) ওঁ বাঙ্মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা, (পূর্ণ) ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং, (সহনা) ওঁ সহ নাববতু, (আপ্যায়ং) ওঁ আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি এবং ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ ইত্যাদি পঞ্চ শান্তি পাঠ করত পরে এই মহাবাক্যরত্নাবলী পাঠ করিবে।।

ওঁ বাঙ্মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা মনো মে বাচি প্রতিষ্ঠিতমাবিরাবীর্ম এধি।।
বেদস্য ম আণীস্থঃ শ্রুতং মে মা প্রহাসীরনেনাধীতেনাহোরাত্রান্ত
সংদধামৃযতং বদিষ্যামি সত্যং বদিষ্যামি তন্মামবতু তদ্বক্তারমবতু অবতু
মামবতু বক্তারমবতু বক্তারম।। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।।১

হে স্বপ্রকাশ পরমাত্মন! আমার বাক্য (অন্তঃকরণ) মনেতে প্রতিষ্ঠিত এবং আমার মন বাক্যেতে প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যাপ্রতিপাদক যাহা কিছু বক্তব্য, তাহা প্রথমে মনেতে উদয় হয়, তৎপরে বাক্যদ্বারা উক্ত হয়, অতএব হে প্রভো! আমার মন এবং বাণী সদা যেন আপনার কৃপায় সাবধান হইয়া আপনার তত্বানুসন্ধানে নিযুক্ত থাকে। হে প্রকাশময় ব্রহ্ম চৈতন্য! আপনি আমার অবিদ্যাবরণাপনোদনার্থ আমার অন্তরে প্রকাশিত হউন। হে ভগবন! আপনার কৃপায় আমার বাক্য এবং মন যেন বেদবিদ্যা আনয়নে সমর্থ হয়। হে প্রভো! (শ্রুতং) গুরুমুখ হইতে শ্রুত আমার তত্বজ্ঞান যেন আমাকে পরিত্যাগ না করে অর্থাৎ আমি যেন বিস্মৃত না হই। হে প্রভো! আমি যেন আমার এই অধীত বিদ্যা আলস্যরহিত হইয়া দিবারাত্রি চর্চা করি। এই অধীত বিদ্যায় (ঋতং) পরমার্থভূতবস্তু যেন বলিতে থাকি এবং সত্য অর্থাৎ ব্যবহারিক যথাভূত অর্থ যেন বলিতে থাকি। (তৎ) সেই ব্রহ্ম তত্ব শিষ্যস্থানীয় আমাকে সদা রক্ষা করুন এবং সেই ব্রহ্মতত্ব বক্তা অর্থাৎ ব্রহ্মতত্বোপদেষ্টা গুরুকে রক্ষা করুন।। হে সর্ব্বরক্ষক! আপনার কৃপায় আমাদের আধ্যাত্মিকাদি ত্রিতাপ যেন সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হয়।।১

ওঁ পূর্ণমদং পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।।২

(অদঃ) যে সকল পদার্থ ইন্দ্রিয়ের অগোচর (সূক্ষ্ম), তাহা ব্রহ্ম দ্বারা ব্যাপ্ত অর্থাৎ পূর্ণ; (ইদং) যে সকল পদার্থ ইন্দ্রিয়-গোচর অর্থাৎ প্রত্যক্ষ, তাহাও ব্রহ্ম দ্বারা পূর্ণ; এবং এই সমস্ত জগৎই ব্রহ্ম হইতে অভিব্যক্ত হইয়াছে ও সেই পূর্ণস্বভাব ব্রহ্মের পূর্ণতা জগৎব্যাপ্ত হইলেও তাঁহার পূর্ণতা অবশিষ্ট থাকে অর্থাৎ পূর্ণতার হানি হয় না।। (ওঁ) হে মঙ্গলময় সর্ব্বরক্ষক পিতঃ! (শান্তিঃ) আমাদিগের আধ্যাত্মিক, আধিদৈবক এবং আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ তাপ আপনার কৃপায় যেন সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হয়।।২

ওঁ সহ নাববতু সহ নৌ ভুনক্তু
সহ বীর্য্যং করবাবহৈ। তেজস্বি নাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ।।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।।৩

সেই প্রসিদ্ধ প্রণবাখ্য পরমেশ্বর শিষ্য এবং আচার্য্য উভয়কে (অবতু) বিদ্যারূপ প্রকাশ দ্বারা রক্ষা করুন এবং (সহ নৌ ভুনক্তু) সেই প্রসিদ্ধ পরমেশ্বর (শিষ্যাচার্য্য) আমাদিগকে বিদ্যাফল ভোগ করান। (সহ) আমরা শিষ্য এবং আচার্য্য উভয়ে মিলিয়া (বীর্য্যং) বিদ্যাকৃত সামর্থ্য (করবাবহৈ) যেন তাঁহার কৃপায় নিষ্পন্ন করিতে সমর্থ হই। হে তেজস্বিন! আমাদিগের (অধীতং) অধীত বিদ্যা আপনার কৃপায় বীর্য্যবান হউক। (মা বিদ্বিষাবহৈ) হে প্রভো! আমরা যেন প্রমাদ বশতঃ কখনই পরস্পরের বিদ্বেষভাজন না হই।।৩

ওঁ আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি বাক প্রাণশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রমথো বলমিন্দ্রিয়াণি
চ সর্ব্বাণি সর্ব্বং ব্রহ্মোপনিষদং মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং মা মা ব্রহ্ম
নিরাকরোদনিরাকরণমস্ত্বনিরাকরণং মে অস্তু তদাত্মনি নিরতে য
উপনিষৎসু ধর্ম্মাস্তে ময়ি সন্তু তে ময়ি সন্তু।। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।।৪

হে ঈশ্বর! আপনার কৃপায় আমার সমস্ত অঙ্গ, বাক, প্রাণ, চক্ষু, শ্রোত্র, বল ও ইন্দ্রিয় বৃদ্ধি বা পুষ্টিলাভ করুক। উপনিষৎপ্রতিপাদিত ব্রহ্ম আমার নিকট প্রতিভাত হউন। আমি যেন ব্রহ্মকে নিরাকরণ বা অস্বীকার না করি এবং ব্রহ্ম যেন আমাকে প্রত্যাখ্যান বা পরিত্যাগ না করেন। তাঁহার নিকট আমার এবং আমার নিকট তাঁহার সর্ব্বদা অপ্রত্যাখ্যানতা বিদ্যমান থাকুক এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ আমাতে উপনিষদুক্ত ধর্ম্মসকল প্রকাশিত হউক।।৪

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবাঃ। ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ।
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টু বাংসস্তনূভিঃ। ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ।।
স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ। স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ।
স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ। স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।।৫

হে দেবগণ! আমরা কর্ণদ্বারা যেন কল্যাণকর বিষয় শ্রবণ করি, চক্ষুদ্বারা যেন মঙ্গলময় দৃশ্য দর্শন করি এবং স্থিরতর দেহে স্তোত্রপরায়ণ হইয়া যেন দেবগণের হিতকর আয়ু ভোগ করিতে সমর্থ হই।। (স্বস্তি) এই মন্ত্রে মন্দবুদ্ধির উপর কৃপাদৃষ্টির জন্য ভগবানকে প্রার্থনা করা হইতেছে। (ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ) হে ত্রিলোকপতিসর্ব্বৈশ্বর্য্যদাতঃ ঈশ্বর! হে বৃহৎ কীর্ত্তিযুক্ত ইন্দ্র! আপনার কৃপায় আমাদিগের মন কলল্যাণযুক্ত হউক। হে সর্ব্বজ্ঞ! হে পুষ্টিকর্ত্তঃ ঈশ্বর! আপনি সর্ব্বপ্রকার কল্যাণ দ্বারা আমাদিগকে অনুগৃহীত করুন। হে অকুণ্ঠিতগতি তার্ক্ষ্যদেব অর্থাৎ গরুড়! আপনি আমাদের কল্যাণ বিধান করুন, এবং হে দেবগুরু বৃহস্পতি! আপনি আমাদের মঙ্গল বিধান করুন। শান্তি, শান্তি, শান্তি।।৫

অথ সার্দ্ধান্তিকবিধিবাক্যানি।।১।।

বেদবিহিত বিধিবাক্য সকল অর্থাৎ ব্রহ্মবোধক বাক্য সকল উক্ত হইতেছে।

সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত।।১

(সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম) নিজ-অজ্ঞান-বিকল্পিত ইদং-পদবাচ্য ব্যক্ত-প্রপঞ্চ সকল ব্রহ্মই স্বয়ং; যেহেতু নিমিত্তোপাদন কারণ ব্রহ্মই স্বয়ং কার্য্যরূপ প্রপঞ্চাকারে প্রকাশিত হয়েন। (তজ্জলানিতি) কারণ, প্রপঞ্চসমূহ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, তাঁহাতে স্থিত এবং তাঁহাতেই লয় প্রাপ্ত হয় অতএব কার্য্যকারণকল্পনা-রহিত হইয়া 'একমাত্র, প্রতিযোগিরহিত ব্রহ্মই আমি' এইরূপ উপাসনা-পরায়ণ হইবে, অর্থাৎ ব্রহ্মানুসন্ধানে সদা রত থাকিবে।।১

আত্মানমেবাবেদহং ব্রহ্মাস্মীতি।।২

হে মৈত্রেয়ি! সর্ব্বাপহ্নবসিদ্ধ পরমাত্মাই আমি, ইহা দ্রষ্টব্য, (সাক্ষাৎ জ্ঞেয়)। বেদান্তবাক্য শ্রবণ, তাহার অর্থের মনন এবং মননানন্তর যোগযুক্ত হইয়া নিদিধ্যাসন অর্থাৎ ধ্যান ও তদনন্তর 'ব্রহ্মই আমি' এইরূপ সাক্ষাৎকরণই ইহা জানিবার উপায়।।২

আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।।৩

হে মনুষ্য বা প্রিয় শিষ্য! আত্মাকেই সাক্ষাৎ করিবে। শ্রুতি দ্বারা আত্মবিষয় শ্রবণ, যুক্তি দ্বারা আত্মবিষয়ের মনন এবং আত্মবিষয়ের নিদিধ্যাসন অর্থাৎ যোগযুক্ত হইয়া সাক্ষাৎকরণই আত্মসাক্ষাৎকারের উপায়।।৩

মহৎ পদং জ্ঞাত্বা বৃক্ষমূলে বসেৎ।।৪

মহৎপদ ব্রহ্মকে জানিয়া বৃক্ষমূল আশ্রয় করিবে অর্থাৎ গৃহত্যাগ করিবে।।৪

সচ্চিদানন্দাত্মানমদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম ভাবয়েৎ।।৫

সচ্চিদানন্দস্বরূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে ভাবনা করিবে।।৫

অহং ব্রহ্মাস্মীত্যনুসন্ধানং কুর্য্যাৎ।।৬

আমিই ব্রহ্ম এরূপ অনুসন্ধান বা বিচার করিবে।।৬

স তজজ্ঞো বালোন্মত্তপিশাচবজ্জড়বৃত্ত্যা লোকমাচরেৎ।।৭

সেই ব্রহ্মজ্ঞ, বালক উন্মত্ত এবং পিশাচের ন্যায় জড়বৃত্তি দ্বারা নিজস্বরূপ গোপন করিয়া লোকালয়ে বিচরণ করিবে।।৭

ব্রাহ্মণঃ সমাহিতো ভূত্বা তত্ত্বংপদৈক্যমেব সদা কুর্য্যাৎ।।৮

ব্রহ্মবেত্তা একাগ্রচিত্ত হইয়া তত্বমসি অর্থাৎ তৎ এবং ত্বং পদের ঐক্য ভাবনা করিবে অর্থাৎ জীবব্রহ্মের ঐক্য চিন্তা করিবে।।৮

সর্ব্বত্রাদ্বৈতব্রহ্মবুদ্ধিং কুর্য্যাৎ।।৯

সর্ব্বত্র দ্বৈতরহিত ব্রহ্মজ্ঞান করিবে অর্থাৎ নিজ আত্মাকে ব্রহ্মরূপে ভাবনা করিবে।।৯

আশাম্বরো ননমস্কারো নস্বাহাকারো নস্বধাকারো
ননিন্দাস্তুতির্যাদৃচ্ছিকো ভবেৎ।।১০

দিগম্বর, এবং কাহাকেও নমস্কার, যজ্ঞাদি বিষয়ে স্বাহা ও স্বধাকার এবং নিন্দাস্তুতি-বর্জ্জিত হইয়া যদৃচ্ছাভাবে নিজ ব্রহ্মস্বরূপে বিচরণ করিবে।।১০

সর্ব্বতঃ স্বরূপমেব পশ্যন জীবন্মুক্তিমবাপ্য
প্রারব্ধপ্রতিভাসনাশপর্য্যন্তং স্বরূপানুসন্ধানেন বসেৎ।।১১
স্বরূপানুসন্ধানং বিনান্যথাচারপরো ন ভবেৎ।।১২

সমস্ততেই নিজ ব্রহ্মস্বরূপকে দর্শন করিয়া জীবন্মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া প্রারব্ধকর্ম্মজন্য মিথ্যাজ্ঞান নাশ পর্য্যন্ত নিজ ব্রহ্মস্বরূপানুসন্ধানে রত থাকিয়া অবস্থান করিবে। স্বরূপানুসন্ধান ব্যতিরেকে অন্য কার্য্য কিছু করিবে না।। ১১,১২

বেদান্তশ্রবণং কুর্ব্বন যোগং সমারভেৎ।।১৩
আকুঞ্চনেন কুণ্ডলিন্যা কপাটমুঘাট্য মোক্ষদ্বারং বিভেদয়েৎ।।১৪

বেদান্তগ্রন্থ শ্রবণপূর্ব্বক যোগানুষ্ঠান করিবে। কুণ্ডলিনী শক্তির আকুঞ্চন দ্বারা তাহার কপাটকে উদঘাটন করত মোক্ষদ্বারকে ভেদ অর্থাৎ উদঘাটন করিবে।।১৩,১৪

যচ্ছেদ্বাঙ্মনসী প্রাজ্ঞস্তদযচ্ছেজজ্ঞান আত্মনি।।১৫
জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিযচ্ছেত্তদযচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি।।১৬

প্রাজ্ঞব্যক্তি বাক্য মন সংযত করিবে, উহা জ্ঞানে সংযত করিবে, এবং জ্ঞান আত্মায় সংযত করিবে। মহান আত্মায় জ্ঞানকে নিয়মিত করত আত্মাতে অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপে শান্ত হইয়া সংযত অবস্থায় থাকিবে।।১৫,১৬

আত্মানং চেদ্বিজানীয়াদয়মস্মীতি পূরুষঃ।।১৭
কিমিচ্ছন কস্য কামায় শরীরমনু সংজ্বরেৎ।।১৮

যদি নিজ আত্মাকে ব্রহ্মরূপে জানিতে পারো, তাহা হইলে কিসের জন্য কামনা করিবে? কামনা করিয়া বা কোন বস্তুর কামনাতে নিজ শরীরকে পীড়াদান করিবে? যেহেতু কামনাই দুঃখের মূল। তুমি যদি নিজে ব্রহ্মস্বরূপ হইলে, তাহা হইলে তোমার আর প্রার্থনার বিষয় কী রহিল?।।১৭,১৮

তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণঃ।।১৯
নানুধ্যায়াদ্বহূঞ্ শব্দান্বাচো বিগ্লাপনং হি তৎ।।২০

ধীর ব্রাহ্মণ ব্রহ্মকে জানিয়া নিজস্বরূপ জ্ঞান করিবে। তাঁহাকে বহু বাক্য দ্বারা অনুধ্যান করিবে না, কারণ বহু বাক্য দ্বারা অনুধ্যান করিলে বাক্যের অপব্যবহার মাত্র করা হয় অর্থাৎ তাহাতে বুদ্ধিভ্রংশ হয়।।১৯,২০

যতো নির্ব্বিষয়স্যাস্য মনসো মুক্তিরিষ্যতে।।২১
অতো নির্বিষয়ং নিত্যং মনঃ কার্য্যং মুমুক্ষুণা।।২২

যেহেতু মন নির্ব্বিষয় (বিষয়শূন্য) হইলে মুক্তিলাভ হয়, অতএব মুক্তিকামী পুরুষের মনকে নির্বিষয় অর্থাৎ বাসনাবর্জ্জিত করাই কর্ত্তব্য।।২১,২২

চিত্তমেব হি সংসারস্তৎ প্রযত্নেন শোধয়েৎ।।২৩

চিত্ত হইতেই সংসার (ভোগ) উৎপন্ন, অতএব চিত্তকে যত্নপূর্ব্বক শুদ্ধ করিবে।।২৩

দৃশ্যং হ্যদৃশ্যতাং নীত্বা ব্রহ্মাকারেণ চিন্তয়েৎ।।২৪
মায়াকার্য্যমিদং ভেদমস্তি চেদ্বহ্মভাবনম।।২৫

এক্ষণে ভাবনার স্বরূপ উক্ত হইতেছে :—দৃশ্য জগৎকে অদৃশ্যব্রহ্মরূপে ভাবনা করিয়া দৃশ্যকে ব্রহ্মরূপে ভাবনা করিবে। এই প্রত্যক্ষ জগৎ মায়াকার্য্য এবং অনন্তভেদযুক্ত, এইরূপ জ্ঞানেতে 'সমস্তই ব্রহ্ম' এই ভাবনা করিবে।।২৪,২৫

দেহোহহমিতি দুঃখং চেদ্বহ্মাহমিতি নিশ্চয়ঃ।।২৬

যদি মায়াকার্য্য দেহেতে আত্মাভিমানবশতঃ দুঃখ উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে উক্ত আত্মাভিমান ত্যাগ করত 'আমিই ব্রহ্ম' এইরূপ নিশ্চয় করিবে।।২৬

হৃদয়গ্রন্থিরস্তিত্বে ছেদনে ব্রহ্মচক্রকম।।২৭
সংশয়ে সমনুপ্রাপ্তে ব্রহ্মনিশ্চয়মাপ্নুয়াৎ।।২৮

হৃদয়গ্রন্থিরূপ অবিদ্যার অস্তিত্ব ছেদনে ব্রহ্মচক্রই সমর্থ। 'আমি ব্রহ্ম কি না' এই সংশয়জ্ঞান উৎপন্ন হইলে 'আমিই ব্রহ্ম' এরূপ নিশ্চয়বুদ্ধি করিবে।।২৭, ২৮

বিজ্ঞেয়োহক্ষরতন্মাত্রং জীবিতং চাপি চঞ্চলম।।২৯
বিহায় শাস্ত্রজালানি যৎ সত্যং তদুপাস্যতাম।।৩০

জীবনকে ক্ষণভঙ্গুর এবং চঞ্চল জানিয়া অক্ষয় ব্রহ্মস্বরূপেই জীবনকে তন্ময় করিবে। শাস্ত্রজালকে ত্যাগ করিয়া যাহা সত্য ব্রহ্মস্বরূপ, তাহার উপাসনা করিবে।।২৯, ৩০

যস্য স্ত্রী তস্য ভোগেচ্ছা নিস্ত্রীকস্য ক্ব ভোগভূঃ।।৩১
স্ত্রিয়ং ত্যক্ত্বা জগত্যক্তং জগত্যক্ত্বা সুখী ভবেৎ।।৩২

যাহার স্ত্রী আছে, তাহারই স্ত্রীসম্ভোগেচ্ছা সম্ভব; যাহার স্ত্রী নাই, তাহার স্ত্রীসম্ভোগের উৎপত্তি কোথায়? স্ত্রীসম্ভোগেচ্ছা ত্যাগ করিলেই জগৎ ত্যাগ করিতে সমর্থ হয় এবং জগৎ ত্যাগ করিলেই মনুষ্য সুখী হয়।।৩১, ৩২

চিত্তং কারণমর্থানাং তস্মিন সতি জগত্রয়ম।।৩৩
তস্মিন ক্ষীণে জগৎ ক্ষীণং তচ্চিকিৎস্যং প্রযত্নতঃ।।৩৪

পুরুষার্থের কারণই চিত্ত এবং চিত্ত থাকিলেই ত্রিজগৎও কাজেই থাকে। চিত্ত ক্ষীণ হইলে জগতের (জাগতিক বিষয়ের) ক্ষয় হয়, অতএব চিত্তব্যাধির চিকিৎসা যত্নপূর্ব্বক করিবে।৩৩,৩৪

সুপ্তেরুত্থায় সুপ্ত্যন্তং ব্রহ্মৈকং প্রবিচিন্ত্যতাম।।৩৫
গচ্ছংস্তিষ্ঠন্নু পবিশঞ্ছয়ানো বান্যথাপি বা।।৩৬

নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া যাবৎ নিদ্রা না হয়, একমাত্র ব্রহ্মকেই ভাবনা করিবে। যদি তুমি কোথায়ও গমন, অবস্থান, উপবেশন বা শয়ন করিয়া থাকো, তাহা হইলেও একমাত্র ব্রহ্মকেই ভাবনা করিবে।৩৫,৩৬

যথেচ্ছয়া বসেদ্বিদ্বানাত্মারামঃ সদা মুনিঃ।।৩৭

জ্যোতির্লিঙ্গং ভ্রুবোর্মধ্যে নিত্যং ধ্যায়েৎ সদা যতিঃ।।৩৮

নিজ ব্রহ্মস্বরূপেই রমণকারী মননশীল পুরুষ ব্রহ্মতে যথেচ্ছ বাস করিবে এবং যোগী সদা নিজ ভ্রূমধ্যে ব্রহ্মকে জ্যোতির্ম্ময়স্বরূপে ভাবনা করিবে।।৩৭,৩৮

আত্মানমাত্মনঃ সাক্ষাদ ব্রহ্ম বুদ্ধা সুনিশ্চলম।।৩৯

দেহজাত্যাদিসম্বন্ধান বর্ণাশ্রমসমন্বিতান।।৪০

একাকী নিস্পৃহস্তিষ্ঠেন্নহি কেন সহালপেৎ।।৪১

সাক্ষাৎ ব্রহ্মবুদ্ধি দ্বারা নিজ আত্মাকে নিশ্চয় করিয়া, এবং জাত্যাদি বর্ণাশ্রমস্থ সম্বন্ধিগণকে ত্যাগ করত একাকী নিঃস্পৃহ অবস্থান করিয়া, কাহারও সহিত আলাপ করিবে না অর্থাৎ মৌনী হইয়া থাকিবে।। ৩৯,৪০,৪১

উদ্যন্নারায়ণেতেবং প্রতিবাক্যং সদা যতিঃ।।৪২

মুনিঃ কৌপীনবাসাঃ স্যান্নগ্নো বা ধ্যানতৎপরঃ।।৪৩

সন্ন্যাসী সর্ব্বদা 'নারায়ণ' এই প্রতিবাক্য মাত্র বলিবে এবং মৌনব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক কৌপীনধারী অথবা নগ্ন থাকিয়া সদা ব্রহ্মধ্যানে তৎপর থাকিবে।।৪২,৪৩

অধ্যাত্মরতিরাসীনো নিরপেক্ষো নিরাশিষঃ।।৪৪

আত্মনৈব সহায়েন সুখার্থী বিচরেদিহ।।৪৫

একমাত্র পরমাত্মাতেই রমণশীল এবং বাসনা ও প্রার্থনাবর্জ্জিত হইয়া একমাত্র পরমাত্মার আশ্রয় অবলম্বন করত পৃথিবীতে বিচরণ করিবে।।৪৪,৪৫

সন্দিগ্ধঃ সর্ব্বভূতানাং বর্ণাশ্রমবিবর্জ্জিতঃ।।৪৬

অন্ধবজ্জড়বচ্চাপি মূকবচ্চ মহীং চরেৎ।।৪৭

সকলের নিকট (সন্দিগ্ধ হইয়া) আত্মগোপন করিয়া, ও বর্ণাশ্রমরহিত হইয়া অন্ধের ন্যায় বা জড়ের ন্যায় অথবা বোবার ন্যায় পৃথিবীতে বিচরণ করিবে।।৪৬,৪৭

যদযৎ পশ্যতি চক্ষুর্ভ্যাং তত্তদাত্মেতি ভাবয়েৎ।।৪৮

যদযচ্ছৃণোতি কর্ণাভ্যাং তত্তদাত্মেতি ভাবয়েৎ।।৪৯

লভতে নাসয়া যদযত্তত্তদাত্মেতি ভাবয়েৎ।।৫০

জিহ্বয়া যদ্রসং হ্যত্তি তত্তদাত্মেতি ভাবয়েৎ।।৫১

ত্বচা যদযৎ স্পৃশেদযোগী তত্তদাত্মেতি ভাবয়েৎ।।৫২

দৃষ্টিং জ্ঞানময়ীং কৃত্বা পশ্যেদ্ব্রহ্মময়ং জগৎ।।৫৩

চক্ষু দ্বারা যাহা দর্শন করিবে তাহা ব্রহ্মস্বরূপ ভাবনা করিবে, এবং কর্ণ দ্বারা যাহা শ্রবণ করিবে তাহাও ব্রহ্মস্বরূপ ভাবনা করিবে। নাসিকা দ্বারা যে গন্ধ গ্রহণ করিবে এবং জিহ্বা দ্বারা যে রস আস্বাদন করিবে তাহাও ব্রহ্ম বলিয়া ভাবনা করিবে। ত্বক দ্বারা যাহা স্পর্শ করিবে তাহাও ব্রহ্মময় বলিয়া ভাবিবে। এই প্রকারে শিষ্য (মুমুক্ষু) নিজ দৃষ্টিকে জ্ঞানময়ী করিয়া সমস্ত জগৎ ব্রহ্মময় দর্শন করিবে।।৪৮,৪৯,৫১,৫২,৫৩

দ্রষ্টৃদর্শনদৃশ্যানাং বিরামো যত্র বা ভবেৎ।।৫৪
দৃষ্টিস্তত্রৈব কর্ত্তব্যা ন নাসাগ্রাবলোকিনী।।৫৫

দৃষ্টিকে নাসাগ্র-অবলোকনী না করিয়া দ্রষ্টা, দর্শন এবং দৃশ্য জগতের যাহাতে বিরাম বা লয় প্রাপ্তি হয়, সেই ব্রহ্মকেই সদা দর্শন করিবে।।৫৪,৫৫

দেবাগ্ন্যগারে তরুমূলে গুহায়াং বসেদসঙ্গোহলক্ষিতশীলবৃত্তঃ।।৫৬

দেবালয়, অগ্ন্যাগার, (সেখানে যজ্ঞাদি হয়), বৃক্ষমূল এবং পর্ব্বতগুহায় সঙ্গবর্জ্জিত, এবং স্বভাব চরিত্র অন্যে বুঝিতে না পারে এরূপ হইয়া যতি বাস করিবে।।৫৬

নিরিন্ধনজ্যোতিরিবোপশান্তো ন চোদ্বিজেদুদ্বিজেদযত্র কুত্র।।৫৭

যেরূপ কাষ্ঠরহিত অগ্নি উপশান্ত (নির্ব্বাণ) হয়, সেইরূপ বিষয়রূপ ইন্ধন-বর্জ্জিত হইয়া মুমুক্ষু কোনও বিষয়ে উৎকণ্ঠাযুক্ত হইবে না।।৫৭

শান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষু-যোহনূচানো হ্যভিজজ্ঞৌ সমানঃ।।৫৮

শান্ত (অন্তরিন্দ্রিয় সংযত), দান্ত (বহিরিন্দ্রিয় সংযত) উপরত (ব্রহ্মাতিরিক্ত অন্য বিষয়ে চিন্তাবর্জ্জিত), তিতিক্ষু (শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ববর্জ্জিত), শ্রদ্ধা এবং সমাধান-যুক্ত বিদ্বান সৎপুরুষ যোগী ব্রহ্মসদৃশ অর্থাৎ আমি ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন এরূপ জ্ঞানসম্পন্ন হয়েন।।৫৮

ত্যক্তৈষণো হ্যনৃণস্তং বিদিত্বা মৌনী বসেদাশ্রমে যত্র কুত্র।।৫৯

উপরোক্ত ব্রহ্মভাবারূঢ় মুনি যজ্ঞ, স্বাধ্যায়, এবং প্রজা (সন্তান) উৎপাদন দ্বারা দেবর্ষিপিতৃঋণ মোচন করত পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা, লোকৈষণাদি বিবিধ এষণা অর্থাৎ কামনা ত্যাগ করিয়া যে কোনও আশ্রমে বাস করিবে। ৫৯

যমৈশ্চ নিয়মৈশ্চৈব হ্যাসনৈশ্চ সুসংযুতঃ।।৬০
নাড়ীশুদ্ধিঞ্চ কৃত্বাদৌ প্রাণায়ামং সমাচরেৎ।।৬১
সর্ব্বচিন্তাং পরিত্যজ্য সাবধানেন চেতসা।।৬২
নির্ব্বিকল্পঃ প্রসন্নাত্মা প্রাণায়ামং সমাচরেৎ।।৬৩

যোগশাস্ত্রোক্ত যম ও নিয়ম সাধনযুক্ত এবং আসনসিদ্ধ হইয়া নাড়ীশুদ্ধি করত প্রাণায়াম করিবে। সমস্ত চিন্তা পরিত্যাগ করত নির্বিকল্প ব্রহ্মেতে প্রসন্নতাযুক্ত হইয়া সাবধান চিত্তে প্রাণায়াম অনুষ্ঠান করিবে।। ৬০,৬১,৬২,৬৩

মরুদভ্যসনং সর্ব্বং মনোযুক্তং সমভ্যসেৎ।।৬৪
ইতরত্র ন কর্ত্তব্যা মনোবৃত্তির্মনীষিণা।।৬৫

যাবৎ ব্রহ্মেতে মন একাগ্র না হয়, তাবৎ রেচক পূরক এবং কুম্ভকাত্মক প্রাণায়াম অভ্যাস করিবে। ব্রহ্ম ভিন্ন অন্যত্র মনোবৃত্তিকে সংযুক্ত করিবে না অর্থাৎ সদাই ব্রহ্ম ভাবনা করিবে।।৬৪,৬৫

ইতি প্রথমং প্রকরণং সমাপ্তম।।

—

সার্দ্বান্তিকবন্ধমোক্ষবাক্যানি।।২

ব্রহ্মবোধক বাক্য সকলের কথনানন্তর এবং মোক্ষস্বরূপের অবগতির জন্য বেদোক্ত বন্ধ ও মোক্ষবাক্য সকল কথিত হইতেছে।

দেহাদীনাত্মত্বেনাভিমন্যতে সোহভিমান আত্মনো বন্ধঃ।।১

তন্নিবৃত্তির্মোক্ষঃ।।২

অনাত্ম দেহাদিতে আত্মা বলিয়া (আমিই দেহ, আমিই ইন্দ্রিয় ইত্যাদি) যে ভাব হয়, তাহাকে অভিমান বলে; এই অভিমানকেই আত্মার বন্ধ বলে। (অভিমানরূপ) উক্ত বন্ধের নিবৃত্তিকে মোক্ষ বলে।।১,২

দেবমনুষ্যাদ্যুপাসনাকামসংকল্পো বন্ধঃ।।৩

ব্রহ্মাতিরিক্ত দেবতা এবং মনুষ্যাদির (শুকাদি ঋষিমুনির) উপাসনা করিবার কামনা বা সংকল্পকে বন্ধ বলে।।৩

কর্ত্তৃত্বাদহঙ্কারসঙ্কল্পো বন্ধঃ।।৪

আমি সকল বিষয়ের কর্ত্তা, সর্ব্বকর্ম্মফলভোক্তা ইত্যাদি অহঙ্কারযুক্ত সঙ্কল্পকে বন্ধ বলে।।৪

অণিমাদ্যষ্টৈশ্বর্য্যাশাসিদ্ধসঙ্কল্পো বন্ধঃ।।৫

অণিমাদি (অণিমা, লঘিমা, গরিমা, মহিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, ঈশিত্ব, বশিত্ব) অষ্ট যৌগৈশ্বর্য্যসিদ্ধি আমার হউক, এই আশাসিদ্ধ সঙ্কল্পকে বন্ধ বলে।।৫

যমাদ্যষ্টাঙ্গযোগসঙ্কল্পো বন্ধঃ।।৬

যমাদি (যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণ, ধ্যান ও সমাধি) অষ্টাঙ্গ যোগসাধনার সঙ্কল্পকে বন্ধ বলে।।৬

কেবলং মোক্ষাপেক্ষাকামসঙ্কল্পো বন্ধঃ।।৭

'আমার অবিদ্যাবন্ধন মুক্ত হউক' এইরূপ মোক্ষকামী পুরুষের সঙ্কল্পকে বন্ধ বলে, কারণ আত্মা স্বতঃই মুক্ত বলিয়া মোক্ষ কামনার বিষয় নহে।।৭

সঙ্কল্পমাত্রসম্ভবো বন্ধঃ।।৮

মোক্ষসঙ্কল্পমাত্রের উৎপত্তিকে বন্ধ বলে।।৮

নিত্যানিত্যবস্তুবিচারাদনিত্যসংসারসুখদুঃখবিষয়—

সমস্তক্ষেত্রমমতাবন্ধক্ষয়ো মোক্ষঃ।।৯

নিত্য এবং অনিত্য বস্তুর বিচার (বিবেক) দ্বারা অনিত্য সংসারের সুখ-দুঃখ বিষয় সকলের ক্ষেত্র অর্থাৎ উৎপত্তিস্থান মমতারূপ বন্ধনের ক্ষয়কে মোক্ষ বলে।।৯

মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।।১০

মনই মনুষ্যের বন্ধ এবং মোক্ষের কারণ।।১০

বন্ধনং বিষয়াসক্তং মুক্ত্যৈ নির্বিষয়ং স্মৃতম।।১১

মনের বিষয়াসক্তিই বন্ধন, নির্ব্বিষয় মনই মুক্তির কারণ।।১১

মমেতি বধ্যতে জন্তুর্ন মমেতি বিমুচ্যতে।।১২

'ইহা আমার' এরূপ জ্ঞান দ্বারা জীব বদ্ধ হয়; 'ইহা আমার নয়' এইরূপ ভাবনা দ্বারা মুক্ত হয়।।১২

মমত্বেন ভবেজ্জীবো নির্ম্মমত্বেন কেবলঃ।।১৩

মমত্বযুক্ত হইয়া জীবপদবাচ্য হয়; মমত্বরহিত হইয়া কেবল অর্থাৎ মুক্ত হয়।।১৩

স্বসঙ্কল্পবশাদ্বদ্ধো নিঃসঙ্কল্পাদবিমুচ্যতে।।১৪

নিজ বাসনা দ্বারাই বদ্ধ হয়, এবং বাসনারহিত হইয়া মুক্ত হয়।।১৪

দ্রষ্টা দৃশ্যবশাদ্বদ্ধো দৃশ্যাভাবে বিমুচ্যতে।।১৫

দ্রষ্টা জীব দৃশ্যের বশ হেতু (দৃশ্যেতে অভিমানযুক্ত হইয়া) বদ্ধ হয়, এবং যখন দৃশ্যেতে অভিমানরহিত হয়, ও 'দৃশ্য ব্রহ্মাত্মক, অন্য কিছুই নহে' এরূপ ভাবনা করে, তখন মুক্ত হয়।।১৫

ইচ্ছামাত্রমবিদ্যেয়ং তন্নাশো মোক্ষ উচ্যতে।।১৬
ভোগেচ্ছামাত্রকং বন্ধস্তত্যাগো মোক্ষ উচ্যতে।।১৭
চিচ্চৈত্যকলনা বন্ধনস্তন্মুক্তির্মুক্তিরুচ্যতে।।১৮

ভোগেচ্ছামাত্রকে অবিদ্যা বলে, বিদ্যা দ্বারা ভোগেচ্ছাত্যাগকে মোক্ষ বলে। ভোগেচ্ছা মাত্রই বন্ধ, এবং ভোগেচ্ছাত্যাগই মোক্ষ। জীবের চিত্ত এবং চিত্তের বিষয়াভিমুখতাই বন্ধ। স্বাত্মাতিরিক্ত চিত্ত এবং চৈত্য বিষয়ের ত্যাগই মুক্তি।।১৬,১৭,১৮

অনাস্থৈব হি নির্ব্বাণং দুঃখমাস্থাপরিগ্রহঃ।।১৯

: বিষয়ে অনাস্থাই নির্ব্বাণ অর্থাৎ মুক্তি, বিষয়ে আস্থাগ্রহণই দুঃখ অর্থাৎ বন্ধ।।১৯

কর্ম্মণা বধ্যতে জন্তুর্বিদ্যয়া চ বিমুচ্যতে।।২০

কর্ম্মদ্বারা জীব বদ্ধ হয়, এবং জ্ঞানের দ্বারা মুক্ত হয়।।২০

স্বরূপাবস্থিতির্মুক্তিস্তদভ্রংশোহহংত্ববেদনম।।২১

আত্মার নিজস্বরূপে অবস্থানকে মুক্তি বলে, নিজস্বরূপচ্যুতিই অহংত্বের পরিচায়ক (অর্থাৎ অবিদ্যা বশতঃ আত্মার দেহাদিতে মমতা উৎপন্ন হয়)।।২১

চিত্তে চলতি সংসারো নিশ্চলে মোক্ষ উচ্যতে।।২২

চিত্ত যখন বিষয়ে চলিত (আসক্ত বা বৃত্তিযুক্ত) হয়, তখনই সংসার অর্থাৎ বন্ধ, এবং যখন চিত্ত নিশ্চল অর্থাৎ নির্বৃত্তিক হয়, তখন জীবের মোক্ষ।।২২

বন্ধো হি বাসনাবন্ধো মোক্ষঃ স্যাদ্বাসনাক্ষয়ঃ।।২৩

বিষয়-বাসনাবদ্ধ হওয়াই বন্ধন, বাসনাক্ষয়ই মোক্ষ।।২৩

পদার্থভাবনাদার্ঢ্যং বন্ধ ইত্যভিধীয়তে।।২৪

বাসনাতানবং ব্রহ্ম মোক্ষ ইত্যভিধীয়তে।।২৫

বিষয়-ভাবনার দৃঢ়তাকে বন্ধ বলে, এবং বিষয়বাসনাক্ষয়কারী ব্রহ্মকে মোক্ষ বলে।।২৪,২৫

ন মোক্ষো নভসঃ পৃষ্ঠে ন পাতালে ন ভূতলে।।২৬

সর্ব্বাশাসংক্ষয়ে চেতঃক্ষয়ো মোক্ষ ইতীষ্যতে।।২৭

আকাশপৃষ্ঠে, পাতালে কিংবা ভূতলে মোক্ষ নাই; নির্ব্বিষয়তা হেতু সকল আশার ক্ষয় হইলে চিত্তের যে ক্ষয় অর্থাৎ (বৃত্তিরহিত হওয়া), তাহাকে মোক্ষ বলে।।২৬,২৭

মোক্ষো মেহস্ত্বিতি চিন্তান্তর্জাতা চেদুত্থিতং মনঃ।।২৮

মননোত্থে মনস্যেষ বন্ধঃ সাংসারিকো মতঃ।।২৯

'বন্ধনকে অপেক্ষা করিয়া আমার মোক্ষ হউক' এইরূপ মননোত্থিত চিন্তাই সাংসারিক বন্ধ।২৮।২৯

তদমার্জ্জনমাত্রং হি মহাসংসারতাং গতম।।৩০

তৎ প্রমার্জ্জনমাত্রং তু মোক্ষ ইত্যভিধীয়তে।।৩১

সেই মনের অশুদ্ধি জন্যই মহাসাংসারিকতা (বন্ধভাব) উপস্থিত হয়, এবং সেই মনের শুদ্ধি মাত্রকেই মোক্ষ বলে (সত্বপুরুষয়োঃ শুদ্ধিসাম্যে কৈবল্যমিতি যোগদর্শনে)।।৩০,৩২

ইতি দ্বিতীয়ং প্রকরণং সমাপ্তম।।

—

সার্ধান্তিকাবিদ্বন্নিন্দাবাক্যানি।।৩

অনন্তর অবিদ্বানের অর্থাৎ অবিদ্যাগ্রস্থের সরূপাবগতির জন্য নিন্দাবাক্য সকল কথিত হইতেছে।

অথ যোহন্যাং দেবতামুপাস্তেহন্যোহসাবন্যোহহমস্মীতি ন স বেদ যথা পশুঃ।।১

আমা হইতে যিনি ভিন্ন তিনিই ঈশ্বর বা পরমাত্মা, এবং তাঁহা হইতে আমি ভিন্ন জীব বা দেহধারী, ও আমাদের উভয় (জীব ও ঈশ্বর) হইতে জগৎ ভিন্ন, এরূপ যে মনে করে এবং নিজ হইতে ভিন্ন অন্য দেবতার উপাসনা করে, সে জানে না যে, সে নিজে অজ্ঞ পশুমাত্র।।১

অত্র ভিদামিব মন্যমানঃ শতধা সহস্রধা ভিন্নো মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি।।২

এই ভেদশূন্য ব্রহ্মতে জগৎ জীব ও পরমেশ্বরের পরস্পর ভেদ যে স্বীকার করে, নিজ স্বরূপে অনভিজ্ঞ সেই মূঢ় নিজস্বরূপসহ শতসহস্র প্রকারে নিজে অবিদ্যাগ্রস্ত হইয়া পুনঃপুনঃ জন্ম-মরণকে প্রাপ্ত হয় (অর্থাৎ সংসারে পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যুর অধীন হইয়া যাতায়াত করে)।।২

কর্ত্তৃত্বাদহঙ্কারভাবনারূঢ়ো মূঢ়ঃ।।৩

নিজ বুদ্ধিতে অবিদ্যা-বিকল্পিত হইয়া শরীরে আমিত্ব স্থাপন করত 'আমি কর্ত্তা' ইত্যাকার অহঙ্কার-ভাবনারূঢ় অবিদ্যাগ্রস্ত ব্যক্তিকে মূঢ় বলে।।৩

মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি।।৪

যে ব্যক্তি ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন এই জগৎ এবং জীবেতে ব্রহ্ম হইতে নানাত্ব (ভেদদর্শন) করে, সেই ব্যক্তি জন্ম মরণরূপ গতাগতি পুনঃ পুনঃ প্রাপ্ত হয়।।৪

অনুভূতিং বিনা মূঢ়ো বৃথা ব্রহ্মণি মোদতে।।৫
প্রতিবিম্বিতশাখাগ্রফলাস্বাদনমোদবৎ।।৬

ছায়াতে প্রতিবিম্বিত বৃক্ষশাখার অগ্রভাগস্থ ফলের আস্বাদন যেরূপ মিথ্যা, সেই প্রকার মূঢ় ব্যক্তি 'নিজে ব্রহ্ম' এইরূপ না জানিয়া ব্রহ্মেতে বৃথা বিষয় আনন্দ ভোগ করে।।৫,৬

অষ্টাঙ্গঞ্চ চতুষ্পাদং ত্রিস্থানং পঞ্চদৈবতম।।৭
ওঁকারং যো ন জানাতি ব্রাহ্মণো ন ভবেত্তু সঃ।।৮

যে ব্যক্তি অষ্টাঙ্গ, চতুষ্পাদ, ত্রিস্থান এবং পঞ্চদৈবতযুক্ত ওঁকারকে না জানে, সে কখনওই ব্রাহ্মণ (ব্রহ্মনিষ্ঠ) নহে।।৭,৮

অষ্টাঙ্গ—অ, উ, ম, অর্দ্ধমাত্র, নাদ, বিন্দু, কলা, কলাতীত। চতুষ্পাদ—বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ এবং তুর্য্য; অথবা বিরাট, সূত্র, বীজ, তুর্য্য। ত্রিস্থান—কৈলাস, বৈকুণ্ঠ, ব্রহ্মলোক; অথবা সত্ব, রজ, তমঃ; অথবা জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি। পঞ্চদৈবত—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর, সদাশিব)।

অতিবর্ণাশ্রমং রূপং সচ্চিদানন্দলক্ষণম।।৯
যো ন জানাতি সোহ বিদ্বান কদা মুক্তো ভবিষ্যতি।।১০

বর্ণাশ্রমের অতীত সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মের রূপকে যে ব্যক্তি না জানিতে পারে, সেই অবিদ্বান ব্যক্তি কোন কালে মুক্ত হইবে? অর্থাৎ কখনই মুক্ত হইবে না।।৯,১০

কুশলা ব্রহ্মবার্ত্তায়াং বৃত্তিহীনাঃ সুরাগিণঃ।।১১

তেহপ্যজ্ঞানতয়া নূনং পুনরায়ান্তি যান্তি চ।।১২

স্বাতিরিক্ত (নিজ ভিন্ন) দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি করিয়া সর্ব্বত্র 'এই আমার হউক, এই আমার হউক,' ইত্যেবং প্রকার বিষয়াসক্ত ব্যক্তিগণ ব্রহ্মবার্ত্তাতে কুশল হইয়াও ব্রহ্মেতে বৃত্তিহীন অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানরহিত বলিয়া নিজ নিজ অজ্ঞান বশতঃ পুনঃ পুনঃ এই সংসারে যাতায়াত করে।।১১,১২

কাষ্ঠদণ্ডো ধৃতো যেন সর্ব্বাশী জ্ঞানবর্জ্জিতঃ।।১৩

যে যতি কেবল কাষ্ঠদণ্ড ধারণ করিয়াছে এবং কেবল উদরপরায়ণ, সে জ্ঞানবর্জ্জিত অর্থাৎ অজ্ঞ।।১৩

স্বায়ত্তমেকান্তহিতং স্বেপ্সিতত্যাগবেদনম।।১৪

যস্য দুষ্করতাং যাতং ধিক তং পুরুষকীটকম।।১৫

নিজ নিজ অজ্ঞান হইতে 'ইহা আমার হউক, ইহা আমার হউক', ইত্যাদি স্বেপ্সিত কামনাসমূহ উত্থিত হয়; কিন্তু 'ব্রহ্মাতিরিক্ত কিছুই নয়' এইরূপ জ্ঞান দ্বারা উক্ত কামনা সকল পরিত্যক্ত হয়। উক্ত কামনা সকলের ত্যাগসূচক, সকলেরই আয়ত্ত, একান্ত হিতকর ব্রহ্মজ্ঞান যে ব্যক্তির দুঃসাধ্য হইয়া উঠে, সেই পুরুষাধমকে ধিক।।১৪,১৫

অদ্বিতীয়ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানন্তি যদা তদা।।১৬

ভ্রান্তা এবাখিলাস্তেষাং ক্ক মুক্তিঃ ক্বেহ বা সুখম।।১৭

অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্বকে যাহারা জানিতে পারে না, তাহারা সর্ব্ব বিষয়ে ভ্রান্ত হয়; অতএব তাহাদিগের মুক্তি বা কোথায়, সুখই বা কোথায়?।।১৬,১৭

অজ্ঞানোপহতো বাল্যে যৌবন বনিতাহতঃ।।১৮

শেষে কলত্রচিন্তার্ত্তঃ কিং করোতি নরাধমঃ।।১৯

মানুষ বাল্যকালে অজ্ঞান দ্বারা আবৃত, যৌবনে স্ত্রী দ্বারা নষ্টজ্ঞান এবং বার্দ্ধক্যে স্ত্রী-পুত্রাদির চিন্তায় প্রপীড়িত। এরূপ নরাধম কোন কার্য্যের উপযোগী হইতে পারে?।।১৮,১৯

ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন জন্তবঃ।।২০

ধরাবিবর মগ্নানাং কীটানাং সমতাং গতাঃ।।২১

অজ্ঞানী জীবগণ নিজ নিজ ইচ্ছা দ্বেষ হইতে সমুত্থিত শীতোষ্ণসুখদুঃখরূপ দ্বন্দ্বেতে মোহযুক্ত হইয়া ধরাবিবরস্থিত কীট সকলের ন্যায় কেবল অসার মাত্র (অর্থাৎ উহাদের জীবন বিফল)।।২০,২১

ইতি তৃতীয় প্রকরণম সমাপ্তম।।

—

সার্ধান্তিকজগন্মিথ্যাবাক্যানি।।৪

এক্ষণে জগতের মিথ্যাস্বরূপাগতির জন্য জগন্মিথ্যা বাক্য সকল উক্ত হইতেছে।

নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ।।১

ব্রহ্ম ভিন্ন স্থাবর জঙ্গমাত্মক অন্য কিছুই নাই।।১

বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম।।২

মৃত্তিকাই সত্য, মৃত্তিকার বিকার সকল (ঘটশরাবাদি) মিথ্যা বা নাম মাত্র। মৃত্তিকাই ঘটাদির পারমার্থিক রূপ, উহার অন্য সংস্থান (ঘটাদি রূপ) কাল্পনিক।।২

অতোহন্যদার্ত্তম।।৩

ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য যাবতীয় বস্তু নশ্বর বা মিথ্যা।।৩

ন তু তদ্দ্বিতীয়মস্তি।।৪

ব্রহ্মের দ্বিতীয় নাই।।৪

নাত্র কাচন ভিদাস্তি নৈব তত্র কাচন ভিদাস্তি।।৫

ব্রহ্মেতে কোনও প্রকার ভেদ নাই (অর্থাৎ তিনি সজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগত-ভেদ রহিত)।।৫

সর্ব্বং বিকারজাতং মায়ামাত্রম।।৬

সমস্ত বিকারজাত বস্তু মায়া মাত্র। (অর্থাৎ মিথ্যা)।।৬

সর্ব্বত্র নহ্যস্তি দ্বৈতসিদ্ধিঃ।।৭

নাস্তি দ্বৈতং কুতো মর্ত্ত্যম।।৮

ব্রহ্মের দ্বৈতসিদ্ধি কুত্রাপি নাই। অখণ্ড এবং একরস ব্রহ্মেতে যখন জগৎ এবং জীবাদি-ভেদযুক্ত দ্বৈতরূপ জগৎ নাই, তখন অবাস্তব ভেদরূপ মনুষ্যাদি কিরূপে তাঁহাতে সম্ভব হইতে পারে?।।৭,৮

প্রপঞ্চো যদি বিদ্যেত নিবর্ত্তেত ন সংশয়ঃ।।৯

শশশৃঙ্গের ন্যায় অলীক প্রপঞ্চ যদি সম্ভব হয়, তাহা হইলে 'ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছুই নাই' এরূপ জ্ঞান দ্বারা নিশ্চয়ই প্রপঞ্চজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়।।৯

মায়ামাত্রমিদং দ্বৈতমদ্বৈতং পরমার্থতঃ।।১০

এই পরিদৃশ্যমান দ্বৈতপ্রপঞ্চ মায়াকার্য্য বলিয়া মায়ামাত্র জানিবে; কিন্তু পরমার্থতঃ প্রপঞ্চকে অদ্বৈত বলিয়া জানিবে অর্থাৎ ব্রহ্মাতিরিক্ত নহে এইরূপ জানিবে।।১০

বিকল্পো বিনিবর্ত্তেত কল্পিতো যদি কেনচিৎ।।১১

প্রতিযোগিরহিত ব্রহ্মেতে কেহ যদি অজ্ঞানবশতঃ গুরুশিষ্যশাস্ত্রাদিরূপ ভেদবুদ্ধির কল্পনা করে, তাহা হইলে ব্রহ্মাতিরিক্ত অন্য কিছুই নাই, এরূপ গুরুপদেশ দ্বারা উহার অবশ্যই নিবৃত্তি হয়।।১১

উপদেশাদয়ং বাদো জ্ঞাতে দ্বৈতং ন বিদ্যতে।।১২

উপদেশ দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান হইলে দ্বৈতভাব বিদূরিত হয়।।১২

দ্বিতীয়কারণাভাবাদনুৎপন্নমিদং জগৎ।।১৩

ব্রহ্ম ভিন্ন জগতে দ্বিতীয় কারণ না থাকায় এই জগৎ উৎপত্তিশীল নহে, কারণ ব্রহ্মই বিবর্ত্তরূপে জগদাকারে প্রতিভাত হন।।১৩

যথৈবেদং নভঃ শূন্যং জগচ্ছূন্যং তথৈব হি।।১৪

যেমন আকাশ শূন্য, সেইপ্রকার এই জগৎও শূন্য অর্থাৎ ব্রহ্ম ভিন্ন কিছুই নহে।।১৪

ইদং প্রপঞ্চ যৎকিঞ্চিদযদযজ্জগতি বীক্ষ্যতে।।১৫
দৃশ্যরূপঞ্চ দৃগ্রূপং সর্ব্বং শশবিষাণবৎ।।১৬

এই দৃশ্যমান জগতে দৃশ্য এবং দ্রষ্টরূপ যাহা কিছু প্রপঞ্চ দৃষ্ট হয়, সমস্তই শশকের শৃঙ্গের ন্যায় অলীক বলিয়া জানিবে।।১৫,১৬

ইদং প্রপঞ্চং নাস্ত্যেব নোৎপন্নং নো স্থিতং জগৎ।।১৭
চিত্তং প্রপঞ্চমিথ্যাহুর্নাস্তি নাস্ত্যেব সর্ব্বদা।।১৮

এই প্রপঞ্চের অস্তিত্ব নাই এবং ইহা উৎপন্ন বা বিদ্যমানও নহে। শ্রুতি চিত্তকেই প্রপঞ্চ বলিয়াছেন; চিত্ত ভিন্ন অন্য কোনও প্রপঞ্চ নাই এবং ব্রহ্মাতিরিক্ত প্রপঞ্চকল্পনার মূল চিত্তও বিদ্যমান থাকে না।।১৭,১৮

মায়াকার্য্যাদিকং নাস্তি মায়া নাস্তি ভয়ং নহি।।১৯
পরং ব্রহ্মাহহমস্মীতি স্মরণস্য মনো নহি।।২০

মায়ার কার্য্যাদি নাই। যখন মায়া নাই, তখন মায়া জন্য দ্বৈতজ জ্ঞানের ভয়ও নাই। যখন ব্রহ্মভিন্ন মায়াকার্য্য নাই, তখন 'আমিই ব্রহ্ম' এরূপ স্মরণকারী মনেরও অস্তিত্ব নাই।।১৯,২০

বন্ধ্যাকুমারবচনে ভীতিশ্চেদস্তিদং জগৎ।।২১
শশশৃঙ্গেণ নাগেন্দ্রো মৃতশ্চেজ্জগদস্তি সৎ।।২২

বন্ধ্যার পুত্রের বচনে যদি ভয় উৎপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা হয়, তাহা হইলে এই দৃশ্য জগৎও সম্ভব হইতে পারে অর্থাৎ যেরূপ বন্ধ্যার পুত্র হওয়া অসম্ভব এবং সেই কল্পিত পুত্রের বচনে ভয় হওয়াও অসম্ভব, সেইরূপ এই জগতের অস্তিত্বও মিথ্যা। শশকের শৃঙ্গরূপ অঙ্কুশ দ্বারা বিদ্ধ হইয়া যদি হস্তীর মৃত্যু হওয়া সম্ভব হয়, তাহা হইলে এই জগতের অস্তিত্বেরও সম্ভব হইতে পারে অর্থাৎ শশকের শৃঙ্গও হইবে না এবং সেই কল্পিত শৃঙ্গ-বিদ্ধ হইয়া হস্তীর মৃত্যুর সম্ভাবনাও নাই; এই প্রকার জগতের অস্তিতও সম্পূর্ণ মিথ্যা বা অসম্ভব।। ২১,২২

মৃগতৃষ্ণাজলং পীত্বা তৃপ্তশ্চেদস্তিদং জগৎ।।২৩

গন্ধর্ব্বনগরে সত্যে জগদ ভবতি সর্ব্বদা।।২৪

মৃগতৃষ্ণার জল পান করিয়া যদি পিপাসার নিবৃত্তি হয়, তাহা হইলে জগৎ থাকাও সম্ভব। (মরুভূমিতে উৎকট রবিরশ্মি পতিত হইলে বালুকায় প্রতিফলিত হইয়া 'জল রহিয়াছে' এরূপ ভ্রম জন্মায়, এবং মৃগগণ তৃষ্ণায় কাতর হইয়া সেই জল পানে পিপাসা নিবৃত্তি করিতে ধাবিত হয়; সেই জলচ্ছায়া অলীক ও গমনশীল বলিয়া তৎপানদ্বারা তাহাদের পিপাসানিবৃত্তি ও তৃপ্তি যেরূপ অসম্ভব, সেই প্রকার এই জগতের অস্তিত্বও সর্ব্বথৈব মিথ্যা। যদি গন্ধর্ব্বনগর সত্য হয়, তাহা হইলে জগৎও সর্ব্বদা সত্য; কিন্তু গন্ধর্ব্বনগরও অলীক, সুতরাং জগৎও মিথ্যা।।২৩,২৪

গগনে নীলিমাসত্যে জগৎ সত্যং ভবিষ্যতি।।২৫

মাসাৎ পূর্ব্বং মৃতো মত্যো হ্যাগতশ্চেজ্জগদ্ভবেৎ।।২৭

আকাশের নীল রং যদি সত্য হয় এবং একমাস পূর্বের মৃত ব্যক্তি যদি পুনরায় জীবিত হইয়া আগমন করে, তাহা হইলে এই জগতের অস্তিত্বও সম্ভব হইতে পারে; কিন্তু আকাশের নীল রং সত্য নহে এবং মৃত ব্যক্তির জীবিত হইয়া পুনরাগমনও সত্য নহে; সুতরাং জগৎও সর্ব্বথৈব মিথ্যা।।২৫,২৬

গোস্তনাদুদ্ভবৎক্ষীরপুনরারোপণে জগৎ।।২৭

জ্বালাগ্নিমণ্ডলে পদ্মবৃদ্ধিশ্চেদস্তিদং জগৎ।।২৮

জ্ঞানিনো হৃদয়ং মূঢ়ৈর্জ্ঞাতং চেদস্তিদং জগৎ।।২৯

গাভীস্তন হইতে দুগ্ধদোহন করার পর পুনরায় তাহা যদি উহাতে আরোপিত হয়, প্রজ্বলিত অগ্নিতে যদি পদ্মের বৃদ্ধি সম্ভব হয় এবং জ্ঞানী মনুষ্যের হৃদয় যদি মূর্খেরা জানিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে এই জগতের অস্তিত্বও সম্ভব হইতে পারে; কিন্তু ওই সকলই অসম্ভব, সুতরাং জগতের অস্তিত্বও মিথ্যা।।২৭,২৮,২৯

আজকুক্ষৌ জগন্নাস্তি হ্যাত্মকুক্ষৌ জগন্নহি।।৩০

চতুরানন ব্রহ্মার উদরে অথবা নিজ ব্রহ্মস্বরূপে কিংবা দ্বৈতাত্মকে জগতের বিদ্যমানতা নাই।।৩০

সর্ব্বদা ভেদকলনং দ্বৈতাদ্বৈতং ন বিদ্যতে।।৩১

সর্ব্বদা ভেদজ্ঞানের কারণ দ্বৈত এবং অদ্বৈত জ্ঞানেরও অস্তিত্ব নাই অর্থাৎ ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কোনও বস্তু নাই।।৩১

নাস্তি নাস্তি জগৎ সর্ব্বং গুরুশিষ্যাদিকং নহি।।৩২

সচ্চিদানন্দমাত্রোহহমনুৎপন্নমিদং জগৎ।।৩৩

দৃশ্য জগৎও নাই, গুরুশিষ্যাদি সম্বন্ধও নাই। আমি সচ্চিদানন্দরূপ মাত্র এবং এই জগৎ অনুৎপন্ন অর্থাৎ আমি থাকিলেই জগৎ এবং আমি না থাকিলে জগতেরও সম্ভব হয় না।।৩২,৩৩

ইতি চতুর্থং প্রকরণং সমাপ্তম।।

—

সার্ধান্তিকোপদেশবাক্যানি।।৫

জগৎ মিথ্যা এই জ্ঞান লাভের অনন্তর বিশুদ্ধচিত্ত ব্রহ্মবেত্তার আমিই ব্রহ্ম'
এই জ্ঞান লাভের জন্য বেদোক্ত উপদেশবাক্য সকল উক্ত হইতেছে।

স য এষোহণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং যৎ সত্যং
স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো।।১

এই যে অণিমা অর্থাৎ সূক্ষ্মতম পরমকারণ, এই সমস্ত জগৎ এতদাত্মক, অর্থাৎ নিখিল জগৎ ব্রহ্মময়, (জগতের কোনও বস্তুই ব্রহ্মাতিরিক্ত নহে)। একমাত্র সেই পরম কারণ ব্রহ্মই সত্য, তিনিই (ব্যাপক রূপে) আত্মা। হে শ্বেতকেতো! তুমিই সেই পরম বস্তু (তাঁহা হইতে অতিরিক্ত নহ)।।১

অভয়ং বৈ জনক প্রাপ্তোহসি।২

হে জনক অভয়স্বরূপ ব্রহ্মকে তুমি প্রাপ্ত হইয়াছ অর্থাৎ তুমি ব্রহ্মস্বরূপ হইয়াছ।।২

ব্রহ্মচর্য্যমহিংসাং চাপরিগ্রহং চ সত্যঞ্চ
যত্নেন হে রক্ষতো হে রক্ষতো হে রক্ষত ইতি।।৩

হে শিষ্য! ব্রহ্মচর্য্য (অষ্টাঙ্গ মৈথুন বর্জ্জন), অহিংসা (মন, শরীর এবং বাক্য দ্বারা কাহারও হিংসা না করা), অপরিগ্রহ (নিজ শরীর রক্ষার উপযোগী দ্রব্যভিন্ন, অন্য দ্রব্য গ্রহণ না করা), এবং সত্য (কায়মনোবাক্যে যথার্থ ব্যবহার করা) অতি যত্নের সহিত পালন করিবে।।৩

তত্ত্বমসি ত্বং তদসি।।৪

তুমিই ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মই তুমি।।৪

যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনোমতম।।৫
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে।।৬

যাহা মন দ্বারা মনন করা যায় না, কিন্তু যাহা মনের একমাত্র বাঞ্ছনীয়, তাহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে। তুমি যে প্রত্যক্ষ বস্তুকে উপাসনা করিতেছ, তাহা ব্রহ্ম নহে।।৫,৬

যৎ পরং ব্রহ্ম সর্বাত্মা বিশ্বস্যায়তনং মহৎ।।৭
সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতরং নিত্যং তত্ত্বমেব ত্বমেব তৎ।।৮

যিনি পরম ব্রহ্ম এবং সকলের আত্মা অর্থাৎ বাহ্যাভ্যন্তরে ব্যাপক, তিনিই এই বিশ্বের একমাত্র মহান আশ্রয়। তিনি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর এবং নিত্যবস্তু। তুমি সেই ব্রহ্মস্বরূপ।।৭,৮

অন্তঃ পূর্ণো বহিঃ পূর্ণঃ পূর্ণকুম্ভ ইবার্ণবে।।৯

সেই ব্রহ্ম সকলের অন্তরে পূর্ণরূপে বিরাজিত এবং বহির্দ্দেশেও পূর্ণরূপে বিরাজিত। তিনি সমুদ্রে পূর্ণকুম্ভের ন্যায় সর্ব্বত্র পরিপূর্ণ।।৯

অন্তঃশূন্যো বহিঃশূন্যঃ শূন্যকুম্ভ ইবাম্বরে।।১০

আকাশস্থ শূন্যকুম্ভের ন্যায় নির্ব্বিশেষ হেতু সেই ব্রহ্ম অন্তর্বাহ্যকল্পনাশূন্য হইয়াও বাহ্যাভ্যন্তরদেশে সর্ব্বত্র বিরাজিত আছেন।।১০

মা ভব গ্রাহ্যভাবাত্মা গ্রাহকাত্মা চ মা ভব।।১১
ভাবনামখিলং ত্যক্ত্বা যচ্ছিষ্টং তন্ময়ো ভব।।১২

হে শিষ্য! গ্রাহ্য যে দৃশ্য তাহাকে গ্রহণ করিও না, গ্রাহক ভাবও ('আমি দ্রষ্টা' এরূপ ভাবও) গ্রহণ করিও না। যাবতীয় ভাবনা ('জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা' এই ত্রিপুটীর ভাব) ত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট যে ব্রহ্মভাব, তাহাতে তন্ময় হও অর্থাৎ ব্রহ্মময় হও।।১১,১২

দ্রষ্টৃদর্শনদৃশ্যাদি ত্যক্ত্বা বাসনয়া সহ।।১৩
দর্শন প্রথমাভাসমাত্মানং কেবলং ভজ।।১৪

বাসনা সহিত দ্রষ্টা দর্শন এবং দৃশ্যজ্ঞান ত্যাগ করিয়া কেবল পরমাত্মাকে ভজনা করো। 'স্বাতিরিক্ত দ্রষ্টা জীব, দর্শন ঘটাদিবিষয়ক এবং দৃশ্যঘটাদি' এই ত্রিপুটি জ্ঞানেরও প্রকাশক পরমাত্মা। 'আমি সেই পরমাত্মাস্বরূপ' এরূপ জ্ঞানযুক্ত হও।।১৩,১৪

চিত্তাকাশং চিদাকাশমাকাশঞ্চ তৃতীয়কম।।১৫
দ্বাভ্যাং শূন্যতরং বিদ্ধি চিদাকাশং মহামুনে।১৬

আকাশ ত্রিবিধ—চিদাকাশ, চিত্তাকাশ, ভূতাকাশ। হে মহামুনে! চিদাকাশ (সদা চিৎরূপেণ কাশতে অর্থাৎ যাহা সদা চিৎরূপে প্রকাশ পান), সেই জন্য সেই চিদাকাশ, চিত্তাকাশ এবং ভূতাকাশবর্জ্জিত। 'ব্রহ্মই সদা চিৎরূপে প্রতিভাত হইতেছেন' এবং 'ওই উভয়াকাশই চিদাকাশের অন্তর্গত' এইরূপ জানিবে।।১৫,১৬

ধ্যানতো হৃদয়াকাশে চিতি চিচ্চক্রধারয়া।।১৭
মনো মারয় নিঃশঙ্কং ত্বাং প্রবধ্নন্তি নারয়ঃ।।১৮

'আমিই ব্রহ্ম' এই ধ্যান দ্বারা হৃদয়াকাশস্থিত চৈতন্যে চিৎরূপ চক্রধারা দ্বারা মনকে নির্দ্দয়রূপে দমন করিবে, কারণ মন বশীভূত হইলেই কামাদিরূপ (স্রক, চন্দন, বনিতাদি) রিপুগণ ব্রহ্মনিষ্ঠকে বন্ধন করিতে সমর্থ হয় না।।১৭,১৮

ভোগৈকবাসনাং ত্যক্ত্বা ত্যজ ত্বং ভেদবাসনাম।।১৯
ভাবাভাবৌ ততস্ত্যক্ত্বা নির্বিকল্পঃ স্থিরো ভব।।২০

বিষয়ভোগের বাসনা ত্যাগ করিয়া জগৎ এবং জীবব্রহ্মের ভেদবাসনাও ত্যাগ করিবে। তদনন্তর ভাব এবং অভাব উভয়কে ত্যাগ করিয়া নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপে স্থির হইবে।।১৯,২০

ত্যজ ধর্ম্মমধর্ম্মঞ্চ উভে সত্যানৃতে ত্যজ।।২১
উভে সত্যানৃতে ত্যক্ত্বা যেন ত্যজসি তত্যজ।।২২

(শ্রুতিস্মৃতিবিহিত) ধর্ম্ম এবং (শ্রুতিস্মৃতিপ্রতিষিদ্ধ) অধর্ম্ম, সত্য এবং মিথ্যা উভয়কে ত্যাগ করিবে। সত্য এবং মিথ্যা উভয় জ্ঞান ত্যাগ করিয়া যে অজ্ঞান দ্বারা মিথ্যা জ্ঞান উদয় হইতেছে, উহাকে ত্যাগ করো এবং ব্রহ্মকে ভাবনা করো।।২১,২২

আত্মন্যতীতে সর্ব্বস্মাৎ সর্ব্বরূপেহথবা ততে।।২৩
কো বন্ধঃ কশ্চ বা মোক্ষো নির্মূলং মননং কুরু।।২৪

সমস্তই ব্রহ্ম। এই সিদ্ধ সর্ব্বব্যাপক নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মেতে অবিদ্যাজন্য বন্ধ বা কোথায় এবং জ্ঞানজন্য মুক্তি বা কোথায় এই বন্ধমোক্ষজ্ঞানরহিত মননশীল হও অর্থাৎ স্বাতিরিক্ত বন্ধ এবং মোক্ষ কল্পনা মিথ্যা বলিয়া জানিবে।।২৩,২৪

আশা যাতু নিরাশাত্বমভাবং যাতু ভাবনা।।২৫
অমনস্তং মনো যাতু তবাসঙ্গেন জীবতঃ।।২৬

তোমার ভোগাশাকে নিরাশায় (বৈরাগ্যে) পরিণত করো এবং ভাবনাকে ব্রহ্মাতিরিক্ত বিষয়ে অভাবনায় পরিণত করো। মনকে বৃত্তি রহিত করো এবং আসক্তিবর্জ্জিত হইয়া জীবন ধারণ করো।।২৫,২৬

একমাদ্যন্তরহিতং চিন্মাত্রমমলং ততম।।২৭
খাদপ্যতিতরাং সূক্ষ্মং তদব্রহ্মাসি ন সংশয়ঃ।।২৮

একমাত্র, আদি এবং অন্তরহিত, চিৎমাত্র, শুদ্ধ, সর্ব্বব্যাপক, আকাশ হইতেও অতি সূক্ষ্ম ব্রহ্মাই তুমি, ইহা নিশ্চয় জানিবে।।২৭,২৮

রক্ষকো বিষ্ণুরিত্যাদি ব্রহ্মা সৃষ্টেস্তু কারণম।।২৯
সংহারে রুদ্র ইত্যেবং সর্ব্বং মিথ্যেতি নিশ্চিনু।।৩০

বিষ্ণু সৃষ্টির রক্ষক (পালনকর্ত্তা), ব্রহ্মা সৃষ্টির কারণ (কর্ত্তা) এবং রুদ্র সংহারকর্ত্তা, এরূপ জ্ঞান মিথ্যা বলিয়া জানিবে।।২৯,৩০

মত্যক্তং নাস্তি কিঞ্চিদ্বা মত্যক্তা পৃথিবী তু বা।।৩১
ময়াতিরিক্তং যদযদ্বা তত্তন্নাস্তীতি নিশ্চিনু।।৩২

আমি ভিন্ন কিছুই নাই এবং আমার অতিরিক্ত পৃথিবীও নাই। আমার অতিরিক্ত যাহা কিছু আছে তাহার অস্তিত্ব নাই, এইরূপ নিশ্চিয় জানিবে।।৩১,৩২

অনাত্মেতি প্রসঙ্গো বা অনাত্মেতি মনোহপি বা।।৩৩
অনাত্মেতি জগদ্বাপি নাস্ত্যনাত্মেতি নিশ্চিনু।।৩৪

অনাত্মা অর্থাৎ আত্মা ভিন্ন প্রসঙ্গ (বার্ত্তা), আত্মা ভিন্ন মন, এবং আত্মা ভিন্ন জগৎও নাই, এইরূপ নিশ্চয় জানিবে।।৩৩,৩৪

আদিমধ্যাবসানেষু দুঃখং সর্ব্বমিদং যতঃ।।৩৫
তস্মাৎ সর্ব্বং পরিত্যজ্য তত্ত্বনিষ্ঠো ভবানঘ।।৩৬

যেহেতু আদি মধ্য এবং অন্তে সমস্তই দুঃখময়, অতএব হে নিষ্পাপ! সকল প্রপঞ্চ পরিত্যাগ করিয়া তুমি ব্রহ্মনিষ্ঠ হও।।৩৫,৩৬

নিদ্রায়া লোকবার্ত্তায়ঃ শব্দাদেরাত্মবিস্মৃতেঃ।।৩৭
ক্বচিন্নাবসরং দত্বা চিন্তয়াত্মানমাত্মনি।।৩৮

নিদ্রার, লোকবার্ত্তার (লৌকিক ব্যবহারের), শাব্দিক জ্ঞানের এবং আত্মবিস্মৃতির অবসর না দিয়া ব্রহ্মেতে নিজ আত্মাকে ভাবনা করিবে।।৩৭, ৩৮

সর্ব্বব্যাপারমুৎসৃজ্য অহং ব্রহ্মেতি ভাবয়।।৩৯
অহং ব্রহ্মেতি নিশ্চিত্য ত্বহংভাবং পরিত্যজ।।৪০

সমস্ত জাগতিক ব্যাপার পরিত্যাগ করিয়া 'আমিই ব্রহ্ম' এইরূপ ভাবনা করিবে। 'আমি ব্রহ্মই' এইরূপ নিশ্চয় করিয়া নিজের দেহাদিতে অহংভাব ত্যাগ করিবে।।৩৯,৪০

ঘটাকাশং মহাকাশ ইবাত্মানং পরাত্মনি।।৪১
বিলোপ্যাখণ্ডভাবেন তুষ্ণীং ভব সদা মুনে।।৪২

ঘটাকাশ যেরূপ মহাকাশে বিলুপ্ত হয়, হে মুনে! সেইরূপ নিজ আত্মাকে পরমাত্মায় লীন করত তুমি পরমাত্মার সহিত অখণ্ড অর্থাৎ 'পরমাত্মা ও তুমি এক' এইরূপ ভাবনাযুক্ত হইয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিবে।। ৪১,৪২

চিদিহাস্তীতি চিন্মাত্রমিদং চিন্ময়মেবচ।।৪৩
চিত্ত্বং চিদহমেতে চ লোকাশ্চিদিতি ভাবয়।।৪৪

যাহা কিছু দৃশ্য এবং অদৃশ্য বস্তু, তাহা চৈতন্যমাত্র। সমস্ত জগৎ চিন্ময়। 'চিত্ত এবং দৃশলোক সকল চৈতন্য মাত্র' এইরূপ ভাবনা করো।।৪৩,৪৪

সত্যচিদঘনমখণ্ডমদ্বয়ং সর্বদৃশ্যরহিতং নিরাময়ম।।৪৫
যৎ পদং বিমলমদ্বয়ং শিবং তৎ সদাহমিতি মৌনমাশ্রয়।।৪৬

যাহা সত্য, ঘনীভূত চিৎস্বরূপ, অখণ্ড, অদ্বয়, সমস্ত দৃশ্যরহিত, স্থূলসূক্ষ্ম এবং কারণশরীরের অভাব হেতু নিরাময় (রোগরহিত), যাহা প্রার্থনার পদ, বিমল এবং শিবস্বরূপ, সেই ব্রহ্ম আমি, এই ভাবনাযুক্ত হইয়া মৌনব্রত অবলম্বন করো।।৪৫,৪৬

জন্মমৃত্যুসুখদুঃখবর্জ্জিতং জাতিনীতিকুলগোত্রদূরগম।।৪৭
চিদ্বিবর্ত্তজগতোহস্য কারণং তৎ সদাহমিতি মৌনমাশ্রয়।।৪৮

জন্ম মৃত্যু সুখ দুঃখরহিত, জাতি নীতি কুল এবং গোত্রবর্জ্জিত, চিৎস্বরূপ ব্রহ্মেরই বিবর্ত্ত এই জগৎ এবং এই জগতের কারণ যে ব্রহ্ম, আমি সেই ব্রহ্মস্বরূপ, এইরূপ ভাবনাযুক্ত হইয়া মৌনকে আশ্রয় কর।।৪৭,৪৮

পূর্ণমদ্বয়মখণ্ডচেতনং বিশ্বভেদকলনাদিবর্জ্জিতম।।৪৯
অদ্বিতীয়পরমং চিদাত্মকং তৎ সদাহমিতি মৌনমাশ্রয়।।৫০

পূর্ণস্বরূপ, অদ্বয়, অখণ্ড, চেতনস্বরূপ, প্রপঞ্চাদিভেদরহিত, পরমজ্ঞানস্বরূপ, আমি—এইরূপ জ্ঞাত হইয়া মৌনকে আশ্রয় করিবে।।৪৯,৫০

স্বাত্মনোহন্যতয়া ভাতং চরাচরমিদং জগৎ।।৫১
স্বাত্মমাত্রতয়া বুদ্ধা তদস্মীতি বিভাবয়।।৫২

'নিজ আত্মা হইতে ভিন্ন যে জগৎ প্রতিভাত হইতেছে তাহা নিজ আত্মাই' এইরূপ ভাবিয়া আমিই এই জগৎস্বরূপ, এইরূপ ভাবনা করিবে।।৫১,৫২

বিলোপ্য বিকৃতিং কৃৎস্নাং সংভবব্যত্যয়ক্রমাৎ।।৫৩
পরিশিষ্টঞ্চ চিন্মাত্রং চিদানন্দং বিচিন্তয়।।৫৪

প্রকৃতিজাত বিকৃতির সম্পূর্ণ বিলোপ করিয়া আত্মা হইতে জগতের উৎপত্তি এবং আত্মাতেই জগতের লয়, এই ক্রম অবলম্বন করত উৎপত্তি এবং প্রলয়ের পর অবশিষ্ট একমাত্র চৈতন্যময় ব্রহ্মই থাকেন (ব্রহ্মেতেই প্রকৃতি এবং প্রকৃতিজ বিকারজাত ভূতভৌতিক পদার্থ সকল লয় করিয়া আমিই অবশিষ্ট চিন্মাত্র এবং আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম) এইরূপ ভাবনা করিবে।।৫৩,৫৪

ইতি পঞ্চমং প্রকরণং সমাপ্তম।।

—

সার্ধান্তিকজীবব্রহ্মৈক্যবাক্যানি।।৬

এক্ষণে জীব এবং ব্রহ্মের ঐক্যপ্রতিপাদক বাক্য সকল উক্ত হইতেছে।

স যশ্চায়ং পুরুষে।।১

সেই সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্ম জীবসমূহে প্রত্যগাত্মরূপে বিরাজিত আছেন।।১

যশ্চাসাবাদিত্যে।।২

স একঃ।।৩

যে সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্ম আদিত্যমণ্ডলে বিরাজিত, তিনিই একমাত্র অর্থাৎ অদ্বিতীয়।।২,৩

সত্যমাত্মা ব্রহ্মৈব ব্রহ্মাত্মৈবাত্র হ্যেব ন বিচিকিৎস্যতাম।।৪

একমাত্র ব্রহ্মই সত্যস্বরূপ এবং জীবগণের আত্মারূপে বিরাজিত, ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই।।৪

ত্বং ব্রহ্মাসি।।৫

অহং ব্রহ্মাস্মি।।৬

আবয়োরন্তরং ন বিদ্যতে তমেবাহমহমেব ত্বম।।৭

হে জীব, তুমিই ব্রহ্ম। আমিও ব্রহ্ম। ব্রহ্ম এবং জীব (ভগবান এবং ভক্ত) আমাদের উভয়ের মধ্যে কোনও ভেদ নাই। তুমিই আমি এবং আমিই তুমি।।৫,৬,৭

গতাঃ কলাঃ পঞ্চদশ প্রতিষ্ঠা দেবাশ্চ সর্ব্বে প্রতিদেবতাসু।।৮

কর্ম্মাণি বিজ্ঞানময়শ্চ আত্মা পরেহব্যয়ে সর্ব একীভবন্তি।।৯

পঞ্চদশ কলা (নামরূপাদি উপাধি) স্ব স্ব কারণরূপ নিজ নিজ অধিষ্ঠাত্রী দেবতাতে লয় প্রাপ্ত হয়। কর্ম্ম সকল, বিজ্ঞানময়কোশযুক্ত জীবাত্মা এবং বিশ্ববিরাট হিরণ্যগর্ভাদি স্ব স্ব উপাধিলোপের পর অব্যয় পরম ব্রহ্মেতে একীভাব প্রাপ্ত হয়।।৮,৯

যেনেক্ষতে শৃণোতীদং জিঘ্রতি ব্যাকরোতি চ।।১০

স্বাদ্বস্বাদু বিজানাতি তৎ প্রজ্ঞানমুদীরিতম।।১১

যদ্দ্বারা শ্রবণ করা যায়, গন্ধ গ্রহণ করা যায়, কথা কহা যায় এবং স্বাদু ও অস্বাদু রস জ্ঞান হয়, তাহাকে প্রজ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম বলে (প্রজ্ঞানং ব্রহ্মেতি শ্রুতিঃ)।।১০,১১

চতুর্ম্মুখেন্দ্রদেবেষু মনুষ্যাশ্বগেবাদিষু।।১২

চৈতন্যমেকং ব্রহ্মাণ্ডং প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম মষ্যপি।।১৩

ব্রহ্ম হইতে ইন্দ্রাদি দেবতা, মনুষ্য এবং গবাদি পশুসমূহে একমাত্র চৈতন্যময় ব্রহ্মই প্রজ্ঞানস্বরূপে বিরাজিত। সেই প্রজ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম আমাতেও বিরাজিত। অর্থাৎ সমস্তই প্রজ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে।। ১২,১৩

পরিপূর্ণঃ পরাত্মাস্মিন দেহেহবিদ্যাধিকারিণি।।১৪
বুদ্ধেঃ সাক্ষিতয়া স্থিত্বা স্ফুরন্নহমিতীর্য্যতে।।১৫
স্বতঃ পূর্ণঃ পরাত্মাত্র ব্রহ্মশব্দেন বর্ণিতঃ।।১৬

এই অবিদ্যার আশ্রয় দেহেতে একমাত্র ব্রহ্মই পরিপূর্ণ রহিয়াছেন। তিনিই বুদ্ধির (সাক্ষিরূপে) অহংপদবাচ্য দ্রষ্টা হইয়া দেহে স্থিত আছেন। স্বতঃ পরিপূর্ণ পরমাত্মা এখানে ব্রহ্মশব্দ দ্বারা বর্ণিত হইয়াছেন।।১৪,১৫,১৬

অস্মীত্যৈক্যপরামর্শাত্তেন ব্রহ্ম ভবাম্যহম।।১৭
একমেবাদ্বিতীয়ং সন্নামরূপবিবর্জ্জিতম।।১৮

'আমিই ব্রহ্ম' এই বিচার দ্বারা আমি ব্রহ্মস্বরূপ ইহা ভাবনা করিবে। সেই ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয়, সৎস্বরূপ এবং নামরূপাদিবর্জ্জিত।।১৭,১৮

সৃষ্টেঃ পুরাধুনাপ্যস্য তাদৃক ত্বং তদিতীর্য্যতে।।১৯
শ্রোতুর্দেহেন্দ্রিয়াতীতং বস্ত্বত্র ত্বংপদেরিতম।।২০

সৃষ্টির পূর্বে (প্রলয়কালে) এবং এক্ষণে (সৃষ্টিকালে) ত্বং এবং তৎ (তত্বমসি) এই বেদান্তবাক্য দ্বারা একমাত্র ব্রহ্মই লক্ষিত হইয়াছেন। শ্রোতার (শিষ্যের) দেহ এবং ইন্দ্রিয়ের অতীত বস্তু নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মতত্ব ত্বং পদ দ্বারা উক্ত হইয়াছে।।১৯,২০

একতা গ্রাহ্যতেহসীতি তদৈক্যমনুভূয়তাম।।২১
স্বপ্রকাশাপরোক্ষত্বময়মিত্যুক্তিতো মতম।।২২

ত্বং পদের লক্ষ্য এই যে তুমি, দৃশ্য গ্রাহ্য বস্তুতে ব্রহ্মরূপে ঐক্য ভাবনা করিবে অর্থাৎ ত্বং পদের লক্ষ্য, জীব হইতে অভিন্ন তৎপদবাচ্য ব্রহ্মই আমি এইরূপ ভাবনা করিবে। 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম ইতি' এই শ্রুতির অর্থ শ্রুতিই বিশদ করিয়া দেখাইতেছেন :—সেই ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ অর্থাৎ তিনি সাধনাদি-অপেক্ষা-বর্জ্জিত, অপরোক্ষ অর্থাৎ প্রত্যক্ষজ্ঞানস্বরূপ।।২১,২২

অহঙ্কারাদিদেহান্তাৎ প্রত্যগাত্মেতি গীয়তে।।২৩

অহঙ্কারাদি হইতে দেহ পর্য্যন্ত যিনি অবিদ্যা দ্বারা আশ্রয় করিয়া আছেন, তাঁহাকে প্রত্যাগাত্মা বা জীবাত্মা বলে (প্রাতিলোম্যেন অঞ্চতীতি)।।২৩

দৃশ্যমানস্য সর্ব্বস্য জগতস্তত্বমীয়তে।।২৪
ব্রহ্মশব্দেন তদব্রহ্ম স্বপ্রকাশত্বরূপকম।।২৫

একমাত্র ব্রহ্মই নিজ অবিদ্যা দ্বারা রচিত দৃশ্যমান সমস্ত জগতের তত্বস্বরূপ লক্ষিত হইয়াছেন।।২৪,২৫

মায়াবিদ্যে বিহায়ৈব উপাধী পরজীবয়োঃ।।২৬
অখণ্ডং সচ্চিদানন্দং পরং ব্রহ্ম বিলক্ষ্যতে।।২৭

পরমাত্মা এবং জীবাত্মার মায়া এবং অবিদ্যা এই উপাধি ত্যাগ করিলে ত্বং পদদ্বারা অখণ্ড সচ্চিদানন্দস্বরূপ একমাত্র ব্রহ্মই লক্ষিত হয়েন।।২৬,২৭

সকারঃ খেচরী প্রোক্তস্ত্বংপদং চেতি নিশ্চিতম।।২৮

হকারঃ পরমেশঃ স্যাত্তৎপদং চেতি নিশ্চিতম।।২৯

সকারো ধ্যায়তে জন্তুর্হকারো হি ভবেদধ্রুবম।।৩০

সোহহং শব্দের ব্যাখ্যা লিখিত হইতেছে—সকার শব্দদ্বারা খেচরী বীজ উক্ত হইয়াছে অর্থাৎ 'খং ব্রহ্ম' এই শ্রুতিদ্বারা আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপক ঈশ্বর উক্ত হইয়াছেন, অতএব 'স' শব্দ দ্বারা সর্ব্বব্যাপক ত্বং পদ লক্ষ্যার্থ জীব উক্ত হইয়াছে। হকার দ্বারা পরমেশ উক্ত হইয়াছেন এবং তৎপদ লক্ষ্যার্থ ব্রহ্মই হকার শব্দ দ্বারা উক্ত হইয়াছেন, ইহা নিশ্চয় করিবে। সকার শব্দের প্রতিপাদ্য জীব যখন নিজ জীবত্ব পরিত্যাগ করে, তখন হকারলক্ষ্য পরমাত্মস্বরূপ ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়।।২৯,৩০

আদ্য রা তৎপদার্থঃ স্যান্মকারস্ত্বংপদার্থবান।।৩১

তয়োঃ সংযোজনমসীত্যর্থে তত্ত্ববিদো বিদুঃ।।৩২

আদ্য 'রা' শব্দ তৎ পদার্থের লক্ষ্যার্থ এবং মকার ত্বং পদার্থের লক্ষ্যার্থ। হে জীব! তুমি রা এবং মকারের সংযোজন অর্থাৎ অভিন্ন হইতেছ অর্থাৎ রাম শব্দ দ্বারা জীব চৈতন্য হইতে অভিন্ন পরমাত্মা উক্ত হইয়াছেন, এইরূপ অর্থ ব্রহ্মবেত্তাগণ করিয়াছেন জানিবে।।৩১,৩২

নমস্ত্বমর্থো বিজ্ঞেয়ো রামস্তৎপদমুচ্যতে।।৩৩

অসীত্যর্থে চতুর্থী স্যাদেবং মন্ত্রেষু যোজয়েৎ।।৩৪

'নমঃ' শব্দে ত্বং পদ লক্ষ্য ব্রহ্ম লক্ষিত হইয়াছেন এবং রাম শব্দে তৎ পদ লক্ষিত হইয়াছে। অসি এই অর্থে চতুর্থীর প্রয়োগ হয়। এই প্রকার সকল মন্ত্রে ব্রহ্মানুসন্ধান তুল্য বলিয়া জানিবে, কারণ ব্রহ্ম, শব্দপ্রতিপাদ্য।।৩৩,৩৪

ক্ষীরং ক্ষীরে যথা ক্ষিপ্তং তৈলং তৈলে জলং জলে।।৩৫

সংযুক্তমেকতাং যাতি তথাত্মন্যাত্মবিন্মুনিঃ।।৩৬

যেরূপ দুগ্ধ দুগ্ধে, তৈল তৈলে এবং জল জলে নিক্ষিপ্ত হইলে একত্ব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ আত্মবিৎ ব্রহ্মবেত্তা মুনি ব্রহ্মই হইয়া যান (ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্ম ভবতীতি শ্রুতিঃ)।।৩৫,৩৬

ঘটে নষ্টে যথা ব্যোম ব্যোমৈব ভবতি স্বয়ম।।৩৭

তথৈবোপাধিবিলয়ে ব্রহ্মৈব ব্রহ্মবিৎ স্বয়ম।।৩৮

যেরূপ ঘট নষ্ট হইলে ঘটস্থিত আকাশ নিজ স্বরূপ মহাকাশে বিলীন হইয়া যায়, সেইপ্রকার অবিদ্যা (স্থূল সূক্ষ্ম কারণরূপ) উপাধি-বর্জ্জিত হইয়া জীব (ব্রহ্মবেত্তা) ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যান।।৩৭,৩৮

ইতি ষষ্ঠং প্রকরণং সমাপ্তম।

—

সার্ধান্তিকমননবাক্যানি।।৭

মহাবাক্যার্থ বোধ দ্বারা জীব ব্রহ্মের ঐক্য জ্ঞানের পর জীবন্মুক্তির উপায়স্বরূপ মননবাক্য সকল উক্ত হইতেছে।।

অহমন্নমহমন্নমহমন্নম।।১

ব্রহ্ম বলিতেছেন আমিই অন্ন অর্থাৎ আমি সর্ব্বাত্মক বলিয়া অন্নরূপে বিরাজ করিতেছি।।১

অহমন্নাদোতহহমন্নাদোতহহমন্নাদঃ।।২

আমিই অন্নের ভক্ষক, কারণ এই চরাচর জগৎ সেই অত্তা ব্রহ্মের অন্নরূপে উক্ত হইয়াছে। এই চরাচর জগৎ ভক্ষণ কিংবা আত্মসাৎ করিবার শক্তি ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কাহারও নাই।।২

অহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চ।।৩

অহমেবেদং সর্ব্বমসানি।।৪

আমিই মনু, আমিই সূর্য্য চন্দ্র তারকাদি যাবতীয় ভূতভৌতিক পদার্থরূপে প্রকটিত হই।।৩,৪

যথা ফেনতরঙ্গাদি সমুদ্রাদুত্থিতং পুনঃ।।৫

সমুদ্রে লীয়তে তদ্বজ্জগন্ময্যনুলীয়তে।।৬

যেরূপ সমুদ্রের ফেনা এবং তরঙ্গাদি উত্থিত হইয়া পুনরায় সমুদ্রেতেই লয় প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ সমস্ত পদার্থই আমাতে উত্থিত হইয়া আমাতেই লয় প্রাপ্ত হয়।।৫,৬

অনাত্মদৃষ্টেরবিবেকনিদ্রা মহং মম স্বপ্নগতিং গতোহহম।।৭

স্বরূপসূর্য্যেহভ্যুদিতে স্ফুটোক্তৈঃ গুরোর্মহাবাক্যপদৈঃ প্রবুদ্ধঃ।।৮

আবিবেকী পুরুষের দেহাদিতে আত্মাভিমানযুক্ত হওয়ায় অবিবেক বশতঃ নিদ্রাদি প্রাদুর্ভূত হয় এবং দেহপুত্র-দারাদিতে আমি এবং আমার এইরূপ স্বপ্নতুল্য জ্ঞান অবিবেক বশতঃই উৎপন্ন হয়; কিন্তু এক্ষণে 'তত্বমসি, অহং ব্রহ্মাস্মি' (হে জীব তুমিই ব্রহ্ম, আমিও ব্রহ্মস্বরূপ) ইত্যাদি মহাবাক্যের গুরুমুখ-নিঃসৃত সুস্পষ্ট উপদেশ দ্বারা নিজস্বরূপ সূর্য্যের উদয় হইয়াছে অর্থাৎ 'আমিই ব্রহ্মস্বরূপ' এইরূপ জ্ঞানোদয় হইয়াছে।।৭,৮

প্রাণাশ্চলন্তু তদ্ধর্ম্মৈঃ কামৈর্বাহন্যতাং মনঃ।।৯

আনন্দবুদ্ধিপূর্ণস্য মম দুঃখং কথং ভবেৎ।।১০

প্রাণাদি নিজ কার্য্য করুক অথবা প্রাণাদিজন্য কামাদি আমার মনকে আহত করুক, আনন্দবুদ্ধিপূর্ণস্বরূপ আমার দুঃখ কোথায়?।।৯,১০

ন মে বন্ধো ন মে মুক্তির্ন মে শাস্ত্রং ন মে গুরুঃ।।১১

মায়ামাত্রবিকাসত্বান্মায়াতীতোহহমদ্বয়ঃ।।১২

আমি অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞানী, সুতরাং আমার বন্ধন নাই, মুক্তি নাই, শাস্ত্রেরও প্রয়োজন নাই, আমার গুরুও কেহ নাই। এই সমস্ত মায়ার বিলাস মাত্র, আমি মায়াতীত অদ্বয় ব্রহ্মস্বরূপ।।১১,১২

আত্মানমঞ্জসা বেদ্মি ক্বাপ্যজ্ঞানং পলায়িতম।।১৩
কর্ত্তৃত্বমপি মে নষ্টং কর্ত্তব্যং বাপি ন ক্বচিৎ।।১৪

আমি এক্ষণে ব্রহ্মকে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়াছি, আমার অজ্ঞান কোথায় পলায়ন করিয়াছে। আমার দেহাদিতে কর্ত্তৃত্বাদি অভিমানের নাশ হইয়াছে, আমার এক্ষণে কোনও কর্ত্তব্য নাই।।১৩,১৪

ব্রাহ্মণ্যং কুলগোত্রে চ নামসৌন্দর্য্যজাতয়ঃ।।১৫
সর্ব্বে স্থূলগতা হ্যেতে স্থূলাদ ভিন্নস্য মে নহি।।১৬

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রাদি বর্ণ, মনুষ্যাদি জাতি, কুল, গোত্র, নাম এবং সৌন্দর্য্য কদর্য্যতাদি ধর্ম্ম সকল স্থূলদেহমাত্রের ধর্ম্ম। এই স্থূলদেহ হইতে ভিন্ন আমার (আত্মার) এ সকল ধর্ম্ম নহে।।১৫,১৬

ক্ষুৎপিপাসান্ধ্যবাধির্য্যকামক্রোধাদয়োহ খিলাঃ।।১৭
লিঙ্গদেহগতা হ্যেতে হ্যলিঙ্গস্য ন বিদ্যতে।।১৮

ক্ষুৎ, পিপাসা, অন্ধতা, বধিরতা, কাম, ক্রোধাদি যাবতীয় ধর্ম্ম লিঙ্গ (সূক্ষ্ম) দেহের। এই লিঙ্গ দেহ হইতে পৃথক আমার (আত্মার) এ সকল ধর্ম্ম নহে।।১৭,১৮

জড়ত্বপ্রিয়মোদত্বধর্ম্মাঃ কারণদেহগাঃ।।১৯
ন সন্তি মম নিত্যস্য নির্ব্বিকারস্বরূপিণঃ।।২০

জড়ত্ব প্রিয় এবং আনন্দ ধর্ম্ম সকল কারণ দেহের। নিত্য, বিকাররহিত আমার (আত্মার) এ সকল ধর্ম্ম নহে।।১৯,২০

চিদ্রূপত্বান্ন মে জাড্যং সত্যত্বান্নানৃতং মম।।২১
আনন্দত্বান্ন মে দুঃখমজ্ঞানাদ ভাতি সত্যবৎ।।২২

আত্মা চিৎস্বরূপ বলিয়া ইহাতে জড়তা নাই, সৎস্বরূপ বলিয়া ইহাতে মিথ্যাত্ব নাই, এবং আনন্দস্বরূপ বলিয়া যে দুঃখ অজ্ঞান বশতঃ সত্যের ন্যায় প্রতীয়মান হয় তাহা ইহাতে নাই।।২১,২২

নাহং দেহো জন্মমৃত্যু কুতো মে নাহং প্রাণঃ ক্ষুৎপিপাসে কুতো মে।।২৩
নাহং চেতঃ শোকমোহৌ কুতো মে নাহং কর্ত্তা বন্ধমোক্ষ কুতো মে।।২৪

যখন আমি (আত্মা) দেহ নহি, তখন আমার জন্ম মৃত্যু কোথায়? যখন আমি প্রাণ নহি, তখন আমার ক্ষুৎপিপাসা কোথায়? যখন আমি চিত্ত নহি, তখন আমার শোক-মোহ কোথায়? যখন আমি কর্ত্তা নহি, তখন আমার বন্ধ মোক্ষ কী কারণে হইতে পারে? ২৩,২৪

আনন্দমন্তর্নিজমাশ্রয়ন্ত মাশাপিশাচীমবমানয়ন্তম।।২৫
আলোকয়ন্তং জগদিন্দ্রজালমাপৎ কথং মাং প্রবিশেদসঙ্গম।।২৬

আমি নিজ আনন্দ স্বরূপকেই একমাত্র আশ্রয়কারী, ইহা আমার হউক ইহা আমার হউক এরূপ আশাপিশাচীকে অপমানকারী, জগৎকে ইন্দ্রজালসদৃশ মিথ্যা দর্শনকারী এবং আসক্তিরহিত, অতএব আমাকে কিরূপে বিপদ আক্রমণ (স্পর্শ) করিতে সমর্থ হইতে পারে?২৫,২৬

দেবার্চ্চনস্নানশৌচভিক্ষাদৌ বর্ত্ততাং বপুঃ।।২৭

তারং জপতু বাক তদ্বৎ পঠত্বাম্নায়মস্তকম।।২৮

আমার দেহ পূর্ব্বসংস্কার বশতঃ দেবার্চ্চনা, স্নান, শৌচক্রিয়া এবং ভিক্ষায় প্রবৃত্ত হউক। আমার বাগিন্দ্রিয় উচ্চৈঃস্বরে প্রণবাদি জপ করুক বা বেদ পাঠ করুক।।২৭,২৮

বিষ্ণুং ধ্যায়তু ধীর্যদ্বা ব্রহ্মানন্দে বিলীয়তাম।।২৯

সাক্ষ্যহং কিঞ্চিদপ্যত্র ন কুর্ব্বে নাপি কারয়ে।।৩০

আমার বুদ্ধি সর্ব্বব্যাপক বিষ্ণুর ধ্যান করুক অথবা ব্রহ্মানন্দ-সাগরে বিলয় প্রাপ্ত হউক। আমি (আত্মা) সাক্ষী মাত্র, আমি কোন কার্য্য করি না এবং কাহাকেও কোন কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করি না।।২৯,৩০

জ্ঞাতং জ্ঞাতব্যমধুনা দৃষ্টং দ্রষ্টব্যমদ্ভুতম।।৩১

এক্ষণে আত্মাস্বরূপে জ্ঞাতব্য যে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম, তিনি মৎকর্ত্তৃক জ্ঞাত হইয়াছেন এবং অপরোক্ষ (সাক্ষাৎ) 'অহং ব্রহ্মাস্মি—আমি সেই ব্রহ্মস্বরূপ' এই অদ্ভুত দ্রষ্টব্য (সেই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মভাব) মৎকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়াছেন।।৩১

বিশ্রান্তোহস্মি চিরংশ্রান্তশ্চিন্মাত্রান্নাস্তি কিঞ্চন।।৩২

ন ভূতং ন ভবিষ্যঞ্চ চিন্তয়ামি কদাচন।।৩৩

নিজ অজ্ঞ দশাতে স্বাতিরিক্ত প্রপঞ্চে আমি মগ্ন ছিলাম, এক্ষণে 'আমি কেবল চিৎস্বরূপ (ব্রহ্মস্বরূপ)' এরূপ জ্ঞান লাভ করিয়া বিশ্রাম লাভ করিয়াছি। এক্ষণে ব্রহ্ম ভিন্ন আমার ভূত-ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান বিষয় চিন্তার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই।।৩২,৩৩

ন স্তৌমি ন চ নিন্দামি হ্যাত্মনোহন্যন্নহি ক্বচিৎ।।৩৪

আমি কাহারও স্তব কিংবা নিন্দা করি না, কারণ আমা হইতে অতিরিক্ত কিছুই নাই, (সর্ব্বমাত্মময়ং জগৎ ইতি শ্রুতেঃ) এবং এই সমস্ত জগৎই ব্রহ্মময় এরূপ শ্রুতি আছে।।৩৪

অলেপকোহহমজরো নীরাগঃ শান্তবাসনঃ।।৩৫

আমি জগৎপ্রপঞ্চে লিপ্ত নহি (সংস্রবশূন্য), আমি স্থূলদেহ হইতে পৃথক বলিয়া অনুরাগরহিত এবং সর্ব্ববাসনা-বর্জ্জিত বলিয়া আমি ব্রহ্মস্বরূপ।।৩৫

স্বপূর্ণাত্মাতিরেকেণ জগজ্জীবেশ্বরাদয়ঃ।।৩৬

ন সন্তি নাস্তি মায়া চ তেভ্যশ্চাহং বিলক্ষণঃ।।৩৭

আমার নিজ পূর্ণস্বরূপাতিরিক্ত জগৎ, জীব এবং ঈশ্বরাদি নাই, মায়াও নাই। আমি এই সকল হইতে বিলক্ষণ ব্রহ্মস্বরূপ (সর্ব্বস্মাৎ অন্যো বিলক্ষণ ইতি শ্রুতেঃ)।।৩৬,৩৭

কিং করোমি ক্ব গচ্ছামি কিং গৃহ্ণামি ত্যজামি কিম।।৩৮

যন্ময়া পূরিতং বিশ্বম মহাকল্পাম্বুনা যথা।।৩৯

যেরূপ মহাপ্রলয়ে পৃথিবী জল দ্বারা পূরিতা হয়েন, সেইরূপ আমা দ্বারা (ব্রহ্মরূপে) এই বিশ্বপ্রপঞ্চ প্রপূরিত রহিয়াছে, অতএব আমি ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া কর্ত্তব্য কার্য্যের অভাব বশতঃ কোন কার্য্য করিব? অর্থাৎ

আমার কর্ত্তব্য কিছুই নাই। সর্ব্বব্যাপক বলিয়া গন্তব্য প্রদেশের অভাব বশতঃ আমি কোথায় গমন করিব? মদতিরিক্ত বিষয়ের অভাব বশতঃ আমি কোন বিষয় গ্রহণ করিব? সমস্তই ব্রহ্মময় বলিয়া আমি কোন বস্তুই বা পরিত্যাগ করিব? (নাস্তি অনাত্মেতি নিশ্চিনু ইতি শ্রুতেঃ)।।৩৮,৩৯

ইতি সপ্তমং প্রকরণং সমাপ্তম।।

—

সার্ধান্তিকজীবন্মুক্তিবাক্যানি।।৮

মহবাক্যার্থ জ্ঞান দ্বারা মনন সম্পন্ন হইয়া মননের ফলস্বরূপ
জীবন্মুক্তিবাক্য সকল উক্ত হইতেছে।

স তত্র পর্য্যেতি জক্ষৎ ক্রীড়ন রমমাণঃ স্ত্রীভির্বা
যানৈর্বা জ্ঞাতিভির্বা বয়স্যৈর্বা নোপজনং স্মরন্নিদং শরীরম।।১

মহাবাক্য শ্রবণ এবং মনন দ্বারা ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মবিৎ পুরুষ যদৃচ্ছাপ্রাপ্ত আহার্য্য ভক্ষণ করত চিত্তবিকাররহিত হইয়া স্ত্রী, যান, আত্মীয় বা বয়স্যগণের সহিত ক্রীড়া এবং রমণশীল হইয়া 'এই শরীর উৎপত্তির অধিকরণ নহে' এইরূপ স্মরণ করত নিজ ব্রহ্মভাবে অবস্থান করিয়া কালযাপন করিতে থাকেন।।১

স বা এষ এবং পশ্যন্নেবং মন্বান এবং বিজানান্নাত্মরতিরাত্মক্রীড়
আত্ম মিথুন আত্মানন্দঃ স স্বরাড ভবতি।।২

সেই ব্রহ্মবিদ্বরিষ্ঠ নিজ ব্রহ্মভাব দর্শন, মনন এবং সাক্ষাৎ করত আত্মরতি, আত্মক্রীড়, আত্মমিথুন এবং আত্মানন্দস্বরূপ হইয়া স্বরাট হয়েন অর্থাৎ নিজ ব্রহ্মস্বরূপে বিরাজ করেন।।২

তে দেবাঃ পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকেষণায়াশ্চ
সসাধনেভ্যো ব্যুত্থায় নিরাগারা নিষ্পরিগ্রহা অশিখা অযজ্ঞোপবীতা
অন্ধা বধিরা মুগ্ধাঃ ক্লীবা মূকা উন্মত্তা ইব পরিবর্ত্তমানাঃ
শান্তা দান্তা উপরতাস্তিতিক্ষবঃ সমাহিতা আত্মরতয়ঃ আত্মক্রীড়া
আত্মমিথুনা আত্মানন্দাঃ প্রণবমেব পরং ব্রহ্মাত্মপ্রকাশং শূন্যং
জানন্তস্তত্রৈব পরিসমাপ্তাঃ।।৩

পুত্রৈষণা (পুত্রকামনা) বিত্তৈষণা (ধনবাসনা), লোকেষণা (লোকপ্রতিষ্ঠা কামনা) এবং উক্ত কামনাত্রয়ের সাধন সকল সম্যক ত্যাগ করিয়া নিরাগার (বাসজন্য গৃহাদিরহিত), নিষ্পরিগ্রহ (নিজ প্রাণ ধারণোপযোগী দ্রব্য গ্রহণ ও তদ্ভিন্ন অন্য দ্রব্য পরিগ্রহশূন্য) এবং শিখা ও যজ্ঞোপবীতরহিত হইয়া, অন্ধ (ব্রহ্মাতিরিক্ত রূপের অগ্রহণ), বধির (ব্রহ্ম ভিন্ন শব্দের অগ্রহণ), মূক, (ব্রহ্মভাবেতে মুগ্ধ, তদ্ভিন্ন বস্তুতে মুগ্ধতা এবং সৌন্দর্য্যবর্জ্জিত), ক্লীব (স্ত্রী-আদি ভোগ্যবস্তুতে বিকাররহিত) এবং উন্মত্তের (লক্ষ্যেতে একতান চিত্তে পরিবর্ত্তমানতা) ন্যায় নিগৃহীতান্তরেন্দ্রিয় শান্ত এবং বাহ্যেন্দ্রিয়সংযত দান্তস্বরূপ, অন্তর্বাহ্য বিষয়ে উপরত, শীতোষ্ণদ্বন্দ্বসহিষ্ণু, লক্ষ্যেতে একাগ্রচিত্ত, আত্মরতিশীল, আত্মক্রীড়াশীল, আত্মমিথুন এবং আত্মানন্দযুক্ত ও পরব্রহ্মের একমাত্র প্রকাশ প্রণবপর হইয়া ব্রহ্মাতিরিক্ত সমস্ত শূন্য এইরূপ জ্ঞান লাভ করত সেই সকল ব্রহ্মবেত্তারা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মেতেই পরিসমাপ্ত হয়েন (স্বয়ং ব্রহ্ম হইয়া যান)।।৩

কুচেলোহসহায় একাকী সমাধিস্থ আত্মকাম আপ্তকামো নিষ্কামো
জীর্ণকামো হস্তিনি সিংহে দংশে মশকে নকুলে সর্পরাক্ষসগন্ধর্ব্বে
মৃত্যো রূপাণি বিদিত্বা ন বিভেতি কুতশ্চনেতি।।৪

ব্রহ্মবেত্তা পরিব্রাট জীর্ণ কৌপীন এবং কন্থা ধারণ করেন বলিয়া তিনি কুচেল-পদবাচ্য, স্বদেহাতিরিক্ত সহায় অগ্রহণ হেতু তিনি অসহায় এবং একাকী, বিক্ষেপরহিত বলিয়া তিনি সমাধিস্থ, নিজ ব্রহ্মস্বরূপ আত্মাকেই কামনা করেন বলিয়া তিনি আত্মকাম, তিনি কোনও বিষয়েই অভাব বোধ করেন না বলিয়া আপ্তকাম, 'ইহা আমার হউক', 'ইহা আমার হউক' ইত্যাদি কামনা-রহিত বলিয়া তিনি নিষ্কাম, জ্ঞানরূপ জঠরাগ্নিতে তাঁহার কামনা জীর্ণ বলিয়া তিনি জীর্ণকাম। তিনি হস্তী সিংহ দংশ মশক নকুল সর্প রাক্ষস গন্ধর্ব্বাদিতে উহাদিগের মরণধর্ম্মশীলতা জানিয়েছেন, তাঁহাতে ভয়হেতু দ্বৈতজ্ঞানের অভাব বশতঃ অদ্বৈতদৃষ্টি দ্বারা তিনি কাহা হইতেও ভয় প্রাপ্ত হয়েন না।।৪

সর্ব্বধর্ম্মান পরিত্যজ্য নির্ম্মমো নিরহঙ্কারোভূত্বা ব্রহ্মিষ্ঠং
শরণমুপগম্য তত্ত্বমসি সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি
কিঞ্চনেত্যাদিমহাবাক্যার্থানুভব-জ্ঞানাদ ব্রহ্মৈবাহমস্মীতি
নিশ্চিত্য নির্ব্বিকল্পক-সমাধিনা স্বতন্ত্রো যতিশ্চরতি স সন্ন্যাসী
স মুক্তঃ স পূজ্যঃ স যোগী স পরমহংসঃ সোহবধূতঃ স
ব্রাহ্মণ ইতি জীবঃ পঞ্চবিংশকঃ স্বকল্পিত-চতুর্বিংশতিতত্ত্বং
পরিত্যজ্য ষড়বিংশক-পরমাত্মাহমিতি নিশ্চয়াজ্জীবন্মুক্তো ভবতি।।৫

পরিব্রাট ব্রহ্মবিৎ মুনি শ্রুতিস্মৃতিবিহিত এবং প্রতিষিদ্ধ বিধিনিষেধরূপ সমস্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সকল বিষয়ে মমতাশূন্য, নিরহঙ্কার এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ নিজ আচার্য্যের শরণাগত হইয়া 'তত্বমসি' 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' 'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন' ইত্যাদি মহাবাক্যার্থের অনুভবজন্য জ্ঞান লাভ করত আমিই ব্রহ্ম এইরূপ নিশ্চয় করিয়া নির্ব্বিকল্প সমাধি দ্বারা অপরাধীন যতি, সন্ন্যাসী, পূজ্য, যোগী এবং পরমহংসপদবাচ্য হইয়া বিচরণ করেন। তিনিই অবধূত ব্রাহ্মণ, তিনি পঞ্চবিংশতত্বযুক্ত জীবপদবাচ্য হইয়া নিজকল্পিত চতুর্ব্বিংশতি তত্বকে ত্যাগ করত 'ষড়বিংশতত্ব পরমাত্মা আমি' এইরূপ নিশ্চয় জ্ঞান দ্বারা জীবন্মুক্তপদবাচ্য হয়েন।।৫

তুরীয়মক্ষরমিতি জ্ঞাত্বা জাগরিতে সুষুপ্ত্যবস্থাপন্ন ইব যদযচ্ছ্রুতং
যদযদ্দৃষ্টং তৎ সর্ব্বমবিজ্ঞাতমিব যো বসেত্তস্য স্বপ্নাবস্থায়ামপি
তাদৃগবস্থা ভবতি স জীবন্মুক্তো ভবতি।।৬

তুরীয় (চতুর্থ) স্থানীয় অক্ষর (ক্ষয়রহিত) পরমাত্মাকে জ্ঞাত হইয়া জাগ্রতকালে সুষুপ্তির ন্যায় যাহা শ্রুত বা দৃষ্ট হয় তাহা যেন অবিজ্ঞাত এইরূপ, এবং স্বপ্নাবস্থাতেও যিনি ঐরূপ ভাবযুক্ত হয়েন, তিনি জীবন্মুক্তপদবাচ্য।।৬

সকৃদ্বিভাতসদানন্দানুভবৈকগোচরো ব্রহ্মবিদ
বিদ্বাংশ্চক্ষুরাদিবাহ্যপ্রপঞ্চোপরতঃ সর্ব্বং জগদাত্মত্বেন
পশ্যন্নাত্মেতি ভাবয়ন কৃতকৃত্যো ভবতি।।৭

স্বয়ংপ্রকাশ, আনন্দময়, একমাত্র পরমব্রহ্মই অবিদ্যাবরণশূন্য জ্ঞানী ব্যক্তির সদা অনুভবের বিষয়। সেই ব্রহ্মবেত্তা বিদ্বান চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাহ্যবস্তু প্রপঞ্চ হইতে বিরত হইয়া সমস্ত জগৎকে ব্রহ্মময় দর্শন এবং ভাবনা করত কৃতকৃত্য হয়েন।।৭

নির্দ্বন্দ্বঃ সদাহচঞ্চলগাত্রঃ পরমশান্তিং স্বীকৃত্য নিত্যশুদ্ধঃ
পরমাত্মাহমেবেত্যখণ্ডানন্দঃ পূর্ণঃ কৃতার্থঃ পরিপূর্ণপরমাকাশমগ্নমনাঃ
প্রাপ্তোন্মন্যবস্থঃ সংন্যস্তসর্ব্বেন্দ্রিয়বর্গোহনেকজন্মার্জ্জিতপুণ্যপুঞ্জপরি

পক্বকৈবল্যফলোহখণ্ডানন্দনিরস্তসর্ব্ব ক্লেশকশ্মলো ব্রহ্মাহমস্মীতি
কৃতকৃত্যো ভবতি।।৮

সেই ব্রহ্মবিৎ পুরুষ শীতোষ্ণ-সুখদুঃখাদির অভাব হেতু দ্বন্দ্বরহিত, সদা নির্ব্বিকল্প-সমাধিযুক্ত বলিয়া অচঞ্চলগাত্র, সমস্ত ব্রহ্মময় এরূপ ভাবনা দ্বারা পরম শান্তস্বরূপ, নিত্য শুদ্ধ পরমাত্মাই আমি এরূপ অনুভব দ্বারা অখণ্ড আনন্দস্বরূপ, অপূর্ণ প্রপঞ্চেতে একমাত্র তিনিই পূর্ণস্বরূপ, নিজ কর্ত্তব্যের অভাববশতঃ কৃতার্থ, পরিপূর্ণ পরমাকাশস্বরূপ ব্রহ্মেতে তাঁহার মন সদা মগ্ন, তিনি নির্ব্বিকল্প সমাধিতে প্রাপ্তোন্মনাবস্থ, তিনি ত্যক্তসমস্তেন্দ্রিয়ব্যাপার হইয়া এবং অনেকজন্মার্জ্জিত পুণ্যরাশিজন্য পরিপক্ক মোক্ষরূপ ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি সদা একরস এবং আনন্দযুক্ত, এবং তাঁহার সমস্ত ক্লেশরূপ দৌর্ব্বল্য নিরস্ত হইয়াছে। এবম্ভুত ব্রহ্মবিৎ 'আমিই ব্রহ্ম' এইরূপ ভাবনা দ্বারা কৃতকৃত্য হয়েন।।৮

ব্রহ্মৈবাহমস্মীত্যনবরত ব্রহ্মপ্রণবানুসন্ধানেন
যঃ কৃত্যকৃত্যো ভবতি স পরমহংসপরিব্রাট।।৯

'ব্রহ্মই আমি' এইরূপ নিয়ত ব্রহ্মের প্রতীকস্বরূপ প্রণবের (ওঁকার) জপ এবং অর্থ ভাবনা দ্বারা সেই পরমহংস পরিব্রাজক মুনি জীবন্মুক্তপদবাচ্য হয়েন।।৯

ভাবাভাবকলাবিনির্মুক্তঃ সর্ব্বসংশয়ধ্বস্তঃ
পূর্ণাহংভাবঃ কৃতকৃত্যো ভবতি।।১০

নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানী যোগী ভাব ও অভাব কলা (শব্দাদি বিষয়রূপ ভাবকলা ও অন্তঃকরণবৃত্তিরাহিত্যরূপ অভাবকলা) হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া আমিই ব্রহ্মস্বরূপ এই জ্ঞান দ্বারা সর্ব্বসংশয়বহিত এবং পূর্ণব্রহ্মস্বরূপ, আমি এইরূপ ব্রহ্মভাবযুক্ত হইয়া জীবন্মুক্তপদবাচ্য হয়েন।।১০

প্রাণো হ্যেষ সর্ব্বভূতৈর্বিভাতি বিজানন বিদ্বান ভবতি নাতিবাদী।।১১

(প্রাণস্য প্রাণ ইতি শ্রুতেঃ) সেই ব্রহ্ম প্রাণের প্রাণ, অতএব তিনিই প্রাণরূপে আব্রহ্মস্তম্বাদি সর্ব্বভূতে বিরাজিত আছেন, এইরূপ জানিয়া ব্রহ্মবিৎ পুরুষ তূষ্ণীম্ভাব অর্থাৎ মৌন অবলম্বন করিবেন।।১১

আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবানেষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ।।১২

পরমাত্মাতে ক্রীড়াশীল, পরমাত্মাতে রমণশীল এবং পরমাত্মাতেই ধ্যানাদি ক্রিয়াশীল পুরুষ, ব্রহ্মবেত্তৃগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।।১২

নিমিষার্দ্ধং ন তিষ্ঠন্তি বৃত্তিং ব্রহ্মময়ীং বিনা।।১৩
যথা তিষ্ঠন্তি ব্রহ্মাদ্যাঃ সনকাদ্যাঃ শুকাদয়ঃ।।১৪

যেরূপ ব্রহ্মাদি, সনকাদি এবং শুকাদি জীবন্মুক্তগণ ব্রহ্মময়ী বৃত্তিযুক্ত হইয়া অবস্থান করিতেছেন, সেইরূপ ব্রহ্মবেত্তৃগণ ব্রহ্মময়ী বৃত্তি ব্যতিরেকে অর্থাৎ আমিই ব্রহ্ম এইরূপ ভাবনা ব্যতীত অর্দ্ধনিমেষ কালও অবস্থান করেন না।।১৩, ১৪

অধ্যাত্মরতিরাসীনো নিরপেক্ষো নিরাশিষঃ।।১৫
সর্ব্বদ্বন্দ্বেবিনির্মুক্তো ব্রহ্মণ্যেবাবতিষ্ঠতে।।১৬

যে ব্রহ্মবেত্তা ব্রহ্মেতে রমণশীল, সদা ব্রহ্মভাবেতে স্থিত, ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য অপেক্ষা-বর্জ্জিত, এবং কামনা-রহিত ও শীতোষ্ণ-সুখদুঃখাদি-দ্বন্দ্বমুক্ত, তিনি সদা ব্রহ্মেতে অবস্থান করেন।।১৫, ১৬

কপালং বৃক্ষমূলানি কুচেলান্যসহায়তা।।১৭
সমতা চৈব সর্ব্বস্মিন্নেতন্মুক্তস্য লক্ষণম।।১৮

যিনি ভিক্ষাপাত্রে, বৃক্ষমূলে, জীর্ণকন্থা এবং অসহায়তা প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ে সমভাবযুক্ত, তাঁহাকে মুক্ত বলে।।১৭, ১৮

স্বপ্নেহহি যো হি যুক্তঃ স্যাজ্জাগ্রতীব বিশেষতঃ।।১৯
ঈদৃকচেষ্টঃ স্মৃতঃ শ্রেষ্ঠো বরিষ্ঠো ব্রহ্মবাদিনাম।।২০

যিনি স্বপ্নে বিশেষতঃ জাগ্রতকালে ব্রহ্মেতে সমাহিত, তিনিই ব্রহ্মবাদিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং বরণীয়।।১৯, ২০

নির্মানশ্চানহঙ্কারো নির্দ্বন্দ্বশ্ছিন্নসংশয়ঃ।।২১
আত্মক্রীড় আত্মরতিরাত্মবান সমদর্শনঃ।।২২
স্মৃত্বা স্পৃষ্টা চ ভুক্তা চ দৃষ্টা জ্ঞাত্বা শুভাশুভম।।২৩
ন হৃষ্যতি গ্লায়তি যঃ স শান্ত ইতি কথ্যতে।।২৪

যিনি মান এবং অহঙ্কারবর্জ্জিত, দ্বন্দ্বশূন্য, নিঃসংশয়, আত্মাতেই ক্রীড়াশীল, আত্মাতেই রমণশীল, ব্রহ্মভাবে স্থিত, সর্ব্বত্র সমদর্শী এবং শুভাশুভ বিষয়ের স্মরণ, স্পর্শ, ভোজন, দর্শন ও জ্ঞান লাভ করিয়াও হর্ষ এবং গ্লানিযুক্ত হয়েন না, তিনি শান্তপুরুষ।।২১, ২২, ২৩, ২৪

অপ্রাপ্তং হি পরিত্যজ্য সংপ্রাপ্তে সমতাং গতম।।২৫

যে ব্রহ্মবেত্তা অপ্রাপ্ত বস্তুর ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া প্রারব্ধবশে প্রাপ্ত বস্তুতেই তুষ্ট হয়েন, তিনি সমতা-প্রাপ্ত হয়েন।।২৫

অদৃষ্টখেদাখেদো যঃ সন্তুষ্ট ইতি কথ্যতে।।২৬

নিজ ইষ্টপ্রাপ্তিতে অখেদ এবং তদপ্রাপ্তিতে খেদ—এইরূপে অদৃষ্টলব্ধ বিষয়ে যিনি সুখদুঃখবর্জ্জিত, তাঁহাকে জীবন্মুক্ত সন্তুষ্ট বলে।।২৬

নাকৃতেন কৃতেনার্থো ন শ্রুতিস্মৃতিবিভ্রমৈঃ।।২৭
নির্ম্মন্থন ইবাম্ভোধিঃ স তিষ্ঠতি যথাস্থিতঃ।।২৮

শ্রৌত এবং স্মার্ত্ত নানাবিধ প্রতিষিদ্ধ এবং বিহিত কর্ম্মেতে যাঁহার কোনও পুরুষার্থ নাই, তিনিই জীবন্মুক্ত পুরুষ। সমুদ্র যেরূপ মন্থনরহিত হইলে স্থিরভাব ধারণ করে, সেইরূপ জীবন্মুক্ত পুরুষ ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়া স্থিরভাব ধারণ করেন।।২৭, ২৮

সম্যগ জ্ঞানাববোধেন নিত্যমেকসমাধিনা।।২৯
সাংখ্য এবাববুদ্ধা যে তে সাংখ্যা যোগিনঃ স্মৃতাঃ।।৩০

ব্রহ্মবিৎ সম্যক প্রকারে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া এবং নিত্য ব্রহ্মেতে সমাধিস্থ হইয়া জীবন্মুক্তপদবাচ্য হয়েন। প্রতিযোগিরহিত পরব্রহ্ম যে শাস্ত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছেন, সেই অদ্বৈত শাস্ত্রকে সাংখ্য বলে। সেই অদ্বৈত ব্রহ্মকে যাঁহারা জানিয়াছেন, তাঁহাদিগকে সাংখ্যযোগী বলে।।২৯, ৩০

প্রাণাদ্যনিলসংশান্তৌ যুক্ত্যা যে পদমাগতাঃ।।৩১
অনাময়মনাদ্যন্তং তে স্মৃতা যোগযোগিনঃ।।৩২

সম্প্রজ্ঞাত সমাধি দ্বারা প্রাণবায়ু নিরুদ্ধ হইলে, নিরাময় (ব্যাধিরহিত) অনাদিস্বরূপ ব্রহ্মেতে স্থিরচিত্ত ব্যক্তিগণ যোগযোগী রূপে (জীবন্মুক্ত) অভিহিত হন।।৩১, ৩২

সুখদুঃখদশা ধীরং সাম্যান্ন প্রোদ্ধরন্তি যম।।৩৩
নিশ্বাসা ইব শৈলেন্দ্রং চিত্তং তস্য মৃতং বিদুঃ।।৩৪

যেরূপ মুখনির্গত নিশ্বাস শৈলেন্দ্রকে (মেরুপর্ব্বতকে) বিচলিত করিতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ শীতোষ্ণ এবং সুখদুঃখাদি যে ব্রহ্মবিৎ ধীর পুরুষকে সাম্য হইতে বিচলিত করিতে সমর্থ না হয় এবং যিনি চিত্তচাঞ্চল্যরহিত বলিয়া মৃতবৎ প্রতীয়মান হয়েন, তাঁহাকে জীবন্মুক্ত বলে।।৩৩, ৩৪

বাচামতীতবিষয়ো বিষয়াশাদশোজ্ঝিতঃ।।৩৫
পরানন্দরসাক্ষুব্ধো রমতে স্বাত্মনাত্মনি।।৩৬

বাক্যের অতীত ব্রহ্মই একমাত্র বিষয়। তদ্ভিন্ন বিষয়াশা যিনি পরিত্যাগ করিয়াছেন, পরমানন্দরসে তৃপ্ত সেই ব্রহ্মবেত্তা পুরুষ নিজ আত্মা দ্বারা পরমাত্মাতে রমণ করেন।।৩৫, ৩৬

নির্গ্রন্থিঃ শান্তসন্দেহো জীবন্মুক্তোহবিভাবনঃ।।৩৭
অনির্ব্বাণোহপি নির্ব্বাণশ্চিত্রদীপ ইব স্থিতঃ।।৩৮
নির্ধনোহপি সদা তুষ্টোহপ্যসহায়ো মহাবলঃ।।৩৯
নিত্যতৃপ্তোহপভুঞ্জানোহপ্যসমঃ সমদর্শনঃ।।৪০
কুর্ব্বন্নপি ন কুর্ব্বাণশ্চাভোক্তা ফলভোগ্যপি।।৪১
শরীর্য্যপ্যশরীরোহসৌ পরিচ্ছিন্নোহপি সর্ব্বগঃ।।৪২

অবিদ্যারূপ গ্রন্থিরহিত, ব্রহ্মজ্ঞানজন্য ছিন্নসংশয় এবং স্বাতিরিক্ত ভাবনারহিত পুরুষকেই জীবন্মুক্ত বলে। তাঁহারা অজ্ঞানদৃষ্টিতে অমুক্তরূপে প্রতিভাত হইলেও চিত্রস্থিত দীপের ন্যায় নিজেই মুক্তস্বরূপ; নির্ধন হইয়াও ব্রহ্মভাবেতে সদা তুষ্ট এবং স্বাতিরিক্ত সহায়শূন্য হইয়াও আত্মবলে বলীয়ান। তাঁহারা বিষয়ভোগ-রহিত হইয়াও পরমাত্মরসে সদা তৃপ্ত, অসম (সমতারহিত) প্রপঞ্চেতে সদা ব্রহ্ম দর্শন হেতু সমদর্শী, কর্ত্তৃত্বাভিমান এবং অহঙ্কাররহিত বলিয়া শ্রৌত এবং স্মার্ত্ত কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াও নিষ্কর্ম্মা এবং আসক্তিরহিত বলিয়া ফলভোগ করিয়াও অভোক্তা। তাঁহারা শরীর ধারণ করিয়াও অশরীরী অর্থাৎ শরীরজন্য সুখদুঃখরূপ ফলে ভোগরহিত এবং দেহাদিতে পরিচ্ছিন্নের (সীমাবদ্ধ) ন্যায় প্রকাশ পাইলেও ব্রহ্মভাব বশতঃ সর্ব্বব্যাপক।। ৩৭,৩৮,৩৯,৪০,৪১,৪২

অধ্যাত্মরতিরাসীনঃ পূর্ণঃ পাবনমানসঃ।।৪৩

সদা অদ্বৈত অধ্যাত্মশাস্ত্রে রতিযুক্ত, নিজ ব্রহ্মভাবেতে স্থিত, সর্ব্বত্র ব্রহ্মস্বরূপে পরিপূর্ণ এবং আমিই ব্রহ্ম এইরূপ ভাবনা দ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি জীবন্মুক্তপদবাচ্য হয়েন।।৪৩

নৈষ্কর্ম্মোণ ন তস্যার্থস্যার্থোহস্তি ন কর্ম্মভিঃ।।৪৪
ন সমাধানজাপ্যাভ্যাং যস্য নির্ব্বাসনং মনঃ।।৪৫

যে ব্রহ্মবিৎ পুরুষের মন বাসনাশূন্য হইয়াছে, তাঁহার নৈষ্কর্ম্ম্য (কর্ম্মসন্ন্যাস) এবং বিহিত কর্ম্মেরও প্রয়োজন নাই। কারণ তাঁহার মন নির্ব্বাসন (বাসনাশূন্য) হইয়াছে। অতএব মনোনিগ্রহের জন্য তাঁহার মন্ত্রজপের কোন

প্রয়োজন নাই। কারণ ওই সকল কর্ম্ম চিত্তকে বিশুদ্ধ বা বাসনারহিত করিবার জন্যই প্রয়োজন হয়।।৪৪,৪৫

জগজ্জীবাদিরূপেণ পশ্যন্নপি পরাত্মবিৎ।।৪৬
ন তৎ পশ্যতি চিদ্রূপং ব্রহ্ম বস্ত্বেব পশ্যতি।।৪৭

ব্রহ্মবেত্তা পুরুষ প্রাতিভাসিক জ্ঞান-কল্পিত জগৎ এবং জীবাদি দর্শন করিয়াও নিজ জ্ঞানদৃষ্টিতে জগৎ এবং জীবাদিরূপে দর্শন না করিয়া ওই সকলকে চিন্ময় ব্রহ্মবস্তু বলিয়া দর্শন করেন।।৪৬,৪৭

অহমন্নং সদান্নাদ ইতি হি ব্রহ্মবেদনম।।৪৮
ব্রহ্মবিদ গ্রসতি জ্ঞানাৎ সর্ব্বং ব্রহ্মাত্মনৈব তু।।৪৯

আমিই অন্ন এবং অন্নের অত্তা (ব্রহ্মই অন্ন এবং অন্নের অত্তা) এই ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মবিৎ সমস্ত প্রপঞ্চকে ব্রহ্মস্বরূপে গ্রাস করেন। অতএব সমস্ত প্রপঞ্চের গ্রাস হেতু কেবল ব্রহ্মমাত্র অবশিষ্ট থাকেন।।৪৮,৪৯

সমাধিমথ কর্ম্মাণি মা করোতু করোতু বা।।৫০
হৃদয়েনাত্তসর্ব্বেহো মুক্ত এবোত্তমাশয়ঃ।।৫১

ব্রহ্মবিৎ বরণীয় হৃদয় দ্বারা সমস্ত ঈহা (চেষ্টা) গ্রাস করিয়া অর্থাৎ নিশ্চেষ্ট হইয়া সমাধিযুক্ত হউন, কোন কর্ম্ম করুন বা না করুন, তাঁহার সদা ব্রাহ্মী স্থিতি হেতু তিনি উত্তমাশয় জীবন্মুক্তপদবাচ্য হয়েন।।৫০,৫১

অক্ষরত্বাদ্বরেণ্যত্বাদ্ধুতসংসারবন্ধনাৎ।।৫২
তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যত্বাদবধূত ইতীর্য্যতে।।৫৩
যো বিলঙ্ঘ্যাশ্রমান বর্ণানাত্মন্যেব স্থিতঃ পুমান।।৫৪
অতিবর্ণাশ্রমী যোগী হ্যবধূতঃ স কথ্যতে।।৫৫

ব্রহ্মবিৎ অক্ষর (অবিনাশী) এবং বরণীয় ব্রহ্মভাবনা দ্বারা সংসারবন্ধন হইতে বিচ্যুতি লাভ করিয়া এবং তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্য সকলের লক্ষ্যার্থজ্ঞান লাভ করিয়া অবধূত পদবাচ্য হন। যিনি আশ্রমচতুষ্টয় এবং ব্রাহ্মণাদি বর্ণ অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মভাবে অবস্থান করেন, সেই বর্ণাশ্রমের অতীত যোগী পুরুষকে অবধূত বলে।।৫২,৫৩,৫৪,৫৫

যথা রবিঃ সর্ব্বরসান প্রভুঙক্তে হুতাশনশ্চাপি হি সর্ব্বভক্ষঃ।।৫৬
তথৈব যোগী বিষয়ান প্রভুঙক্তে ন লিপ্যতে পুণ্য-পাপৈশ্চ শুদ্ধঃ।।৫৭

যেরূপ সূর্য্যদেব ভালো-মন্দ সকল রস শোষণ করেন এবং যেরূপ অগ্নি সকল পদার্থ ভক্ষণ করেন (অগ্নি-সংযোগে ভালো-মন্দ সকল পদার্থ ভস্মীভূত হয়—, সেইরূপ ব্রহ্মবিৎ যোগী বিশুদ্ধচিত্ত বশতঃ নির্লিপ্ত (ব্রহ্ম) ভাবে বিষয় সকল ভোগ করেন এবং নির্লেপ হেতু বিষয়ভোগ জনিত পাপ-পুণ্য দ্বারা লিপ্ত হয়েন না।। ৫৬,৫৭

কেবলং সুসমঃ স্বচ্ছো মৌনী মুদিতমানসঃ।।৫৮

সেই ব্রহ্মভাবে মননশীল মুনি সমভাব-যুক্ত হইয়া বিশুদ্ধ এবং সদা আনন্দচিত্তে অবস্থান করেন।।৫৮

সন্তোষামৃতপানেন যে শান্তাস্তৃপ্তিমাগতাঃ।।৫৯
আত্মারামা মহাত্মানস্তে মহাপদমাগতাঃ।।৬০

যে সকল শান্ত পুরুষ ব্রহ্মেতে স্থিত হইয়া সন্তোষরূপ অমৃত পান করত নিত্য তৃপ্ত হইয়া কালযাপন করেন, পরমাত্মাতে রমণশীল সেই সকল মহাত্মা ব্রহ্মপদারূঢ় হয়েন।।৫৯,৬০

হর্ষামর্ষভয়ক্রোধকামকার্পণ্যদৃষ্টিভিঃ।।৬১
ন হৃষ্যতি গ্লায়তি যঃ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে।।৬২

যিনি সুখ দুঃখ ভয় ক্রোধ কাম ও দৈন্য দৃষ্টি (ভাব) দ্বারা হর্ষ বা গ্লানি-যুক্ত হয়েন না, তাঁহাকে জীবন্মুক্ত বলে।।৬১, ৬২

অহঙ্কারময়ীং ত্যক্তা বাসনাং লীলয়ৈব যঃ।।৬৩
তিষ্ঠতি ধ্যেয়সংত্যাগী স জীবন্মুক্ত উচ্যতে।।৬৪

অহঙ্কারযুক্ত বাসনাকে সহজে ত্যাগ করিয়া যিনি ব্রহ্মাতিরিক্ত ধ্যেয় বর্জ্জন করত অবস্থান করেন, তাঁহাকে জীবন্মুক্ত বলে।।৬৩, ৬৪

মৌনবান্নিরহংভাবো নির্মানো মুক্তমৎসরঃ।।৬৫
যঃ করোতি গতোদ্বেগঃ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে।।৬৬

যিনি সদা ব্রহ্মভবেতে মৌনী, অহঙ্কার মান এবং মৎসরতা-রহিত, ও যিনি সকল বিষয়ে উদ্বেগরহিত (সংকল্পশূন্য নিজ দেহধারণোপযোগী ভিক্ষাদি কর্ম্ম করেন) তিনিই জীবন্মুক্ত পুরুষ।৬৬

যাবতী দৃশ্যকলনা সকলেয়ং বিলোক্যতে।।৬৭
সা যেন সুষ্ঠু সংত্যক্তা স জীবন্মুক্ত উচ্যতে।।৬৮
উদ্বেগানন্দরহিতঃ সময়া স্বচ্ছয়া ধিয়া।।৬৯
ন শোচতে ন চোদেতি সজীবন্মুক্ত উচ্যতে।।৭০

যাবতীয় দৃশ্য প্রপঞ্চ, যাহা নিজ অজ্ঞান বশতঃ ব্যবহারিক দশায় সত্যরূপে দৃষ্ট হয়, যিনি জ্ঞানদৃষ্টি দ্বারা ত্যাগ করিয়াছেন, যিনি স্বাভিলষিত বিষয়রজ উদ্বেগ ও আনন্দরহিত এবং নিজ নিয়মিত বিশুদ্ধ চিত্তদ্বারা কোন বিষয়ে হর্ষ বা বিষাদযুক্ত হয়েন না, তাঁহাকে জীবন্মুক্ত বলে।।৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০

সর্বেচ্ছাঃ সকলাঃ শঙ্কাঃ সর্বেহাঃ সর্বনিশ্চয়াঃ।।৭১
ধিয়া যেন পরিত্যক্তাঃ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে।।৭২
জন্মস্থিতি বিনাশেষু সোদয়াস্তময়েষু চ।।৭৩
সমমেব মনো যস্য স জীবন্মুক্ত উচ্যতে।।৭৪
সর্বাধিষ্ঠানচিন্মাত্রে নির্বিকল্পে চিদাত্মনি।।৭৫
যো জীবতি গতস্নেহঃ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে।।৭৬

'ইহা আমার হউক' ইত্যাদি প্রাপ্তব্য বস্তু বিষয়ক ইচ্ছা সকলকে 'ইহা এইরূপ বা ইহা এইরূপ নয়' ইত্যাদি সংশয়ের বিষয় আশঙ্কা সকল, সর্ব্বভোগেচ্ছা এবং 'আমি দেহ আমি জীব' ইত্যাদিরূপ নিশ্চয় জ্ঞানকে ব্রহ্মভাবে পরিণত নিজ বিশুদ্ধ বুদ্ধি দ্বারা যিনি ত্যাগ করিয়াছেন, যাঁহার উদয় এবং অস্তশীল জন্ম স্থিতি ও বিনাশেতে 'সমস্তই ব্রহ্ম' এরূপ ভাবনা দ্বারা যাঁহার মন সমভাব প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং সকলের আধার চিন্ময় নির্ব্বিকল্প চিৎস্বরূপ ব্রহ্মভাব সাক্ষাৎ করিয়া যিনি ব্রহ্ম ভিন্ন অন্যত্র বিগতস্নেহ হইয়া জীবন ধারণ করেন, তাঁহাকে জীবন্মুক্ত বলে।।৭১,৭২,৭৩,৭৪,৭৫,৭৬

ক্রিয়ানাশাদভবেচ্চিন্তানাশোহস্মাদ্বাসনাক্ষয়ঃ।।৭৭
বাসনাপ্রক্ষয়ো মোক্ষঃ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে।।৭৮

নির্ব্বিকল্পা চ চিন্মাত্রা বৃত্তিঃ প্রজ্ঞেতি কথ্যতে।।৭৯
সা সর্ব্বদা ভবেদ যস্য স জীবন্মুক্ত উচ্যতে।।৮০

ক্রিয়া-ফলেচ্ছার (সকল কর্ত্তব্যের) অভাব বশতঃ ক্রিয়া নাশ হয় এবং ক্রিয়ানাশ হেতু ফলকামনার নাশ ও ফলকামনানাশ হেতু দ্বৈত বাসনার ক্ষয় হয় (একমাত্র ব্রহ্মভাবেরই স্ফুরণ হয়)। সেই দ্বৈতবাসনা-ক্ষয়ই মোক্ষ; ইহা যিনি জানেন, তিনি জীবন্মুক্তপদবাচ্য। বিকল্পরহিত (ভ্রমশূন্য) কেবল ব্রহ্মেতেই বৃত্তি (ব্রহ্মজ্ঞান)-কে প্রজ্ঞা বলে। সেই ব্রহ্মজ্ঞান যাঁহার সর্ব্বদা স্ফুরিত হয়, তাঁহাকে জীবন্মুক্ত বলে।।৭৭,৭৮,৭৯,৮০

দেহেন্দ্রিয়েষ্বহংভাব ইদংভাবস্তদন্যকে।।৮১
যস্য নো ভবতঃ ক্বাপি স জীবন্মুক্ত উচ্যতে।।৮২
ন প্রত্যগব্রহ্মণো ভেদং কদাপি ব্রহ্মসর্গয়োঃ।।৮৩
প্রজ্ঞয়া যো বিজানাতি স জীবন্মুক্ত উচ্যতে।।৮৪

দেহ এবং ইন্দ্রিয়েতে অহংভাব এবং তদভিন্ন ক্ষেত্রদারাদিতে ইদং (অমুক) ভাব যে মুনির উদয় না হয় এবং যিনি নিজ প্রজ্ঞা দ্বারা ব্রাহ্মী সৃষ্টিতে জীব এবং ব্রহ্মের ভেদ দর্শন না করেন, তিনিই জীবন্মুক্ত।। ৮১,৮২,৮৩,৮৪

সাধুভিঃ পূজ্যমানোহপি পীড্যমানোহপি দুর্জ্জনৈঃ।।৮৫
সমমেব ভবেদ যস্য স জীবন্মুক্ত উচ্যতে।।৮৬
যথাস্থিতমিদং যস্য ব্যবহারবতোহপি চ।।৮৭
অস্তং গতং স্থিতং ব্যোম স জীবন্মুক্ত উচ্যতে।।৮৮

সাধুব্যক্তি কর্ত্তৃক পূজিত কিংবা দুর্জ্জন কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়াও যে ব্রহ্মবিৎ সমভাব ধারণ করেন এবং যাঁহার সমাধি বা ব্যবহার দশাতে সমস্ত প্রপঞ্চ (ঘটশরাবাদি) জ্ঞান ব্যোমবৎ সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্মেতে অস্ত হয়, তাঁহাকে জীবন্মুক্ত বলে।।৮৫,৮৬,৮৭,৮৮

নোদেতি নাস্তমায়াতি সুখে দুঃখে মনঃপ্রভা।।৮৯
যথাপ্রাপ্তস্থিতির্যস্য স জীবন্মুক্ত উচ্যতে।।৯০
যো জাগর্ত্তি সুষুপ্তিস্থো যস্য জাগ্রন্ন বিদ্যতে।।৯১
যস্য নির্বাসনো বোধঃ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে।।৯২

যাঁহার মানসিক প্রভা (প্রজ্ঞা) সুখেতে হর্ষিত এবং দুঃখেতে দুঃখিত হয় না, যিনি 'ব্রহ্মাতিরিক্ত কিছুই নাই' এই স্থিতিযুক্ত হয়েন, যিনি নিদ্রিত অবস্থাতেও নিজ ব্রহ্মভাবে জাগ্রত এবং যাঁহার অবিদ্যক জাগরণ অবস্থা সম্ভব নহে (কারণ ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মভাবেতে জাগ্রত) ও যাঁহার জ্ঞান বাসনারহিত, তাঁহাকে জীবন্মুক্ত বলে।। ৮৯,৯০,৯১,৯২

রাগদ্বেষভয়াদীনামনুরূপং চরন্নপি।।৯৩
যোহন্তর্ব্যোমবদত্যচ্ছঃ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে।।৯৪
যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।।৯৫
কুর্বতোহকুর্বতো বাপি স জীবন্মুক্ত উচ্যতে।।৯৬

যিনি ব্যবহার দশাতে রাগ দ্বেষ ভয়াদির অনুরূপ আচরণ করিয়াও নিজ অন্তরে আকাশের ন্যায় স্বচ্ছ (নির্ম্মল), যাঁহার অহঙ্কৃত ভাব (কর্ত্তৃত্বাভিমান) নাই, সুতরাং কর্ত্তৃত্বাভিমানরহিত বলিয়া যাঁহার বুদ্ধি কিছুতে

আসক্ত হয় না, সেই ব্রহ্মবিৎ বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান এবং প্রতিষিদ্ধ কর্ম্মানুষ্ঠান করিলেও তাঁহাকে জীবন্মুক্ত বলে।। ৯৩,৯৪,৯৫,৯৬

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।।৯৭
হর্ষামর্ষভয়োন্মুক্তঃ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে।।৯৮
যঃ সমস্তার্থজালেষু ব্যবহার্য্যপি শীতলঃ।।৯৯
পরার্থেষ্বিব পূর্ণাত্মা স জীবন্মুক্ত উচ্যতে।।১০০

যাঁহা হইতে লোক সকল কোনরূপে উদ্বেজিত হয় না এবং যিনি লোক সকলকেও কোনরূপে উদ্বেগ প্রদান করেন না, যিনি সুখ দুঃখ ভয় হইতে মুক্ত, কেবল ব্রহ্মভাবেতে স্থিত, যিনি দৃশ্য প্রপঞ্চে স্বদেহ ধারণাদি ব্যবহারযুক্ত হইয়াও নিজ ব্রহ্মভাবেতে প্রসন্নাত্মা এবং পরার্থেতেও পূর্ণব্রহ্মভাব দ্বারা সর্ব্বত্র পরিপূর্ণরূপে বিরাজিত, তাঁহাকে জীবন্মুক্ত বলে।।৯৭,৯৮,৯৯,১০০

প্রজহাতি যদা কামান সর্ব্বাংশ্চিত্তগতান মুনে।।১০১
ময়ি সর্ব্বাত্মকে তুষ্টঃ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে।।১০২
চৈত্যবর্জ্জিতচিন্মাত্রে পদে পরমপাবনে।।১০৩
অক্ষুব্ধচিত্তো বিশ্রান্তঃ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে।।১০৪

হে মুনে, যিনি চিত্তগত সমস্ত কামনা পরিত্যাগ করিয়া যখন সর্ব্বাত্মক ব্রহ্মেতে পরিতুষ্ট হন এবং চৈত্য (চিত্তবৃত্তিবিকল্পিত বিষয়) বর্জ্জিত চিন্মাত্র পরম পবিত্র ব্রহ্মেতে ক্ষোভরহিত হইয়া বিশ্রাম করেন, তখন তাঁহাকে জীবন্মুক্ত বলে।।১০১, ১০২, ১০৩, ১০৪

ইদং জগদয়ং সোহয়ং দৃশ্যজাতমবাস্তবম।।১০৫
যস্য চিত্তে ন স্ফুরতি স জীবন্মুক্ত উচ্যতে।।১০৬
শান্তসংসারকলনঃ কলাবানপি নিষ্কলঃ।।১০৭
যঃ সচিত্তোহপি নিশ্চিত্তঃ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে।।১০৮

এই জগৎ, এই সেই, এই অবাস্তব দৃশ্য প্রপঞ্চ যাঁহার চিত্তে স্ফুরিত না হয় এবং যাঁহার নিজ ব্রহ্মদৃষ্টি দ্বারা জননমরণ-পরম্পরারূপ সংসার-রচনা শান্ত হইয়াছে, যিনি ষোড়শ-কলাযুক্ত হইয়াও কলা (অংশ) রহিত এবং যিনি চিত্তযুক্ত হইয়াও নিজ ব্রহ্মভাব দ্বারা চিত্তব্যাপাররহিত তাঁহাকে জীবন্মুক্ত বলে।।১০৫,১০৬,১০৭,১০৮

চিদাত্মাহং পরাত্মাহং নির্গুণোহহং পরাৎপরঃ।।১০৯
আত্মমাত্রেণ যস্তিষ্ঠেৎ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে।।১১০
দেহত্রয়াতিরিক্তোহহং শুদ্ধচৈতন্যমস্ম্যহম।।১১১
ব্রহ্মাহমিতি যস্যান্তঃ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে।।১১২

'আমিই চিদাত্মা, আমিই পরমাত্মা, আমিই নির্গুণ, আমিই পরাৎপর (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ)' এইরূপ নিজ ব্রহ্মভাবেতে যিনি অবস্থান করেন, এবং 'ত্রিবিধ স্থূল সূক্ষ্ম কারণদেহের অতীত আমি, আমি শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ, আমিই ব্রহ্ম' এইরূপ যিনি ভাবসম্পন্ন, তাঁহাকে জীবন্মুক্ত বলে।।১০৯,১১০,১১১,১১২

যস্য দেহাদিকং নাস্তি যস্য ব্রহ্মেতি নিশ্চয়ঃ।।১১৩
পরমানন্দপূর্ণো যঃ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে।।১১৪
নিত্যানন্দঃ প্রসন্নাত্মা হ্যন্যচিন্তাবিবর্জ্জিতঃ।।১১৫

কিঞ্চিদস্তিত্বহীনো যঃ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে।।১১৬

যাঁহার দেহাদি নাই অর্থাৎ ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য দেহাদিপ্রপঞ্চজাতবস্তু কিছুই নহে, যাঁহার এরূপ জ্ঞান হইয়াছে এবং যিনি পরমানন্দ-পরিপূর্ণ, 'আমিই ব্রহ্ম' এই জ্ঞান হেতু যিনি অখণ্ডৈকরস ব্রহ্মানন্দেতে প্রসন্নচিত্ত, ব্রহ্মাতিরিক্ত অন্য চিন্তারহিত এবং যিনি প্রতিভাসিক জ্ঞান জন্য 'অস্তি নাস্তি' ইত্যাদি বিভ্রমরহিত, সেই ব্রহ্মবেত্তা পুরুষকে জীবন্মুক্ত বলে।।১১৩,১১৪,১১৫,১১৬

অহং ব্রহ্মাস্ম্যহং ব্রহ্মাস্ম্যহং ব্রহ্মেতি নিশ্চয়ঃ।।১১৭
চিদহং চিদহং চেতি স জীবন্মুক্ত উচ্যতে।।১১৮

'আমিই ব্রহ্ম আমিই ব্রহ্ম আমিই ব্রহ্ম এবং আমিই চিৎ স্বরূপ আমিই চিৎ স্বরূপ,' এইরূপ নিশ্চয়জ্ঞানযুক্ত পুরুষকে জীবন্মুক্ত বলে।।১১৭,১১৮

ইতি অষ্টমং প্রকরণং সমাপ্তম।।

—

সার্ধান্তিকস্বানুভূতিবাক্যানি।।৯

জীবন্মুক্তি মহাবাক্যার্থ-লব্ধ জীবন্মুক্তিপদারূঢ়ের স্বানুভূতি (ব্রহ্মই আমি)
বাক্য সকল উক্ত হইতেছে।

যো সাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি।।১
যিনি বিশ্ব প্রপঞ্চের আধরাস্বরূপ পরম পুরুষ ঈশ্বর রূপে বিরাজিত, সেই পুরুষই আমি।।১

তদযোঽহং সোঽসৌ যোঽসৌ সোঽহম।।২
দেহেতে প্রজ্ঞাত্মা এবং প্রাণাধ্যাত্মা রূপে ও আদিত্যমণ্ডলে যে পুরুষ বিরাজিত, আমি সেই (প্রত্যক এবং পর চৈতন্যের একত্বহেতু দেহস্থ এবং আদিত্যগত চৈতন্য এক)।।২

তং শান্তমচলমদ্বয়ানন্দচিদঘন এবাস্মি।।৩
তং-পদবাচ্য, শান্ত, নির্ব্বিকারস্বরূপ, অচল, অদ্বয়, আনন্দ এবং চিদঘনস্বরূপ ব্রহ্মই আমি।।৩

তৎ পূর্ণানন্দৈকবোধস্তদ্বহ্মৈবাহমস্মি।।৪
তৎ-পদবাচ্য, পূর্ণ, আনন্দ এবং চিৎস্বরূপ ব্রহ্মই আমি।।৪

ত্বং বাহমস্মি ভগবো দেব তেঽহং বৈ ত্বমসি।।৫
হে ভগবন! সৎমাত্ররূপ দেব! তুমিই আমি এবং আমিই তুমি।।৫

সচ্চিদানন্দাত্মকোঽহমজোঽহং পরিপূর্ণোঽহমস্মি।।৬
আমি সচ্চিদানন্দস্বরূপ অজ এবং পূর্ণস্বরূপ।।৬

শুদ্ধাদ্বৈতব্রহ্মাহম।।৭
আমি শুদ্ধ এবং অদ্বৈত ব্রহ্ম।।৭

বাচামগোচরনিরাকারপরব্রহ্মস্বরূপোঽহমেব।।৮
বাক্যের অগোচর, নিরাকার, পরব্রহ্মস্বরূপই আমি।।৮

সদোজ্জ্বলোঽহ বিদ্যাতৎকার্য্যহীনঃ স্বাত্মবন্ধহরঃ সর্ব্বদা দ্বৈতরহিত
আনন্দরূপঃ সর্ব্বাধিষ্ঠানসন্মাত্রো নিরস্তাবিদ্যাতমোহোঽহমেবাহমোঁ
তদযৎ পরং ব্রহ্ম রামচন্দ্রশ্চিদাত্মকঃ সোঽহমোঁ তদ্রামভদ্রঃ
পরং ব্রহ্ম রামচন্দ্রশ্চিদাত্বকঃ সোঽহমোঁ তদ্রামভদ্রঃ পরং জ্যোতী রসোঽহমোম।।৯
সদা উজ্জ্বল, অবিদ্যা এবং অবিদ্যাকার্য্যবিহীন, নিজ বন্ধ হরণকারী, সর্ব্বদা, দ্বৈতরহিত, আনন্দস্বরূপ, সকলের অধিষ্ঠান, সৎস্বরূপ, অবিদ্যা-তমো-মোহ-বিবর্জ্জিত ওঁকারস্বরূপ আমিই; যিনি পরব্রহ্ম রামচন্দ্র এবং

চিন্ময়, আমিই সেই ; ওঁকারস্বরূপ যে রামভদ্র পরজ্যোতি এবং আনন্দরসস্বরূপ, আমিই সেই।।৯

তৎপর পরমপুরুষঃ পুরাণপুরুষোত্তমো নিত্য-
শুদ্ধবুদ্ধমুক্তসত্যপরমানন্দানন্তাদ্বয়পরিপূর্ণঃ
পরমাত্মা ব্রহ্মৈবাহং রামোহস্মি।।১০

সেই পরম, পুরাতন, পুরুষোত্তম, নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তস্বভাব, সত্যপরমানন্দস্বরূপ, অনন্ত, অদ্বয়, পরিপূর্ণ পরমাত্মা ব্রহ্মই আমি ; রামচন্দ্রই আমি।।১০

ত্রিষু ধামসু যদভোজ্যং ভোক্তা ভোগশ্চ যদভবেৎ।।১১
তেভ্যো বিলক্ষণঃ সাক্ষী চিন্মাত্রোহহং সদাশিবঃ।।১২

তিন (নাম, রূপ ও কর্ম্ম) ধামেতে ভোজ্য, ভোক্তা এবং ভোগরূপ যাহা আছে, সেই সকল হইতে বিলক্ষণ (বিভিন্ন), সাক্ষিস্বরূপ চিন্মাত্র এবং সদাশিব আমি।।১১,১২

ময্যেব সকলং জাতং ময়ি সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম।।১৩
ময়ি সর্ব্ব লয়ং যাতি তদ্বক্ষাদ্বয়মস্যহম।।১৪

আমা হইতেই সমস্ত উৎপন্ন হইয়াছে, আমাকেই সমস্ত স্থিত রহিয়াছে এবং আমাতেই সমস্ত লয়প্রাপ্ত হয়। সেই দ্বৈতরহিত ব্রহ্মই আমি।।১৩,১৪

নির্বাণোহস্মি নিরীহোহস্মি নিরংশোহস্মি নিরীপ্সিতঃ।।১৫
চিদাত্মাস্মি নিরংশোহস্মি পরাপরবিবর্জ্জিতঃ।।১৬
ব্রহ্মৈবাহং সর্ববেদান্তবেদ্যং নাহং বেংদ্য ব্যোমবাতাদিরূপম।।১৭
রূপং নাহং নাম নাহং ন কর্ম্ম ব্রহ্মৈবাহং সচ্চিদানন্দরূপম।।১৮

আমিই নির্ব্বাণ (মুক্তি) স্বরূপ, আমিই চেষ্টাশূন্য, আমিই অংশ এবং ঈপ্সা (ইচ্ছা)-রহিত। আমিই চিদাত্মা, আমিই অংশ এবং পরাপরভাব-রহিত। সর্ব্ববেদান্তবেদ্য ব্রহ্মই আমি, আমি ব্যোমবাতাদিরূপে বেদ্য নহি। আমি রূপ, নাম কিংবা কর্ম্মও নহি। সচিচদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মই আমি।।১৫,১৬,১৭,১৮

নিত্যঃ শুদ্ধো বুদ্ধমুক্তস্বভাবঃ সত্যঃ সূক্ষ্মঃ সন বিভুশ্চাদ্বিতীয়ঃ।।১৯
আনন্দাব্ধির্যৎপরঃ সোহহমস্মি প্রত্যগ ধাতুর্নাত্র সংশীতিরস্তি।।২০
সোহহমর্কঃ পরং জ্যোতিরর্কজ্যোতি রহং শিবঃ।।২১
আত্মজ্যোতিরহং শুক্রঃ সর্ব্বজ্যোতি রসাবহোম।।২২

নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তস্বভাব, সত্যস্বরূপ, সূক্ষ্ম হইয়াও বিভু (সর্ব্বব্যাপক), অদ্বিতীয় এবং আনন্দসাগর স্বরূপ আমিই প্রপঞ্চাধার ; আমিই পরব্রহ্ম, ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। আমি স্থূল প্রপঞ্চের অবভাসক সূর্য্য, আমিই পরম জ্যোতি, সূর্য্যজ্যোতি শিবও আমি, আত্মজ্যোতি শুক্র এবং সর্ব্বজ্যোতিও আমি।। ১৯,২০,২১,২২

দ্বৈতভাববিমুক্তোহস্মি সচ্চিদানন্দলক্ষণঃ।।২৩
শুদ্ধবোধস্বরূপোহহং কেবলোহহং সদাশিবঃ।।২৪
নিষ্ক্রিয়োহস্ম্যবিকারোহস্মি নির্গুণোহস্মি নিরাকৃতিঃ।।২৫
নির্বিকল্পোহস্মি নিত্যোহস্মি নিরালম্বোহস্মি নির্দ্বয়ঃ।।২৬

আমি দ্বৈতভাবরহিত এবং সচ্চিদানন্দলক্ষণ-সমন্বিত, আমি শুদ্ধ জ্ঞান মাত্র, আমি নিত্য মুক্ত এবং সদাশিব। আমি নিষ্ক্রিয়, বিকাররহিত, নির্গুণ এবং আকৃতিরহিত, আমি বিকল্পরহিত, নিত্য, আলম্বন ও দ্বৈতরহিত।। ২৩,২৪,২৫,২৬

কেবলাখণ্ডবোধোহহং স্বানন্দোহহং নিরন্তরঃ।।২৭
সত্যং জ্ঞানমনন্তং যৎ পরং ব্রহ্মাহমেব তৎ।।২৮
কেবলং চিৎসদানন্দং ব্রহ্মৈবাহং জনার্দনঃ।।২৯
অশুভাশুভসংকল্পৈঃ সংশান্তোহস্মি নিরাময়ঃ।।৩০

আমি কেবল অখণ্ড জ্ঞানস্বরূপ, আমি নিরন্তর (স্বয়ং) এবং নিজেই আনন্দস্বরূপ। সত্য, জ্ঞান এবং অনন্ত যে পরমাত্মা, আমি তাহাই। আমি শুদ্ধ চিন্ময় সদানন্দ ব্রহ্ম এবং জনার্দন। শুভ এবং অশুভ সংকল্পে শূন্য ও নিরাময় আমিই।।২৭,২৮,২৯,৩০

নষ্টেষ্টানিষ্টকলনঃ সংবিন্মাত্রপরোহস্ম্যহম।।৩১
অন্তর্যাম্যহমগ্রাহ্যোহনির্দ্দেশ্যোহহমলক্ষণঃ।।৩২
অদ্বৈতোহহমপূর্ণোহহমবাচ্যোহহমনন্তরঃ।।৩৩
অদ্বয়ানন্দবিজ্ঞানঘনোহস্ম্যহমবিক্রিয়ঃ।।৩৪

ইষ্টানিষ্ট-জ্ঞানশূন্য কেবল জ্ঞান মাত্র পরব্রহ্ম আমি। আমি অন্তর্যামী, অগ্রাহ্য (গ্রহণের অযোগ্য), অনির্দ্দেশ্য এবং লক্ষণবর্জ্জিত অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ স্বরূপ। আমি অদ্বৈত, পূর্ণ স্বরূপ, বাক্যের অতীত এবং ব্যবধানরহিত। আমি অদ্বয়, আনন্দ এবং বিজ্ঞানঘনস্বরূপ ও নির্ব্বিকার।।৩১,৩২,৩৩,৩৪

অবিদ্যাকার্য্যহীনোহহমবাঙ্মনসগোচরঃ।।৩৫
আত্মচৈতন্যরূপোহহমমানন্দচিদঘনঃ।।৩৬
আপ্তকামোহহমাকাশাৎ পরমাত্মেশ্বরোহস্ম্যহয।।৩৭
চিদানন্দোহস্ম্যহং চেতা চিদঘনশ্চিন্ময়োহস্ম্যহম।।৩৮

আমি অবিদ্যাকার্য্যশূন্য, বাক্য এবং মনের অগোচর, আত্মচৈতন্যস্বরূপ, আনন্দ এবং চিদঘন স্বরূপ। আমি আপ্তকাম, আকাশাদি ভূত ভৌতিক পদার্থ হইতে শ্রেষ্ঠ পরমাত্মা এবং ঈশ্বর। আমি চৈতন্য এবং আনন্দস্বরূপ, জ্ঞাতা, চিদঘন এবং চিন্ময়।।৩৫,৩৬,৩৭,৩৮

জ্যোতির্ম্ময়োহস্ম্যহং জ্যায়াঞ্জ্যোতিষাং জ্যোতিরস্ম্যহম।।৩৯
নিত্যোহহং নিরবদ্যোহহং নিষ্ক্রিয়োহস্মি নিরঞ্জনঃ।।৪০
নির্ম্মলো নির্ব্বিকল্পোহহং নিরাখ্যাতোহস্মি নিশ্চলঃ।।৪১
নির্ব্বিকারো নিত্যপূতো নির্গুণো নিঃস্পৃহোহস্ম্যহম।।৪২
নিরিন্দ্রিয়ো নিয়ন্তাহং নিরপেক্ষোহস্মি নিষ্কলঃ।।৪৩
পুরুষঃ পরমাত্মাহং পুরাণঃ পরমোহস্ম্যহম।।৪৪

আমি জ্যোতির্ম্ময়, সর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধ এবং জ্যোতিরও জ্যোতি। আমি নিত্যস্বরূপ, নিরবদ্য, নিষ্ক্রয় এবং নিরঞ্জন। আমি নির্ম্মলস্বভাব, নির্ব্বিকল্প, নামবর্জ্জিত এবং নিশ্চয় স্বরূপ। আমি নির্ব্বিকার, নিত্য পবিত্র, নির্গুণ এবং নিঃস্পৃহ। আমি ইন্দ্রিয়বর্জ্জিত, জগতের নিয়ন্তা, নিরপেক্ষ এবং অংশরহিত। আমি পরম পুরুষ, পরাণ পুরুষ এবং পরমাত্মাস্বরূপ।।৩৯,৪০,৪১,৪২,৪৩,৪৪

পূর্ণানন্দৈকবোধোহহং প্রত্যগেকরসোহস্ম্যহম।।৪৫
প্রজ্ঞাতোহহং প্রশান্তোহহং প্রকাশঃ পরমেশ্বরঃ।।৪৬
একধা চিন্ত্যমানোহহং দ্বৈতাদ্বৈতবিলক্ষণঃ।।৪৭
শুদ্ধোহস্মি শুক্রঃ শান্তোহস্মি শাশ্বতোহস্মি শিবোহস্ম্যহম।।৪৮
অহং সকৃদ্বিভাতোহস্মি স্বে মহিম্নি সদা স্থিতঃ।।৪৯
সচ্চিদানন্দমাত্রোহহং স্বপ্রকাশোহস্মি চিদঘনঃ।।৫০

আমিই পূর্ণস্বরূপ, আনন্দ এবং বোধস্বরূপ। আমিই প্রত্যক (জীবাত্মা) এবং সদা একরস। আমি প্রজ্ঞাস্বরূপ, প্রশান্ত, প্রকাশময় পরমেশ্বর। আমি একরূপে চিন্ত্যমান হইয়া থাকি, আমি দ্বৈত কিংবা অদ্বৈতবিলক্ষণ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম। আমি শুদ্ধস্বরূপ, আমি স্বচ্ছ বলিয়া শুক্র, আমি শান্তস্বরূপ, নিত্য এবং কল্যাণময় শিব। আমি নিজ মহিমাতে স্থিত হইয়া স্বয়ং প্রকাশস্বরূপ। আমি সচ্চিদানন্দস্বরূপ, স্বপ্রকাশ, এবং চিদঘন।।৪৫,৪৬,৪৭,৪৮,৪৯,৫০

মানাবমানহীনোহস্মি নির্গুণোহস্মি শিবোহস্ম্যম।।৫১
দ্বৈতাদ্বৈতবিহীনোহস্মি দ্বন্দ্বহীনোহস্মি সোহস্ম্যহম।।৫২
ভাবাভাববিহীনোহস্মি ভাষাহীনোহস্মি ভাস্ম্যহম।।৫৩
শূন্যাশূন্যবিহীনোহস্মি শোভনাশোভনোহস্ম্যহম।।৫৪
সদসদভেদহীনোহস্মি সংকল্পরহিতোহস্ম্যহম।।৫৫
নানাত্বভেদহীনোহস্মি হ্যখণ্ডানন্দবিগ্রহঃ।।৫৬

আমি মান এবং অপমানরহিত, নির্গুণ এবং সদাশিব। আমি দ্বৈত এবং অদ্বৈত ভাববর্জ্জিত ও দ্বন্দ্বরহিত, আমি সেই পরব্রহ্ম। আমি নির্ব্বিশেষ বলিয়া ভাব ও অভাবহীন, আমি ভাষাবর্জ্জিত এবং জ্যোতিঃস্বরূপ। আমি শূন্য এবং অশূন্যভাব বিহীন, আমি শোভন এবং অশোভন, আমি সৎ অসৎভেদবর্জ্জিত এবং সংকল্পরহিত। আমি নানাত্মরূপ ভেদ বর্জ্জিত এবং অখণ্ড আনন্দস্বরূপ।।৫১,৫২,৫৩,৫৪,৫৫,৫৬

বন্ধমোক্ষবিহীনোহস্মি শুদ্ধং ব্রহ্মাস্মি সোহস্ম্যহম।।৫৭
চিত্তাদিসর্ব্বহীনোহস্মি পরমোহস্মি পরাৎপরঃ।।৫৮
সদা বিচাররূপোহস্মি নির্ব্বিচারোহস্মি সোহস্ম্যহম।।৫৯
ধ্যাতৃধ্যানবিহীনোহস্মি ধ্যেয়হীনোহস্মি সোহস্ম্যহম।।৬০

আমি বন্ধ এবং মোক্ষবিহীন, আমি শুদ্ধ ব্রহ্মস্বরূপ। আমি চিত্তাদি ইন্দ্রিয় বিহীন পরম পুরুষ এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আমি সদা বিচাররূপ এবং আমিই নির্ব্বিচারস্বরূপ। আমি ধ্যাতৃ, ধ্যান এবং ধ্যেয়ভাব-বিবর্জ্জিত। আমিই সেই ব্রহ্ম।।৫৭,৫৮,৫৯,৬০

লক্ষ্যালক্ষ্যবিহীনোহস্মি লয়হীনরসোহস্ম্যহম।।৬১
মাতৃমানবিহীনোহস্মি মেয়হীনঃ শিবোহস্ম্যহম।।৬২
সর্ব্বেন্দ্রিয়বিহীনোহস্মি সর্ব্বকর্ম্মকৃদস্ম্যহম।।৬৩
মুদিতামুদিতাখ্যোহস্মি সর্ব্বমৌনফলোহস্ম্যহম।।৬৪

আমি লক্ষ্য এবং অলক্ষ্যভাববর্জ্জিত, আমি লয়রহিত এবং রসস্বরূপ। আমি মাতৃ, মান ও মেয় ভাবরহিত এবং শিবস্বরূপ। আমি সর্ব্বেন্দ্রিয়বর্জ্জিত এবং সকলকর্ম্মকারী, আমি মুদিতা এবং অমুদিতা নামে অভিহিত ও সর্ব্বমৌনফলস্বরূপ।।৬১,৬২,৬৩,৬৪

ষড়বিকারবিহীনোহস্মি ষটকোশরহিতোহস্ম্যহম।।৬৫
দেশকালবিমুক্তোহস্মি দিগম্বরসুখোহস্ম্যহম।।৬৬
অখণ্ডাকাশরূপোহস্মি হ্যখণ্ডাকারমস্ম্যহম।।৬৭
প্রপঞ্চমুক্তচিত্তোহস্মি প্রপঞ্চরহিতোহস্ম্যহম।।৬৮

আমি ষড়বিকারবর্জ্জিত, ছয় কোশরহিত। আমি দেশকাল-পরিচ্ছেদ-বিবর্জ্জিত এবং দিগম্বর। আমি অখণ্ড আকাশস্বরূপ এবং অখণ্ডাকার রূপ, আমি প্রপঞ্চ মুক্ত চিত্তস্বরূপ এবং প্রপঞ্চ রহিতও আমি।। ৬৫,৬৬,৬৭,৬৮

সর্ব্বপ্রকাশরূপোহস্মি চিন্মাত্রজ্যোতিরস্ম্যহম।।৬৯
কালত্রয়বিমুক্তোহস্মি কামাদিরহিতোহস্ম্যহম।।৭০
মুক্তিহীনোহস্মি মুক্তোহস্মি মোক্ষহীনোহস্ম্যহং সদা।।৭১
গন্তব্যদেশহীনোহস্মি গমনাদিবিবর্জ্জিতঃ।।৭২
সর্ব্বদা সমরূপোহস্মি শান্তোহস্মি পুরুষোত্তমঃ।।৭৩
চিদক্ষরোহহং সত্যোহহং বাসুদেবোহজরোহমরঃ।।৭৪

আমি সর্ব্বপ্রকাশস্বরূপ, আমিই চিন্মাত্র জ্যোতিস্বরূপ। আমি কালত্রয় বিমুক্ত এবং কামাদি রহিত। আমি মুক্তিহীন এবং মুক্ত স্বরূপ ও সর্ব্বদা মোক্ষবিহীন। স্বর্ব্বব্যাপক হেতু আমি গন্তব্যদেশহীন এবং গমনাদিরহিত। আমি সর্ব্বদা সমরূপ এবং শান্তস্বরূপ পুরুষোত্তম। আমি চিৎস্বরূপ এবং অক্ষর, আমি সত্যস্বরূপ, বাসুদেব, অজর এবং অমর।।৬৯,৭০,৭১,৭২,৭৩,৭৪

অহমেবাক্ষরং ব্রক্ষ বাসুদেবাখ্যমদ্বয়ম।।৭৫
পরব্রক্ষস্বরূপোহহং পরমানন্দমস্ম্যহম।।৭৬
কেবলং জ্ঞানরূপোহহং কেবলং পরমোহস্ম্যহম।।৭৭
কেবলং শান্তরূপোহহং কেবলং চিন্ময়োহস্ম্যহম।।৭৮

আমি অক্ষর ব্রহ্মস্বরূপ এবং বাসুদেবাখ্য অদ্বয়। আমি পরব্রহ্মস্বরূপ এবং আমিই পরমানন্দ স্বরূপ। আমি কেবল জ্ঞান স্বরূপ এবং আমিই পরম ব্রহ্মস্বরূপ। আমি কেবল শান্ত স্বরূপ এবং আমিই চিন্ময় স্বরূপ। ৭৫,৭৬,৭৭,৭৮

কেবলং নিত্যরূপোহহং কেবলং শাশ্বতোহস্ম্যহম।।৭৯
কেবলং সত্যরূপোহহমহং ত্যক্ত্বাহমস্ম্যহম।।৮০

আমি কেবল নিত্য স্বরূপ এবং সনাতন। আমি সত্য এবং অহংভাব রহিত ব্রহ্মস্বরূপ।।৭৯,৮০

কেবলং তুর্য্যরূপোহস্মি তুর্য্যাতীতোহস্মি কেবলঃ।।৮১
কেবলাকাররূপোহস্মি শুদ্ধরূপোহস্ম্যহং সদা।।৮২
নির্ব্বিকল্পস্বরূপোহস্মি নিরীহোহস্মি নিরাময়ঃ।।৮৩
অপরিচ্ছিন্ন রূপোহস্মি হ্যনন্তানন্দরূপবান।।৮৪

আমি কেবল ওঁকারের চতুর্থস্থানীয় এবং তুর্য্যাতীতও আমি। আমি কেবল আকার এবং শুদ্ধ স্বরূপ। আমি নির্ব্বিকল্প স্বরূপ, নিরীহ এবং নিরাময়। আমি অপরিচ্ছিন্ন স্বরূপ অনন্ত এবং আনন্দ রূপযুক্ত।।৮১,৮২,৮৩,৮৪

আত্মারামস্বরূপোহস্মি হ্যহমাত্মা সদাশিবঃ।।৮৫

আদিমধ্যান্তশূন্যোহস্মি হ্যাকাশসদৃশোহস্ম্যহম।।৮৬
নিত্যশুদ্ধচিদানন্দঃ সত্তামাত্রোহহমব্যয়ঃ।।৮৭
নিত্যবুদ্ধবিশুদ্ধৈকঃ সচ্চিদানন্দমস্ম্যহম।।৮৮

আমি আত্মারাম স্বরূপ, আমিই আত্মস্বরূপ সদা শিব। আমি আদি মধ্য এবং অন্ত শূন্য, আমিই আকাশ সদৃশ ব্যাপক। আমি নিত্য শুদ্ধ চিদানন্দ স্বরূপ এবং সৎস্বরূপ ও অব্যয়। আমি নিত্য বুদ্ধ স্বরূপ, একমাত্র বিশুদ্ধ স্বভাব এবং সচ্চিদানন্দ স্বরূপ।।৮৫,৮৬,৮৭,৮৮

ভূমানন্দস্বরূপোহস্মি ভাষাহীনোহস্ম্যহং সদা।।৮৯
সর্ব্বাধিষ্ঠানরূপোহস্মি সর্ব্বদা চিদঘনোহস্ম্যহম।।৯০
চিত্তবৃত্তিবিহীনোহহং চিদাত্মৈকরসোহস্ম্যহম।।৯১
অহং ব্রহ্মৈব সর্ব্বং স্যাদহং চৈতন্যমেব হি।।৯২

আমি ভূমানন্দ (অতিশয় আহ্লাদ) স্বরূপ, এবং সর্ব্বদা ভাষাহীন। আমি সর্ব্বাধিষ্ঠান স্বরূপ এবং আমিই সদা চিদঘন স্বরূপ। আমি চিত্তবৃত্তি রহিত, চিদাত্মক এবং আমিই একমাত্র রসাত্মক। আমিই ব্রহ্ম, আমিই সর্ব্বময় এবং আমিই চৈতন্যস্বরূপ।। ৮৯,৯০,৯১,৯২

অহমেবাহমেবাস্মি ভূমাকারস্বরূপবান।।৯৩
অহমেব মহানাত্মা হ্যহমেব পরাৎপরঃ।।৯৪
অহমন্যবদাভামি হ্যহমেব শরীরবৎ।।৯৫
অহং শিষ্যবদাভামি হ্যহং লোকত্রয়াশ্রয়ঃ।।৯৬

আমি অহমাকার (অহংস্বরূপ) এবং ভূমাকার স্বরূপ। আমিই মহান আত্মা, আমিই পরাৎপর স্বরূপ। আমিই অন্যরূপে প্রতিভাত হই এবং আমিই শরীরসদৃশ প্রত্যক্ষ। আমি শিষ্য রূপে প্রকাশিত হই এবং আমিই এই লোকত্রয়ের আশ্রয়।।৯৩,৯৪,৯৫,৯৬

অহং কালত্রয়াতীতো হ্যহং বেদৈরুপাসিতঃ।।৯৭
অহং শাস্ত্রেণ নির্ণীত অহং চিত্তে ব্যবস্থিতঃ।।৯৮
আনন্দঘন এবাহমহঃ ব্রহ্মাস্মি কেবলম।।৯৯
আত্মনাত্মনি তৃপ্তোহস্মি হ্যরূপো হ্যহমব্যয়ঃ।।১০০

আমি কালত্রয়ের (বর্ত্তমান, ভূত, ভবিষ্যৎ) অতীত, ব্রহ্মস্বরূপ আমিই বেদ কর্ত্তৃক উপাসিত হই। আমিই শাস্ত্র কর্ত্তৃক নির্ণীত এবং আমিই সকলের চিত্তেতে অন্তর্যামীরূপে অবস্থিত রহিয়াছি। আমি আনন্দঘন স্বরূপ এবং আমিই কেবলমাত্র ব্রহ্ম। আমি নিজ ব্রহ্মস্বরূপেতেই তৃপ্ত, নিরাকার এবং অব্যয়।।৯৭,৯৮,৯৯,১০০

আকাশাদপি সূক্ষ্মোহহমাদ্যন্তাভাববানহম।।১০১
সত্তামাত্রস্বরূপোহহং শুদ্ধমোক্ষস্বরূপবান।।১০২
সত্যানন্দস্বরূপোহহং জ্ঞানানন্দঘনোহস্ম্যহম।।১০৩
নামরূপবিমুক্তোহহমহমানন্দবিগ্রহঃ।।১০৪

আমি আকাশ হইতেও সূক্ষ্ম, আদি এবং অন্তভাব রহিত। আমি সত্তামাত্র স্বরূপ, শুদ্ধ এবং মোক্ষস্বরূপ। আমি সত্য আনন্দ স্বরূপ, আমিই জ্ঞান এবং আনন্দঘন স্বরূপ। আমি নাম রূপ বিবর্জ্জিত এবং আমিই মহা আনন্দের মূর্ত্তি স্বরূপ।।১০১,১০২,১০৩,১০৪

আদিচৈতন্যমাত্রোহহমখণ্ডৈকরসোহস্ম্যহম।।১০৫
সর্ব্বত্র পূর্ণরূপোহহং পরামৃতরসোহস্ম্যহম।।১০৬
একমেবাদ্বিতীয়ং সদ ব্রহ্মৈবাহং ন সংশয়ঃ।।১০৭
অহমেব পরং ব্রহ্ম হ্যহমেব গুরোর্গুরুঃ।।১০৮

আমি আদি চৈতন্য মাত্র, অখণ্ড এবং একরস স্বরূপ। আমি সর্ব্বত্র পূর্ণস্বরূপ, আমিই পরম অমৃত রস স্বরূপ। আমি একমাত্র অদ্বিতীয় এবং সৎ ব্রহ্মস্বরূপ, ইহাতে সংশয় নাই। আমিই পর ব্রহ্ম, আমিই গুরুরও গুরু।।১০৫,১০৬,১০৭,১০৮

সর্বজ্ঞানপ্রকাশোহস্মি মুখ্যবিজ্ঞানবিগ্রহঃ।।১০৯
তুর্য্যাতুর্য্য প্রকাশোহস্মি তুর্য্যাতুর্য্যাদিবর্জ্জিতঃ।।১১০
দৃশিস্বরূপং গগনোপমং পরং সকৃদ্বিভাতং ত্বজমেকমক্ষরম।।১১১
অলেপকং সর্ব্বগতং যদদ্বয়ং তদেব চাহং সকলং বিমুক্ত ওঁম।।১১২

আমিই সর্ব্বজ্ঞানের প্রকাশ এবং মুখ্য বিজ্ঞানের মূর্ত্তি স্বরূপ। আমি তুর্য্য এবং অতুর্য্যের প্রকাশস্বরূপ, আমিই তুর্য্য এবং অতুর্য্যভাব বর্জ্জিত। আমি আকাশসদৃশ দৃশি স্বরূপ (জ্ঞানমাত্র), আমিই আকাশসদৃশ পর (শ্রেষ্ঠ), আমিই স্বয়ং প্রকাশ, অজ এবং অক্ষর। আমি নির্লিপ্ত, সর্ব্বগত অদ্বয়স্বরূপ। আমি কলা রহিত, বিমুক্ত স্বভাব এবং ওঁকার স্বরূপ। ১০৯,১১০,১১১,১১২

অহং ব্রহ্মাস্মি মন্ত্রোহয়ং জন্মপাপং বিনাশয়েৎ।।১১৩
অহং ব্রহ্মাস্মি মন্ত্রোহয়ং ভেদবুদ্ধিং বিনাশয়েৎ।।১১৪
'আমিই ব্রহ্ম' এই মন্ত্র জন্ম, পাপ এবং জীবাত্মা ও পরমাত্মাতে ভেদ বুদ্ধির বিনাশ করে।।১১৩,১১৪

অহং ব্রহ্মাস্মি মন্ত্রোহয়ং কোটিদোষং বিনাশয়েৎ।।১১৫
অহং ব্রহ্মাস্মি মন্ত্রোহয়ং জ্ঞানানন্দং প্রযচ্ছতি।।১১৬
'আমিই ব্রহ্ম'এই মন্ত্র কোটি দোষ বিনাশ করিয়া জ্ঞান এবং আনন্দকে প্রদান করে।।১১৫,১১৬

সর্ব্বমন্ত্রান সমুৎসৃজ্য এতন্মন্ত্রং সমভ্যসেৎ।।১১৭
সদ্যো মোক্ষমবাপ্নোতি নাস্তি সন্দেহমণ্বপি।।১১৮

সকল মন্ত্র ত্যাগ করিয়া অহং ব্রহ্মাস্মি (আমিই ব্রহ্ম) এই মন্ত্র অভ্যাস করিবে। এই মন্ত্র অভ্যাস করিলে সদ্যঃমোক্ষ প্রাপ্তি হয়, ইহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।।১১৭,১১৮

ইতি নবমং প্রকরণং সমাপ্তম।।

—

সার্ধান্তিকসমাধিবাক্যানি।।১০

এই প্রকরণে সমাধির লক্ষণ সকল উক্ত হইতেছে।

জীবাত্মপরমাত্মৈক্যাবস্থা ত্রিপুটিরহিতা
পরমানন্দস্বরূপা শুদ্ধচৈতন্যাত্মিকা সমাধিঃ।।১

ধ্যান ধ্যেয় ও ধ্যাতা এই ত্রিপুটি (ত্রিবিধ) ভেদরহিত জীবাত্মা এবং পরমাত্মার যে ঐক্যাবস্থা (অভেদভাব), যাহা সুখদুঃখাভাব বশতঃ পরমানন্দস্বরূপা এবং শুদ্ধ চৈতন্যাত্মিকা (ব্রহ্মভাবাত্মিকা), সেই ব্রাহ্মীস্থিতিকে নির্বিকল্প সমাধি বলে।।১

ধ্যাতৃধ্যানে বিহায় নিবাতস্থিতদীপবদ ধ্যেয়ৈকগোচরং চিত্তং সমাধিঃ।।২

ধ্যাতৃত্বভাব এবং ধ্যানভাব ত্যাগ করিয়া বায়ুশূন্য স্থানে স্থিত স্থির দীপের ন্যায় ধ্যেয়মাত্র বিষয়ে চিত্তাবস্থাকে সমাধি বলে অর্থাৎ যখন চিত্ত ধ্যাতৃ এবং ধ্যান ভাব (আমি ধ্যান করিতেছি—ইহার ধ্যান করিতেছি ইত্যাদি) ত্যাগ করিয়া নিজস্বরূপ শূন্যের ন্যায় ধ্যেয়াকারে তন্ময় হয়, তখন সেই চিত্তাবস্থাকে সমাধি বলে।।২

বৃত্তিশূন্যং প্রচারশূন্যং মনঃ পরমাত্মনি লীনং ভবতি।।৩

কামাদি বৃত্তি শূন্য এবং বিষয়েতে প্রচার শূন্য হইলে মন পরমাত্মাতে লয় প্রাপ্ত হয়।।৩

প্রাপ্তে জ্ঞানেন বিজ্ঞানে জ্ঞেয়ে পরমাত্মনি হৃদি সংস্থিতে দেহে লব্ধশান্তিপদং গতে তদা প্রভামনোবুদ্ধিশূন্যং ভবতি।।৪

ব্রহ্মবিৎ পুরুষ গুরুমুখনিঃসৃত শাস্ত্র জন্য জ্ঞান দ্বারা এবং স্বানুভুতি হইতে বিজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া নিজ হৃদিস্থিত জ্ঞেয় স্বরূপ পরমাত্মায় 'আমিই ব্রহ্ম' এইরূপ জ্ঞান হইলে স্থূল সূক্ষ্ম এবং কারণ ত্রিবিধ দেহাভিমান রহিত হইয়া শান্তিপদ লাভ করেন। তৎকালে তাঁহার আত্মচৈতন্য মন এবং বুদ্ধি শূন্যভাবে বিরাজ করে অর্থাৎ সমাধি অবস্থায় জাগ্রৎ স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়ের অতীত এবং বৃত্তি (মন ও বুদ্ধি) শূন্য হইয়া আত্মা স্বীয় স্বপ্রকাশ অবস্থায় বিরাজ করেন।।৪

প্রাণাপানয়োরৈক্যং কৃত্বা ধৃতকুম্ভকো
নাসাগ্রদর্শনদৃঢ়ভাবনয়া দ্বিকরাঙ্গুলিভিঃ ষণ্মুখীকরণেন
প্রণবধ্বনিং নিশম্য মনস্তত্র লীনং ভবতি।।৫

চিত্তবিক্ষেপের উন্মূলন জন্য কর্ণ নাসিকা ও চক্ষুদ্বার সকল দুই হস্তের অঙ্গুলি দ্বারা ষণ্মুখী করিয়া (উক্ত ইন্দ্রিয় সকলের ছয় মুখ রুদ্ধ করিয়া) নাসাগ্র ভ্রূকুটি বা ভ্রূমধ্য) ভাগ দর্শন করিতেছি এইরূপ দৃঢ় ভাবনা যুক্ত হইয়া প্রাণ এবং অপান বায়ুর সমতা করত রেচক পূরক বিহীন কেবল মাত্র কুম্ভক করিয়া প্রাণ এবং অপান বায়ুর ঐক্য করিলে দীর্ঘ ঘণ্টানিনাদের ন্যায় অনাহতাখ্য প্রণবধ্বনি হৃদয়ে শ্রুত হয়। সেই প্রণবধ্বনি শ্রবণ করিয়া মন সেই প্রণবে অবলম্বন যুক্ত হইয়া তাহাতে লয় প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ প্রণব স্বরূপ পরমাত্মায় লীন হয়, সেই লয়াবস্থাই সমাধি।।৫

পয়ঃস্রবানন্তরং ধেনুস্তনক্ষীরমিব সর্ব্বেন্দ্রিয়বর্গে
পরিনষ্টে মনোনাশো ভবতি।।৬

গাভীস্তন হইতে দুগ্ধ দোহনের পর তাহার স্তনস্থিত দুগ্ধ যেরূপ নিরুপদ্রবে স্থিত হয়, সেইরূপ স্বেন্দ্রিয় বিষয়ের অগ্রহণ হেতু যোগিগণের ইন্দ্রিয়বর্গ পরিনষ্ট হইলে নিরালম্বন (বিষয়াভাব বশতঃ বৃত্তি রহিত) হেতু মনেরও নাশ হইয়া থাকে। এই মনোনাশ (মনোবৃত্তিরাহিত্য) অবস্থাকে সমাধি বলে।।৬

যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ।।৭
বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টন্তী তামাহুঃ পরমাং গতিম।।৮

যে সময় মনের সহিত পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় কোন বিষয় গ্রহণ করে না এবং বুদ্ধি চেষ্টাযুক্ত হয় না, সেই মনের বৃত্তিরাহিত্য অবস্থাকে নির্ব্বিকল্প সমাধি (পরম গতি) বলে।।৭,৮

সংশান্ত সর্ব্বসংকল্পা যা শিলাবদবস্থিতিঃ।।৯
জাগ্রন্নিদ্রাবিনির্মুক্তা সা স্বরূপস্থিতিঃ পরা।।১০

প্রস্তরের ন্যায় নির্ব্বিকার এবং অচল ভাবে যে যে অবস্থায় সমস্ত সংকল্প সম্যকরূপে শান্ত হয় সেই জাগ্রৎ ও নিদ্রা অবস্থা বর্জ্জিত অবস্থাকে স্বরূপস্থিতি বা ব্রহ্মরূপস্থিতি বা ব্রহ্মরূপতা বলে।।৯,১০

মারুতে মধ্যসঞ্চারে মনঃস্থৈর্য্যং প্রজায়তে।।১১
যো মনঃসুস্থিরীভাবঃ সৈবাবস্থা মনোন্মনী।।১২

প্রাণ এবং অপান বায়ুর ঐক্য সম্পাদন দ্বারা যখন সুষুম্না নাড়ী মধ্যে বায়ু সঞ্চারিত হয়, তখন মনের স্থৈর্য্য উৎপন্ন হয়। মনের যে সুস্থির ভাব (বৃত্তিরাহিত্য), সেই অবস্থাকে মনের উন্মনী অবস্থা বলে।।১১,১২

সরূপোহসৌ মনোনাশো জীবন্মুক্তস্য বিদ্যতে।।১৩

মনের নাশ হওয়াই জীবন্মুক্তের স্বরূপ।।১৩

নিদ্রাঘরূপনাশস্তু বর্ত্ততে দেহমুক্তিকে।।১৪

বিদেহ মুক্তি নিদ্রারূপ নহে, তৎকালে নিদ্রারূপপাপের নাশ হয়। কারণ বিদেহ মুক্তাবস্থার অন্তঃকরণচতুষ্টয় গোচর সংকল্পাদি বৃত্তির অভাব হয়।।১৪

চিত্তে চৈত্যদশাহীনে যা স্থিতিঃ ক্ষীণচেতসাম।।১৫
সোচ্যতে শান্তকলনা জাগ্রত্যেব সুষুপ্ততা।।১৬

ক্ষীণচিত্ত যোগীদিগের চিত্তে সংকল্পাদি চৈত্যদশা বিহীনতা হেতু নির্ব্বিকল্পরূপিণী যে স্থিতি, তাহা জাগ্রৎকালেও বিষয়ের অগ্রহণ বশতঃ সুষুপ্ততা এবং বিকল্পশূন্য নির্ব্বিকল্প সমাধি বলিয়া জানিবে।।১৫,১৬

নৈতজ্জাগ্রন্ন চ স্বপ্নঃ সংকল্পানামভাবনাৎ।।১৭
সুষুপ্তভাবো নাপ্যেতদভাবাজ্জড়তা স্থিতেঃ।।১৮

নির্ব্বিকল্প সমাধি জাগ্রৎ বা স্বপ্নাবস্থা নহে, কারণ উক্ত সমাধিতে সঙ্কল্পের অভাব আছে। ইহা সুষুপ্তি ভাবও নহে, কারণ সুষুপ্তি অবস্থায় বিষয়জ্ঞান না থাকায় তাহা স্থিতির জড়তা মাত্র (তামসিক বৃত্তি মাত্র), কিন্তু নির্ব্বিকল্প সমাধিতে সুষুপ্তির ন্যায় জড়তা স্থিতির নাশ হয়।।১৭,১৮

সত্ত্বাববোধ এবাসৌ বাসনাতৃণপাবকঃ।।১৯

প্রোক্তঃ সমাধিশব্দেন ন তু তূষ্ণীমবস্থিতিঃ।।২০

ব্রহ্মস্বরূপের জ্ঞানকে নির্ব্বিকল্প সমাধি বলে। উক্ত সমাধি অনন্ত কোটি বাসনারূপ তৃণের ভস্মকারক অগ্নিস্বরূপ, উহা জড়ের ন্যায় তূষ্ণীম্ভাবে অবস্থিতি নহে।।১৯,২০

নির্ব্বিকারতয়া বৃত্ত্যা ব্রহ্মাকারতয়া পুনঃ।।২১

বৃত্তিবিস্মরণং সম্যক সমাধিরভিধীয়তে।।২২

জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়রূপ বিকার রহিত এবং নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মাকারতা যুক্ত হইয়া যোগীর ব্রহ্মাকার বৃত্তির বিস্মরণকে সমাধি বলে; কারণ তৎকালে সমাহিত যোগী নিজেই ব্রহ্ম হইয়া যান, সেই ব্রহ্মাকারা বৃত্তিরও বিস্মরণ হয়।।২১,২২

দৃশ্যাসংভববোধেন রাগদ্বেষাদিতানবে।।২৩

রতির্বলোদিতা যা সা সমাধিরভিধীয়তে।।২৪

'একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, এই দৃশ্য প্রপঞ্চ মিথ্যা, ইহা উৎপন্ন হয় নাই এবং ইহা বিদ্যমানও নহে,' এইরূপ দৃশ্যের অভাবজ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মাতিরিক্ত দৃশ্য কল্পনামূলক রাগ দ্বেষাদি ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, সেই রাগ দ্বেষাদি রহিত জ্ঞান-বলোত্থিত ব্রহ্মেতে যে রতি, তাহাকে সমাধি বলে।।২৩,২৪

অহমেব পরং ব্রহ্ম ব্রহ্মাহমিতিসংস্থিতিঃ।।২৫

সমাধিঃ স তু বিজ্ঞেয়ঃ সর্ব্ববৃত্তিনিরোধকঃ।।২৬

'আমিই পরম ব্রহ্ম' এবং 'ব্রহ্মই আমি' এইরূপ সর্ববৃত্তি নিরোধক ব্রহ্মসংস্থিতিকে সমাধি বলে।।২৫,২৬

সমাধিঃ সংবিদুৎপত্তিঃ পরজীবৈকতাং প্রতি।।২৭

ধ্যানস্য বিস্মৃতিঃ সম্যক সমাধিরভিধীয়তে।।২৮

তৎ ও ত্বং পদার্থের লক্ষ্য পরমাত্মা এবং জীবাত্মার একতা বশতঃ আমিই ব্রহ্ম এই যে সংবিতের (জ্ঞানের) উৎপত্তি হয়, তাহাকে সমাধি বলে। 'নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই আমি' এইরূপ ধ্যানের বিস্মরণ সমাধি।।২৭,২৮

সমাহিতা নিত্যতৃপ্তা যথা ভূতার্থদর্শিনী।।২৯

ব্রহ্মন সমাধিশব্দেন পরা প্রজ্ঞোচ্যতে বুধৈঃ।।৩০

হে ব্রহ্মন! 'ব্রহ্মাতিরিক্ত কিছুই নাই' এইরূপ সমাহিতাবস্থা (একাগ্রতা), 'নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই আমি' এইরূপ ব্রহ্মেতে যে নিত্য তৃপ্তি এবং যাহা যথাভূত অর্থের প্রদর্শনকারিণী এইরূপ শ্রেষ্ঠা প্রজ্ঞাকে সমাধি বলে। (ঋতম্বরা অত্র প্রজ্ঞেতি যোগদর্শন)।।২৯,৩০

অক্ষুব্ধা নিরহঙ্কারা দ্বন্দ্বেষ্বননুপাতিনী।।৩১

ব্রহ্মন সমাধিশব্দেন মেরোঃ স্থিরতরা স্থিতিঃ।।৩২

'ব্রহ্ম ভিন্ন কিছুই নাই' এইরূপ অনুভূতি দ্বারা শ্বাসাদি বা কামাদি বৃত্তি দ্বারা অক্ষুব্ধ অর্থাৎ বিক্ষেপরহিত, দেহাদিতে অহংভাব বর্জ্জিত, শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব রহিত, মেরু পর্ব্বত হইতেও স্থিরতরা যে ব্রাহ্মী স্থিতি, তাহাকে সমাধি বলে।।৩১,৩২

নিশ্চিতা বিগতাভীষ্টা হেয়োপাদেয়বর্জ্জিতা।।৩৩

ব্রহ্মন সমাধিশব্দেন পরিপূর্ণমনোগতিঃ।।৩৪

হে ব্রহ্মন! ব্রহ্মই আমি এইরূপ নিশ্চয় জ্ঞান, স্বাতিরিক্ত অভ্যুদয় রাহিত্য, (অজ্ঞানই হেয় এবং জ্ঞানই উপাদেয়) ঐ উভয় হেয় এবং উপাদেয় বর্জ্জিত, সর্ব্বত্র পরিপূর্ণ, ব্রহ্মগোচর যে মনোগতি (প্রজ্ঞা), তাহাকে সমাধি বলে।।৩৩,৩৪

সলিলে সৈন্ধবং যদ্বৎ সাম্যং ভজতি যোগতঃ।।৩৫

তথাত্মমনসোরৈক্যং সমাধিরভিধীয়তে।।৩৬

যেরূপ জলেতে সৈন্ধব লবণখণ্ড পরস্পরের যোগ বশতঃ সমতা প্রাপ্ত হয় (মিশ্রিত হয়), সেইরূপ আত্মা এবং মনের একতাকে সমাধি বলে।।৩৫,৩৬

যৎ সমত্বং তয়োরত্র জীবাত্মপরমাত্মনোঃ।।৩৭

সমস্তনষ্টসংকল্পঃ সমাধিরভিধীয়তে।।৩৮

জীবাত্মা এবং পরমাত্মার যে সমতা এবং যে অবস্থায় সমস্ত সংকল্প বিনষ্ট হয়, তাহাকে সমাধি বলে।। ৩৭,৩৮

প্রভাশূন্যং মনঃশূন্যং বুদ্ধিশূন্যং নিরাময়ম।।৩৯

সর্ব্বশূন্যং নিরাভাসং সমাধিরভিধীয়তে।।৪০

যাহা অহঙ্কারপূর্ণ বিষয়েতে বিকাশ, মনন এবং নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান এই ত্রিবিধ জ্ঞান রহিত, যাহা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানমাত্র, যে জ্ঞান নিরুপদ্রব ব্রহ্মাতিরিক্ত অন্য জ্ঞান শূন্য, যাহা মায়া রহিত এবং আভাস বর্জ্জিত, সেই জ্ঞানকে সমাধি বলে।।৩৯,৪০

ব্রহ্মাকারমনোবৃত্তিপ্রবাহোহহংকৃতিং বিনা।।৪১

সম্প্রজ্ঞাতসমাধিঃ স্যাদ ধ্যানাভ্যাসপ্রকর্ষতঃ।।৪২

দেহাদিতে অন্য ভাব রহিত হইয়া ধ্যানের অভ্যাসের একাগ্রতা হইতে উৎপন্ন ব্রহ্মাকার মনের বৃত্তিপ্রবাহকে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে।।৪১,৪২

প্রশান্তবৃত্তিকং চিত্তং পরমানন্দদীপকম।।৪৩

অসম্প্রজ্ঞাতনামায়ং সমাধির্যোগিনাং প্রিয়ঃ।।৪৪

পরমানন্দের উদ্দীপক, বৃত্তি রহিত (স্বাতিরিক্ত স্মৃতি বৃত্তি নিবৃত্ত) চিত্তকে যোগীদিগের প্রিয় অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে।।৪৩,৪৪

স্বানুভূতিরসাবেশাদ্দৃশ্যশব্দাবুপেক্ষিতুঃ।।৪৫

নির্ব্বিকল্পসমাধিঃ স্যান্নিবাতস্থিতদীপবৎ।।৪৬

'নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই আমি' এই স্বানুভূতিরূপ রসের আবেশ হেতু দৃশ্যানুবিদ্ধ, শব্দানুবিদ্ধ সবিকল্প সমাধিতে যখন যোগীর উপেক্ষা হয়, তখন তাঁহার বাতশূন্য প্রদেশস্থিত দীপের ন্যায় স্থির নির্ব্বিকল্প সমাধি উৎপন্ন হয়। ৪৫,৪৬

প্রভাশূন্যং মনঃশূন্যং বুদ্ধিশূন্যং চিদাত্মকম।।৪৭

অন্তর্ব্যাবৃত্তিরূপোহসৌ সমাধির্মুনিভাবিতঃ।।৪৮

যখন প্রভা (সাধারণ জ্ঞান), মন, বুদ্ধি রহিত হইয়া যোগী কেবল চিৎস্বরূপ হন, সেই চিন্মাত্রাবস্থাকে, যাহা ব্রহ্মভিন্ন অন্য সকলের নিষেধাত্মক এবং যাহা মুনিগণের একান্ত বাঞ্ছনীয়, সেই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মাকারতাকে নির্ব্বিকল্প সমাধি বলে।।৪৭,৪৮

ঊর্দ্ধপূর্ণমধঃপূর্ণং মধ্যপূর্ণং শিবাত্মকম।।৪৯
সাক্ষাদবিধিমুখো হ্যেষ সমাধিঃ পারমার্থিকঃ।।৫০

অবিদ্যাপদতুর্য্যভাগ ঊর্দ্ধশব্দার্থ, তৎস্থূলাংশ অধঃশব্দার্থ, তৎসূক্ষ্ম বীজভাব মধ্যশব্দার্থ, এবম্ভূত অবিদ্যাপদ ও তৎকার্য্যজাত দৃশ্য প্রপঞ্চ নিজ অজ্ঞানদৃষ্টিতে অশিব হইলেও জ্ঞানদৃষ্টিতে শিবাত্মক (ব্রহ্মময়), সেই ব্রহ্ম প্রতিযোগিরহিত, ঊর্দ্ধ অধঃ এবং মধ্য সর্ব্বত্র পূর্ণস্বরূপ, সাক্ষাৎ তিনিই অবশিষ্ট থাকেন। সেই বিধিমুখ অর্থাৎ ব্রহ্মমুখ প্রকটিত সেই সমাধি পারমার্থিকরূপা অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপিণী।।৪৯,৫০

ইতি দশমং প্রকরণং সমাপ্তম।।

—

সার্ধান্তিকাষ্টবিধস্বরূপব্যাক্যেষু

নানালিঙ্গস্বরূপবাক্যানি।।১১

ব্রহ্মের অষ্টবিধ স্বরূপ মহাবাক্য সকলের মধ্যে তাঁহার নানালিঙ্গ
স্বরূপের বাক্য সকল উক্ত হইতেছে—

শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্বাচো
হ বাচঃ স উ প্রাণস্য প্রাণঃ।।১

সেই ব্রহ্ম শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনেরও মন, বাক্যেরও বাক্য এবং প্রাণেরও প্রাণস্বরূপ অর্থাৎ শ্রোত্রাদি তাঁহার শক্তিতেই নিজ কার্য্যে ব্যাপৃত অথবা তিনিই শ্রোত্রাদিরূপে বিরাজিত।।১

যো বৈ ভূমা তৎ সুখম।।২
যো-বৈ ভূমা তদমৃতম।।৩

যিনি অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্ম, তাঁহাকে ভূমা বলে। তিনিই একমাত্র সুখস্বরূপ, সেই ভূমা ব্রহ্মই আনন্দ স্বরূপ।। ২,৩

নেতি নেতি নহ্যেতস্মাদিতি নেত্যন্যৎ পরমস্ত্যথ নামধেয়ং
সত্যস্য সত্যমিতি প্রাণা বৈ সত্যং তেষামেব সত্যম।।৪

(নেতি) 'ন ইতি' এই নিষেধ বাক্য দ্বারা অবিদ্যার স্থূলাংশ নিষিদ্ধ হইতেছে। (নেতি) দ্বিতীয় নকার দ্বারা অবিদ্যার সূক্ষ্মাংশ নিষিদ্ধ হইতেছে। তৃতীয় নেতি দ্বারা অবিদ্যার বীজভাবের নিষেধ হইতেছে। চতুর্থ নেতি দ্বারা অবিদ্যার তুর্য্যাংশের (চতুর্থাংশের) নিষেধ হইতেছে। ব্রহ্ম ভিন্ন যাহা কিছু তৎসমস্ত নাম মাত্র, এক মাত্র তিনিই সত্য, তিনিই সত্যের সত্য, তিনিই প্রাণ রূপে সত্য স্বরূপ, তিনি সকল প্রপঞ্চের মধ্যে এক মাত্র সত্যস্বরূপ। (বাচারম্ভণবিকারনাম ধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম)।।৪

রাতির্দাতুঃ পরায়ণম।।৫

সেই ব্রহ্ম, ভক্ত এবং দাতার একমাত্র শ্রেষ্ঠ আশ্রয়।।৫

স পর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়-মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম।।৬

সেই ব্রহ্ম সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত আছেন, তিনি শুক্র অর্থাৎ জ্যোতির্ম্ময়, স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণদেহ রহিত। তিনি শরীর রহিত বলিয়া ছিদ্র এবং নাড়ীশিরাদি বর্জ্জিত। তিনি শুদ্ধ স্বরূপ এবং শুদ্ধ স্বরূপ বলিয়া পাপরহিত।।৬

প্রণবো হ্যপরং ব্রহ্ম প্রণবশ্চ পরঃ স্মৃতঃ।।৭

প্রণবই (ওঁকার) অপর ব্রহ্ম এবং পর ব্রহ্ম বলিয়া কথিত হন।।৭

ন নিরোধো দ চোৎপত্তিন বদ্ধো ন চ সাধকঃ।।৮
ন মুমুক্ষুর্ন বৈ মুক্ত ইত্যেষা পরমার্থতা।।৯

দ্বৈতমিথ্যাত্ব নিশ্চয় হইলে নিরোধ (প্রলয়), উৎপত্তি (জন্ম), বদ্ধ (সংসারী জীব) এবং সাধকভাব থাকে না। ব্রহ্মজ্ঞানোদয়ে মুমুক্ষু নাই, মুক্তও নাই। ইহাই পরমার্থতা অর্থাৎ যথার্থ অবস্থা।।৮,৯

অখণ্ডৈকরসং শাস্ত্রমখণ্ডৈকরসা ত্রয়ী।।১০
অখণ্ডৈকরসো দেহ অখণ্ডৈকরসং মনঃ।।১১
সেই ব্রহ্ম অখণ্ড ও একরস, তিনি শাস্ত্র, তিনি অখণ্ড ও একরস বেদবিদ্যা। তিনি অখণ্ডৈকরস দেহ স্বরূপ (দেহবৎ সর্ব্বব্যাপক) এবং তিনি অখণ্ডৈকরস মনঃস্বরূপ।।১০,১১

অখণ্ডৈকরসং সূত্রমখণ্ডৈকরসো বিরাট।।১২
অখণ্ডৈকরসা বিদ্যা অখণ্ডৈকরসোহব্যয়ঃ।।১৩
সেই ব্রহ্ম অখণ্ডৈকরস সূত্রাত্মা, তিনি অখণ্ডৈকরস বিরাট স্বরূপ, তিনি অখণ্ডৈকরস বিদ্যা স্বরূপ এবং তিনিই অখণ্ডৈকরস অব্যয় স্বরূপ।।১২,১৩

অখণ্ডৈকরসং গোপ্যমখণ্ডৈকরসঃ শশী।।১৪
অখণ্ডৈকরসং ক্ষেত্রমখণ্ডৈকরসা ক্ষমা।।১৫
তিনি অখণ্ডৈকরস গোপনীয় (দুর্জ্ঞেয়), তিনি অখণ্ডৈকরস শশী। তিনি অখণ্ডৈকরস ক্ষেত্র, এবং তিনিই অখণ্ডৈকরস ক্ষমা (পৃথিবী)।।১৪,১৫

অখণ্ডৈকরসাস্তারা অখণ্ডৈকরসো রবিঃ।।১৬
অখণ্ডৈকরসো জ্ঞাতা অখণ্ডৈকরসা স্থিতিঃ।।১৭
তিনি অখণ্ডৈকরস তারাগণ, তিনি অখণ্ডৈকরস সূর্য্য, তিনি অখণ্ডৈকরস জ্ঞাতা এবং তিনিই অখণ্ডৈকরস স্থিতিস্বরূপ।।১৬,১৭

অখণ্ডৈকরসা মাতা অখণ্ডৈকরসঃ পিতা।।১৮
অখণ্ডৈকরসো রাজা অখণ্ডৈকরসং পুরম।।১৯
অখণ্ডৈকরসং তারমখণ্ডৈকরসো জপঃ।।২০
তিনি অখণ্ডৈকরস মাতা, তিনি অখণ্ডৈকরস পিতা, তিনি অখণ্ডৈকরস রাজা এবং তিনিই অখণ্ডৈকরস পুরস্বরূপ। তিনি অখণ্ডৈকরস প্রণব মন্ত্র এবং তিনিই অখণ্ডৈকরস জপস্বরূপ।।১৮,১৯,২০

সর্ব্ববর্জ্জিতচিন্মাত্রং ত্বত্তা মত্তা চ চিন্ময়ম।।২১
আদিরন্তঞ্চ চিন্মাত্রং গুরুশিষ্যাদি চিন্ময়ম।।২২
তিনি সর্ব্ববর্জ্জিত চিৎস্বরূপ মাত্র, তিনি তৎপদবাচ্য এবং অহংপদবাচ্য চিন্ময়। তিনি আদি এবং অন্তেতে চিন্ময় এবং তিনিই গুরুশিষ্যাদি চৈতন্য স্বরূপ।।২১,২২

দৃগ্দৃশ্যং যদি চিন্মাত্রমস্তি চেচ্চিন্ময়ং সদা।।২৩
সর্ব্বাশ্চর্য্যং চ চিন্মাত্রং দেহশ্চিন্মাত্রমেবহি।।২৪
যদি দৃশ্য এবং দ্রষ্টা সমস্তই চিন্ময় হইল, তবে ব্রহ্মই সদা চিন্ময়রূপে বিরাজিত আছেন। তিনিই সমস্ত অদ্ভুত রস এবং চিন্ময় স্বরূপ, দেহও চিন্ময়।।২৩,২৪

অহং ত্বং চৈব চিন্মাত্রং মূর্ত্তামূর্ত্তাদিচিন্ময়ম।।২৫
পুণ্যং পাপঞ্চ চিন্মাত্রং জীবশ্চিন্মাত্রবিগ্রহঃ।।২৬
আমি এবং তুমি সেই চিন্ময় ব্রহ্মস্বরূপ, সমস্ত মূর্ত্ত ও অমুর্ত্ত পদার্থও চিন্ময়। পুণ্য এবং পাপও চিন্ময়, জীবও চিন্ময়ের মূর্ত্তি, কারণ ব্রহ্মাতিরিক্ত কোন বস্তুই নাই।।২৫,২৬

দেহত্রয়বিহীনত্বাৎ কালত্রয়বিবর্জ্জনাৎ।।২৭
জীবত্রয়গুণাভাবাত্তাপত্রয়বিবর্জ্জনাৎ।।২৮
সেই ব্রহ্ম স্থূল সূক্ষ্ম এবং কারণ এই দেহত্রয় রহিত, ভূত ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান এই কালত্রয়ের অতীত। সেই ব্রহ্ম জীবভাব এবং সত্ব, রজ ও তমঃ এই ত্রিগুণরহিত, সেই ব্রহ্ম আধিদৈবিক, আধ্যাত্মিক এবং আধিভৌতিক এই তাপত্রয় বিবর্জ্জিত।।২৭,২৮

লোকত্রয়বিহীনত্বাৎ সর্ব্বমাত্মেতিশাসনাৎ।।২৯
চিত্তভাবাচ্চিন্তনীয়ং দেহাভাবাজ্জরা ন চ।।৩০
পাদাভাবাদ গতির্নাস্তি হস্তাভাবাৎ ক্রিয়া ন চ।।৩১
মৃত্যুর্নাস্তি জনাভাবাদ বুদ্ধ্যভাবাৎ সুখাদিকম।।৩২
সেই ব্রহ্ম ভূঃ ভুবঃ স্বঃ এই লোকত্রয় রহিত, 'সমস্তই ব্রহ্ম' ইহাই শ্রুতির উপদেশ। সেই ব্রহ্মের চিত্তের অভাব বশতঃ তাঁহার চিন্তনীয় বস্তু নাই এবং দেহের অভাব বশতঃ জরাও নাই। তাঁহার পদের অভাব বশতঃ গতি নাই এবং হস্তের অভাব বশতঃ ক্রিয়াও নাই। তাঁহার জন্মের অভাব বশতঃ মৃত্যু নাই এবং বুদ্ধির অভাব বশতঃ বুদ্ধিগম্য সুখাদিও নাই।।২৯,৩০,৩১,৩২।।

ইতি একাদশং প্রকরণং সমাপ্তম।।

—

সার্ধান্তিকপুংলিঙ্গস্বরূপবাক্যানি।।১২

এই প্রকরণের ব্রহ্মের পুংলিঙ্গ স্বরূপের লক্ষণ সকল উক্ত হইতেছে।

স এষোহকলোহমৃতঃ।।১

যিনি চিদ্ধাতু, তিনি ষোড়শ কলা রহিত এবং অমৃত স্বরূপ।।১

নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং নোভয়তঃপ্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞানঘনং
ন প্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞমদৃশ্য মব্যবহার্য্য মগ্রাহ্য মলক্ষণ মচিন্ত্য
মব্যপদেশ্যমেকাত্মপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং
শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ।।২

বিবেকিগণ ওঁকারের চতুর্থ অবস্থাকে এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, তৎকালে ব্রহ্ম অন্তঃপ্রজ্ঞ তৈজস নহেন, বহিঃপ্রজ্ঞ বিশ্ব নহেন, জাগ্রৎ এবং স্বপ্নের মধ্যবর্ত্তী জ্ঞানসম্পন্ন নহেন, প্রজ্ঞানঘন প্রাজ্ঞ নহেন, জ্ঞাতা নহেন, অপ্রজ্ঞও নহেন, কিন্তু তিনি অদৃশ্য (চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অগোচর), তিনি অব্যবহার্য্য ('ইহা অমুক' ইত্যাকার ব্যবহারের অযোগ্য), তিনি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য (অনুমানযোগ্য), তিনি সকল প্রকার চিহ্ন রহিত, মানস চিন্তার অবিষয়, শব্দ নির্দ্দেশের অযোগ্য, 'একই আত্মা' ইত্যাকার প্রতীতিগম্য, জাগ্রদাদি প্রপঞ্চের নিবৃত্তিস্থান, তিনি শান্ত, (নির্ব্বিকার), মঙ্গলময় এবং অদ্বৈত, তিনিই সর্ব্বভূতান্তরাত্মা এবং তিনিই একমাত্র জ্ঞাতব্য বিষয়।।২

অমাত্রশ্চতুর্থোহব্যবহার্য্যঃ প্রপঞ্চোপশমঃ শিবোহদ্বৈতঃ।।৩

সেই ব্রহ্ম মাত্রাশূন্য, অব্যবহার্য্য, জগৎ প্রপঞ্চের নিবৃত্তিস্থান মঙ্গলময় ওঁকারের চতুর্থস্থানীয় এবং অদ্বৈত স্বরূপ।।৩

যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ বিজানাতি স ভূমা।।৪

ব্রহ্মবিৎ বরীয়ান যে স্বরূপে কোন রূপজাতকে দর্শন করেন না, কোন শব্দজাতকে শ্রবণ করেন না, সদসৎ বস্তুকে জ্ঞাত হয়েন না, তাঁহাকে ভূমাস্বরূপ বা ব্রহ্ম বলে অথবা মৎস্বরূপে অন্য দর্শন নাই, অন্য শ্রবণ নাই, অন্য বিজ্ঞান নাই অর্থাৎ কোন প্রকার ভেদ ব্যবহারের উপযোগ নাই, সেই স্বরূপই ভূমা অর্থাৎ ব্রহ্ম।।৪

স এষ নেতি নেত্যাত্মাহগৃহ্যো নহি গৃহ্যতেহ শীর্য্যো নহি
শীর্য্যতেহসঙ্গো নহি সজ্জতেহসিতো ন ব্যথ্যতে ন রিষ্যতি।।৫

ব্রহ্মেতে সমস্ত পদার্থের নিষেধ করিয়া একমাত্র ব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকেন। সেই আত্মা অগ্রাহ্য, কারণ তাঁহাকে কেহ গ্রহণ করিতে পারে না, তিনি অশীর্য্য অর্থাৎ শীর্ণ হয়েন না, তিনি অমূর্ত্ত বলিয়া অসঙ্গ (কোন বিষয়ে লিপ্ত হয়েন না), তিনি বন্ধন রহিত বলিয়া অসিত (বন্ধন বর্জ্জিত), তিনি কিছুতেই ব্যথিত হয়েন না বা কোন রূপে বিনষ্ট হয়েন না।।৫

রসঘন এবৈবং বাহরেয়মাত্মানন্তরোহবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘন এব।।৬

হে মৈত্রেয়ী, এই আত্মা সচ্চিদানন্দনরসঘন, তিনি অনন্তর এবং অবাহ্য। তাঁহার অন্তর এবং বাহ্যযোগ বশতঃ বিশেষতা আসিয়া পড়ে, সেই জন্য তাঁহাকে অনন্তর এবং অবাহ্য বলা হয় অর্থাৎ তিনি অন্তর্বাহ্য বিভাগ শূন্য, অতএব কৃৎস্ন অর্থাৎ সম্পূর্ণ, কারণ স্বাতিরিক্ত বাহ্যাভ্যন্তরের অভাব তাঁহাতে আছে (আত্মৈবেদং সর্ব্বং—সমস্তই আত্মময়, এইরূপ শ্রুতি আছে)। তিনি সর্ব্বজ্ঞ চিদঘন স্বরূপ (জ্ঞানস্বরূপ)।।৬

তস্মাত্মনো বিলীনে মনসি গতে সংকল্পে বিকল্পে দগ্ধে
পুণ্যপাপে সদাশিবঃ ওঁশক্ত্যাত্মকঃ সর্ব্বত্রাবস্থিতঃ স্বয়ংজ্যোতিঃ
শুদ্ধো নিত্যো নিরঞ্জনঃ শান্ততমঃ প্রকাশয়তি।।৭

আত্মাতিরিক্ত মন আছে এই বিভ্রম জ্ঞান হেতু মহাঅনর্থ উৎপন্ন হয় "নাবিদ্যা নো মায়া পরং ব্রহ্মাহস্মীতি স্মরণস্য মনো নহি" 'অবিদ্যা নাই, মায়াও নাই, আমিই ব্রহ্ম' এই স্মরণকারী ব্যক্তির মনও থাকে না, এই শ্রুতির অর্থজ্ঞানদ্বারা বিশুদ্ধ জ্ঞানদৃষ্টিতে মন লয় প্রাপ্ত হয়, তদনন্তর মন হইতে উৎপন্ন সংকল্প ও বিকল্প ও তজ্জন্য পুণ্যপাপ ভস্মীভূত হয়, অনন্তর জাগ্রদাদি পঞ্চদশ কলার গ্রাসকারী সদাশিব তুরীয় ওঁকার স্বরূপে অবশিষ্ট থাকেন; তৎপরে সেই ওঁকার সর্ব্বশক্তিময়, সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত, স্বয়ং জ্যোতি, শুদ্ধ, নিত্য, নিরঞ্জন, (বিশুদ্ধ) এবং তমোগুণরহিত স্বপ্রকাশ ব্রহ্মস্বরূপে প্রকাশিত হন।।৭

এষ শুদ্ধঃ পূতঃ শূন্যঃ শান্তোহপ্রাণোহনীশাত্মানন্তোহক্ষয্যঃ
স্থিরঃ শাশ্বতোহজঃ স্বতন্ত্রঃ স্বে মহিম্নি তিষ্ঠতি।।৮

এই পরমাত্মা স্বভাবতঃ শুদ্ধ এবং পবিত্র, অন্তঃকরণ শূন্য, কর্ম্ম ও জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং পঞ্চ প্রাণ রহিত বলিয়া তিনি শান্ত; স্বাতিরিক্ত মুখ্য প্রাণের অভাব বশতঃ তিনি অপ্রাণ, জীবরূপে অস্বতন্ত্র বলিয়া তিনি অনীশ, অপরিচ্ছিন্ন বলিয়া তিনি অনন্ত, ষড়ভাব বিকার রহিত বলিয়া তিনি অক্ষয়, সৎস্বরূপ বলিয়া তিনি স্থির, চিরন্তন বলিয়া তিনি শাশ্বত (নিত্য), দেহাদি রহিত বলিয়া তিনি অজ, এবং পরমেশ্বরের স্বরূপ বলিয়া তিনি স্বতন্ত্র। তিনি সদা নির্ব্বিশেষ স্বীয় স্বরূপে এবং মহিমায় বিরাজিত।।৮

চক্ষুষো দ্রষ্টা শ্রোত্রস্য দ্রষ্টা মনসো দ্রষ্টা বাচো দ্রষ্টা বুদ্ধের্দ্রষ্টা
প্রাণস্য দ্রষ্টা তমসো দ্রষ্টা সর্ব্বস্য দ্রষ্টা ততঃ সর্ব্বস্মাদন্যো বিলক্ষণঃ
সদঘনোহয়ং চিদঘন আনন্দঘন এবৈকরসোহব্যবহার্য্যঃ।।৯

সেই পরমাত্মা সকলের সাক্ষী বলিয়া চক্ষুর দ্রষ্টা, শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের দ্রষ্টা, মনের দ্রষ্টা, বাগিন্দ্রিয়ের দ্রষ্টা, বুদ্ধির দ্রষ্টা, পঞ্চপ্রাণের দ্রষ্টা, অবিদ্যার দ্রষ্টা এবং সমস্ত পদার্থেরই দ্রষ্টা; কিন্তু তিনি সমস্ত পদার্থ হইতে বিলক্ষণ স্বরূপ, সদঘন স্বরূপ, চিদঘন স্বরূপ এবং আনন্দঘন স্বরূপ ও সদা একরস। তাঁহাতে ব্যবহার্য্য প্রপঞ্চের অভাব বশতঃ তিনি অব্যবহার্য্য।।৯

সন্মাত্রো নিত্যঃ শুদ্ধো বুদ্ধঃ সত্যো মুক্তো নিরঞ্জনো
বিভুরদ্বয়ানন্দঃ পরঃ প্রত্যগেকরসঃ।।১০

সেই ব্রহ্ম সৎ স্বরূপ, নিত্য, শুদ্ধ স্বরূপ, জ্ঞান এবং সত্য স্বরূপ, মুক্ত স্বভাব, নির্ম্মল, সর্ব্বব্যাপক, দ্বৈত রহিত, আনন্দ স্বরূপ, পরমাত্মা এবং জীবাত্মা স্বরূপ ও সদা একরস।।১০

অদৃষ্টোহ ব্যবহার্য্যোহপ্যল্পো নাহল্পঃ সাক্ষ্যবিশেষঃ
সর্ব্বজ্ঞোহনন্তোহভেন্নোহদ্বয়ো বিদিতাবিদিতাৎ পরঃ
অদ্বৈতপরমানন্দো বিভুর্নিত্যো নিষ্কলঙ্কো নির্বিকল্পো
নিরঞ্জনো নিরাখ্যাতঃ শুদ্ধো দেব একো নারায়ণো

ন দ্বিতীয়োঽস্তি কশ্চিৎ।।১১

সেই ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য (স্বাতিরিক্ত কাহারও দ্বারা দৃষ্ট হন না) বলিয়া অদৃষ্ট, ব্যবহার্য্য প্রপঞ্চ রহিত (ইদং প্রত্যয়ের অগোচর) বলিয়া অব্যবহার্য্য, ভক্তজনের জন্য অল্প স্থান হৃদয়াদি স্থানে লভ্য বলিয়া অল্প, ভূমা (অপরিচ্ছিন্ন বা সর্ব্বব্যাপক) বলিয়া অনল্প, সর্ব্বব্যাপক বলিয়া সকলের সাক্ষী, বস্তুতঃ সকলকে নির্ব্বিশেষ জানেন বলিয়া অবিশেষ, সমস্ত জানেন বলিয়া সর্ব্বজ্ঞ, পরিচ্ছেদ রহিত বলিয়া অনন্ত, জীবাত্মা পরমাত্মা ইত্যাকার ভেদ রহিত, দ্বৈত রহিত, মূর্ত্ত এবং অমূর্ত্ত পদার্থ হইতে শ্রেষ্ঠ, অদ্বৈত, পরমানন্দ স্বরূপ, বিভু, নিত্য নির্দ্দোষ, নির্ব্বিকল্প নিরঞ্জন, সংজ্ঞা রহিত এবং শুদ্ধ স্বরূপ তিনি এক অদ্বিতীয় নারায়ণ স্বরূপ। তাঁহার দ্বিতীয় কেহই নাই।।১১

অচক্ষুর্বিশ্বতশ্চক্ষুরকর্ণো বিশ্বতঃকর্ণ অপাদো বিশ্বতঃপাদ
অপাণিবিশ্বতঃপাণিরহমশিরা বিশ্বতঃশিরা
বিদ্যামাত্রৈকসংশ্রয়ো বিদ্যারূপঃ।।১২

সেই ব্রহ্ম চক্ষু রহিত হইয়াও বিরাটরূপে সর্ব্বত্র চক্ষুষ্মান, শ্রোত্রেন্দ্রিয় রহিত হইয়াও সর্ব্বত্র শ্রোত্রেন্দ্রিয়যুক্ত, পাণি পাদ মস্তক বিহীন হইয়াও হস্ত পদ শিরোযুক্ত, স্বাতিরিক্ত মান এবং মেয় পদার্থের অভাব বশতঃ তিনি বিদ্যার একমাত্র আশ্রয় এবং স্বয়ংই বিদ্যাস্বরূপ।।১২

দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ সবাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ।।১৩
অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রো হ্যক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ।।১৪

তিনি নিজ মহিমাতেই প্রকাশিত, মূর্ত্তি বর্জ্জিত বলিয়া অমূর্ত্ত; সর্ব্বত্র পরিপূর্ণ বলিয়া পুরুষ, স্বব্যাপ্য প্রপঞ্চের বাহ্য এবং অভ্যন্তরে সদা বর্ত্তমান, অজর এবং অমৃত স্বরূপ বলিয়া অজ। ক্রিয়াজ্ঞানেচ্ছাশক্ত্যাত্মক প্রাণ এবং অন্তঃকরণ চতুষ্টয়ের অভাব বশতঃ তিনি অপ্রাণ এবং অমনা, প্রকাশ মাত্র স্বরূপ বলিয়া তিনি শুভ্র এবং প্রপঞ্চের আরোপাধার অক্ষর ঈশ্বর হইতে পর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ।।১৩,১৪

অদ্বৈতঃ সর্বভাবানাং দেবস্তুর্য্যো বিভুঃ স্মৃতঃ।।১৫

বিশ্ব বিরাট ঈশাদিভাব—সকলেতে দ্বৈতের ন্যায় ভান হইলেও সেই দ্বৈত ভাবের অপবাদাধার ব্রহ্ম অদ্বৈত বিভু এবং তুর্য্যদেব বলিয়া খ্যাত হন।।১৫

অপূর্ব্বোঽনন্তরোঽবাহ্যো ন পরঃ প্রণবোঽব্যয়ঃ।।১৬

স্বতঃ অন্য কারণ রহিত বলিয়া তিনি অপূর্ব্ব, স্বতঃকার্য্যাভাব হেতু তিনি অনন্তর, ব্রহ্ম ভিন্ন পদার্থের অভাব বশতঃ তিনি অবাহ্য, স্বপরত্বের অভাব বশতঃ তিনি অনপর এবং নিত্য বলিয়া তিনি অব্যয় (প্রণব স্বরূপ পরমাত্মা অবশিষ্ট থাকেন বলিয়া তিনি অব্যয়)।।১৬

অমাত্রোঽনন্তমাত্রশ্চ দ্বৈতস্যোপশমঃ শিবঃ।।১৭

অকারাদি মাত্রা রহিত বলিয়া তিনি অমাত্র, পরাভিধানাত্মক অনন্ত মাত্রারূপী বলিয়া তিনি অনন্তমাত্র, তিনি অভিধান অভিধেয়রূপ অশিব দ্বৈত ভাব রহিত বা তদ্রূপের উপশমাধার বলিয়া শিব পরমাত্মস্বরূপ।।১৭

কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ।।১৮

তিনি ঈশ্বরাত্মরূপে নিখিল কর্ম্মের ফলদাতা সর্বান্তর্য্যামী বলিয়া তিনি সকল ভূতের আশ্রয়। সর্ব্বব্যাপক বলিয়া তিনি সাক্ষী, সকলের চেতা (জ্ঞাতা), অশেষ এবং বিশেষ রহিত বলিয়া তিনি কেবল, এবং তিনিই গুণত্রয়ের অভাববশতঃ নির্গুণ।।১৮

সর্ব্বসংকল্পরহিতঃ সর্ব্বনাদময়ঃ শিবঃ।।১৯

সর্ব্ববর্জ্জিতচিন্মাত্রঃ সর্ব্বানন্দময়ঃ পরঃ।।২০

মন রহিত বলিয়া তিনি সর্ব্ব সংকল্প রহিত প্রণবাদি সর্ব্বনাদময় বলিয়া তিনি বস্তুতঃ সদাশিব। তিনি সর্ব্বঅচিৎ বর্জ্জিত চিৎস্বরূপ এবং সর্ব্বানন্দময় পরমাত্মা।।১৯,২০

সর্ব্বানুভববিনির্ম্মুক্তঃ সর্ব্বধ্যানবিবর্জ্জিতঃ।।২১

আত্মানাত্মবিবেকাদিভেদাভেদবিবর্জ্জিতঃ।।২২

সেই পরমাত্মা অন্তঃকরণরূপ অবিদ্যাকল্পিত জগজ্জীবেশাদি অনুভব বর্জ্জিত এবং দেহাদি সাক্ষ্যন্ত সর্ব্বধ্যান রহিত। তিনি আত্মা এবং অনাত্মার বিবেকাদি জন্য ভেদ এবং অভেদজ্ঞান বর্জ্জিত।।২১,২২

মহাবাক্যার্থতো দূরো ব্রহ্মাস্মীত্যতিদূরতঃ।।২৩

তচ্ছব্দবর্জ্জ্যস্ত্বংশব্দহীনো বাক্যার্থবর্জ্জিতঃ।।২৪

তিনি মহাবাক্যার্থবৃত্তি হইতে দূর এবং ব্রহ্মাস্মীতি এই বৃত্তি হইতেও দূর। তিনি 'তত্বমসি' এই বাক্যের তৎ শব্দ বর্জ্জিত এবং ত্বং শব্দ হীন বাক্যার্থ রহিত অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ।।২৩,২৪

ক্ষরাক্ষরবিহীনো যো নাদান্তর্জ্যোতিরেব সঃ।।২৫

ক্ষর প্রপঞ্চ, তদাধার অক্ষর ঈশ্বর, এই উভয় ভাব বিহীন সেই ব্রহ্ম প্রণব (শব্দ ব্রহ্ম) নাদান্ত বিদ্যোত মান তুর্য্য জ্যোতিঃস্বরূপ।।২৫

অখণ্ডৈকরসো বাহমানন্দোহস্মীতি বর্জ্জিতঃ।।২৬

দৃশ্যদর্শননির্ম্মুক্তঃ কেবলামলরূপবান।।২৭

আমি একমাত্র অখণ্ডৈকরস ব্রহ্মস্বরূপ, আমি আনন্দস্বরূপ, ইহা (দৃশ্যপ্রপঞ্চ) মায়িক বলিয়া এতভ্ভাব বর্জ্জিত। দৃশ্য ঘটাদি, তদ্বিষয়ক জ্ঞান দর্শন, এই উভয়ভাব বর্জ্জিত আমি কেবল, নির্ব্বিশেষ এবং অমলস্বভাব ব্রহ্ম।।২৬,২৭

নিত্যোদিতো নিরাভাসো দ্রষ্টা সাক্ষী চিদাত্মকঃ।।২৮

স এব বিদিতাদন্যস্তথৈবাদিতাদধি।।২৯

তিনি মাত্রা রহিত বলিয়া নিত্য উদিত, উদয়াস্ত রহিত বলিয়া নিরাভাস। তিনি জীবরূপে ব্যষ্টি প্রপঞ্চের দ্রষ্টা, ঈশ্বররূপে সমষ্টি প্রপঞ্চের সাক্ষী। স্বভাবতঃ চিন্ময় বলিয়া তিনি চিদাত্মা। সেই ব্রহ্ম বিদিত অর্থাৎ জ্ঞাত স্থূল পদার্থ হইতে অন্য (পৃথক) এবং সেই ব্রহ্ম অবিদিত অর্থাৎ সূক্ষ্ম অবিদ্যা বীজ হইতেও পৃথক।।২৮,২৯

ইতি দ্বাদশং প্রকরণং সমাপ্তম।।

—

সার্ধান্তিকস্ত্রীলিঙ্গস্বরূপবাক্যানি।।১৩

এই প্রকরণে ব্রহ্মের স্ত্রীলিঙ্গ স্বরূপের লক্ষণ সকল উক্ত হইতেছে।

অলৌকিকপরমানন্দলক্ষণাখণ্ডামিততেজোরাশিঃ।।১

অলৌকিক পরমানন্দলক্ষণা সেই চিন্ময়ী, অখণ্ড এবং অমিত তেজোরাশি রূপিণী এবং পূর্ণবোধাত্মিকা।।১

ভাবাভাবকলাবিনির্মুক্তা চিদবিদ্যা ব্রহ্মসংবিত্তিঃ।।২

শ্রোত্রাদি গ্রাহ্য শব্দাদি ভাব কলা এবং মন আদি গ্রাহ্য সংকল্পাদি অভাব কলা, তদুভয় বিনির্ম্মুক্ত চিদ্রূপিণী এবং বিদ্যারূপিণী (চিদস্মীতি বেদনীয়ত্বাৎ চিদ্বিদ্যা) আমি চিন্ময়ী এই জ্ঞান হেতু তিনি চিদ বিদ্যা, (বৃংহণাৎ) ব্যাপনশীল বলিয়া ব্রহ্ম, (ব্রহ্মবিদবরিষ্ঠৈঃ সংবেদনীয়ত্বাৎ) সেই চিন্ময়ী মা ব্রহ্মাবেত্তৃ কর্ত্তৃক সংবেদনীয়া বলিয়া তিনি ব্রহ্মসংবিত্তি।।২

সচ্চিদান্দলহরী মহাত্রিপুরসুন্দরী।।৩

সেই চিন্ময়ী মা সচ্চিদানন্দ লহরী পূর্ণ প্রবাহরূপিণী। ভূঃ, ভুবঃ, এবং স্বঃ এই ত্রিপুরোপলক্ষিত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডকে অধিষ্ঠান করিয়া যিনি শোভাযুক্তা হয়েন, তিনি মহাত্রিপুরসুন্দরী।।৩

বহিরন্তয়নুপ্রবিশ্য স্বয়মেকৈব বিভাতি।।৪

তিনি অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামিনীরূপে অধিষ্ঠিতা হইয়া এবং উহাদের বাহ্যাভ্যন্তরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া স্বয়ং একমাত্র বিরাজিতা আছেন।।৪

সর্ব্বসঙ্কল্পরহিতা সর্ব্বসংজ্ঞাবিবর্জ্জিতা।।৫

সৈষা চিদবিনাশাত্মা স্বাত্মেত্যাদিকৃতা ভিদা।।৬

অন্তঃকরণবৃত্তির অভাব বশতঃ তিনি সর্ব্ব সংকল্প বর্জ্জিতা এবং সর্ব্ববিধ সংজ্ঞা রহিতা। সেই চিন্ময়ী অবিনাশরূপিণী আত্মা, তদ্ভিন্ন অন্য কিছুই নাই। তিনিই আত্মা ইত্যাদি বিভিন্ন নাম যুক্তা।।৫,৬

আকাশশতভাগাচ্ছা জ্ঞেষু নিষ্কলরূপিণী।।৭

নাস্তমেতি ন চোদেতি নোত্তিষ্ঠতি ন তিষ্ঠতি।।৮

আকাশ অপেক্ষা শত গুণে তিনি নির্ম্মলা চিন্মাত্র রূপিণী। ব্রহ্মাত্মবিদবরিষ্ঠ-দৃষ্টিতে তিনি প্রাণাদি নামান্ত ষোড়শকলা রহিত বলিয়া নিষ্কলরূপিণী। চিদ্রূপিণী মা কলাযুক্ত বলিয়া তাঁহার উদয় এবং অস্ত সম্ভব হইতে পারে, তদুত্তরে বলা হইতেছে—তিনি নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মরুপিণী চিন্ময়ী বলিয়া তাঁহতে উদয়াস্তময়াদি বিকৃতি সম্ভব হইতে পারে না, কারণ তিনি মূর্ত্ত এবং অমূর্ত্ত হইতে বিলক্ষণা অর্থাৎ ভিন্নস্বরূপা।।৭,৮

ন চ যাতি ন চায়াতি ন চ নেহ নচেহ চিৎ।।৯

সৈষা চিদমলাকারা নির্ব্বিকল্পা নিরাস্পদা।।১০

তিনি সর্ব্বব্যাপিণী বলিয়া তাঁহার গমনাগমন নাই, সেই চিন্ময়ী ভিন্ন অন্য কিছুই নাই। সেই চিন্ময়ী মা জীবাভিন্ন ব্রহ্ম স্বরূপেতে বিমলাকারা, সঙ্কল্পের অভাব বশতঃ নির্ব্বিকল্পা এবং স্বাতিরিক্ত অধিষ্ঠানের অভাব বশতঃ নিরধিষ্ঠানা।।৯,১০

মহাচিদেকৈবেহাস্তি মহাসত্তেতি চোচ্যতে।।১১
নিষ্কলঙ্কা সমা শুদ্ধা নিরহঙ্কাররূপিণী।।১২
সকৃদ্বিভাতা বিমলা নিত্যোদয়বতী সমা।।১৩
সা ব্রহ্ম পরমাত্মেতি নামভিঃ পরিগীয়তে।।১৪

একমাত্র তিনিই মহাচিদ্রূপিণী এবং মহাসত্তা স্বরূপা উক্তা হয়েন। পরম অদ্বয়স্বরূপিণী যে মা, তাঁহাতে বিশেষণ বিশিষ্ট মায়া কলঙ্কের অভাববশতঃ তিনি নিষ্কলঙ্কা, অবিদ্যাকৃত (বৈষম্য) রহিতা, এবং নিরহংকাররূপিণী মা নিত্য বিরাজিতা, তিনি চিন্ময়ী বলিয়া বিমলা, স্বস্বরূপে নিত্যোদয়বতী এবং করুণাময়ী বলিয়া সমদর্শিনী। সেই চিদ্রূপিণী মাকে ব্রহ্ম পরমাত্মা ইত্যাদি নাম দ্বারা যোগিগণ কীর্ত্তন করেন।। ১১,১২,১৩,১৪

ইতি ত্রয়োদশং প্রকরণং সমাপ্তম।।

—

সার্ধান্তিকনপুংসকলিঙ্গস্বরূপবাক্যানি।।১৪

এই প্রকরণে ব্রহ্মের নপুংসকলিঙ্গস্বরূপের লক্ষণ উক্ত হইতেছে।

অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি।।১
সে ব্রহ্ম স্থূল প্রপঞ্চ হইতে অন্য অর্থাৎ ভিন্ন এবং অবিদিত সূক্ষ্ম হইতেও ভিন্ন।।১

যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃশ্রোত্রং তদপাণিপাদম।।২
সেই ব্রহ্ম নিরাকার এবং স্থূলদেহাদি হইতে বিলক্ষণ বলিয়া অদৃশ্য, অগ্রাহ্য, গোত্ররহিত, ব্রাহ্মণাদি বর্ণরহিত এবং জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয় বর্জ্জিত বলিয়া চক্ষু, শ্রোত্র, পাণি, পাদাদি, ইন্দ্রিয় বর্জ্জিত।।২

সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম।।৩
হে সৌম্য (প্রিয়শিষ্য)! সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র সৎ স্বরূপ, অদ্বিতীয়, স্বজাতীয় বিজাতীয় স্বগত ভেদ রহিত এবং নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই ছিলেন।।৩

অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘমলোহিত মস্নেহমচ্ছায়মতমোহবায়;বনাকাশ মসঙ্গ
মরসমগন্ধমচক্ষুস্কমশ্রোত্রমবাগমনোহতেজস্কমপ্রাণমমুখমমাত্রমনন্তরমবাহ্যম।।৪
সেই ব্রহ্ম বুদ্ধি অপেক্ষা সূক্ষ্ম বলিয়া অস্থূল, বৃহৎ বলিয়া অনণু, নিষ্পরিমাণ বলিয়া অহ্রস্ব এবং অদীর্ঘ, রজঃ আদি গুণত্রয়াভাব হেতু তিনি অলোহিত, অদ্রব বলিয়া তিনি অস্নেহ, অমূর্ত্ত বলিয়া তিনি অচ্ছায় (ছায়া রহিত), অবিদ্যক মোহাভাব বশতঃ তিনি অতমঃ; ভূত ভৌতিক ভাবরহিত বলিয়া তিনি অবায়ু, অনাকাশ, অসঙ্গ, অগন্ধ; জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয়ের অভাববশতঃ তিনি অচক্ষু, অশ্রোত্র, অবাক, অন্তঃকরণাভাববশতঃ তিনি অমন, প্রাণাদির অভাববশতঃ তিনি অপ্রাণ, তিনি অতেজস্ক, নিরবয়ব বলিয়া তিনি অমুখ, অপরিচ্ছিন্ন বলিয়া তিনি অমাত্র এবং অন্তর্বাহ্যকল্পনা রহিত বলিয়া তিনি অনন্তর এবং অবাহ্য।।৪

নিত্যং শুদ্ধং বুদ্ধং মুক্তং সত্যং সূক্ষ্মং পরিপূর্ণমদ্বয়ং
সদানন্দচিন্মাত্রং পুরতঃ সুবিভাবতমবিভাতমদ্বৈত-মচিন্ত্যমলিঙ্গং
স্বপ্রকাশমানন্দঘনম।।৫
সেই ব্রহ্ম নিত্যস্বরূপ, শুদ্ধ মুক্ত স্বভাব, সুখস্বরূপ, পরিপূর্ণ, অদ্বয়, সদানন্দ স্বরূপ এবং চৈতন্য মাত্র। সমস্ত পদার্থের পুরোভাগে নিজেই স্বপ্রকাশময় বলিয়া এবং সূর্য্যাদি দ্বারা তিনি প্রকাশিত নহেন বলিয়া তিনি সুবিভাত এবং অবিভাত, দ্বৈতরহিত বলিয়া তিনি অদ্বয়, অনির্ব্বচনীয় বলিয়া তিনি অচিন্ত্য, তাঁহাতে স্বগমক লিঙ্গের অভাব বশতঃ তিনি অলিঙ্গ অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ, তিনি স্বপ্রকাশ এবং ঘনীভূত আনন্দ স্বরূপ।।৫

এতদ্ধ্যশব্দ মস্পর্শ মরূপ মরস মগন্ধ মব্যক্ত মদাতব্য
মবিসর্জ্জিয়তব্য মনানন্দয়িতব্য মমন্তব্য মবোদ্ধব্য
মনহংকর্ত্তয়িতব্য মচেতয়িতব্য মপ্রাণয়িতব্য মপানয়িতব্য
মব্যানয়িতব্য মনুদানয়িতব্য মসমানয়িতব্য মনিন্দ্রিয়মবিষয়
মকরণ মলক্ষণ মসঙ্গ মগুণ মবিক্রিয় মব্যপদেশ্য মসত্ব

মরজস্ক মতমস্ক মমায় মভয় মপ্যৌপনিষদমেব সুবিভাতং
সকৃদ্বিভাতং পুরতোহস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ সুবিভাত মদ্বময়।।৬

এক্ষণে প্রত্যগভিন্ন (জীব হইতে অভিন্ন) ব্রহ্মস্বরূপ উক্ত হইতেছে। পঞ্চতন্মাত্র, জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বিষয় রহিত বলিয়া তিনি অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অরস, অগন্ধ, অব্যক্ত, অদাতব্য, অগন্তব্য, অবিসর্জ্জয়িতব্য, অনানন্দয়িতব্য, অমন্তব্য, অবোদ্ধব্য, অনহঙ্কর্ত্তয়িতব্য, অচেতয়িতব্য, প্রাণ অপান সমান ব্যান এবং উদান এই পঞ্চ প্রাণরহিত বলিয়া তিনি অপ্রাণয়িতব্য, অপানয়িতব্য, অব্যানয়িতব্য, অনুদানয়িতব্য, অসমানয়িতব্য, অন্তঃকরণাদি ইন্দ্রিয়রহিত বলিয়া তিনি অনিন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের বিষয়াভাববশতঃ তিনি অবিষয়, ইন্দ্রিয়রহিত বলিয়া তিনি অকরণ, অনির্দ্দেশ্য বলিয়া অলক্ষণ, আসক্তি রহিত বলিয়া তিনি অসঙ্গ, সত্বাদি, গুণরহিত বলিয়া তিনি অগুণ, বিকার রহিত, অব্যপদেশ্য (বাঙ্মনের অগোচর) সত্ব রজঃ তমোগুণ বর্জ্জিত বলিয়া তিনি মায়া রহিত, অভয়, তিনি একমাত্র উপনিষদপ্রতিপাদ্য, তিনি স্বপ্রকাশ, সদা প্রকাশ, সমস্ত পদার্থের পুরোভাগে সুপ্রকাশিত একমাত্র অদ্বয় ব্রহ্ম স্বরূপ।।৬

অনির্ব্বচনীয়ং জ্যোতিঃ সর্ব্বব্যাপকং নিরতিশয়ানন্দলক্ষণং পরমাকাশম।।৭

বাক্য এবং মনের অগোচর ব্রহ্ম রূপেতে স্বয়ং প্রকাশ বলিয়া তিনি অনির্ব্বচনীয় জ্যোতিঃস্বরূপ, তিনি সর্ব্বব্যাপক, তিনি ভূমা বলিয়া নিরতিশয় আনন্দ লক্ষণযুক্ত, ভূতাকাশের কারণ বলিয়া তিনি পরমাকাশ এবং চিদাকাশ।।৭

তদ্বহ্ম তাপত্রয়াতীতং ষটকোশবিনির্ম্মুক্তং ষড়ূর্ম্মিবর্জ্জিতং
পঞ্চকোশাতীতং ষড়ভাববিকারশূন্যমেবমাদিসর্ব্ববিলক্ষণং
নির্গুণং নিরুপপ্লবং জ্যোতিরভ্যন্তরং সর্ব্বমায়াতীত
মপ্রত্যগেকরস মদ্বিতীয়ম।।৮

সেই ব্রহ্ম স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ দেহরহিত বলিয়া আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক এবং আদিভৌতিক এই ত্রিতাপ বিনির্ম্মুক্ত, তিনি ত্বক, রুধির, মাংস, মেদ, মজ্জা এবং অস্থি এই ছয় কোশ রহিত, তিনি অশনায়া, পিপাসা, শোক, মোহ, জরা, মরণ এই ছয় প্রকার (উর্ম্মি) চিত্তবিকার বর্জ্জিত, তিনি অন্নষয়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময় এই পঞ্চকোশ রহিত, তিনি ছয় বিকার (জায়তে, অস্তি, বিপরিণমতি, বর্দ্ধতে, অপক্ষীয়তে বিনশ্যতি) রহিত, এই প্রকার সর্ব্বপদার্থ হইতে বিলক্ষণ (ভিন্ন), সত্বাদি গুণরহিত বলিয়া তিনি নির্গুণ, স্থূলাদি দেহরহিত বলিয়া তিনি উপদ্রবশূন্য, অতি প্রকাশময় বলিয়া তিনি অভ্যন্তর জ্যোতি, তিনি সর্ব্বময়াতীত, তাঁহাতে স্বাতিরিক্ত প্রত্যক রসের (জীব ও জগৎভাব) অভাবহেতু তিনি অপ্রত্যক একরস স্বরূপ এবং দ্বৈত রহিত বলিয়া তিনি অদ্বিতীয়।।৮

তজ্জ্যোতিরেকমদ্বিতীয়ং সর্ব্বকল্পনাতীতং ধ্রুব
মক্ষরমেকং সদা চকাস্তি সচ্চিদানন্দম।।৯

সেই ব্রহ্ম জ্যোতিস্বরূপ একমাত্র অদ্বিতীয়, তিনি নির্ব্বিশেষ হেতু সমস্ত কল্পনার অতীত, সৎ মাত্র বলিয়া তিনি নিশ্চল, অবিনাশী, এবং একমাত্র সেই ব্রহ্মই সদা প্রকাশিত রহিয়াছেন।।৯

যত্তৎ সত্যং বিজ্ঞানমানন্দং নিষ্ক্রিয়ং নিরঞ্জনং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং
সর্ব্বতোমুখমনির্দ্দেশ্যমমৃতং নিষ্কলম।।১০

সেই ব্রহ্ম সত্য বিজ্ঞান এবং আনন্দ স্বরূপ, নিষ্ক্রিয়, নির্ম্মল, সর্ব্বব্যাপক সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম, সর্ব্বব্যাপী, বাক্য ও মনের অগোচর, অমৃত স্বরূপ এবং কলা শূন্য।।১০

একমদ্বৈতং নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরতিশয় মনাময়
মদ্বৈতং চতুর্থং ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রাতীতমেকমাশাস্যম।।১১

সেই ব্রহ্ম একমাত্র, দ্বৈতরহিত, নিষ্কল, নিষ্ক্রিয়, বিকাররহিত শান্ত স্বরূপ, তিনি নিরতিশয় অনাময় (রোগাদি উপদ্রব রহিত) অদ্বিতীয়, তুর্য্য স্বরূপ, সেই ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ বলিয়া ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্রভাব শূন্য, একমাত্র এবং সকলের আশাস্য (একমাত্র বাঞ্ছিত)।।১১

অদ্বয় মনাদ্যন্তমশেষ বেদবেদান্তবদ্যমনির্দ্দেশ্যমনিরুক্তমপ্রচ্যবমাশাস্যমদ্বৈতং
চতুর্থং সর্ব্বাধার মনাধার মনিরীক্ষ্যম।।১২

সেই ব্রহ্ম অদ্বয়, উৎপত্তি প্রলয় রহিত বলিয়া অনাদি, অনন্ত, ব্রহ্মা ইন্দ্রাদিরূপে এবং স্বীয় স্বরূপ দ্বারা তিনি অশেষ, তিনি বেদ এবং বেদান্ত বেদ্য, তিনি নির্ব্বিশেষ বলিয়া অনির্দ্দেশ্য এবং অনিরুক্ত (নির্দ্দেশ এবং বচনাতীত), তিনি অচ্যুত বলিয়া অপ্রচ্যব, তিনি আশাস্য (একমাত্র বাঞ্ছনীয়), তিনি অদ্বৈত, তিনি ওঁকারের তুরীয় পদবাচ্য, সকলের আধার, তাঁহার আধার কেহ নাই বলিয়া তিনি অনাধার ব্রহ্মাহমস্মীতি এই ভাবনা ব্যতিরেকে তিনি অনিরীক্ষ্য অর্থাৎ অলক্ষ্য।।১২

অশব্দমস্পর্শরূপমব্যয়ং তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।।১৩
পরং বিজ্ঞানাদ যদ বরিষ্ঠং প্রজানাং যদর্চ্চিমদ যদণুভ্যোহণু চ।।১৪

সেই ব্রহ্ম শব্দ স্পর্শ রূপ রস এবং গন্ধ বর্জ্জিত, নিত্য এবং অব্যয় স্বরূপ। তমোগুণ বিশিষ্ট জীবদিগের নিজ অজ্ঞান দৃষ্টি জন্য স্বাতিরিক্ত বস্তু বিষয়ক বিজ্ঞান হইতে যিনি শ্রেষ্ঠ, যিনি স্বয়ং প্রকাশ বলিয়া সূর্য্যাদি হইতেও জ্যোতির্ম্ময়, যিনি অণুস্বরূপ বুদ্ধিবৃত্তি হইতেও সূক্ষ্ম, তাঁহাকে ব্রহ্ম বলে।।১৩,১৪

বৃহচ্চ তদ্দিচ্য মচিন্ত্যরূপম সূক্ষ্মাচ্চ তৎ সূক্ষ্মতরং বিভাতি।।১৫
এতজজ্ঞেয়ং নিত্যমেবাত্মসংস্থং নাতঃ পরং বেদিতব্যংহি কিঞ্চিৎ।।১৬

তিনি আকাশ হইতেও বৃহৎ, নিজ মহিমাতেই স্বপ্রকাশ, বাক্য এবং মনের অগোচর বলিয়া তিনি অচিন্ত্য স্বরূপ এবং তিনিই সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতররূপে প্রতিভাত হয়েন। প্রত্যগভিন্ন ব্রহ্মরূপেতে নিত্য যে আত্মসংস্থান (নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই আমি এইরূপ ভাব), একমাত্র তাহাই জ্ঞেয়, অভিন্ন অন্য কিছুই জ্ঞাতব্য নাই।।১৫,১৬

অঘোষমব্যঞ্জন মস্বরঞ্চ যত্তালুকণ্ঠোষ্ঠমনাসিকঞ্চ যৎ।।১৭
অরেফজাত মুভয়োষ্মবর্জ্জিতং যদক্ষরং ন ক্ষরতে কথঞ্চিৎ।।১৮

সেই ব্রহ্মই পরম অক্ষর স্বরূপ। তাঁহাতে প্রযত্ন বিশেষের অভাব বশতঃ তিনি অঘোষ, তাঁহাতে হলসংজ্ঞকবর্ণের অভাব বশতঃ তিনি অব্যঞ্জন, স্বরবর্ণরহিত বলিয়া তিনি অস্বর, এবং তালু, কণ্ঠ, ওষ্ঠ এবং অনুনাসিক বর্ণ রহিত। শষহাদি প্রযত্নরহিত বলিয়া এবং রকারাদি প্রত্যাহারের তাঁহাতে অভাব বশতঃ তিনি রেফ এবং উষ্মবর্ণ বর্জ্জিত। সেই ব্রহ্ম ক্ষর (অবস্থান্তর) রহিত বলিয়া পরম অক্ষর স্বরূপ অর্থাৎ কণ্ঠ ওষ্ঠ তাল্বাদি বর্ণবিকার তাঁহাতে নাই, তিনি নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম স্বরূপ।।১৭,১৮

অগোচরং মনোবাচা মবধূতাদি সংপ্লবম।।১৯
সত্তামাত্রপ্রকাশৈকপ্রকাশং ভাবনাতিগম।।২০

তিনি মন এবং বাক্যের অগোচর, তিনি অবধূতাদির (ব্রহ্মসংস্থ সন্ন্যাসীর) স্বাতিরিক্ত সংসার সাগরের সন্তরণার্থ ভেলা স্বরূপ। তিনি সত্তামাত্র (সৎ স্বরূপ), 'প্রত্যগভিন্ন সত্তা মাত্র ব্রহ্মই আমি' এই বোধের প্রকাশক

এবং 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এই ভাবনা ব্যতিরেকে তাঁহাকে লাভ করা যায় না।।১৯,২০

অহেয়মনুপাদেয় মসামান্যবিশেষণম।।২১
ধ্রুবং স্তিমিতগম্ভীরং ন তেজো ন তমস্ততম।।২২

তিনি হেয়রূপ গুণত্রয় রহিত বলিয়া অহেয়, তাঁহাতে উপাদেয় গুণসাম্যের অভাবহেতু তিনি অনুপাদেয়, অমূর্ত্ত সামান্য ভাব এবং মূর্ত্তভাব বিশেষরূপ, তিনি এই উভয় সামান্য এবং বিশেষ ভাব বর্জ্জিত, কূটস্থ বলিয়া তিনি ধ্রুব, নিস্তরঙ্গ চিৎ সমুদ্রস্বরূপ বলিয়া তিনি স্তিমিত গম্ভীর, তিনি ভূতভৌতিক তেজ এবং তমো রহিত।।২১,২২

নিষ্কলং নির্ম্মলং শান্তং সর্ব্বাতীতং নিরাময়ম।।২৩
ন শূন্যং নাপি চাকারি ন দৃশ্যং নাপি দর্শনম।।২৪
চিন্মাত্রচৈত্যরহিত মনন্ত মজরং শিবম।।২৫
চৈত্যানুপাতরহিতং সামান্যেন চ সর্ব্বগম।।২৬

তিনি নিষ্কল, নির্ম্মল, প্রপঞ্চ রহিত, শান্ত স্বরূপ, সকলকে অতিক্রম করিয়া স্থিত বলিয়া তিনি সর্ব্বাতীত এবং তিনিই নিরুপদ্রব। অবিদ্যারূপ বীজ তাঁহাতে নাই বলিয়া তিনি শূন্য নহেন, কিন্তু স্বস্বরূপে সদা বর্ত্তমান অবিদ্যা কল্পিত নামরূপ প্রপঞ্চরহিত বলিয়া তিনি আকারযুক্ত নহেন, তিনি বিষয় (দৃশ্য) এবং বিষয়ী (জ্ঞান) রহিত বলিয়া তিনি দৃশ্যও নহেন, দর্শনও নহেন। তিনি চিন্মাত্র স্বরূপ, তিনি চিত্তজাত বৃত্তিশূন্য, তিনি অনন্ত, অজর এবং মঙ্গলময় শিবাত্মক। তিনি চিত্তসম্বন্ধ রহিত, তিনি নিজ সত্তা দ্বারা সামান্য ভাবেতে সর্ব্বব্যাপক।।২৩,২৪,২৫,২৬

অনাময় মনাভাস মনামক মকারণম।।২৭
মনোবচেভ্যামগ্রাহ্যং পূর্ণাৎ পূর্ণং সুখাৎ সুখম।।২৮
দ্রষ্টৃদর্শনদশ্যাদিবর্জ্জিতং তদিদংপদম।।২৯
শুদ্ধং সূক্ষ্মং নিরাকারং নির্ব্বিকারং নিরঞ্জনম।।৩০

তিনি অনাময়, স্বাতিরিক্ত আভাসরহিত বলিয়া তিনি অনাভাস স্বরূপ, তিনি নামাদি রহিত এবং কারণ বর্জ্জিত। তিনি মন এবং বাক্যের অগোচর (অগ্রাহ্য), পূর্ণ স্বভাব। আকাশ হইতেও তিনি পূর্ণ, তিনি সুখ হইতেও অতিশয় সুখস্বরূপ। দৃশ্য এবং দর্শন রহিত যে পদ জ্ঞান জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা এই ত্রিপুটি বর্জ্জিত, সেই ইদংপদবাচ্য ব্রহ্মই তিনি। তিনি শুদ্ধ স্বরূপ, সূক্ষ্ম, নিরাকার, নির্ব্বিকার এবং নিরঞ্জন।।২৭,২৮,২৯,৩০

অপ্রমাণ মনির্দ্দেশ্য মপ্রমেয় মতীন্দ্রিয়ম।।৩১
নির্লেপকং নিরাপায়ং কূটস্থ মচলং ধ্রুবম।।৩২
সদঘনং চিদঘনং নিত্যমানন্দঘনমব্যয়ম।।৩৩
প্রত্যগেকরসং পূর্ণমনন্তং বিশ্বতোমুখম।।৩৪

তিনি প্রমাণের অতীত, অনির্দ্দেশ্য, অপ্রমেয় স্বরূপ এবং অতীন্দ্রিয়। তিনি নির্লেপক, অপায়রহিত, তিনি কূটস্থ অচল এবং ধ্রুব। সেই ব্রহ্ম ঘনীভূত সৎস্বরূপ, ঘনীভূত চিৎস্বরূপ এবং ঘনীভূত নিত্য আনন্দ স্বরূপ। তিনি অব্যয়, প্রত্যগভিন্ন একরস, পূর্ণস্বরূপ, এবং বিশ্বব্যাপী।।৩১,৩২,৩৩,৩৪

অহেয়মনুপাদেয় মনাদেয় মনাশ্রয়ম।।৩৫
শুদ্ধং বুদ্ধং সদা মুক্ত মনামক মরূপকম।।৩৬

তিনি হেয় এবং উপাদেয় বর্জ্জিত, তিনি কাহারও দেয় নহেন বলিয়া অনাদেয় এবং স্বাতিরিক্ত আশ্রয় রহিত বলিয়া তিনি অনাশ্রয় স্বরূপ। তিনি শুদ্ধ বুদ্ধ এবং সদা মুক্ত স্বভাব, নাম এবং রূপ বর্জ্জিত।।৩৫,৩৬

সংকল্প সংক্ষয়বশাদ গলিতে তু চিত্তে
সংসারমোহমিহিকা গলিতা ভবন্তি।।৩৭
স্বচ্ছং বিভাতি শরদীব খমাগতায়াং
চিন্মাত্রমেকমজামাদ্যমনন্তমন্তঃ।।৩৮

সংকল্প ক্ষয় হেতু যখন চিত্ত বৃত্তিশূন্য হয়, তখন সংসাররূপ মোহ-কুজ্ঝটিকা দূর হয়। শরৎকালীন আকাশ যেরূপ নির্ম্মল ভাব ধারণ করে, সেই প্রকার চিত্ত বৃত্তিশূন্য হইলে তিনি নির্ব্বিশেষ স্বচ্ছ চিন্মাত্র স্বরূপে প্রতিভাত হয়েন। তিনি চিৎস্বরূপ, এক, অজ এবং আদি ও অন্ত রহিত।।৩৭,৩৮

ইতি চতুর্দ্দশং প্রকরণং সমাপ্তম।

—

সার্ধান্তিকাত্মস্বরূপবাক্যানি।।১৫

এই প্রকরণে ব্রহ্মের স্বরূপ বাক্য সকল উক্ত হইতেছে।

আকাশো হ বৈ নাম নামরূপয়োর্নির্বহিতা যে
যদন্তরা তদ্বহ্ম তদমৃতং স আত্মা।।১

যিনি (আ সমন্তাৎ কাশতে) সর্ব্বত্র দীপ্তিমান, সেই আকাশ পরব্রহ্ম, তিনি চিদ্ধাতু, তিনি জগদাধার বলিয়া জগদবীজভূত নাম এবং রূপের নিষ্পাদক।।১

ইদং সর্বং যদয়মাত্মা।।২
চিদেকরসো হ্যয়মাত্মা।।৩
অতো হ্যয়মাত্মা।।৪
অনুজ্ঞাতা হ্যয়মাত্মা।।৫

মিথ্যাজ্ঞান বিকল্পিত এই পরিদৃশ্যমান জগৎ চিদেকরস আত্মস্বরূপই অর্থাৎ ব্রহ্ম প্রপঞ্চাকারে প্রতিভাত হইতেছেন। তিনি অনুজ্ঞাতা অর্থাৎ চৈতন্য স্বরূপ, একরস এবং আত্মস্বরূপ।।২,৩,৪,৫

অনুজ্ঞৈকরসো হ্যয়মাত্মা।।৬
অবিকল্পো হ্যয়মাত্মা।।৭
দেহাদেঃ পরতরত্বাদ ব্রহ্মৈব পরমাত্মা।।৮

তিনি তৈজস এবং সূত্রাত্মার ঐক্য জ্ঞান প্রদান করেন বলিয়া অনুজ্ঞা (অনুজ্ঞাতা), তিনি একরস এবং আত্মস্বরূপ। সেই আত্মা বিকল্পরহিত। দেহাদি ব্রহ্মাণ্ড হইতে শ্রেষ্ঠতর বলিয়া তিনি পরমাত্মা এবং বৃহৎ বলিয়া তিনি ব্রহ্মরূপে উক্ত হয়েন।।৬,৭,৮

অখণ্ডৈকরসো হ্যয়মাত্মা।।৯
নির্গুণঃ সাক্ষিভূতো নিষ্ক্রিয়ো নিরবয়ব আত্মা।।১০

সেই আত্মা অখণ্ড এবং একরস। আত্মা সত্বাদিগুণরহিত সর্ব্বান্তর্যামী বলিয়া সকলের সাক্ষী, দেহাদি রহিত বলিয়া নিষ্ক্রিয় এবং নিরবয়ব।।৯,১০

বিরজঃ পর আকাশাদজ আত্মা মহান ধ্রুবঃ।।১১

সেই আত্মা রজঃ আদি গুণরহিত বলিয়া বিরজা অর্থাৎ স্বচ্ছ, নিরবয়ব বলিয়া আকাশ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তিনি অজ এবং অপরিচ্ছিন্ন বলিয়া মহান এবং ধ্রুব।।১১

একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।।১২

সেই এক অদ্বিতীয় দেবতা সকল ভূতে গূঢ়রূপে (অদৃশ্যরূপে) স্থিত আছেন, তিনি সর্ব্বব্যাপী এবং সকল ভূতের অন্তরাত্মা।।১২

নিঃশব্দং পরমং ব্রহ্ম পরমাত্মা সমীর্য্যতে।।১৩

সকলে নিষ্কলে ভাবে সর্ব্বত্রাত্মা ব্যবস্থিতঃ।।১৪

শব্দগুণ আকাশ হইতে বিলক্ষণ বলিয়া তিনি নিঃশব্দ, পরম ব্রহ্ম এবং পরমাত্মা বলিয়া উক্ত হয়েন। নামরূপাদি ষোড়শ কলা যুক্ত এবং কলা রহিত সকল ভাবেতেই সেই আত্মা বিরাজিত আছেন।।১৩,১৪

সর্ব্বদা সর্ব্বকৃৎ সর্ব্বঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।।১৫

অনাদ্যন্তাবভাসাত্মা পরমাত্মেহ বিদ্যতে।।১৬

তিনি অজ্ঞানদৃষ্টিতে সর্ব্বকর্ত্তা বলিয়া দৃষ্ট হয়েন এবং জ্ঞানদৃষ্টিতে তিনি সর্ব্বময় পরমাত্মা বলিয়া কথিত হন। ঐহিক অর্থাৎ সংসার দশাতেও আদি মধ্য এবং অন্তশূন্য প্রকাশ মাত্র একমাত্র পরমাত্মাই বিদ্যমান আছেন।। ১৫,১৬

নিত্যঃ সর্ব্বগতো হ্যাত্মা কূটস্থো দোষবর্জ্জিতঃ।।১৭

তৎপরঃ পরমাত্মা চ শ্রীরামঃ পুরুষোত্তমঃ।।১৮

সর্ব্বকারণকার্য্যাত্মা কার্য্যকারণবর্জ্জিতঃ।।১৯

সর্ব্বাতীতস্বভাবাত্মা নাদান্তর্জ্যোতিরেব সঃ।।২০

সেই আত্মা নিত্য, সর্ব্বগত, কূটস্থ (নির্ব্বিকার) এবং নির্ম্মল। সেই আত্মা পরমাত্মা, শ্রীরাম এবং পুরুষোত্তম বলিয়া উক্ত হয়েন। (স্বাত্মাতিরিক্তাশ্রয়াপহ্নবসিদ্ধশ্রীঃ মুক্তিঃ, শ্রীরূপেণ যো রাজমানো মহীয়তে স শ্রীরামঃ) স্বাতিরিক্ত আশ্রয়রাহিত্য সিদ্ধ মুক্তিকে শ্রী বলে, যিনি সেই মুক্তিস্বরূপা শ্রীরূপেতে বিরাজিত, তাঁহাকে শ্রীরাম বলে)। সেই আত্মা অজ্ঞানদৃষ্টিতে সর্ব্বকার্য্য এবং কারণ রূপে প্রকাশিত হইলেও জ্ঞানদৃষ্টিতে স্বয়ং কার্য্য এবং কারণ রহিত। তিনি পরমার্থদৃষ্টিতে সকলের অতীত, এবং তুর্য্যাত্মক যে অন্তর্জ্যোতি, তাহাই তিনি। তিনি তুরীয়াবস্থারও অতীত।।১৭,১৮,১৯,২০

নির্ব্বিকল্পস্বরূপাত্মা সবিকল্পবিবর্জ্জিতঃ।।২১

সদা সমাধিশূন্যাত্মা আদিমধ্যান্তবর্জ্জিতঃ।।২২

প্রজ্ঞানবাক্যহীনাত্মা অহংব্রহ্মাস্মিবর্জ্জিতঃ।।২৩

তত্ত্বমস্যাদিহীনাত্মা অয়মাত্মেত্যভাবকঃ।।২৪

তিনি সবিকল্প প্রপঞ্চ রহিত বলিয়া নির্ব্বিকল্পস্বরূপ। বাহ্য এবং আভ্যন্তরিক বিক্ষেপরহিত বলিয়া সদা সমাধি শূন্য, তাঁহার আদি, মধ্য কিংবা অন্তও নাই। তিনি বাক্যের অগোচর বলিয়া 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এই বাক্যবোধগম্যরহিত কেবলমাত্র প্রজ্ঞান স্বরূপ। তিনি বাক্যের অতীত বলিয়া 'তত্ত্বমস্যা'দি বাক্যপ্রতিপাদ্য বিহীন এবং 'অয়মাত্মা' ইত্যাদি বাক্যরহিত।।২১,২২,২৩,২৪

ওঁকারবাচ্যহীনাত্মা সর্ব্বাচ্যবিবর্জ্জিতঃ।।২৫

সর্ব্বত্র পূর্ণরূপাত্মা সর্ব্বত্রাত্মাবশেষকঃ।।২৬

শুদ্ধচৈতন্যরূপাত্মা সর্ব্বসিদ্ধিবিবর্জ্জিতঃ।।২৭

আনন্দাত্মা প্রিয়ো হ্যাত্মা মোক্ষাত্মা বন্ধবর্জ্জিতঃ।।২৮

তিনি বাক্যের অতীত বলিয়া ওঁকারবাচ্য বিশ্ববিরাট ঈশাদি ভাব রহিত, তিনি শান্ত এবং শিবস্বরূপ বলিয়া সর্ব্ববাচ্যের অতীত। তিনি সর্ব্বত্র পূর্ণরূপে বিরাজিত এবং সর্ব্বত্র আত্মস্বরূপে নিত্য সিদ্ধ বলিয়া তিনি অণিমাদি সমস্ত সিদ্ধি রহিত। তিনি আনন্দস্বরূপ, প্রিয় এবং বন্ধরহিত মোক্ষস্বরূপ।।২৫,২৬,২৭,২৮

শূন্যাত্মা সূক্ষ্মরূপাত্মা বিশ্বাত্মা বিশ্বহীনকাঃ।।২৯
সত্তামাত্রস্বরূপাত্মা নান্যৎ কিঞ্চিজ্জগদ্ভয়ম।।৩০
অপরিচ্ছিন্নরূপাত্মা অণুস্থূলাদিবর্জ্জিতঃ।।৩১
নামরূপবিহীনাত্মা পরসংবিৎসুখাত্মকঃ।।৩২
সাক্ষ্যসাক্ষিত্বহীনাত্মা কিঞ্চিৎ কিঞ্চিন্ন কিঞ্চন।।৩৩
মুক্তামুক্তস্বরূপাত্মা মুক্তামুক্তবিবর্জ্জিতঃ।।৩৪

স্বাতিরিক্ত প্রপঞ্চ রহিত বলিয়া তিনি শূন্যাত্মা, সর্ব্বব্যাপক বলিয়া তিনি সূক্ষ্মস্বরূপ বিশ্বাত্মা, কিন্তু প্রপঞ্চ রহিত বলিয়া তিনি বিশ্বরহিত। স্বাতিরিক্ত প্রপঞ্চের অভাব বশতঃ তিনি সৎস্বরূপ, তাঁহাতে ভয়হেতু কিছুই নাই। তিনি পরিচ্ছেদ রহিত, অণু এবং স্থূলভাব বর্জ্জিত। তিনি নাম এবং রূপবিহীন পরম জ্ঞান স্বরূপ এবং আনন্দ স্বরূপ। তিনি প্রতিযোগী রহিত নির্ব্বিশেষ বলিয়া সাক্ষী এবং অসাক্ষী এই উভয় ভাবরহিত, সেই ব্রহ্মাতিরিক্ত কোন বস্তু নাই। তিনি পরমার্থদৃষ্টিতে মুক্ত এবং অমুক্তভাব রহিত এবং মুক্ত ও অমুক্ত স্বরূপ অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ।।২৯,৩০,৩১,৩২,৩৩,৩৪

দ্বৈতাদ্বৈতস্বরূপাত্মা দ্বৈতাদ্বৈতাদিবর্জ্জিতঃ।।৩৫
নিষ্কলাত্মা নির্ম্মলাত্মা বুদ্ধ্যাত্মা পুরুষাত্মকঃ।।৩৬
আত্মেতিশব্দহীনো য আত্মশব্দার্থবর্জ্জিতঃ।।৩৭
সচ্চিদানন্দহীনো য এষৈবাত্মা সনাতনঃ।।৩৮
যস্য কিঞ্চিদ্বহির্নাস্তি কিঞ্চিদন্তঃ কিয়ন্ন চ।।৩৯
যস্য লিঙ্গং প্রপঞ্চং বা ব্রহ্মৈবাত্মা ন সংশয়ঃ।।৪০

তিনি পরমার্থদৃষ্টিতে দ্বৈত এবং অদ্বৈত ভাবরহিত, দ্বৈত এবং অদ্বৈত স্বরূপ, তিনি নিষ্কল, নির্ম্মল, বুদ্ধিরও আত্মা এবং পুরাণ পুরুষ স্বরূপ। তিনি পরমার্থ দৃষ্টিতে নির্ব্বিশেষ বলিয়া সচ্চিদানন্দপদবাচ্যরহিত সনাতন আত্মা। যাঁহার বাহ্য ও আভ্যন্তরিক ভাব নাই এবং অজ্ঞানদৃষ্টিতে এই দৃশ্য প্রপঞ্চ যাঁহার লিঙ্গস্বরূপ উক্ত হয়, সেই ব্রহ্মই পরমার্থদৃষ্টিতে জগৎ এবং জীবরূপে বিবর্ত্তিত হয়েন, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।। ৩৫,৩৬,৩৭,৩৮,৩৯,৪০

ইতি পঞ্চদশং প্রকরণং সমাপ্তম।।

—

সার্ধান্তিকসর্বস্বরূপবাক্যানি।।১৬

এই প্রকরণে ব্রহ্মের সর্ব্বস্বরূপতার বাক্য সকল উক্ত হইতেছে।

ওঁকার এবেদং সর্ব্বম।।১

এই পরিদৃশ্যমান ইদংপদবাচ্য অভিধান এবং অভিধেয় রূপ অবিদ্যা এবং তৎকার্য্য সমস্ত প্রপঞ্চই ওঁকার পদবাচ্য পরব্রহ্ম।।১

স এবাধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ স পশ্চাৎ স পুরস্তাৎ
স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ স এবেদং সর্ব্বম।।২

তৎপদবাচ্য সেই ব্রহ্ম অধঃ, উপরি, পশ্চাৎ, পুরোভাগে এবং দক্ষিণ ও উত্তরে সর্ব্বত্র বিরাজিত।।২

অহমেবাধস্তাদহমুপরিষ্টাদহং পশ্চাদহং পুরস্তাদহং
দক্ষিণতোহহমুত্তরতোহ হমেবেদং সর্ব্বম।।৩

অহংপদবাচ্য ব্রহ্ম অধঃ, উপরি, পশ্চাৎ, পুরোভাগ, দক্ষিণ এবং উত্তর সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত। সোহহম শব্দদ্বারা প্রত্যগভিন্ন (জীবাভিন্ন) ব্রহ্মই উক্ত হয়েন।।৩

আত্মৈবাধস্তাদাত্মোপরিষ্টাদাত্মা পশ্চাদাত্মা পুরস্তাদাত্মা
দক্ষিণত আত্মোত্তরত আত্মৈবেদং সর্ব্বম।।৪

সেই আত্মা প্রত্যক পর রূপে অভিন্ন হইয়া অধঃ, উপরি, পশ্চাৎ, পুরোভাগ, দক্ষিণ এবং উত্তর সর্ব্বত্র বিরাজিত আছেন।।৪

আত্মৈব বেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্ব্বম।।৫

এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড অমৃত আত্মস্বরূপ।।৫

এতদ্বহ্মৈতৎ সর্ব্বম।।৬
নারায়ণ এবেদং সর্ব্বম।।৭
সচ্চিদানন্দরূপমিদং সর্ব্বম।।৮
সত্তামাত্রং হীদং সর্ব্বং মৎস্বরূপমেবেদং সর্ব্বম।।৯

পরিদৃশ্যমান সমস্তই ব্রহ্ম। (নরাৎ আবির্ভূতং নারং জগৎ তদপবাদাধারঃ নারায়ণঃ) নারায়ণই এই জগতের আধার স্বরূপ। এই পরিদৃশ্যমান জগৎ সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ব্রহ্মময়। সৎ ব্রহ্মই এই জগৎ রূপে প্রতিভাত হইতেছেন।।৬,৭,৮,৯

স এব সর্ব্বং যদভূতং যচ্চ ভাব্যং সনাতনম।।১০
স্বয়ং ব্রহ্মা স্বয়ং বিষ্ণুঃ স্বয়মিন্দ্রঃ স্বয়ং শিবঃ।।১১

তিনিই সর্ব্বময়, কালত্রয় স্বরূপ এবং সনাতন। তিনি নিজেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র এবং শিব রূপে বিরাজিত আছেন।।১০,১১

স্বয়ং বিশ্বমিদং সর্ব্বং স্বস্মাদন্যন্ন কিংচন।।১২
মরুভূমৌ জলং সর্ব্বং মরুভূমাত্রমেব তৎ।।১৩
জগত্রয়মিদং সর্ব্বং চিন্মাত্রং স্ববিচারতঃ।।১৪
ভববর্জ্জিতচিন্মাত্রং সর্ব্বং চিন্মাত্রমেব হি।।১৫

তিনি স্বয়ং ব্রহ্ম স্বরূপে প্রতিভাত হন, ব্রহ্মাতিরিক্ত অন্য কিছুই নাই। যেরূপ মরুভূমিতে যাবতীয় জল বাস্তব নহে, কেবল মরুভূমি মাত্র, সেইরূপ বিচারদৃষ্টিতে ত্রিজগদাদি সমস্ত প্রপঞ্চ চিন্মাত্র এবং জন্মবর্জ্জিত।। ১২,১৩,১৪,১৫

যৎকিঞ্চিদযন্ন কিঞ্চিচ্চ সর্ব্বং চিন্মাত্রমেব হি।।১৬
অখণ্ডৈকরসং সর্ব্বং যদযচ্চিন্মাত্রমেব হি।।১৭
ভূতং ভব্যং ভবিষ্যঞ্চ সর্ব্বং চিন্মাত্রমেব হি।।১৮
জ্ঞাতা চিন্মাত্ররূপশ্চ সর্ব্বং চিন্মাত্রমেব হি।।১৯

অন্য যাহা কিছু দৃষ্ট হয়, সমস্তই সেই চিন্মাত্রস্বরূপ। সমস্ত জগৎ অখণ্ড এবং একরস ব্রহ্ম। ভূত ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমানরূপ সমস্ত কাল এবং জ্ঞাতৃত্বভাব সমস্তই চিন্মাত্র ব্রহ্ম, কারণ সমস্তই ব্রহ্মময়।।১৬,১৭,১৮,১৯

যচ্চ যাবচ্চ দূরস্থং সর্ব্বং চিন্মাত্রমেব হি।।২০
চিন্মাত্রান্নাস্তি লক্ষ্যঞ্চ সর্ব্বং চিন্মাত্রমেব হি।।২১

যাবতীয় দূরস্থ পদার্থ চিন্ময় ব্রহ্মস্বরূপ। চিন্ময় ব্রহ্মভিন্ন অন্য লক্ষ্য নাই, কারণ সমস্তই ব্রহ্মাত্মক।।২০,২১

আত্মনোহন্যা গতির্নাস্তি সর্ব্বমাত্মময়ং জগৎ।।২২
আত্মনোহন্যতুষং নাস্তি সর্ব্বমাত্মময়ং জগৎ।।২৩

পরমাত্মা ভিন্ন অন্য গতি নাই এবং ব্রহ্মাতিরিক্ত অন্য তুষ্টি নাই, কারণ সমস্ত জগৎ ব্রহ্মময়।।২২,২৩

সর্ব্বমাত্মৈব শুদ্ধাত্মা সর্ব্বং চিন্মাত্রমদ্বয়ম।।২৪
সর্ব্বঞ্চ খল্বিদং ব্রহ্ম নিত্যচিদঘনমক্ষতম।।২৫
সমস্তং খল্বিদং ব্রহ্ম সর্ব্বমাত্মেদমাততম।।২৬

সকল আত্মাই শুদ্ধস্বরূপ, সেই শুদ্ধাত্মা চিন্ময় অদ্বৈত ব্রহ্মই সর্ব্বময়। এই সমস্ত জগৎ নিত্য চিদঘন এবং অক্ষয় ব্রহ্মস্বরূপ। সকলের আত্মা ব্যাপক, ব্রহ্মই সমস্ত ব্যাপিয়া আছেন।।২৪,২৫,২৬

ন ত্বং নাহং ন চান্যং বা সর্ব্বং ব্রহ্মৈব কেবলম।।২৭
ন তদস্তি ন যত্রাহং ন তদস্তি ন তন্ময়ম।।২৮
কিমন্যদভিবাঞ্ছামি সর্ব্বং সচ্চিন্ময়ং ততম।।২৯
ভ্রান্তিরভ্রান্তির্নাস্ত্যেব সর্ব্বং ব্রহ্মৈব কেবলম।।৩০

তৎপদবাচ্য, অহংপদবাচ্য বা অন্য শব্দবাচ্য অন্য কিছুই নাই, সমস্তই ব্রহ্ম। এমন কোন পদার্থ নাই যেখানে আমি নাই, এমন কোন পদার্থ নাই যাহাতে আমি তন্ময় নহি। আমি কিসের বাঞ্ছা করিব, সমস্তই চিন্ময় ব্রহ্মদ্বারা ব্যাপ্ত রহিয়াছে। সমস্তই যখন ব্রহ্ম, তখন ভ্রান্তি এবং অভ্রান্তি কিছুই নাই।।২৭,২৮,২৯,৩০

ন দেহো ন চ কর্ম্মাণি সর্ব্বং ব্রহ্মৈব কেবলম।।৩১
লক্ষণাত্রয়বিজ্ঞানং সর্ব্বং ব্রহ্মৈব কেবলম।।৩২
জগন্নাম্না চিদাভাতি সর্ব্বং ব্রহ্মৈব কেবলম।।৩৩

দেহও নাই, কর্ম্মও নাই, সমস্তই একমাত্র ব্রহ্ম। ত্রিবিধ লক্ষণার বিজ্ঞান স্বরূপ একমাত্র ব্রহ্মই সর্ব্বময়। চিন্ময় ব্রহ্মই জগৎরূপে প্রতিভাত রহিয়াছেন, কারণ সমস্তই ব্রহ্মময়।।৩১,৩২,৩৩

ব্রহ্মমাত্রমিদং সর্ব্বং ব্রহ্মমাত্রমসন্ন হি।।৩৪
ব্রহ্মমাত্রব্রতং সর্ব্বং ব্রহ্মমাত্ররসং সুখম।।৩৫
ব্রহ্মমাত্রং শ্রুতং সর্ব্বং স্বয়ং ব্রহ্মৈব কেবলম।।৩৬
ব্রহ্মৈব সর্ব্বং চিন্মাত্রং ব্রহ্মমাত্রং জগত্ত্রয়ম।।৩৭

এই পরিদৃশ্যমান সমস্ত পদার্থই ব্রহ্ম। ব্রহ্মময় বলিয়া কোন পদার্থ অসৎ নহে। সমস্ত ব্রত, রস, সুখ এবং সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞান ব্রহ্মভিন্ন অন্য কিছুই নহে। সমস্ত চৈতন্য এবং ত্রিজগৎ ব্রহ্মই স্বয়ং।।৩৪,৩৫,৩৬,৩৭

সর্ব্বং প্রশান্তমজমেকমনাদিমধ্যমাভাস্বরং স্বদনমাত্রমচৈত্যচিহ্নম।।৩৮
সর্ব্বং প্রশান্তমিতি শব্দময়ী চ দৃষ্টির্বোধার্থমেব হি মুধৈব তদোমিতীদম।।৩৯

বিকল্পশূন্য, অজ, এক, আদি মধ্য বর্জ্জিত, জ্যোতিঃস্বরূপ, স্বাদ্য স্বাদক ভাবরহিত, আস্বাদনমাত্র জ্ঞান স্বরূপ এবং চির ভ্রান্তি রহিত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের অববোধার্থ যে শব্দময় ওঁকারোপদেশ, তাহাও নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান দানে অসমর্থ, কারণ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম, শব্দের অবাচ্য হয়েন (যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ ইতি শ্রুতেঃ)।

ইতি ষোড়শং প্রকরণং সমাপ্তম।।

—

সার্ধান্তিকব্রহ্মস্বরূপবাক্যানি।।১৭

এই প্রকরণে ব্রহ্মস্বরূপবাক্য সকল উক্ত হইতেছে।

সর্ব্বং হ্যেতদ ব্রহ্ম।।১
পরিদৃশ্যমান সমস্তই ব্রহ্ম।।১

অয়মাত্মা ব্রহ্ম।।২
এই জীবাত্মাই ব্রহ্ম।।২

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।।৩
ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান এবং অনন্ত স্বরূপ।।৩

প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম।।৪
ব্রহ্ম প্রজ্ঞা, প্রতিষ্ঠা (আশ্রয়) এবং প্রজ্ঞান স্বরূপ।।৪

তদেতদ ব্রহ্মাহপূর্ব্ব মনপর মনন্তর মবাহ্যময়মাত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বানুভূঃ।।৫
সেই ব্রহ্ম অপূর্ব্ব (কারণ রহিত), পরভাব শূন্য, এবং অন্তর্বাহ্যরহিত। এই ব্রহ্ম সকলের অনুভূতি স্বরূপ বলিয়া সর্ব্বানুভূঃ।।৫

বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম।।৬
তিনি বিজ্ঞান এবং আনন্দ স্বরূপ।।৬

অজরোহমরোহমৃতোহভয়ো ব্রহ্মাভয়ং বৈ ব্রহ্ম।।৭
তিনি অজর, অমর, অমৃত এবং অভয়স্বরূপ।।৭

সর্ব্বভূতস্থমেকং নারায়ণং কারণপুরুষমকারণং পরং ব্রহ্মোম।।৮
সেই ওঁকারাখ্য পরব্রহ্ম সর্ব্বভূতে স্থিত, এক, নারায়ণ এবং কারণ রহিত পুরুষ স্বরূপ।।৮

স্বয়ংপ্রকাশঃ স্বয়ং ব্রহ্ম।।৯
তিনি স্ব প্রকাশ এবং স্বয়ং ব্রহ্মস্বরূপ।।৯

তদেতদদ্বয়ং স্বয়ং প্রকাশমহানন্দ মাত্মৈবৈতদভয় মমৃত মেতদ ব্রহ্ম।।১০
তিনি অদ্বিতীয়, স্বয়ং প্রকাশ এবং আনন্দস্বরূপ। তিনি অভয় এবং অমৃতস্বরূপ।।১০

সদেব পুরস্তাৎ সিদ্ধং ব্রহ্ম।।১১

সেই ব্রহ্ম সৎস্বরূপ এবং সৃষ্টির পূর্ব্ব হইতে সিদ্ধস্বরূপ বিরাজিত।।১১

আকাশবৎ সূক্ষ্মং কেবলসত্তামাত্রস্বভাবং পরং ব্রহ্ম।।১২
সেই ব্রহ্ম আকাশের ন্যায় সূক্ষ্ম (সর্ব্বব্যাপী), কেবল সৎস্বরূপ এবং পর ব্রহ্মস্বরূপ।।১২

অদ্বিতীয়মখিলোপাধিনির্মুক্তং তৎসকলশত্তুযপবৃংহিত মনাদ্যনন্তং
নিত্যং শিবং শান্তং নির্গুণমিত্যাদিবাচ্য মনির্ব্বাচ্যং চৈতন্যং ব্রহ্ম।।১৩
সেই ব্রহ্ম নিখিল অবিদ্যা জন্য উপাধি রহিত, ষোড়শ কলা যুক্ত শক্তি দ্বারা বর্দ্ধিত, আদ্যন্তরহিত, নিত্য, শান্ত শিবস্বরূপ, নির্গুণ ইত্যাদি শব্দবাচ্য এবং বাক্যাতীত, তিনি চৈতন্য স্বরূপ।।১৩

একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম।।১৪
সেই ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয়।।১৪

সর্ব্বদানবচ্ছিন্নং পরং ব্রহ্ম।।১৫
তিনি সর্ব্বদা দেশকালাদি পরিচ্ছেদ রহিত।।১৫

সচ্চিদানন্দতেজঃকূটরূপং তারকং ব্রহ্ম।।১৬
সেই তারক ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ, তেজ এবং নির্ব্বিকার স্বরূপ।।১৬

তন্নিত্যমুক্তমবিক্রিয়ং সত্যজ্ঞানানন্তানন্দপরিপূর্ণং
সনাতনমেকমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম।।১৭
তিনি নিত্যযুক্ত, অজ, নিষ্ক্রিয়, সত্য, জ্ঞান, অনন্ত, আনন্দ পূর্ণ সনাতন, এক এবং অদ্বিতীয়স্বরূপ।।১৭

চিৎস্বরূপং নিরঞ্জনং পরং ব্রহ্ম।।১৮
তত্ত্বংপদলক্ষ্যং প্রত্যগভিন্নং ব্রহ্ম।।১৯
তিনি চিৎ স্বরূপ, নির্ম্মলস্বভাব এবং পরমস্বরূপ। তিনিই তৎ এবং ত্বং পদের লক্ষ্য এবং জীব হইতে অভিন্ন।।১৮,১৯

অখণ্ডার্থং পরং ব্রহ্ম।।২০
স্বর্বকালাবাধিতং ব্রহ্ম।।২১
সগুণনির্গুণস্বরূপং ব্রহ্ম।।২২
তিনি সর্ব্বকালের বাধা রহিত। তিনি সগুণ, এবং নির্গুণ।।২০,২১,২২

আদিমধ্যান্তশূন্যং ব্রহ্ম।।২৩
মায়াতীতগুণাতীতং ব্রহ্ম।।২৪
তিনি আদি মধ্য এবং অন্ত শূন্য। তিনি মায়াতীত এবং সত্বাদি গুণরহিত।।২৩,২৪

অনন্তমপ্রমেয়াখণ্ডপরিপূর্ণং ব্রহ্ম।।২৫
তিনি অনন্ত, অপ্রমেয়, অখণ্ড এবং পরিপূর্ণ স্বভাব।।২৫

অদ্বিতীয়পরমানন্দনিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তসত্যস্বরূপব্যাপকাভিন্নাপরিচ্ছিন্নং ব্রহ্ম।।২৬

তিনি অদ্বিতীয়, পরমানন্দ স্বরূপ, নিত্য শুদ্ধবুদ্ধ এবং মুক্ত স্বভাব, সত্যস্বরূপ, ব্যাপক, প্রপঞ্চাভিন্ন এবং অপরিচ্ছিন্ন স্বরূপ।।২৬

সচ্চিদানন্দস্বপ্রকাশং ব্রহ্ম।।২৭

মনোবাচামগোচরং ব্রহ্ম।।২৮

দেশতঃ কালতো বস্তুতঃ পরিচ্ছেদরহিতং ব্রহ্ম।।২৯

তিনি সচ্চিদানন্দ, স্বপ্রকাশস্বরূপ তিনি মন এবং বাক্যের অগোচর। তিনি দেশকাল এবং বস্তু হইতে পরিচ্ছেদরহিত।।২৭,২৮,২৯

অখিলপ্রমাণাগোচরং ব্রহ্ম।।৩০

তুরীয়ং নিরাকারমেকং ব্রহ্ম।।৩১

তিনি নিখিল প্রমাণের অগোচর, ওঁকারের চতুর্থ স্থানীয় নিরাকার এবং এক।।৩০,৩১

অদ্বৈতমনির্ব্বাচ্যং ব্রহ্ম।।৩২

শিবং প্রশান্তমমৃতং পরঞ্চ ব্রহ্ম।।৩৩

তিনি অদ্বৈত এবং বাক্যাতীত। তিনি শিব, প্রশান্তস্বভাব, অমৃত এবং পরমাত্মস্বরূপ।।৩২,৩৩

যদেকমক্ষরং নিষ্ক্রিয়ং শিবং সন্মাত্রং পরং ব্রহ্ম।।৩৪

সেই পরব্রহ্ম অক্ষর, নিষ্ক্রিয়, শিব এবং সৎস্বরূপ।।৩৪

অসাবাদিত্যো ব্রহ্ম।।৩৫

ওমিত্যেতদক্ষরং পরং ব্রহ্ম।।৩৬

এই প্রত্যক্ষ সূর্য্যই ব্রহ্ম। ওঁকারই অবিনাশী পর ব্রহ্ম।।৩৫,৩৬

ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদ ব্রহ্ম পশ্চাদব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ।।৩৭

অধশ্চোর্দ্ধঞ্চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম।।৩৮

সেই অমৃতস্বরূপ ব্রহ্ম পুরোভাগে, পশ্চাদভাগে দক্ষিণ এবং উত্তর দিকে স্থিত। সেই ব্রহ্ম অধঃ এবং ঊর্দ্ধদিকে ব্যাপ্ত এই বিশ্ব, বরণীয় ব্রহ্মস্বরূপ হয়েন।।৩৭,৩৮

তদেব নিষ্কলং ব্রহ্ম নির্ব্বিকল্পং নিরঞ্জনম।।৩৯

চৈতন্যমেকং ব্রহ্মাতঃ প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম ময্যপি।।৪০

সেই নিষ্কল, নির্ব্বিকল্প, নিরঞ্জন, চৈতন্য স্বরূপ ব্রহ্মই আমাতে প্রজ্ঞান রূপে বিরাজিত।।৩৯,৪০

ব্রহ্মশব্দেন তদব্রহ্ম স্বপ্রকাশাত্মরূপকম।।৪১

এতদভাববিনির্ম্মুক্তং তদব্রহ্ম ব্রহ্মতৎ পরম।।৪২

ব্রহ্ম শব্দ দ্বারা স্বপ্রকাশ পরমাত্মাই উক্ত হয়েন। এই স্বাতিরিক্ত ভাব রহিত যিনি, তিনিই পরব্রহ্ম অভিহিত হয়েন।।৪১,৪২

চিন্মাত্রাৎ পরমং ব্রহ্ম চিন্মাত্রান্নাস্তি কোঽপি হি।।৪৩
অখণ্ডৈকরসং ব্রহ্ম চিন্মাত্রান্নহি বিদ্যতে।।৪৪
পরম ব্রহ্মই চিন্মাত্রস্বরূপে উক্ত হয়েন, চিন্মাত্র ব্যতিরেকে কিছুই নাই, ব্রহ্ম অখণ্ড এবং একরস, তিনি চিন্মাত্র হইতে অন্য কিছুই নহেন অর্থাৎ চিন্মাত্র স্বরূপ।।৪৩,৪৪

সদোদিতং পরং ব্রহ্ম জ্যোতিষামুদয়োথ যতঃ।।৪৫
যস্মিন প্রলীয়তে শব্দস্তৎ পরং ব্রহ্ম-গীয়তে।।৪৬
যে ব্রহ্ম হইতে সূর্য্যাদি জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ উদয় হয়, তিনি সদাজ্যোতিঃ পরব্রহ্মস্বরূপ। যাঁহাতে শব্দ লয় প্রাপ্ত হয়, তাঁহাকে ব্রহ্ম বলে।।৪৫,৪৬

সর্ব্বশক্তি পরং ব্রহ্ম নিত্যমাপূর্ণমদ্বয়ম।।৪৭
সত্তা সর্ব্বপদার্থানাং গম্যং ব্রহ্মাভিধং পদম।।৪৮
তিনি সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বত্র সম্যক রূপে পরিব্যাপ্ত এবং অদ্বয়। ঘটাদি সকল পদার্থের সত্তাপ্রদ একমাত্র প্রাপ্তব্য ব্রহ্মই হয়েন।।৪৭,৪৮

পরং ব্রহ্ম পরং সত্বং সচ্চিদানন্দলক্ষণম।।৪৯
অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষং নিরঞ্জনম।।৫০
সেই পরব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ লক্ষণযুক্তা পরা সত্তা স্বরূপ। তিনি অবিনাশী, নির্ব্বিশেষ এবং নির্ম্মল।।৪৯,৫০

ব্রহ্মৈবৈক মনাদ্যন্ত মব্ধিবৎ প্রবিজৃম্ভতে।।৫১
ন কিঞ্চিদ্ভাবনাকারং যত্তদব্রহ্ম পরং বিদুঃ।।৫২
তিনি আদি এবং অন্ত বর্জ্জিত, নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের ন্যায় স্বয়ংই প্রকাশিত হন। যাঁহাতে কিঞ্চিৎ ভাবনাকার নাই, তাঁহাকেই পরব্রহ্ম বলিয়া জানিবে।।৫১,৫২

একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।।৫৩
ব্রহ্মৈব বিদ্যতে সাক্ষাদ বস্তুতোঽবস্তুতোঽপি চ।।৫৪
ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয়, ব্রহ্মাতিরিক্ত নানা পদার্থ কিছুই নাই, কারণ সেই ব্রহ্মই নানারূপে প্রতিভাত হন। বস্তুতঃ অর্থাৎ স্বীয় সত্যস্বরূপে এবং অবস্তুতঃ অর্থাৎ প্রপঞ্চরূপে সেই ব্রহ্মই সাক্ষাৎ বিদ্যমান আছেন।। ৫৩,৫৪

তদ্বিদ্যাবিষয়ং ব্রহ্ম সত্যজ্ঞান সুখাদ্বয়ম।।৫৫
শান্তঞ্চ তদতীতং চ পরং ব্রহ্ম তদুচ্যতে।।৫৬
তিনি বিদ্যাবিষয় অর্থাৎ মায়া ও তৎকার্য্যরহিত, তিনি সুখ, সত্য এবং জ্ঞান স্বরূপ ও অদ্বয়। তিনি শান্তস্বরূপ, মায়া রহিত এবং মায়া কার্য্যেরও অতীত, তিনিই পরব্রহ্ম।।৫৫,৫৬

অনুভূতিপরং তস্মাৎ সারং ব্রহ্মেতি কথ্যতে।।৫৭
যদিদং ব্রহ্ম পুচ্ছাখ্যং সত্যজ্ঞানাদ্বয়াত্মকম।।৫৮
তিনি সর্ব্ব অনুভূতির শ্রেষ্ঠ অনুভূতি স্বরূপ এবং সকলের সারভূত নির্ব্বিশেষ স্বরূপ। যিনি পুচ্ছাখ্য অর্থাৎ সর্ব্বকারণ ব্রহ্ম, তিনি সত্য, জ্ঞান এবং অদ্বয়স্বরূপ।।৫৭,৫৮

সদ্রূপং পরমং ব্রহ্ম ত্রিপরিচ্ছেদবর্জ্জিতম।।৫৯

তদব্রহ্মানন্দমদ্বন্দ্বং নির্গুণং সত্যচিদঘনম।।৬০

সৎস্বরূপ পরব্রহ্ম ভূত ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান কালত্রয়ের অতীত, আনন্দ স্বরূপ, দ্বন্দ্বরহিত, নির্গুণ, সত্য এবং চিদঘন স্বরূপ।।৫৯,৬০

সর্ব্বাধিষ্ঠানমদ্বন্দ্বং পরং ব্রহ্ম সনাতম।।৬১

প্রজ্ঞানমেব তদব্রহ্ম সত্যপ্রজ্ঞানলক্ষণম।।৬২

তিনি সকল পদার্থের আধার, দ্বন্দ্বরহিত, পরব্রহ্ম এবং সনাতন স্বরূপ। তিনি সত্য প্রজ্ঞান লক্ষণযুক্ত প্রজ্ঞান স্বরূপ।।৬১,৬২

অস্তীত্যুক্তে জগৎ সর্ব্বং সদ্রূপং ব্রহ্ম তদ্ভবেৎ।।৬৩

ভাতীত্যুক্তে জগৎসর্ব্বং ভানং ব্রহ্মৈব কেবলম।।৬৪

'আছে' এই কথা বলিলেই সৎস্বরূপ ব্রহ্ম সমস্ত জগৎ হইয়া যান। 'প্রকাশ পাইতেছে' এ কথায় কেবল ব্রহ্মাই জগৎ স্বরূপে প্রতিভাত হন।।৬৩,৬৪

ব্রহ্ম মাত্রং চিদাকাশং সচ্চিদানন্দমদ্বয়ম।।৬৫

ব্রহ্মণোহন্যতরন্নাস্তি ব্রহ্মণোহন্যজ্জগন্ন চ।।৬৬

ব্রহ্মণোহন্যদহং নাস্তি ব্রহ্মণোহন্যৎ ফলং নহি।।৬৭

ব্রহ্মণোহন্যত্তৃণং নাস্তি ব্রহ্মণোহন্যৎ পদং নহি।।৬৮

সমস্তই ব্রহ্মমাত্র চিদাকাশপূর্ণ এবং সচ্চিদানন্দলক্ষণ অদ্বয় স্বরূপ। ব্রহ্মাতিরিক্ত কিছুই নাই, তদতিরিক্ত জগৎ নাই। ব্রহ্মভিন্ন অস্মৎপদবাচ্য অন্য কিছুই নাই, ব্রহ্মাতিরিক্ত অন্য প্রাপ্তব্য ফলও নাই। ব্রহ্মাতিরিক্ত কোন তৃণ নাই এবং তদতিরিক্ত অন্য পদ (স্থান)ও নাই।।৬৫,৬৬,৬৭,৬৮

ব্রহ্মণোহন্যদগুরুর্নাস্তি ব্রহ্মণোহন্যদসদ্বপুঃ।।৬৯

নিত্যানন্দময়ং ব্রহ্ম কেবলং সর্ব্বদা স্বয়ম।।৭০

বীজং মায়াবিনির্মুক্তং পরং ব্রহ্মেতি কথ্যতে।।৭১

মদ্রুপমদ্বয়ং ব্রহ্ম আদিমধ্যান্তবর্জ্জিতম।।৭২

ব্রহ্মাতিরিক্ত অন্য গুরু নাই এবং ব্রহ্মাতিরিক্ত কোন (অসদ্বপু) নিরাকারও নাই। ব্রহ্ম সদাকালে স্বয়ং নিত্যানন্দ স্বরূপ। মায়া রহিত সমস্ত চৈতন্যের বীজ স্বরূপ পরব্রহ্মাই কীর্ত্তিত হয়েন। তিনি অস্মৎপ্রত্যয়গোচর, অদ্বয়, এবং আদি মধ্য ও অন্ত রহিত।।৬৯,৭০,৭১,৭২

সর্বত্রাবস্থিতং শান্তং চিদ ব্রহ্মেত্যনুভূয়তে।।৭৩

সিদ্ধান্তোহধ্যাত্মশাস্ত্রাণাং সর্ব্বাপহ্নব এবহিব।।৭৪

নাবিদ্যাস্তীহ নো মায়া শান্তং ব্রহ্মেদমক্লমম।।৭৫

সর্ব্বব্যাপী, প্রপঞ্চোপশম, চিদব্রহ্মই অনুভূত হয়েন। মোক্ষশাস্ত্রের এই সিদ্ধান্ত যে, সেই ব্রহ্ম সর্ব্বাপহ্নবসিদ্ধ অর্থাৎ ব্রহ্মাতিরিক্ত সমস্ত বস্তুই তাঁহাতে লয় প্রাপ্ত হয় এবং তিনিই একমাত্র অবশিষ্ট থাকেন। তাঁহাতে অবিদ্যা নাই, মায়া নাই। তিনি মায়া রহিত এবং শান্ত স্বরূপ, ব্রহ্মাতিরিক্ত কারণীভূত মায়া এবং তৎকার্য্যভূত গ্লানি রহিত বলিয়া তিনি অক্লম।।৭৩,৭৪,৭৫

স্বাত্মন্যারোপিতাশেষভাসবস্তুনিরাসতঃ।।৭৬

স্বয়মেব পরং ব্রহ্ম পূর্ণমদ্বয়মক্রিয়ম।।৭৭

নিজেতে আরোপিত অশেষ আভাস যুক্ত বস্তুতে মিথ্যা জ্ঞানের নিরাস হইলে স্বয়ং, পূর্ণ, অদ্বয়, অক্রিয় স্বরূপ প্রকাশ পায়।।৭৬,৭৭

রাম এব পরং ব্রহ্ম রাম এব পরং তপঃ।।৭৮

রাম এব পরং তত্ত্বং শ্রীরামো ব্রহ্ম তারকম।।৭৯

(নির্ব্বিশেষতয়া রাজতে মহীয়তে ইতি রামঃ) নির্ব্বিশেষ রূপে যিনি বিরাজিত আছেন, তিনি রামপদবাচ্য। সেই রাম অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ পরব্রহ্মাই পরমতত্ব, তিনিই পরম তপ এবং তিনিই অবিদ্যা হইতে পার করেন বলিয়া তারকব্রহ্মস্বরূপ।।৭৮,৭৯

চিদ্রুপমাত্রং ব্রহ্মৈব সচ্চিদানন্দমদ্বয়ম।।৮০

ঋতং সত্যং পরং ব্রহ্ম সর্বসংসারভেষজম।।৮১

চিৎস্বরূপ ব্রহ্মাই সচ্চিদানন্দ এবং অদ্বয়স্বরূপ। তিনি ব্যবহারিক এবং পারমার্থিক সত্যস্বরূপ। তিনিই ভবরোগ নাশের একমাত্র ঔষধ।।৮০,৮১

ব্রহ্ম চিদব্রহ্ম ভুবনং ব্রহ্ম ভূতপরম্পরা।।৮২

ব্রহ্মাহং ব্রহ্মচিচ্ছত্রুর্ব্রহ্ম চিন্মিত্রবান্ধবা।।৮৩

ব্রহ্মরূপতয়া ব্রহ্ম কেবলং প্রতিভাসতে।।৮৪

জগদ্রুপতয়াপ্যেতদ ব্রহ্মৈব প্রতিভাসতে।।৮৫

ব্রহ্মাই চিৎস্বরূপ, তিনিই ভুবনস্বরূপ, তিনিই ভূতপরম্পরা। ব্রহ্মাই আমি, ব্রহ্মচৈতন্যই শত্রুরূপে বিরাজিত, ব্রহ্মাই মিত্র এবং বান্ধব। ব্রহ্মাই ব্রহ্মস্বরূপে প্রতিভাসিত হন। তিনিই জগৎ রূপে প্রকাশিত হন।। ৮২,৮৩,৯৪,৮৫

বিদ্যাবিদ্যাদিভেদেন ভাবাভাবাদিভেদতঃ।।৮৬

গুরুশিষ্যাদিভেদেন ব্রহ্মৈব প্রতিভাসতে।।৮৭

ইদং ব্রহ্ম পরং ব্রহ্ম সত্যং ব্রহ্ম প্রভুর্হি সঃ।।৮৮

কালো ব্রহ্ম কলা ব্রহ্ম সুখং ব্রহ্ম স্বয়ংপ্রভম।।৮৯

তিনিই বিদ্যা এবং অবিদ্যারূপে, ভাব এবং অভাব রূপে এবং গুরু শিষ্যাদি ভেদেতে স্বয়ং প্রকাশিত হন। তিনি পরব্রহ্ম, সত্যস্বরূপ এবং সকলের প্রভু। তিনিই কাল, তিনিই ষোড়শ কলা, তিনিই সুখ এবং স্বয়ং জ্যোতিস্বরূপ।।৮৬,৮৭,৮৮,৮৯

দোষো ব্রহ্ম গুণো ব্রহ্ম দমঃ শান্তং বিভুঃ প্রভুঃ।।৯০

লোকো ব্রহ্ম গুরুর্ব্রহ্ম শিষ্যো ব্রহ্ম সদাশিবঃ।।৯১

পূর্ব্বং ব্রহ্ম পরং ব্রহ্ম শুদ্ধং ব্রহ্ম শুভাশুভম।।৯২

জীব এব সদা ব্রহ্ম স্বয়ং ব্রহ্ম সনাতনম।।৯৩

সেই ব্রহ্মাই দোষ, গুণ, দম, শম, বিভু এবং সকলের প্রভু স্বরূপ। সমস্ত লোক ব্রহ্ম এবং গুরু ও শিষ্য সেই সদাশিব ব্রহ্মাই। ব্রহ্ম সকলের পূর্ব্ব অর্থাৎ আদি এবং তিনি পর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ। শুদ্ধস্বরূপ তিনিই শুভ

এবং অশুভ। জীবই স্বয়ং ব্রহ্মস্বরূপ এবং সনাতন।।৯০,৯১,৯২,৯৩

ইতি সপ্তদশং প্রকরণং সমাপ্তম।।

—

সার্ধান্তিকাবশিষ্টবাক্যানি।।১৮

এই প্রকরণে ব্রহ্মের অবশিষ্ট স্বরূপ বাক্য সকল উক্ত হইতেছে।

সর্ব্ববিশেষং নেতি নেতীতি বিহায় যদবশিষ্যতে তদদ্বয়ং ব্রহ্ম।।১

নিজ অজ্ঞানবিকল্পিত সমস্ত বিশেষ ভাব 'নেতিনেতি' অর্থাৎ ইহা ব্রহ্ম নহে ইহা ব্রহ্ম নহে এই নিষেধ বাক্য দ্বারা ত্যাগ করিয়া যাহা অবশিষ্ট নির্ব্বিশেষ ভাব, তাহাই অদ্বয় ব্রহ্মস্বরূপ।।১

জীবভাবজগদ্ভাববাধে প্রত্যগভিন্নং ব্রহ্মৈবাবশিষ্যতে।।২

নিজেতে সমারোপিত স্বাতিরিক্ত জীব এবং জগদ্ভাব 'ব্রহ্মাতিরিক্ত কিছুই নাই' এই জ্ঞান দ্বারা যখন বাধিত হয়, তখন জীবাভিন্ন ব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকেন।।২

পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।।৩
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।।৪

(অদঃ) যে সকল পদার্থ ইন্দ্রিয়ের অগোচর অর্থাৎ সূক্ষ্ম তাহা ব্রহ্ম দ্বারা ব্যাপ্ত অর্থাৎ পূর্ণ, (ইদং) যে সকল পদার্থ ইন্দ্রিয় গোচর অর্থাৎ প্রত্যক্ষ তাহাও ব্রহ্ম দ্বারা পূর্ণ এবং এই সমস্ত জগৎই ব্রহ্ম হইতে অভিব্যক্ত হইয়াছে ও সেই পূর্ণস্বভাব ব্রহ্মের পূর্ণতা জগৎ ব্যাপ্ত হইলেও তাঁহার পূর্ণতা অবশিষ্ট থাকে অর্থাৎ তাঁহার পূর্ণতার কখনও হানি হয় না।।৩,৪

কার্য্যোপাধিরয়ং জীবঃ কারণোপাধিরীশ্বরঃ।।৫
কার্য্যকারণতাং হিত্বা পূর্ণবোধোহবশিষ্যতে।।৬

অবিদ্যাকার্য্য অন্তঃকরণোপাধিযুক্তকে জীব এবং মূলাবিদ্যারূপ কারণোপাধিযুক্তকে ঈশ্বর বলে। নিজ অজ্ঞানকল্পিত কার্য্যকারণরূপ উপাধির অপহ্নব হইলে পূর্ণবোধস্বরূপ পরমাত্মাই অবশিষ্ট থাকেন।।৫,৬

ততঃ স্তিমিতগম্ভীরং ন তেজো ন তমস্ততম।।৭
অনাখ্যমনভিব্যক্তং সৎ কিঞ্চিদবশিষ্যতে।।৮

ব্রহ্ম বিশেষণরহিত এবং ভূমাস্বরূপ বলিয়া স্থির সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর, ভৌতিক তেজ বা তমোগুণও নহেন। তিনি মায়ারহিত বলিয়া আখ্যা এবং অভিব্যক্তিরহিত সৎস্বরূপে অবশিষ্ট থাকেন।।৭,৮

সঙ্কল্পমনসী ভিন্নে ন কদাচন কেনচিৎ।।৯
সংকল্পজাতে গলিতে স্বরূপমবশিষ্যতে।।১০

বৃত্তি এবং বৃত্তিমানের অভেদ হেতু সংকল্প এবং মনের কদাপি কোন প্রকারে ভেদ হইতে পারে না। 'ব্রহ্মাতিরিক্ত কাম সংকল্পাদি বৃত্তি নাই' এই জ্ঞান দ্বারা যখন উক্ত মানসিক সংকল্প ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তখন স্বস্বরূপমাত্র ব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকেন।।৯,১০

মহাপ্রলয়সংপত্তৌ হ্যসত্তাং সমুপাগতে।।১১

অশেষদৃশ্যে স্বর্গাদৌ শান্তমেবাবশিষ্যতে।।১২

মহাপ্রলয় সময়ে যখন অশেষ দৃশ্য সৃষ্টির নাশ হয় তখন প্রপঞ্চরহিত শান্তস্বরূপ একমাত্র ব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকেন।।১১,১২

খেদোল্লাসবিলাসেষু স্বাত্মাকর্তৃতয়ানয়া।।১৩
স্বসংকল্পে ক্ষয়ং যাতে সমতৈবাবশিষ্যতে।।১৪

অজ্ঞান জন্য নিজ কর্তৃত্বাভিমান হেতু সুখদুঃখের খেলায় যখন 'ব্রহ্মাতিরিক্ত কিছুই নাই' এই সমজ্ঞান দ্বারা সংকল্প ক্ষয় হয়, তখন সমস্বরূপ ব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকেন।।১৩,১৪

সমতা সর্ব্বভাবেষু যাসৌ সত্যপরা স্থিতিঃ।।১৫
পরমামৃতনাম্নী সা সমতৈবাবশিষ্যতে।।১৬

সমস্ত ভাবেতেই সত্যপরা স্থিতি অর্থাৎ ব্রাহ্মী স্থিতি (স্বাতিরিক্ত বিষমতা গ্রাস) কে সমতা বলে। যাহা পরমা এবং অমৃত রূপিণী (বিদেহ কৈবল্য রূপিণী) সেই সমতা অর্থাৎ ব্রহ্মরূপতাই অবশিষ্ট থাকেন।।১৫,১৬

কালত্রয়মুপেক্ষিত্বা হীনায়াশ্চৈত্যবন্ধনৈঃ।।১৭
চিতশ্চৈত্যমুপেক্ষিত্র্যাঃ সমতৈবাবশিষ্যতে।।১৮

নিজ অজ্ঞানবিকল্পিত ভূত ভৌতিক সর্ব্বভাবেতে বিষমভাব দৃষ্ট হইলেও যখন ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা সমতা (ব্রহ্মরূপতা) উৎপন্ন হয়, তখন 'ব্রহ্মাতিরিক্ত ভূতাদি কালত্রয় নাই' এই জ্ঞান দ্বারা কালত্রয় উপেক্ষা করিয়া এবং চিত্তোত্থ বন্ধন রহিত হইয়াও চিত্ত এবং চৈত্য বর্জ্জিত হইয়া নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মরূপতারূপ সমতা (ব্রহ্মভাব) অবশিষ্ট থাকেন।।১৭,১৮

সা হি বাচামগম্যত্বাদসত্তামিব শাশ্বতীম।।১৯
নৈরাত্ম্যসিদ্ধান্তদশামুপয়াতেহবশিষ্যতে।।২০

সেই সমতা বাক্যের অতীত এবং নির্ব্বিশেষহেতু স্বাতিরিক্ত অসত্তারূপিণী। পারমার্থিক জ্ঞানে নিজ অজ্ঞান কল্পিত জীব এবং জগৎভাব যখন বিলীন হয় উহাকে নৈরাত্ম্য সিদ্ধান্ত দশা বলে। সেই পারমার্থিক অবস্থার একমাত্র সমতা স্বরূপ চিন্মাত্রই অবশিষ্ট থাকেন।।১৯,২০

যাবদবন্মুশ্রেষ্ঠ স্বয়ং সংত্যজতেহখিলম।।২১
তাবত্তাবৎ পরালোকঃ পরমাত্মৈব শিষ্যতে।।২২

হে মুনিশ্রেষ্ঠ! নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের আবরণ স্বরূপ ভেদজ্ঞান যেরূপ যেরূপ মনুষ্য ত্যাগ করে, সেইরূপ সেইরূপ 'পরামাত্মাই আমি' এই পরা আলোকস্বরূপ ব্রহ্ম ভাবেতে অবস্থান করে।।২১,২২

অভ্যাসেন পরিস্পন্দে প্রাণানাং ক্ষয়মাগতে।।২৩
মনঃ প্রশমমায়াতি নির্ব্বাণমবশিষ্যতে।।২৪

বেদান্ত শ্রবণসহকৃত যমাদি অষ্টাঙ্গ যোগানুষ্ঠান দ্বারা প্রাণাদির বৃত্তিজন্য বিক্ষেপের নাশ হইলে মনেরও নাশ হয়, তখন নির্ব্বাণ অর্থাৎ মুক্তি অবশিষ্ট থাকেন।।২৩,২৪

জ্ঞেয়বস্তুপরিত্যাগে বিলয়ং যাতি মানসম।।২৫
মানসে বিলয়ে যাতে কৈবল্যমবশিষ্যতে।।২৬

নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবিৎ যখন ঘটাদি সাধারণ জ্ঞেয় পদার্থ সকল 'নেতি ' অর্থাৎ ইহা ব্রহ্ম নহে এই নিষেধমুখিজ্ঞান দ্বারা পরিত্যাগ করেন তখন মনের জ্ঞেয় না থাকায় নিরলম্বনহেতু মনেরও লয় হয় এবং মনোলয় হইলে কৈবল্য অর্থাৎ মুক্তিই অবশিষ্ট থাকেন।।২৫,২৬

বতো বাচো নিবর্ত্তন্তে বিকল্পকলনান্বিতঃ।।২৭

বিকল্পসংক্ষয়াজ্জন্তোঃ পদং তদবশিষ্যতে।।২৮

যখন নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মভাব হইতে ঘটপটাদি নানাবিধ বিকল্পকলনান্বিত বাক্য সকল নিবর্ত্তিত হয়, তৎকালে জীবের চিত্তজাত নানাবিধ মিথ্যাজ্ঞানেরও সংক্ষয় হয়, তৎকালে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম পদই অবশিষ্ট থাকেন।। ২৭,২৮

চিদ ব্যোমৈব কিলাস্তীহ পরাপরবিবর্জ্জিতম।।২৯

সর্ব্বত্রাসংভবচ্চৈত্যং যৎ কল্পান্তেহবশিষ্যতে।।৩০

অধুনা এবং পূর্ব্বকালে পর এবং অপর ভাব (পর শিব এবং অপর জীব) বর্জ্জিত, ব্রহ্মাতিরিক্ত চৈত্যভাব রহিত এবং আকাশবৎ ব্যাপক চিদাকাশই কল্পের শেষে অবশিষ্ট থাকেন।।২৯,৩০

পঞ্চরূপপরিত্যাগাদর্থরূপপ্রহাণতঃ।।৩১

অধিষ্ঠানং পরং তত্বমেকং সচ্ছিষ্যতে মহৎ।।৩২

নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মাতিরিক্ত কোন পদার্থই নাই, এই জ্ঞানদ্বারা ব্রহ্মের পঞ্চরূপ (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর, সদাশিব) পরিত্যাগ করিয়া এবং ভূত ভৌতিক রূপ অর্থ সকল ত্যাগ করিয়া সকল প্রপঞ্চের অধিষ্ঠান, মহৎ পরতত্ব স্বরূপ, এবং সৎস্বরূপ ব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকেন।।৩১,৩২

সর্ব্ববেদান্তসিদ্ধান্তসারং বচিন যথার্থতঃ।।৩৩

স্বয়ং মৃত্বা স্বয়ং ভূত্বা স্বয়মেবাবশিষ্যতে।।৩৪

হে শিষ্য! সর্ব্ববেদান্তসিদ্ধান্তসার বাক্য আমি (গুরু) যথার্থ বলিতেছিঃ—ব্রহ্মই স্বয়ং মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়া এবং স্বয়ং জন্ম গ্রহণ করিয়া নিজেই অবশিষ্ট থাকেন, কারণ ব্রহ্মাতিরিক্ত কিছুই নাই।।৩৩,৩৪

অশব্দমস্পর্শ মরূপমব্যয়ং তথাহরসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।।৩৫

অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং তদেব শিষ্যত্যমলং নিরাময়ম।।৩৬

সেই ব্রহ্ম সমস্ত বিশেষণ রহিত বলিয়া অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয়, অরস, নিত্য অগন্ধ, আদি অন্তরহিত, মহৎ তত্ব হইতেও শ্রেষ্ঠ, ধ্রুব, অমল এবং নিরাময় নির্ব্বিশেষরূপেতে নিজেই অবশিষ্ট থাকেন।। ৩৫,৩৬

ইতি অষ্টাদশং প্রকরণং সমাপ্তম।

—

সার্ধান্তিকফলবাক্যানি।।১৯

এই প্রকরণে ব্রহ্মজ্ঞানের ফলস্বরূপ (ব্রহ্মরূপতা) বাক্য সকল উক্ত হইতেছে।।

স যো হ বৈ তৎ পরমম।।১
যিনি সকলের পর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, তিনিই ব্রহ্ম।।১

ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি।।২
ব্রহ্মবেত্তা ব্রহ্মই হয়েন।।২

ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম।।৩
ব্রহ্মসংস্থোহমৃতত্বমেতি।।৪
ব্রহ্মজ্ঞ এবং ব্রহ্মসংস্থ পরিব্রাট ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা সেই পরব্রহ্ম হয়েন এবং অমৃত হয়েন অর্থাৎ মুক্তিলাভ করেন।।৩,৪

তরতি শোকমাত্মবিৎ।।৫
য এবং বেদাহং ব্রহ্মাস্মীতি স ইদং সর্ব্বং ভবতি।।৬
আত্মজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি শোকযুক্ত হয়েন না। 'আমিই ব্রহ্ম' এই জ্ঞান যাহার হইয়াছে, তিনি সর্ব্বময় (ব্রহ্মময়)।।৫,৬

স এষ বিসুকৃতো বিদুষ্কৃতো ব্রহ্মবিদ বিদ্বান ব্রহ্মৈবাভি প্রৈতি।।৭
সেই ব্রহ্মবেত্তা পুরুষ সুকৃতি এবং দুষ্কৃতি রহিত হইয়া ব্রহ্মকেই লাভ করেন।।৭

য এবং নির্বীজং বেদ নির্বীজ এব স ভবতি তদ্বহ্মৈবাহ
মস্মীতি ব্রহ্মপ্রণবমনুস্মরণ ভ্রমর-কীটন্যায়েন শরীরত্রয়মুৎসৃজ্য
সংন্যাসেনৈব দেহত্যাগং করোতি স কৃতকৃত্যো ভবতি।।৮
যে জ্ঞানী পুরুষ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে জানিতে পারেন, তিনি নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই হয়েন। 'আমি সেই ব্রহ্ম' এইরূপ জ্ঞানযুক্ত হইয়া ব্রহ্মস্বরূপ ওঁকারের ধ্যান করত ভ্রমর কীট ন্যায় যুক্তি দ্বারা স্থুলসূক্ষ্ম কারণ শরীর পরিত্যাগ করিয়া যিনি ব্রহ্মাতিরিক্ত সমস্ত ত্যাগ করত দেহাভিমান পরিত্যাগ করেন, তিনি কৃতকৃত্য অর্থাৎ মুক্ত হয়েন।।৮
তমেবং জ্ঞাত্বা বিদ্বান মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে।।৯
তদেবং বিদ্বাংস ইহৈবামৃতা ভবন্তি।।১০
বিদ্বান ব্যক্তি সেই ব্রহ্মকে জানিয়া মৃত্যুমুখ হইতে মুক্ত হন, এমন কি জীবিতাবস্থাতেই মুক্ত হইতে পারেন।।৯,১০

অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচায্য তন্মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে।।১১

আদি এবং অন্তরহিত মহৎতত্ত্বেরও শ্রেষ্ঠ এবং ধ্রুব স্বরূপ ব্রহ্মকে জানিয়া ব্রহ্মবিৎ মৃত্যুমুখ হইতে মুক্ত হন।।১১

যজজ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্তুরমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি।।১২

সেই ব্রহ্মকে জানিয়া জীব মৃত্যু হইতে মুক্ত হইয়া অমৃতত্ব অর্থাৎ মুক্তিপদ লাভ করেন।।১২

যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম।।১৩
তদা বিদ্বান পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি।।১৪

যখন তত্বজ্ঞানী জ্যোতির্ম্ময় জগৎকর্ত্তা ঈশ এবং পুরুষপদবাচ্য এবং ব্রহ্মাদিরও কারণকে জ্ঞান দৃষ্টিতে দর্শন করেন, তখন পুণ্যপাপরহিত হইয়া নির্ম্মল স্বরূপে পরম সম যে ভাব (ব্রহ্মভাব) তাহা প্রাপ্ত হন অর্থাৎ মুক্ত হন।।১৩,১৪

এতদযো বেদ নিহিতং গুহায়াং সোহবিদ্যাগ্রন্থিং বিকিরতীহ সোম্য।।১৫

হে সৌম্য! হৃদয়গুহাস্থিত ব্রহ্মকে যে জানিতে পারে, তাহার অবিদ্যাগ্রন্থির ছেদন হয়।।১৫

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্চিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।।১৬
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন দৃষ্টে পরাবরে।।১৭

সেই সর্ব্বভাবময় ব্রহ্ম দর্শন হইলে হৃদয়ের অবিদ্যাগ্রন্থিচ্ছিন্ন হয়, সমস্ত সংশয়ের নাশ হয় এবং সমস্ত কর্ম্মেরও ক্ষয় হয়।।১৬,১৭

যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেহস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।।১৮
তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ পরাৎ পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম।।১৯

যেরূপ নদী সকল নিজ নিজ নাম এবং রূপ ত্যাগ করিয়া সমুদ্রে মিলিত হয়, সেই প্রকার ব্রহ্মবিৎ অজ্ঞানবিকল্পিত নাম এবং রূপ-বিনির্ম্মুক্ত হইয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরম পুরুষ দিব্যস্বরূপ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন।।১৮,১৯

জ্ঞাত্বা তং মৃত্যুমত্যেতি নান্যঃ পন্থা বিমুক্তয়ে।।২০
তদ্বহ্মাহমিতি জ্ঞাত্বা ব্রহ্ম সম্পদ্যতে ধ্রুবম।।২১

সেই ব্রহ্মকে জানিয়াই জীব মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারে। সেই মুক্তির এতদ্ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই। 'ব্রহ্মই আমি' ইহা বিদিত হইয়া বিদ্বান নিশ্চয়ই ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়।।২০,২১

যত্র যত্র মৃতো জ্ঞানী পরমাক্ষরবিৎ সদা।।২২
পরব্রহ্মণি লীয়তে ন তস্যোৎক্রান্তিরিষ্যতে।।২৩

পরম অক্ষরস্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞানী যে সময়ে দেহত্যাগের ইচ্ছা করেন, তখন তিনি পরব্রহ্মেতেই লয় প্রাপ্ত হন অর্থাৎ ইচ্ছামৃত্যু হয়েন। তাঁহার ব্রহ্মলাভ ব্যতিরেকে অন্য মরণ নাই।।২২,২৩

যদযৎ স্বাভিমতং বস্তু তত্যজন মোক্ষমশ্নুতে।।২৪

ব্রহ্মাতিরিক্ত অন্য অভিমত বস্তু ত্যাগ করিয়া মোক্ষ লাভ করিবে।।২৪

অসংকল্পনশস্ত্রেণ ছিন্নং চিত্তমিদং যদা।।২৫

সর্ব্বং সর্ব্বগতং শান্তং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা।।২৬

যখন সংকল্পরাহিত্যরূপ শস্ত্র দ্বারা ব্রহ্মবেত্তার চিত্ত বিনষ্ট হয়, তখন সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বাত্মক শান্তস্বরূপ ব্রহ্মকে তিনি প্রাপ্ত হন।।২৫,২৬

প্রিয়েষু স্বেষু সুকৃতমপ্রিয়েষু চ দুষ্কৃতম।।২৭
বিসৃজ্য ধ্যানযোগেন ব্রহ্মাপ্যেতি সনাতনম।।২৮

ধ্যানযোগেতে প্রিয়াপ্রিয় জন্য সুকৃত দুষ্কৃত পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানী সনাতন ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হন।।২৭,২৮

ঘটাকাশমিবাত্মানং বিলয়ং বেত্তি তত্ত্বতঃ।।২৯
স গচ্ছতি নিরালম্বং জ্ঞানালোকং সনাতনম।।৩০

ঘটাকাশের ন্যায় যিনি আত্মবিলয় (উপাধিনাশ) তত্ত্বজ্ঞানেতে জ্ঞাত হয়েন, তিনি নিরালম্ব সনাতন জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন।।২৯,৩০

তৃণাগ্রেষ্বম্বরে ভানৌ নরনাগামরেষু চ।।৩১
যস্তিষ্ঠতি তদেবাহমিতি মত্বা ন শোচতি।।৩২

'তৃণাগ্রে, আকাশে, সূর্য্যে, মনুষ্য সর্প এবং অমরগণেতে যিনি (ব্রহ্ম) সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছেন, সেই ব্রহ্মই আমি' এইরূপ যে ব্রহ্মবিৎ মনন করেন, তিনি শোকরহিত হয়েন।।৩১,৩২

সর্ব্বসাক্ষিণামাত্মানং বর্ণাশ্রমবিবর্জ্জিতম।।৩৩
ব্রহ্মরূপতয়া পশ্যন ব্রহ্মৈব ভবতি স্বয়ম।।৩৪

ব্রহ্মবেত্তা বর্ণাশ্রমরহিত সকলের সাক্ষী স্বরূপ পরমাত্মাকে ব্রহ্মরূপে দর্শন করিয়া নিজেই ব্রহ্ম হয়েন।। ৩৩,৩৪

তদ্ব্রহ্মানন্দমদ্বন্দ্বং নির্গুণং সত্যচিদঘনম।।৩৫
বিদিত্বা স্বাত্মনো রূপং ন বিভেতি কুতশ্চন।।৩৬

সেই ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ, দ্বন্দ্বরহিত, নির্গুণ এবং চিদঘনস্বরূপ! নিজ ব্রহ্মস্বরূপের যিনি জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, সেই ব্রহ্মবিৎ পুরুষের কাহা হইতেও ভয় উৎপন্ন হয় না।।৩৫,৩৬

বাসনাং সংপরিত্যজ্য ময়ি চিন্মাত্রবিগ্রহে।।৩৭
যস্তিষ্ঠতি গতস্নেহঃ সোহহং সচ্চিৎসুখাত্মকঃ।।৩৮

বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক চিন্মাত্র স্বরূপ (আমাতে) অস্মৎপদবাচ্য ব্রহ্মেতে যে ব্যক্তি বিগতস্নেহ হইয়া অবস্থান করেন তিনি সোহহংপদবাচ্য সচ্চিৎ এবং সুখাত্মক ব্রহ্ম স্বরূপ।।৩৭,৩৮

দর্শনাদর্শনে হিত্বা স্বয়ং কেবলরূপতঃ।।৩৯
য আস্তে কপিশার্দ্দূল ব্রহ্ম ন ব্রহ্মবিৎ স্বয়ম।।৪০

হে কপিশ্রেষ্ঠ! যিনি দর্শন এবং অদর্শনভাব (নিজেকে জীবভাবে দর্শন এবং ব্রহ্মরূপে অদর্শন) পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ং নিজ শুদ্ধ স্বরূপে স্থিত হয়েন, তাঁহাকে ব্রহ্ম বলে, তিনি ব্রহ্মবিৎ পদবাচ্য নহেন।।৩৯,৪০

ইতি একোনবিংশং প্রকরণং সমাপ্তম।।

সার্ধান্তিকবিদেহমুক্তিবাক্যানি।।২০

এই প্রকরণে ব্রহ্মমাত্রাবস্থান লক্ষণ বিদেহমুক্তির লক্ষণ সকল উক্ত হইয়াছে।

বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে।।১

ব্রহ্মস্বরূপে নিত্যমুক্ত হইয়াও যিনি নিজ অজ্ঞান বশতঃ বদ্ধের ন্যায় প্রতীয়মান হন, পুনরায় 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এই জ্ঞানদৃষ্টি দ্বারা নিজ অজ্ঞান হইতে বিমুক্ত হন, তাঁহাকে বিমুক্ত বলে।।১

গুহাগ্রন্থিভ্যো বিমুক্তোহমৃতো ভবতি।।২

হৃদয়গুহাস্থিত অবিদ্যাগ্রন্থি হইতে বিমুক্ত পুরুষ অমৃত ব্রহ্মস্বরূপ হয়েন অর্থাৎ বিদেহমুক্তপদবাচ্য হয়েন।।২

অথাকাময়মানো যোহকামো নিষ্কাম আত্মকাম আপ্তকামো ন তস্য
প্রাণা উৎক্রামন্ত্যত্রৈব সমবলীয়ন্তে ব্রহ্মৈব সন ব্রহ্মাপ্যেতি।।৩

ব্রহ্মাতিরিক্ত প্রপঞ্চেতে বিরক্তির পর কামনাযোগ্য বিষয়ের অভাব বশতঃ তিনি অকাম অর্থাৎ কামনারহিত পুরুষ এবং নিষ্কামপদবাচ্য হয়েন, ব্রহ্মাতিরিক্ত তাঁহার অন্য কামনা নাই বলিয়া তিনি আত্মকাম এবং পূর্ণকাম বলিয়া তিনি আপ্তকাম। এবম্বিধ অকাম নিষ্কাম আত্মকাম এবং আপ্তকাম পুরুষের প্রাণাদি পঞ্চপ্রাণ স্বাধিকরণ ব্রহ্মেতে লয় প্রাপ্ত হয়, তিনি ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হয়েন।।৩

তদযথাহিনির্ল্বয়নী বল্মীকে মৃতা প্রত্যস্তা শয়ীতেবমেবদং শরীরং
শেতেহ থায়মশরীরোহমৃতঃ প্রাণো ব্রহ্মৈব তেজ এব অশরীরো
নিরিন্দ্রিয়োপ্রাণোহতমাঃ সচ্চিদানন্দমাত্রঃ স স্বরাট ভবতি।।৪

যে প্রকার সর্পত্বক (সাপের খোলস) স্বাশ্রয় বল্মীকে (উইঢিবিতে) মৃতের ন্যায় পরিত্যক্ত হইয়া পতিত থাকে, সেই প্রকার ব্রহ্মবিৎ পুরুষের নিজ ব্রহ্মভাব দ্বারা পরিত্যক্ত অভিমান বশতঃ স্থূল সূক্ষ্ম এবং কারণ এই ত্রিবিধ শরীর সচেতন থাকিলেও মৃতের ন্যায় অবস্থান করে। সেই বিদেহমুক্ত পুরুষ অমৃত এবং প্রাণ স্বরূপ ব্রহ্মজ্যোতিতে শরীর রহিত এবং নিরিন্দ্রিয় হইয়া প্রাণ এবং অবিদ্যা রহিত সচ্চিদানন্দ স্বরূপ স্বরাট হয়েন অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ স্বকীয় মহিমাতে বিরাজ করেন।।৪

পৃথিব্যপ্সু প্রলীয়ত আপো জ্যোতিষি লীয়ন্তে জ্যোতির্বায়ৌ
বিলীয়তে বায়ুরাকাশ আকাশমিন্দ্রিয়েষ্বিন্দ্রিয়াণি তন্মাত্রেষু
তন্মাত্রাণি ভূতাদৌ বিলীয়ন্তে ভূতাদির্মহতি বিলীয়তে মহানব্যক্তে
বিলীয়তেহব্যক্তমক্ষরে বিলীয়তেহক্ষরং তমসি বিলীয়তে তমঃ
পরে দেব একীভবতি পরস্তান্ন সন্নাসন্ন সদসৎ।।৫

পৃথিবী স্বকারণ জলেতে লয় প্রাপ্ত হয়, জল অগ্নিতে, অগ্নি বায়ুতে, বায়ু আকাশে, আকাশ ইন্দ্রিয়ে, ইন্দ্রিয় সকল তন্মাত্রেতে, তন্মাত্র ভূতকারণ অহঙ্কারে, অহঙ্কার মহৎ তত্বে, মহৎ তত্ব অব্যক্ত প্রকৃতিতে, অব্যক্ত

প্রকৃতি অক্ষর পুরুষে, অক্ষর পুরুষ তমতে (সাক্ষিস্বরূপে) এবং তম স্বরূপ সাক্ষিত্ব পর দেবতায় (নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে) লয় প্রাপ্ত হয়। তখন নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মাতিরিক্ত কোন বস্তু সৎ এবং অসৎ পদবাচ্য হয় না।।৫

ব্রহ্মাণ্ডং তদগতলোকান কার্য্যরূপাংশ্চ কারণত্বং প্রাপয়িত্বা ততঃ
সূক্ষ্মাঙ্গং কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি প্রাণাশ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণ্যন্তঃকরণচতুষ্টরং
চৈকীকৃত্য সর্ব্বাণি ভৌতিকানি কারণে ভূতপঞ্চকে সংযোজ্য
ভূমিং জলে জলং বহ্নৌ, বহ্নিং বায়ৌ বায়ুমাকাশে
চাকাশমহঙ্কারে চাহঙ্কারং মহতি মহদব্যক্তে অব্যক্তং পুরুষে
ক্রমেণ বিলীয়তে বিরাট হিরণ্যগর্ভেশ্বরা উপাধিবিলয়াৎ
পরমাত্মনি লীয়ন্তে।।৬

ব্রহ্মাণ্ড এবং তদগত লোকসমূহ ও কার্য্যরূপ বিষয় সকল স্ব স্ব কারণে লয় প্রাপ্ত হইয়া এবং কার্য্যরূপ হইতে সূক্ষ্মাঙ্গ পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার এই অন্তঃকরণচতুষ্টয় স্ব স্ব কারণে লয় প্রাপ্ত হয়। সমস্ত ভৌতিককার্য্য কারণস্বরূপ পঞ্চতন্মাত্রেতে সংযুক্ত হইয়া ভূমি জলে, জল অগ্নিতে, অগ্নি বায়ুতে, বায়ু আকাশে, আকাশ অহঙ্কারে, অহঙ্কার মহৎ তত্বে, মহৎ তত্ব অব্যক্ত প্রকৃতিতে এবং প্রকৃতি পরম পুরুষে ক্রমে বিলয় প্রাপ্ত হয় ও বিরাট হিরণ্যগর্ভ ঈশ্বর ইঁহারা নিজ নিজ উপাধিরহিত হইয়া স্ব স্ব কারণ পরমাত্মায় বিলীন হন।।৬

প্রারব্ধক্ষয়বশাদ্দেহত্রয়ভঙ্গং প্রাপ্যোপাধিবিনির্মুক্তঘটাকাশবৎ
পরিপূর্ণতা বিদেহমুক্তিঃ।।৭

যেরূপ ঘটাদি উপাধিরহিত হইলে ঘটাকাশ আবরণশূন্য হয়, সেইরূপ ব্রহ্মবেত্তার প্রারব্ধ ক্ষয় বশতঃ স্থূল সূক্ষ্ম কারণরূপ দেহত্রয় নাশ প্রাপ্ত হইলে তাঁহার পরিপূর্ণরূপা (দেহত্রয়াবরণ রহিত) ব্রাহ্মী স্থিতিকে বিদেহমুক্তি বলে।

যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেহস্য হৃদি শ্রিতাঃ।।৮
অথ মর্ত্ত্যোহমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে।।৯

যখন ব্রহ্মবেত্তার হৃদয়স্থিত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মাবরণস্বরূপ সমস্ত কামনা লয় প্রাপ্ত হয়, তখন শরীর ধারণ বশতঃ মরণধর্ম্মা হইয়াও তিনি অমৃত অর্থাৎ মরণ ধর্ম্মরহিত এবং সেই শরীরেই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন অর্থাৎ বিদেহমুক্ত হন।।৮,৯

বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ সংন্যাসযোগাদযতয়ঃ শুদ্ধসত্বাঃ।।১০
তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে পরামৃতাঃ পরিমুচ্যন্তি সর্ব্বে।।১১

যাঁহারা ঈশাদি সর্ব্ব বেদান্তার্থ জ্ঞান সুনিশ্চিতরূপে জ্ঞাত হয়েন, তাঁহারা ব্রহ্মেতে সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যাগরূপ সংন্যাস দ্বারা বিশুদ্ধসত্ব হয়েন। তাঁহারা ব্রহ্মস্বরূপেতে সম্যক জ্ঞান সম্পন্ন হইয়া ব্রহ্মস্বরূপেতে জীবিতাবস্থাতেই ব্রহ্মভাবাপন্ন হইয়া বিদেহমুক্তপদবাচ্য হয়েন।।১০,১১

তস্যাভিধ্যানাদ যোজনাতত্বভাবাদ ভূয়শ্চান্তে বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ।।১২

'ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বম অর্থাৎ যিনি নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম সেই ব্রহ্মই সমস্ত' এই ধ্যানের পরিপাক বশতঃ 'তিনিই সর্ব্বময়' এই ঐক্য জ্ঞান যাহার উৎপন্ন হইয়াছে, সেই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মসাধকের পরিশেষে সমস্ত মায়া ও তৎকার্য্যের নিবৃত্তি হয়।।১২

জীবন্মুক্তপদং ত্যক্তা স্বদেহে কালসাৎকৃতে।।১৩
বিশত্যদেহমুক্তত্বং পবনোহস্পন্দতামিব।।১৪
'অহং ব্রহ্মাস্মীতি অর্থাৎ আমিই ব্রহ্ম' এই ব্রহ্মময়ী বৃত্তিলহরী যখন প্রবাহিত হয়, তখন তাহাকে জীবন্মুক্তি বলে। সেই জীবন্মুক্ত পুরুষ প্রারব্ধ কর্ম্মক্ষয় পর্য্যন্ত ভূমাস্বরূপ ব্রহ্মেতে অবস্থান করিয়া স্পন্দহীন বায়ুর ন্যায় আত্যন্তিক দেহাভিমানের নাশ করিয়া এবং স্বাধিষ্ঠিত দেহেতে মিথ্যাজ্ঞানের ক্ষয় করিয়া দেহত্যাগানন্তর বিদেহমুক্তপদবাচ্য হয়েন।।১৩,১৪

ততস্তৎ সম্বভূবাসৌ যদ গিরামপ্যগোচরম।।১৫
যচ্ছূন্যবাদিনাং শূন্যং ব্রহ্ম ব্রহ্মাবিদাং চ যৎ।।১৬
বিজ্ঞানমাত্রং বিজ্ঞানবিদাং যদমলাত্মকম।।১৭
সেই জীবন্মুক্ত মুনি আত্যন্তিক অভিমানের নিবৃত্তির পরে মন এবং বাক্যের অগোচর ব্রহ্মমাত্র পদকে প্রাপ্ত হন অর্থাৎ বিদেহমুক্ত হয়েন। সেই বিদেহমুক্তি শূন্যবাদিগণের শূন্যস্বরূপ, ব্রহ্মবাদিগণের ব্রহ্মস্বরূপ এবং তাহা বিজ্ঞানবাদিগণের নির্ম্মল বিজ্ঞানস্বরূপ।।১৫,১৬,১৭

পুরুষঃ সাংখ্যসৃষ্টীনামীশ্বরো যোগবাদিনাম।।১৮
শিবঃ শৈবাগমস্থানাং কালঃ কালৈকবাদিনাম।।১৯
সেই বিদেহমুক্তি (ব্রহ্মপদ) সাংখ্যবাদিগণের পুরুষ, যোগবাদিগণের ঈশ্বর, শৈবগণের শিব এবং কালবাদিগণের কাল বলিয়া আখ্যাত হন।।১৮,১৯

যৎ সর্ব্বশাস্ত্রসিদ্ধান্তং যৎ সর্ব্বহৃদয়ানুগম।।২০
যৎ সর্ব্বং সর্ব্বগং বস্তু যত্তত্বং তদসৌ স্থিতঃ।।২১
যাহা সকলের হৃদয় গ্রাহ্য, সর্ব্বশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত স্বরূপ, যাহা সর্ব্বব্যাপক বস্তু এবং যাহা পরমার্থ তত্বস্বরূপ, তাহাই বিদেহমুক্তি।।২০,২১

যদনুক্তমনিঃস্পন্দং দীপকং তেজসামপি।।২২
স্বানুভূত্যৈকমানঞ্চ যত্তত্বং তদসৌ স্থিতঃ।।২৩
উদয় এবং অস্তাদি রহিত বলিয়া যিনি অনুত্তম চিৎ সূর্য্য, এবং যিনি সূর্য্যাদি তৈজস পদার্থেরও প্রকাশক বা উদ্দীপক এবং যিনি ব্রহ্মবেত্তার নিজ অনুভূতিরই একমাত্র গম্য, তাঁহাকে (ব্রহ্মপদকে) বিদেহমুক্তি বলে।। ২২,২৩

যদেকং চাপ্যনেকঞ্চ সাঞ্জনঞ্চ নিরঞ্জনম।।২৪
যৎ সর্ব্বং চাপ্যসর্ব্বঞ্চ যত্তত্বং তদসৌ স্থিতঃ।।২৫
যাহা এক এবং বহু, যাহা মায়াযুক্ত হেতু সাঞ্জন (সমল) এবং মায়াতীত বলিয়া নিরঞ্জন (নির্ম্মল), যাহা সকল ভাব ধারণ করে অথচ অসর্ব্ব অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ ভাবেতে স্থিত, তাহাই (ব্রহ্মপদই) বিদেহমুক্তি।। ২৪,২৫

নিরানন্দোহপি সানন্দঃ সচ্চাসচ্চ বভূব সঃ।।২৬
ন চেতনো ন চ জড়ো ন চৈবাসন্ন সন্ময়ঃ।।২৭

তিনি নির্ব্বিশেষ বলিয়া নিরানন্দ হইয়াও সানন্দ, সৎ এবং অসৎ উভয়স্বরূপ, তিনি চেতন কিংবা জড়ও নহেন এবং সৎ কিংবা অসৎও নহেন।।২৬,২৭

অজমমরমনাদ্যমাদ্যমেকং পদমমলং সকলঞ্চ নিষ্কলঞ্চ।।২৮
স্থিত ইতি স তদা নভঃ স্বরূপাদপি বিমলস্থিতিরীশ্বরক্ষণেন।।২৯
জন্মাদিরহিত বলিয়া তিনি অজ, নাশরহিত বলিয়া তিনি অমর, স্বাতিরিক্ত কারণরহিত বলিয়া তিনি অনাদি ও অনন্ত, অদ্বিতীয় বলিয়া এক, প্রাপ্তব্য বলিয়া তিনি পদস্বরূপ, মায়ারহিত বলিয়া তিনি অমল, ষোড়শ কলাযুক্ত বলিয়া তিনি সকল, কিন্তু স্বভাবতঃ তিনি নিষ্কল অর্থাৎ কলারহিত। এবম্ভূত ব্রহ্মরূপেতে যিনি স্থিত, তিনি নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানের উত্তরকালেতে সর্ব্ববিকল্পরহিত হইয়া আকাশ হইতেও বিমল স্থিতি সম্পন্ন ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হয়েন। সেই ঐশ্বরিক ভাবকে বিদেহমুক্তি বলে।।২৮,২৯

ব্যপগতকলনাকলঙ্কশুদ্ধঃ স্বয়মমলাত্মনি পাবনে পদেহসৌ।।৩০
সলিলকণ ইবাম্বুধৌ মহাত্মা বিগলিতবাসনমেকতাং জগাম।।৩১
অশুদ্ধ মায়া ও তৎকার্য্যরূপ কলঙ্কের অভাব বশতঃ শুদ্ধস্বরূপ মহাত্মা, সমুদ্রে সলিলকণার ন্যায়, নির্ম্মল পবিত্র নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মপদবীতে বাসনা শূন্য হইয়া ব্রহ্মরূপতা প্রাপ্ত হয়েন।।৩০,৩১

সংশান্তদুঃখমজড়াত্মকমেকসুপ্তমানন্দমন্থরমপেতরজস্তমো যৎ।।৩২
আকাশকোশতনবোহতনবো মহান্তস্তস্মিন পদে গলিতচিত্তলবা ভবন্তি।।৩৩
ভূমানন্দ স্বরূপ বলিয়া যিনি সংশান্তদুঃখ, জড় মায়া ও তৎকার্য্যাদি-রহিত বলিয়া যিনি অজড়াত্মক, এক, নির্ব্বিশেষ সাক্ষিস্বরূপ বলিয়া যিনি সুপ্তিপদবাচ্য, নিজ আনন্দে পূর্ণ বলিয়া যিনি আনন্দমন্থর এবং নির্গুণ বলিয়া যিনি রজঃ ও তমোরহিত, তিনি বিদেহমুক্ত। '(সচ্চিদানন্দাকাশং ব্রহ্মেতি অর্থাৎ সচ্চিনানন্দ স্বরূপ আকাশই ব্রহ্ম)' যাঁহারা এরূপ মননশীল আকাশকোশতনু অর্থাৎ জীবন্মুক্ত, তাঁহারা সমস্ত বিকল্প এবং বাসনা রহিত হইয়া বিদেহমুক্তপদবাচ্য হয়েন।।৩২,৩৩

বিদেহমুক্ত এবাসৌ বিদ্যতে নিষ্কলাত্মকঃ।।৩৪
সমগ্রাগ্র্যগুণাধারমপি সত্বং প্রলীয়তে।।৩৫
গুণ সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গুণ 'সত্ব'। যখন সেই সত্বগুণও নিজ ব্রহ্মভাবেতে লয় প্রাপ্ত হয়, তখন সেই নির্ব্বিশেষ অবস্থাতে নির্ম্মল বিদেহমুক্ত অবস্থান করেন অর্থাং সেই অবস্থাই বিদেহমুক্তির অবস্থা।৩৪,৩৫

বিদেহমুক্তৌ বিমলে পদে পরমপাবনে।।৩৬
বিদেহমুক্তিবিষয়ে তস্মিন সত্বক্ষয়াত্মকে।।৩৭
চিত্তনাশে বিরূপাখ্যে ন কিঞ্চিদিহ বিদ্যতে।।৩৮
ন গুণা নাগুণাস্তত্র ন শ্রীর্নাশ্রীর্ন চৈকতা।।৩৯
বিমল পদ পরম পবিত্র বিদেহমুক্তিতে যখন সত্বগুণ লয় প্রাপ্ত হয় ও যখন চিত্ত স্বকারণে লয় প্রাপ্ত হয়, তখন তাহাকে বিরূপাখ্য চিত্তলয়াবস্থা বলে, সেই অবস্থায়—'ব্রহ্মাতিরিক্ত কিছুই নাই' এই নির্ব্বিকল্পরূপ জ্ঞান হয়। তৎকালে সত্বাদি গুণ এবং অগুণভাব রহিত হয় ও তখন মুমুক্ষাশ্রয়ণীয়া বিদ্যাও থাকে না, তৎকালে, প্রপঞ্চাশ্রয়ণীয়া অবিদ্যা কিংবা 'অস্তি নাস্তি' ইত্যাদি বিকল্পজাত বিষয়ও থাকে না—কেবল মাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্মভাব থাকে।।৩৬,৩৭,৩৮,৩৯

জীবন্নেব সদা মুক্তঃ কৃতার্থো ব্রহ্মবিত্তমঃ।।৪০

উপাধিনাশাদ্ব্রহ্মৈব সন ব্রহ্মাপ্যেতি নির্দ্বয়ম।।৪১

'ব্রহ্মাতিরিক্ত কিছুই নাই' এই শ্রুতির অর্থজ্ঞান দ্বারা বিশুদ্ধ ব্রহ্মবেত্তা পুরুষ কর্ত্তব্যের অভাব বশতঃ কৃতার্থ, দেহাভিমানরহিত বলিয়া জীবিতাবস্থায় তিনি সদা মুক্ত এবং তাঁহার অবিদ্যাজন্য দেহাদি উপাধিনাশ হইলে তিনি অদ্বয় ব্রহ্মস্বরূপ হয়েন।।৪০,৪১

শাস্ত্রেণ নশ্যেৎ পরমার্থদৃষ্টিঃ কার্য্যক্ষমং নশ্যতি চাপরোক্ষাৎ।।৪২

প্রারব্ধনাশাৎ প্রতিভাসনাশ এবং ত্রিধা নশ্যতি চাত্মমায়া।।৪৩

অদ্বৈত বেদান্ত শাস্ত্র শ্রবণ দ্বারা পূর্ব্বানুভূত প্রপঞ্চগত পারমার্থিক সত্যত্বজ্ঞানের নাশ হয়। তদনন্তর বেদান্ত শাস্ত্রমনন-প্রাদুর্ভূত অপরোক্ষ জ্ঞান দ্বারা প্রপঞ্চের ব্যবহারিক কার্য্যক্ষমত্বেরও নাশ হয়। প্রারব্ধ সঞ্চিত ক্রিয়মাণ এই ত্রিবিধকর্ম্মনাশ হেতু প্রাতিভাসিক জ্ঞানেরও নাশ হয়। এইরূপে ত্রিবিধ পারমার্থিক ব্যবহারিক এবং প্রাতিভাসিক আত্মমায়ার নাশ হয় অর্থাৎ তৎকালে জ্ঞানী বিদেহমুক্ত হয়েন।।৪২,৪৩

অহিনির্ল্বয়নী সর্পনির্মুক্তো জীববর্জ্জিতঃ।।৪৪

বল্মীকে পতিতস্তিষ্ঠেত্তং সর্পো নাভিমন্যতে।।৪৫

এবং স্থূলঞ্চ সূক্ষ্মঞ্চ শরীরং নাভিমন্যতে।।৪৬

যেরূপ সাপের খোলস সর্প হইতে নির্মুক্ত হইয়া মৃত অবস্থায় বল্মীকে পতিত থাকিলে তাহাতে সর্প যেরূপ নিরভিমান হইয়া অবস্থান করে, সেইরূপ বিদেহমুক্ত পুরুষ স্থূল এবং সূক্ষ্ম শরীরের উপর কোনপ্রকার অভিমান করেন না।।৪৪,৪৫,৪৬

প্রত্যকজ্ঞানশিখিধ্বস্তে মিথ্যাজ্ঞানে সহেতুকে।।৪৭

নেতি নেতীতিরূপত্বাদশরীরো ভবত্যয়ম।।৪৮

জীবাভিন্ন ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা সহেতুক মিথ্যাজ্ঞান জন্য প্রত্যকজ্ঞান (জীবভাব) বিনষ্ট হয়, তৎপরে 'নেতি নেতি' এই নিষেধমুখী জ্ঞান দ্বারা অশরীর অর্থাৎ স্থূল সূক্ষ্ম কারণ এই ত্রিবিধ শরীরের উপর অভিমান রহিত হইয়া জ্ঞানী বিদেহমুক্তপদবাচ্য হন।।৪৭,৪৮

বিশ্বশ্চ তৈজসশ্চৈব প্রাজ্ঞশ্চেতি চ তে ত্রয়ঃ।।৪৯

বিরাড ঢিরণ্যগর্ভশ্চ ঈশ্বরশ্চেতি চ তে ত্রয়ঃ।।৫০

ব্রহ্মাণ্ডং চৈব পিণ্ডাণ্ডং লোকা ভূরাদয়ং ক্রমাৎ।।৫১

স্বস্বোপাধিলয়াদেব লীয়ন্তে প্রত্যগাত্মনি।।৫২

'বিশ্ব, তৈজস, হিরণ্যগর্ভ, এই তিন ব্যষ্টি, বিরাট, হিরণ্যগর্ভ ঈশ্বর এই তিন সমষ্টি; ব্রহ্মাণ্ড পিণ্ডাণ্ড এবং ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ, সত্য, অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল ও পাতাল এই চতুর্দ্দশ লোক নিজ নিজ উপাধিলয় হেতু জীবাভিন্ন ব্রহ্মেতে যখন লয় প্রাপ্ত হয়, তখন এইরূপ ভাবাপন্ন বিদ্বান বিদেহমুক্তপদবাচ্য হয়েন।।৪৯,৫০,৫১,৫২

তূষ্ণীমেব স্থিতস্তষ্ণীং তূষ্ণীং সত্যন্ন কিংচন।।৫৩

যে অবস্থায় ব্রহ্মবেত্তা সঙ্গরহিত এবং সদা উদাসীন ভাবে তুষ্ট হইয়া স্থিত হয়েন এবং যৎকালে তিনি 'ব্রহ্মাতিরিক্ত কিছুই নাই' এই ব্রাহ্মী স্থিতিতেই তুষ্ট থাকেন, তখন তাঁহাকে বিদেহমুক্ত বলে। (বিদেহ কৈবল্য কেবল নিষ্প্রতিযোগী ব্রহ্মভাব মাত্র)।।৫৩

কালভেদং বস্তুভেদং দেশভেদং স্বভেদকম।।৫৪
কিঞ্চিদভেদো ন তস্যাস্তি কিঞ্চিদ্বাপি ন বিদ্যতে।।৫৫
জীবেশ্বরেতি বা ক্বেতি বেদশাস্ত্রাঃ ক্বাহং ত্বিতি।।৫৬
ইদং চৈতন্যমেবেতি অহং চৈতন্যমিত্যপি।।৫৭
ইতি নিশ্চয়শূন্যো যো বৈদেহী মুক্ত এব সঃ।।৫৮

যে অবস্থায় কালভেদ, বস্তুভেদ, দেশভেদ বা নিজ ভেদাদি কোনও প্রকার ভেদজ্ঞান থাকে না, যে অবস্থায় জীব এবং ঈশ্বরভাবই বা কোথায়, বেদ এবং শাস্ত্রই বা কোথায়, অহং জ্ঞানই বা কোথায়' এইরূপ জ্ঞান হয়, যে অবস্থায় স্থূল সূক্ষ্ম কারণ এই দেহত্রয়ের অভাব জ্ঞান এবং 'এই চৈতন্য, আমি চৈতন্য' এইরূপ নিশ্চয় জ্ঞানশূন্যতা উদয় হয়, সেই নির্ব্বিশেষ অবস্থা-সম্পন্নকে বিদেহমুক্ত বলে।।৫৪,৫৫,৫৬,৫৭,৫৮

ব্রহ্মভূতঃ প্রশান্তাত্মা ব্রহ্মানন্দময়ঃ সুখী।।৫৯
স্বচ্ছরূপো মহামৌনী বৈদেহী মুক্ত এব সঃ।।৬০

'ব্রহ্মাহমিতি অর্থাৎ আমিই ব্রহ্ম' এইরূপ ব্রহ্মভাবাপন্ন পুরুষকে ব্রহ্মভূত বলে। যিনি ব্রহ্মভূত, উদ্বেগজনক অন্তকরণরহিত বলিয়া তিনি প্রশান্তাত্মা, ব্রহ্মানন্দস্বরূপ বলিয়া তিনি সুখী, মায়ারহিত বলিয়া তিনি শুদ্ধস্বরূপ এবং নিজ ব্রহ্মভাবেতে তিনি অত্যন্ত মননশীল, এরূপ ভাবাপন্নকে বিদেহমুক্ত বলে।।৫৯,৬০

ব্রহ্মৈবাহং চিদেবাহমেবং বাপি ন চিন্ত্যতে।।৬১
চিন্মাত্রেণৈব যস্তিষ্ঠেদ বৈদেহী মুক্ত এব সঃ।।৬২

যিনি 'আমি ব্রহ্ম এবং আমি চৈতন্যস্বরূপ' এরূপ ভেদজ্ঞান যখন চিন্তা না করেন এবং কেবল নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মভাবেতে অবস্থান করেন, তখন তাঁহাকে বিদেহমুক্ত বলে।।৬১,৬২

চৈতন্যমাত্রসংসিদ্ধঃ স্বাত্মারামঃ সুখাসনঃ।।৬৩
তুর্য্যতুর্য্যঃ পরানন্দো বৈদেহী মুক্ত এব সঃ।।৬৪

যিনি অচেতন প্রপঞ্চাপহ্নবসিদ্ধ চৈতন্য মাত্র, নিজ ব্রহ্মস্বরূপে রতিশীল বলিয়া যিনি স্বাত্মারাম, সুখমাত্ররূপে অবস্থান হেতু যিনি সুখাসন, যিনি ওঁকারের চতুর্থস্থানীয় এবং যিনি পরমাত্মাস্বরূপ তাঁহাকে বিদেহমুক্ত বলে।। ৬৩,৬৪

যস্য প্রপঞ্চভানং ন ব্রহ্মাকারমপীহ ন।।৬৫
অতীতাতীতভাবো যো বৈদেহী মুক্ত এব সঃ।।৬৬

যাঁহার 'প্রপঞ্চের অস্তি নাস্তি ভবতি' ইত্যাকার জ্ঞান এবং প্রপঞ্চের আধার ব্রহ্মাকার বৃত্তি উদয় হয় না, যিনি সর্ব্বাতীত যে চতুর্থ অবস্থা তাহারও অতীত, তাঁহাকে বিদেহমুক্ত বলে।।৬৫,৬৬

চিত্তবৃত্তেরতীতো যশ্চিত্তবৃত্যবভাসকঃ।।৬৭
সর্ব্ববৃত্তিবিহীনাত্মা বৈদেহী মুক্ত এব সঃ।।৬৮

যিনি চিত্তবৃত্তিরও অতীত কিন্তু চিত্তবৃত্তির প্রকাশক এবং স্বয়ং নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম বলিয়া যিনি সর্ব্ববৃত্তিশূন্য, সেই নির্ব্বিশেষ আত্মাকে বিদেহমুক্ত বলে।।৬৭,৬৮

সর্ব্বত্রৈবাহমাত্মাস্মি পরমাত্মা পরাত্মকঃ।।৬৯

নিত্যানন্দস্বরূপাত্মা বৈদেহী মুক্ত এব সঃ।।৭০

'পরমাত্মক এবং অপরমাত্মক (প্রপঞ্চ এবং জীবাত্মক) সর্ব্বত্রই আমিই একমাত্র আত্মা রূপে বিদ্যমান আছি এবং আমিই নিত্যানন্দ স্বরূপ' এইরূপ অবস্থাযুক্ত ব্রহ্মবেত্তাকে বিদেহমুক্ত বলে।।৬৯,৭০

জীবাত্মা পরমাত্মেতি চিন্তাসর্ব্বস্ববর্জ্জিতঃ।।৭১
সর্ব্বসংকল্পহীনাত্মা বৈদেহী মুক্ত এব সঃ।।৭২

জীবাত্মা এবং পরমাত্মা এই উভয় চিন্তারহিত এবং স্বাতিরিক্ত সংকল্পবর্জ্জিত ব্রহ্মবিৎকে বিদেহমুক্ত বলে।। ৭১,৭২

আত্মজ্ঞেয়াদিহীনাত্মা যৎ কিঞ্চিদিদমাত্মকঃ।।৭৩
ভাবাভাববিহীনাত্মা বৈদেহী মুক্ত এব সঃ।।৭৪

ব্রহ্মাতিরিক্ত আত্মা এবং বিষয় জ্ঞান রহিত, ইদংপদবাচ্য যে কোনও বিষয়, যিনি তদ্ভাবরহিত, যিনি ভাব এবং অভাব জ্ঞান বিহীন, এই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম ভাবাপন্ন ব্রহ্মবিৎকে বিদেহমুক্ত বলে।।৭৩,৭৪

ওঁকারবাচ্যহীনাত্মা সর্ব্ববাচ্যবিবর্জ্জিতঃ।।৭৫
অবস্থাত্রয়হীনাত্মা বৈদেহী মুক্ত এব সঃ।।৭৬

ওঁকারেরও যিনি বাচ্যরহিত, যিনি সর্ব্ববাচ্যেরও অতীত এবং জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয় বর্জ্জিত, এই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মভাবাপন্নকে বিদেহমুক্ত বলে।।৭৫,৭৬

ইতি বিংশং প্রকরণং সমাপ্তম।।

—

উপসংহার

বিধ্যঘ্রর্বন্ধমুগ গুলফো হ্যবিদ্বদ্ধেয়জঙ্ঘকঃ।
জগন্মিথ্যাজানুদেশস্তু পদেশোরূদেশকঃ।
ব্রহ্মাত্মৈক্যকটীদেশো বিদ্বন্মনননাভিকঃ।
জীবন্মুক্তাখ্যদহরঃ সানুভূতিকরদ্বয়ঃ।
স্বসমাধিস্কন্ধদেশঃ স্বস্বরূপাখ্যকন্ধরঃ।
ফলভূতমহাবাক্যফলো বৈদেহমস্তকঃ।
এবং বিধ্যাদ্যদেহান্তমহাবাক্যকলেবরঃ।
বস্তুতো নির্ব্বিশেষাত্মা ত্রিপান্নারায়ণোহস্ম্যহম।

বিধিবাক্য সকল মহাবাক্যরত্নাবলীরূপ কলেবরের চরণস্বরূপ। বন্ধ ও মোক্ষ বাক্য সকল উহার গুলফস্বরূপ, অবিদ্বন্নিন্দাবাক্য সকল উহার জঙ্ঘাদেশ

জগন্মিথ্যা বাক্য সকল উহার জানুদেশ
উপদেশ বাক্য সকল উহার উরুদেশ
ব্রহ্মাত্মৈক্য বাক্য সকল উহার কটীদেশ
মনন বাক্য সকল উহার নাভিদেশ
জীবন্মুক্ত বাক্য সকল উহার দহরাকাশ (হৃদয়াকাশ)
স্বানুভূতি বাক্য সকল উহার করদ্বয়
সমাধি বাক্য সকল উহার স্কন্ধদেশ
অষ্টবিধ স্বস্বরূপ বাক্য সকল কন্ধরা অর্থাৎ গ্রীবার পশ্চাৎভাগ
ফল বাক্য সকল মহাবাক্যের ফলস্বরূপ,
বিদেহমুক্তি বাক্য সকল মহাবাক্যরূপ কলেবরের মস্তকস্বরূপ

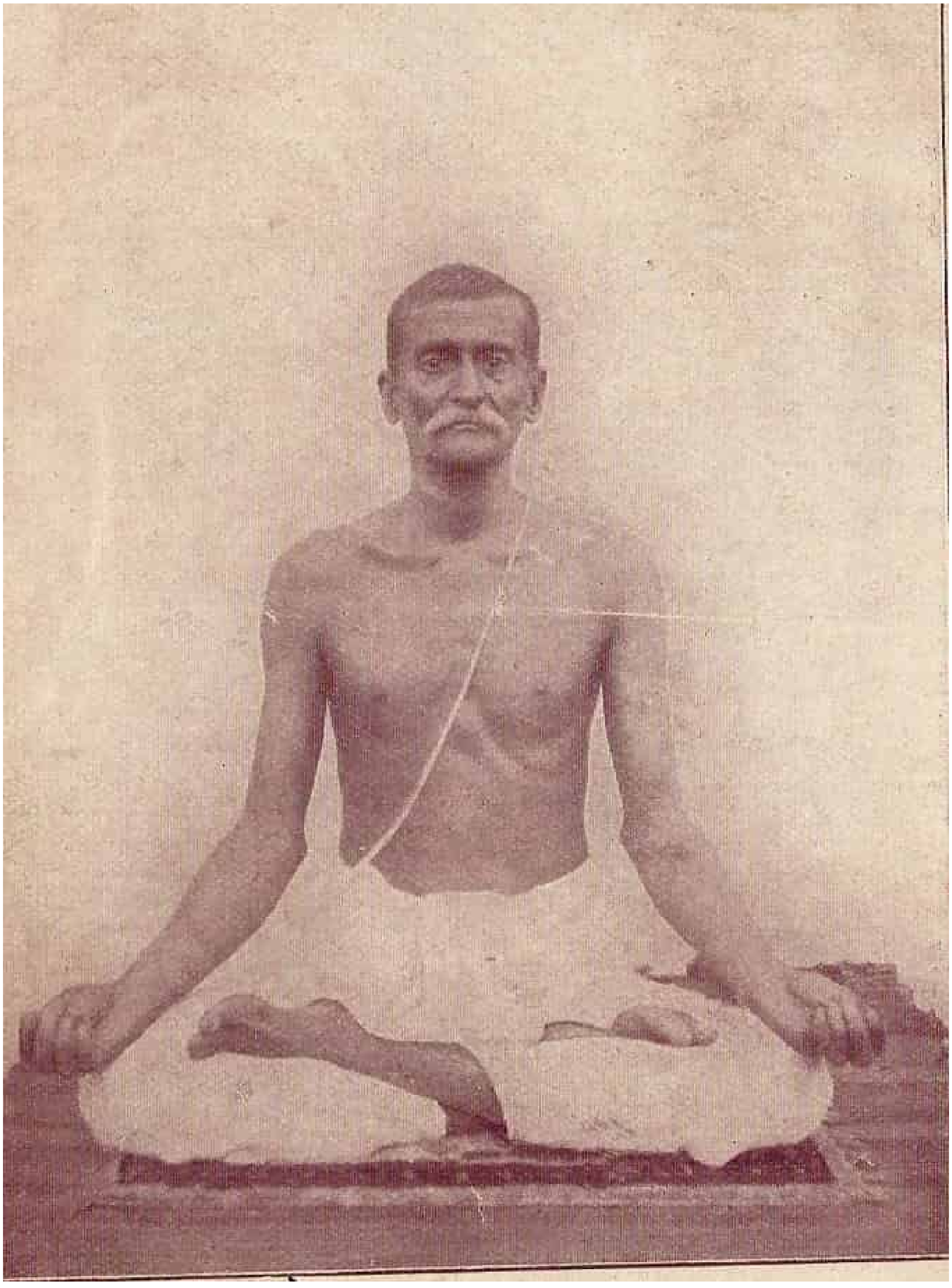
এই প্রকার বিধিবাক্য হইতে আরম্ভ করিয়া বিদেহবাক্যান্ত মহাবাক্যরূপ যাঁহার কলেবর, যাহা বস্তুতঃ নির্ব্বিশেষাত্মস্বরূপ এবং যিনি ত্রিপাদ নারায়ণস্বরূপ, সেই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই আমি।

সমাপ্ত

শ্রীউমাচরণ মুখোপাধ্যায়

বিরচিত

তত্ত্ববোধ



শ্রীউমাচরণ মুখোপাধ্যায়



শ্রীউমাচরণ মুখোপাধ্যায়ের নাতি শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়



কুলন্দাই গণেশন স্বামী ও বাসন্তী চৌধুরী



মন্দিরে ত্রৈলঙ্গস্বামীজির মূর্তি। ছবি অভিজিৎ মণ্ডল



পঞ্চগঙ্গা। ছবি অভিজিৎ মণ্ডল



দশাশ্বমেধ ঘাট। ছবি অভিজিৎ মণ্ডল



মণিকর্ণিকা ঘাট। ছবি অভিজিৎ মণ্ডল

উৎসর্গ

যাঁহার অপরিসীম দয়া ও অসীম স্নেহের গুণে হৃদয়ের
আবিলতা দূর হইয়া
ভক্তিভাব প্রস্ফুরিত হইয়াছে,
যিনি অজ্ঞানান্ধকার নাশ করিয়া
হৃদয়ে নির্ম্মল ও পবিত্র জ্ঞানালোক সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছেন,
যিনি সংসার সমুদ্রের অগাধ সলিলরাশির ভীষণ আবর্ত্তে
একমাত্র কর্ণধার হইয়া
পথ নিদর্শন করিয়া দিতেছেন,
যিনি কৃপা করিয়া নিজ করুণাকল্পতরুর সুশীতল চরণছায়ায়
এ অধমকে আশ্রয় দান করিয়া
চিরশ্রান্তি বিদূরিত করিয়া দিয়াছেন,
যিনি আমার মেঘাচ্ছাদিত ঘোরান্ধকারময় হৃদয়াকাশে
ধ্রুবতারা রূপে সর্ব্বক্ষণ বিরাজিত,
যাঁহার পবিত্র করস্পর্শে
আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত,
সেই পরমারাধ্য, শ্রদ্ধাস্পদ, ভক্তিভাজন শ্রীমৎ গুরুদেবের
শ্রীচরণ কমলে,
এই অমূল্যরত্ন ভক্তি পুষ্পাঞ্জলিরূপে
উৎসর্গীকৃত
হইল।
''দাসানুদাস উমাচরণ''

ভূমিকা

উমাচরণ মুখোপাধ্যায়ের অমূল্য প্রয়াসে সম্ভব হল 'তত্ত্ববোধ' নামক এই সংকলন। নিজের জীবন নিবেদন করে দিয়েছিলেন মহাসাধক শ্রীশ্রী ত্রৈলঙ্গস্বামীর পরম পদ কমলে। গুরুগত প্রাণ। বঙ্গভূমে তিনিই এই পরমপুরুষের মহিমা প্রচার করেছিলেন। দিনের পর দিন তাঁর একান্ত সঙ্গ করে সাধন জগতের মণি-মুক্তা সংগ্রহ করেছেন। এই সব রত্ন দুর্লভ। হারিয়ে গেলে কিছু করার ছিল না। অপূরণীয় ক্ষতি হত।

ভূমিকায় পরমশ্রদ্ধেয়, গুরুকৃপাধন্য উমাচরণ লিখছেন, 'পরমারাধ্য শ্রীমৎ গুরুদেবের কৃপাই আমার একমাত্র বল, কেবল তাঁহারই বলে বলীয়ান হইয়া, ও তাঁহারই শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করিয়া এবং মহাপুরুষদিগের সাহায্যে বহু আয়াস, যত্ন, উদ্যম অধ্যবসায় সহকারে এই সমস্ত গুরুতর বিষয় সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিতে উদ্যত হইয়াছি।'

ত্রৈলঙ্গ মহারাজ যে-সব বিষয়ে আলোকপাত করেছেন, তা হল, 'বিশ্ব বা জগৎ', 'আর্যভূমি ভারতবর্ষ', 'অহংতত্ত্ব', 'দর্শন', 'ত্রিবেণী', 'কাল', 'ব্যোম বা আকাশ', 'শব্দ ও নাদ', 'বাক্য', 'প্রকৃতি', 'শক্তি', 'মায়া', 'প্রাণ', 'মন', 'বুদ্ধি', 'চিত্র', 'তত্ত্বসার', 'কুমার দেবব্রত', 'সিদ্ধাশ্রম', 'ব্রহ্মচর্য', 'সন্ন্যাস ও আনন্দ', 'স্বাধীন ও পরাধীন', 'সত্য', 'চৌর্য', 'শরীর', 'ব্যাধি', 'জরা', 'মৃত্যু', 'শ্মশান'।

ত্রৈলঙ্গ মহারাজ বেশিরভাগ সময়েই মৌনী থাকতেন। শ্রদ্ধেয় উমাচরণ তাঁর অসীম প্রয়াসে যখনই সুযোগ পেয়েছেন তখনই মহারাজের কাছ থেকে এইসব বিষয়ে তাঁর চিন্তা, ভাবনা, অভিমত আদায় করে নিয়েছেন। দর্শনের সঙ্গে যুক্তিগ্রাহ্য বিজ্ঞানেরও মিলন ঘটেছে। ত্রৈলঙ্গস্বামীর উপলব্ধ জ্ঞানের প্রকাশ ঘটেছে। এইসব নিবন্ধে ধরা পড়েছেন অন্য এক ত্রৈলঙ্গস্বামী, যিনি শুধু অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন কাশীর 'সচল বিশ্বনাথ' নন, তিনি মহাজ্ঞানী। সৃষ্টির অন্তরালে লুকিয়ে থাকা যাবতীয় রহস্য তার নখ-দর্পণে, বিজ্ঞান যেখানে সহসা পৌঁছতে পারে না।

'আর্য ভূমি ভারতবর্ষ' সম্পর্কে মহারাজ যা বলে গেছেন, তা আমাদের চিরকালের মন্ত্র হয়ে থাকবে। 'ভারত-শ্রেষ্ঠ স্থান নাই। আর্য-শ্রেষ্ঠ জাতি নাই। ব্রহ্মচর্য-শ্রেষ্ঠ শক্তি নাই। ভারত রাজর্ষিপালিত একমাত্র আদিস্থান। মহামোক্ষধাম, মহাপুণ্যস্থান, মহাতীর্থস্থান যে আর্যভূমি, তাহাই ভারতবর্ষ। তপোবলে প্রভাবিত যে ব্রহ্মলোক তা এই ভারতেরই প্রভা। জ্ঞান-বিজ্ঞানে আলোকিত। বেদ, বেদান্ত, দর্শন, সাহিত্য আয়ুর্বেদ, গন্ধর্ব-বেদ, জ্যোতিষ, ভারতেরই প্রভা। জ্যোতির্লোকের কেন্দ্র এই ভারত। 'যাহা নাই ভারতে, তাহা নাই সৃষ্টিতে; যাহা আছে সৃষ্টিতে তাহা আছে ভারতে; সুতরাং ভারত বিশ্বকেন্দ্র।' তিনি বলছেন, 'এই ভারতে যে যে-রূপ কর্ম করিবে, সে সেইরূপ ফল পাইবে। সৎকার্য কর, ক্রমেই ঊর্ধ্বগতি হইয়া ব্রহ্মত্ব, শেষে মুক্তি পর্যন্ত পাইবে। অসৎকার্য কর, ক্রমে অধোগতি হইয়া কীটাদি নারকী গতি প্রাপ্ত হইবে।'

মানুষ তুমি কে? প্রাণের তুমি কোন অবস্থা? এই দার্শনিক প্রশ্নের নানা উত্তর জ্ঞানের নানা বিভাগ থেকে এসেছে। স্বামী বলছেন, 'মনুষ্যজীবন জীবশ্রেণির মধ্যবর্তী অবস্থা। এই মনুষ্যজন্মে যিনি যেরূপ কর্ম করিবেন, তিনি তদুপযুক্ত লোকে গমন করিবেন।' স্বামী বলছেন, 'মনুষ্যশক্তিকে দেবগুণে উন্নত কর, দেবত্বপ্রাপ্ত হইবে; পশুগুণে অবনত কর পশুত্ব প্রাপ্ত হইবে। মনুষ্যকেন্দ্র হইতে দেবতাও নির্গত হইয়াছে, পশুও নির্গত হইয়াছে, যাহার যে-রূপ কর্ম, তাহার সেইরূপ জন্ম।'

ত্রৈলঙ্গ মহারাজ বলছেন, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। ইচ্ছা হলেও পরিবর্তিত হতে পারবেন না। যা আছেন, তাই থাকবেন। তিনি বলছেন, 'ব্রহ্মা যদি মনে করেন আমি মুক্ত হইব, মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করিব, তাহা তিনি পারেন না; তাঁহার সীমাবদ্ধ আয়ুর অন্তে মুক্ত হইবেন। দেবতারা মন্বন্তরজীবী। পক্ষান্তরে মনুষ্য সকলই পারে, মনুষ্য ইচ্ছা করিলে এই মুহূর্তেই মরিতে পারে, ইচ্ছা করিলে দেবায়ুর অধিক বাঁচিতে পারে। ইচ্ছা করিলে এই জীবনে দেবত্ব লইতে পারে, পশুত্বে লইতে পারে, ব্রহ্মত্ব

লইতে পারে, এমনকী মুক্তি পর্যন্ত লইতে পারে।' অনেক পরে স্বামী বিবেকানন্দ এই একই সত্য উদঘাটন করবেন,

Man alone attains to perfection, not ever the Devas
Man is an infinite circle whose circumference is no where,
but the centre is located in one spot,
Man can become like God and acquire control
over the whole universe. Man is divine.

ত্রৈলঙ্গ মহারাজের শক্তিতত্ত্ব অসাধারণ। মানুষে যা সম্ভব দেবগণে তা কেন অসম্ভব? তাঁদের তো অণিমা-লঘিমাদি বিভূতি আছে। মহারাজ বলছেন, শক্তি অর্জন করা যায় না। শক্তি প্রকৃতিদত্ত, যেমন মধুমক্ষিকা সুন্দর মধুচক্র নির্মাণ করে, মানুষ তা পারে না, তাহলে কি এই দাঁড়ায় মানুষ শক্তি ও জ্ঞানে মধুমক্ষিকার চেয়ে হীন? না, তা নয়। মানুষ যখন এই জীবনেই ঈশ্বরত্ব নিতে পারে তখন অণিমাদি তো অতি তুচ্ছ বিষয়! এ কথা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণও বলেছেন। সেই কারণেই দেবতারাও আর্যভূমি ভারতে মনুষ্যজন্ম গ্রহণকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন। স্বর্গের দেবত্ব অপেক্ষা ভারতে মনুষ্যদেহ লাভ ভাগ্যবানদেরই হয়ে থাকে। স্বর্গভোগ ও মুক্তিলাভ দুটিই হতে পারে।

এই গ্রন্থ শেষ হবে দুটি নিবন্ধে—'মৃত্যু' ও 'শ্মশান'। দুটিই অসাধারণ। আমরা সকলেই কালভয়ে ভীত, মৃত্যুভয়ে ত্রাসিত। কেন? কোন পরিণতির নাম মৃত্যু? মমতা বা ভয়ই মৃত্যু। একবার কেন ভাবি না, মৃত্যু তো দেহের সঙ্গেই জন্মগ্রহণ করেছে। জন্ম আর মৃত্যু অস্তিত্বের এ-পিঠ আর ও-পিঠ। মহারাজ বলছেন, 'মৃত্যু একটি পরিবর্তন মাত্র। শক্তির কালিক পরিবর্তন। বাল্যশক্তি যে-কালে বাড়ে তা যৌবনকাল। যৌবনশক্তি যে-কালে হ্রাস পায়, সেই কাল হল জরা, তারপর মৃত্যুকাল। মৃত্যুর আর এক নাম কাল। বাল্যের পরিবর্তন যৌবন, যৌবনের পরিবর্তন বার্ধক্য, বার্ধক্যের পরিবর্তন জরা, জরার পরিবর্তন মৃত্যু। সব্রহ্মা সৌরজগৎ মুহুর্মুহু পরিবর্তন হচ্ছে, তা কেবল মৃত্যুরই রূপান্তর মাত্র।'

মৃত্যু সম্পর্কে এমন কথা পূর্বে কেউ বলেননি, 'মৃত্যু একজন মহা উপকারী বন্ধু, পরম দয়াবান, মহাদাতা। মৃত্যু আত্মার জ্ঞানোৎপাদনের জন্যে স্থূল শরীর হতে সূক্ষ্ম শরীরকে পৃথক করে, সেই কারণেই মৃত্যু উপকারী মিত্র। বার্ধক্যে জীব বড় কষ্ট পায়, সেই কষ্টকে মৃত্যুই দূর করে থাকে। এই জন্যে মৃত্যু পরম দয়াল। মৃত্যু প্রাণী মাত্রেরই পুরোনো শরীর গ্রহণ করে নতুন শরীর দান করে থাকে। মৃত্যু মহাদাতা।'

শেষ! শ্মশান।

বলছেন, 'বিশ্বনাট্যের বিরাম স্থান শ্মশান। অভিমান, গর্ব, দুঃখ, শোক, তাপ, আধি, ব্যাধি, জ্বালা, যন্ত্রণার অবসান-নিকেতন। ধনী, নির্ধন, দুঃখী, সুখী, রাজা, প্রজা, দীন, ভিখারি, যেখানে সমভাব, তারই নাম শ্মশান। বিশ্ব একটি মহাশ্মশান কেননা জগতে অদাহ স্থান নেই।' অতঃপর একটি অপূর্ব রূপকের আচ্ছাদনে তিনি শ্মশানের মহিমা প্রকাশ করেছেন। নিত্য শ্মশানে জীবনের জীবন খেলা। বলছেন, 'পুত্র যাঁর কাল, কন্যা যাঁর মৃত্যু তিনি কালজয়ী মহাপুরুষ।'

শ্রদ্ধেয় রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বিখ্যাত একটি গান, 'ভবে কে বলে কদর্য শ্মশান...।' সেই গানটির উৎস এই আশ্চর্য রচনা। ত্রৈলঙ্গ মহারাজ বলছেন,

'পরম পবিত্র, পরম যোগের স্থান
হেথা পাপী পুণ্যবান, মূর্খ কি বিদ্বান
সমভাবে সরল হৃদয়ে একত্রে শয়ান।

অন্ধ-খঞ্জ-বধির-গলিত কুষ্ঠধারী
রূপের কন্দর্প রাজা-প্রজা-ভিখারি
সকলেই একই শয্যায় শয়ান।'

শ্রদ্ধেয় উমাচরণ মুখোপাধ্যায় যে লোকেই থাকুন, আমার সাষ্টাঙ্গ প্রণাম। তাঁরই অনন্য প্রয়াসে উদ্ধার হল লুপ্ত জ্ঞান। অলৌকিক সাধক মহাত্মা ত্রৈলঙ্গ মহারাজ যে ভারতের আধ্যাত্মিক আকাশে চিরপ্রভায় সমুজ্জ্বল থাকুন। যুগ বসে থাক তাঁর পদপ্রান্তে কৃপামুখী হয়ে।

সূচিপত্র

চৌর্য্য

শরীর

ব্যাধি

জরা

মৃত্যু

শ্মশান

শ্রীউমাচরণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সংগৃহীত পুস্তকাবলী

প্রথম অধ্যায়

বিশ্ব বা জগৎ

সমস্ত পৃথিবীকে বিশ্ব বলিয়া জানা যায়। ইহা কী প্রকারে উৎপন্ন হইল, তাহা জানা আবশ্যক। প্রথমতঃ, বিন্দু কাহাকে বলে? যাহার অস্তিত্ব আছে, অংশ নাই, তাহাই বিন্দু। বিন্দু-সমষ্টিই মহৎ বস্তু। বিন্দুসমষ্টির যোগে একটি মহান পদার্থ; আবার ঐ মহান পদার্থের অংশানু-অংশই বিন্দু। পঞ্চভূত ও কালের পরমাণু-সমষ্টি লইয়া এই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে; অর্থাৎ মৃত্তিকা, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ এবং কালের পরমাণু-সমষ্টি লইয়া এই বিশাল জগতের সৃষ্টি হইয়াছে। বিশ্বের যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, যে বস্তুতে বুদ্ধিপ্রয়োগ করি, তাহাতেই দুইটি পদার্থের অনুমান প্রতীত হয়—একটি চিৎ আর একটি অচিৎ। চিৎ জ্ঞাতা রূপে, অচিৎ জ্ঞেয় রূপে; চিৎ ভোক্তা রূপে, অচিৎ ভোগ্য রূপে বিরাজিত। চিৎ সৎ, তাহার বিকার নাই, সুতরাং অপরিণামী, নিত্যকাল একরূপেই স্থিত, সেই জন্য ধ্বংসরহিত, সুতরাং সৎ। আর অচিৎ বিকারী, সেইজন্য, পরিণামী, সুতরাং ধ্বংসশীল ও অসৎ। সেই হেতু বিশ্ব সদাত্মক বিন্দুসমষ্টি ভিন্ন আর কিছু নহে।

একগাছি কেশের অগ্রভাগকে শত ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার এক ভাগকে সহস্র অংশে বিভক্ত কর, পরে ঐ সহস্রাংশের একাংশকে পুনরায় অর্দ্ধাংশ করিয়া তাহার এক এক অংশকে দুই ভাগে বিভক্ত করিলে, এক একটি অংশ যেরূপ সূক্ষ্ম হয়, চিন্ময় ব্রহ্মও সেইরূপ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পদার্থ। ইহা দ্বারা চিদবিন্দুসমষ্টি-যোগে মহৎ চিদব্রহ্ম। বিশ্ব যখন এক চিতেরই বিকাশ, সেই মহৎ চিৎই যখন বিন্দুসমষ্টি, তখন বিশ্বও বিন্দু-সমষ্টি।

যাহার শব্দ আছে শ্রুত হয় না, স্পর্শ আছে অনুভূত হয় না, রূপ আছে দৃষ্ট হয় না, রস আছে স্বাদ পাওয়া যায় না, গন্ধ আছে ঘ্রাণ পাওয়া যায় না,—এইপ্রকার যে আধার, তাহাই শক্তিবিন্দু। মনে কর, তুমি একটা কার্য্য করিতেছ, ঘণ্টা দুই পরে তোমার ক্লান্তিবোধ হইল। কেন ক্লান্তিবোধ হইল? পাঁচ মিনিট কার্য্য করিয়া কোন পরিশ্রম বোধ হয় নাই। ইহার কারণ এই, দুই ঘণ্টা কার্য্য করিয়া তোমার যতখানি শক্তিবিন্দু হ্রাস হইয়াছে, পাঁচ মিনিট কার্য্য করিয়া তোমার ততখানি শক্তিবিন্দু হ্রাস হয় নাই, প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই বিন্দু বিন্দু করিয়া শক্তি হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে; তাহা না হইলে দুই ঘণ্টা পরে কেন পরিশ্রম বোধ হইল? ইহাতেই অনুমান করা যাইতে পারে—প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই শক্তি কিছু কিছু করিয়া হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছিল, পাঁচ মিনিটে অনুভব হয় নাই, দুই ঘণ্টায় তাহা অনুভব হইল। একবারেই শক্তিবিন্দু কমে নাই, একবারেই পরিশ্রম অনুভব হয় নাই, বিন্দু বিন্দু করিয়া, বিন্দু বিন্দু বোধে দুই ঘণ্টা পরে তাহা অনুভূত হইল। বালকেরা একেবারে শক্তিশালী হয় না, ক্রমে ক্রমে বিন্দু বিন্দু শক্তি আয়ত্ত করিয়া বিশেষ শক্তিশালী হয়; শক্তির আয়ত্ততাই বৃহত্ব। ছোট আমে কম রস, বড় আমে বেশী রস; ইহার কারণ এই, বড় আমে রসবিন্দু যত বেশী আছে, ছোট আমে তত নাই; রসের কম-বেশী লইয়াই আমের ক্ষুদ্রত্ব ও বৃহত্ব। এই বিশ্বমধ্যে যাহা কিছু আছে, সমস্তই এই প্রকার। ইহাই শক্তির বিন্দুবিভাগ।

প্রকৃতির যাহা শেষ বিভাজ্য—যাহা আর ভাগ করা যায় না, বিভাগের যাহা শেষ সীমা, তাহাই পরমাণু। পদার্থ মাত্রেই বিভাজ্য। শক্তির যাহা শেষ বিভাগ, তাহাই বিন্দু; প্রকৃতির যাহা শেষ বিভাগ, তাহাই পরমাণু; সুতরাং বিন্দু ও পরমাণু একই পদার্থ, কারণ শক্তি ও প্রকৃতি একই পদার্থ। জগৎ পরমাণুপুঞ্জ। বিন্দু বিন্দু মৃত্তিকার যোগে বড় বড় পাহাড় হইয়াছে, বিন্দু বিন্দু জলে বৃহৎ সমুদ্র হইয়াছে, বিন্দু বিন্দু তেজে বৃহৎ সূর্য্য হইয়াছে। বিশ্ব যখন শক্তির বিকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়, আবার সেই শক্তি যখন বিন্দুসমষ্টি, তখন বিশ্বও বিন্দুসমষ্টি।

বিশ্ব যখন শক্তির বিকাশ, তখন বিশ্ব সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক বিন্দুসমষ্টি। বিশ্বের শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতিও বিন্দুসমষ্টি। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম বিন্দুসমষ্টি। বিন্দু বিন্দু কাল-যোগে কলা,

বিন্দু বিন্দু কলা-যোগে কাষ্ঠা, বিন্দু বিন্দু কাষ্ঠা-যোগে এক অনুপল; এই প্রকারে বিপল, পল, দণ্ড, প্রহর, সমস্তই বিন্দুসমষ্টি। সুতরাং কাল বিন্দুসমষ্টি। বিন্দু বিন্দু ব্যোম-যোগে এই মহাব্যোম; সুতরাং মহাব্যোমও বিন্দুসমষ্টি। সেইরূপে বিন্দু বিন্দু যোগে এই বিশ্ব বা জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে; সুতরাং বিশ্ব বিন্দুময়,—বিশ্বও বিন্দুসমষ্টি ব্যতীত আর কিছু নহে।

যে যে বস্তু জন্মে, তাহারই স্থিতি, বৃদ্ধি, পরিণাম, পরিবর্ত্তন, ক্ষয় বা হ্রাস ও বিনাশ হয়। আত্মা ব্যতীত সকল পদার্থই পরিণামী। চেতন হউক, অচেতন হউক, স্থাবর হউক, জঙ্গম হউক, অচল হউক বা সচল হউক, মহানগর হউক বা মহা বিজন হউক, সাগর হউক বা শৈল হউক,—আব্রহ্ম কীট পর্য্যন্ত কেহই কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না। রজোগুণ বিশ্বব্যাপী, প্রকৃতির রজোগুণে সকলকেই অবশ ভাবে কর্ম্ম করিতেই হইবে। কেহই কর্ম্ম ছাড়া থাকিতে পারিবে না, প্রকৃতিদেবীর ইহাই আদেশ। এই যে জড় পদার্থ লতা ও বৃক্ষ দেখিতেছ, এই যে পৃথিবী, পর্ব্বত, গ্রহ, উপগ্রহ দেখিতেছ, ইহারাও অবশ ভাবে নিরন্তর কর্ম্ম করিতেছে; জড়জগতে আকর্ষণ ও বিকর্ষণ কার্য্য নিয়তই চলিতেছে; এক মুহূর্ত্তও কর্ম্মগতির বিরাম নাই,—ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, স্ববশে হউক, অবশে হউক, ক্ষুদ্রতম কীট হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত কেহই কর্ম্মশূন্য হইয়া সংসারে থাকিতে পারিবে না,—আদ্যাশক্তি মহামায়ার ইহাই অভিপ্রায়, সুতরাং বিশ্ব কর্ম্মশীল।

বিশ্ব গতিশীল ও কর্ম্মশীল বলিয়া অপূর্ণ। যাহা পরিবর্ত্তনশীল, তাহাই গতিশীল। যাহা গতিশীল, তাহাই জগৎ। গন্তব্যস্থান প্রাপ্ত হয় নাই যে, গতিশীল সে। গন্তব্যস্থানে যে পর্য্যন্ত কোনও পদার্থ পঁহুছিতে না পারে, যে স্থানে পঁহুছিলে আর চলিবার প্রয়োজন থাকে না অর্থাৎ বাঞ্ছিতস্থানে না পঁহুছান পর্য্যন্ত পদার্থের গতি। যখন জগৎ নিয়ত গতিশীল, অবিরাম গতিতে অনন্তাভিমুখে ছুটিয়াছে, অবিরাম গতাগতির উপর রহিয়াছে, তখন বেশ বুঝা যাইতেছে যে, এখনও পর্য্যন্ত গন্তব্য স্থানে পঁহুছায় নাই, বা বাঞ্ছিত স্থান বা বস্তু এখনও পর্য্যন্ত পায় নাই। যদি গন্তব্য স্থানে পঁহুছিত, তবে গতি স্থির হইত, গতাগতির বিরাম হইত; তাহা যখন হয় নাই, তখন বিশ্ব অপূর্ণ।

বিশ্ব যে কারণে গতিশীল, সেই কারণেই ক্রিয়াশীল। ক্রিয়াশীল কে? বাঞ্ছিত পদার্থ পায় নাই যে। বাঞ্ছিত পদার্থ পায় নাই কে? কর্ম্মশীল যে। সেই ক্রিয়াশীল, যে বাঞ্ছিত পায় নাই; সেই বাঞ্ছিত পায় নাই, যে ক্রিয়াশীল। যে কর্ম্মশীল, বাঞ্ছিত পায় নাই, সেই অপূর্ণ। বাঞ্ছিত পদার্থ না পাওয়া পর্য্যন্তই ক্রিয়া। জগতের যে কোনও পদার্থের যে কোনও ক্রিয়া হউক, সকলেরই মূল বাঞ্ছিত-পদার্থ-প্রাপ্তি; অর্থাৎ প্রাণী মাত্রেই অভীষ্ট প্রাপ্তির জন্য ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হয়; অভীষ্ট প্রাপ্ত হইলে ক্রিয়াও নিবৃত্ত হয়। জগৎ যখন ক্রিয়াশীল তখন বেশ বুঝা যাইতেছে যে, এখনও পর্য্যন্ত অভীষ্ট প্রাপ্ত হয় নাই; যদি অভীষ্ট প্রাপ্ত হইত, তবে কর্ম্মের বিরতি হইত, কর্ম্মচক্র স্থগিত হইত। অপূর্ণই পূর্ণ হইবার চেষ্টা করে, অভাববিশিষ্ট হইলেই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়; বাঞ্ছিত পদার্থ যাহার করগত হয় নাই, সে-ই কর্ম্মপরায়ণ হয়, কর্ম্মে তাহারই অধিকার, কর্ম্মভূমিতে অবশ ভাবে তাহারাই যাতায়াত করিয়া থাকে। জগৎকর্ম্মভূমি, কর্ম্ম বা পরিবর্ত্তনই জগতের রূপ। কোনও জাগতিক পদার্থই কর্ম্মশূন্য হইয়া ক্ষণকালের জন্যও থাকিতে পারে না। যাহা অপূর্ণ, তাহাই কর্ম্মশীল। সংসার যখন কর্ম্মশীল, তখন নিশ্চয়ই বাঞ্ছিত পদার্থ পায় নাই, সুতরাং অপূর্ণ; সেইজন্য বিশ্বও অপূর্ণ।

সাধারণ রঙ্গভূমির নাট্যশালাতে নাটক অভিনয় দেখিতে যাইলে প্রত্যেক পট-পরিবর্ত্তনেই যেমন নূতন নূতন দৃশ্য দর্শকের নয়নগোচর হইয়া থাকে, সেইরূপ ভব-রঙ্গভূমেও প্রত্যেক পট-পরিবর্ত্তনেই অভিনব দৃশ্য দর্শকের দৃষ্টিতে ভাসমান হয়, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। ধীরভাবে জগৎ-রঙ্গভূমির নাটকাভিনয় পর্য্যবেক্ষণ করিলে দ্রষ্টা বুঝিতে পারেন যে, বিশ্বনাটক-অভিনেতৃগণ প্রত্যেক পট-পরিবর্ত্তনেই অভিনব দৃশ্য তাহার সম্মুখে ধরিলেও তাহার কোনওটাই নূতন নহে; তাহারা এমন কোনও দৃশ্য দেখাইতে পারে না, যাহার কোনও-না কোনও অংশ পূর্ব্বদৃষ্ট দৃশ্যের সদৃশ নহে। এরূপ কোনও অভিনয় বিশ্বরঙ্গভূমিতে অভিনীত হয় না, যাহা পূর্ব্বাভিনীত অভিনয় হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। বিশ্বনাট্যালয় শূন্য নহে, ইহার অভিনেতৃবর্গ তালজ্ঞান-বিহীন নয়। বিশ্ব যখন একবার আবির্ভাব, একবার তিরোভাব হইতেছে, তখন ইহা নিয়ত

গতিশীল, নিয়ত নর্ত্তনশীল। গতিমাত্রেরই তাল আছে, ক্রিয়ামাত্রেই তালে তালে হইয়া থাকে। কাল ও ক্রিয়ার যাহা মান, প্রতিষ্ঠ নিয়ম হেতু, তাহাকে তাল বলে। বিশ্ব তাল-বিহীন নহে। জগতের আবির্ভাব, স্থিতি ও তিরোভাব তালে তালেই হইতেছে, অনিয়মে হয় না; অনিয়মে হইলে জগতের অস্তিত্ব থাকিত না। সমুদ্রে তরঙ্গের পর তরঙ্গ, লহরীর পর লহরী উঠিতেছে, পড়িতেছে, ছুটিতেছে, তাহাও তালে তালে হইতেছে। যাহার যাহা নিয়ম, তাহাই তাহার তাল। যে-কোনরূপ রাগিণী হউক না কেন, তাহাই ষড় জাদি-স্বরযুক্ত হইবে, মধ্যমানাদি-তালযুক্ত হইবে। বিশ্ববীণা তালে বাজে, প্রকৃতি-নর্ত্তকী তালে নৃত্য করে। জগৎ-গায়ক তালে গায়, অর্থাৎ জগৎ নিয়মাধীন। জগৎ অনিয়মে পরিবর্ত্তন হয় না। জন্মাদি-জড়ভাব বিকার নির্দ্দিষ্ট-নিয়মাধীন। বিশ্ব-নাট্যশালা একটি অপূর্ব্ব রঙ্গালয়, এ রঙ্গের বিরাম নাই।

জগৎ অনিত্য, জাগতিক পদার্থ অস্থায়ী। জাগতিক পদার্থের যোগ-বিয়োগ অনিত্য হইলেও তাত্বিক পদার্থ নিত্য, জগৎ প্রবাহরূপে নিত্য। সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় বা আবির্ভাব ও তিরোভাবাত্মক জগৎ অনাদিকাল হইতে আছে এবং অনন্ত কালের জন্য থাকিবে। যে সূর্য্য, চন্দ্র, দ্যুলোক, ভূলোক, দেব, মনুষ্য এখন দেখিতেছি, হয়তো ইহারা থাকিবে না; কিন্তু না থাকিলেও, অন্য পদার্থ এই স্থান অধিকার করিবে, সুতরাং ইহার হ্রাস বৃদ্ধি নাই, ইহা অনাদিকাল হইতে আছে, থাকিবেও অনন্ত কালের জন্য। বীজ হইতে অঙ্কুর, অঙ্কুর হইতে উদ্ভিদ, উদ্ভিদ হইতে পত্র, পুষ্প ও ফলের উৎপত্তি হয়, তাহার পর আবার তাহার ক্রমে অবনতি হইয়া থাকে। প্রকৃতিতে সকলই নিত্য, নূতন,—নিত্য উৎপত্তি, উৎপত্তির পর শৈশব, শৈশবের পর যৌবন, যৌবনের পর বার্দ্ধক্য, আবার বার্দ্ধক্যের পর বাল্য ইত্যাদি। এইরূপে নিত্যই প্রলয়, নিত্যই উৎপত্তি, নিত্যই নবভাব। কাহারও এককালে লয় নাই, শূন্যত্ব নাই; কেবল অবস্থান্তর। কাহারও হঠাৎ উৎপত্তি হয় না, কাহারও শূন্য হইতে আবির্ভাব হয় না। যাহা ছিল তাহাই আসিতেছে, যাইতেছে, আবার আসিতেছে। কিছুই শূন্য ছিল না, বা শূন্য হইবে না; কেবল পরিবর্ত্তন, কেবল নবভাবের আবির্ভাব মাত্র। এই নিয়মেই সমুদ্র, পর্বত, ক্ষিতি, তেজ, অঙ্কুর, বৃক্ষ, কীট, পতঙ্গ,—এই নিয়মেই মানব,—এই নিয়মেই দানব,—আসিতেছে, যাইতেছে, আবার আসিতেছে।

সমুদ্রবক্ষে তরঙ্গ উঠিয়া সমুদ্রেই লীন হয়, আবার সমুদ্র বক্ষেই উঠে পড়ে; সেইরূপ বিশ্বের যে সকল পদার্থকে আমরা যায় আসে মনে করি, তাহারা বিশ্বের মধ্যেই যায় আসে, আগন্তুক নূতন কিছু আসে না, নূতন কিছু যায় না; যাহা আসে তাহাই যায়, যাহা যায় তাহাই আসে। অসতের উৎপত্তি ও সতের ধ্বংস নাই, সুতরাং একটু যায়ও না, আসেও না, জগৎ যাহা তাহাই আছে। যাহাকে আমরা যায় মনে করি, সে রূপান্তর পরিগ্রহ করিয়া অন্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় এই মাত্র বিশেষ; পদার্থ যাহা তাহাই থাকে, কেবল ভাবান্তর মাত্র; সুতরাং জগতের কিছু যায়ও না, আসেও না।

জগৎ যখন একমাত্র প্রকৃতিরই বিকাশ, শক্তিরই বিকাশ, শক্তিরই খেলা; সেই শক্তিই যখন স্ত্রীলিঙ্গ, তখন বিশ্বও স্ত্রীলিঙ্গ। বিশ্ব—শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধময়, সুতরাং শক্তিময়; বিশ্ব—ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোমময়, সুতরাং প্রকৃতিময়। জগতের আদ্যন্ত যখন শক্তিময় ও প্রকৃতিময়, তখন বিশ্ব স্ত্রীলিঙ্গময়। যাহাকে আমরা পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ বলিয়া মনে করি, তাহা একমাত্র স্ত্রীলিঙ্গেরই নানা সাজ; যেমন একজন স্ত্রীলোক—কাহারও মাতা, কাহারও কন্যা, কাহারও ভগিনী, কাহারও পত্নী ইত্যাদি নানারূপ উপাধি ধারণ করে, সেইরূপ একই স্ত্রীলিঙ্গের কোনওরকম বিকাশকে আমরা পুংলিঙ্গ ও কোনওরকম বিকাশকে ক্লীবলিঙ্গ বলিয়া থাকি। এই স্ত্রীলিঙ্গেই রঙ্গ, আদ্যাশক্তি বা মূল প্রকৃতির খেলা।

পতির শরীর-মধ্যে যে চিতের বিকাশ, পত্নীর শরীর-মধ্যেও সেই চিতের বিকাশ; পতির মধ্যে যে চিৎপুরুষ রহিয়াছেন, পত্নীর মধ্যেও সেই চিৎপুরুষ রহিয়াছেন, চিৎ সম্বন্ধে উভয়ই সমান। চিৎশরীরে ও সূক্ষ্মশরীরে লিঙ্গভেদ নাই; একমাত্র চিৎশরীরই ভোগায়তন, তাহাতেই লিঙ্গভেদ কল্পিত হয়। কেবল স্থূল শরীরের লিঙ্গভেদ হইয়া থাকে। পঞ্চভূতের দ্বারা গঠিত যে শরীর, তাহাই স্থূল শরীর, সুতরাং উহাও স্ত্রীলিঙ্গ। পতির স্থূল শরীর যাহার দ্বারা গঠিত, পত্নীর স্থূল শরীরও তাহারই দ্বারা গঠিত; উভয়েই প্রকৃতি সম্বন্ধে

সমান, সুতরাং উভয়ে স্ত্রীলিঙ্গ সম্বন্ধেও সমান। পতি ও পত্নী চিৎ সম্বন্ধে এক পাইলাম, সূক্ষ্মশরীর সম্বন্ধে এক পাইলাম, স্থূল শরীর সম্বন্ধেও এক সমান পাইলাম, প্রকৃতি ও শক্তি উভয় সম্বন্ধই সমান পাইলাম; সুতরাং স্ত্রী ও পুরুষের ভেদ কেথায় রহিল? সব একলিঙ্গ ও একপ্রকার হইয়া গেল। এক স্ত্রীলিঙ্গেরই লিঙ্গভেদ পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ। এক স্ত্রীলিঙ্গের উপর পুংলিঙ্গের মহানর্ত্তন এই মহাবিশ্ব। স্ত্রী-পুরুষের আলিঙ্গন যাহা, তাহা পরস্পর স্থূল শরীরেই হইয়া থাকে; সুতরাং বলিতে হইবে, স্ত্রীলিঙ্গই স্ত্রীলিঙ্গকে আলিঙ্গন করিতেছে, প্রকৃতিই প্রকৃতিকে সম্ভোগ করিতেছে। তুমি যাহা দেখিতেছ, ধরিতেছ, তাহা প্রকৃতিই প্রকৃতিকে দেখিতেছে ও ধরিতেছে। যদি বল, এ সকল মনের কার্য্য, অহঙ্কারের কার্য্য, তাহা ঠিক; তাহারও প্রকৃতি স্ত্রীলিঙ্গ; অর্থাৎ আমি, তুমি, তিনি—সমস্তই প্রকৃতি ভিন্ন আর কিছু নহে। আত্মা সম্বন্ধে পুরুষে যাহা, স্ত্রীতেও তাহা। যাহা কিছু ভেদ—শরীর সম্বন্ধে।

শরীর দুই প্রকার—স্থূল শরীর ও সূক্ষ্ম শরীর। এই অস্থিচর্ম্মাবৃত স্থূল শরীরের ভিতর সূক্ষ্ম শরীর রহিয়াছে; সূক্ষ্ম শরীর শক্ত্যাত্মক, শক্তির অষ্টাদশ অবয়ব দ্বারা সূক্ষ্ম শরীর গঠিত। শক্তি স্ত্রীলিঙ্গবাচক, সুতরাং সূক্ষ্ম শরীর স্ত্রীলিঙ্গ। স্থূল শরীর প্রকৃত্যাত্মক; প্রকৃতি স্ত্রীলিঙ্গবাচক, সুতরাং স্থূল শরীরও স্ত্রীলিঙ্গ। বিশ্বের সমস্তই যদি স্ত্রীলিঙ্গ হইল, তবে পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গভেদ কোথা হইতে আসিল? যেমন হস্তের পাঁচটি আঙ্গুল, একই উপাদানে গঠিত অথচ আকৃতিতে ভিন্ন—কোনওটা ছোট, কোনওটা বড়, নামগত ভেদ মাত্র, যেমন অঙ্গুষ্ঠ, তর্জ্জনী, মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠা, সেইরূপ একই স্ত্রীলিঙ্গ উপাদানে সর্ব্ব বিশ্ব গঠিত, আকৃতিগত ও নামগত ভেদে পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ লিঙ্গভেদ কল্পিত হইতেছে।

"বিশ্ব-মূল" খুঁজিতে গিয়া দেখি, কেহ বলেন মূল দুই, কেহ বলেন তিন, কেহ বলেন বহু—এই প্রকার মতভেদ। বেদান্ত ও সাংখ্যের মত দুই না হইলে সৃষ্টি হয় না, সুতরাং মূল দুই। গণিত-ভায়া বলেন, দাদারা সকলেই দিগগজ পণ্ডিত বটেন, কিন্তু মূলে ভুল। যদি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা যায়, তিন ও দুয়ের মূল কী? তখন তাঁহারা মাথা চুলকাইবেন। শত বল, সহস্র বল, দশ বল, বিশ বল, এক বাদ দিবার কাহারও সাধ্য নাই; এক বাদ দিলে সকলেই অস্তিত্ব হারায়, মূল নির্ম্মূল হইয়া পড়ে। লক্ষ বল, অনন্ত বল, কোটী বল, সকলেরই মূল এক; এক সকলেরই মধ্যে আছে, এক সকলের মূলে দণ্ডায়মান; কিন্তু একের মূলে কেহই নাই। একের বিকাশ অনন্ত, সহস্রকে ভাগ কর, একে যাইয়া পর্য্যবসিত হইবে। কিন্তু এককে অনন্ত ভাগ কর। একই অবশিষ্ট থাকিবে, কদাচ শূন্য হইবে না। শত শূন্য যোগ দিলেও এক হইবে না। সুতরাং শূন্যবাদীদের শূন্য হইতে জগৎ-আবির্ভাব কল্পনাভ্রম ভিন্ন আর কী বলিব? বেদান্তের দ্বৈত কল্পনা ব্রহ্ম ও মায়া, সাংখ্যের দ্বৈত কল্পনা প্রকৃতি ও পুরুষ ভ্রম। একের বিকাশ দুই, তাই অমূল বেদ মূল বাহির করিলেন এক বা একমেবাদ্বিতীয়ম; সুতরাং বিশ্বমূল এক। বিশ্ব অনন্ত; ব্যোমের যদি অন্ত কল্পনা করিতে পার, তবে অনন্ত বিশ্বেরও অন্ত কল্পনা করিও, নচেৎ করিও না।

এমন কোনও সৃষ্টি নাই, যাহার আদি আছে। এমন কোনও প্রলয় নাই, যাহার পর আর সৃষ্টি নাই। এমন কোনও মহাপ্রলয় নাই, যাহা অনন্ত বিশ্বকে ধ্বংস করে। মহাপ্রলয়ে কোনও কোনও বিশ্ব, বিশ্ববীজে লীন হয়; সর্ব্বধ্বংসরূপ মহাপ্রলয় কস্মিনকালে হয় নাই, হইবেও না। কালের যদি আদি কল্পনা করিতে পার, তবে সৃষ্টির আদি কল্পনা করিও। আর কালের যদি আদি কল্পনা করিতে না পার, তবে সৃষ্টিরও আদি কল্পনা করিও না। কালের আদি অন্ত যাহা, সৃষ্টিরও আদি অন্ত তাহা। বিশ্ব অনাদিকাল হইতে একবার ব্যক্ত আর একবার অব্যক্ত এইরূপে আবর্ত্তিত হইতেছে, হইবেও অনন্ত কালের জন্য।

তুমি বিছানায় শয়ন কর যে কারণে, বিশ্বও অব্যক্তে শয়ন করে সেই কারণে। তোমার বিছানায় শয়ন করিবার অর্থ এই যে, দিবসে নানা কার্য্যে পরিশ্রম করিয়া ক্লান্ত হইয়াছ, সেই ক্লান্তি নিবারণার্থ বিছানায় শয়ন করিয়া রাত্রে নিদ্রা যাও। বিশ্বও দিবসের কার্য্যে ক্লান্ত হইয়া তাহা নিবারণ করিবার জন্য রাত্রে অব্যক্ত প্রকৃতিশয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রা যায়। তোমার যেমন দিবা-রাত্রি আছে, বিশ্বেরও সেইরূপ দিবা-রাত্রি আছে। তুমি ক্ষুদ্র, তোমার দিবা-রাত্রিও ক্ষুদ্র; বিশ্ব বড় তাহার দিবা-রাত্রিও বড়। তোমার সামান্য পরিশ্রমের পর

সামান্য নিদ্রা; বিশ্বের মহাপরিশ্রমের পর মহানিদ্রা। তুমি যেমন এই নিয়মে অনাদি কাল হইতে চলিয়া আসিয়াছ এবং চলিবেও অনন্ত কাল; বিশ্বও সেইরূপ এই নিয়মে অনাদি কাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে, এবং চলিতে থাকিবেও অনন্ত কাল; ইহাই প্রলয় ও মহাপ্রলয়। তুমি নিদ্রাভঙ্গে যেমন জাগরিত হও, বিশ্বও সুষুপ্তিভঙ্গে সেইরূপ জাগরিত হয়। তোমার নিদ্রাভঙ্গের যে কারণ, জগৎসুষুপ্তি ভঙ্গেরও সেই কারণ। বিশ্বেরও জাগ্রৎ সুষুপ্তির নিয়ম আছে। তোমার যেমন সারাদিন জাগিবার নিয়ম এবং রাত্রে নিদ্রা যাইবার নিয়ম, বিশ্বেরও সেই নিয়ম। বিশ্বও যতক্ষণ জাগিবে, ততক্ষণ নিদ্রা যাইবে।

আমাদের যেমন ছোট নিশা বড় নিশা আছে, বিশ্বেরও সেইরূপ ছোট নিশা বড় নিশা আছে। আমাদের ছোট নিশা গ্রীষ্মকালের রাত্রি, বড় নিশা শীতকালের রাত্রি। বিশ্বেরও মন্বন্তর প্রলয়, দিবাপ্রলয় ছোট নিশা; মহাপ্রলয় মহানিশা। মন্বন্তর প্রলয়ে মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক ও সত্যলোক ব্যতীত তাবৎ সংসার প্রলয়শয্যায় শয়ন করে। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি ৭১ বার অতিক্রান্ত হইলে এক মন্বন্তর হয়। এই প্রকার রাত্রি, ইহাই বিশ্বের ছোট রাত্রি। এই প্রকারে চতুর্দ্দশ মনুর অবসানে ব্রহ্মার একদিন অতিবাহিত হয়; ব্রহ্মার রাত্রিও এই রূপ। বিশ্বেরও দিবা-রাত্রি এইরূপ। বিশ্বের মহারাত্রি হইতেছে মহাপ্রলয়, তাহাই বিশ্বের বড় নিশা; মহাপ্রলয়ে আব্রহ্ম কীট কিছুই থাকে না। ৮০০০০০৬৪০০০০০০০, আট পদ্ম চৌষট্টি কোটী সংবৎসরে ব্রহ্মার অহোরাত্র, এইরূপ শত বৎস ব্রহ্মার পরমায়ু।

আর্য্যভূমি ভারতবর্ষ

ভারত-শ্রেষ্ঠ স্থান নাই, আর্য্য-শ্রেষ্ঠ জাতি নাই, ব্রহ্মচর্য্য-শ্রেষ্ঠ শক্তি নাই, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। ভারত, রাজর্ষি-পালিত একমাত্র আদি স্থান। মহামোক্ষধাম, মহাপুণ্যস্থান, মহাতীর্থস্থান যে আর্য্যভূমি, তাহাই ভারতবর্ষ। প্রভা-বর্ষণে বড় যে স্থান, তাহাই ভারতবর্ষ। যাহা সর্ব্বপ্রভার স্থান অর্থাৎ যে স্থানে সকল পদার্থের দীপ্তি, সকল পদার্থের প্রকাশ আছে, যে ভাণ্ডারে সকল পদার্থেরই এবং সমস্ত রত্নের সমাবেশ আছে, তাহাই ভারতবর্ষ। তপোবলে প্রভাবিত যে ব্রহ্মলোক, তাহা এই ভারতেরই প্রভা। সূর্য্য, চন্দ্র, ধ্রুব, নক্ষত্রাদির যে প্রভা, তাহা এই ভারতেরই প্রভা। জ্ঞান-বিজ্ঞানে আলোকিত যে মহর্লোকাদি, তাহা এই ভারতেরই দীপ্তি। বেদ, বেদান্ত, দর্শন, সাহিত্য, আয়ুর্ব্বেদ, গান্ধর্ব্ব-বেদ, জ্যোতিষশাস্ত্র প্রভৃতির যে প্রভা, তাহা এই ভারতেরই প্রভা। সুতরাং, সর্ব্ব পদার্থের আকর যে স্থান, সর্ব্বপ্রভা বর্ষণের কেন্দ্র যে স্থান, তাহাই ভারতবর্ষ।

যাহা বিশ্বকেন্দ্র, তাহাই ভারতবর্ষ। কেন্দ্রস্থানেই সকল পদার্থের সংযোগ, সকল পদার্থের প্রকাশ। পদার্থের যাহা কিছু শক্তি, যাহা কিছু ভাব, যাহা কিছু কার্য্য, সমস্তই কেন্দ্র হইতে বহির্গত হয়। কেন্দ্রে যাহার প্রকাশ নাই, বিস্তারেও তাহার বিকাশ নাই; বিস্তারে যাহার প্রকাশ আছে, কেন্দ্রেও তাহার বিকাশ আছে; সুতরাং বিস্তারিত বিশ্বে যে পদার্থের বিকাশ আছে, বিশ্বকেন্দ্রেও সেই পদার্থের প্রকাশ আছে। সকল পদার্থই কেন্দ্র-আশ্রয়ী, সকল পদার্থেরই কেন্দ্র আছে। বিশ্ব যখন পদার্থ, তখন বিশ্বেরও কেন্দ্র আছে। যাহা বিশ্বকেন্দ্র, তাহাই ভারতবর্ষ; সুতরাং ভারতে সর্ব্ব পদার্থেরই সমাবেশ আছে। যাহা নাই ভারতে, তাহা নাই সৃষ্টিতে; যাহা আছে সৃষ্টিতে, তাহা আছে ভারতে; সুতরাং ভারত বিশ্বকেন্দ্র। ভারতবর্ষ কর্ম্মভূমি—কর্ম্মস্থান; ভারত ছাড়া, আর সমস্তই নরক ভোগস্থান। কর্ম্ম ব্যতীত ভোগ অসিদ্ধ। আব্রহ্ম কীট সকলই ভোগদেহ, একমাত্র আর্য্যজীবনই কর্ম্মদেহ। ব্রহ্মলোকাদি যখন ভোগস্থান, ব্রহ্মকায়াদি যখন ভোগদেহ, তখন তাহাদিগের কর্ম্মদেহ এবং কর্ম্মস্থান থাকা চাই; সেই কর্ম্মস্থান ভারতবর্ষ, এবং কর্ম্মদেহই আর্য্যদেহ। যে ব্রহ্মজ্ঞান-প্রভায় প্রভাবিত ব্রহ্মলোক, সেই ব্রহ্মার ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তির কর্ম্মস্থান এই ভারতবর্ষ এবং কর্ম্মদেহ আর্য্যদেহ। দেবের দেবত্ব, মনুষ্যের মনুষ্যত্ব, পশুর পশুত্ব, কীটের কীটত্ব, সমস্তই ভারতের আর্য্যের কর্ম্ম। এই ভারতে যে যেরূপ কর্ম্ম করিবে, সে সেইরূপ ফল পাইবে। সৎকার্য্য কর, ক্রমে ঊর্দ্ধগতি হইয়া ব্রহ্মত্ব, শেষে মুক্তি পর্য্যন্ত পাইবে। অসৎ কার্য্য কর, ক্রমে অধোগতি হইয়া কীটাদি নারকী গতি প্রাপ্ত হইবে।

মনুষ্যজীবন জীবশ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী অবস্থা। এই মনুষ্যজন্মে যিনি যেরূপ কর্ম্ম করিবেন, তিনি তদুপযুক্ত লোকে গমন করিবেন। দেবের দেবত্ব, পশুর পশুত্ব, সমস্ত শক্তিই আর্য্য শক্তির অন্তর্নিবিষ্ট; সমস্ত শক্তিই মনুষ্যশক্তিতে নিহিত আছে; মনুষ্য সর্ব্বশক্তির আধার। ভারতের সমস্তই যখন ভোগস্থান—স্বর্গই হউক বা নরকই হউক; বিশ্ব যখন প্রাণিব্যাপ্ত—দেবই হউক, পশুই হউক বা কীটই হউক; সমস্তই ভারত হইতে আগত। বিশ্ব আর্য্যময়, আর্য্য প্রাণিময়। ভারতের আর্য্যজীবনের কর্ম্মের ফল হইতে উৎপন্ন ভোগাক্রান্ত তমোগুণী জন্মই পশুপক্ষ্যাদি ভোগদেহ, সত্বগুণান্বিত দেহই দেবদেহ। বিশ্ব যখন প্রাণিব্যাপ্ত, সুতরাং বলিতে হইবে বিশ্ব আর্য্যময়, আর্য্য প্রাণিময়; সুতরাং ভারতবর্ষ বিশ্বকেন্দ্র, এবং আর্য্য শক্তিকেন্দ্র।

যত কিছু শক্তি, সমস্তই মনুষ্য-সমাবেশ; অন্য যত কিছু শক্তি, সমস্তই বদ্ধশক্তি। মনুষ্যশক্তিকে দেবগুণে উন্নত কর, দেবত্ব প্রাপ্ত হইবে; পশুগুণে অবনত কর, পশুত্ব প্রাপ্ত হইবে। মনুষ্যকেন্দ্র হইতে দেবতাও নির্গত হইয়াছে, পশুও নির্গত হইয়াছে; যাহার যেরূপ কর্ম্ম, তাহার সেইরূপ জন্ম।

শক্তি দুই প্রকার—বদ্ধশক্তি ও মুক্তশক্তি। যে শক্তি বাড়াইবার উপায় নাই, তাহাই বদ্ধ শক্তি; আর যে শক্তি বাড়াইবার উপায় আছে, তাহাই মুক্ত শক্তি। একমাত্র মনুষ্যই মুক্তশক্তির অধিকারী। আব্রহ্ম কীট সকলই

বদ্ধশক্তির অধিকারী। দেব ও পশু যে শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সেই শক্তিই ভোগ করিতেছে; তাহাদের সেই শক্তির উৎকর্ষ বা বর্দ্ধন করিবার উপায় নাই, কারণ প্রকৃতি কর্ত্তৃক সীমাবদ্ধ। ইন্দ্র যদি ইচ্ছা করেন, আমি ইন্দ্রত্বে অবস্থিতি করিয়া কর্ম্মপ্রভাবে শক্তি বর্দ্ধিত করিয়া ব্রহ্মত্ব লইব, তাহা তিনি পারিবেন না; সেইরূপ পশু-পক্ষী কাহারও কোন ক্ষমতা নাই। আর্য্য ছাড়া অন্যান্য জীবগণের জ্ঞান কেবল আহারবিহারাদি-ভোগমূলক। ইহারা যে জ্ঞানের সহিত জন্মগ্রহণ করিয়াছে, যাবজ্জীবন তাহাই লইয়া বাস করে; সহজাত জ্ঞানের বৃদ্ধি করিবার শক্তি বা সহজাত জ্ঞানকে অতিক্রম করিবার সামর্থ্য ইহাদের নাই, অর্থাৎ প্রকৃতিদত্ত সীমা লঙ্ঘন করিতে ইহারা পারে না। মনুষ্য কিন্তু তাহার বিপরীত, মনুষ্য যাহা ইচ্ছা করিবে, তাহাই করিবার তার শক্তি আছে।

ব্রহ্মা যদি মনে করেন আমি মুক্ত হইব, মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করিব, তাহা তিনি পারেন না; তাঁহার সীমাবদ্ধ আয়ুর অন্তে মুক্ত হইবেন। দেবতারা মন্বন্তরজীবী; যদি কেহ মনে করেন মরিয়া যন্ত্রণার হাত এড়াইব, তাহা পারিবেন না। মন্বন্তরের এদিকে কিছুতেই মৃত্যু নাই। আবার যদি মনে করেন মন্বন্তরের অতীতে বাঁচিব, তাহাও পারিবেন না। কারণ ভোগদেহ কর্ম্মরহিত, সুতরাং সহজাত ক্ষমতার বৃদ্ধি নাই। পক্ষান্তরে মনুষ্য সকলই পারে; মনুষ্য ইচ্ছা করিলে এই মুহূর্ত্তেই মরিতে পারে, ইচ্ছা করিলে দেবায়ুর অধিক বাঁচিতে পারে, ইচ্ছা করিলে এই জীবনে দেবত্ব লইতে পারে, পশুত্ব লইতে পারে, ব্রহ্মত্ব লইতে পারে, এমনকি মুক্তি পর্য্যন্ত লইতে পারে। যদি বল, দেবতারা অণিমাদি-ঐশ্বর্য্যশালী, তবে কেন মনুষ্য হইতে শ্রেষ্ঠ হইবেন না? না হইবার কারণ এই, শক্তি স্বোপার্জ্জিত নহে, জ্ঞানোৎকর্ষ হেতু প্রাপ্ত নহে; প্রকৃতিদত্ত। যেমন মধুমক্ষিকা সুন্দর মধুচক্র নির্ম্মাণ করে, মনুষ্য তাহা পারে না; তাই বলিয়া কি মনুষ্য, শক্তিতে অথবা জ্ঞানে মধুমক্ষিকা হইতে ন্যূন? ইহাও সেইরূপ। মনুষ্য যখন এই জীবনে ঈশ্বরত্ব লইতে পারে, তখন অণিমাদি ত অতি তুচ্ছ বিষয়। ইহা দ্বারা বেশ জানা যায় যে, শক্তিতে আর্য্য শ্রেষ্ঠ; সেইজন্য দেবতারাও আর্য্যভূমি ভারতে মনুষ্যজন্ম গ্রহণকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করেন।

স্বর্গের দেবত্ব অপেক্ষাও ভারতে মনুষ্যদেহ লাভ করা, ভাগ্যবানেরই হইয়া থাকে; কেননা সুকৃতিগণই ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বর্গভোগ ও মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। এই ভারতে পুরুষগণ জন্মলাভ করিয়া স্ব স্ব সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক কর্ম্ম করিয়া যথাক্রমে আপনাদের স্বর্গ ও নরকগতি আপনারাই বিধান করে; যেহেতু এই ভারতে সকল ব্যক্তির সকল প্রকার গতি কর্ম্মানুসারে হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষে মনুষ্যজন্ম সর্ব্বপুরুষার্থের সাধন বলিয়া দেবতারাও গান করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, এই সকল মানব কি অনির্ব্বচনীয় পুণ্য করিয়াছিল, যেহেতু স্বয়ং ভগবান সাধন ব্যতিরেকেও ইহাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন। এই সকল লোক ভারতভূমির মধ্যে মানবকুলে মুকুন্দসেবার উপযোগী জন্ম লাভ করিয়াছেন; আর আমরা কল্পান্ত পর্য্যন্ত পরমায়ুঃ প্রাপ্ত হইয়া এই যে স্বর্গরাজ্য জয় করিয়াছি, ইহার পরেও ত আবার জন্মগ্রহণ করিতে হইবে; অতএব আমাদের এস্থান জয় করা অপেক্ষা, মানবগণ অল্পায়ু হইয়া যে ভারতভূমি জয় করে, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; কারণ সেই সকল ব্যক্তি মানবদেহ দ্বারা, ক্ষণকালেই স্ব স্ব কৃতকর্ম্ম দ্বারা ভগবানের অভয়পদ বা মুক্তিপদ সম্যক প্রকারে প্রাপ্ত হইতে পারে, যাহা আমরা কিছুতেই পারি না।

যে সকল প্রাণী এই ভারতভূমিতে জ্ঞান, ক্রিয়া ও ঐশ্বর্য্যপূর্ণ মানবজন্ম প্রাপ্ত হইয়াও মোক্ষার্থ যত্ন না করে, তাহারা পক্ষীদিগের ন্যায় পুনরায় বন্ধন প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ জালবদ্ধ পক্ষীগণ ব্যাধ কর্ত্তৃক মুক্ত হইয়াও পুনর্বার যেমন অসাবধানতা প্রযুক্ত সেই বৃক্ষে বিহার করিতে গেলে বদ্ধ হয়, তাহাদের ন্যায় ওই সকল লোক ভারতভূমিতে মোক্ষার্থ জন্মলাভ করিয়াও স্ব স্ব কর্ম্মদোষে পুনর্বার বদ্ধ হয়।

ভারতে যে যাহা কামনা করিয়া ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হয়, তাহাই তাহার সফল হয়। ভারতবর্ষ প্রকৃতি দেবীর লীলাভূমি। প্রকৃতিতে যাহা কিছু ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য আছে, ভারতে তাহার কিছুরই অভাব নেই। প্রকৃতি সমগ্র পৃথিবীর যে প্রদেশে যে ভাবে বিরাজিত, এই ভারতবর্ষে সেই সেই ভাবেই বিরাজমান। পরমেশ্বর প্রকৃতির

সেই রূপ, সেই দৃশ্য, সেই চিত্র, সেই ঐশ্বর্য্য ও সেই মাধুর্য্য ভূমণ্ডলের ভিন্ন ভিন্ন ভাগে যথাযোগ্য ভাবে জীবের ভোগের নিমিত্ত অর্পণ করিয়া, পরে ঐ সকল ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্যের একত্র সমাবেশে কী প্রকার শোভা হয় দেখিবার জন্যই যেন, ধরাধামে আদর্শস্বরূপ আর্য্যজাতির লীলাক্ষেত্র কর্ম্মভূমি ভারতভূমির সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রকৃতিতে এমন কোন বস্তু নাই, যাহার কিছু আভাস ভারতে পাওয়া যায় না। ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যপূর্ণ সর্ব্ববিধ দৃশ্য একত্র ভারত ভিন্ন আর কোথাও দৃষ্ট হয় না।

ভারত যেমন সৃষ্টিবৈচিত্র্যের পূর্ণ লীলাভূমি, এমন আর পৃথিবীতে দ্বিতীয় দেখিতে পাওয়া যায় না। ভারতের ভূভাগ যত প্রকারের উদ্ভিদ ও শস্য প্রসব করিতে সমর্থ, পৃথিবীর কোনও একটি এমন দেশ দেখিতে পাওয়া যায় না, যে তাহার প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ হয়। ভারতের পর্ব্বতমালার নিকট ভূমণ্ডলের সমস্ত শৈলশিখর মস্তক অবনত করিয়া রহিয়াছে। গন্ধপুষ্পে সুশোভিত, বিচিত্র সৌরভে আমোদিত ভারতের বন উপবন চিত্র বিচিত্র রঙ্গে ত্রিজগতের মন ভুলাইতে যেমন সমর্থ, পৃথিবীর কোন বন উপবন তাদৃশ রূপের ছটা লইয়া তাহাদের পরিচর্য্যার আসনও গ্রহণ করিতে পারে না। পৃথিবীর দক্ষিণ প্রান্তে একটি গৌরবর্ণ মনুষ্য জন্মান যেমন কঠিন, উত্তরপ্রান্তেও সেইরূপ একটি কৃষ্ণকায় মনুষ্য জন্মান অসম্ভব; কিন্তু ভগবানের বিচিত্র বিহারভূমি ভারতবর্ষে সেরূপ দৃষ্ট হয় না। কি জানি, ভগবান কিরূপ তুলাদণ্ডে তৌল করিয়া তাঁহার অনন্ত শক্তিরাশির অনন্ত বিকাশভাণ্ডার সাম্যাবস্থায় এই ভূমিতে, স্তরে স্তরে, থরে থরে, সাজাইয়া রাখিয়াছেন। অন্যান্য দেশের কোথাও কেবল কৃষ্ণবর্ণ, কোথাও কেবল গৌরবর্ণ, কোথাও কেবল কপিলবর্ণ ইত্যাদির মেলা বসিয়াছে। ভারতে কিন্তু কৃষ্ণবর্ণ, শ্যামবর্ণ, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, গৌরবর্ণ, অথবা পৃথিবীর কোষে যত বর্ণমালা আছে, সকল বর্ণের ঢেউ খেলিয়া ভারতমহিমাকে অবর্ণনীয় করিয়া তুলিয়াছে। অতি শীতে পৃথিবীর কত দেশ চিরদিন থরথর কাঁপিতেছে, অতি তাপের জ্বালায় কত দেশ দগ্ধ হইয়া যাইতেছে, কিন্তু ভারতের বিচিত্র প্রকৃতিতে গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত, সকল ঋতুই সখ্যভাবে হাত ধরাধরি করিয়া নিয়মপূর্ব্বক যথাসময়ে নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে। ভারত প্রকৃতির শিল্পশালায় যাহা চাহিবে, তাহাই পাইবে। একই স্থানে বসিয়া যদি পৃথিবীর সকল স্থানের শোভা সমৃদ্ধি, সুখ সম্ভোগ করিতে হয়, তবে এক ভারতেই বসিয়া তাহা করিতে পারা যায়। সকল রসই ভারত প্রকৃতির পদসেবা করিয়া ঝির ঝির ধীর ধীর ধারায় বহিয়া যাইতেছে। যিনি যে রসের রসিক হউন না কেন—ভারতের বিচিত্র রসময়ী প্রকৃতি তাঁহার সাধ মিটাইতে সমর্থ হইবে। ভারতনিবাসীই আদিম মনুষ্য, আদিম শিক্ষিত, আদিম সভ্য, আদিম কবি, আদিম বিজ্ঞানবিৎ, আদিম ধার্ম্মিক, আদিম জ্ঞানী, আদিম যোগী, আদিম মননশীল, এবং আদিম ভগবদভক্ত। আদিম শাস্ত্র, আদিম ভাষা, ভারতবর্ষেই প্রথম প্রচারিত হয়। এই সেই ভারতবর্ষ, যেখানে মনু, যাজ্ঞবল্ক্য বক্তা, বশিষ্ঠাদি উপদেষ্টা, শুকদেবাদি তপস্বী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সেই অগস্ত্যমুনির জন্মস্থান ভারতবর্ষ, যিনি গণ্ডূষে সপ্তসমুদ্র শোষণ করিয়াছিলেন। বাল্মীকির কোমল প্রকৃতি ও ভক্তিভাব, বশিষ্ঠের ক্ষমা ও শান্ত ভাব, কর্ণের বদান্যতা ও বৈরাগ্যভাব—জানি না কি কুহকে সমস্তই যেন, নাট্যশালায় অভিনয়ের ন্যায়, কিছুক্ষণের জন্য কিয়ৎ পরিমাণে কার্য্য করিয়া, লীলাময়ীর লীলাপটের অন্তরালে প্রবেশ করিল।

এই সেই ভারতবর্ষ, যাহার কন্দরে কন্দরে, গুহায় গুহায়, কত তেজঃপুঞ্জ মহা মহা যোগী ও ঋষিগণ ধ্যানস্তিমিত নেত্রে মহাধ্যানে মগ্ন আছেন। এই সেই ভারত—রাজর্ষি-পালিত রত্নাকরবেষ্টিত রত্নবর্ষি-ভারতবর্ষ, যেখানে আদ্যাশক্তি পতিতপাবনী গঙ্গা পতিতপাবন গাঙ্গেয়কে গর্ভে ধারণ করিয়া ভীষ্মজননী নামে খ্যাত হইয়াছেন। এই সেই ভারত, যেখানে সুরধুনী সুরলোক ত্যাগ করিয়া আর্য্যগলে বরমাল্য দোলাইবার জন্য মর্ত্তে আগমন করিয়া কৃতার্থ মনে করিয়াছেন। এই সেই ভারত, যেখানে পতিতপাবনী গঙ্গা কুল কুল নাদে প্রবাহিত হইতেছেন, যাঁহার পবিত্র বারিতে কত পাপী তাপী উদ্ধার পাইতেছে, যাঁহার তটে ঘাটে কত তপস্তেজঃপূর্ণ তাপসগণ, মুনিগণ ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণীযুক্ত সামগান করিতেন,—যে সামধ্বনিতে গন্ধর্ব্বলোক, দেবলোক, ব্রহ্মলোক পুলকিত হইত। যেখানে সামগানে পাষাণ বিগলিত, শক্তি দ্রবীভূত হইত,

আজ সেই ভারত কালের বশে ম্রিয়মাণ হইয়া রহিয়াছে, ইহা অপেক্ষা আমাদের দুর্ভাগ্য আর কী হইতে পারে!

বিশ্ব বা জগৎ দুই ভাগে বিভক্ত,—এক আর্য্যবিশ্ব, আর এক অনার্য্যবিশ্ব। শক্তিকেন্দ্র মনুষ্য এবং বিশ্বকেন্দ্র ভারত। প্রাণীও দুইভাগে বিভক্ত,—এক আর্য্য আর এক অনার্য্য। শক্তিও দুইভাগে বিভক্ত,—এক আর্য্যশক্তি আর এক অনার্য্যশক্তি। যে শক্তি সত্বগুণী, তাহাই আর্য্যশক্তি; যাহা রজঃ ও তমোগুণী শক্তি, তাহাই অনার্য্যশক্তি। যাহাদের বিধিতে উপবাসের ব্যবস্থা আছে, তাহারাই আর্য্য। উপবাসবর্জ্জিত অর্থাৎ যাহাদের বিধিতে উপবাসের নিয়ম নাই, তাহারাই অনার্য্য।

উপবাস কারে বলি? পাপ হইতে নিবৃত্ত এবং সর্ব্বভোগবর্জ্জিত যে অবস্থা, তাহাই উপবাস। সাধারণতঃ অনশনকেই উপবাস বলা হয়। একমাত্র অনশনে সমস্ত কুপ্রবৃত্তি অর্থাৎ রজঃ ও তমোগুণ দমিত থাকে, সুতরাং সত্বগুণ বর্দ্ধিত হয়। উপবাস সত্বগুণ-বর্দ্ধক, অনুপবাস তমোগুণ-বর্দ্ধক; সত্বগুণ-বর্দ্ধক উপবাস বিধেয়। বিধিবদ্ধ যে জাতি, তাহাই আর্য্যজাতি; উপবাসবর্জ্জিত যে প্রাণী, তাহাই অনার্য্য। উপবাসব্রতী প্রাণী যে স্থানে বাস করে, তাহাই আর্য্যবিশ্ব; আর উপবাসবর্জ্জিত প্রাণী যে স্থানে বাস করে, তাহাই অনার্য্যবিশ্ব। আর্য্যবিশ্ব ভারত, অনার্য্যবিশ্ব ভারত ব্যতীত সমস্ত দেশ। আর্য্যবিশ্ব কর্ম্মভূমি, আর অনার্য্যবিশ্ব স্বেচ্ছাবিধিচালিত একমাত্র ভোগস্থান যে সকল দেশ। যেহেতু ভোগস্থান, সেই হেতু কর্ম্মবর্জ্জিত, সুতরাং বিধিবর্জ্জিত। আব্রহ্ম কীট সকলই অনার্য্য, যেহেতু, উপবাসবর্জ্জিত। আর্য্য আশ্রয়, অনার্য্য আশ্রয়ী।

আর্য্য দাতা, অনার্য্য গ্রহীতা। অনার্য্য প্রাণী সকলেই আর্য্যদত্ত অন্ন ভক্ষণ করিয়া জীবনধারণ করে। উপবাসব্রত ভারতে আর্য্য ছাড়া আর কাহারও নাই; কারণ তাহারা কর্ম্মী নয়, কেবল ভোগী; ভোগী বলিয়াই ক্ষুধাতুর, ক্ষুধাতুর বলিয়াই সকলেই আর্য্যের শরণপ্রার্থী—আর্য্যগৃহে অতিথি। একমাত্র আর্য্যই অতিথিসৎকারী—নিজে না খাইয়াও অতিথিকে দেয়, আর্য্যগৃহে দেবতারাও অতিথি।

বিশ্বে একমাত্র আর্য্যই রক্ষক। বিমল সত্বগুণ-বিশিষ্ট আর্য্যের মহাবিজ্ঞান—রক্ষা পাইবার উপায় আবিষ্কারের হস্ত, সকলকে রক্ষা করিবার জন্য ব্যস্ত। নিজের প্রাণ অন্যকে দিয়া অপরের জীবন বাঁচাইতে আর্য্যই অভ্যস্ত, ইহারা ভিন্ন আর কেহ নাই। আর্য্যের সত্বগুণী বুদ্ধির বিমল বিকাশ হইতে বিমল মহাবিজ্ঞান আবিষ্কৃত হইয়া থাকে।

যাঁহারা মহাবিজ্ঞানে আরূঢ় হইয়া মৃতকে অমৃতময়, অশান্তিকে শান্তিময়, দুঃখকে সুখময় করিয়াছেন—রাক্ষসিক, পৈশাচিক ও পাশবিক তমোগুণ হইতে রক্ষিত হইয়াছেন, তাঁহারাই ধন্য। বহু জন্মের পুণ্যপ্রভাবে ভারতে আর্য্যজন্ম লাভ হয়। ভারতে যখন আর্য্যজন্ম লাভ হইবে, তখনই প্রাণ শীতল হইবে, জীবন কৃতার্থ হইবে, ধার্ম্মিক ও পুণ্যবান হইবে, সুতরাং মুক্তির অধিকারী হইবে।

অহংতত্ব

অহংতত্ব শব্দের অর্থ—আমি কে? এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে গেলেই বিষম সমস্যায় পতিত হইতে হয়। মনে মনে স্থিরচিত্তে অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতের প্রতি যখন দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায়, তখন মনে সর্ব্বদাই এই প্রশ্ন উত্থিত হয় যে, আমি কে? কোথা হইতে আসিয়াছি, কি জন্য আসিয়াছি, কে আনিয়াছে, কি জন্য আনিয়াছে, আমার কর্ত্তব্যকার্য্য কি, যে কার্য্যের জন্য আসিয়াছি তাহারই বা করিলাম কি? যখন কোন মানব তাঁহার আকৃতি, প্রকৃতি, শক্তি ও অবস্থিতির বিষয় আলোচনা করিতে করিতে বাহ্যজগৎ পর্যবেক্ষণ করেন, তখনই এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার চিন্তাপথে পতিত হইয়া, একটি অতি ক্ষুদ্র ও একটি অতি বৃহৎ, এই দুইটি পরস্পর বিরোধী ভাবের আবির্ভাব করাইয়া দেয়। তিনি তখন বোধ করেন, আমি যে পৃথিবীতে বাস করিতেছি, তাহা এই অসীম বিশ্ব সম্বন্ধে, একটি ক্ষুদ্র বালুকাকণা হইতেও ক্ষুদ্রতর এবং আমি স্বয়ং স্বকীয় ক্ষমতাবলে, বুদ্ধিবলে, সসাগরা ধরার ও সমস্ত জীবের উপর আধিপত্য স্থাপনে সমর্থ হইয়াও ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে ক্ষুদ্র হইতেও ক্ষুদ্রতর। ক্ষুদ্রতম নিকৃষ্ট কীটের যে দশা, আমি উৎকৃষ্ট মানব—আমারও সেই দশা। সে-ও কালে উৎপত্তি দ্বারা প্রকাশ পাইয়া সুখ-দুঃখ, আহার-নিদ্রা, ধর্ম্ম-কর্ম্ম ভোগ করিয়া কালেই বিলীন হইতেছে, আমিও কালধর্ম্মে জন্মলাভ করিয়াছি এবং সুখ-দুঃখ, আহার-নিদ্রা, ধর্ম্ম-কর্ম্ম উপভোগ করিয়া আবার কালগর্ভেই মিশিয়া যাইব। এই কি আমি? এই কি আমার পরিণাম? এই পর্য্যন্তই কি আমার আমিত্বের শেষ? কি কার্য্য করিতে আসিয়াছি, কি করিয়াই বা যাইব?

ভাবনা বা চিন্তা, ইহা জ্ঞান ক্রিয়া; ভাবিতেছি বা চিন্তা করিতেছি বলিলে বুঝা যায় যে, এক্ষণে জ্ঞান কার্য্য করিতেছে, কার্য্যমাত্রই শক্তিসাধ্য; জ্ঞান কার্য্য করিতেছে বলিলে বুঝা যায়, আত্মশক্তির প্রকাশ হইতেছে। শক্তিমাত্রেই সত্বাশ্রিত, বিনা আশ্রয়ে শক্তি থাকিতে পারে না। আত্মশক্তি আছে বলিয়াই, মূলে ধীমান চেতন পুরুষ অর্থাৎ আমি আছি।

আমাদের স্ব স্ব আত্মা আছে, ইহা নিশ্চিত অর্থাৎ সত্য। আমি আছি, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। যদি কেহ বলেন আমি নাই, তিনি যদি বাস্তবিকই না থাকেন, তবে আমি নাই এ কথা বলিলেন কে? আমি চিন্তা করি, আমি মনন করি, আমি কত মতলব করি, এই হেতু আমি আছি। চিন্তা আত্মার স্বকীয় গুণ, এই জন্য চিন্তা দ্বারা আত্মার অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। অন্যের সহিত আলাপ করিতে হইলে, বাক্য ব্যবহার করিতে হয়; কিন্তু আপনার সহিত আলাপ করিতে হইলে, বাক্যের অর্থস্বরূপ পদার্থ সকলের আন্তরিক চিন্তা করিতে হয়। এখানে বাক্যব্যয়ের প্রয়োজন হয় না, এখানকার আমি স্বয়ং তাহা জ্ঞান হয়। আমি আছি ইহা যেমন আত্মার একটি স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞান, আমি হই ইহাও সেইরূপ আত্মার স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞান; মনে কর, আমি একজন দরিদ্র আছি, আমার সর্ব্বদাই ইচ্ছা হয় যে বড়লোক হই; সেইরূপ আমি আছি, সেও ইচ্ছা করে তৎ হই অর্থাৎ ব্রহ্ম হই।

চেতন ও অচেতনের গ্রন্থিস্থানই অহংকার। পুরুষ ও প্রকৃতির আসক্তিতে বা মিলনে অহংবুদ্ধি উৎপন্ন হয়, ওই বুদ্ধিস্থ জ্ঞানাংশই আমি-পদবাচ্য জীবাত্মা। আমি ধ্যানদৃষ্টি দ্বারা বা চিন্তা দ্বারা অহংকারতত্বকে বিদিত হইতে পারি। অতএব অহংকারতত্ব জ্ঞেয় ও ভোগ্য। আমি যে বস্তুকে জানিতে সমর্থ হই, সে বস্তুটি আমি হইতে পারে না। আমার চক্ষু যে সকল বস্তু দর্শন করিতে সমর্থ হয়, সেই দৃষ্ট বস্তুর একটিও আমার চক্ষু নহে বা চক্ষু হইতে পারে না, ইহা স্থির সিদ্ধান্ত। সেইরূপ আমি যে সকল বিষয় জানিতে পারি, তাহার একটিও আমি নহি; এই হেতু যখন আমি আমাকে জানিতে পারি, তখন আমি যে আমি নই, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে। প্রকৃত আমি যে, সে আমি জ্ঞানের অবগাহনস্থান। এ আমি বদ্ধ, সে আমি মুক্ত; এ আমি বিকার, সে আমি নির্ব্বিকার; এ আমি জড়, সে আমি অজড়, এ আমি অধীন, সে আমি স্বাধীন।

জীবাত্মা যতদিন আত্মহারা হইয়া প্রকৃতিকে নিজ অভীষ্ট বলিয়া বরণ করিতে থাকিবে, প্রকৃতির শব্দ, স্পর্শ, গন্ধাদিতে মোহিত থাকিবে, ততদিন যাতায়াত ক্ষান্ত হইবে না। জীব যতদিন ফল-ফুলের দ্বারা শোভিত, দেহ মন বুদ্ধির দ্বারা পরম সুখের প্রস্রবণরূপে প্রকাশিত, প্রকৃতির আলিঙ্গনে মুগ্ধ থাকিবে, ততদিন জীবের নিরাশ ভাবে প্রবাসভ্রমণ ক্ষান্ত হইবে না। যতদিন আত্মনিবাসে দৃষ্টি না পড়িবে, ততদিন তাহার ভ্রমণ নিবৃত্ত হইবে না। জীব সংসারে নিত্যস্থায়ী বাসিন্দা নহে।

ক্ষণিক জ্ঞানের মধ্যে আত্মাকে নিত্য বলিয়া অনুভব করার নাম অহংকার। ক্ষণিক জ্ঞানের মধ্যে নিত্যত্বের অর্থ এই যে, এখন আমি সুখবোধ করিলাম, পরক্ষণেই দুঃখবোধ করিলাম; এই এতক্ষণ উষ্ণবোধ হইতেছিল, পরক্ষণেই শীতল অনুভব হইল, ইহারই নাম ক্ষণিক জ্ঞান। এই ক্ষণিক জ্ঞানের মধ্যে যাহা নিত্য অর্থাৎ যখন সুখবোধ হইতেছিল, তখনও আমি ছিলাম, যখন দুঃখবোধ হইল, তখনও আমি আছি; যখন উষ্ণবোধ হইল, তখনও আমি আছি, যখন শীতল বোধ হইল, তখনও আমি আছি। সুখ গেল দুঃখ আসিল, শীত গেল গ্রীষ্ম আসিল; আমি কিন্তু গেলামও না, আসিলামও না,—সকলটাতেই সমান ভাবে রহিলাম; ইহারই নাম ক্ষণিকের মধ্যে নিত্যত্ব বা অহংকার। একদিকে আত্মজ্ঞানের যেমন পরিণতি সংসাধিত হইতে থাকে, তেমনি অপর দিকে অব্যক্তের অস্তিত্ব অনুভব বদ্ধমূল হইতে থাকে, ক্রমেই প্রকৃতির আলিঙ্গন গাঢ় হইতে থাকে, কি একটা যেন আমাকে অভিভূত করিতেছে এইরূপ জ্ঞান জন্মে; তৎপরে আর একপদ অহংকার অগ্রসর হইলে ইহা আমার রসজ্ঞান, ইহা আমার স্পর্শজ্ঞান প্রভৃতি আবির্ভূত হয়; আমি ইচ্ছা করি বা না করি, তবু যেন আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ইহা আমাকে অভিভূত করিতেছে; এটা কি ওটা কি করিয়া কত ভাবনা ভাবি, তথাপি অব্যক্তের কোন অন্তই পাই না; যেমন গোড়ায় অব্যক্ত, শেষেও তেমনি অব্যক্ত। আমরা বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া তাঁহার রঙ্গ দেখিতে থাকি। তাহা আমাদিগকে হাসাইতেছে, কাঁদাইতেছে, তাহার আবেগে আমরা চঞ্চল। হাসিয়া আবার কিরূপে সেইরূপ হাসিব তাহার চেষ্টা, কাঁদিয়া আবার কিসে সেইরূপ কাঁদিতে না হয় তাহার চেষ্টায় থাকি। এই অহঙ্কাররূপ পর্বতে মনরূপ কেশরী অনবরত গর্জ্জন করিতেছে। এই দেহরূপ অরণ্যে অহঙ্কাররূপ মত্তমাতঙ্গ সগর্ব্বে অনবরত বিচরণ করিতেছে। এই জন্য অহঙ্কারী ব্যক্তিমাত্রেই লোকের ঘৃণার বস্তু, ত্যাজ্য ও অশ্রদ্ধেয় হইয়া থাকে। এই অহঙ্কারের উদয়ে শান্তি লুক্কায়িত হয়, সুখ অন্তর্দ্ধান করে। আমি ভিন্ন এ সংসার আর কিছুই নহে। আমি আছি বলিয়াই সমস্ত বস্তু রহিয়াছে। আমি না থাকিলে কিছুই থাকে না। আমি জাত ও আমি অজাত উভয়স্বরূপ। আমি স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ, যুবা। আমি সর্ব্বপ্রাণীতে ব্যাপ্ত, আমিত্বের অস্তিত্বে বন্ধন, আমিত্ব ছাড়িলেই মুক্তি।

তুমি-আমি যেমন পৃথিবী হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া, বাড়ী, ঘর, উদ্যান, ঘটী, বাটি প্রস্তুত করি, কিন্তু ঐ সকল উপাদান আমাদের সৃষ্ট পদার্থ নহে, সেইরূপ ব্রহ্মা জগৎ-লীন উপাদান সংগ্রহ করিয়া অর্থাৎ পঞ্চবিধ পরমাণু লইয়া পৃথিবী, বন, পর্ব্বত, সমুদ্র, ভূলোক, দ্যুলোক, অন্তরীক্ষলোক, যথাযোগ্য বিন্যাস করেন। ঐ পঞ্চবিধ পরমাণু ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এবং জীব শরীর, ইহারা ব্রহ্মার সৃষ্ট নহে, ঐ সকল প্রকৃতির সৃষ্টি, উহাদের যথাযথ বিন্যাস করাই ব্রহ্মার ব্রহ্মত্ব। ইহা তুমি-আমি পারি না, তাঁহার তুল্য ক্ষমতাশালীরাই পারেন। তুমি-আমি যে নিয়মে মানস সৃষ্টি করি, দেবগণও সেই নিয়মে মানস সৃষ্টি করেন। তুমি যেমন মানসিক চিন্তা দ্বারা নানাপ্রকার শিল্প উদ্ভাবন কর, ইঁহারাও সেইরূপ মানসিক চিন্তা দ্বারা নানাপ্রকার মানস সৃষ্টি উদ্ভাবন করেন। তুমি যদি উপাসনা দ্বারা, সাধনা দ্বারা বুদ্ধিকে মার্জ্জিত করিতে পার, বিশুদ্ধ করিতে পার, তাহা হইলে তোমারও সঙ্কল্প সিদ্ধ হইবে; বুদ্ধিকে যথেচ্ছ নিয়োগ করিতে পারিবে, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ে সমর্থ হইবে, স্বয়ং ব্রহ্ম-ঐশ্বর্য্য ধারণ করিতে পারিবে।

জগতে এমন কোন স্থান নাই, যেখানে জীব নাই; জগৎ জীব-পূর্ণ। মনে কর, একটি পুংপক্ষী ও একটি স্ত্রীপক্ষিণী সংযোগে স্ত্রী পক্ষিণীর গর্ভে কতকগুলি ডিম্ব জন্মিয়াছে, সেইরূপ প্রকৃতি ও পুরুষসংযোগে, প্রকৃতির গর্ভে, সূর্য্যের ন্যায় সর্ব্বপ্রকাশক জ্যোতির্ম্ময় একটি অণ্ড জন্মিয়াছে; উহারই নাম বৃহৎ অণ্ড বা ব্রহ্মাণ্ড। আদ্যাশক্তি মূল প্রকৃতি দিগম্বরী কেন? আঁতুড়ঘরে প্রসূতির প্রসবের সময় কাপড় পরিবার সময়

থাকে না, প্রকৃতিদেবীও অনবরত অনন্ত বিশ্বের অনন্ত ডিম্ব প্রসব করিতেছেন, প্রসবের বিরাম নাই, সুতরাং বাস পরিধানের সময় নাই, সেইজন্য দিগম্বরী। প্রকৃতি গর্ভে সকল দিকে সকল পদার্থই অনন্ত; বিশ্বও অনন্ত, দেশ বা গ্রাম, নগর বা শহরও অনন্ত; ব্রহ্মাদি, জীব এবং পশুপক্ষী, কীটাদিও অনন্ত। পাখীর গর্ভে ডিম ছিল, সেই ডিমের গর্ভে অব্যক্ত অহংকারাত্মক জীব ছিল; সেই ডিম ভাঙ্গিল, অমনি অব্যক্ত অহংকার ব্যক্ত হইল; অহংকার যেমন ব্যক্ত হইল, অমনি ইচ্ছা জন্মিল, সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছানুযায়ী দ্রব্য অন্বেষণার্থ কর্ম্মক্ষেত্রে বহির্গত হইল। এখন মনে কর, মহান বিরাট অণ্ড ভাঙ্গিল, ব্রহ্মাদির বিকাশ হইল। সংসার কর্ম্মভূমি। ব্রহ্মলোক হইতে নরক পর্য্যন্ত সমস্তই সংসার। বিরাট হইতে বহির্গত হইয়া সংসারে আসিয়া ক্ষুদ্রতম কীট হইতে আদিশরীর হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মাদি পর্য্যন্ত কেহই কর্ম্মশূন্য হইয়া থাকিতে পারিবেন না। ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, স্ববশে হউক বা অবশে হউক, সজ্ঞানে হউক বা অজ্ঞানে হউক, স্বভাবে হউক বা অভাবে হউক, কর্ম্ম করিতেই হইবে এবং ভোগও করিতেই হইবে, প্রকৃতিদেবীর ইহাই আদেশ। কর্ম্ম করিলেই সুখ-দুঃখ ভোগ করিতেই হইবে। ভোগাদি বিষয়ে ব্রহ্মাদি দেবগণের যে দশা, পশু, পক্ষী, কীটাদিরও সেই দশা।

সর্ব্ব ভোগের আস্পদ, সর্ব্ব ঐশ্বর্য্যের আগার, সর্ব্ব শোভার আধার ত্রিলোক,—বিষ্ণুলোক, ব্রহ্মলোক ও শিবলোক,—স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল, এই সমস্ত সৃষ্টি দৃষ্টি করিয়া ব্রহ্মা সন্তোষ লাভ করিতে পারিলেন না। কেন পারিলেন না? দেখিলেন যতই ঐশ্বর্য্য থাক, যতই ভোগ থাক, যতই শোভা থাক, সমস্তই কিন্তু অপূর্ণ, সমস্তই সীমাবদ্ধ। ঐশ্বর্য্য ও ভোগাদি বাড়াইবার উপায় নাই, সীমা ছাড়াইবার সাধ্য নাই, সমস্তই বদ্ধ, বদ্ধ বলিয়া মুক্তধাম নয়। অসন্তোষ হইয়া বিষণ্ণ মনে ভাবিতেছেন—এই ভোগাস্পদ প্রাণী কোথা হইতে আসিল, ইহার কেন্দ্র কোথায়? এই যে ভোগ, ইহার মূল কারণ কি? যত কিছু ভোগ, সমস্তই কর্ম্মানুযায়ী, কর্ম্মই তাহার মূল; সুতরাং কর্ম্মস্থান থাকার প্রয়োজন। ত্রিভুবন সমস্তই ভোগস্থান, তবে ইহাদের কর্ম্মভূমি কোথায়? ইহাদের ভোগের কর্ম্মকেন্দ্র কোথায়? ইহাদের মোক্ষকেন্দ্র কোথায়? ইহাদের শোভা ও মাধুর্য্যকেন্দ্র কোথায়? ঐশ্বর্য্য ও শৌর্য্যের কেন্দ্র কোথায়? ব্রহ্মাদি দেবগণের, কীটাদি পতঙ্গের কর্ম্মকেন্দ্র কোথায়? ভাবিতে ভাবিতে ব্রহ্মার বিশ্বকেন্দ্রে দৃষ্টি পড়িল, যাহা দেখিলেন তাহাতে স্তম্ভিত হইলেন! কেন স্তম্ভিত হইলেন? উল্লাসে। কেন উল্লাস? দেখিলেন বিশ্বকেন্দ্রে সমস্তেরই অসীমতা রহিয়াছে। ঐশ্বর্য্য বল, মাধুর্য্য বল, শৌর্য্য বল, বীর্য্য বল, শোভা বল, সৌষ্ঠব বল, সুখ বল, আমোদ বল, সমস্তই অপূর্ব্ব ও অসীম। আরও দেখিলেন, কেন্দ্রে কোটী সূর্য্য প্রকাশিত, কোটী চন্দ্র সুশীতল, কি এক মহান মার্ত্তণ্ড ব্রহ্মলোকাতীত লোক স্নিগ্ধ উত্তাপে আলোকিত করিতেছে; সুতরাং স্তম্ভিত হইয়াছেন। যে সূর্য্যকিরণ ব্রহ্মলোকে ম্লান, সেই ব্রহ্মলোক ছাড়িয়া সে কিরণ ব্রহ্মাতিলোক আলোকিত করিতেছে, সুতরাং স্তম্ভিত হইয়াছেন। কেন্দ্র ছাড়িলে যাহা কিছু সমস্তই অপূর্ণ ও অসীম।

অহং-এর প্রধান লক্ষণ আত্মার জীবভাব। লৌহ একীভূত অগ্নির ন্যায় প্রকাশ পাইলে তাহারই নাম অহংতত্ব। আত্মার নাম দৃকশক্তি, আর বুদ্ধির নাম দর্শনশক্তি। চিৎস্বরূপ আত্মা বুদ্ধিবৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত হন, বলিয়া সেই সেই বুদ্ধিবৃত্তি প্রকাশিত হয়; এস্থলে তিনি দৃকশক্তি অর্থাৎ দ্রষ্টা, আর সেই সেই বুদ্ধিবৃত্তিগুলি তাঁহার প্রতিবিম্বপাতের আধার বলিয়া, সে সকলের নাম দর্শনশক্তি। একখণ্ড লৌহ অগ্নির সহিত গাঢ় সহবাস করিয়া অগ্নিতুল্য হয়, সেইরূপ হইয়া যাওয়ার নাম আমি। লৌহ ও অগ্নি পৃথক বস্তু, অথচ একের ন্যায় প্রতিভাত হয়; আত্মাও বুদ্ধির সহিত সেইরূপ প্রতিভাত হইয়া অহংতত্বাত্মক জীব উপাধি ধারণ করিয়াছে। সেই জীব আপন বুদ্ধিকে চৈতন্য হইতে পৃথক বলিয়া জানে না, বুদ্ধি বা চিত্তের প্রতি যে অক্ষুণ্ণ "আমি জ্ঞান" পাতাইয়া রহিয়াছে, তাহার নাম অহংতত্ব।

দর্শন

দৃশ ধাতুর উত্তর অনট প্রত্যয় করিয়া দর্শন নিষ্পন্ন হইয়াছে। দৃশ ধাতুর অর্থ দেখা। যাহা দ্বারা দেখা যায় অর্থাৎ যাহা দেখায় তাহাই দর্শন। দেখায় কী? যাহা প্রয়োজন। জগতের সমস্ত প্রাণীই প্রয়োজনবিশিষ্ট,—কেহ অন্নের, কেহ বস্ত্রের, কেহ বিষয়ের, কেহ জুড়ি গাড়ির, কেহ দাস-দাসীর ইত্যাদি। যে পদার্থকে অভিলাষ করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মে, তাহাই প্রয়োজন। কর্ম্মমাত্রই প্রয়োজন, বিনা প্রয়োজনে কেহ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না। চেতন, অচেতন সকল পদার্থই কর্ম্মশীল। প্রয়োজন কাহাকে বলে? যাহার অভাব, যে কার্য্য করিয়া সিদ্ধ হইলে সুখ বোধ হয় এবং দুঃখ নিবারণ হয়, তাহারই নাম প্রয়োজন।

আব্রহ্ম কীট পর্য্যন্ত সকলেরই অন্তরের ভাব—কিসে দুঃখ নিবারণ হয়, কি করিলে নিরবচ্ছিন্ন সুখলাভ হয়; অবোধ শিশু যাহার কিছুমাত্র জ্ঞান নাই, তাহারও অন্তরের ভাব—কিসে দুঃখ নিবারণ হয়, কি করিলে সুখলাভ হয়। এই প্রকারে জীব মাত্রেই সুখের জন্য ব্যস্ত, সুখের জন্যই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। সুখ সুখ করিয়া সকলেই লালায়িত। দুঃখ সকলেরই ত্যাজ্য, সেইজন্য প্রাণী মাত্রেই সুখকে প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়; কিন্তু প্রকৃত সুখ কি কেহ লাভ করিতে পারিয়াছে, কর্ম্ম হইতে কি কেহ বিরত হইতে পারিয়াছে? যখন কর্ম্ম হইতে কেহ বিরত হয় নাই, তখন বুঝা যাইতেছে যে, সুখের সঙ্গে কাহারও সাক্ষাৎকার হয় নাই। জ্ঞানতঃ হউক বা অজ্ঞানতঃ হউক, সেই নিত্য সুখের অনুসন্ধানে ব্রহ্মা হইতে কীট পর্য্যন্ত সকলেই সদা অস্থির, নিয়ত গতিশীল, নিয়ত কর্ম্মে ব্যাপৃত রহিয়াছে।

সুকুমার শিশুর সুধামাখা সহাস্যবদন নিরীক্ষণ করিয়া জননী মর্ত্তে থাকিয়া ত্রিদিব-সুখ ভোগ করিতেছেন, তাহার সুধামাখা কথা শুনিয়া আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইতেছেন; এক দিন সেই শিশু, মার ক্রোড় ত্যাগ করিয়া শিক্ষা দিবে, বলিবে, 'মাগো! সংসারে কেহই কাহারও নহে, তুমিও আমার মা নহ, আমিও তোমার সন্তান নহি' এই শিক্ষা দিয়া চলিয়া যাইবে। আহা! দুদিন পূর্বে যে মাতা তাহার হৃদয়রত্নকে হৃদয়ে রাখিয়া মর্ত্ত্যধামে বাস করিয়াও স্বর্গের সুখ অনুভব করিতেন, যাহার মুখ দেখিয়া আপনাকে ভুলিয়া যাইতেন, জগৎ বিস্মৃত হইতেন, শোকতাপের আক্রমণ অনায়াসে সহ্য করিতেন, আজ তাঁহার কি অবস্থা! পুত্র চলিয়া গেল, কেবল রাখিয়া গেল জননীর হৃদয়বিদারক স্মৃতি, আর দিয়া গেল জননীর জীবনব্যাপী দুঃখের উৎস। ইহাতে বেশ জানা গেল, সুখের সঙ্গে কিছুমাত্র পরিচয় হয় নাই। সুখের প্রকৃত পথ কোথায় বা কোন দিকে এবং কি প্রকারে যাইতে হয়, তাহার কিছুমাত্র জানিতে পারে নাই।

বাল্যকালে ধূলাখেলায় মনের জ্বালা জুড়াইল না। কৈশোর বয়সে আনন্দের আশায় প্রাণ ব্যাকুল হইল, তাহা পাইয়াও সুখবোধ হইল না। যৌবনের তরল প্রবাহ আবার নয়নপথের পথিক হইল—কত বিলাস, কত লালসা, কত আশা, কত সাহস, কত ভাবই আবির্ভাব হইল, কিছুতেই আনন্দ হইল না, প্রাণ তৃপ্ত হইল না, সাধ মিটিল না, সুরূপ কুসুমে নয়ন লাগিয়া রহিল, বোধ হইল যেন আর ছাড়িবে না, সংসার একেবারেই বিস্মৃত হইল। কিন্তু কি ভাবিয়া আবার পরিত্যাগ করিবে, ইহাতে কি সুখ হইল না? শান্তির সহিত কি সাক্ষাৎ হইল না? তৃষ্ণার অসাধারণ চতুরতাই ইহার একমাত্র কারণ। যে পরিচ্ছদে শান্তি নাই, তাহাকেই সুখ বলিয়া মনে হইয়াছিল। কিছুতেই সুখের সহিত সাক্ষাৎ হইল না।

ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শোক, মোহ, জরা, মৃত্যু প্রভৃতি প্রাণী সকলকে ঘেরিয়া রহিয়াছে। শারীরিক দুঃখ কমে ত মানসিক দুঃখ আরম্ভ হয়, মানসিক দুঃখ কমে ত শারীরিক দুঃখ আরম্ভ হয়। একমুহূর্ত্তও দুঃখের হাত হইতে অবসর পাইয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিবার উপায় নাই। এখন বেশ বুঝা গেল, মুহূর্ত্তকালও কোন মানব সুখী নহে। যাহাকে আমরা সুখ বলিয়া মনে করি, একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে বেশ জানা যায়, তাহারও পরিণাম দুঃখ, বিষমিশ্রিত খাদ্যবিশেষ, বিবেকীর সমীপে তাহা দুঃখ পদার্থরূপে পরিগণিত। বিষয়-ইন্দ্রিয়-সংযোগ-জনিত

একপ্রকার মনোবিকারই আমাদের নিকটে সুখনামে পরিচিত পদার্থ। সংসারে সকল বস্তুই ক্ষণভঙ্গুর, কোন পদার্থই চিরস্থায়ী নহে, সুতরাং যাহাকে সুখজনক পদার্থ বলিয়া মনে করা যায়, তাহা যে চিরস্থায়ী নহে, তাহা যে শীঘ্র লয় প্রাপ্ত হইবে, তাহা নিশ্চিত।

সুখজনক পদার্থের নাশে যে নিদারুণ দুঃখভোগ করিতে হয়, তাহা জীব মাত্রেই সহ্য করিতেছে। ব্রহ্মলোকের সুখ ঐশ্বর্য্য পর্য্যন্ত ক্ষণস্থায়ী, তাহারও নাশ আছে, সেইজন্য দুঃখও আছে। বৈষয়িক সুখ স্থায়ী হয় না, যাহাকে পাইয়া সুখী হওয়া যায়, তাহা অনতিবিলম্বে বিলীন বা দুষ্প্রাপ্য হয়, সুখের পিপাসা উপশমিত হয় না, কিন্তু ক্ষণিক সুখ ভোগের পরিণাম দুঃখানলে দগ্ধ হইতে হয়। অজ্ঞ ব্যক্তিরা বনিতাভোগাদিকে দুঃখ বলিয়া স্বীকার করে না, কেননা যদি ইহাকে দুঃখ বলিয়া স্বীকার করে, তবে মানব কোন সুখ লইয়া জগতে থাকিবে? মায়াবশে যাহা মধুর বলিয়া মনে হয়, তাহার স্থায়িত্ব কতক্ষণ? ভবসাগরে ভাসিতে ভাসিতে কত লোকের সহিত মিলিত হইয়াছি, কত লোকের সঙ্গ ভালো লাগিয়াছে, কত দ্রব্য মনোরম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি, আত্মহারা হইয়া আমি কত লোককে আত্মীয় বোধ করিয়াছি, কিন্তু কেহই স্থির হয় নাই; নদীতে ভাসমান তরঙ্গ-বায়ু-চালিত তৃণসমূহের পরস্পর মিলনের ন্যায়, সংসারের সকল মিলনই ক্ষণস্থায়ী, এ বিয়োগ-সাগরে চির-সংযোগের আশা দুরাশা। যে রাজ্যে নিবৃত্তিকে পশ্চাৎ রাখিয়া উৎপত্তি দর্শন দেয়, যে দেশে মৃত্যুকে সঙ্গে করিয়া জন্ম আগমন করে, যেখানে সংযোগ ক্ষণকাল ও বিয়োগ-বিরহিত হইয়া অবস্থান করে না, যে রাজ্যে স্থায়ী ভাবের নিত্য অভাব, সে রাজ্যে সুখ কোথায়? মরুভূমিতে কি কখনও পিপাসা শান্তি হইতে পারে? পরিবর্ত্তনশীল সংসারে মরিবার জন্য জন্ম হইয়া থাকে, বিয়োগযাতনা ভোগ করিবার জন্য সংযোগ হইয়া থাকে, সুতরাং প্রকৃত সুখের সঙ্গে কাহারও পরিচয় হয় নাই, হইবেও না।

এখন দেখিতে হইবে সুখ কোন পদার্থ এবং প্রকৃত সুখ কিসে? দেখিতে পাওয়া যায় পান্থশালায় পথিকে পথিকে আলাপ-পরিচয় হয়, আবার পরস্পর নিজ নিজ গন্তব্য স্থানে চলিয়া যায়; পুনরায় যদি কোন স্থানে দেখা হয়, তাহা হইলে বলিতে পারে, এই পথিকের সহিত পূর্বে দেখা হইয়াছিল, কিন্তু নামধাম কি তাহা বলিতে পারি না। বৈষয়িক সুখও বিষয়াসক্তের মধ্যে তাদৃশ পরিচিত, বিষয়াসক্তের সুখভোগও সেইপ্রকার। পূর্বে অনুভব করিয়াছিলাম, বৈষয়িক সুখের পরিচয় দিতে পারে; কিন্তু ইহার স্বরূপ, ইহার উৎপত্তি, স্থিতি প্রভৃতি বিষয়ে প্রায় সকল বৈষয়িকই অনভিজ্ঞ।

সুখ দুই প্রকার—পরিচ্ছিন্ন ও অপরিচ্ছিন্ন। পরিচ্ছিন্ন সুখ বিষয়েন্দ্রিয়-জনিত মানস-বিকার, আর অপরিচ্ছিন্ন সুখ অখণ্ড সচ্চিদানন্দময় পরব্রহ্ম বা আত্মার স্বরূপে অবস্থিতি! সকলেই জানে অভীষ্ট বিষয় প্রাপ্তিতে সুখ হয়; কিন্তু অভীষ্ট বিষয় প্রাপ্তিতে কেন সুখ হয়, তাহা তাহারা জানে না। বিশেষ চিন্তা করিলে প্রতীতি হইবে যে, সুখ অন্বেষণকারীর চিত্ত সুখের অন্বেষণ করিতে করিতে যাহাকে সুখ বলিয়া নিশ্চয় করে, যে বিষয়কে আত্মার অনুকূল বা আত্মীয় বলিয়া অবধারণ করে, তাহাকে লইয়া নিজ গৃহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয়, সুখান্বেষণার্থ বহির্মুখ চিত্ত অন্তর্মুখ হয়, নির্জ্জনে নিরুপদ্রবে তাহা ভোগ করিবে বলিয়া স্বস্থানে প্রবেশ করে। চিত্তবৃত্তি অন্তর্মুখীণ হইলেই স্বাভিমুখ, দর্পণে মুখ প্রতিবিম্বপাতের ন্যায় সুখময় আত্মার প্রতিবিম্ব তাহাতে পতিত হয়, তাহাতেই বিষয়প্রাপ্তির জন্য সুখানুভব হইয়া থাকে। অল্পবুদ্ধি মানব মনে করে, বিষযে সুখ ছিল, বিষয় ভোগ করিয়া সুখ প্রাপ্ত হইলাম; কিন্তু বস্তুতঃ সুখ দিলেন সুখময় আত্মা। সুখ উপলব্ধি হইল চিত্তবৃত্তি অন্তর্মুখীণ হইয়াছিল বলিয়া, সুখবোধ হইল চিত্তবৃত্তি ক্ষণকালের জন্য নিরুদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া, সুখবোধ হইল কিয়ৎক্ষণের জন্য পরিবর্ত্তন ভোগ করিতে হয় নাই বলিয়া। আত্মার স্বরূপ, অবস্থাই সুখ। বৈষয়িক সুখ প্রকৃত সুখের পরিচ্ছিন্ন অবস্থা, বিষয়েন্দ্রিয়-সম্বন্ধ-জনিত আনন্দের পরমাবস্থাই পরমানন্দ, ইহা পরমানন্দেরই মাত্রা, তাহারই কণাবিশেষ। বৈষয়িক সুখ ব্রহ্মানন্দের কণিকা মাত্র। ব্রহ্মানন্দের কণিকা মাত্র অবলম্বন করিয়া জীব-জগৎ অবস্থান করে। মনুষ্যলোক হইতে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত যে আনন্দ উপভোগ করে, তাহা পরিচ্ছিন্ন সুখ। এই নিরতিশয় সুখই মুখ্য প্রয়োজন, ইহাকে পাইবার জন্য জীবজগৎ নিয়ত কর্ম্মশীল এবং সতত চঞ্চল।

যাহা অখণ্ডিত, যাহা অপরিচ্ছিন্ন, তাহা পূর্ণ; আর যাহা তদ্বিপরীত, তাহা অপূর্ণ। অপূর্ণই পূর্ণ হইবার চেষ্টা করিয়া থাকে। যতদিন জীব পূর্ণ না হইবে, ততদিন অবশভাবে, অবিরাম গতিতে, জন্মাদিভাব-বিকারে বিকৃত হইতে হইবে, নিয়ত গতিতে কর্ম্মস্রোতে ভাসিতে হইবে। পূর্ণ হইবার জন্যই জীবের চেষ্টা। ত্রিতাপজ্বালা নির্ব্বাপিত করিবার জন্যই ব্যস্ত; সংসার-বিদেশ হইতে নিত্য-স্বদেশে যাইবার জন্যই জীবের গতি। উদ্দেশ্য যে দিন সিদ্ধ হইবে, অভাব যে দিন পূর্ণ হইবে, গন্তব্য স্থান অবধারিত হইবে, গতি স্থগিত হইবে, চঞ্চলতা দূর হইবে, স্রোত রুদ্ধ হইবে, কর্ম্মে বিরতি হইবে। কি প্রকারে তাহা হইবে? ত্রিতাপজ্বালা কিসে নিবারণ হইবে? কিসে অনাপ্ত আপ্ত হইবে, অপূর্ণ পূর্ণ হইবে? অপূর্ণ পূর্ণ হইবার, অনাপ্ত আপ্ত হইবার, ত্রিতাপজ্বালা নিভিবার উপায় দর্শানই এই দর্শনের উদ্দেশ্য।

প্রকৃতি এক মুহূর্ত্তও বিকৃতা না হইয়া থাকিতে পারে না। যে বস্তু সদা পরিবর্ত্তনশীল, তাহাতে সুখ কোথায়? যাহা সুখ তাহাও পরিবর্ত্তনশীল, সুতরাং নিত্য স্থায়ী সুখ কোথায়? নিত্য সুখ প্রকৃতিতে নাই। তবে কি ইহার কোন উপায় নাই যে, প্রকৃতি বিকৃতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া, অবিকৃত নিত্য সুখ আনন্দ লাভ হইতে পারে? আর্য্যমাতা শ্রুতি তাঁহার সন্তানের জন্য না রাখিয়াছেন এমন উপায় নাই; আমরা উপায় প্রয়োগ করি না বলিয়া দুঃখ, তাপ, রোগ, শোক, জ্বালা, যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। সংসারক্ষেত্রে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া জীবমাত্রেরই এরূপ বলবতী বাসনা সমুপস্থিত হয় যে, কিসে আমি সম্যক সুখে সুখী হইব এবং দুঃখের পথ কিসে কখনও স্বপ্নেও অনুভূত না হয়, স্বজনসমাজে দীর্ঘায়ু, বলবান, রূপবান, বিদ্বান, যশস্বী হইয়া জীবন কাটাইতে পারি।

যে আর্য্যজাতির বিজ্ঞান বুদ্ধিতে জগৎ আলোকিত, যে আর্য্যজাতির ধর্ম্মচিন্তায় জগৎ ধর্ম্মপথে ধাবিত, সেই আর্য্যজাতির অধিকাংশ কালবশে দৈবদুর্বিপাকে এতদূর অজ্ঞান আবরণে আচ্ছাদিত হইয়াছেন যে, তাঁহারা আর আপনাদের পিতৃপিতামহাদির ধনের উত্তরাধিকারী হইতে পারেন না। এমনকি, পিতৃপিতামহাদির ভাষা বুঝিতেও অক্ষম হইয়াছেন। পিতৃপিতামহেরা তাঁহাদের সন্ততির জন্য আর্য্যভূমির প্রত্যেক স্তরে আপনাদের বৈজ্ঞানিক উন্নতির কৌশলরূপ কত শত কর্ম্ম ও উপাসনাদি রাখিয়া গিয়াছেন; বলবীর্য্য, ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান, শক্তি ও তেজ আদি রাখিয়া গিয়াছেন। কুসন্তান পথ হারাইয়াছে, কুপথের ধূলায় চক্ষু অন্ধ করিয়াছে, কামাদি-কণ্টকে চরণ ক্ষত-বিক্ষত করিয়াছে, আর অগ্রসর হইতে পারে না, পৈতৃক সম্পত্তি গ্রহণ করিতে পারে না। সন্তান হইয়া পিতা-মাতার কথা বুঝিতে পারে না; বেদ কি, পুরাণ কি, দর্শন কি, কিছুই বুঝিতে পারে না। পিতৃপিতামহের সঞ্চিত রত্নে আমরা ভূষিত হইতে পারিলাম না; আমরা যে স্থানে শাস্ত্রবৃক্ষস্থিত কর্ম্মফলের মূর্ত্তি দেখি, সেই স্থানে সহজে আমরা বামন হইয়া পড়ি।

হইলাম আমরা বামন, দোষ দিলাম পিতামহের, সকল ভ্রাতায় মিলিয়া বলাবলি করিলাম, ওই ফলটা মিথ্যা সাজান। ইহা অপেক্ষা দুর্দ্দৈব আর কি হইতে পারে!

আর্য্যজাতির ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া অনেক সময়ে নৈরাশ্য-তিমিরে হৃদয় আচ্ছন্ন হয়; কিন্তু আশা-মরীচি ক্ষণকাল মধ্যে উহা ধ্বংস করিয়া দিয়া হৃদয় আনন্দে উদ্ভাসিত করে। যখনই দিশাহারা হইয়া "কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হই" যখনই সহস্র সহস্র বিপদ আসিয়া চিত্তকে ব্যাকুলিত করে, তখনই যেন হৃদয়াকাশে 'দৈববাণী' নির্ঘোষিত হয়—"ভয় নাই, এই প্রাচীন জাতি বিলুপ্ত হইবে না।" কোন উপায় অবলম্বন করিলে এই প্রাচীন জাতি বিলুপ্ত না হয়, কি উপায়ে পিতৃপিতামহের সম্পত্তির অধিকারী হইতে পারে, কি কৌশলে সেই আর্য্যবীর্য্য, বল, ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান, শক্তি, ও তেজ আদি লাভ করিতে পারে, তাহা দেখানোই এই দর্শনের উদ্দেশ্য।

আর্য্যশক্তির অন্তরালে পিতামহের কি এক অপূর্ব্ব শক্তি, যাহা—মাতা যেমন পুত্রকে রক্ষা করে—সেইরূপ আর্য্যকে রক্ষা করিতেছে! আদ্যাশক্তির পুত্র শক্তিহীন কেন, আর্য্য কি ছিল কি হইয়াছে, কি হইতে পারে? আর্য্য কি এক রত্ন হারাইয়া, দিন দিন কাঙ্গালের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে, সেই হারানিধি পাইবার উপায়, —আর্য্য যে ফণিমণি হারাইয়া জগৎ আঁধার দেখিতেছে, সেই মণি লাভের উপায়, যে উপায়ে নিশ্চিতরূপে

অনন্ত শক্তির অনন্ত বিভূতি লাভ হয়—যাহাতে সকল কার্য্য সিদ্ধ হয়—সেই সকল বিষয় ইহাতে বিশেষ রূপে বিবৃত হইয়াছে। আর্য্যগর্ব্ব শ্লাঘ্য, অতএব কেন গর্ব্ব করিব না? আর্য্য যেন জন্মে জন্মে এই মহাধনে ধনী হইয়া গর্ব্ব করে। এ জীবন আর্য্যজীবন, সুতরাং মহাগর্ব্বের জীবন। আর্য্য এ মহাজীবন ভুলিয়াছে, সেই হেতু পূর্ব্ব গর্ব্বও খর্ব্ব হইয়াছে।

ত্রিবেণী

বেণী শব্দে বন্ধন। ত্রিগুণের বন্ধনের নাম ত্রিবেণী। বেণী দুইপ্রকার—যুক্ত বেণী ও মুক্ত বেণী। যোগস্থানের নাম যুক্ত বেণী, মুক্ত স্থানের নাম মুক্ত বেণী। সত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সঙ্গমস্থান বা গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতীর সঙ্গম স্থানের নাম ত্রিবেণী। সংসার পক্ষে যুক্ত ত্রিবেণী—যে স্থানে সত্বগুণী গঙ্গা,—রজোগুণী সরস্বতী ও তমোগুণী যমুনার সহিত যুক্ত হইয়াছে; আর মুক্ত বেণী—যে জায়গায় সত্বগুণ রজঃ ও তমোগুণকে ত্যাগ করিয়া গুণাতীতে মিলিবার চেষ্টা করিয়াছে অর্থাৎ সত্বগুণী গঙ্গা রজঃ ও তমোগুণী সরস্বতী ও যমুনাকে ছাড়িয়া দিয়া সাগরাভিমুখে ছুটিয়াছে। জীবপক্ষে—সত্ব, রজঃ ও তমঃজীবকে যে জায়গায় বন্ধন করিয়াছে, তাহাই যুক্ত ত্রিবেণী অর্থাৎ সংসার; আর জীবকে যে স্থানে ছাড়িয়া দিয়াছে, তাহাই মুক্ত ত্রিবেণী অর্থাৎ ক্রম-মুক্তস্থান। ইহাই রূপকে বর্ণিত আছে—আকাশ হইতে গঙ্গা পতিতা হইয়া, হরিদ্বার প্রভৃতি স্থান ভেদ করিয়া যুক্তত্রিবেণী-সঙ্গমে আসিয়া যোগ হইয়াছে, ইহাই যুক্ত ত্রিবেণী। জীবপক্ষে—জীব ব্রহ্মাকাশ হইতে পতিত হইয়া মহত্তত্বাদি ভেদ করিয়া সংসারে আসিয়া, সত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের সহিত যোগ হইয়াছে; সংসারই জীবের যুক্ত ত্রিবেণী।

যে স্থানে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীকে ছাড়িয়া দিয়াছেন, তাহাই মুক্ত ত্রিবেণী। এই মুক্ত ত্রিবেণীতে, সরস্বতী ও যমুনাকে ছাড়িয়া গঙ্গা উন্মুক্ত গতিতে, নিজ প্রিয় সখা সহ আলিঙ্গন করিতে, চির-পিপাসা চির-জ্বালা জুড়াইতে, চির-দুঃখের কথা কহিতে সাগরাভিমুখে ছুটিয়াছে। যতই নিকটে যাইতেছে, ততই আনন্দবেগ উথলিয়া উঠিতেছে, আনন্দ ক্রমে বর্দ্ধিত হইতেছে, শেষে আনন্দে আটখানা হইয়া, শত মুখে সহস্র মুখে প্রিয় সখাকে আলিঙ্গন করিল, সহস্র মুখে সহস্রপ্রকার রস পান করিয়া জীবন জুড়াইল, চির পিপাসিত প্রাণ শীতল করিল, সুখের অনন্ত সাগরে মিলিল।

গঙ্গা আকাশ হইতে পতিতা হইয়া কিছুকাল গতির পর, ত্রিবেণীতে যোগ হইয়াছে। জীবপক্ষে—জীব ব্রহ্মাকাশ হইতে পতিত হইয়া মহত্তত্ব-ভেদরূপ গতির পর সংসারে আসিয়া যোগ হইয়াছে। গঙ্গাপক্ষে—ত্রিবেণীতে যোগ হইয়া কিছুকাল ভোগানন্তর মুক্ত ত্রিবেণীতে আসিয়া মুক্ত হইয়া সাগরাভিমুখে ছুটিয়াছে; যতদিন সাগরে পতিত না হইবে, ততদিন তাহার গতির বিরাম নাই। জীবপক্ষে—জীব ব্রহ্মাকাশ হইতে পতিত হইয়া, সংসারে আসিয়া কিছুদিন ভোগানন্তর সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মার্ণব-অভিমুখে ছুটিবে, যতদিন চিনমহার্ণবে পতিত না হইবে, ততদিন তাহার ছুটাছুটির বিরাম নাই, গতিরও বিশ্রাম নাই। গঙ্গাপক্ষে যুক্ত ত্রিবেণী প্রয়াগ, জীবপক্ষে সংসার। গঙ্গাপক্ষে মুক্ত ত্রিবেণী বাঁশবেড়িয়া, জীবপক্ষে মুক্ত ত্রিবেণী ক্রমমুক্ত স্থান—মহর্ল্লোক বা ব্রহ্মলোক। এই মুক্ত ত্রিবেণী ক্রমমুক্ত স্থানে জীবন্মুক্তেরা দাঁড়াইয়া আছেন; এখন পর্য্যন্ত চিনমহার্ণবে পতিত হন নাই, পতিত হইবার উপক্রম হইয়াছে। গঙ্গা যেমন মুক্ত ত্রিবেণী ছাড়িয়া যতই সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী হইতেছে, ততই তাহার বেগ বর্দ্ধিত হইতেছে, শেষে অতি বর্দ্ধিত হইয়া সহস্র মুখ ধারণ করিয়া সমুদ্রে পতিত হইয়াছে; জীবন্মুক্তেরাও মহর্ল্লোক নামক মুক্ত ত্রিবেণী ছাড়িয়া যতই চিনমহার্ণবের নিকটবর্ত্তী হইতেছেন, ততই আনন্দবেগ বাড়িতেছে। জীবন্মুক্তেরা মহর্ল্লোক ছাড়িয়া জনলোক, জনলোক ছাড়িয়া তপোলোক, তপোলোক ছাড়িয়া ব্রহ্মার্ণবের অতি নিকটে ব্রহ্মলোকে আসিয়া সহস্রানন্দ-মুখী হইয়া শীঘ্রই অনন্ত নিত্যানন্দ চিৎসমুদ্রে পতিত হইবেন।

যে ধর্ম্মের দ্বারা ঊর্দ্ধগতি হয়, সে ধর্ম্ম লঘু নামে পরিভাষিত। অগ্নির ঊর্দ্ধজ্বলন, বাষ্পের উদগতি, বায়ুর তির্য্যক গতি, ইন্দ্রিয়ের প্রকাশগতি, সমস্তই সত্বগুণের কার্য্য। যাহা দ্বারা জ্ঞানের আবরণ অর্থাৎ অজ্ঞান-ঢাকা নষ্ট হয়, ইন্দ্রিয়ের ও চিত্তে বস্তুর প্রতিবিম্ব গৃহীত হয়, তাহা প্রকাশ নামে অভিহিত হয়। বুদ্ধির প্রকাশ সত্ব, তেজের প্রকাশ আলোক, দিনের প্রকাশ সূর্য্য, সমস্তই সত্বগুণের মহিমা। সত্বগুণাবলম্বী মহাত্মারা ইচ্ছানুসারে

ঐশ্বর্য্যশালী, স্বাধীন ও ক্ষুদ্রকায় হইতে সমর্থ হন। এই সত্বগুণ শান্তবৃত্তিতে ব্রহ্মের সৎ, চিৎ ও আনন্দ, তিন গুণেরই প্রকাশ আছে।

একজন মনুষ্যকে কখন সৎ, কখন অসৎ কার্য্য করিতে দেখা যায়; সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের বিষমতাই ইহার কারণ। সত্বগুণের প্রাবল্যকালে যাহাকে সৎ কার্য্য করিতে দেখা যায়, রজোগুণের প্রাবল্যকালে তাহাকেই লৌকিক কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে দেখা যাইবে, আবার তমোগুণের প্রাবল্যকালে সেই ব্যক্তিই অসৎ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে দেখিতে পাইবে। মনে কর, তোমার অত্যন্ত রাগ হইয়াছে, কাহাকে মার, কাহাকে কাট, তাহার স্থিরতা নাই; কিন্তু হঠাৎ তোমার রাগটা থামিয়া গেল। রাগ থামিবার কারণ এই যে, তখন সত্বগুণ, তোমার অলক্ষিতে আসিয়া রজোগুণকে দমন করিল; এখানে সত্বগুণ আসিয়া যদি তোমার রজোগুণ ক্রোধকে দমন না করিত, তবে যে কী অনর্থ ঘটিত তাহার ঠিক নাই! সত্ব, রজঃ, তমঃ, পরস্পর পরস্পরকে অভিভূত করিবে, ইহাই নিয়ম। সত্বাদি তিন গুণ সকলেরই আছে; সত্ব আছে, রজঃ নাই, রজঃ আছে, তমঃ নাই; বা তমঃ আছে, রজঃ নাই; তাহা হইতে পারে না—তিনই তিনের সহচর। কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া থাকিবার নিয়ম নহে।

কাল

সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণের দুঃখজনক অর্থাৎ যাহা দ্বারা অব্যক্ত প্রকৃতির সাম্যাবস্থা ভঙ্গ হইয়া মহদাদি পরিণাম আরম্ভ হয়, তাহারই নাম কাল। যাহা নিখিল পরিবর্ত্তনের আশ্রয় ও হননকারক, তাহাই কাল। পরিদৃশ্যমান সংসার নিয়ত পরিণতিশীল, কালই সর্ব্ববিধ পরিণামের নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী অর্থাৎ যাহা সর্ব্বভূতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ, তাহাই কাল। সর্ব্বপ্রকার পরিবর্ত্তনের মূল কাল। যাহা সৃষ্ট বস্তুর জনক এবং জগতের আশ্রয়, তাহাই কাল। অল্পাধিক্য জ্ঞান হেতু কাল ক্ষণ, দণ্ড ও প্রহরাদি নামে অভিহিত হয়। যাহা জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ব্যবহারের অদ্বিতীয় কারণ, তাহাই কাল। যাহা শরদাদিরূপে আম্রাদি বৃক্ষের ফল-পুষ্প-প্রসব শক্তিকে প্রতিবদ্ধ করে, এবং বসন্তাদিরূপে তাহাদের সেই শক্তিকে পুনঃ অনুগৃহীত করে, তাহাই কাল। একখানি বস্ত্র অতি যত্নের সহিত কাপড়ে মুড়িয়া সিন্দুকে তুলিয়া রাখ, দশ বৎসর পরে সিন্দুকটি খুলিয়া দেখ, কাপড়খানি জীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। সিন্দুকের ভিতর অতি যত্নে রক্ষিত কাপড় জীর্ণ করিল কে? যিনি জীর্ণ করিয়াছেন, তিনিই কাল।

স্ত্রীযোনিতে পুংবীজ আহিত হইল, দশমাস পরে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল; তুমি বলিতে পার, দশমাস পরে না হইয়া অদ্যই কেন সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় না? তাহা হইবে না, কারণ কাল সেই বীজকে ক্রমে চক্ষু, কর্ণ, ত্বক, মাংস, মজ্জা ইত্যাদিতে পরিণত করিয়া দশ মাসে পূর্ণাবয়ব গঠনানন্তর ভূমিষ্ঠ করিবে। এই যে বিন্দু পরিমাণ বীজ-পদার্থকে অপূর্ব্ব মনুষ্যাকারে গঠিত করিল, তাহা কাল। যাহা কর্ত্তব্য অবধারণের নিয়ন্তা, তাহা কাল। এই কালে ইহা আমার কর্ত্তব্য, এই কালে ইহা আমার অকর্ত্তব্য, যাহা দ্বারা এই প্রকার অবধারণ হয়, তাহা কাল। ত্রৈগুণ্যশূন্য জড় দ্রব্যবিশেষ কাল অর্থাৎ সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়শূন্য যে জড় দ্রব্যবিশেষ, তাহা কাল। প্রলয়নিশা-অবসানে যিনি প্রকৃতি পুরুষকে জাগ্রত করেন ও সংযোগ করেন, তিনি কাল। কাল ইন্দ্রিয়গম্য নহে। কালের সহিত ইন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ঘটে না; কাল অনুভবগম্য। বাহ্য জ্ঞানের মূলে আধার এবং মানস জ্ঞানের মূলে কালের অবস্থান। দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ আধারের উপাধি; ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান কালের উপাধি। বাহ্য বস্তুর আকার পরিবর্ত্তন দেশকে আশ্রয় করিয়া ঘটিয়া থাকে, যেমন বৃক্ষ কতক স্থানকে ব্যাপিয়া অবস্থিতি করে, মানস অবস্থার পরিবর্ত্তন কালকে আশ্রয় করিয়া ঘটিয়া থাকে, যেমন তোমার ক্রোধ হইয়াছে, ক্রোধ কতক সময়কে ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিতেছে। আধার ও কাল ব্যতিরেকে কোন জ্ঞানই সম্ভব হয় না, বিষয় সকল আধার ও কালের সহিত দৃঢ় সম্বন্ধ। আধার-গুণে বিষয়ের বাহ্য প্রকাশ এবং কাল-গুণে তাহাদের অন্তরে আবির্ভাব হয়। বেশ বুঝিতে পারা যায়, মানস জ্ঞানের মূলে কালের অবস্থান। কল্পনা, স্মৃতি ও আশা ইহা মানস বৃত্তি; এই তিনটি বৃত্তি একই পদার্থ এবং একই শক্তির পরিণাম, কেবল কালিক বৈলক্ষণ্য মাত্র প্রভেদ। কল্পনা বর্ত্তমান কাল, স্মৃতি ভূত কাল, আশা ভবিষ্যৎ কাল।

বর্ত্তমান কাল বা কল্পনা—বিদ্যমান বস্তুর বা অনুপস্থিত পরিচিত ব্যক্তির বর্ত্তমান কালে মনে উপস্থিত হওয়ার জ্ঞানই কল্পনা। কল্পনা বর্ত্তমান-কালিক, কল্পনা দ্বারা বর্ত্তমান কালের অনুভব সিদ্ধ হয়। ভূত কাল বা স্মৃতি পূর্ব্বানুভূত—অর্থাৎ অতীত কালে যে বিষয় আমাদিগের ইন্দ্রিয়গোচর হইয়াছিল, তাহা পুনর্ব্বার মনে উপস্থিত হওয়ার জ্ঞানই স্মৃতি; সুতরাং স্মৃতিবিষয় ভূত-কালিক। স্মরণের দ্বারা অতীত কালের জ্ঞান সিদ্ধ হয়। ভবিষ্যৎ কাল বা আশা—বর্ত্তমান কল্পিত বিষয় বা বর্ত্তমান দৃষ্টিবিষয় ভবিষ্যৎ কালে সেইরূপ উপস্থিত হইবে ইত্যাকার সম্ভাবনাসূচক জ্ঞানই আশা নামে অভিহিত হইয়া থাকে; সুতরাং আশা দ্বারা ভবিষ্যৎ কালের অনুমান সিদ্ধ হয়।

এক্ষণে ইহা দ্বারা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কালের অস্তিত্ব পাওয়া গেল। যদি বিচার করিয়া দেখা যায়, তবে বলিতে হইবে বর্ত্তমান কাল নাই। কেননাই? তাহার কারণ এই যে, কাল সদাই চঞ্চল, চলনশীল, এক মুহূর্ত্তও স্থির নাই, কাল-চক্র অনবরত চলিতেছে, ক্রমাগত যাইতেছে। ইহাতে এইপ্রকার সংশয় হয়,যে পদার্থ আবর্ত্তিত হইতেছে, এক মুহূর্ত্তও যাহার গতির বিরাম নাই, যাহা গতির উপর রহিয়াছে, তাহার বর্ত্তমান হয় কি প্রকারে? যাহাকে আমরা বর্ত্তমান মুহূর্ত্ত বলিয়া অবধারণ করি, তাহা বর্ত্তমান বলিতে বলিতে অতীতের কুক্ষিতে লীন হইতেছে। যে মুহূর্ত্তে দাঁড়াইয়া যে মুহূর্ত্তকে ভবিষ্যৎ বলিতেছি, তাহাও চক্ষের পলক পড়িতে না পড়িতে, বর্ত্তমানে আসিয়া অতীতে লীন হইতেছে; কাল এত দ্রুত আবর্ত্তিত হইতেছে যে, তাহা অনুভব করা যায় না, সুতরাং বর্ত্তমান কাল অবধারণ করা যায় না। এক অখণ্ড নিত্য দণ্ডায়মান কালই সদাই ভূত, সদাই বর্ত্তমান, ও সদাই ভবিষ্যৎ। কালের দুই পক্ষ, কাল বিনা অঙ্গে অবয়ব ধারণ করে, কাল প্রতি পদেই জন্মলাভ করে, কাল প্রতি পদেই পদ পায়। লোকে বলে তাহার পদ নাই, কিন্তু সর্ব্বক্ষণ এই এল, এই গেল, এই সেই সেই এই, এই নেই—প্রতিক্ষণেই নানারূপ বদল।

কাল বিন্দুরূপী। কাল দুই ভাগে বিভক্ত—এক খণ্ডিত আর এক অখণ্ডিত। খণ্ডিত কাল বিন্দু, মুহূর্ত্ত ইত্যাদি, তাহা জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়, যাহা নির্দ্দেশ্য তাহা খণ্ড কাল। যে কাল স্থাবর জঙ্গম আদির উৎপত্তি স্থিতি ও নাশের কারণ, তাহা অখণ্ড দণ্ডায়মান কাল। আমরা দেখি, নর্তকী প্রহর ব্যাপিয়া নৃত্য করিতেছে, কিন্তু তাহা প্রহরব্যাপী নহে, প্রত্যুত ক্ষণব্যাপী। ক্ষণ পরম্পরায় এক বুদ্ধিগম্য হইয়া প্রহর ভ্রান্তি জন্মায়। কালের খণ্ডিত অবস্থা প্রকৃতির জড়ভাব-বিকার। কালই প্রকৃতিকে জড়ভাবে বিকারিত করিতেছে, প্রকৃতি কালশক্তি-নিমিত্ততা প্রযুক্ত জড়াদিভাব-বিকারে বিকৃতবৎ উপলব্ধ হইয়া থাকে। এক অপরিচ্ছিন্ন কালশক্তি খণ্ডিত হইলেই জড়ভাব-বিকাররূপে উপলব্ধ ও অভিহিত হইয়া থাকে। প্রকৃতির জড়ভাববিকার কাল খণ্ডিত বিশেষ বিশেষ সত্তা ভিন্ন আর কিছু নহে। কাল ভোক্তা ও ভোগ্য উভয়ই। কাল যখন প্রকৃতিকে পরমাণুরূপে বিকাশ করিয়া তাহা ভোগ করে, তখন মুহূর্ত্ত শব্দে কথিত আর যখন সাকল্য অবস্থা ভোগ করে, তখন পরম মহান বলিয়া অভিহিত হয়। পরমাণু হইতে মহান পর্য্যন্তের ভোক্তা একমাত্র কাল, সুতরাং কাল সর্ব্বভোক্তা। আবার কাল কালকে কালরূপে নিয়তকাল ভোগ করিতেছে, সুতরাং ভোগ্য। কাল কার্য্য ও কারণ উভয়ই। জড়ভাব-বিকারের যাহা পূর্ব্ববর্ত্তী কাল, তাহা কারণ; পরবর্ত্তী কালভাব কার্য্য। কারণ পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত, কার্য্য পরমুহূর্ত্ত। কাল আধার এবং আধেয়; কাল নিজেই নিজের আধার, অন্য আধার তাহার নাই।

কাল আত্মবশ। আত্মা যাহা আদেশ করেন, কাল তাহাই মস্তকে বহন করে। আমরা যদি একটা গোলাকে দ্রুতবেগে চালনা করি, তবে কোন প্রতিবন্ধক অবিদ্যমানে, কাল ক্রমাগত তাহাই করিবে। কালেতে নূতন কিছুই হয় না; চেতন কর্ত্তৃক যাহা আরদ্ধ হয়, কালেতে কেবল তাহাই বহমান হয়; নূতন আরম্ভ, আত্মা ভিন্ন আর কাহারও দ্বারা সম্ভব নহে। পুরাতন অভ্যাসই কালের অধিকারে স্থান পায়। আত্মা যখন আপন কার্য্যভার কালের হস্তে সমর্পণ করেন, তখন তাহাতে আত্মার কেবল অধ্যক্ষতা মাত্র থাকিলেই হইল, আত্মাকে স্বহস্তে সেই কার্য্য লইয়া পুনর্ব্বার বিব্রত হইতে হয় না, কালই তাহা সমাধা করিয়া ফেলে। মনে কর, চেতন আত্মা কর্তৃক একটি আমের আঁটি পোঁতা হইল, চেতন আত্মার আর কোন কার্য্য নাই; আত্মা এখন কার্য্যভার কালের স্কন্ধে চাপাইলেন, এখন কালই আঁটিকে ক্রমে ক্রমে দুই-তিন বৎসরে বৃক্ষে পরিণত করিয়া পরিশেষে আত্মাকে ফল ভোগ করাইবে, সুতরাং কাল আত্মবশ।

কালবশ প্রকৃতি। আবার প্রকৃতি কালবশ। প্রকৃতি যে কালের অধীন হইয়া পরিণত হয় তাহা স্বীকার্য্য; কেননা অদ্য আমের আঁটি পুঁতিলাম, প্রকৃতি তাহাকে আজই বৃক্ষে পরিণত করিতে পারিবে না, কালবশে ক্রম-পরম্পরায় বৃক্ষে পরিণত হইবে; যদি প্রকৃতির কর্ত্তৃত্ব থাকিত, তাহা হইলে আজই বৃক্ষে পরিণত হইতে পারিত, কালবশ হেতু তাহা পারিল না, সুতরাং প্রকৃতি কালবশ। প্রকৃতি যে কালের মুখাপেক্ষা করে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই, যেহেতু জ্ঞানশক্তি-বিরহিত অচেতন প্রকৃতির কালজ্ঞান থাকা অসম্ভব, কোন কালে ইহা কর্ত্তব্য, কোন কালে ইহা অকর্ত্তব্য, তাহা অবধারণ করা জ্ঞানশক্তিবিহীনের সাধ্য নয়। যদি তাহা

না মানা যায়, তাহা হইলে বিশ্ব জগতের সদাই সৃষ্টি হইত, কদাচ প্রলয় দশা প্রাপ্ত হইত না; অথবা ইহার চির প্রলয়াবস্থাতেই অবস্থান অবশ্যম্ভাবী হইত, কদাচ সৃষ্টি হইত না, এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়।

মহাকাল নিরাকার, নির্ব্বিকার, অবিনাশী, বিভু, নিত্য, অচ্যুত, অব্যয়, অনাদি, অনন্ত, অজ, অপ্রমেয়, সাক্ষী, দ্রষ্টা, নির্লিপ্ত, সর্ব্বগ্রাসী, আদি-অন্ত-মধ্য-রহিত, নিত্য-জাগ্রত, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কারণ, স্বয়ম্ভু, স্বপ্রকাশ। ইনি কখন জন্মেন না, মরেন না, অথবা উৎপন্ন হইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হন না। ইনি জন্মরহিত, হ্রাস-বৃদ্ধি আদি অন্ত শূন্য, শাশ্বত অর্থাৎ ক্ষয়শূন্য এবং পুরাতন অর্থাৎ পরিণাম শূন্য। ষড়ৈশ্বর্য্যশালী মহামহিম মহেশ্বর।

কাল অচিন্ত্য। কাল যে কত কালের, কাল তাহা নিজেই বলিতে পারে না। দিবা নাই, রাত্রি নাই, প্রভাত নাই, সন্ধ্যা নাই, মধ্যাহ্ন নাই, উষা নাই, এই সকল সময়জ্ঞাপক কোন চিহ্ন বিদ্যমান নাই, এরূপ কালবিহীন কালকে কল্পনায় আনিতে গেলে, মন আপনা হইতেই স্তম্ভিত হইয়া আসে। ফল কথা, সৃষ্টিকর্ত্তার স্রষ্টা নিরূপণের ন্যায়, অনাদি কালের আদি অনুসন্ধানের জন্য বুদ্ধি চালনা করা বৃথা।

এই দেখ আর্য্যপ্রদীপের বিমল প্রভায় মহাকাল দণ্ডায়মান। শ্রুতির উপদেশ—কাল হইতে বিশ্ব জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, কালেই স্থিতি হইতেছে, আবার কালেই লয় হইবে। কালেই সিদ্ধি হয়, কালেই বৃক্ষ ফল প্রসব করে, কালেই তপোবৃক্ষ তপঃফল প্রসব করে, কালেই শিশুর বল বৃদ্ধি হয়, কালেই বৃদ্ধদিগের বল বুদ্ধি হীন হয়, কালেই প্রসূতি প্রসব করে, কালেই সূর্য্য তাপ প্রদান করে। অকালে কিছুই হয় না। সময় উপস্থিত না হইলে কেহ বিদ্যা বা বুদ্ধিপ্রভাবে অর্থলাভে সমর্থ হয় না, আবার সময় অনুসারে মূর্খও অর্থলাভে সমর্থ হয়, অতএব সমস্ত কার্য্য কালসাপেক্ষ সন্দেহ নাই। লোকের দুঃখের সময়ে কী বিজ্ঞান, কী শাস্ত্র, কী মন্ত্র, কী ঔষুধ, ইহাদের কোনটাই ফল প্রদান করিতে সমর্থ হয় না। আবার অভ্যুদয়কালে সকল উপায়ই যথাবিধি প্রয়োগ করিলে ক্রমে উহা তেজস্বর হইয়া সিদ্ধিপদ হয়। কালসহকারে বায়ু প্রচণ্ডবেগে প্রবাহিত, জলধর সকল সলিলভরে অবনত, সরোবর শ্বেতপদ্ম ও নীলপদ্ম-সমাকীর্ণ, এবং বৃক্ষ সকল ফুল-ফলে সুশোভিত হয়; কালক্রমে চন্দ্রবিম্ব ষোড়শ কলায় পূর্ণ, বিভাবরী কখনও নিবিড় অন্ধকারাবৃত, কখনও বা বিমল জ্যোৎস্নায় বিভূষিত হয়। কালের সহকারিতা প্রাপ্ত না হইয়া বৃক্ষ সকল পুষ্প। ফল প্রসবে সমর্থ হয় না, এবং নদীসকলও বেগে প্রবাহিত হইতে পারে না; হস্তী, মৃগ প্রভৃতি পশুগণ, সর্প ও বিহঙ্গমগণ অসময়ে কদাচ সংযোগাদি নিমিত্ত মত্ত হয় না। ঐরূপ স্ত্রীলোকদিগের গর্ভসঞ্চার, বসন্তাদি ঋতু সমাগম, জীবের জন্ম-মৃত্যু, বালকের মধুর বাঙনিষ্পত্তি, যৌবন সমাগম, যত্নে রোপিত বীজের অঙ্কুরোদগম, কাল প্রাপ্ত না হইলে কিছুই হয় না। অকালে উৎপন্ন কোন বস্তু নাই, সৃষ্টির পূর্বে যখন জগৎ অতীতের অজ্ঞেয়তার রাজ্য অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান পান্থশালায় আতিথ্য গ্রহণ করিতে পারে নাই, তখন কি ছিল? কাল ছিল, সেই অনাদি কালই এই পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছে। শত পুরুষকারও কালস্রোতে ভাসিয়া যায়। কালের করুণায় সাগরতল পর্ব্বতের তুঙ্গ শৃঙ্গে পরিণত হয়, ক্ষুদ্র বীজ বিশাল বৃক্ষে পরিণত হয়, তরু স্থানে মধুর আবির্ভাব হয়, মরুমধ্যে স্রোতস্বতীর মনোরম মূর্ত্তি প্রকটিত হইয়া থাকে। কৃষকগণ প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়া যথাকালের পূর্বে উপযুক্ত শস্য প্রাপ্ত হয় না। তপঃসিদ্ধিতেও কালের কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ। ব্রহ্মস্বরূপ সাক্ষাৎকার, কালের পারমার্থিক রূপ দর্শন ও কালের প্রসাদে। কালের বশবর্ত্তিতায় জগৎ সৃষ্ট হয়, কালের দ্বারা বর্দ্ধিত, আবার কালমাহাত্মেই বিনষ্ট হয়। কালই সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং পোষণ করিতেছেন, পরিশেষে ঘাড়ে ধরিয়া সংহার দশায় উপনীত করিবেন। কাল প্রজাপতির পূর্ব্ববর্ত্তী, কাল স্বয়ম্ভু, কালের কারণ নাই, কালই সর্ব্বকারণ; কাল আদি-অন্তবিহীন, ষড়ৈশ্বর্য্যযুক্ত, অন্তশূন্য, জরামরণবিহীন, জগতের কর্তা, স্বাধীন, সর্ব্বগ, সকলের আত্মস্বরূপ। এই মহাকাল স্থূলও বটে, সূক্ষ্মও বটে, সাকারও বটে, নিরাকারও বটে।

মহাকালের কোন দৃশ্যরূপ নাই, ইহার ভাগ-বিভাগ নাই, দিবা নাই, রাত্রি নাই, আদি নাই, অন্ত নাই, বিশ্বব্যাপী সত্তা, কেবল অখণ্ড অনুভবস্বরূপ স্বপ্রকাশ বিরাট সত্তা। এই অসীম বিশ্বের তদাদি তদন্ত কাল কর্ত্তৃক ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। সংসারে এমন কি আছে, যাহা কালের উদরসাৎ না হয়? গরুড় যেমন সর্পকে,

কাল তেমনি সুরূপ, সুকর্ম্মা, মহাগৌরবসম্পন্ন মানবকেও ভক্ষণ করে। দাতা, কৃপণ, ধার্ম্মিক, অধার্ম্মিক, মৃদু কর্কশ, সদয়, নির্দ্দয়, অধম বা উত্তম—এমন কেহই নাই, কাল যাহাকে গ্রাস না করে। কাল পর্ব্বতকেও যখন গ্রাস করিয়া থাকে, তখন সামান্য মানুষ ভক্ষণ করিয়া কি তাহার তৃপ্তি হইতে পারে? নটগণ যেমন বিবিধ মূর্ত্তিতে ক্রীড়া করে, কালও সেইরূপ হরণ, নাশন, প্রাশন প্রভৃতি নানারূপে বিহার করিতেছে। বন্যহস্তী যেমন পাদপদিগকে, কাল তেমনি সংসারকে সমূলে উন্মূলিত করে। কাল সময়ে প্রজাকুল সংহার করিয়া অস্থিমালায় আপাদমস্তক ভূষিত করে। মহাকল্পবৃক্ষ হইতে সুর ও অসুররূপ ফল পাতনপূর্ব্বক ভক্ষণ করে এই মাতার ক্রোড় হইতে তাহার প্রাণাধিক প্রীতিময় পুত্রকেও অনায়াসে গ্রহণ করিয়া থাকে।

শত শত মহাকল্প অতীত হইলেও ইহার শান্তি বা খেদ বোধ হয় না। ক্ষুদ্র বৃহৎ কোন বস্তুই ইহার নিকট পরিহার প্রাপ্ত হয় না। ইহার মহিমা অবগত হওয়া সামান্য বুদ্ধির সাধ্য নহে। ইহা সর্ব্বাপেক্ষা বলশালী। এইরূপে কৃতান্ত ও মৃত্যুস্বরূপ কাল প্রলয়কালীন নৃত্য হইতে নিবৃত্ত হইয়া পুনরায় ব্রহ্মাদির সৃষ্টি করিয়া শোক-দুঃখ-জরাশালিনী সৃষ্টিরূপিণী নাট্যশালার আবিষ্কার করে এবং বালক যেমন পুত্তলিকাদি নির্ম্মাণ করিয়া আবার ভগ্ন করে, সেইরূপ চতুর্দ্দশ ভুবন, বিবিধ বনরাজি ও দেশ এবং নানাজাতীয় জীবজন্তু রচনা করিয়া পুনর্ব্বার সংহার করে। এই কৃতান্তরূপী কাল তরুণ দেহেও জরার আবির্ভাব করিয়া প্রাণীদিগকে বিনাশ করে। আপ্ত ব্যক্তিও ইহার কৃপালাভে সমর্থ নয়। ইহার উদরের সীমা নাই। ইহার কৃপায় আবার আর্ত্ত ত্রাণ পায়। এই কাল পক্ষপাত-পরিশূন্য হইয়া সকলকেই সমভাবে গ্রহণ করে। সর্ব্বশাস্ত্রের সার সিদ্ধান্ত—কালই বিশ্বের হর্ত্তা, কর্ত্তা, বিধাতা, ভোক্তা; কালই জগদাধার, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের মূলাধার মহেশ্বর। কালেরই মহাক্রিয়া এই মহাবিশ্ব। কাল-শক্তিবশে বর্তমান জগৎ ধাবিত, কাল-শক্তিবশেই অতীত জগৎ অতিক্রান্ত, আবার কাল-শক্তিবশেই ভবিষ্যৎ জগৎ আভাসরূপে অবস্থিত। জগৎ কালে উৎপন্ন, আবার কালশক্তিকবলে শেষ ইহার আত্মসমর্পণ। যুগের পর যুগ, শতাব্দীর পর শতাব্দী, এই বিশ্বের কত মস্তক উন্নত হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে, সেই সকল উন্নত মস্তক একদিন মহাকালের অঙ্গে শেষ সমাধি লইবে। কালকে ছাড়িয়া কেহই কিছু করিতে পারে না, কালই সর্ব্বেসর্ব্বা, কালই বিশ্ব ভাঙ্গিতেছে গড়িতেছে, কালের হাত ছাড়াইবার উপায় নাই, মুক্তই হও আর বদ্ধই হও; মুক্ত হইলেও কালগর্ভে থাকিতে হইবে, বদ্ধ হইলেও কালগর্ভে থাকিতে হইবে। চিরকাল বিশ্বকে কালগর্ভে থাকিতে হইবে।

কাল-নদী নিরন্তর প্রবাহিত হইতেছে। ক্ষুদ্র প্রবাহিনী যেমন মহানদীতে মিলিত হইয়া থাকে, মহানদী আবার সমুদ্রের সহিত সংযুক্ত হয়; মহানদী যে প্রকার ক্ষুদ্র নদীর মিলন বশতঃ বিস্তীর্ণা হয়, কদাচ শুষ্ক হয় না, নিরন্তর প্রবাহিত হয়, সেই প্রকার ক্ষণ মুহূর্ত্তাদি ক্ষুদ্র কালনদী, আর দিবস পক্ষাদি বৃহৎ কালনদী, সংবৎসরকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে, ক্ষুদ্র বৃহৎ মিলিত হইয়া পরস্পর বিস্তীর্ণ হয়, কখনও বিচ্ছিন্ন হয় না। জগৎ স্বভাবস্রোতে পতিত হইয়া সততই ভাসমান হইতেছে; কালরূপ মহা আবর্ত্ত, মাসরূপ তরঙ্গ, ঋতুরূপ বেগ, পক্ষরূপ উপল, নিমেষাদি ক্ষেত্র, অহোরাত্র সলিল, ধর্ম্মরূপ দধি, অর্থাভিলাষ পয়ঃ, সত্যবাক্য মুখ্যতীর, অহিংসা তরু, যুগ হ্রদ, সমুদয় আশ্রয় করিয়া নিয়ত অপ্রতিহতবলশালী ব্রহ্মোদ্ভুত কালরূপ মহানদী বিশ্বসংসার প্লাবিত করত ঈশ্বরসৃষ্ট ভূতগণকে শমনভবনে নীত করিতেছে। উদারচেতা পণ্ডিতেরা জ্ঞানময় পোত দ্বারা অনায়াসে এই কালনদী উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন; জ্ঞানপোত-বিহীন লঘুচেতা মানবগণ কখনই উহার পার হইতে সমর্থ হয় না। ছয় ঋতু যাহার নাভি, দ্বাদশ মাস যাহার অর, অমাবস্যাদি যাহার পর্ব্ব, কখনই যাহার অন্ত হইবে না; যাহা নিরন্তর ঘূর্ণিত হইতেছে, এই বিশ্ব সংসার যাহার আস্যদেশে প্রবিষ্ট হয়, সেই কালচক্র নিভৃত গুহায় নিহিত রহিয়াছে।

কাল পদার্থভেদে ভিন্ন ভিন্ন। পদার্থ যেমন ভিন্ন ভিন্ন, তাহাদের আয়ু স্থিতিকালও ভিন্ন ভিন্ন, সকলের কাল সমান নহে। জগৎকারণ ব্রহ্ম, স্বীয় মায়া দ্বারা যত সংখ্যায়, যত রূপে, যাবৎ পরিণামে বিশ্বরূপ ধারণ করিয়াছেন, কালও তত সংখ্যায়, তত রূপে, তাবৎ পরিমাণে নির্দ্দিষ্ট হইয়া রহিয়াছে, অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কালও আছে। এমন সব প্রাণী আছে, যাহাদের মনুষ্যের এক দিনের ভিতর, জন্ম

বৃদ্ধি, সন্তান ও প্রসব ও অপক্ষয় পর্য্যন্ত শেষ হইয়া যায়। আবার মনুষ্য অপেক্ষা দেবতারা দীর্ঘস্থায়ী। নরলোকের ষাটি হাজার বৎসর ব্রহ্মার এক মুহূর্ত্ত হয়।

সত্যের পরিমাণ ১৭২৮০০০ বৎসর, ত্রেতা ১২৯৬০০০ বৎসর, দ্বাপর ৮৬৪০০০ বৎসর, কলি ৪৩২০০০ বৎসর, এই চারি যুগের সমষ্টির ৭১ (একাত্তর) গুণ মনু ও ইন্দ্রের আয়ুষ্কাল। আবার লোমশ মুনির একগাছি লোম পতনে, এক ইন্দ্রের পতন, এই প্রকারে লোমশ মুনির সমস্ত লোম পতনে তাঁহার মৃত্যু, সুতরাং লোমশ মুনির আয়ুসংখ্যা নির্ণয় করা যায় না। ব্রহ্মার একদিনে চতুর্দ্দশ মনুর মুক্তি, ও চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের পতন হয়। ব্রহ্মার এক মাসে ৪২০ ইন্দ্রের পতন, ব্রহ্মার এক বৎসরে ৫৪০০০ ইন্দ্রের পতন এবং ব্রহ্মার সমুদয় জীবিত কালে অন্যূন ৫৪০০০০ ইন্দ্রের বিনাশ হয়। ব্রহ্মার দিবসকে কল্প কহে। চতুর্যুগসহস্রে ব্রহ্মার এক দিন ওই প্রকার রাত্রি, ব্রহ্মার অহোরাত্র ৮০০০০০৬৪০০০০০০০ আট পদ্ম চৌষট্টি কোটী। এই প্রকার ব্রহ্মার আয়ু শত বৎসর। মহর্লোকস্থ প্রাণীদিগের আয়ু সহস্র কল্প, জন লোকের আয়ুকাল দুই সহস্র কল্প, তপোলোকস্থ জীবের আয়ুকাল চারিসহস্র কল্প, সত্যলোকস্থ প্রাণীর আয়ুকাল ব্রহ্মার সমতুল্য অর্থাৎ ইহারা মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত জীবিত থাকেন।

মহাকাল-বক্ষে কালা কালী দুয়েরই অবস্থিতি। কালবক্ষে চিৎ শক্তির, পুরুষ প্রকৃতির, কালী কালার, শিব শিবার, শ্যাম শ্যামার আসন নির্দ্দিষ্ট আছে। কালীর বক্ষে কালা, কালার বক্ষে কালী। বহ্নির দাহিকা শক্তি যেমন বহ্নি-বক্ষেই আপন আসন নির্দ্দেশ করে, তদ্রূপ কালের বক্ষে কালীর আসন নিদ্দিষ্ট আছে। মহাকাল-রঙ্গভূমি কালমঞ্চে মহাকালীর মহানর্ত্তনই মহাবিশ্ব।

ব্যোম বা আকাশ

ব্যোম বা আকাশ অর্থাৎ শূন্য, অবসর, খালি বা ফাঁক তাহারই নাম ব্যোম। দৈর্ঘ্য বিস্তার ও বেধ যে পদার্থের আকার, তাহাকে অসীম বলিয়া মনে করিলে যাহা পাওয়া যায়, তাহারই নাম ব্যোম বা আকাশ; দেশ সকল তাহারই নামান্তর। যাহা অনন্ত বিশ্বকে থাকিবার জন্য স্থান বা আশ্রয়স্বরূপ অবকাশ দিতেছে, তাহাকেই বলে মহাব্যোম। রূপের সীমাপ্রকাশক যে লক্ষণ, তাহাই ব্যোম। বদ্ধাবস্থায় আত্মার সহিত ব্যোমের যে সম্বন্ধ, মুক্তাবস্থায়ও সেই সম্বন্ধ। মহাব্যোম বিভু, নিত্য, অবিনাশী, নির্বিকার, নির্লিপ্ত, অব্যক্ত, অনাশ্রয়, অনালম্ব; ইহার এই সকল গুণ আছে। গগন নিজে জানে না, তাহার ব্যাপ্তি বা সীমা কত দূর। আকাশই বায়ুর সহিত তেজের কারণ। তেজ আকাশ হইতে বায়ু গ্রহণ করিয়া প্রদীপ্ত হয়। আকাশই তেজের কারণ। চন্দ্র, সূর্য্য, বিদ্যুৎ, নক্ষত্র, অগ্নি প্রভৃতি তেজের রূপ; এই সকল আকাশের অন্তর্গত। যে যাহার অন্তর্গত হয়, সেই পদার্থ, অন্তর্গত পদার্থ হইতে প্রধান হইয়া থাকে, আর অন্তর্গত পদার্থকে অল্প বলিয়া জানা যায়।

কোনও ব্যক্তি অপরকে সম্বোধন করিতে গেলে, আকাশই সহযোগী হয়, কদাচ আকাশ ব্যতিরেকে সম্বোধন পদ উৎপন্ন হইতে পারে না, আকাশ দ্বারা সেই আহূত ব্যক্তি আহ্বানের শব্দ শুনিতে পায়, আকাশ ভিন্ন শব্দের গতি হইতে পারে না, সুতরাং আকাশ ব্যতিরেকে আহ্বান বা শ্রবণ কিছুই সম্ভাবিত হইতে পারে না। দুই পদার্থের মধ্যে ফাঁক বা আকাশ না থাকিলে শব্দের গতি হয় না, অর্থাৎ আকাশ অভাবে সে স্থানে কোন পদার্থ থাকিলে শব্দ শ্রুত হয় না। আকাশ আছে বলিয়াই বজ্রের কড় কড়, বিহঙ্গের কাকলি, বালকের আধো আধো ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে। শ্রবণ-ইন্দ্রিয় আকাশ হইতে উৎপন্ন। কার্য্যমাত্রেরই কর্ত্তা আছে। মহাব্যোম এখন অবকাশ দানরূপ কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে; অবকাশ দানরূপ কার্য্য করাই যখন ইহার স্বভাব, তখন কাজেই ইহা কর্ত্তা। আবার অনন্ত বিশ্বের থাকিবার আশ্রয়স্থল মহাব্যোম, সুতরাং ইহাই অধিকরণ। মহাব্যোম মহাদয়ালু, ইহা তোমাকে থাকিবার স্থান দেয় বলিয়া তুমি থাকিতে পারিতেছ। আকাশে প্রাণীগণ জন্মে, অঙ্কুরাদি আকাশকে লক্ষ্য করিয়া উৎপন্ন হয়। গর্ভস্থ শিশু আকাশকে অবলম্বন করিয়া জন্মগ্রহণ করে ও বর্দ্ধিত হয়। এই আকাশ অবকাশ দেয় বলিয়াই তুমি নগর, কানন, বন, উপবন, অট্টালিকা, বিহারোদ্যান প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া জগতের এত সৌষ্ঠব সাধনে সমর্থ হইয়াছ।

ব্যোম সর্ব্বব্যাপী, বায়ুবিহারী ক্ষুদ্রতম কীটাণুর অলক্ষ্য কুক্ষিতে যে ব্যোমকণিকার প্রত্যক্ষ সঞ্চার, উর্দ্ধতম ব্রহ্মলোকেও সেই ব্যোম পরমাণুর বিপুল বিলাস। ব্যোম অনন্ত ও অসীম। উহার দৈর্ঘ্য নাই, প্রস্থ নাই, উর্দ্ধপ্রসারিত উন্নতি নাই, অধঃ প্রসারিত অবনতি নাই, দিক নাই, বিদিক নাই, আছে কেবল অনন্তমুখী বিস্তৃতি। বুদ্ধি উহার পানে তাকাইয়া বিহ্বল হয়, কল্পনা উহার সীমা বা অবধি না পাইয়া অচল হয়। এই হেতুই জগতের জ্ঞান ও বিজ্ঞান ভক্তিসম্মিলিত কণ্ঠে এই মহাব্যোমকে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের পদ্মাসনরূপে নির্দ্দেশ করিয়া সভয় সম্ভ্রমে নমস্কার করিয়াছে। ব্যোম সৃষ্টি-উপকরণের অক্ষয় ভাণ্ডার, উহা আপনি আপনার মণিরত্নবিলসিত বরণীয় বরভূষণে নিত্য বিভূষিত; উহার কোন অঙ্গে কৌস্তুভ, কোন অঙ্গে কোহিনুর, কোথাও বা পদ্মরাগ, এবং কোথাও বা দূর্ব্বাদলশ্যাম মরকত মণি বিভাসিত। কোন স্থানে শ্বেত সূর্য্য রজতছটায় দিগ্বলয় উদ্ভাসিত করিয়া অবিরাম গতিতে আবর্তিত হইতেছে। কোন স্থানে কাঞ্চনসদৃশ প্রদীপ্ত প্রভাকর চারিদিকে স্বর্ণরশ্মির অনন্ত রেখা বিস্তার করিয়া সাগরে তরঙ্গ তুলিয়া ঘূর্ণিত পথে গতি করিতেছে। কোথাও নীল, কোথাও লোহিত এবং কোথাও হরিতাভ রবি আপন আপন জগৎ আলোকিত করিয়া নির্দ্দিষ্ট গতিতে মহাবেগে প্রবাহিত হইতেছে। কেবল ইহাই নহে, প্রত্যেক সূর্য্যের সঙ্গে আবার অসংখ্য জীবের আধার, আশ্রয় ও লীলাভূমি অগণ্য পৃথিবী বা গ্রহনিচয় ঘূর্ণমান। কাহারও কণ্ঠে এক, কাহারও কণ্ঠে দুই,

কাহারও কণ্ঠে তিন বা ততোধিক চন্দ্রমণি বিলম্বিত এবং কাহারও গলদেশে চাঁদে চাঁদে গাঁথা বিচিত্র পারিজাতহার দোদুল্যমান। ব্যোমের স্তরে স্তরে ও পটলে পটলে কতই যে শোভার সম্পদ ফুটিয়া রহিয়াছে, কে তাহা গণনা করিবে!

কেহ বলেন ব্যোম আছেন, কেহ বলেন নাই; কেহ বলেন ইনি ভাব, কেহ বলেন ইনি অভাব;—মহা সমস্যা, মহা ধাঁধা! ভাব কারে বলি? যাহার অস্তিত্ব আছে, তাহাই ভাব পদার্থ। অভাব কারে বলি? ভাব পদার্থের অব্যক্ত কারণে লীনকেই অভাব বলিয়া জানা যায়। ইহার কারণ—ভাবেরই অভাব হয়, অভাবের অভাব হইতে পারে না। যাহা আছে, তাহারই নাই হয়; যাহা নাই, তাহার নাই হয় না; নাই-এর নাই হইতে পারে না। অসতের উৎপত্তি ও সতের নাশ অসম্ভব। সহস্র শূন্য যোগ করিলেও এক হয় না, এককে সহস্র ভাগ করিলেও শূন্য হয় না; সুতরাং ভাব পদার্থেরই অদৃশ্য কারণে লীন অভাব। ব্যোম তবে পদার্থ কিসে? ইনি অবকাশ দিতেছেন, তাহা তুমি অস্বীকার করিতে পারিবে না। তুমি একটা মাঠের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে অক্লেশে চলিয়া যাইতে পার, কারণ তোমাকে যাইবার জন্য ব্যোম অবকাশ দিতেছে; কিন্তু একটি পাহাড় ভেদ করিয়া এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত যাইতে পার না, কেননা, তোমাকে অবকাশ দেয় নাই; সুতরাং দেখা যাইতেছে, যে 'ভাব' তোমাকে মাঠের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে যাইতে দিতেছে, সেই ভাবের অভাব হেতু তুমি পর্ব্বতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে যাইতে পারিতেছ না; সুতরাং সেই পদার্থটা ভাব। বিশেষতঃ ইনি যে ভাব পদার্থ, তাহা তাঁহার গুণের দ্বারাই প্রকাশ পাইতেছে; গুণ গুণীতেই বর্ত্তে, বিশেষ্যকে আশ্রয় করিয়াই গুণ বা বিশেষণ অবস্থিতি করে, অভাব পদার্থ বিশেষ্য হইতে পারে না এবং বিশেষণ অভাব পদার্থকে আশ্রয় করে না; সুতরাং ইনি ভাব পদার্থ, কারণ ইহাতে বিভূত্ব অবিনাশিত্ব, নির্ব্বিকারত্ব, নির্লিপ্তত্ব ইত্যাদি গুণ আছে। সেই হেতু ইনি ভাব পদার্থ আছেন, অভাব নাই নহেন। জগতে এমন কিছুই নাই, যাহা নাই, অর্থাৎ সকল বস্তুই আছে। যাহা নাই বা অভাব বলিয়া মনে করিতেছি, তাহাই আছে, কেননা একটা পদার্থ না থাকিলে, তুমি মনে কর কি প্রকারে? তুমি যখন মনে করিতেছ, তখন উহার ভাব পদার্থ। যাহা নাই বা অভাব পদার্থের অনুমান অসিদ্ধ। আছে বা ভাব বস্তুতে নাই বা অভাব শব্দ প্রয়োগ করিবার যোগ্য হয়, নাই-এর উপর নাই বা অভাবের উপর অভাব শব্দ প্রয়োগ হয় না। যখন তুমি নাই বলিয়া মনে ভাবিতেছ, তখন নাই বলিয়া একটা ভাব তোমার মনে প্রকাশ পাইতেছে; অতএব তুমি নাই বলিয়া যাহাকে মনে ভাবিতেছ, তাহাই আছে; যাহা নাই বলিয়া আছে, তাহাই মহাব্যোম।

মহাব্যোম, মহাকাল, প্রকৃতি, পুরুষ—সকলই বিভু, অথচ কেহ কাহারও প্রতিবন্ধক নহে। বিশ্বে যত কিছু পদার্থ আছে, সকলই ব্যবহার্য্য। এই আকাশ বা ব্যোমও ব্যবহার্য্য। যে গুণী, যে কৃতী, সে সকল পদার্থকেই ব্যবহারযোগ্য করিয়া লইতে পারে। কর্ণ ও আকাশ এই দুইয়ের পরস্পর যে সম্বন্ধ আছে, সেই সম্বন্ধের প্রতি সংযম প্রয়োগ করিলে দিব্য শব্দ উৎপন্ন হয়; যোগীরা এই সংযম দ্বারা দিব্য শব্দ শুনিতে পান, দূরস্থ ও সূক্ষ্ম শব্দও শুনিতে পান। শরীর ও আকাশ, এই দুইয়ের যে সম্বন্ধ আছে, তৎপ্রতি সংযম প্রয়োগ করিয়া, যোগীগণ লঘু অর্থাৎ তুলার ন্যায় অল্পভার হইয়া আকাশে যাতায়াত করিতে পারেন। আর্য্যের অধ্যাত্মবিজ্ঞান এই তত্ব আয়ত্ত করিয়া ইহাকে ব্যবহারোপযোগী করিয়াছেন, অনেক অলৌকিক কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে অনার্য্য জড় বিজ্ঞান ইহাকে কোন ব্যবহারে আনিতে পারে নাই, তবে তাহার এত দম্ভ কিসের? ব্যোম সর্ব্বপ্রকার শক্তির আদিভূত, অনন্ত পরমাণুসমূহের জন্য অদৃশ্য অক্ষয় ভাণ্ডার বলিয়া জানিবে।

শব্দ ও নাদ

শব্দ অর্থে নাদ বা ধ্বনি—শ্রোত্রগ্রাহ্য গুণপদার্থ। ইহা আকাশবৃত্তি, নিত্য ও অনাদি। অনবরত বোধস্বভাব, চৈতন্যস্বরূপ আত্মা সর্ব্বার্থময় নির্ব্বিভাগ শব্দতত্ব নামে গীত বা শব্দিত হইয়া থাকে, সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দময় পরমাত্মা নাদ দ্বারা বহিঃপ্রকাশিত অবস্থাই শব্দ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। যাহা উচ্চারিত হইলে কোন বস্তুর উপলব্ধি হয়, কোনরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহার নাম শব্দ। এই পদ এই অর্থের বোধক হউক, এই শব্দ হইতে এই অর্থ বোধগম্য, এই প্রকার অনাদি ঈশ্বর-সংকেতই, ঈশ্বরেচ্ছাই শব্দশক্তি। শব্দের সহিত অর্থের নিত্য সম্বন্ধ। অর্থ শব্দের অর্থ কি?

যাহা অর্থিত বা যাচিত হয় তাহাই অর্থ, অর্থাৎ শব্দের নিকট যাহা যাচিত হয়; শব্দের নিকট অর্থ ছাড়া আর কি যাচ্ঞা করা যাইতে পারে? শব্দের নিকট শব্দের অর্থই যাচ্ঞা করা হয়, কাজেই শব্দের নিকট যাহা যাচিত হয় তাহাই অর্থ। যাহা প্রকাশ করে তাহা শব্দ, যাহা প্রকাশিত হয় তাহা অর্থ; অতএব শব্দের সহিত তদ্বোধ্য অর্থের নিত্য সম্বন্ধ। অতএব বলিতে পারা যায়, শব্দের সহিত অর্থের বাচ্যবাচক, প্রকাশ্য-প্রকাশক সম্বন্ধ আছে, কাজেই নাম ও নামীতে সম্বন্ধ আছে, সুতরাং নাম ও নামীতে অভেদ।

আত্মাই শব্দ, আত্মাই অর্থ। ব্রহ্মই প্রকাশক, ব্রহ্মই প্রকাশ্য। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে শব্দ ও অর্থ, কার্য্য কারণ বা প্রকাশ্য প্রকাশক ভাবে উপলব্ধ হইয়া থাকে। সকল বস্তুর আত্মাই প্রকাশক। আত্মা ছাড়া সকল বস্তুই প্রকাশ্য। শব্দই প্রকাশক, অর্থ প্রকাশ্য। প্রকাশক যে পদার্থ তাহা আত্মা, সুতরাং আত্মা ও শব্দ যখন প্রকাশক পদার্থ, তখন আত্মা ও শব্দ এক পদার্থ। আত্মা যাহা প্রকাশ করেন তাহা শব্দ, আর শব্দ যাহা প্রকাশ করে তাহা অর্থ। শব্দ সকলের অর্থবোধ-কারণতা, অর্থবোধ-যোগ্যতা, অর্থজ্ঞাপক শক্তি, অনাদি স্বভাবসিদ্ধ। শব্দের সহিত অর্থের প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদকতা, গ্রাহ্য-গ্রাহকতা, বাচ্য-বাচকতা, প্রকাশ্য-প্রকাশকতা সম্বন্ধ—মানববুদ্ধিস্থাপিত নহে, লৌকিক বা সাংকেতিক নহে, শব্দের সহিত অর্থের বা নামের সহিত নামীর সম্বন্ধ—বর্ত্তমান সময়ের নহে, তাহা অনাদি কালের নিত্য সম্বন্ধ। যেমন—গো এই শব্দ উচ্চারণ করিলে শৃঙ্গলাঙ্গুলাদিযুক্ত পশুবিশেষ বলিয়া বোধ হয়, বাচ্যবাচক সম্বন্ধ প্রকাশ হয়, সেই প্রকার প্রণব উচ্চারণ করিলেও সংঙ্কেত সাধকের হৃদয়ে প্রকৃত ঈশ্বরভাব উদিত হয়। উপাসনার নিমিত্ত ঈশ্বরের সহিত প্রণবের সংঙ্কেত বন্ধন করা হইয়াছে সত্য বটে, কিন্তু তাহা আজকাল নহে। অনাদি কালের প্রণবের সহিত ঈশ্বরের অনাদি কালের সম্বন্ধ।

শব্দ দুই প্রকার,—ধ্বন্যাত্মক ও বর্ণাত্মক। নানা প্রকার বাদ্যযন্ত্র প্রভৃতির যে শব্দ তাহা ধ্বন্যাত্মক, কণ্ঠসংযোগাদিজন্য শব্দ বর্ণাত্মক। দুই বস্তুর আঘাত হইলে শব্দ উৎপন্ন হয়, আবার আত্ম প্রযত্নে মানব-কণ্ঠ হইতে শব্দ নির্গত হয়; ইহাদের উভয়বিধ শব্দের কার্য্যকারিতা একরূপ নহে। ধ্বন্যাত্মক শব্দকে অব্যক্ত শব্দ বলে। শব্দ মাত্রেরই শক্তি এই যে, শব্দ শ্রবণ-ইন্দ্রিয়ে সংযুক্ত হইবামাত্র আপনার স্বরূপাদি প্রকাশ করে এবং কোন না কোন মানস ক্রিয়া বা জ্ঞান উৎপাদন করে। যে সকল শব্দ শোক, হর্ষ, আবেগ প্রভৃতি মানস বিকারের জনক, অথচ যাহাতে কোন প্রকার অর্থের সংস্রব থাকে না অর্থাৎ যাহা মানব-মনে কোনপ্রকার বস্তুর ছবি সংলগ্ন করে না অথচ শোক-হর্ষাদি জন্মায়, তাহা ধ্বন্যাত্মক শব্দ; যথা—মৃদঙ্গ, বীণা, রাগিণী ইত্যাদি। আমাদের নিকট পশুশব্দ ও ম্লেচ্ছশব্দ ধ্বনিবাচক। মনুষ্য-কণ্ঠ নির্গত শব্দ, যদি বুদ্ধিপূর্ব্বক বা সংস্কারপূর্ব্বক উচ্চারিত না হয়, তবে সে শব্দ ধ্বনিবাচক বলিয়া গণ্য হয়; যেমন বালক, রোগী, পাগল ইত্যাদি য়্যাঁ, ওঁ, গ্যাঁ, গোঁ শব্দ।

বর্ণাত্মক শব্দ—যাহা দ্বারা বস্তুর বর্ণনা হয়, তাহার নাম বর্ণ। কণ্ঠসংযোগাদি জন্য শব্দকে বর্ণাত্মক শব্দ কহে। ঐ বর্ণাত্মক শব্দকে ব্যক্ত শব্দ, বাক্য, কথা বা উপদেশ প্রভৃতি বহু নামে ব্যবহার করা হয়। যে শব্দ

মানব-কণ্ঠ হইতে বুদ্ধিপূর্ব্বক বিনির্গত হয়, অর্থের সহিত যাহার সম্পূর্ণ সংস্রব থাকে অর্থাৎ যে শব্দের দ্বারা মানব-মনে কোন না কোন বস্তুর আকার অনুভূত হয়, সেই সকল শব্দ বর্ণ-শব্দ বা ব্যক্ত শব্দ নামে পরিচিত। এই অসীম মহিমান্বিত বর্ণ-শব্দের দ্বারা, কবিগণ গ্রাম, নগর, সরিৎ, সাগর, পর্ব্বত প্রভৃতি বহিঃপদার্থ ও কাম, ক্রোধ, লোভ, ভয়, সুখ, দুঃখ ইত্যাদি মানব ভাবের ছবি বর্ণনা দ্বারা অন্যের মনে স্থাপিত করিয়া থাকেন।

ধ্বন্যাত্মক ও বর্ণাত্মক উভয়ই আহত শব্দ। আহত শব্দের অতীত অনাহত ধ্বনি বলিয়া এক প্রকার শব্দ আছে, তাহার নাম অশরীরিবাণী। অশরীরিবাণী হৃদাকাশে ঈশ্বর-সকাশ হইতে উদ্ভূত হয়। তপস্যা দ্বারা চিত্ত মন মার্জ্জিত হইলে, সত্বের অতি উৎকর্ষে বুদ্ধি নির্ম্মল হইলে, সাধকের বহু ভাগ্যফলে, দক্ষিণ কর্ণে ঐ নাদ প্রকাশিত হয়। ইহা অভ্রান্ত ও আপ্ত অর্থাৎ নিজ সম্পত্তি।

শব্দ স্বপ্রকাশ; প্রদীপ নিজেই নিজের প্রকাশক এবং অন্যেরও প্রকাশক, সেইরূপ শব্দ নিজেই নিজের প্রকাশক, অর্থেরও প্রকাশক, এই হেতু স্বপ্রকাশ। প্রকাশকত্বই ইহার কার্য্য। শব্দ বিশ্ব প্রকাশক। শব্দশক্তি-বলেই বিশ্ব প্রকাশিত হইতেছে। যদি শব্দজ্ঞান না থাকিত, শব্দজ্যোতিঃ সকল সংসারকে যদি প্রকাশ না করিত, তবে এই ত্রিভুবন অন্ধতমাসাচ্ছন্নের ন্যায় প্রতীয়মান হইত, জড়বৎ অনুভূত হইত। যেমন সূর্য্যের উদয়ে সর্ব্ববস্তুর প্রকাশ হয়, সেইরূপ শব্দজ্যোতির প্রকাশে সর্ব্ববস্তুর প্রকাশ হয়।

শব্দশক্তিবলেই ইনি রাজা, ইনি প্রজা, পিতা, মাতা, ভ্রাতা প্রভৃতির বোধশক্তি জন্মে। এই শব্দই ঋক, সাম, যজুঃ, অথর্ব—চতুর্ব্বেদ, ইতিহাস, পুরাণাদি শাস্ত্র সকল, নীতিশাস্ত্র, দেববিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা, নৃত্যগীতাদি-শাস্ত্র, শিল্পশাস্ত্র প্রভৃতি সকলকে প্রকাশ করে। স্বর্গ, পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল, মনুষ্য, দেবতা, পশু, পক্ষী, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, সত্য, মিথ্যা, সাধু, অসাধু, প্রিয়, অপ্রিয়—এই সমুদায়ই শব্দ দ্বারা বোধগম্য হইয়া থাকে। শব্দ না থাকিলে ধর্ম্মাধর্ম্ম, ক্রিয়াকর্ম্ম, কিছুই জানা যাইতে পারে না। যদি শব্দ না থাকে, তাহা হইলে অধ্যাপনা হইতে পারে না এবং শ্রবণাদি-অভাবে, ধর্ম্মাধর্ম্ম, সত্য, মিথ্যা, ক্রয়, বিক্রয়, কাজকর্ম্ম কিছুই হয় না এবং বিষয়ের বোধ জন্মিতে পারে না; শব্দই ঐ সকল প্রকাশ করে। যাহারা বধির, তাহাদের শব্দজ্ঞান-অভাবে বোধশক্তি কম। এই নিমিত্তই শব্দ সকলের প্রধান ও প্রকাশক। শব্দ স্বপ্রকাশ ব্রহ্মেরও প্রকাশক।

শব্দই বিশ্ব। বাক বা শব্দ হইতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি বা উৎপত্তি, শব্দেই উহার স্থিতি, শব্দেই উহা বিলীন হইয়া যায়। শব্দই বিশ্বের বন্ধনী শক্তি। শব্দচক্রে সকল বিশ্ব ঘুরিতেছে। পদ বা শব্দবোধ্য অর্থের না পদার্থ। পদ + অর্থ = পদার্থ। বাক্যের অর্থ দ্বারা যাহা প্রতিপন্ন হয়, তাহা পদার্থ। বাক্যের অবিষয়ী পদার্থ অজ্ঞেয়। যে কোন পদার্থ হউক, তাহা শব্দবোধ্য, এই নিমিত্ত পদার্থের পদার্থ নাম হইয়াছে। যাহা বাক্যের বিষয়ীভূত, তাহাই জ্ঞেয়; যাহা কিছু আমাদের জ্ঞানগম্য, জ্ঞানের আকারে আকারিত হইলে যাহা বাক্যের আকারে প্রকাশিত হয়, আমরা যাহা মনে মনে চিন্তা করিতে পারি ও শব্দের দ্বারা প্রকাশ করিতে পারি, তৎসমুদয়ই পদার্থ। অভাব এক প্রকার পদার্থ, স্বপ্ন এক প্রকার পদার্থ, কল্পনা এক প্রকার পদার্থ। জগতে এমন কোন শব্দ নাই, যাহার কোন অর্থ নাই; এমন একটি পদার্থ নাই, যাহার বাচক শব্দ নাই। বাচক শব্দ নাই তাহার প্রমাণ কি? পদার্থকে আঘাত করিলে তাহা হইতে যে শব্দ নির্গত হয়, তাহাই আহত শব্দ এবং তাহাই তাহার বাচক। সেই বাচক শব্দই সংঙ্কেত অনুসারে সর্ব্বপ্রকার অর্থের বোধক হয়। শব্দ ও অর্থ দুই প্রকারেই প্রকৃতির পরিণাম নির্ম্মিত হইয়াছে। বিশ্ব প্রকৃতির পরিণাম, সুতরাং শব্দ পরিণাম। বাক বা শব্দতত্বই বিভক্ত হইয়া গো, অশ্ব, মনুষ্য, ক্ষিতি, তেজ ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন জাগতিক রূপে অবস্থান করে। শব্দ বিশ্বময়; বিশ্বের এমন কোন পদার্থ নাই, যাহাতে শব্দ নাই।

প্রকৃতি শব্দময়, শব্দ প্রকৃতিময়, সুতরাং শব্দ বিশ্বময়। শব্দ যে বিশ্বময় সর্ব্বব্যাপী, তাহা কি প্রকারে বুঝা যায়? বিশ্ব পঞ্চবিধ পরমাণু-সমষ্টি। পঞ্চবিধ পরমাণুতে শব্দগুণ আছে। পরমাণুতে যে শব্দগুণ আছে, তাহা কি প্রকারে বুঝা যায়? পরমাণু কারণ, বিশ্ব কার্য্য; পদার্থের বিয়োগ ব্যষ্টিই পরমাণু, পরমাণুর যোগ সমষ্টিই পদার্থ। পদার্থের যখন শব্দ আছে, তৎকারণ পরমাণুতেও শব্দ আছে। যাহা কারণে না থাকে, তাহা কার্য্যে

থাকিতে পারে না; বিশ্বকার্য্যে যখন শব্দ আছে অর্থাৎ মৃত্তিকায় ঠনঠন শব্দ, জলে কুলকুল শব্দ, অগ্নিতে সোঁ সোঁ শব্দ, বায়ুতে গোঁ গোঁ শব্দ আছে, তখন তৎকারণ পরমাণুতেও শব্দ আছে। আবার পরমাণু কার্য্য, শক্তি কারণ, শক্তিতেও শব্দ আছে।

পদার্থের শেষ বিভাজ্য যাহা অর্থাৎ তাহার আর ভাগ হইতে পারে না, ভাগের অতীত, তাহাই পরমাণু। বিন্দু কাহাকে বলি? যাহার অস্তিত্ব আছে, অংশ নাই, তাহা বিন্দু অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, শক্তির শেষ বিভাজ্য যাহা, তাহা বিন্দু। রেখা কারে বলি? যাহার দৈর্ঘ্য আছে, বিস্তার নাই, তাহাই রেখা অর্থাৎ বিন্দুসমষ্টি রেখা; রেখার শেষ বিভাজ্য যাহা, তাহাই বিন্দু। ব্রহ্ম কারে বলি? যাহা পদার্থের শেষ সীমা, যাহার লয় ক্ষয় নাই, বিভাগ নাই, তাহা ব্রহ্ম। এই তিন পদার্থই এক, সুতরাং তিন পদার্থ শব্দময়, কাজে কাজেই বিশ্ব শব্দময়; সুতরাং শব্দ, ব্রহ্ম, বিন্দু, পরমাণু—সমস্তই এক। অব্যক্ত শব্দব্রহ্ম বিশ্ব ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিতেছেন। সেই নিরাকার শব্দব্রহ্মের সাকার রূপ—বেদ, গীতা, উপনিষদ এবং মানব ইত্যাদি।

বিন্দু, পরমাণু, ক্ষণ, সাধারণতঃ প্রত্যক্ষসাধ্য নয়, কেবল অনুমানসাপেক্ষ। বিন্দু যখন সমষ্ঠিভূত হইয়া রেখা হয়, পরমাণু যখন সমষ্টিভূত হইয়া পদার্থ হয়, ক্ষণ যখন সমষ্টিভূত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া কাল ও দণ্ডাদিতে পরিণত হয়, তখন আমরা ইহাদিগকে বুদ্ধিগোচর করিতে পারক হই। যদি বল শব্দ আগন্তুক, দুই বস্তুর যোগযোগে শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে, না তাহা হইতে পারে না; কেননা অসতের উৎপত্তি ও সতের বিনাশ, কোন কালেই হয় না, সুতরাং ঐ নাদ আগন্তুক নয়। শব্দ অব্যক্তভাবে চিতেও ছিল, অচিতেও ছিল, এই দুই সংযোগে অব্যক্তলীন শব্দ ব্যক্ত হইল।

শক্তিময় পরমেশ্বর জগদাকার ধারণ করিবার সময় বিন্দু, নাদ ও বীজ এই ত্রিধা ভিন্ন হইয়াছিলেন। বিন্দু শিবাত্মক, বীজ শক্ত্যাত্মক, নাদ উভয়াত্মক অর্থাৎ শিবশক্ত্যাত্মক। শব্দময় ব্রহ্মের মহামানস্থ শব্দই জগতের গতি বা অব্যক্ত অবস্থা। সূর্য্য-চন্দ্রাদির প্রতিবিম্ব যে যে আধারে প্রতীত হয়, তত্তৎ আধারের স্পন্দনশীলতা বশতঃ চঞ্চল বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে; শব্দতত্ত্বও সেইরূপ নাদের হ্রাস্ব, দীর্ঘ, প্লুত, উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত ও জ্ঞাত, মধ্য, বিলম্বিত বৃত্তি নিবন্ধন সবৃত্তিকবৎ প্রতীত হয়েন।

শব্দ অনন্ত। বিশ্বে পদার্থের অন্ত নাই, শব্দেরও অন্ত নাই। বিশ্বে যত রকম পদার্থ আছে, তত রকম শব্দ আছে। জগৎকারণ ব্রহ্ম স্বীয় মায়া দ্বারা যত সংখ্যায়, যাবৎ পরিমাণে, যত রূপে বিভক্ত হইয়া বিশ্বরূপ ধারণ করিয়াছেন, পদ বা শব্দের সংখ্যাও ঠিক তত। বিশ্ব-জগৎ শব্দব্রহ্মেরই পরিণাম। অনাদিনিধন শব্দব্রহ্মই জগদাকারে বিবর্ত্তিত হইয়া থাকেন।

কি জড়, কি উদ্ভিদ, কি জীব, সকলেই শব্দার্থের বশে কর্ম্ম করিয়া থাকে। তাবৎ ক্রিয়ার মূলই শব্দ। অগ্রে বা প্রথমে মানসে শব্দ ভাবনা আরম্ভ হয়, তাহার পরে হস্তাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। প্রাণবায়ুর ঊর্দ্ধগমন ব্যাপার—শব্দভাবনা, শব্দসংস্কার ব্যতীত হয় না। তাপ, তড়িৎ, আলোক, চুম্বক আকর্ষণ, মাধ্যাকর্ষণ সংহতি, রাসায়নিক আকর্ষণ ইত্যাদি শব্দেরই ভিন্ন ভিন্ন পরিণাম। ইহার শক্তি অসীম, ক্ষমতা আশ্চর্য। এই নামরূপ জগৎ শব্দের দ্বারা পরিচিত, লালিত, চালিত ও শাসিত। সকল প্রকার সম্পদ বিপদের ইনিই মূল। মহা মহা সমরে মহা মহা রথী, বড় বড় যোদ্ধা জীবন আহুতি দিতেছে, লক্ষ লক্ষ প্রাণী আহত হইতেছে, পত্নী পতিহারা হইতেছে, পিতা পুত্র হারাইতেছে। এরূপ হয় কেন? এই বিপদের মূল কে? একমাত্র শব্দ। কেননা সেনাপতি শব্দ করিল, 'যুদ্ধ কর,' অমনি লক্ষ লক্ষ প্রাণী ছুটিল, কত লোক জীবন বিসর্জ্জন দিল; ইহা কেবল শব্দভাবনারই কার্য্য। একজন একজনকে কটূক্তি করিল, অমনি সে উত্তেজিত হইয়া তাহাকে হত্যা করিল; এই ভয়ানক দুর্ঘটনা শব্দবশেই হইল। মহারাজ দশরথ আজ্ঞা করিলেন বা শব্দ করিলেন, 'রামচন্দ্র তুমি বনে যাও' রামচন্দ্র অমনি বনে গমন করিলেন, চতুর্দ্দশ বৎসর বড়ই ক্লেশ পাইলেন। শব্দের প্রথম ক্ষণে উৎপত্তি, দ্বিতীয় ক্ষণে স্থিতি, তৃতীয় ক্ষণে লয়। মহারাজ-দশরথ-মুখনির্গত শব্দ অনেকক্ষণ লয় হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সেই শব্দভাবনা বা শব্দসংস্কারই মহারাজ-কুমারকে চতুর্দ্দশ বৎসর পর্য্যন্ত দুর্গতি ভোগ করাইল। শব্দ শক্তিবশে কত বড় বড় সংসার শ্মশানে পরিণত হইতেছে।

অর্থের মূলও এই শব্দ। যত প্রকার সম্পদ, সৌষ্ঠব, উন্নতি, সকলের মূল শব্দ। এই শব্দ শক্তিবশেই অরণ্য নগরে পরিণত হইতেছে, মরুভূমে ত্রিতল হর্ম্ম্য প্রস্তুত হইতেছে। এই শব্দশক্তি কত শোকীর শোক, দুঃখীর দুঃখ ভঞ্জন করে, আবার অশোকীর শোক, সুখীর দুঃখ ঘটায়, এই প্রকার সেই প্রকার কত আশ্চর্য্য বিচিত্র ঘটনা এই শক্তিবশে সাধিত হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। বীণা, বংশী, মৃদঙ্গ, পাখোয়াজ, সারেঙ্গ প্রভৃতি আশ্চর্য্য শব্দবিজ্ঞানের নিদর্শন। ভৈরবী, বেহাগ, ললিত, শ্রীরাগ প্রভৃতি শব্দশ্রীর অপূর্ব্ব প্রতিভা। আর্য্যজগতে শব্দশক্তির উপর যত প্রভুত্ব, তত আর কাহারও নাই। যে রাগ রাগিণী দ্বারা পশু পক্ষী মোহিত, হিংস্রক হিংসা-বিস্মৃত, রোগীর রোগ দূরীভূত, শোকীর শোক বিগত, দুঃখীর দুঃখ বিহত, এ হেন শব্দ বিজ্ঞান আর কাহার আছে?

যে শক্তিবলে পতিতপাবনী গঙ্গার উদ্ভব, পাষাণ আর্দ্র, শীলা দ্রব, কর্কশ কঠিন চিত্ত কোমল ও নরম হয়, যে শক্তিবলে নিরাকার সাকার হয়, নিষ্ক্রিয় সক্রিয় হয়, অচল সচল হয়, তাহা কাহার আছে? আর্য্য-শব্দ-বিজ্ঞান অপূর্ব্ব, অতি মহৎ তাহা কে বুঝিবে? আর্য্যেরা যে শব্দ-শক্তিবলে মহাশক্তি আয়ত্ত করিয়া সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-সামর্থ্য ধারণ করিয়া, সর্ব্বশক্তির উপর আধিপত্য করিয়া গিয়াছেন; আজ তাহা কই? সামধ্বনিতে, গীতাগানে তপোরণ্যে হিংস্র পশু হিংসা ভুলিয়াছে। যে শক্তির শক্তি জানিয়া আর্য্যেরা মহাশক্তির উপর আধিপত্য করিয়াছিলেন, যে শক্তির বলে সকলের উপর অধিষ্ঠান করিবার জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন, যাহার বশে সর্ব্ব বিশ্ব চালিত হইত, আজ আর্য্যেরা তাহা হারাইয়াছে। পূর্বে লোকের বাড়ীতে রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, বিরাটাদি পাঠ হইত, আজ তাহা এক প্রকার লোপ হইতে বসিয়াছে। বেদ, গীতা, প্রভৃতির শব্দ অর্থবোধ ব্যতিরেকেও কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়া কত কত মঙ্গল সাধিত করে, তাহা আজ বিশ্বাসের অতীত হইয়াছে।

পাপকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, তাহার জন্য অনুতাপ, দান, তপস্যা, শান্তি, তীর্থপর্য্যটন ইত্যাদির দ্বারা উহা বিনষ্ট হইয়া থাকে। অনাদিনিধন বেদ হইতে, কত পুরাণ উপপুরাণ বাহির হইয়া, নিত্য নূতনের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে, কত নব নব ভাব প্রকটিত করিতেছে, শব্দের অচিন্ত্য প্রভাব আর্য্য ছাড়া কে বুঝিবে? আর্য্যের বেদ, পুরাণ, সঙ্গীত প্রভৃতি নিত্য, অবিনাশী, উৎপত্তি-স্থিতি-প্রলয়-বর্জ্জিত। আর্য্য শব্দ ছাড়া যত কিছু শব্দ সমস্তই বর্ণাত্মক, তাহাতে পবিত্রতাকারী গুণ নাই। আর্য্যজিহ্বা ছাড়া জড় জিহ্বায় এই শব্দ উচ্চারিত হয় না, জড়াচ্ছন্ন হৃদয়ে আর্য্যজ্ঞান প্রতিভাত হয় না। শব্দকে যদি শব্দ, অর্থ ও প্রত্যয়ে বিভক্ত করা যায়, তাহা হইলে লোকের মনোগত ভাব ও পশু-পক্ষ্যাদির শব্দ বুঝা যায়, আর্য্য শব্দবিজ্ঞান অপূর্ব্ব।

শব্দই তৃতীয় চক্ষু। যেমন চক্ষুর দ্বারা বস্তুর আকার প্রকার অবগত হওয়া যায়, বস্তু প্রত্যক্ষ হয়, তেমনি শব্দের দ্বারাও বস্তুর আকার প্রকার ভাব ভঙ্গী জ্ঞাত হওয়া যায়, বস্তু প্রত্যক্ষের ন্যায় প্রতিভাত হয়। বরং চক্ষু অপেক্ষা বাক্যের শক্তি অধিক। চক্ষু নিকটস্থ বস্তু প্রকাশ করে, বাক্য দূরস্থ বস্তুকেও প্রকাশ করে। মনে কর কাশীতে একটা ঘটনা ঘটিতেছে, কাশীর লোক চক্ষুর দ্বারা কলিকাতায় সেই ঘটনা দেখাইতে পারে না, কিন্তু বাক্যের দ্বারা প্রত্যক্ষের ন্যায় দেখাইতে ও প্রকাশ করিতে পারে। চক্ষুর দ্বারা সুখ-দুঃখাদি অন্তঃপদার্থের জ্ঞান হয় না, কিন্তু বাক্য দ্বারা তাহা হয়। চক্ষুর দ্বারা অন্যের অন্তরে বস্তুর ভাবভঙ্গী আহিত করা যায় না, কিন্তু বাক্যের দ্বারা আহিত করা যায়। চক্ষু নিজ অধিষ্ঠাতার অনুগত, বাক্য কিন্তু নিজ অধিষ্ঠাতার ন্যায় অন্যেরও অনুগত। চক্ষু দ্বারা ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হয় না, শব্দ দ্বারা ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হয়; এই জন্য শব্দরাশি শাস্ত্র—ব্রাহ্মণের তৃতীয় চক্ষু বলিয়া অভিহিত হয়। শ্রুতি ও স্মৃতি ব্রাহ্মণের দেবনির্ম্মিত দুই চক্ষু বলিয়া জানিবে। ইহার মধ্যে শ্রুতি কিংবা স্মৃতি রূপ এক চক্ষু না থাকিলে কানা, এবং শ্রুতি স্মৃতি রূপ উভয় চক্ষু না থাকিলে অন্ধ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। ফলতঃ কেবলমাত্র দৃশ্যমান নেত্রদ্বয় থাকিলেই ব্রাহ্মণ চক্ষুষ্মান হইতে পারেন না, বেদ ও শাস্ত্র দ্বারা ব্রাহ্মণ চক্ষুষ্মান বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। বাহ্য পথ পরিভ্রমণ করিলেই সেই সময় আমাদের বহিশ্চক্ষু উপকারে আইসে; কিন্তু অন্তর্মার্গে বা ব্রহ্মমার্গে বিচরণ করিতে হইলে এই বহিশ্চক্ষুর্দ্বয় কোন উপকারে আইসে না, সেই স্থলে শ্রুতি ও স্মৃতি চক্ষুদ্বয়ই পথ প্রদর্শক হয়। সুতরাং শ্রুতি ও

স্মৃতিরূপ চক্ষুদ্বয় না থাকিলে ব্রাহ্মণকে প্রতি পদে বিড়ম্বিত হইতে হয়। জগতে যাহা কিছু পরোক্ষ ও অপরোক্ষ বস্তু আছে, সে সমস্তই শব্দের ঐশ্বর্য্য। বাক্যের দ্বারা সমস্ত পদার্থের উপলব্ধি হয়। পূর্ব্বকালে মুনি ঋষিরা গুরুসকাশে যাইয়া আত্ম সাক্ষাৎকার লাভ করিতেন, তাহা এই বাক্যপ্রসাদেই করিতেন অর্থাৎ বাক্য রূপ উপদেশজ্ঞান দ্বারা ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হইত; সুতরাং শব্দই ব্রহ্ম দর্শনের দিব্যচক্ষু বা তৃতীয় চক্ষু। শব্দ ব্যতীত ব্রহ্ম দর্শন হইতে পারে না।

শব্দই কর্ম্ম। কি বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম, কি অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম, উভয়ই জ্ঞান বা শব্দ দ্বারা নিষ্পাদিত হইয়া থাকে। শব্দের ভাবনা বিনা পেশী আকুঞ্চিত বা প্রসারিত হয় না। শব্দ ভাবনা ব্যতীত স্নায়ু উত্তেজিত হয় না, শব্দ ব্যতিরেকে কেহ কাহাকেও আহ্বান করিতে পারে না। হস্তাদি অঙ্গের সঞ্চালন দ্বারা আহ্বান করা যায়, শব্দের দ্বারা আহ্বান করার ভাব বিশেষ রূপে প্রকাশ করা যায়; মানস শব্দের প্রবাহ হস্তে না আসিলে নিশ্চয়ই হস্তের পেশী ক্রিয়া করে না। আমরা শব্দ বলিতে যাহা বুঝি, তাহাও মানস শব্দের মুখাদি-স্থানভেদে বিশেষ বিশেষ ভাবে অভিব্যক্ত রূপ। তাপের উত্তেজন, রাসায়নিক ক্রিয়া নিমিত্ত উত্তেজন, তাড়িত উত্তেজন ক্রিয়া ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন রূপে শব্দ উত্তেজনেরই ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা। শব্দ ভাবনাই সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মের মূল এবং তাহাই কারণ। পূর্ব্ব সংবেদনার সংস্কার মস্তিষ্কে লগ্ন হইয়া থাকে; প্রযত্ন অতীত ও বর্ত্তমান সংবেদনার ফল। বিনা কারণে, বিনা উত্তেজনায় কোন কর্ম্ম হয় না; ইচ্ছা শক্তির ক্রিয়োন্মুখ অবস্থা, তাহা বিনা কারণে বিনা উত্তেজনায় হইতে পারে না। শব্দ ও স্পন্দন একই পদার্থ। বিনা স্পন্দনে শব্দ উৎপন্ন হয় না, বিনা শব্দে স্পন্দন উৎপন্ন হয় না। অণু-পরমাণুর যত কিছু কার্য্য আকর্ষণ বিকর্ষণ—সমস্তই স্পন্দনাত্মক; যেহেতু স্পন্দনাত্মক, সেই হেতু শব্দমূলক। যেখানে স্পন্দন আছে সেইখানেই শব্দ আছে, যেখানে শব্দ আছে সেইখানেই স্পন্দন আছে। অণু-পরমাণুতে সদা সর্ব্বদা আকর্ষণ ও বিকর্ষণ চলিতেছে, তাহাতে সদাই শব্দ কার্য্য করিতেছে। একটা বস্তুতে আর একটা বস্তু পতিত হইলে যে ঘাতপ্রতিঘাত রূপ ক্রিয়া বা স্পন্দন উৎপন্ন হয়, তাহার মূল শব্দ।'

সকলেরই ভাষা আছে; পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, অগ্নি, বায়ু, তড়িৎ, গ্রহ, নক্ষত্র, তরু, লতা, সকলেরই ভাষা আছে, সকলেই নাদাত্মক। সকলেই শব্দ ব্যবহার করে। শব্দ হইতে যখন বিশ্বজগৎ আবির্ভূত হইয়াছে, তখন সকলেরই ভাষা আছে, এ কথা বিশ্বাস না হইবার কোনও কারণ নাই। জড় বিজ্ঞান ভূত ও ভৌতিক শক্তির ভাষা বুঝিবার চেষ্টা করিতেছে, ইহারা এইজন্য ভূত ও ভৌতিক শক্তির ভাষা কিয়ৎ পরিমাণে বুঝিতে পারক হইয়াছে, সেইজন্য ভূত ও ভৌতিক শক্তির সহিত ইহাদের আলাপ হয়। ভূত ও ভৌতিক শক্তিকে ইহারা যাহা বলে, উহারা তাহা শ্রবণ করে, এবং তাহার উত্তর প্রদান করে।

আর্য্য ঋষিগণ, শব্দতত্ত্ববিদ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ, ত্রিলোকের শব্দ বুঝিতেন, এই জন্য তাঁহারা ত্রিভুবনের সহিত সম্বন্ধ স্থাপনে সমর্থ হইয়াছিলেন। যে ছন্দে, যে স্বরে, যে কালে, যে মন্ত্রে, যে দেবতাকে আহ্বান করিলে তাঁহার শ্রুতিগোচর হয়, বেদের কৃপায় তাহা তাঁহারা জানিতে পারিয়াছিলেন; এই জন্য তাঁহারা দেবতাগণকে আহ্বান করিতে পারিতেন, দেবতাগণও তাঁহাদিগকে দেখা দিতেন, উভয়ে উভয়ের ভাষা বুঝিতেন এবং কথোপকথনও হইত। শব্দ বা ভাষা ব্যতীত জ্ঞান থাকিতে পারে না। জ্যোতিষশাস্ত্রে, তন্ত্রশাস্ত্রে পশুপক্ষ্যাদির শব্দ দ্বারা শুভাশুভ লক্ষণ অবগত হইবার উপায় বর্ণিত আছে। আর্য্য ঋষিগণ কোন কোন বর্ণের সহিত কোন কোন রাশির, কোন কোন গ্রহের, কোন কোন ভূত ভৌতিক শক্তির ছন্দোগত সাদৃশ্য আছে, স্পন্দনের সাম্য আছে, তাহা নির্ণয় করিয়াছিলেন।

প্রথমতঃ প্রকৃতি-পুরুষ যোগে 'অ' শব্দ উৎপন্ন হয়, ঐ শব্দের সহিত গতি ও তেজ সংলগ্ন রহিয়াছে। ঐ উৎপন্ন 'অ' শব্দ অতি দ্রুত অস্বাভাবিক গতি দ্বারা চালিত হইতে হইতে, আভ্যন্তরিক অননুভূত ঘর্ষণ দ্বারা গতির হ্রাস হওয়ায় উহা সঙ্কুচিত হইয়া 'উ' শব্দে পরিণত হয়; তদনন্তর ঐ গতি মহাভূত কর্ত্তৃক বাধিত হওয়ায় 'ম' শব্দ উপন্ন হইয়া 'ওম' শব্দে পরিণত হয়। বাক্য ও প্রাণ মিথুনীভূত। এই মিথুনীভূত বাক্য ও প্রাণ শব্দব্রহ্ম প্রণবে সংসৃষ্ট আছে। এই প্রণব হইতে বিশ্বজগৎ উৎপন্ন হইয়াছে।

যাহা দ্বারা বাক্য অভিব্যক্ত হয় এবং হৃদাকাশে আত্মা হইতে যাহা প্রকাশিত হয়, তাহাই স্ফোটকরূপ প্রণব। তাহা স্বপ্রকাশ পরমাত্মা ব্রহ্মের সাক্ষাৎবাচক শব্দ এবং সমুদয় বৈদিক মন্ত্র ও উপনিষদের নিত্য বীজস্বরূপ। বিধানাদি দ্বারা কর্ণবৃত্তি আচ্ছাদিত হইলেও অথবা ইন্দ্রিয়বর্গের কার্য্য নিবৃত্ত হইলেও যে অবাধিত জ্ঞানতত্ব এই স্ফোটরূপ অব্যক্ত প্রণব শ্রবণ করেন, তিনিই পরমাত্মা; যোগিগণ যাঁহার উপাসনা করত, আত্মার আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক মালিন্য হইতে মুক্ত হইয়া অপুনর্ভব মুক্তিলাভ করেন।

অনন্তর সেই অব্যক্ত স্ফোটকরূপ প্রণবে তিন বর্ণ প্রকাশ পাইল; সেই বর্ণত্রয় ক্রমশঃ সত্ব, রজঃ, তমঃ, ঋক, সাম, যজুঃ, স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল, জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি প্রভৃতি বৃত্তি ধারণ করিলেন এবং আকারাদি ক্ষকারান্ত বর্ণরাশি নির্গত হইল। যেমন উর্ণনাভি (মাকড়সা) হৃদাকাশ হইতে মুখ দ্বারা ঊর্ণাতন্তু প্রকটন ও উপসংহার করে, তদ্রুপ সচ্চিদানন্দময়ের হৃদাকাশে আছেন যে প্রণব, তাহা স্বশক্তি দ্বারা ছন্দোময় সর্ব্বজ্ঞানাদিসম্পন্ন বেদমূর্ত্তি হইয়া আকাশকে অবলম্বন করিয়া হিরণ্যগর্ভরূপ আধারচক্রে আভির্ভূত হইয়া বহুবাগ বিশিষ্ট অনন্ত স্পর্শ, ঊষ্ম, অন্তস্থ বর্ণে ভূষিত, লৌকিকাদি ভাষায় বিস্তৃত, চতুরক্ষরাদি উত্তরোত্তর অধিক ছন্দোবিশিষ্ট বৃহৎ বাক্যময় হইয়া, কখনও ব্রহ্মার হৃদাকাশে প্রকটিত, কখনও অপ্রকটিত হন।

সমাধি-অবস্থাপন্ন পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার হৃদাকাশ হইতে প্রথমতঃ নাদ উৎপন্ন হইল, তাহাই প্রণব, যাহা আমরা কর্ণবৃত্তি আচ্ছাদন করিয়া অন্তরে অনুভব করিয়া থাকি। অনন্তর ভগবান ব্রহ্মা তাহা হইতে অন্তস্থ, ঊষ্ম, স্বর, স্পর্শ, হ্রস্ব ও দীর্ঘাদিলক্ষণ অক্ষরসমূহের সৃষ্টি করিলেন, পরে পুনরায় তাহা হইতে চারি বদন দ্বারা চাতুর্হোত্র কর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্ত, প্রণবের সহিত চারিবেদ উৎপন্ন করিলেন। সেই বেদরাশিমধ্যে গায়ত্রী, উষ্ণিক, অনুষ্টুপ, বৃহতী, পঙক্তি, ত্রিষ্টুপ, জগতী ও অতিবিরাট ইত্যাদি ছন্দঃ সকল বিদ্যমান আছে।

বুদ্ধির বিষয়ীভূত অর্থ বা মনোভাব বিজ্ঞাপনের নিমিত্ত শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। আত্মা মন বা বুদ্ধি দ্বারা যাহা বিষয়ীকৃত করেন, বাক বা শব্দ দ্বারা তাহাই উক্ত হইয়া থাকে। কেহ মনের অবিষয়ীকৃত বস্তু বর্ণনা করিতে সমর্থ নহে। আত্মা বুদ্ধি দ্বারা গৃহীত অর্থ সমূহকে প্রকাশিত করিবার জন্য মনকে নিযুক্ত করেন। মন কায়াগ্নিকে তৎকর্ম্মভার অর্পণ করেন, কায়াগ্নি মরুৎকে নোদিত করে, মরুৎ হইতে বৈখরী-শব্দভাবাপন্ন মনোভাব প্রকটিত হয়।

কাষ্ঠমধ্যে অগ্নি থাকে, বিনা ঘর্ষণে তাহার অভিব্যক্তি হয় না, এবং তাহার অস্তিত্বও বুদ্ধিগোচর হয় না; কিন্তু ঘর্ষিত হইলেই অগ্নি প্রজ্বলিত হয়, তখন ইহা স্বরূপ ও পররূপের প্রকাশক হইয়া থাকে। বুদ্ধিস্থ শব্দ সংস্কার যাবৎ অব্যাকৃত অবস্থায় বর্ত্তমান থাকে, তাবৎ ইহার অস্তিত্ব কাহারও হৃদয়ঙ্গম হয় না, তাবৎ ইহা অসংবেদ্য ভাবেই অবস্থান করে। বুদ্ধিস্থ শব্দ স্থান-করণাদি দ্বারা অনুগৃহীত হইয়া যখন বিবর্ত্তিত হয়, তখনই ইহা অরণিস্থ অগ্নিস্বরূপ প্রকাশ পাইয়া থাকে। বুদ্ধিস্থ শব্দভাবনা বা শব্দ সংস্কারই জ্ঞানের কারণ। বুদ্ধিতত্বের সংকীর্ণতা বশতঃ বিনা উপদেশে সকল শব্দের অর্থ জানিতে পারি না, অরণিস্থ জ্যোতির ন্যায় আমাদের জ্ঞান আবৃত হইয়া থাকে। অরণিগর্ভ-বিদ্যমান জ্যোতিকে যেমন ঘর্ষণাদি দ্বারা অভিব্যক্ত করিতে হয়, সেইরূপ আমাদেরও উপদেশ-শ্রবণাদি দ্বারা বুদ্ধিস্থ শব্দ সংস্কারকে প্রবোধিত করিতে হয়। উপদেশ ও ঔপদেশিক জ্ঞানের অন্য নাম যথাক্রমে শব্দ ও শব্দজ্ঞান। উপদেশ, শব্দ, শাস্ত্র, বেদ—এ সকল তুল্যার্থ।

বর্ণোৎপত্তি—শব্দ বলিতে আমরা সাধারণতঃ যাহা বুঝিয়া থাকি, তাহা মনোভাবের সূক্ষ্ম বাগাত্মাতে অবস্থিত, আন্তর জ্ঞানের প্রব্যক্তাবস্থা। এই সূক্ষ্ম বাগাত্মাতে অবস্থিত আন্তর জ্ঞানের প্রকাশক শব্দ কী প্রকারে পরিব্যক্ত হয়? বর্ণ দ্বারা ব্যক্ত হয়। বর্ণ কী প্রকারে উৎপন্ন হয়? আত্মা বুদ্ধি দ্বারা অর্থ বা প্রয়োজন নিশ্চয়পূর্ব্বক মনকে তাহা বলিবার জন্য, প্রকটিত করিবার নিমিত্ত প্রেরণ করেন; মন কায়ান্তর্ব্বর্ত্তী অগ্নিকে এবং অগ্নি বায়ুকে প্রেরণ করিয়া থাকে। বায়ু এইরূপে প্রেরিত হইয়া, উদীর্ণ অর্থাৎ উচ্চারিত হইয়া ঊর্দ্ধগতি ও মূর্দ্ধদেশে অভিহত হইয়া, মুখবিবরে প্রবেশপূর্ব্বক স্বর, কাল, স্থান ও অনুপ্রদানাদি ভেদানুসারে 'অ, আ, ক, খ' ইত্যাদি বর্ণ উৎপাদন করিয়া থাকে। একমাত্র অ, আ, ই, মূল বর্ণ, এই বর্ণত্রয় সকল বর্ণেই রহিয়াছে; অ-বর্ণ ছাড়িলে কোন বর্ণেরই বর্ণ থাকে না। একমাত্র অ-বর্ণ-ই স্থান-কালাদি-ভেদে 'আ, ই, ক, খ' ইত্যাদি

রূপ ধারণ করে; যেমন বেহালা এবং সারেঙ্গ নাম্নী একপ্রকার যন্ত্র আছে, তাহাকে ছড়ি দিয়া টানিলে যে স্বাভাবিক শব্দ নির্গত হয়, তাহাই অ; সেই স্বাভাবিক অ শব্দ, স্থানকালাদি-ভেদে অঙ্গুলি নির্দ্দেশপূর্ব্বক বিবিধ শব্দ উৎপন্ন করে, কিন্তু সেই বিবিধ শব্দের মধ্যে স্বাভাববিক 'অ' বর্ণ রহিয়াছে, বর্ণের মধ্যে অকার সর্ব্ববাঙ্ময়ত্ব হেতু সকল বর্ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহা 'আমারই বিভূতি, অকার রূপে 'আমি' সর্ব্ব বর্ণ ও সর্ব্ব বিশ্ব ব্যাপিয়া রহিয়াছি। স্বর, কাল, স্থান, প্রযত্ন ও অনুপ্রদান এই পাঁচটি বর্ণবিশেষের হেতু। উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত-ভেদে স্বর ত্রিবিধ। আয়াম অর্থাৎ গাত্রের দৈর্ঘ্য, দারুণ্য অর্থাৎ স্বরের কঠিনতা, অণুতা, অর্থাৎ গল-বিবরের সংবৃততা, এই তিনটি উদাত্ত। অম্বর-সর্গ অর্থাৎ গাত্রের বিস্তৃততা, মার্দ্দব অর্থাৎ স্বরের স্নিগ্ধতা, স্থূলতা অর্থাৎ গলবিবরের উরুতা, এই তিনটি অনুদাত্ত। বর্ণ সকলের যে হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত, এই ত্রিবিধ ভেদ, তাহা কালকৃত। কণ্ঠাদি উচ্চারণস্থানের ভেদ নিবন্ধন বর্ণ সকলের মধ্যে যে ভেদ হইয়া থাকে, তাহাকেই স্থানভেদ বলা যায়। বাহ্য ও আভ্যন্তর-ভেদে প্রযত্ন দ্বিবিধ। এই দ্বিবিধ প্রযত্নের মধ্যে স্পৃষ্ট, ঈষৎস্পৃষ্ট, বিবৃত ও সংবৃত, ইহারা আভ্যন্তর প্রযত্ন; এবং বিবার, সংবার, শ্বাস, নাদ, ঘোষ, অঘোষ, অল্পপ্রাণ, মহাপ্রাণ, উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত ইহারা বাহ্য প্রযত্ন। অনুপ্রদান, সংসর্গ, স্থান, করণবিন্যাস, এবং পরিমাণ অর্থাৎ মাত্রাকাল—এই পাঁচটি কারণ দ্বারা বর্ণবিশেষের উৎপত্তি হয়।

শব্দ বা বাক্যকে বেদে পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী এই চারি ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। তুরীয় বাক বা শব্দ অব্যক্ত; ঐ অব্যক্ত বাক যখন ব্যক্ত হয়, তখন পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী নাম ধারণ করে। পরা, পশ্যন্তী ও মধ্যমা আমাদিগের অগোচর, ইহা যোগিগম্য; বৈখরী নাদই আমাদিগের বোধ্য। এক নাদাত্মিকা বাক মূলাধার হইতে উদিতা হইয়া 'পরা' এই নামে অভিহিতা হয়। নাদের সূক্ষ্মতা বশতঃ দুর্নিরুপণীয় বলিয়া হৃদয়গামিনী সেই পরা বাক, 'পশ্যন্তী' এই নামে উক্ত হয়। যোগিগণের দ্রষ্টব্য, সেইজন্য পশ্যন্তী নাম হইয়াছে। হৃদয়াখ্য মধ্যদেশে উদীয়মানা তিনিই বুদ্ধিগত বিবক্ষা অর্থাৎ বলিবার ইচ্ছা প্রাপ্ত হইলে, 'মধ্যমা' এই সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইয়া থাকেন এবং ব্যক্তে অবস্থানপূর্ব্বক কণ্ঠ, তালূ ও ওষ্ঠ প্রভৃতি স্থানের ব্যাপার দ্বারা যখন বহির্গমন করেন, তখন 'বৈখরী' এই আখ্যা প্রাপ্ত হন।

প্রথম পরাখ্য নাদ, ইহা প্রাণময় আধারচক্রে অবস্থিত। দ্বিতীয় পশ্যন্তী, ইহা মনোময় অর্থাৎ প্রাণে মিথুনীভূত বাক্য। যখন মনে মনে স্মরণ করা হয়, তখন ইহা মনোময়, ইহার আধার মণিপুর বা নাভি। মূলাধার হইতে নাদ উত্থিত হইয়া স্বাধিষ্ঠান ভেদ করিয়া মণিপুরে উদয় হয়। তৃতীয় মধ্যমা, ইহা বুদ্ধিময়, বুদ্ধিতেই ইহা প্রকাশ পায় অর্থাৎ মনেতে যে নাদ অভিব্যক্ত হইয়াছিল, তাহা বিচারপূর্ব্বক ব্যক্ত করিবে, এই হেতু বুদ্ধিময়। যে পরাখ্য নাদ স্বাধিষ্ঠান ভেদ করিয়া মণিপুরে উদয়ানন্তর পশ্যন্তী নাম ধারণ করিয়াছিল, তাহাই হৃদয়ে অনাহত চক্রে আসিয়া মধ্যমা নাম ধারণ করিল। আঙুল দিয়া কাণ বন্ধ করিলে এই নাদ শুনিতে পাওয়া যায়। চতুর্থ বৈখরী, যাহা ব্যক্ত হয় তাহাই বৈখরী। ঐ হৃদয়স্থ মধ্যমা বাক যখন বিশুদ্ধ চক্র বা কণ্ঠ ভেদানন্তর বাগিন্দ্রিয় আশ্রয় করিয়া বহির্গত হয়, তখন উহা বৈখরী নাম ধারণ করে। মূলাধার অনন্ত শক্তিরূপ ভূমাব্রহ্মে অধিষ্ঠিত আছে যে শব্দ, যাহা সর্ব্বভূতে সূক্ষ্ম নাদরূপে অবস্থিতি করে, তাহা অতি সূক্ষ্মদর্শীরা মৃণাল ও ঊর্ণাতন্তুর ন্যায় লক্ষ্য করেন।

যেমন দারুগতাকাশে অব্যক্ত অগ্নি আছে, সেই কাষ্ঠ মথিত হইলে প্রথমতঃ অগ্নির কিঞ্চিৎ অভিব্যক্তি হয়, কিন্তু তখনও দৃষ্টিগোচর হয় না, আরও অধিক মথিত হইলে বায়ু-সহকারে প্রথমতঃ সূক্ষ্ম স্ফুলিঙ্গরূপে উদ্ভূত হইয়া ঘৃত প্রাপ্তিপূর্ব্বক অতিশয় বর্দ্ধিত হয়, তখন দৃষ্টিগোচর হয়, বাণীও সেইরূপ। শব্দব্রহ্ম বায়ুসহকারে মূলাধারে প্রবিষ্ট হইয়া কিঞ্চিৎ অভিব্যক্তি হইল, মূলাধার হইতে উত্থিত হইয়া স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর ভেদ করিয়া অনাহতে আসিল, এখন পর্য্যন্ত অবোধ থাকিল। মূলাধার হইতে ক্রমে অল্প অল্প ব্যক্ত হইতে হইতে মনোময় সূক্ষ্মরূপ প্রাপ্ত হইয়া কণ্ঠ ভেদ করিয়া মুখ বিবরে হ্রস্বাদি মাত্রা, উদাত্তাদি স্বর ও অকারাদি বর্ণভাবে স্থূলরূপে নানা প্রকার শব্দরূপ ধারণ করিয়া বাগিন্দ্রিয় দ্বারা যখন অভিব্যক্তি হইল, তখনই আমাদিগের জ্ঞানগোচর হইল। যেমন অগ্নিসখা বায়ু, বায়ুর সাহায্যে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়, সেইরূপ বাকসখা বায়ু, বায়ুকে আশ্রয় করিয়া

বাক্য নির্গত হয়। নাদের প্রথম ক্ষণে উৎপত্তি, দ্বিতীয় ক্ষণে স্থিতি, তৃতীয় ক্ষণে লয়। উৎপত্তি হইলেও লয় আছে, নাদের লয় কোথায়? নাদ মূলাধার হইতে উত্থিত হইয়া তুরীয় স্থান ব্রহ্মধাম সহস্রারে অর্থাৎ মস্তকে যাইয়া লীন হয়।

বেদোক্ত নাদের সপ্তম বেণুনাদই বংশীধ্বনি। এই বংশীতে সর্ব্বদাই প্রণবধ্বনি হইতেছে। সাধকের বেণুনাদ উত্থিত হইলে তিনি নিম্নলিখিত অবস্থা প্রাপ্ত হন, গূঢ় বিজ্ঞান অর্থাৎ অজ্ঞাত বিষয় সকল জানিতে পারেন, ভীরু ভয়শূন্য হন, হিংস্রক হিংসারহিত হন, কোনপ্রকার দুঃখ থাকে না। প্রত্যুত সদানন্দে মগ্ন থাকেন, কন্দর্পবিকার থাকে না, এই নাদে মন প্রাণ মাতোয়ারা হয়, বাহ্যজ্ঞান থাকে না। সেইজন্য নীবিবন্ধ খসিয়া পড়ে, চূল আলুলায়িত হয়, ক্ষুধা-তৃষ্ণা রহিত হয়, জীবিত-নিরপেক্ষ শরীরে মমতা রহিত হয়, মোহ অপগত হয়, বৈরাগ্য আসিয়া উপস্থিত হয়, বৈরাগ্য হেতু স্ত্রী-পুত্রাদি, সংসার ভাল লাগে না, সমাধি-অবস্থা-তুল্য হইয়া পড়ে। এই বেণুনাদ সাধককে পরব্রহ্মের সহিত মিশিবার জন্য নিরন্তন উৎসুক রাখে, সাধক কোন বাধা-বিপত্তি মানে না। বসন্তকাল আমাদের কাছে যেরূপ মধুর, নাতিশীত, নাতিগ্রীষ্ম; বংশীরবে সাধকের অন্তরও বসন্তের ন্যায় প্রফুল্লতা ধারণ করে। বসন্তকালে দ্বিপ্রহরে দারুণ জ্বালা বোধ হয়, কিন্তু এ রবে জ্বালা নাই, বরং শীতলতা আছে। বেদে ইহা নিরাকার, হৃদয়ে অনাহতে নিরাকার চিৎবংশীধর নিরাকার নাদে নিরাকার জীবকে আকর্ষণ করিতেছে। বেদ উক্ত নিরাকার চিৎকে সাকার কৃষ্ণরূপে, হৃদয়কে বৃন্দাবন, সপ্তম নাদকে সপ্তরন্ধ্রাত্মক বংশীধ্বনি ও জীবকে রাধিকারূপে উক্ত করিয়াছেন। কবিরা ঐ বংশীধ্বনির গুণ, অনির্ব্বচনীয় প্রভাব, অপূর্ব্বভাবে অতি মধুর বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা ভাবিলে পুলকে আত্মহারা হইতে হয়।

বাক্য

বাক্য দুই প্রকার—সত্য বাক্য ও মিথ্যা বাক্য। সত্য বাক্যের আর এক নাম আপ্ত বাক্য। বাক্য মাত্রেই সত্য বা যথার্থ জ্ঞানের জনক নহে, তাহাও ভ্রমোচচারিত হইতে দেখা যায়, অতএব কীরূপ বাক্য প্রমাণ বা সত্য জ্ঞানের জনক, তাহা বিশেষরূপে বিবেচ্য। কোন বাক্য সত্য, কোন বাক্য মিথ্যা, তাহা বোধগম্য হওয়া সহজ নহে। সহজ না হইলেও তাহার লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহাকে বলে আপ্ত শব্দ বা আপ্ত বাক্য। আপ্ত বাক্য বা শব্দজ্ঞান ইহা সত্য, ইহা একেবারে নির্দ্দোষ। প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রভৃতি সকল প্রমাণই ভ্রান্ত হইতে পারে, কিন্তু আপ্ত বাক্য ভ্রান্ত হইতে পারে না, বাস্তবিক ইহা অভ্রান্ত। অভ্রান্ত জ্ঞানের অসীম, অনাদি, অনন্ত ও একমাত্র আকর আপ্ত বাক্য ; উহার হ্রাস নাই, বৃদ্ধি নাই, উন্নতি নাই, অবনতি নাই, লয় নাই, ক্ষয় নাই। মহাপ্রলয়েও যাহা প্রবাহরূপে নিত্য, অনাদি কাল হইতে অনন্ত কালস্রোতে যাহা একইরূপ ছিল, আছে ও থাকিবে, যাহা ভূলোক, দ্যুলোক, দেবলোকের ধ্বংসকালেও দেদীপ্যমান, যাহা সর্ব্বকালের অতীত, সর্ব্বকালে উপস্থিত, কালের ধ্বংসে, স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয়েরই সংহারে যাহার সত্তা সমভাবে বিদ্যমান, অভ্রান্ত জ্ঞানের সেই একমাত্র আধার 'আপ্ত বাক্য' ; জ্ঞানের ইহাই প্রকৃত প্রমাণ, পরিমাপক এবং পন্থা ; জ্ঞান মাত্রেই ইহা হইতে উদ্ভূত ; যাহা ইহাকে অতিক্রম করিতে যায়, ইহার বিরোধী হয়, ইহার বিপরীত পথে বিন্দুমাত্রও চলে, তাহা জ্ঞান নহে অজ্ঞান, নিশ্চয় নয় ভুল, তাহা অভ্রান্ত নয়, ভ্রান্ত, প্রমাণ নহে প্রমাদ। আপ্তবাক্য বলি কারে? আপ্ততা বাক্যের কি পুরুষের? আপ্ততা বাক্যেরও বটে, পুরুষেরও বটে। আপ্ত অর্থাৎ বিশ্বস্ত, সত্য ; যে পুরুষের ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা অর্থাৎ পর প্রতারণেচ্ছা, ইন্দ্রিয়গণের অশক্তি বা বাগযন্ত্রের অসম্পূর্ণতা নাই, সেই পুরুষই আপ্ত পদের উপযুক্ত। উক্ত পুরুষ যাহা বলেন, যাহা উপদেশ করেন, তাহা প্রমাণ ও সত্য, তাহা অভ্রান্ত। ইন্দ্রিয়গণের অশক্তি অর্থাৎ কর্ণের বধিরতা, জিহ্বার জড়তা, ত্বকের কুণ্ঠতা, চক্ষুর অন্ধতা, নাসিকার ঘ্রাণহীনতা, বাক্যের মূকত্ব, হস্তের কুণিত্ব, পাদের পঙ্গুত্ব, পায়ুর ব্যুদাবর্ত্ত, উপস্থের ক্লীবতা, মনের উন্মত্ততা,—এই সকল ইন্দ্রিয়ের অশক্তি যাহার থাকিবে, সে কখনও আপ্ত পুরুষ হইতে পারিবে না। বাক্যের আপ্ততা যথা—আকাঙ্ক্ষা, আসক্তি, যোগ্যতা ও তাৎপর্য্য ; যে আপ্ত পুরুষের বাক্যে এইগুলি আছে, তাহাই আপ্ত বাক্য ; যে বাক্যে এই চারিটি নাই, তাহা আপ্ত পুরুষের বাক্য হইলেও অনাপ্ত বাক্য হইবে।

আকাঙ্ক্ষা—'বৃক্ষ' একটা শব্দ করা গেল, তৎসঙ্গে একটা আকাঙ্ক্ষা রহিল—মরা কি জীবিত, ফলা কি অফলা।

আসক্তি—যে সকল শব্দ যোজনা করিয়া একটা বাক্য রচনা করিবে, সম্বন্ধ অনুসারে সেই সকলকে বিনা বিলম্বে ও পরে পরে উচ্চারণ করার নাম আসক্তি। এই আসক্তিই অর্থবোধের প্রধান কারণ। শব্দ সকল আসক্তিক্রমে উচ্চারিত না হইলে অর্থপ্রকাশ হয় না। আজ বলিলাম রাম, কাল বলিব গিয়াছে, তাহা হইবে না ; যে সময়ে রাম বলিলাম, সেই সঙ্গেই গিয়াছে বলিতে হইবে।

যোগ্যতা—যে বাক্যের অর্থ প্রত্যক্ষ ও যুক্তির অবিরোধী সেই বাক্যই যোগ্য বাক্য। যেমন—'এই স্ত্রী বন্ধ্যা' ইহাই যোগ্য বাক্য, 'ইহার জননী বন্ধ্যা' ইহা অযোগ্য বাক্য, কেননা পুত্র থাকা সত্বে বন্ধ্যা হইতে পারে না।

তাৎপর্য্য—বক্তার অভিপ্রায় বা মনোগত ভাব বিশেষকে তাৎপর্য্য বলে। তাৎপর্য্য শব্দজ্ঞানের প্রধান অঙ্গ, তাৎপর্য্যযুক্ত বাক্য প্রকৃষ্ট পরিমাপক ; যে বাক্যের তাৎপর্য্য নাই সে বাক্য আকাঙ্ক্ষা আসক্তি ও যোগ্যতা অনুসারে উচ্চারিত হইলেও অপ্রমাণ। 'ইহার জননী বন্ধ্যা' এই বাক্য যদি তাৎপর্য্যযুক্ত হয়, তবে এই বাক্যই উৎকৃষ্ট বাক্য, 'ইহার জননী বন্ধ্যা' এই বাক্যে বাক্যে যদি এইপ্রকার অর্থ প্রকাশ হয় যে, ইহার জননীর পুত্র হওয়া অপেক্ষা না হওয়া ভাল ছিল, কেননা পুত্র হইতে কোন সুখ হইল না, বরঞ্চ দুঃখই জঞ্জাল, সেইখানে

এই বাক্য শোভনীয়। সমুদয় কথার সারসঙ্কলন এই যে, যে বাক্য আকাঙ্ক্ষা, আসক্তি, যোগ্যতা ও তাৎপর্য্য, এই চারিপ্রকার সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ, সেই বাক্যই আপ্ত বাক্য; অন্য প্রকার আপ্ত বাক্য নহে।

চক্ষুরাদির ন্যায় আপ্ত বাক্যও যথার্থ জ্ঞানের জনক। এমন আপ্ত পুরুষ কেহ আছেন কি না, যাহাতে উক্ত দোষ সকল নাই। সাংখ্য ও বেদান্ত বলেন—এক আপ্ত পুরুষ ঈশ্বর, আর এক আপ্ত পুরুষ যোগী।

ঈশ্বর নিত্যাপ্ত, যোগী নৈমিত্তিকাপ্ত অর্থাৎ নিমিত্তাধীন; কোনও হেতু হইতে যাঁহার আপ্ততা উৎপন্ন অর্থাৎ ধ্যান, ধারণা, সমাধি বা শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন হইতে যাঁহার আপ্ততা উৎপন্ন হয়, তাঁহাকে নৈমিত্তাপ্ত বলে।

বাল্যকাল হইতে শব্দ শ্রবণ, কার্য্য দর্শন, ব্যবহারপদ্ধতি পর্য্যবেক্ষণ ও মনন করিতে করিতে মনুষ্য যথাকালে যাইয়া শব্দরাশির বিচিত্র শক্তি অবগত হইতে পারে, শব্দে অর্থ প্রত্যয় ব্যুৎপত্তি সামর্থ্য আছে তাহা জানিতে পারে। শিশুকাল হইতে বাক্য শ্রবণ ও ব্যবহার দর্শন করিতে করিতে কালে বহু জ্ঞান সঞ্চিত হয়। যদি কোনও লোক কাহাকেও কিছু না বলে ও কোনও লোক কাহারও নিকট কিছু না শুনে, তাহা হইলে সে চক্ষু থাকিতেও অন্ধ, ইন্দ্রিয় সকল থাকিতেও ইন্দ্রিয়হীন। অধিক কি, বাক্য ব্যবহার না থাকিলে আমাদের কোনও জ্ঞানই সঞ্চিত, সমুৎপন্ন ও পরিষ্কৃত হইত না; বাকশক্তি ও তজ্জাত ভাষা না থাকাতেই পশুজাতি অজ্ঞানান্ধ। সদ্যঃপ্রসূত বালককে যদি জনশূন্য অরণ্যে রাখা যায়, তাহা হইলে তাহার কিরূপ জ্ঞান হয়, তাহা একবার ভাবিলেই বুঝা যায়। যদি এক কালে সকল মনুষ্যই বাগিন্দ্রিয়-বিহীন হয়, তাহা হইলে এ সংসারের দশা কী হয়, তাহা অল্প চিন্তা করিলেই বুঝা যায়।

ব্রহ্মজ্ঞান-লাভ আপ্তোপদেশেরই কার্য্য। বাক্য—কি লৌকিক, কি আলৌকিক, কি তাত্বিক—সমুদয় পদার্থের প্রকাশক। সমুদয় পদার্থেরই ব্যবহার-উপযুক্ত নাম আছে। মনুষ্য আদি-সৃষ্টি সময় হইতে এখনও পর্য্যন্ত সেই সকল নাম শুনিয়া শুনিয়া শিখিতেছে। এই কারণে লোকের মনে স্বভাবতঃই এই চিন্তার উদয় হয় যে, প্রথমে মনুষ্য কাহার নিকট বাকশক্তি পাইল, কাহার নিকট সঙ্কেতে বাঁধা শব্দ শুনিয়াছিল; অবশেষে স্থির হইয়া থাকে বাকশক্তি ও সঙ্কেত বাঁধা শব্দ, যাহার অন্য নাম ভাষা, তাহা আদিশরীরী ব্রহ্মার আত্মায় আপনা আপনি আবির্ভূত হইয়াছিল। সেই অনাদিনিধন অনন্ত শব্দরাশিই আর্য্যের বেদ, সেই সকল বেদ শব্দ, দেশভেদে ও মনুষ্যের বাগযন্ত্রের গঠনাদি ভেদে বিকৃত হইয়া নানা আকারে পরিণত হইয়াছে। যতই ভাষা থাকুক সকলের মূলেই বেদ।

সৃষ্টি যদি অনাদি হয়, মনুষ্যের যদি আদি না থাকে, তাহা হইলে বেদও অনাদি। আমাদের বুদ্ধি ষড়দর্শনের নিকট সামান্য জোনাকিপোকা বিশেষ; সেই ষড়দর্শন যাহার নিকট মস্তক অবনত করিয়াছে, সে বস্তু যে শ্রেষ্ঠ, তাহা কে না স্বীকার করিবে? যাহার অর্থ বুঝি আর না বুঝি, যাহার শব্দ উচ্চারণ করিলে শরীর-মন পবিত্র হয়, ঐহিক পারত্রিক মঙ্গল হয়, সেই আপ্ত শব্দরাশি বেদ যে অতি মহান তাহার আর সন্দেহ কি? বেদ আর্য্য-আশ্রিত, আর্য্য বেদ-আশ্রিত, বেদশব্দ আর্য্যশব্দ, বেদজ্ঞান আর্য্যজ্ঞান, যাহা আর্য্যশব্দ নয় তাহা পশুশব্দ, যাহা আর্য্যজ্ঞান নয়, তাহা পশুজ্ঞান। প্রাণেন্দ্রিয়-মনোময়রূপ অথচ দুর্জ্ঞেয়, দেশ কাল দ্বারা যাহা অক্ষররাশি-বিশিষ্ট, পুস্তকরূপী নহে, এতাদৃশ বেদ গম্ভীর সমুদ্রের ন্যায় মহান ও গ্রহণীয়। জ্ঞাতব্য পদগুলি যাহার অঙ্গ, সিদ্ধি যাহার পর্ব্ব, স্বর ও ব্যঞ্জন যাহার ভূষণ, সেই দিব্য অক্ষর ব্রহ্মকে নমস্কার।

প্রকৃতি

এই মহাশক্তিকে বুঝিবার সুবিধার নিমিত্ত ইহাকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। মায়া, শক্তি, ও প্রকৃতি। মায়ার কার্য্য ভ্রম উৎপাদন, অদ্বৈতে দ্বৈতভ্রম, শুক্তিকাতে রজতভ্রম, রজ্জুতে সর্পভ্রম, দৃষ্টিদোষে দিকভ্রম ইত্যাদি এবং শোক ভ্রমেরই অন্তর্গত। মায়া নিরবয়ব ও আশ্রয়ী। শক্তির কার্য্য সঙ্কোচ ও বিস্তার; শক্তি নিরবয়ব ও আশ্রয়ী।

প্রকৃতির কার্য্য আশ্রয় প্রদান। ইহা সাবয়ব ও আশ্রয়। কাহার আশ্রয়? শক্তির ও মায়ার আশ্রয়। প্রকৃতি আশ্রয়, মায়া ও শক্তি আশ্রয়িণী। শক্তি ও মায়াকে আশ্রয় প্রদানই প্রকৃতির কার্য্য। শক্তি যন্ত্র ছাড়া কার্য্যে অক্ষম, সুতরাং প্রকৃতিই তাহার আশ্রয় যন্ত্র। নিরবয়বা অনুমান সাধ্যা শক্তি, সাবয়বা প্রত্যক্ষগম্যা প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে বলিয়াই আমরা শক্তির অনুমান করিতে পারক হইয়াছি।

নিরবয়বা মায়া সাবয়বা প্রকৃতিকে আশ্রয় না করিলে, কি বা কি দিয়া কাহার ভ্রম জন্মাইবে? সুতরাং প্রকৃতি মায়ার আশ্রয় ও যন্ত্র। মায়ার সহিত শক্তির কোনও সম্বন্ধ নাই, আছে প্রকৃতির সহিত। সেই জন্য তিন ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া অনুমিত হয়। তিনের তিন ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য, তিনই পৃথক পৃথক অথচ এক। মায়ার আশ্রয় প্রকৃতি, শক্তিরও আশ্রয় প্রকৃতি, সুতরাং বিশ্বেরও আশ্রয় প্রকৃতি, প্রকৃতিই বিশ্ব।

সৃষ্টিকার্য্যে যিনি প্রধানা ও প্রথমা, তিনিই প্রকৃতি। পুরুষের অধিষ্ঠানে প্রকৃতিই জগৎ সৃষ্টি করেন, জগৎ সৃষ্টি করিতে প্রকৃতিই সমর্থ, পুরুষ সাক্ষিস্বরূপ অধিষ্ঠান থাকিলেই হইল। বিশেষতঃ চিৎ বা পুরুষ নির্লিপ্ত বিধায় কোনও কার্য্যে সমর্থ নয়।

ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এই অষ্ট প্রকৃতি। প্রকৃতি পরিণামশীলা। এক ভাবে না থাকার নাম পরিণাম। প্রকৃতির চারি অবস্থা—ব্যক্ত, অব্যক্ত, বিশেষ ও অবিশেষ।

(১) প্রকৃতির যখন কোন প্রকার বিকার বা প্রভেদ ছিল না, ঠিক সাম্যাবস্থায় ছিল, যাহাকে এই দৃশ্যমান বিশ্বের সর্ব্বাদিম অবস্থা বা বীজস্বরূপ বা শক্তিসমষ্টি স্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করা হয়, সেই অবিকৃত ও দুর্জ্ঞেয় শক্তিরূপ মূল অবস্থাটিই তাহার অব্যক্তাবস্থা। তৎকালে কোন প্রকার জ্ঞানোপযোগী চিহ্ন ছিল না বলিয়াই তাহার নাম অব্যক্তাবস্থা। (২) যাহা অব্যক্ত, মূল প্রকৃতির প্রথম বিকার, যাহাকে বলা হয় মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধিতত্ব, তাহাই তাহার ব্যক্ত অবস্থা। (৩) অবিশেষ অবস্থা—যাহা বিশেষ অবস্থার মূল। (৪) বিশেষ অবস্থা—পৃথিব্যাদি স্থূলভূত ও ইন্দ্রিয়গণ।

চতুরবস্থাপন্না প্রকৃতি সেই চিন্ময় পুরুষের ভোগ সাধন রূপে পরিণত হইতেছে অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, সুখ, দুঃখ, হর্ষ, বিষাদ, মোহ, আহ্লাদ, পরিতাপাদি বহু আকারে পরিণত হইতেছে। রূপ ষোড়শ প্রকার—শুক্ল, কৃষ্ণ, রক্ত, নীল, পীত, সবুজ, অরুণ, হ্রস্ব, দীর্ঘ, বর্ত্তুল, চতুষ্কোণ, কঠিন, চিক্কণ, মধুর, স্নিগ্ধ ও দারুণ। মনেতে তেজের গুণ—শোক, রাগ, হাস্য, নিদ্রা, ক্ষুধা, ভ্রান্তি ও আলস্য। শব্দ সাত প্রকার—সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি।

প্রকৃতি শক্তির আশ্রয়, আশ্রয়ভেদে শক্তিভেদ অনুমিত হয়। একই শক্তি ক্ষিতিরূপ প্রকৃতি শক্তিকে আশ্রয় করাতে গন্ধরূপে অনুভব ও ব্যবহার করি, গন্ধরূপে শক্তি আমাদের ভোগ্যা, এই প্রকারে জলে রস, তেজে প্রভা, বায়ুতে স্পর্শ, ব্যোমে শব্দ, মনে সঙ্কল্প, বুদ্ধিতে অবধারণ, অহংকারে অভিমান শক্তি আশ্রয়ী হইয়া রহিয়াছে। আব্রহ্ম কীট সমস্ত জগৎ ভূতেরই বিকাশ, সুতরাং সমস্তই প্রকৃতিময়।

এই জগতে প্রত্যেক পুরুষেরই প্রকৃতি আছে, প্রত্যেক প্রকৃতির পুরুষ আছে। পুরুষ প্রকৃতির অংশ কি প্রকৃতি পুরুষের অংশ, তাহা নির্ণয় হয় না। এক দিন বৃন্দাবনে রাধা-কৃষ্ণকে ব্রহ্মা বলিলেন,—আপনি শ্রীকৃষ্ণ

ইনি রাধা বা আপনি রাধা ইনি শ্রীকৃষ্ণ, ইহা কেহ নিরূপণ করিতে পারে না, বেদেও ইহার মীমাংসা নাই। হে রাধে! আপনি শ্রীকৃষ্ণের প্রাণযুক্ত হইয়া জগতের মাতৃস্বরূপা হইয়াছেন এবং এই শ্রীকৃষ্ণও আপনার প্রাণবিশিষ্ট হইয়া ঈশ্বর হইয়াছেন।

আশ্চর্য্যের বিষয় কোন শিল্পী এই রূপ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা বোধগম্য হয় না। এই শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ নিত্য, সেইরূপ আপনিও নিত্যা। আপনি ইঁহার অংশ অথবা ইনিই আপনার অংশ, ইহা কেহই নিরূপণ করিতে সমর্থ হয় না।

উত্তম, মধ্যম, অধম, সকল প্রকার নারীগণ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন; তাহার মধ্যে যাহারা প্রকৃতির সত্বাংশ হইতে উৎপন্না, তাহারা উত্তমা, সুশীলা ও পতিব্রতে নিয়ত আসক্তা হয়। যাহারা প্রকৃতির রজোভাগ হইতে উৎপন্না হয়, তাহারাই মধ্যমা এবং ভোগ্যা বলিয়া কথিতা হয়; ইহারা সর্ব্বদা সুখসম্ভোগশালিনী এবং স্বকার্য্যসাধনতৎপরা। যাহারা প্রকৃতির তমঃ অংশ হইতে উৎপন্না, তাহারা অধমা; তাহারা অজ্ঞাত কুল সম্ভব দুর্ম্মুখা, কলহপ্রিয়া, ধূর্ত্তা, কুলটা, ও সর্ব্বদাই স্বাধীনভাবে থাকতে ইচ্ছা করে। পৃথিবীতে কুলটাগণ ও স্বর্গে অপ্সরাগণ প্রকৃতির তমঃ অংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই জগতে স্ত্রীগণ প্রকৃতির কলাংশের অংশ হইতে উৎপন্ন এবং পুরুষগণ পুরুষাংশ হইতে উৎপন্ন; অতএব স্ত্রীগণের অপমানে প্রকৃতিই অপমানিতা হন, স্ত্রীগণের সম্মানে প্রকৃতিই সম্মানিতা ও সন্তুষ্ট হন।

শক্তি

এই বিশ্ব সংসার কর্ম্মক্ষেত্র। ইহার যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই দিকেই দেখিতে পাওয়া যায় কার্য্য। ঊর্দ্ধে অসীম আকাশের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে কার্য্য। কি প্রখর-করশালী সূর্য্যাদি গ্রহগণ, কি সুধাকর শশধর, কি নক্ষত্রনিচয়, কি মহাসমুদ্র, কি মহাবিশ্ব, সকলেই নিজ নিজ নিয়মিত পথে অনন্য লক্ষ্যে কেন্দ্রাভিমুখাকর্ষণে কার্য্যক্ষেত্রে পরিভ্রমণ করিতেছে। অধোদিকে দৃষ্টিপাত কর, নিখিল ভূমণ্ডল, জলনিধি, শৈল, কানন, গ্রাম, নগর, প্রান্তর, জীবনিকরের সহিত নিরন্তর অবিচ্ছেদে স্বীয় প্রকৃতিকে কেন্দ্র করিয়া স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে। চরাচরে কাহারও লক্ষ্যচ্যুতি নাই, কর্ম্মে বিরাম নাই। কি জড় জগৎ, কি চেতন জীবনিচয় সকলেই স্ব স্ব গন্তব্য পথে কার্য্যক্ষেত্রে নিরন্তর বিচরণ করিতেছে। অপরিমেয় অম্বুরাশিও কার্য্য করিতেছে; নদ, নদীও কার্য্য করিতেছে, গিরি, মরু, স্থাবরসংঘও কার্য্য করিতেছে, তরু, লতা, উদ্ভিদ সমূহও কার্য্য করিতেছে; কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রাণীগণও কার্য্য করিতেছে; উৎকৃষ্ট জীব মানবমণ্ডলীও কার্য্য করিতেছে। সকলেই স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে কার্য্য করিতেছে। ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীর ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য, ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য হেতু ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী বা গুণবিভাগ হইয়াছে। সকলের কার্য্য এক রকম নহে, সেই জন্য সকলে এক শ্রেণীভুক্ত নহে, কেরাণীর কার্য্য ও কুম্ভকারের কার্য্য এক নহে, কাজেই শ্রেণীও এক নহে।

জড় জগতের কার্য্য জড়রূপে প্রতিভাত হয়, চেতন জগতের কার্য্য চেতনাত্মা রূপে প্রকাশিত হয়। জড়ের কার্য্যে কেবল সত্যও উন্নতির ভাব থাকিলেও তাহাতে জ্ঞান বা সুখের ছায়া দৃষ্টিগোচর হয় না; কিন্তু চেতন জগতের কার্য্যে প্রতি পদেই সত্য ও উন্নতির সহিত জ্ঞান ও সুখের পূর্ণ আভাস প্রতীত হইয়া থাকে। জীবের নিখিল কার্য্যই উন্নতি লক্ষ্যে সুখোদ্দেশে সুখময়ী প্রকৃতিকে কেন্দ্র করিয়া সমাহিত হইতেছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কেহ নিজের সম্পূর্ণ উন্নতি ও সুখ দেখিতে পায় না। সকলেই আপন আপন অভাবের স্মৃতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া অসুখী। বহির্জগতে অনবরত কার্য্য চলিতেছে, আবার অন্তর্জগতেও নীরবে কাম ক্রোধ প্রভৃতি কার্য্য করিতেছে। অবিরাম কর্ম্মচক্র ঘুরিতেছে, বিশ্ব কর্ম্মরহিত এক মুহূর্ত্তও নহে। সমস্ত কর্ম্মের মূলই শক্তি। এই বিশ্ব শক্তির কার্য্য, কেবল শক্তির খেলা। কর্মময় জগৎ, সুতরাং শক্তিময় জগৎ। শক্তিও ক্রিয়াতে মিশিয়া রহিয়াছে। শক্তি ক্রিয়া ছাড়িয়া নাই; ক্রিয়া শক্তি ছাড়িয়া নাই। শক্তি ক্রিয়া ছাড়িলে তাহার অস্তিত্ব অনুমান করা যায় না, এবং শক্তি ছাড়া ক্রিয়াও হইতে পারে না। শক্তিবশে কি জড় কি চেতন নিরন্তর কার্য্য করিতেছে, স্থাবর জঙ্গম নিরন্তর ব্যাপৃত অবশে কার্য্যে রহিয়াছে।

আমি ভাবিতেছি বা চিন্তা করিতেছি, ভাবনা-চিন্তা জ্ঞানক্রিয়া, ভাবিতেছি বা চিন্তা করিতেছি বলিলেই বুঝা যাইতেছে জ্ঞান কার্য্য করিতেছে। কার্য্যমাত্রই শক্তিসাধ্য। জ্ঞান করিতেছে বলিলেই বুঝা যাইতেছে যে শক্তি কার্য্য করিতেছে, সুতরাং আত্মা যদ্দারা চিন্তারূপ ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিতেছেন অথবা জ্ঞান যদ্দারা ভাবনারূপ কর্ম্ম নিষ্পন্ন করিতেছে, তাহাই শক্তি। ক্রিয়া বা পরিবর্ত্তনের যাহা কারণ, তাহাই শক্তি।

সময়ে সময়ে দেখা যায় অগ্নির দাহিকা শক্তি, বিষের বিষশক্তি, বিষ মহৌষধির দ্বারা প্রতিবদ্ধ হয়। অগ্নির সহিত আমাদের দেহের সংযোগ হইলেই আমাদের দেহকে দগ্ধ করে; যাহা আমাদের দেহকে দগ্ধ করে, তাহাই অগ্নির দাহিকা শক্তি। কিন্তু শক্তিমান পুরুষ অগ্নির দাহিকা শক্তিকে প্রতিবদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। যতখানি বিষ খাইয়া তুমি-আমি মরি, এমন লোক অনেক আছেন, তাহা হইতে অধিক বিষ খাইলেও মরেন না। প্রহ্লাদকে অগ্নিতে ফেলিয়াছিল, বিষ খাওইয়াছিল, তাহাতে সে মরে নাই। বশিষ্ঠদেব অগ্নিতে ঝাঁপ দিয়াছিলেন, অগ্নি তাঁহাকে দগ্ধ করিতে পারে নাই। সীতার অগ্নিপরীক্ষাও সেইরূপ; অগ্নি তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারে নাই। যদি স্পর্শ করিতে পারিত, তাহা হইলে নিশ্চয় দগ্ধ করিতে পারিত।

শক্তি ত্রিগুণা অর্থাৎ সত্ব-রজঃ-তমোগুণা। গুণ অর্থাৎ রজ্জু বা দড়ি, যদ্বারা বন্ধন করা যায়। আমরা যেমন রজ্জু দ্বারা কোন পদার্থ বন্ধন করি, সেইরূপ শক্তি যদ্বারা সংসার বন্ধন করিয়াছে, তাহারই নাম গুণ। এক গাছা রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিলে আলগা হয়, কিন্তু তিন গাছা রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিলে খুব শক্ত হয়। শক্তি ত্রিগুণে অর্থাৎ সত্ব রজঃ তমঃ গুণে জগৎকে দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন; সেই শক্তি ত্রিগুণা। এক গুণের বন্ধনই খোলা যায় না, ত্রিগুণের বন্ধন খোলে কাহার সাধ্য! বিশ্বে সমস্তই ত্রিগুণে বদ্ধ। ভূলোকে, স্বর্গে বা দেবগণের মধ্যে এমন জীব নাই, যে প্রকৃতি হইতে জাত এই গুণত্রয় হইতে মুক্ত। মরমাত্মা ব্যতীত, অনাত্মা কোনও বস্তু নাই যাহা ত্রিগুণময় মায়াপাশ-বন্ধন এড়াইতে পারে। তৃণ হইতে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত ত্রিগুণময়ী মায়ারূপ-রজ্জুতে গ্রথিত রহিয়াছে।

যাহার যাহা সত্তা, তাহাই তাহার শক্তি। যে থাকিলে যাহা থাকে, যে না থাকিলে যাহা থাকে না, তাহাই তাহার শক্তি, বা যে যাহার কারণ, তাহাই তাহার শক্তি; সুতরাং কারণই শক্তি। এখন দেখিতে হইবে কে কাহার সত্তা, কে থাকিলে কে থাকে, কে না থাকিলে কে থাকে না, কে কাহার কারণ। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, মন, বুদ্ধি, অহংকার—এই অষ্ট প্রকৃতির অষ্ট সত্তা ঠিক হইলেই সব ঠিক হইতে পারে। গন্ধই ভূমির সত্তা, সুতরাং গন্ধই উহার কারণ বা শক্তি। ভূমি হইতে গন্ধ উঠাইয়া লইলে উহার অস্তিত্ব থাকে না, এই প্রকার জলের রস, তেজের প্রভা, বায়ুর স্পর্শ, আকাশের শব্দ, মনের সঙ্কল্প, বুদ্ধির অবধারণ, অহংকারের অভিমান শক্তি বিবেচনা করিতে হইবে। সত্ব-রজঃ-তমোগুণা প্রকৃতি হইতে এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক বহু প্রজা সৃষ্ট হইয়াছে। প্রকৃতি এক মুহূর্তও বিনা পরিবর্ত্তনে থাকতে পারে না; সত্ব যখন প্রকৃতির অঙ্গ, তখন উহাও বিনা পরিবর্ত্তনে থাকিতে পারে না। রাগ বা বিরাগের যোগই সৃষ্টি বা পরিণামের কারণ; রাগ ও বিরাগ যথাক্রমে রজঃ ও তমঃ গুণের কার্য্য, অতএব বুঝা যাইতেছে, সত্ব শক্তি, রজঃ তমঃ শক্তির দ্বারা নানা আকারে অভিব্যক্ত হয়, ইহারই নাম সৃষ্টি বা পরিণাম। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম-সমষ্টিই বিশ্ব। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, ইহারা শক্তি। শব্দশক্তি আকাশ, স্পর্শশক্তি বায়ু, প্রভাশক্তি অনল বা তেজ, রসশক্তি জল, গন্ধশক্তি পৃথিবী। এক আদি-অন্ত-বিহীন শক্তি এই বিশ্বের আদি কারণ, সমস্ত জগৎ তাহা হইতে উদ্ভূত এবং তাহাতেই অবস্থিত। ঐ শক্তি দ্বারা জগৎ রক্ষিত, পালিত, বর্দ্ধিত ও ধ্বংসিত হইতেছে।

বিশ্ব হইতে যদি শক্তিকে বাদ দেওয়া যায়, তাহা হইলে কিছুই থাকে না। ঐ শক্তি কখনও দ্রষ্টা, কখনও দৃশ্য, কখনও ভোক্তা, কখনও ভোগ্য নানা প্রকার বিবিধ রূপে ক্রিয়া করিতেছে। ঐ শক্তি কখনও ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিতে আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইতেছে, কখনও সৌম্য মূর্ত্তিতে দেখা দিতেছে—কখনও সংহার মূর্ত্তিতে, কখনও শ্মশানরূপে, কখনও কালীরূপে, কখনও শিবরূপে, কখনও বিষ্ণুরূপে; আবার ঐ শক্তি বৈশাখমাসে ঝঞ্ঝারূপে জগৎকে আকুলিত করিতেছে, এবং ফাল্গুন মাসে বসন্তরূপে ফুল-ফলের মনোহর শোভায় আশ্বস্ত করিতেছে।

একই শক্তি কখনও সমুদ্ররূপে, কখনও অগ্নিরূপে, কখনও বিজন অরণ্যরূপে, কখনও নগররূপে, দৃশ্য হইতেছে। যাহা কিছু দৃশ্য হইতেছে, সমস্তই ত্রিগুণেরই নানা সাজ। প্রকৃতি-নর্ত্তন অনাদি কাল হইতে অনন্ত কাল এই ভাবেই চলিয়াছে ও চলিবে। প্রকৃতি-নর্ত্তকী এই রঙ্গভূমে এইরূপে নৃত্য করিতেছে, দর্শকেরও অভাব নাই, নৃত্যেরও বিরাম নাই।

শক্তি আধার ব্যতীত কার্য্যক্ষম হয় না। শক্তি কোনও যন্ত্র বা আধার ব্যতীত কার্য্য প্রকাশ করিতে পারে না। এক আদ্যাশক্তি মূল প্রকৃতি দর্শন-ইন্দ্রিয়কে আশ্রয় করিয়া, একই শক্তি, দশ-রকম কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে। কেবল মাত্র স্থান ভেদে শক্তিভেদ কল্পিত হইয়া থাকে; যেমন একই গন্ধশক্তি গোলাপ ফুল যাহাকে আকর্ষণ করিল তাহা এক প্রকার, চামেলী যাহাকে আকর্ষণ করিল তাহা অন্য প্রকার, আবার বেল ফুল যাহাকে আকর্ষণ করিল তাহা আর এক প্রকার, ইত্যাদি।

একই জলীয় রস, নারিকেল যাহাকে আকর্ষণ করিল তাহা একপ্রকার তালশাঁস যাহাকে আকর্ষণ করিল তাহা অন্য প্রকার, খেজুর-রস যাহাকে আকর্ষণ করিল তাহা ভিন্ন প্রকার, ইক্ষু যাহাকে আকর্ষণ করিল তাহা

আর এক প্রকার। এই প্রকারে একই শক্তি প্রকৃতি ভেদে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। শক্তি অনুমান সাধ্য। কর্ম্ম দৃশ্য, শক্তি অদৃশ্য। একটি বীজ আছে, তাহার অঙ্কুর জনন-সামর্থ্য আছে। কিন্তু ঐ বীজ যদি ভর্জ্জিত হয় তাহা হইলে তাহা হইতে অঙ্কুর-উৎপাদন-শক্তি তিরোহিত হয়। যে সামর্থ্য থাকিলে বীজ অঙ্কুর-জননে সমর্থ হয়, সেই সামর্থ্যই বীজের শক্তি। যাহা থাকিলে বীজাদি কারণ হইতে অঙ্কুরাদি কার্য্য উৎপন্ন হয়, না থাকিলে হয় না, সেইরূপ একটা কিছু অদৃশ্য পদার্থ আছে, তাহারই নাম শক্তি। বীজের মধ্যে অঙ্কুর-জনন-শক্তি আছে, তাহা তুমি দেখিতে পাও না, অঙ্কুর জননরূপ কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়া গেলে পর তুমি সেই শক্তির অনুমান করিতে পার। অগ্নির দাহিকা শক্তি আছে, অগ্নি দৃশ্য, দাহিকা শক্তি অদৃশ্য। অগ্নি তৃণ দগ্ধ করিতেছে; যে শক্তি দগ্ধ করিতেছে সে শক্তিকে কেহ দেখিতে পাইতেছে না। কিন্তু দাহরূপ কার্য্য দেখা যাইতেছে, সুতরাং বলিতে হইবে কার্য্য দৃশ্য, শক্তি অদৃশ্য; কার্য্য ব্যক্ত, শক্তি অব্যক্ত।

শক্তিই কর্ম্ম, কর্ম্মই শক্তি। শক্তির বিকাশই কর্ম্ম, কর্ম্মের কারণই শক্তি। কর্ম্মের দ্বারা শক্তির অনুমান হয়, কর্ম্মের মূল শক্তি। শারীরিক, বাচনিক ও মানসিক, যে কোন কার্য্য হউক, বিনা শক্তিতে কোনও কর্ম্মই নিষ্পন্ন হয় না। শক্তির স্বরূপ দর্শন করিতে হইলে কর্ম্মের স্বরূপ জানিতে হইবে। গমনক্রিয়া দ্বারা গ্রাম বা পর্ব্বত পাওয়া যায়, কাষ্ঠ দগ্ধ হইয়া ভস্ম হয়, স্নানের দ্বারা দেহ শোধিত হয়, ইত্যাদি।

জগতে কার্য্য অসংখ্য। অসংখ্য হইলেও তাহার জাতিবাচক সংখ্যা আছে। মনুষ্যের ইন্দ্রিয় দশটি, দশটি ইন্দ্রিয়ের জন্য দশটি কার্য্য নির্দ্দিষ্ট আছে। চক্ষুর দর্শন, কর্ণের শ্রবণ, নাসিকার ঘ্রাণ, জিহ্বার আস্বাদ, ত্বকের স্পর্শ, এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের পঞ্চ কার্য্য; বাক্যের কথন, পাণির গ্রহণ, পাদের গমন, পায়ুর বিসর্গ, উপস্থের আনন্দাস্বাদ, এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের পঞ্চ কার্য্য। প্রাণের নিমেষ, উন্মেষ, শ্বাসাদি, অন্তঃকরণের নিন্দ্রা কল্পনাদি। জগতে ইহাদের অতিরিক্ত কোনও কার্য্য নাই। যত কিছু কার্য্য, ইহাদের একটা না একটার অন্তর্গত থাকিবেই। বিশ্বের অসংখ্য কার্য্য হইলেও ঐ সকল কার্য্য দ্বাদশ শ্রেণীভুক্ত। ঐ দ্বাদশ শ্রেণী আবার দুই ভাগে বিভক্ত—সঙ্কোচ ও বিস্তার।

গমন, ভোজন, দর্শন ইত্যাদি যত কিছু কার্য্য আছে, সঙ্কোচ ও বিস্তার ব্যতীত হইতে পারে না। হস্ত দ্বারা কিছু ধরিতে গেলেই তাহাতে আকুঞ্চিত ও প্রসারিত করিতে হইবে। গমন করিতে হইলে, দুই পদ অনবরত আকুঞ্চিত ও প্রসারিত করিতে হইবে। হাতের অঙ্গুলি সঙ্কুচিত না করিলে ধারণকার্য্য নির্ব্বাহ হইবে না। এই প্রকার সমস্ত ইন্দ্রিয়ের। বুদ্ধি যে চিন্তা করিতেছে, মন যে কল্পনা করিতেছে, সমস্তই সঙ্কোচ ও বিস্তার-শক্তির বলে সাধিত হইতেছে। বুদ্ধি অনবরত চিন্তা করিতেছে, মন অনবরত কল্পনা করিতেছে; বুদ্ধি এক চিন্তাতেই স্থির নাই, মনও এক কল্পনাতে স্থির নাই। এক চিন্তার পর এক চিন্তা, এক কল্পনার পর আর এক কল্পনা; একটাকে ছাড়িতেছে, আর একটাকে ধরিতেছে। সুতরাং মন ও বুদ্ধির মধ্যে সঙ্কোচ ও বিস্তার কার্য্য অনবরত চলিতেছে, এক মুহূর্ত্তও বিরাম বিশ্রাম নাই। এই মহৎ কর্ম্মচক্র কোন শক্তিবলে ঘূর্ণিত হইতেছে? প্রাণ-শক্তিবলে ঘূর্ণিত হইতেছে। প্রাণেতে আবার সঙ্কোচ ও বিস্তার শক্তি নিহিত রহিয়াছে। প্রাণ জীবের শ্বাস-প্রশ্বাস; সেই শ্বাস-প্রশ্বাসের কার্য্য সঙ্কোচ ও বিস্তার। প্রাণের চেষ্টাতেই ইন্দ্রিয় সকল চেষ্টাশীল; কি জ্ঞানেন্দ্রিয়, কি কর্ম্মেন্দ্রিয়, প্রাণই সকল ইন্দ্রিয়কে কার্য্যশীল করিয়া রাখিয়াছে। সেই প্রাণ আবার প্রকৃতির রাজসিক ধারা। সমস্ত বিশ্ব-কার্য্য আকুঞ্চন ও প্রসারণ-শক্তিবলেই সাধিত হইতেছে। এক কথায় সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, সমস্ত কার্য্যই আকুঞ্চন ও প্রসারণ-শক্তিবলেই নির্ব্বাহ হইতেছে। ছোট বড়, ভালো মন্দ, শক্ত বা নরম, যত প্রকার কার্য্য-কৌশল বিজ্ঞানবলে প্রস্তুত হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে, সমস্তই শক্তিবলে সমাধা হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে; আর সেই শক্তির মূল প্রকৃতি এবং জগন্মাতা আদ্যাশক্তি। পৃথিবীর আদি হইতে যে শক্তির দ্বারা সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে, যাহা ব্যবহার না করিলে কোনও কার্য্য সমাধা হয় না, সেই শক্তিই আদ্যাশক্তি।

মায়া

মায়া কাহাকে বলে? যাহাতে জগৎ মোহিত হইয়া রাহিয়াছে; তাহা কি প্রকার পদার্থ, সকলেরই বিশেষরূপে অবগত হওয়া উচিত। পরব্রহ্মের প্রতিবিম্বযুক্ত সত্ব, রজঃ, তমঃ এই ত্রিগুণাত্মক এবং সৎ বা অসৎ নির্ণয়ের অযোগ্য পদার্থবিশেষের নাম মায়া, বা অজ্ঞান। জ্ঞানের উদয়ে উহা অসৎ, জ্ঞানের অনুদরে উহা সৎ। এই জন্য ইহা এক ভাবে সৎ, আর এক ভাবে অসৎ, সেইজন্য ইহা সদসৎ নামের অযোগ্য।

ব্রহ্মের যে জগদবিকাশিনী শক্তি, তাহাই মায়া। মায়া বাস্তবিক স্বয়ং স্বতন্ত্র কোনও পদার্থ নহে, উহা ব্রহ্মেরই ভাব বা শক্তিবিশেষ; তোমার ভাব বা শক্তি যেমন তোমা হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ নহে, মায়া সেইরূপ ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ নহে। যেমন তোমার ভাব তুমি স্বয়ং নহ, মায়াও সেইরূপ স্বয়ং ব্রহ্ম নহে। অগ্নির দাহিকা শক্তি অগ্নি হইতে পৃথক কোনও পদার্থ নহে, অথবা স্বয়ং অগ্নিও নহে, সেইরূপ মায়াশক্তি ব্রহ্ম হইতে পৃথক কোনও পদার্থ নহে, অথবা স্বয়ং ব্রহ্মও নহে। তুমি চেতন জীব, তোমার শক্তি বা ভাব হইতে যেমন শরীরস্থ অচেতন অনেক পদার্থের বিকাশ হয়, সেইরূপ মায়া হইতে অচেতন জগতের বিকাশ হয়।

যে অজ্ঞাত কারণ সচ্চিদানন্দ-জ্ঞানস্বরূপ চিৎকে দুঃখীর ন্যায়, সর্ব্বজ্ঞকে অসর্ব্বজ্ঞের ন্যায়, অশোকীকে শোকাভিভূতের ন্যায় প্রতীয়মান করায়, তাহারই নাম মায়া। মনে কর, তোমার পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, বা কন্যার কেহ একজন মারা গেল, তুমি কাঁদিয়া আকুল—ইহা মায়ার খেলা। তুমি নিজে অশোকী সচ্চিদানন্দ নিত্য বিভু-পদার্থ, তুমি যাহার জন্য শোক করিতেছ, সে-ও নিজে অশোকী সচ্ছিদানন্দ নিত্য বিভু-পদার্থ, তাহার যাইবার স্থান নাই, কারণ বিভু-পদার্থের যাতায়াত অসিদ্ধ। সেই নিত্য সদানন্দ বিভুপদার্থ কতকগুলি জড়ীয় পরমাণু সমষ্টিযোগে একটি শরীর ধারণ করিয়া পিতা, মাতা, কন্যা, পুত্র ইত্যাদি ভ্রম জন্মাইয়াছিল। সংশ্লিষ্ট পরমাণু বিশিষ্ট হইল, ইহাতে তোমার কাঁদিয়া আকুল হইবার কোনও কারণ নাই, কেবল মায়ার কর্ম্ম। সংযোগ হইলেই বিয়োগ হয়, এবং বিয়োগ হইলেই সংয়োগ হয়, ইহা প্রকৃতির অবশ্যম্ভাবী নিয়ম। নিত্য বিভু স্থির আত্মা তোমার সম্মুখেই বিরাজমান, অথচ সে নাই বলিয়া কাঁদিয়া ব্যাকুল; সেও চিরকাল থাকিবে, তুমিও চিরকাল থাকিবে; কেবল ভ্রম-দৃষ্টিতে ভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। যে পরমাণু-সংযোগে ভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছিল, তাহাও সেই চিৎবিকাশ, সেই চিৎবিকাশ পরমাণুর সংশ্লিষ্ট ভাব দৃষ্টে পুত্র জন্মিয়াছে বলিয়া হাসিয়াছিলে, তাহারই বিশ্লিষ্ট ভাব দর্শনে পুত্র মরিয়াছে বলিয়া কাঁদিতেছে, ইহাই মায়া।

স্ত্রী-কায়া দেখিলে লোকে বড়ই মুগ্ধ হয়; ইহার জন্য কত লোক কত কাণ্ড কারখানা করিতেছে, তাহার বর্ণনা করা যায় না। বাস্তবিক স্ত্রী-কায়া সুন্দর নহে, তাহাকে আমরা সুন্দর বলিয়া মনে করি, তাহাকে দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হই, ইহাই মায়া। স্ত্রীলোকের বেশ-ভূষা অঙ্গ হইতে বিচ্যুত করিলে অমনি অতি কুৎসিত দেখাইবে; সেই কুৎসিতকে সুশ্রীর ন্যায় দেখা যাইতেছে যাহার দ্বারা, তাহাই মায়া। অনাদি কাল এক ভোগে মত্ততাই মায়া। চতুরবস্থাপন্না প্রকৃতি, স্বর্গ, মর্ত্ত, মাতাল, দেব, মনুষ্য, কীট, পতঙ্গ, অনাদিকাল হইতে অনন্ত কাল পর্য্যন্ত একই ভাবে স্থায়ী, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, ভোগ ভোগাইতেছে; এই পরিবর্ত্তনশীল ভোগের জন্য কত কি করিতেছে, তাহা পাইবার জন্য আকুল হইতেছে। তাহারই বিয়োগে ব্যাকুল হইতেছে, অথচ নিত্য অনন্ত আনন্দের আধার সচ্চিদানন্দ পদার্থ নিকটেই রহিয়াছে, তাহা পাইবার নামগন্ধও করে না, তাহাই মায়া! এই মায়ার ইয়ত্তা করিবার সাধ্য নাই, মায়া নিজেই তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে না।

বেদান্তে যাহা মায়া, সাংখ্যে তাহা অব্যক্ত প্রকৃতি। মায়া, শক্তি, প্রকৃতি তিনই এক। বেদান্ত যাহাকে মায়া বলে—অর্থাৎ এই বাহ্য জগৎ মনের কল্পনা মাত্র, এই আছে এই নাই, তাহাই মায়া। সাংখ্য বলেন,—উহা প্রকৃতি, মনের কল্পনা নয়, উহা যথার্থ; কখনও ব্যক্ত, কখনও অব্যক্ত এই মাত্র প্রভেদ। বেদান্ত মায়াকে আবরণ ও বিক্ষেপ-শক্তিমতী বলিয়া উল্লেখ করেন; সাংখ্য বলেন,—উহা প্রকৃতির রজঃ ও তমঃগুণ। বেদান্ত

বলেন—সংসার অলীক, সাংখ্য বলেন—সংসার ক্ষণিক। দুই মহারথীর দুই মত; আমরা সামান্য পদাতিক, কোন পথে যাই, তাহার ঠিক নাই। বেদের আশ্রয় লইলেই সাংখ্য চক্ষু রক্তবর্ণ করেন, আবার সাংখ্যের মত অবলম্বন করিলে বেদ আরক্ত লোচনে মুখ গম্ভীর করেন। আমাদের দশা এক্ষণে 'বল মা তারা দাঁড়াই কোথা'।

মায়ার দুইটি উপাধি—বিদ্যা ও অবিদ্যা। শুদ্ধ সত্বগুণের বিকাশ বিদ্যা নামে কথিত হয়, আর রজঃ ও তমঃ গুণের বিকাশ অবিদ্যা বা অজ্ঞান নামে অভিহিত হয়। ঐ বিদ্যাতে চিৎ-ছায়া অহংতত্বাত্মক ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এবং অবিদ্যাতে চিৎ-ছায়া অহংতত্বাত্মক জীব। ঐ বিদ্যা ও অবিদ্যার তারতম্যে নানান জীবের নানান বিকাশ বা উপাধি বা কার্য্য হয়। ঈশ্বর মায়াকে নিজ আয়ত্তে রাখিয়া, জগতের সৃষ্টি করেন বলিয়া সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বনিয়ন্তা ও সর্ব্বান্তর্যামী ঈশ্বর বলিয়া অভিহিত হন। জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়েই শক্তির অধীশ্বর, আশ্রয় ও প্রবর্ত্তক হইলেও খণ্ডশক্তির আশ্রয়ীভূত জীবাত্মা বিশ্বব্যাপিনী শক্তির অধিনায়ক পরমাত্মার সম্পূর্ণ অধীন। জীবাত্মা পরমাত্মার অংশ মাত্র। জীবের স্বকীয় শক্তির উপর আধিপত্য থাকিলেও বিশ্বশক্তির উপর আধিপত্যের অভাব বশতঃ তদ্দ্বারা জগৎব্যাপারাদি বিভু-কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে না। অবিদ্যা বা অজ্ঞানের দুই উপাধি—এক আবরণশক্তি, আর এক বিক্ষেপশক্তি। অজ্ঞান যে শক্তি দ্বারা স্বয়ং পরিচ্ছিন্ন হইয়াও অপরিচ্ছিন্ন আত্মাকে বুদ্ধি বৃত্তির আচ্ছাদন দ্বারা আচ্ছাদিতের ন্যায় প্রকাশ করেন, তাহার নাম আবরণশক্তি; আর যে শক্তিরূপ উপাদান কারণ দ্বারা লিঙ্গাদি ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত জগৎ সৃষ্টি করেন, তাহারই নাম বিক্ষেপশক্তি। সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণময়ী মায়া স্বরূপতঃ জড়স্বরূপা, দুঃখরূপিণী ও দুরন্তা। এই মায়ার দুই শক্তি থাকাতে, বেদ বলেন, যে শক্তি সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে দূরে নিক্ষেপ করে, তাহার নাম বিক্ষেপশক্তি, আর যে শক্তি সত্যস্বরূপ ব্রহ্মকে আচ্ছাদন করিয়া রাখে, তাহার নাম আবরণ শক্তি। এই অজ্ঞানরূপিণী মায়া আবরণশক্তি দ্বারা নির্ব্বিকার নিরঞ্জন ব্রহ্মকে আবৃত রাখিয়া, বিক্ষেপশক্তি-প্রভাবে তাঁহাকেই জগদাকারে দেখাইয়া বা প্রকাশ করিয়া থাকেন।

একই নট রঙ্গভূমে যেমন নানা সাজে সজ্জিত হয়, অজ্ঞান ব্যক্তিরা যেমন সেই সজ্জিত নটকে চিনিতে পারে না, কারণ পট-আচ্ছাদিত থাকা হেতু; সেইরূপ আবরণ-বিক্ষেপকারী মায়ারূপ যবনিকায় আচ্ছাদিত থাকাতে কেহ আমাকে চিনিতে পারে না। আগুন যেমন শরা চাপা দিলে লোক-লোচনের অন্তরালে থাকে, আমিও সেইরূপ যোগমায়া দ্বারা সমাবৃত হেতু সকলের নিকট প্রকাশ পাই না। ইহাতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, অজ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মপদার্থ আবৃত থাকাতে এই বিশ্বভ্রম জন্মিয়াছে, সকলেই মায়াতে অন্ধ হইয়াছে, মোহে ভ্রান্ত কল্পনা করিতেছে, অভাব পদার্থ দ্বারা আবরণ কল্পনা করে। জ্ঞানের অভাব অজ্ঞান, অজ্ঞানের অভাব জ্ঞান; যেমন আলোকের অভাব অন্ধকার, অন্ধকারের অভাব আলোক, প্রকৃতির তমঃগুণই অজ্ঞান নামে অভিহিত হইয়াছে।

এই বিশ্ব চিন্ময়, জড় বলিয়া যে বোধ হয়, তাহাই মায়া। এই ব্রহ্মই মায়া-সাজে সজ্জিত হইয়া, মায়িক অংশটুকুকে জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, ভোক্তা, ভোগ্য, দ্রষ্টা, দৃশ্য রূপে প্রতীত হইতেছেন। অগ্নির দাহিকা শক্তির ন্যায়, মায়া ব্রহ্মেরই শক্তি। মায়ার আসন ব্রহ্মবক্ষেই নির্দ্দিষ্ট আছে, রজোগুণী মায়া চিন্ময় ব্রহ্মকে ক্ষোভিত করিলেন; ক্ষোভিত করিয়া আবরণাত্মক তমঃশক্তি দ্বারা প্রকাশাত্মক সত্বগুণ জ্ঞানকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন। মায়ার শক্তি অসীম; এককে দুই দেখায়, সৎকে অসৎ বোধ করায়। ব্রহ্ম মুক্ত, জীব বদ্ধ। মুক্ত ও অমুক্তে যোগাযোগ রহিয়াছে; জীব ও ব্রহ্ম এক সূত্রে গাঁথা রহিয়াছে, অথচ ভিন্নের ন্যায় দেখাইতেছে। জীব মুক্তই হউক আর বদ্ধই হউক, এক ব্রহ্ম সূত্রে গাঁথা। জীব বদ্ধাবস্থায়ও তাঁহার সহিত যুক্ত আছে, মুক্ত হইলেও তাঁহার সহিত যুক্ত থাকিবে। মনে কর, একটি নিস্তরঙ্গ, নিষ্কল্লোল, ধীর, স্থির, প্রশান্ত, কূল-কিনারা-বিহীন, অগাধ, পারাপার-রহিত পারাবার বিস্তৃত রহিয়াছে, তুমি দেখিতেছ তরঙ্গহীন সাগরের জল সমস্ত এক ভাবাপন্ন, যেন সব সমান, কেহ কাহারও সহিত বিভিন্ন নাই, পরস্পর মিলিত, কেহ কাহাকে ছাড়িয়া নাই, পরস্পর যোগ হইয়া এক হওয়াতে অসীম ও অনন্ত হইয়াছে। হঠাৎ সমুদ্রবক্ষে মৃদু বাতাস বহিল, সমুদ্রও

ঈষৎ চঞ্চল হইল; বাতাস আর একটু বাড়িল, সমুদ্রও কিঞ্চিৎ ক্ষোভিত হইল; ক্রমে পবনহিল্লোল প্রবল হইল, পূর্বে যাহাকে একভাবাপন্ন দেখিয়াছিলে, তাহাকে এখন ভিন্নভাবাপন্ন দেখিতেছ; যাহা সমান ছিল, তাহা বিষমভাব ধারণ করিয়াছে; যাহা নিস্তরঙ্গ নিষ্কল্লোল ছিল, তাহা সতরঙ্গ সকল্লোল হইয়াছে, যাহা অভিন্ন ছিল, তাহা ভিন্নবৎ বোধ হইতেছে। এই পবন কোথায় ছিল? ইহা কি আগন্তুক? না সমুদ্রবক্ষেই ছিল, কাল বায়ুর রজঃগুণকে ক্ষোভিত করিয়া চালনানন্তর সমুদ্রকে ক্ষোভিত করিয়াছে, সেই জন্য তরঙ্গ উঠিয়াছে; ঐ তরঙ্গ কোনও স্থানে উঠিল? সমুদ্রের সমতল ক্ষেত্রের উপরিভাগে উঠিয়াছে, সতরঙ্গ সকম্প জলের নিম্নে তাহার আশ্রয়স্বরূপ নিষ্কম্প, নিস্তরঙ্গ জল রহিয়াছে, কারণ সেখানে পবনের প্রবেশ করিবার সাধ্য নাই, সুতরাং আলোড়নও নাই; তরঙ্গে নানারকম ছোট-বড়, রঙ্গ-বিরঙ্গের বুদ্ধুদ উঠিতেছে পড়িতেছে, জলের অল্প বিস্তর তারতম্যানুসারে কোনও বুদ্ধুদ বড়, কোনও বুদ্ধুদ ছোট, সূর্য্যকিরণ পতিত হওয়াতে রঙ্গ-বিরঙ্গ ধারণ করিয়াছে, কোনটা লাল, কোনটা সবুজ, কিন্তু ঐ বুদ্ধুদ, ফেনিল তরঙ্গ আকৃতি কার্য্যগত ভিন্ন হইলেও জলরূপে একই। তরঙ্গায়িত জল, গভীর সমুদ্রের নিস্তরঙ্গ জল ছাড়া নয়। তুমি মনে করিলে তরঙ্গ গণনা করিব, ইহার আদি-অন্ত কোথায় দেখিব; দেখার সাধ মিটিল না, অন্তের সীমা পাইলে না। অনন্ত কাল দাঁড়াইয়া থাকে, অনন্ত কাল দেখিতে থাক, তরঙ্গ উঠিতেছে, পড়িতেছে, ছুটিতেছে, বিরাম নাই বিশ্রাম নাই। যে দর্শক তরঙ্গের উঠাপড়া ছুটাছুটি দেখিতেছে, সে নিজেও অনন্ত কাল উঠাপড়া ছুটাছুটি করিতেছে, তাহা তাহার বোধ নাই। তুমি কোনও বস্তুর আদি অন্ত দেখিয়াছ কি? তোমার নিজের আদি অন্ত দেখিয়াছ কি? তোমার নিজের আদি অন্ত যদি না দেখিয়া থাক, তবে অন্যের আদি অন্ত দেখিতে চাহিও না। যখন নিজের আদি অন্ত পাইবে, তখন অন্যেরও আদি অন্ত সহজেই পাইবে।

বিশ্ব যখন এক ব্রহ্মেরই বিকাশ, তখন মায়া ব্রহ্মাংশ, বিশ্বের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে; কিন্তু উভয়ই এক। ত্রিগুণের তারতম্য অনুসারে, কেহ বুদ্ধিমান, কেহ নির্ব্বুদ্ধি, কেহ অমল, কেহ সমল, কেহ সবল, কেহ দুর্ব্বল, কেহ ছোট, কেহ বড় ইত্যাদি। মুক্ত হও বা বদ্ধ থাক, চিৎ-সাগরেই থাকিতে হইবে। মায়ামুক্তের সহিত মায়াবদ্ধের পূর্ণযোগ, এক সূত্রে গ্রথিত; সূত্র ছাড়াইবার উপায় নাই, ছিন্ন করিবারও সাধ্য নাই। ব্রহ্মের মায়াতীত অংশ অগাধ, অনন্ত, নিশচল, নিষ্কম্প, নিস্তব্ধ, অনন্ত-বিশ্রাম, অনন্ত-বিরাম, ধীর, স্থির, শান্ত, গভীর, মহানন্দ, মহাসুখের ক্ষীরোদার্ণব। অনন্ত বিশ্ব-তরঙ্গ চিদবক্ষে একটার পর আর একটা অনাদি অনন্ত-কাল হইতে অবিরাম উঠিতেছে, ছুটিতেছে, পড়িতেছে, আবার উঠিবে, ছুটিবে, পড়িবেও অনন্তকাল। ব্রহ্মবক্ষে যে অংশে মায়ার বিকাশ হইয়াছে, সেই অংশেই বিশ্বরূপ তরঙ্গ উঠিতেছে; গভীর সমুদ্রে প্রবেশ করিলে মায়ারূপ বাতাস লাগিবে না, সুতরাং উঠা পড়া যাওয়া আসার জ্বালায় জ্বলিতে হইবে না।

প্রাণ

শ্বাস-প্রশ্বাস যাহার কার্য্য, স্থূল শরীরে তাহাকেই আমরা প্রাণ বলিয়া জানি। বিজ্ঞানের বিষয় নয় অথচ সন্দেহের বিষয়ও নয়, তাহাই প্রাণের রূপ। প্রাণের এক উপাধি হিরণ্যগর্ভ, হিরণ্ময় কোষে অধিষ্ঠান হেতু হিরণ্যগর্ভ নাম হইয়াছে। প্রাণের এক নাম 'ঋক', যেহেতু প্রাণ সমস্ত ইন্দ্রিয়কে উত্থিত করে। প্রাণের এক নাম 'যজুঃ', যেহেতু প্রাণ থাকিলেই সর্ব্ব ভূতের সহিত যোগ হয়। প্রাণের, এক নাম 'সাম', যেহেতু সংযোগ ও সাম্যকরণ জন্য সাম নাম হইয়াছে। প্রাণের এক নাম 'আঙ্গিরস', যেহেতু প্রাণই অঙ্গের রস, অর্থাৎ যে অঙ্গ হইতে প্রাণ বিযুক্ত হয়, সেই অঙ্গ শুষ্ক হয়, এই হেতু প্রাণ যে শরীরের ও ইন্দ্রিয়ের আত্মা ইহাও সিদ্ধ হইল; আত্মা না থাকিলেই মরণ ও শরীরের শোষণ হয়, প্রাণ না থাকিলেও তাহাই হয়। যে প্রকার প্রদীপালোক গৃহ ঘটাদির পরিমাণ অনুসারে সঙ্কোচ ও বিকাশ লাভ করে, সেই প্রকার প্রাণও শরীর মাত্রেই পরিমিত হয়।

প্রাণ আপোময় অর্থাৎ কিছু না খাইয়া কেবলমাত্র জল খাইয়া থাকিলেও প্রাণ বাঁচিয়া থাকিতে পারে। প্রাণ সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বগত, কারণ রাজসিক বৃত্তি বিশ্বব্যাপী। প্রাণ ও বাক্য মিথুনীভূত, সেই মিথুনীভূত প্রাণ ও বাক্য শব্দব্রহ্ম প্রণবে সংসৃষ্ট আছে। স্বর ও অকারাদি বর্ণ প্রাণ হইতে উৎপন্ন হয়। প্রাণ উদয়-অস্তশীল। আদিত্য যেমন উদয়-অস্তশীল, জন্ম-মৃত্যু দ্বারা প্রাণেরও উদয়-অস্ত অনুমান করা যায়। জন্মেতে প্রাণের উদয়, মৃত্যুতে প্রাণের অস্ত হয়, কিন্তু ধ্বংস হয় না, যেমন আদিত্য উদয় ও অস্তে ধ্বংস হয় না।

অনেক প্রাণাত্মবাদী আত্মাকেই প্রাণ বলেন। তাহার কারণ এই, যাহার প্রাণ আছে তাহারই আত্মা আছে, যাহার আত্মা আছে তাহারই প্রাণ আছে। এমন কোনও প্রাণী দেখা যায় না, যাহার আত্মা নাই; এমন কোন আত্মবান দেখা যায় না, যাহার প্রাণ নাই। শ্রুতিতে প্রাণ, পরমাত্মা পরব্রহ্ম রূপে বর্ণিত আছে, যেহেতু স্থাবর জঙ্গমাত্মক ভূত সকল প্রাণেই প্রতিষ্ঠিত আছে। যিনি সমুদয় ভূতের আত্মা রূপে প্রকাশ পাইতেছেন, তিনিই প্রাণস্বরূপ। সমস্ত জগৎ যাহা কিছু, সেই প্রাণস্বরূপ। ব্রহ্মাই চালিত হইতেছেন এবং তাঁহা হইতেই নিঃসৃত হইতেছে।

প্রাণকে কেহ কেহ ইন্দ্রিয়ের রজঃ-অংশ হইতে উদ্ভূত বলিয়া থাকেন। প্রাণ আত্মার ভোগশক্তির ব্যাপার। প্রাণের দ্বারাই আত্মার ভোগ সাধিত হয়। অন্ন-জলের সারাংশ প্রাণের সহিত মিশিয়া প্রাণ হইয়া যায়, তাহাতে শরীর পুষ্ট হয় এবং আত্মার ভোগ সাধিত হয়। প্রাণ সকল অপেক্ষা প্রিয়। লোকে নিজ প্রাণকে যত ভালবাসে, এত আর কাহাকেও ভালবাসে না। প্রাণ, মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ইহারা শরীরে কার্য্য করিয়া থাকে। প্রাণের চেষ্টাতেই ইন্দ্রিয় সকল চেষ্টাশীল। প্রাণই ইন্দ্রিয়গণকে স্ব স্ব কার্য্যে প্রয়োগ করিতেছে। মন চঞ্চল, কার্য্য করিবার জন্য সদাই ব্যস্ত, ইন্দ্রিয়গণ স্বীয় স্বীয় বিষয়ে ধাবিত হয়; প্রাণ যে স্পন্দিত হয়, সমস্তই রজঃ-গুণের কার্য্য। সমস্ত বিশ্বে যখন এই সকল গুণ কার্য্য করিতেছে, রজোগুণ যখন সমস্ত জগৎ ব্যাপীয়া অবস্থিতি করিতেছে, রজোগুণেরই ব্যক্ত ধারা প্রাণ, সুতরাং প্রাণই সমস্ত বিশ্ব ব্যাপিয়া কার্য্য করিতেছে, প্রাণের চেষ্টাতেই জগৎ কার্য্যক্ষম, সুতরাং প্রাণ সর্ব্বব্যাপী। প্রাণের দ্বারা ধার্য্য ধারণ, কার্য্য কারণ নির্ব্বাহ হয়। সর্ব্বদাই প্রাণের ক্রিয়া হইতেছে, নিদ্রাবস্থাতেও প্রাণের ক্রিয়া সমভাবে হইয়া থাকে। শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়তই প্রবাহিত হইতেছে। যখন প্রাণ ক্রিয়া না করে। অক্ষম হয় বা প্রাণের কার্য্য বন্ধ হয়, তখন আর জীবের বোধশক্তি থাকে না, মৃত্যু আসিয়া গ্রাস করে।

সূর্য্য যে প্রকার সকল বস্তুর প্রকাশক ও অস্তিত্ব জ্ঞাপক, প্রাণও তদ্রুপ। ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে সূর্য্যই জগতের অস্তিত্ব প্রকাশক, আদিত্য রূপে অবস্থান করিতেছেন। এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমস্ত বিশ্বই এক মহাপ্রাণ। প্রাণই পিতা,

মাতা, ভ্রাতা, ভগিণী, পুত্র, কন্যা, আচার্য্য, দেব, পশু, পক্ষী, কীট ইত্যাদি। প্রাণ বিদ্যমান থাকিলে, পিতা-মাতা সম্বোধন হইয়া থাকে; প্রাণ চলিয়া গেলে, যাঁহাকে এতক্ষণ সম্ভ্রম করা হইত, তাঁহাকে আর সম্ভ্রম করা হয় না, বরং জ্বলন্ত কাষ্ঠ দ্বারা তাঁহাকে দগ্ধ করা হয়।

প্রাণ ক্রিয়াশক্তি বা রজোগুণ-প্রধান প্রকৃতিতে প্রতিবিম্বিত চিৎশক্তি। সূত্র দ্বারা যেমন পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও দূরবর্ত্তী বস্তু সকলকে গ্রথিত ও একীভূত করা হয়, সেইরূপ প্রাণ, অণুসমূহকে গ্রথিত করিয়া শরীর নির্ম্মাণ করে। প্রাণকে আশ্রয় করিয়া শরীর, ইন্দ্রিয় ও মন প্রভৃতি বিদ্যমান থাকে। প্রাণ মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয় ও ভূত, সকল পদার্থই চৈতন্য-অধিষ্ঠিত ত্রিগুণময়ী পৃথক পৃথক পরিচ্ছিন্ন অবস্থা। ভৌতিক রাজ্য তমোগুণপ্রধান, প্রাণরাজ্য রজোগুণপ্রধান এবং বুদ্ধিরাজ্য সত্বগুণপ্রধান।

প্রকৃতপক্ষে প্রাণই দেহরাজ্যের সর্ব্বাধিকারী মহারাজ। জীবাত্মা পরমাত্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—কাহার অবস্থিতিতে আমি অবস্থিত হইব? পরমাত্মা বলিলেন—প্রাণের অবস্থিতিতে তুমি অবস্থিত হইবে। কোনও সময়ে প্রাণ, মন, বুদ্ধি, চক্ষু, কর্ণাদি ইন্দ্রিয় সকল পরস্পর আমি প্রধান, আমি প্রধান, আমি না থাকিলে জীব দেহ আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারে না, এইপ্রকার বিবাদ উপস্থিত করিল; কে প্রধান, ইহার মীমাংসা করিয়া দিবার জন্য ব্রহ্মাকে মধ্যস্থ মানা হইল। ব্রহ্মা বিচার করিয়া বলিলেন,—তোমরা দেহ হইতে একে একে চলিয়া যাও, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে, কে প্রধান এবং কাহার অভাবে দেহ থাকে না। প্রথম চক্ষু গেল, চক্ষু যাওয়াতে জীবের কোনও ক্ষতি হইল না, অন্ধ হইয়াও বাঁচিয়া রহিল, তাহার পর কর্ণ গেল, তাহাতেও কালা হইয়া বাঁচিয়া রহিল, বুদ্ধি গেল, জড়ের ন্যায় হইয়া বাঁচিয়া রহিল। এই প্রকারে সকল ইন্দ্রিয় চলিয়া গেল, তাহাতে প্রাণের কোনও ক্ষতি বৃদ্ধি হইল না; যেমন প্রাণ যাইবার উপক্রম করিল, অমনি সকল ইন্দ্রিয় চীৎকার করিয়া বলিল, তুমি যাইও না, তুমি যাইলে আমাদের এক মুহূর্ত্তও থাকিবার ক্ষমতা নাই, তোমার সঙ্গে সকলকেই যাইতে হইবে। তখন ব্রহ্মা বলিলেন,—এখন বুঝিতে পারিয়াছ, প্রাণই প্রধান; তাহার প্রমাণ, এই সুষুপ্তি সময়ে অহঙ্কার বুদ্ধি প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সকলের কার্য্য থাকে না, তাহাতে জীবের বাঁচিয়া থাকিবার কোনও ব্যাঘাত হয় না, কেননা প্রাণ জাগ্রত থাকে, প্রাণ না থাকিলে জীব থাকিতে পারে না, সুতরাং দেহরাজ্যে প্রাণই সকলের শ্রেষ্ঠ।

প্রাণই কর্ত্তা, ক্রিয়া, কর্ম্ম, কর্ম্মকর্ত্তা ও কর্ম্মফল-ভোক্তা। এই মহাপ্রাণ ছায়ার ন্যায় ঈশ্বরের অনুগত। প্রাণ স্বীয় শক্তিতেই গমন করে ও প্রকাশ পায়। প্রাণের বহির্ভূত থাকিয়া এই পর্য্যন্ত কোনও ক্রিয়া সম্পন্ন হয় নাই এবং কোনও কর্ত্তাও প্রাণ ব্যতিরেকে কোনও কার্য্য নিষ্পন্ন করিতে পারে নাই। প্রাণ বা সজীবতা না থাকিলে কোনও কার্য্যই সম্পন্ন হইতে পারে না। প্রাণই প্রাণ দ্বারা গমন করে, প্রাণই প্রাণ প্রদান করে। এক প্রাণই যদি কর্ম্মকর্ত্তা হইল, তবে কর্ম্মফল ভোক্তাও তিনি। জীব যাহা কিছু কর্ম্ম করিয়াছে, করিতেছে ও করিবে, সে সমস্তই ফল সহিত সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত হইয়া অদৃশ্য রূপে, ছাপ-লাগা বা দাগ লাগার ন্যায়, বস্ত্রে কুসুমগন্ধের ন্যায়, প্রাণে অঙ্কিত থাকে। কর্ম্ম করিলেই জীবের সূক্ষ্ম শরীরে কর্ম্মজন্য ধর্ম্মাধর্ম্ম নামক গুণ বা শক্তি বিশেষ জন্মিবেই জন্মিবে। ধর্ম্মাধর্ম্ম নামক গুণ জন্মিলে সে আপনার আশ্রয়ীভূত জীবকে অবস্থানন্তরে পাতিত করিবে, সেই সেই স্বকৃত কর্ম্মের ভালো-মন্দ ফল ভোগ করিতে হইবে; বার বার জন্ম, বার বার মরণ, বার বার অল্পকাল ও বহুকাল জীবনধারণ, পুনঃ পুনঃ সুখ দুঃখাদি ভোগ করিতে হইবে; কত দিনে বা কোন সময়ে কিরূপ অবস্থায় পাতিত করিবে, তাহার স্থিরতা নাই, ফলতঃ এক সময়ে করিবেই করিবে, কেহই নিবারণ করিতে পারিবে না। কিন্তু কোন কর্ম্মের কিরূপ ফল, তাহা অতীব দুর্ব্বোধ্য।

প্রাণ পরলোক-সত্তার ঈক্ষণ যন্ত্র। প্রাণে পরলোক-সত্তা গাঁথা রহিয়াছে, প্রাণই জগৎকেন্দ্র, প্রাণই বিশ্বকেন্দ্র। জগৎ ব্রহ্মাণ্ড এই প্রাণেই অবস্থিত। যেমন মৃণাল সকল নাল-মধ্যে তন্তু দ্বারা সংযুক্ত আছে, সেইরূপ আশারূপ পাশ দ্বারা সকলেই প্রাণে অবস্থিত আছে। মুকুরাদিতে যেরূপ প্রতিবিম্ব পড়ে, তদ্রুপ এই প্রাণে, পরমাত্মা জীবাত্মা রূপে অবস্থিত আছেন। এই বিশ্বে তুমি যাহা কিছু দেখিয়াছ, শুনিয়াছ, দেখিতেছ, শুনিতেছ এবং যাহা কিছু দেখিবে, শুনিবে, সে সমস্তই প্রাণে গাঁথা রহিয়াছে, রহিতেছে ও রহিবে। মুক্তি না হওয়া

পর্য্যন্ত মহাপ্রলয়েও ধ্বংস হইবে না, এক কথায় সমস্ত বিশ্বই তোমার প্রাণে গাঁথা; তাহার প্রমাণ এই, মনে কর, তোমার পুত্র বিদেশে আছে, তাহাকে আজ তোমার স্মরণ হইল, স্মরণ হওয়ার অর্থ এই, তোমার পুত্রের আকৃতি ও ক্রিয়াকলাপ সমস্ত মনে পড়িল। মনে পড়িল অর্থাৎ তোমার পুত্রের আকৃতি ও ক্রিয়াকলাপ যাহা প্রাণে গাঁথা রহিয়াছে, তাহা তুমি মানস প্রত্যক্ষ করিতেছ, তাহারই নাম স্মরণ বা স্মৃতি। স্মৃতি বলিয়া যাহাকে বলা হয়, তাহা প্রাণে গাঁথা পদার্থের মানস প্রত্যক্ষ ভিন্ন আর কিছুই নহে। তোমার পুত্রের আকৃতি প্রকৃতি ও ক্রিয়াকলাপ যেমন প্রাণে গাঁথা রহিয়াছে, সেইরূপ বিশ্বের সমস্ত পদার্থই তোমার প্রাণে গাঁথা রহিয়াছে, বিশ্বে এমন কোন পদার্থ নাই, যাহা তুমি দেখ নাই বা শুন নাই; বিশ্ব অনাদি অনন্ত কালের, তুমিও বার বার মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করিয়া সমস্ত বিশ্ব ভ্রমণ করিয়াছ, সুতরাং তোমার দেখিতে শুনিতে কিছু বাকি নাই। যদি বল ইহার প্রমাণ কি? ইহার প্রমাণ এই, স্বপ্নে যাহা কিছু অদ্ভুত অসম্ভব ঘটনা প্রত্যক্ষ কর, যাহা তুমি এ জীবনে দেখ নাই বলিয়া বিবেচনা কর, তাহা অন্য জীবনের, অন্য স্থানের বিভিন্ন অবস্থার ঘটনা। স্মরণ হয়, প্রাণে গাঁথা ঘটনা বলিয়া। প্রাণে যাহা গাঁথা নাই, তাহা কখনও স্মরণ হইতে পারে না? প্রাণে যাহা গাঁথা নাই; মানসেও তাহার প্রত্যক্ষ হইতে পারে না; স্মরণ হইতে পারে না এবং স্বপ্নেও দর্শন হইতে পারে না; সুতরাং তুমি যাহা স্বপ্ন দেখিলে, তাহা প্রাণে গাঁথা মানস প্রত্যক্ষ পদার্থ; সুতরাং প্রাণে 'পরলোক-সত্তা', গ্রথিত থাকে।

যাহার চিত্ত-দর্পণ মার্জ্জিত ও স্বচ্ছ, সেই চিত্ত-দর্পণের দ্বারা তাহার প্রাণে সমস্ত বিশ্ব প্রতিফলিত দেখিতে পায়। যদি বল পরলোকের কথা স্মরণ থাকে না কেন? যাহার গত-কল্যর কথা মনে থাকে না, তাহার পরলোকের কথা মনে রাখা কত অসম্ভব; বিশেষতঃ মৃত্যু-যন্ত্রণায় সমস্ত স্মৃতি লোপ হইয়া যায়; মৃত্যুর সময়ে যাহার যন্ত্রণা না হয়, তাহারই পক্ষে পূর্ব্বজন্মের কথা মনে থাকিবার সম্ভব। যে প্রাণ দুঃখ যন্ত্রণায় ব্যথিত, ভয় যুক্ত ও হিংসিত হয় না, কামের দ্বারা কলুষিত নয়, আশাপাশে বদ্ধ নয়, তাহার প্রাণই দৈব প্রাণ। প্রাণ উৎক্রমণসময়ে দৈব ভাবাপন্ন থাকিলে তাহারই পূর্ব্ব ও পরজন্ম-স্মৃতি মনে থাকিতে পারে, অন্যের স্মরণ থাকিতে পারে না।

প্রাণ সদা জাগরিত। জীব সুষুপ্তি প্রাপ্ত হইলে, বাহ্যেন্দ্রিয়ের ও অন্তরিন্দ্রিয়ের জ্ঞান যখন লুপ্ত হয়, অহঙ্কার যখন তিরোহিত হয়, জীব মৃত কি জীবিত যখন এইরূপ সংশয় হয়, তখন প্রাণই সেই সংশয় অপনোদন করে। জীবের সহজ অবস্থা তিনটি—জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি। জীব জাগ্রত হইতে স্বপ্নে, স্বপ্ন হইতে সুষুপ্তিতে অবস্থান করে; প্রাণ কিন্তু নিত্য জাগ্রদবস্থায়ই বিরাজমান থাকে; জীব যে বেঁচে আছে, তাহার সাক্ষ্য দেয়। প্রাণ স্বপ্নাবস্থাও পায় না, নিদ্রাবস্থাও পায় না, প্রাণ স্বপ্নের অতীত, নিদ্রারও অতীত।

জীবের জাগ্রদবস্থা কারে বলে? ইন্দ্রিয়গণ যখন কার্য্যে রত থাকে, তখন জীবের জাগ্রদবস্থা। ঐ জাগ্রদবস্থা তিন প্রকার—প্রথম জাগ্রত-জাগ্রত, দ্বিতীয় জাগ্রত-স্বপ্ন, তৃতীয় জাগ্রত-সুষুপ্তি। যে অবস্থায় সত্য জ্ঞান হয়, তাহার নাম জাগ্রত-জাগ্রত। যে অবস্থায় ভ্রম জ্ঞান হয়, তাহার নাম জাগ্রত-স্বপ্ন; তুমি জাগ্রদবস্থায় কোনও একটা কিছু ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ চমকিয়া উঠিলে, ইহার নামও জাগ্রত-স্বপ্ন। যে অবস্থায় জ্ঞানের ক্ষণিক উপরতি হয়, তাহার নাম জাগ্রত-সুষুপ্তি। তুমি এক জায়গায় বসিয়া কিছু ভাবিতেছ, ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ নিদ্রার আবল্য আসিল, চক্ষুও কিঞ্চিৎ নিমীলিত হইল, ঐ অৰ্দ্ধনিমীলিতাবস্থায়, সম্মুখ একটি বৃক্ষ দেখিয়া ব্যাঘ্রভ্রমে চমকিয়া উঠিলে, ইহারই নাম বা এই অবস্থাকেই বলে জাগ্রত-সুষুপ্তি।

জাগ্রত ও সুষুপ্তির মধ্যস্থিত অবস্থার নাম স্বপ্ন অথবা তোমার দিবা ভাগের সমস্ত কার্য্য যাহা গ্রথিত রহিয়াছে তাহার চক্ষুর অন্তরালে সুষুপ্তির পূর্বে মানস প্রত্যক্ষের নাম স্বপ্ন। ইহা তিন ভাগে বিভক্ত—প্রথম স্বপ্ন-জাগ্রত, দ্বিতীয় স্বপ্ন-স্বপ্ন, তৃতীয় স্বপ্ন সুষুপ্তি। যে অবস্থায় স্বপ্নে সত্য জ্ঞান হয়, তাহার নাম স্বপ্ন-জাগত। যদিও স্বপ্নাবস্থায় প্রায়ই মিথ্যাজ্ঞান উদিত হইতে দেখা যায়, কিন্তু তাহার মধ্যে অনেক সময়ে সত্য জ্ঞানও উদিত হইতে দেখা গিয়াছে। অনেকে অনেক সময় মন্ত্র ও ঔষধ লাভ করিয়াছেন, অনেকে অনেকপ্রকার জ্ঞানও লাভ করিয়াছেন। যে অবস্থায় স্বপ্নে স্বপ্ন দৃষ্ট হয়, তাহার নাম স্বপ্ন-স্বপ্ন। যে অবস্থায় প্রকৃত সুষুপ্তি হয়

নাই, অথচ স্বপ্ন-দর্শনও উপরত হইয়াছে, এইরূপ দুর্লক্ষ্য অবস্থার নাম স্বপ্ন-সুষুপ্তি। স্বপ্ন—ইহা একটি আশ্চর্য্য বিজ্ঞান, মলিন চিত্তে তাহার অনুভব হয় না; ইহা একটি মানস শিল্প, ইহা ত্রিকাল জ্ঞানের বীজ। ইহা পাত্রবিশেষে সত্যও বটে মিথ্যাও বটে; যেমন টাকা সৎপাত্রে ন্যস্ত হইলে সৎকার্য্য সাধিত হয়, অসৎ পাত্রে ন্যস্ত হইলে নানা প্রকার অসৎ কার্য্যে ব্যয়িত হইয়া থাকে, সেইরূপ স্বপ্নও সাধকে সত্য, অসাধকে মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। সত্বগুণ উদিত স্বপ্ন সত্য হয়, রজোগুণান্বিত স্বপ্ন মিথ্যা হয়। সাধকদিগের সাধনার তারতম্য-অনুসারে সত্বেরও উৎকর্ষ হইতে থাকে, স্বপ্নও সেই পরিমাণে সফলতা ধারণ করিতে থাকে। এই সফলতার শেষ সীমা ত্রিকালজ্ঞান বা সর্ব্বজ্ঞত্ব। মনে কর, তুমি সাধনা আরম্ভ করিলে, এই সময়ের স্বপ্ন কখনও সত্য কখনও মিথ্যা; ক্রমে তোমার সাধনার উৎকর্ষ হইতেছে, সেই সঙ্গে সত্বগুণও বৃদ্ধি হইতেছে, স্বপ্নও ততই সফলতা ধারণ করিতেছে। যাহা পূর্বে স্বপ্নাবস্থায় দেখা যাইত, তাহা সাধনার উৎকর্ষে সত্বগুণ বর্দ্ধিত হওয়াতে জাগ্রদবস্থায়ই দেখা যাইবে, তাহাই সর্ব্বজ্ঞত্ব। শোকগ্রস্ত, রোগগ্রস্ত, চিন্তাগ্রস্ত ব্যক্তির স্বপ্ন মিথ্যা। সময়ে সময়ে রোগগ্রস্ত ব্যক্তির স্বপ্ন সত্য হইতে দেখা যায়, তাহাতে মনে করিতে হইবে, দৈবাধীন সত্বগুণের উদ্রেক-সময়ে সেই স্বপ্ন দেখিয়াছে, সেইজন্য সত্য হইয়াছে। স্বপ্ন দ্বারা পরকাল-সত্তারও অনুমান সিদ্ধ হয়। তুমি যাহা দেখ নাই, শুন নাই, তাহা যেমন বলিতে পার না, মনও যাহা দেখে নাই, শুনে নাই, তাহা বলিতে পারে না। স্বপ্নাবস্থায় কখনও বিচিত্র নগর, উদ্যান, অট্টালিকা, গো, হস্তী, রেলগাড়ি, সর্প, জলে সাঁতার প্রভৃতি কত ভয়ঙ্কর স্থান এবং কত মনোরম স্থান দেখা যায়; সেই সকল তুমি মিথ্যা মনে করিও না, কারণ কোন না কোন জন্মে, কোন না কোন সময়ে। কোন না কোন স্থানে মন তাহা দেখিয়াছে, তাহাই মন স্বপ্নাবস্থায় তোমাকে দেখাইল।

যে অবস্থায় বিভিন্ন জ্ঞান বিষয়চ্যুত হইয়া আত্মাভিমুখে এক অখণ্ড আকার ধারণ করে, তাহার নাম সুষুপ্তি। যে অবস্থায় সত্ববৃত্তি সুখাকার হওয়াতে অস্পষ্ট ঘন সুখজ্ঞান হইতে থাকে, সেই অবস্থার নাম সুষুপ্তি-জাগ্রত। যে অবস্থায় রজোবৃত্তি অর্থাৎ দুঃখভাব লুক্কায়িত আবদ্ধ থাকে, তাহার নাম সুষুপ্তিস্বপ্ন। যে অবস্থায় সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান তিরোহিত হয়, অর্থাৎ যে অবস্থায় চিত্ত তমঃ অর্থাৎ অজ্ঞান মাত্র অবলম্বন করিয়া নির্ব্বিকার হয়, তাহার নাম সুষুপ্তি-সুষুপ্তি।

ঐ সমস্ত অবস্থার মধ্যে স্বপ্ন-জাগ্রদবস্থা বিশেষ অদ্ভুত এবং অনুসন্ধানযোগ্য। কি প্রকার সত্য প্রজ্ঞা উদিত, তাহা জানিতে পারিলে অবশ্যই তাহার দ্বারা সেইরূপ জ্ঞান লাভের কোন না কোন কৃত্রিম উপায় আবিষ্কৃত হইতে পারে। পূর্ব্বকালে ঋষিগণ উক্ত অবস্থার তাৎপর্য বিশেষরূপে অবগত হইয়াই যোগবলে বিভূতি লাভের উপায় আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, যে সময় পুরুষ সুষুপ্তি প্রাপ্ত হয়, সেই সময়ে বাক, মন, চক্ষু ও শ্রোত্র প্রাণে বিলীন হইয়া থাকে; যে সময়ে জাগরিত হয়, সেই সময় প্রাণ হইতে তফাৎ হইয়া যায়।

প্রাণই জীবিকা শক্তি। প্রকাশময় বিজ্ঞানাত্মা চিদাত্মাকে আশ্রয় করিয়া শরীরের চৈতন্য সম্পাদন করেন; প্রাণ সেই চিদাত্মাতেও বিজ্ঞানাত্মাতে বর্তমান থাকিয়া বিচেষ্টমান হন, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান, সকলই প্রাণেতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে; প্রাণই ভূতবর্গের কার্য্যরূপ পরব্রহ্ম এবং তিনিই বিরাট প্রভৃতির কারণ। চিদ্বিজ্ঞান-সমন্বিত সূত্রাত্মারূপ প্রাণই সর্ব্বভূতের চেতয়িতা জীবাত্মা; তিনিই সনাতন পুরুষ,. তিনিই মহান, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এবং ভূত পঞ্চকের শব্দাদিরূপ বিষয়ও তিনি; এই রূপে যেই সূত্রাত্মা উপাধির আবেশ হেতু জীবভাব প্রাপ্ত হইলে পর, এই দেহমধ্যে বাহ্য কি আভ্যন্তর কি সর্ব্ববিষয়েই প্রাণবায়ু দ্বারা প্রতিপালিত হন। এই প্রাণ দেহমধ্যে প্রাণ অপানাদি পঞ্চপ্রকারে বিভক্ত হইয়া বিদ্যমান আছেন। সেই প্রাণবায়ু পশ্চাৎ অপানবায়ুত্ব প্রাপ্ত হইলে তদ্দ্বারা জীব পৃথক পৃথক গমনীয় গতি আশ্রয় করে, সেই অপান বায়ু আবার সমান নামে অভিহিত হইয়া জঠরানল অবলম্বনপূর্ব্বক ভুক্তান্ন পরিপাক করিয়া মূত্রাশয়ে ও পুরীষাশয়ে মূত্র ও পুরীষ বহন করত পরিবর্ত্তিত হয়। সেই এক বায়ু প্রযত্ন, কর্ম্ম ও বল, এই তিন বিষয়ে বর্ত্তমান থাকে, শাস্ত্র তদবস্থ বায়ুকে উদান বায়ু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মনুষ্যের সমুদয় শরীর মধ্যে প্রত্যেক সন্ধিস্থলে সন্নিবিষ্ট

থাকিবার অবস্থায় ব্যান বায়ু বলিয়া উপদিষ্ট হয়। জঠরানল ত্বগাদি ধাতু সমস্তের মধ্যে ব্যাপ্ত থাকে; যেই অগ্নি প্রাণাদি বায়ু কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া অন্নাদি রস, ত্বগাদি ধাতু ও পিত্তাদি দোষ সমস্ত পরিবর্ত্তন করত দ্রুতবেগে সঞ্চরণ করে। প্রাণ সকলের একত্র সন্নিপাত নিমিত্ত সংঘর্ষণ জন্মে, সেই সংঘর্ষ দ্বারা জঠরাগ্নি উৎপন্ন হয়, এবং সেই অগ্নিই দেহাদির ভুক্ত অন্ন পরিপাক করে।

সমান ও উদান বায়ুর মধ্যে প্রাণ ও অপান বায়ু সন্নিবেশিত আছে, তাহাদিগের সংঘর্ষ দ্বারা নিষ্পাদিত সপ্তধাতুময় শরীরকে পরিণত করিতে থাকে এবং সর্ব্ব শরীরে অন্নরস সমস্ত বহন করে। যে ক্রিয়া দ্বারা হৃদয় হইতে মুখ নাসিকা পর্য্যন্ত ঐর্দয্য বায়ুর গতাগতি ঘটনা হয়, সেই ক্রিয়ার নাম 'প্রাণ', যে ক্রিয়ার দ্বারা পরিচালক বায়ু নাভিস্থান হইতে পদাঙ্গুলি পর্য্যন্ত রস-রক্তাদি বহন করিয়া পরিব্যাপিত করে, সেই ক্রিয়ার নাম 'অপান'; যে ক্রিয়া দ্বারা নাভিদেশ বেষ্টন করত ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাক, মল, মূত্রাদির পার্থক্য ও রস-রক্তাদি উৎপাদন করত যথাযথ স্থানে লইয়া যায়, সেই ক্রিয়ার নাম সমান, গ্রীবার পশ্চাৎভাগ হইতে মস্তকচূড়া পর্য্যন্ত সমস্ত দৈহিক উপাদান সহিত ঊর্দ্ধগমনশীল কণ্ঠস্থায়ী যে বায়ু, তাহাকে 'উদান' বায়ু বলে; যাহা সর্ব্বশরীরে শিরায় শিরায় সঞ্চরণ করত বল রক্ষা করিতেছে, তাহার নাম 'ব্যান' বায়ু।

জীবের কোন অবস্থানকে জীবনীশক্তি বলে? প্রাণ যতক্ষণ শরীরপোষক বায়ুকে পোষণ করে, ততক্ষণ তাহার আয়ু; আর সেই প্রাণ শরীর পোষক বায়ুকে যখন ত্যাগ করে, তখনই তাহার মৃত্যু হয়। কড়ি, বরগা, ইট, চুন, সুরকি প্রভৃতি একত্র করিয়া গৃহের যে দৃঢ়তা ও বাসোপযোগিতা সম্পাদন করা যায়, তাহার নাম গৃহের জীবন। সেই দৃঢ়তার সহিত স্থিতিকালই সেই ঘরের পরমায়ু বা প্রাণ। জীবদেহের জীবন, প্রাণ বা আয়ু তাহারই অনুরূপ। জল অগ্নি ও বায়ু বা বায়ু পিত্ত ও কফ, এই তিন পদার্থের দ্বারা উৎপন্ন শক্তি বিশেষের নাম জীবন। যেমন অগ্নি দ্বারা জল উত্তপ্ত হইয়া বায়ু উৎপাদন করে এবং সেই বায়ুর শক্তি দ্বারা বাষ্পীয়যান গতি প্রাপ্ত হয়। সেইরূপ জীবন নামক যানও প্রাণ অপানাদি দশ বায়ু দ্বারা ধৃত হইয়া মনের সাহায্যে গতি প্রাপ্ত হয়। আত্মা উহার আরোহী, যখন তেজের বৃদ্ধি হইয়া রসের ন্যূনতা প্রযুক্ত বায়ু কুপিত হয়, তখনই সন্ন্যাস রোগে মৃত্যু হয়। যখন তেজের ন্যূনতা দ্বারা রসের আধিক্য হইয়া বায়ুর অল্পতা হেতু দেহ গতিহীন হয়, তখন বাতশ্লেষ্মা বিকারের মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হয়; যখন রস ও বায়ুর ন্যূনতা হইয়া তেজের আধিক্য দ্বারা দেহ গতিহীন হয়, তখন সান্নিপাতিক মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হয়। ঐ জীবন নামক ষটশক্তি একবার চালিত হইলে, যতদিন বাধা প্রাপ্ত না হয়, ততদিন চলিতে থাকে। ঐ নির্জীব জীবনীশক্তি যখন আত্মা দ্বারা সজীবত্ব প্রাপ্ত হয় তখন উহাকে জীবন বা জীবাত্মা বলা যায়; শরীর হইতে জীবনী শক্তির বিশ্লেষণই মৃত্যু। সপ্তদশ-অবয়ব-বিশিষ্ট শরীর মধ্যে যতগুলি পদার্থ আছে, তাহাদের মধ্যে সকলের বিশ্রাম করিবার সময় আছে; কিন্তু প্রাণের দিবা নাই, রাত্রি নাই, সন্ধ্যা নাই, সকাল নাই, বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, অনবরতই শ্বাস-প্রশ্বাস বহিতেছে, ইহাতে বেশ বুঝা যায় যে, প্রাণই দেহরাজ্যের রাজা, এবং প্রাণের মতেই সকলকে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হয়।

মন

মন সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক। বিচিত্র বিষয়ে বিক্ষিপ্ত হওয়াই মনের ধর্ম্ম। মন যখন আত্মার সহিত অভিন্নরূপে অবস্থান করিয়া দ্রব্যাদি বিবিধ জ্ঞানের উৎপাদন-কারণ হয়, তখন মন বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। যাহার সংযোগ না হইলে চক্ষু দেখিতে পায় না, কর্ণ শুনিতে পায় না, হস্ত ধরিতে পারে না, কোনও ইন্দ্রিয়ই কার্য্যক্ষম হয় না, তাহারই নাম মন, অর্থাৎ অন্যমনস্ক থাকিলে কিছুই সিদ্ধ হয় না। ইহা এই প্রকার, উহা এইরূপ নহে, ইহা করিব কি করিব না, তথায় যাইব কি যাইব না, হয়ত কিছু দূর যাইয়া ফিরিয়া আসিলাম ইত্যাদি বিবেচনা করা মনের ধর্ম্ম। এই ক্ষমতা মন ব্যতীত অন্য কোনও ইন্দ্রিয়ের নাই। অন্যান্য ইন্দ্রিয় বস্তুর প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিয়া চরিতার্থ হয়; এই বস্তু অমুক প্রকার, এরূপ ধারণা করিতে পারে না।

যাহা দ্বারা আমরা ইচ্ছামতো নানা সামগ্রী কল্পনা করি, যাহা দ্বারা আমরা ইচ্ছামতো নানা প্রকার কার্য্য করি, কখনও কাহাকেও স্বাধীন করি, কখনও কাহাকেও অধীন করি, জড় এবং আত্মার মধ্যবর্ত্তী এই যে এক অদ্ভুত পদার্থ, ইহাকেই বিশিষ্ট রূপে মন কহা যায়। আমরা যখন বস্তু সকলকে প্রত্যক্ষ করি, তখন সঙ্গে সঙ্গে এই এক শক্তিও অনুভব করি যে, ইহার সমান অন্যান্য বস্তুকে প্রত্যক্ষ করিলেও করিতে পারি; সুতরাং প্রত্যক্ষ ক্রিয়াতে আমাদের মন উপস্থিত বিষয়েতেই সর্ব্বসমেত আবদ্ধ থাকে না; কিন্তু উহা উপস্থিত বিষয়ের দিকে সমধিক আকৃষ্ট হইলেও কিয়ৎ পরিমাণে আমাদের আপন বশে থাকে, তাহাতে আর সংশয় নাই। এইজন্য স্বীয় চেষ্টা দ্বারা আমাদের মনকে এক বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে অনায়াসে নিয়োগ করিতে পারি। লোকের ভাব-অভাব সুখ-দুঃখাদি ক্ষণমধ্যেই উদিত ও অস্তমিত হয়, মনের কল্পনাই তাহার কারণ।

মনকে পৃথক রাখিয়া কি জ্ঞানেন্দ্রিয় কি কর্ম্মেন্দ্রিয় কেহই কোনও প্রকার কার্য্য করিতে সমর্থ হয় না। মনকে পৃথক রাখিয়া যদি কোনও ইন্দ্রিয় কদাচিৎ কোনও বিষয়ে সংযুক্ত হয়, তবে তাহা নিষ্ফল হয়, অর্থাৎ জ্ঞান জন্মায় না। মন অন্যদিকে নিবিষ্ট থাকিলে কোনও বিষয়েরই ভোগজনিত তৃপ্তি লাভে সমর্থ হওয়া যায় না। মন যখন যে ইন্দ্রিয়ে সংযুক্ত হয়, তখন সেই ইন্দ্রিয়কে কার্য্য করায়। অন্যমনস্ক থাকিলে কোনও কার্য্য হয় না। দেহের কোনও চেষ্টা নাই, মনই চেষ্টা করিয়া কার্য্যে নিযুক্ত করে, সুতরাং মনই তাহার নায়ক। সুখদুঃখ চক্ষুকর্ণাদি দ্বারা বোধ হয় না, হয় তাহা মনের দ্বারা। বাহ্য পদার্থ যেমন ইন্দ্রিয়দ্বার দিয়া অন্তরে প্রবেশ করে, সুখদুঃখ পদার্থও মন-দ্বার দিয়া অন্তরে প্রবেশ করে। যে বস্তু সমীপে নাই, যে বস্তু বিদ্যমান নাই, চক্ষু কর্ণাদি হস্তপদ তাহা গ্রহণ করিতে পারে না, কিন্তু মন পারে। কোনও ইন্দ্রিয়ের সাহয্য ব্যতীত মন সকল কার্য্যই করিতে পারে। যে কোনও কার্য্য হউক, প্রথমে মনে উদয় হয়, তাহার পর বাক্য এবং হস্ত, পদ দ্বারা তাহা কৃত হয়। যদি হাত-পা বদ্ধ থাকে, তাহা হইলেও মন চুপ করিয়া স্থির থাকিবে না। সে নিজের কল্পনা-সাহায্যে পূর্ব্বদৃষ্ট, পূর্ব্বশ্রুত বস্তুর চিন্তা বা আলোচনা করিয়া তাহা স্বীয় শরীরে আরোহণ করাইয়া বিচিত্র করিবেই করিবে। চক্ষুর অধিকার কর্ণে নাই, কর্ণের অধিকার চক্ষে নাই; কিন্তু মনের অধিকার সকলটাতেই আছে।

প্রথম ইন্দ্রিয় দ্বারা বস্তুর প্রতিবিম্ব গ্রহণ, অনন্তর তাহার মনের নিকট সমর্পণ, তাহার পর মনের দ্বারা স্বরূপাদি নির্ণয় হয়। মনের দ্বারা বিবেচিত হইবার পূর্ব্বাবস্থা অস্পষ্ট, এবং উত্তরাবস্থা স্পষ্ট। ইন্দ্রিয় সকল বস্তু গ্রহণ করিয়াছে, মনের নিকট সমর্পণ করে নাই, অথচ অস্পষ্ট মনের ছায়া পড়িয়াছে, তাহাই মুগ্ধ জ্ঞান। বালক, বোবা, উন্মাদ, জড় ইহারাও বস্তু দেখে, কিন্তু বিবেচনা করিতে পারে না; আঁ, ওঁ, গ্যাঁ, গোঁ, করে, ইহাই মুগ্ধজ্ঞান। ইন্দ্রিয় সকল বস্তু গ্রহণ করিয়া মনের নিকট অর্পণ করিল, মন বিকল্প করিতে থাকিল—ইহা কি পদার্থ, এই প্রকার ইতস্ততঃ করিয়া ঠিক করিতে না পারিয়া অহঙ্কারকে অর্পণ করিল, অহঙ্কার বলিল—উহা কোন পদার্থ তাহা বিচার করা আমার কার্য্য নয়, তবে তুমি আমাকে যাহা দিয়াছ তাহা উপেক্ষণীয় নহে,

কারণ উহা প্রিয়দত্ত উপহার, তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, তোমার প্রসাদে আমি ভিখারী হইয়াও সময়ে সময়ে রাজা। তুরিতানন্দ বাবাজীর অনুগ্রহে সচ্চিদানন্দ হইয়া বসি, সময়ে সময়ে ভিখারী অবস্থায়ও তুমি আমাকে রাজত্ব দাও, অতএব তুমি আমার অতি প্রিয়, সুতরাং তোমার দত্ত উপহার আমি বুদ্ধির নিকট দিলাম, উহা কোন পদার্থ বুদ্ধিই নিশ্চয় করিয়া দিবে, আমি ভোগ করিব। এইরূপ ক্রমপরম্পরায় আসিয়া জ্ঞান পরিপক্ক হয়, এবং পদার্থও স্থির হয়। ইন্দ্রিয়গণ মনের সাহায্যে আলোচনা করিল, মন সঙ্কল্প করিল, অহঙ্কার অভিমান করিল, তদনন্তর বুদ্ধির অধ্যবসায় বা অবধারণ হইল, এইখানে জ্ঞান পরিপক্ক হইয়া সম্পূর্ণ হইল।

যেমন জলদাবৃত অমা-রজনীর নিবিড় অন্ধকারে পথভ্রান্ত পথিক অরণ্যে উপস্থিত হইয়া বিদ্যুতের সাহায্যে ব্যাঘ্র দর্শন করিয়া সহসা পশ্চাৎ প্রতিনিবৃত্ত হয়, এখানে বিদ্যুৎ সঞ্চালনের ন্যায় সহসা আলোচন, সঙ্কল্প, আভিমান ও অধ্যবসায়, এই বৃত্তি কয়টির উদয় হইয়া পরে অপসারণ কার্য্য সম্পাদিত হয়। প্রথমতঃ অস্পষ্ট আলোকে দূরে কিছু দেখা গেল, ঐ জ্ঞান মুগ্ধ ভাবে অর্থাৎ অস্পষ্টরূপে জন্মিল, তৎপরে দ্বিতীয় অবস্থায় মন আসিয়া সঙ্কল্প করিল ইহা ব্যাঘ্র, ইহা সঙ্কল্পাত্মক মনের কার্য্য—দ্বিতীয় জ্ঞান; পরে তৃতীয় অভিমানাত্মক জ্ঞান অর্থাৎ অহঙ্কার অভিমান করিল আমার দিকে আসিতেছে—ইহা তৃতীয় জ্ঞান; তৎপরে চতুর্থ অধ্যবসায়মূলক নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান অবধারণ করিল—আমি অপসৃত হই, নচেৎ আমাকে খাইয়া ফেলিবে। এই চারি প্রকার জ্ঞান, ইহারা বিদ্যুতের ন্যায় এত শীঘ্র শীঘ্র সম্পাদিত হয় যে, পরপর অবধারণ করা যায় না; শতপত্র-ভেদের তুল্য অর্থাৎ এক শত পদ্মপত্র একটা সূচিকা দ্বারা ভেদ করিলে মনে হয় যেন একবারে সমস্ত পত্রই ভেদ হইয়াছে, কিন্তু হইয়াছে পরপর।

মনের সঙ্কোচ ও বিস্তার সংস্কার-ধর্ম্ম। মন এক স্থানে থাকিয়াই মুহূর্ত্তমধ্যেই সর্ব্ববিশ্ব পরিভ্রমণ করিয়া আসিতে পারে, ইহা সংস্কার-ধর্ম্ম। মন প্রসারণশক্তি-বলে, সর্ব্ববিশ্বে ব্যাপিত হইতে পারে, আকুঞ্চনশক্তি-বলে পরমাণুতুল্য হইতে পারে, এই জন্য অনেকে মনকে বায়বীয় পরমাণুতুল্য বলিয়া থাকেন। বস্তুর স্মরণ অর্থাৎ ইহা সেই বস্তু বলিয়া অনুভব, ইহা সংস্কারধর্ম্ম; লজ্জা ও সংস্কারধর্ম্ম, কারণ লজ্জা দ্বারা মন আকুঞ্চিত হয়, মন নিরবয়ব ও নিত্য।

মন কেবল ভাবনা মাত্র। এই ভাবনা স্পন্দিত হইয়া বিহিত নিষিদ্ধ ক্রিয়ারূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে; ঐ ক্রিয়া দৃষ্টভাবে পরিণত হইলে যে ফল সমুদ্ভূত হয়, জীব তাহারই অনুগামী হইয়া থাকে এবং প্রারব্ধ কর্ম্মের অনুযায়ী দেহ আশ্রয় করে। মনই কর্ম্ম করে এবং স্বীয় কর্ম্মফল ভোগ করে; যাহা কিছু বিদ্যমান, সকলই মনের বিকাশ মাত্র। এই মনের বিকাশকেই কর্ম্মের বীজ বলে। এই জন্য মন ও কর্ম্মের কিছু মাত্র বিভিন্নতা নাই; মনের কর্ম্মশক্তি স্বভাবসিদ্ধ, অগ্নির উষ্ণতার ন্যায়। মনের স্পন্দনই কর্ম্ম। মনের দৃঢ়ত্বই কর্ম্মসিদ্ধির রূপ, কেননা পুরুষকার দ্বারা যে ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায়, মনের দৃঢ়ত্বই তাহার কারণ; দৃঢ়মনা ব্যক্তি পর্ব্বতও ভেদ করিতে পারে। অস্থিরচিত্ত ব্যক্তি সামান্য মৃণাল ভেদেও সমর্থ হয় না, মনে করিলে এক মুহূর্ত্তে যে কার্য্যে করা যায়, মনে না করিলে শত মুহূর্ত্তেও সেই কার্য্য সম্পন্ন হয় না। তিল মধ্যে তৈলের ন্যায়, মনের মধ্যেই সুখদুঃখ ধর্ম্মাধর্ম্ম অবস্থিত। মনের দোষেই দুঃখ, মনের গুণেই সুখ, মনের দোষেই শত্রু, মনের গুণেই মিত্র। মহর্ষি মাণ্ডব্য শূলে আরোপিত হইলেও কোনও ক্লেশ অনুভব করেন নাই কারণ তিনি মনকে পবিত্র, রাগহীন ও সন্তাপহীন করিয়াছিলেন। কলঙ্কিত মন হিতকে অহিত এবং মিত্রকে শত্রু বোধ করে।

মনের স্পন্দন হেতুই বহুবিধ ক্রিয়া প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। মন ও কর্ম্ম পরস্পর ধর্ম্ম ও কর্ম্ম শব্দে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কর্ম্ম মনের স্পন্দনাত্মক বিলাস সহ সম্মিলিত হইয়া মনরূপে পরিণত হয়। এই মন কর্ম্ম-সাহায্যে আপনার সঙ্কল্প শরীর বিবিধরূপে বিস্তৃত করিয়া এই সঙ্কল্প-সঙ্কুল মায়াময় জগৎকে বহুরূপে প্রকাশ করে। মনের কর্ম্ম-ভাবনাই সংসারে জীবকে নটের ন্যায় বিবিধ নাম ধারণ করায়। উহাই আমি, তুমি ও অন্যান্য বিবিধ নাম রূপাদি-স্বরূপ। মনই সঙ্কল্প দ্বারা পিতা হইতে পুত্ররূপে প্রাদুর্ভূত হয়। এই মনই কখন দেবতারূপে, কখন মনুষ্যরূপে, কখন পশুরূপে উদিত হইয়া উল্লসিত হইয়া থাকে; বাসনার অনুসরণ প্রসঙ্গে

আত্মাকে বহুরূপে বিস্তার করিয়া থাকে; মন কর্ম্মে আসক্ত হইলে বন্ধন হয়; কর্ম্ম পরিত্যাগে বা ভাবনা ত্যাগে মুক্ত হয়।

ভ্রান্তি-দর্শন মনের কার্য্য। রজ্জুতে সর্পভ্রম, চন্দ্রে অগ্নিশিখাভ্রম, জলাশয়ে মরীচিকা ভ্রম, দৃষ্টিদোষে দিকভ্রম, শুক্তিকাতে রজতভ্রম ইত্যাদি মনেরই কার্য্য; মনের মননই জগৎ। এই যে বাহ্য জগৎ পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বার দিয়া মানস-সমুদ্রে ভাসমান হইতেছে, ইহার মূলাধার চৈতন্য। মনের কল্পনা-বারির অভাব হইলে, বাহ্য জগৎ সমুদ্রগর্ভে বিলীন হইয়া যায়; সুতরাং মন ও জগৎ উভয়ই এক বস্তু। সত্য বিচার দ্বারা ভ্রান্তি দূর হইলে একের অভাবে উভয়েরই বিনাশ হইয়া থাকে, তখন কেবল অবশিষ্ট ব্রহ্মাই অবস্থিতি করেন। আমি জীবিত, জাত, মৃত—এই সকল মনেরই ভ্রান্ত কল্পনা; সুতরাং মন সংযত হইলে, সংসারভ্রান্তির নাশ হয়, ভ্রান্তিনাশে ব্রহ্মে স্থিতি অবশ্যম্ভাবী। মন স্থূল ভ্রান্তির বশীভূত হইলে জীব নামে অভিহিত ও তদ্বিহীন হইলে পরব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়।

মন স্বভাবতঃই চঞ্চল। একে তো চঞ্চল পদার্থ ধরিয়া রাখা কঠিন, তাহাতে কেবল চঞ্চল নহে, আবার পীড়নকারী, তাহার উপদ্রবে ইন্দ্রিয় ও শরীর পর্য্যন্ত ক্ষোভযুক্ত হইয়া থাকে; মনের যাহাতে আগ্রহ হইবে, সে তাহাই করিবে—উহা ভাল কাজই হউক, আর মন্দ কাজই হউক। ইহা ছাড়া ভয়ানক বলবান, সে এমনি বলবান যে, কেহই তাহাকে সে দিক হইতে ফিরাইতে পারে না; বিশেষতঃ আরও দৃঢ়, বিষয়বাসনারাশি দ্বারা দুর্ভেদ্য, তাহার সঙ্গে সঙ্গে জন্ম-জন্মান্তরের সংস্কাররাশি মনকে এত দৃঢ় করিয়া রাখিয়াছে যে, তাহাকে ছেদন বা মর্দ্দন করা অতিশয় কঠিন। যখন অত্যন্ত ঝড় বহিয়া যায়, তখন সেই প্রবল বায়ুকে ধরিয়া রাখা যেমন কঠিন, অব্যাহতগতি চঞ্চল মনকেও নিরুদ্ধ করা সেইরূপ দুষ্কর। ভালো-মন্দ সমস্ত কার্য্য মনের আবেগেই হইয়া থাকে।

মন হুতাশনের ন্যায় চিন্তারূপে শিখা ও ক্রোধরূপে ধূমজাল বিস্তার করিয়া শুষ্ক তৃণের ন্যায় জীবকে অহরহঃ দগ্ধ করিতেছে, এবং তৃষ্ণার সহিত মিলিত হইয়া জীবকে আকুল করিতেছে। মন অগ্নি অপেক্ষাও উষ্ণ, পর্ব্বত অপেক্ষাও দুরতিক্রম্য, বজ্র অপেক্ষাও দৃঢ়, বিদুৎ অপেক্ষাও চঞ্চল, এবং বায়ু অপেক্ষাও সদাগতি। মন স্থির থাকিলে সকলই স্থির থাকে, মন অস্থির হইলে সকলই অস্থির বলিয়া প্রতীয়মান হয়। মন সাগরের ন্যায় অতীব বিস্তীর্ণ, বিবিধ-জন্তু-সমাকীর্ণ। বিমল আত্মতত্বই জগতে বিদ্যমান, আর কিছুই নাই, এই প্রকার যখন বিচার করে, তখন বিদ্যা নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

মন বিবেকশক্তি ধারণ করে, যে শক্তি দ্বারা একপ্রকার অনুভূতিকে অন্যপ্রকার অনুভূতি হইতে ভিন্ন বলিয়া বুঝিতে পারে, অর্থাৎ যাহা দ্বারা আমাদের বিবেক প্রতিপত্তি হয়, মনের তাদৃশ শক্তিই বিবেকশক্তি। অঙ্গুলি দ্বারা পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিলে, স্পর্শকর্ত্তাকে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ না করিয়াও যে শক্তি দ্বারা আমরা স্পর্শকর্ত্তাকে বুঝিতে পারি, তাহাই বিবেকশক্তির কার্য্য।

ব্রহ্মা হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত শরীরিমাত্রেই দ্বিশরীর-বিশিষ্ট, তাহার মধ্যে মন এক শরীর। ইহা অতিমাত্র বেগশালী ও চঞ্চল। অন্য শরীর মাংসময়, ইহা অতি অকিঞ্চিৎকর, কারণ সকল প্রকার পীড়া দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে। এই মাংসদেহ ক্ষীণ, হীন, মূক ও ক্ষণভঙ্গুর, এই সকল কারণে অতিশয় হেয়। দ্বিতীয় শরীর মন এই প্রকার ক্ষণিক বা অসার ধর্মবিশিষ্ট নহে। ইহা আয়ত্ত হইয়াও আয়ত্ত নহে; এই মাংসময় শরীর ইহার আবরণ, কিন্তু এই আবরণে মন বদ্ধ নহে, কারণ ইহা এই মুহূর্ত্তেই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড বিচরণ করিয়া আসিতে পারে। কামরূপী হেতু হস্ত পদ না থাকিলেও যথায় ইচ্ছা তথায় যাইতে পারে, ইহার শক্তির সীমা নাই।

মনের সহিত আত্মার ও বাহ্য জগতের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। কোনও কারণবশতঃ কোন একটা শরীরে জীবনীশক্তির আবির্ভাব হইলে, সেই শরীরের সহিত আত্মা ও মনের যে সম্বন্ধ উপস্থিত হয়, সেই সম্বন্ধের ঘটক অবস্থার নামই জন্ম, এবং কোন কারণবশতঃ কোন একটি শরীরের জীবনীশক্তি বিচ্ছিন্ন হইলে, সেই শরীরের সহিত আত্মা ও মনের যে সম্বন্ধ ছিল তাহার নাশক অবস্থার নাম মৃত্যু।

যতক্ষণ পর্য্যন্ত তৈল ও তৈলের আধার, বৃত্তাকা ও অগ্নি, ইহাদের পরস্পর সংযোগ থাকে, ততক্ষণ তাহাকে প্রদীপ বলা যায়, সেইরূপ দেহাদির সহিত মনের সংযোগকে জন্ম বলা যায়, এবং বিয়োগকে মৃত্যু বলা যায়।

দীপের জ্যোতির দীপত্ব বা জ্বালা পরিণাম। জীবপক্ষে—তৈলস্থানীয় কর্ম্ম, বাসনারূপে তদধিষ্ঠানীয় মন, বর্ত্তিকাস্থানীয় দেহ, অগ্নিসংযোগ স্থানীয় চৈতন্য, দীপ স্থানীয় সংসার, দেহকৃত—দেহসংযোগ-নিবন্ধন এই ভব-সাগর। তৈল থাকিলেও প্রবল বাতাসে বর্ত্তিকা নির্ব্বাণ হয়, সেইরূপ আয়ু থাকিলেও মৃত্যু ঘটিতে পারে। বর্ত্তিকা নিবিয়া গেলেও তাহার অস্তিত্ব নষ্ট হয় না, বায়ুতে তাহার তেজ লীন থাকে, সেইরূপ দেহ ধ্বংস হইলেও আত্মা-সংযুক্ত মন দেহান্তর গ্রহণ করে। এই জন্ম ও মৃত্যু উভয়ই আত্মার উন্নতির জন্য। আত্মাতে জ্ঞানোৎপাদনের জন্যই শরীর। ওই শরীর যখন জ্ঞানোৎপাদনে অসমর্থ হয়, কর্ম্মে অক্ষম হয়, তখন আত্মার জ্ঞান উদ্বোধনার্থ নূতন শরীর হইয়া থাকে। ইহাই জন্ম-মৃত্যুর রহস্য।

মনের মানসিক বৃত্তি অস্থিরতা, ইহা এক বিষয়ে নিবিষ্ট থাকে না, সন্তুষ্ট থাকে না, ইহা করিব উহা করিব বলিয়া সর্ব্বদাই অস্থির থাকে, একটি ছাড়িয়া অন্য একটি, সেটি ছাড়িয়া অপর একটি গ্রহণ করিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়, বাহ্য বস্তুর আকাঙ্ক্ষায় অস্থির থাকার জন্যই অতিশয় চঞ্চলস্বভাব। মনের কামবৃত্তি যথা—কাম, ক্রোধ, লোভঃ ঈর্ষা, হিংসা, উপার্জ্জন, বিসর্জ্জন, আবার মোহবৃত্তি—ভ্রম, প্রমাদ, নিদ্রা, মোহ, সংশয়, ভয়, এবং সুখ, দুঃখ, শোক, হর্ষ, বিষাদ ইত্যাদি। মনের সহানুভূতিও বেশ আছে; যেমন—দয়া, প্রেম, স্নেহ, ভক্তি, অনুরাগ ক্ষমা ইত্যাদি। নিরোধবৃত্তি—শম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি, বৈরাগ্য ইত্যাদি।

প্রাণ, মন ও বুদ্ধির এক ভাব। যেমন—আমি প্রত্যহ পথ ভ্রমণে বাহির হই; পথের ধারে আম, জাম, লিচু, লেবু অনেক প্রকার গাছ আছে, প্রত্যহ যাতায়াত করিবার সময় ঐ গাছ কয়েকটা অবলোকন করি। প্রতিদিনের দর্শনের ফলে ওই গাছ কয়েকটা প্রাণে গাঁথা হইয়া গেল; দর্শনের দ্বার দিয়া প্রাণে চুপি চুপি প্রবেশ করিল, কখন কোন দিন কোন সময়ে প্রবেশ করিল, তাহা আমি জানিতে পারিলাম না। প্রতিদিনই সেই স্থানের আম গাছটা দেখিবামাত্র, জাম গাছটা মনে পড়ে, জাম গাছটা দেখিবামাত্র লিচু গাছটা মনে পড়ে, লিচু গাছটা দেখিবামাত্র লেবু গাছটার কথা মনে পড়ে। প্রাণে যাহা গাঁথা রহিয়াছে, মনে তাহার একাংশ চাক্ষুস দৃষ্টিযোগে ব্যক্ত হয় এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে পর-পরবর্ত্তী অংশের দর্শনাকাঙ্ক্ষা মনে ব্যক্ত হয়। যখন কোনও সংস্কার অন্তঃকরণে বদ্ধমূল হয়, তখন তাহা প্রাণের সঙ্গে মিশিয়া গিয়া লুকাইয়া অবস্থিতি করে। মনে কর, তোমার পুত্র বিদেশে আছে, আজ তোমার তাহাকে স্মরণ হইল, এখন মনে ভেবে দেখ দেখি, তোমার মনে হইল কোথা হইতে? অবশ্য তাহা প্রাণে গাঁথা রহিয়াছে, যাহা প্রাণে গাঁথা রহিয়াছে, তাহাই মনে দৃষ্ট হইল; তাহারই নাম স্মরণ। দৃষ্ট, অদৃষ্ট, শ্রুত, অশ্রুত, এ বিশ্বের সমস্ত পদার্থই প্রাণে গাঁথা রহিয়াছে, কোন প্রকার স্মারকের উত্তেজনায় নাড়াচাড়া পাইলেই তাহা স্মরণ হয় বা মনে পড়ে। আমি আম বাগান হইতে হঠাৎ মাঠের মধ্যে আসিয়া পড়িলাম, আসিয়া দেখি জমিতে কতকগুলি ধান গাছ। ধান গাছের সহিত আম গাছের বিভিন্নতা বিচার করা বুদ্ধির কার্য্য। ইহা দ্বারা বুঝা যায়, প্রাণ মন ও বুদ্ধি এক আধারমূলক, এক সঙ্গে গাঁথা রহিয়াছে, কেহ কাহাকে ছাড়িয়া নাই। এক চিৎসূত্রে অহঙ্কার, প্রাণ, মন ও বুদ্ধি গাঁথা রহিয়াছে।

চাওয়া তিন প্রকার। প্রথম প্রাণের চাওয়া, দ্বিতীয় মনের চাওয়া, তৃতীয় বুদ্ধির চাওয়া। প্রাণের চাওয়া ব্যাকুলতা, মনের চাওয়া অনুসন্ধান, বুদ্ধির চাওয়া অবধারণ। একটা মাঠের মধ্যে একজন পথিকের প্রাণ জলের জন্য ব্যাকুল হইল, ইহা প্রাণের চাওয়া; মন জলের অনুসন্ধানে দৌড়িল, ইহা মনের চাওয়া; জলের অনুসন্ধানে সম্মুখে মরীচিকা দেখিল; হিতাহিতবোধরহিত চঞ্চল মন বলিল ইহাই জল; বিজ্ঞ বিচক্ষণ বুদ্ধি বলিল, তুমি চঞ্চল বালকের মত, তোমার কিছুমাত্র হিতাহিতবোধ নাই, তুমি যাহাকে জল বলিতেছ, ইহা জল নয়, মরীচিকা। যদি তোমার একান্ত জলের প্রয়োজন হইয়া থাকে, তবে ঐ দূরে যে গাছটি দেখা যাইতেছে, তাহার নিকট যাও, ঐখানে জলাশয় পাইবে, কারণ ঐ গাছ হইতে কয়েকটা পাখী উড়িয়া

আসিয়াছে, তাহাদের পায়ে কাদা লাগিয়া রহিয়াছে, অতএব বুঝা যাইতেছে নিকটে জল আছে—ইহাই বুদ্ধির চাওয়া, ইহারই নাম অবধারণ। ইহা দ্বারা বেশ বুঝা যায় প্রাণ, মন, বুদ্ধি একাধারমূলক।

বুদ্ধি

যাহা নিশ্চল, ধীর, স্থির তাহাই বুদ্ধি। বহু বিচিত্র বিষয়ে বিক্ষিপ্ত হইয়াও স্থির থাকা বুদ্ধির ধর্ম্ম। যাহা চঞ্চল, অধীর অস্থির, তাহাই মন। অধ্যবসায় বুদ্ধির গুণ, সঙ্কল্প মনের গুণ। নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানের নাম অধ্যবসায়। কোনও একটা পদার্থ আছে, এই যে নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান অর্থাৎ আমি আছি, বস্তু আছে, এই যে আছে নিশ্চয়ভাব, তাহাই বুদ্ধি। জীবমাত্রেরই ইহা করিতে পারি, ইহা পরিতে পারিব, এইরূপ নিশ্চয় জ্ঞান হইলে বুদ্ধি উত্তেজিত হয়, পরে সে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। মনে কর, একজন লোক দূর হইতে একটা পশুকে দেখিয়া এইরূপ চিন্তা করিল যে, এটা পশু বটে তাহাতে আর সন্দেহ নাই; কিন্তু এটা কোন পশু, অশ্ব বা গো, স্থির হইল না! দর্শক এখানে সাধারণ পশুজ্ঞান হইতে কোনও একটা বিশেষ পশুজ্ঞানে অবতীর্ণ হইবার জন্য পন্থা অন্বেষণ করিতে লাগিল, ইহাতে কৃতকার্য্য হইলেও তাহার বুদ্ধি নিশ্চল হয় বা চরিতার্থ হয়, ইহাই বুদ্ধির ধর্ম্ম। যতক্ষণ নিশ্চয় না হইবে, ততক্ষণ সে কিছুতেই স্থির হইতে পারিবে না; কোন পশু স্থির হইলেই, সেই সময় হইতে সেও স্থির হইবে। ইহাই বুদ্ধির নিশ্চয়াত্মক ধর্ম্ম। যতক্ষণ নিশ্চয় না হয়, ততক্ষণ তাহার মনে কেবল ভাবনাই চলিতে থাকে যে, এটা কোন পশু; ইহা মনের ধর্ম্ম। বুদ্ধিবৃত্তি—ইষ্ট ও অনিষ্ট বৃত্তি-বিশেষের বিনাশ, উৎসাহ, চিত্তস্থৈর্য্য, প্রতিপত্তি, প্রমাণ, স্মৃতি, নিদ্রা, যুক্তি, বিবেকবিচার ও সিদ্ধান্ত।

বুদ্ধি তিন অবয়বে বিভক্ত—বিচার, বিবেচনা ও যুক্তি। এই তিন অবয়ব আবার দুই ভাগে বিভক্ত—শক্তি ও জ্ঞান। বিচারবুদ্ধির শক্তি প্রধান অঙ্গ এবং যুক্তি ও বিবেচনা-বুদ্ধির জ্ঞান প্রধান অঙ্গ। বিচারবুদ্ধির হাত-পা, বিবেচনা বুদ্ধির চক্ষু। যুক্তি, বিচার ও বিবেচনার মাঝখানে থাকিয়া, 'যেহেতু' ও 'অতএব'-র যোগ সাধন করে। লোকে প্রথম উদ্যমের বিচারকার্য্য সরাসরি মতে করিয়া ফেলে, বিবেচনাকে বড় একটা কর্ত্তৃত্ব ফলাইতে দেয় না। যেমন এক ব্যক্তিকে জমকালো পোষাক পরিধান করিতে দেখিয়া মনে করিলাম এই ব্যক্তি বড় ধনী, ইহা সরাসরি বিচার, বুদ্ধির বিবেচনা শক্তিকে খাটাইয়া দেখিলাম তাহা নয়, যুক্তি আসিয়া বলিল, ঐ পোষাক অপরের নিকট হইতে ধার করিয়া আনিয়াছে, অতএব এই ব্যক্তি ধনী নয়। এক ব্যক্তিকে শ্লোক উচ্চারণ করিতে দেখিয়া মনে করিলাম এই ব্যক্তি একজন মহা পণ্ডিত, কিন্তু বুদ্ধির বিবেচনাশক্তি খাটাইয়া দেখিলাম তাহা নয়, যুক্তি আসিয়া বলিল, উহার সমস্ত পুঁথিগত বিদ্যা, কারণ ঐ ব্যক্তি কোনও শ্লোকের অর্থ জানে না, কেবল পুস্তক দেখিয়া শ্লোক মুখস্থ করিয়াছে; অতএব সিদ্ধান্ত হইল ঐ ব্যক্তি পণ্ডিত নয়, যুক্তি এবং 'অতএব'র যোগ সাধন হইল।

কিছু স্বর্ণ হস্তে লইয়া তাহা কত দরের সোনা; ইহা বিচার শক্তির কার্য্য। ভাল সোনা কাহাকে বলে, সে তাহা জানে; ইহা বিবেচনার কার্য্য। কিরূপ ক্রেতাকে কিরূপ সোনা গছাইতে হইবে, ইহা ঠিক করা যুক্তির কার্য্য; যেহেতু এই ক্রেতা এই সোনার উপযুক্ত, অতএব সিদ্ধান্ত হইল, ইহাকে এই দরের সোনা দেওয়া যাক, 'যেহেতু' এবং 'অতএব' যোগ-সাধন যুক্তির কার্য্য করিল।

বুদ্ধি, বিষয় ও বিষয়ী এই উভয়ের সহিত সম্বন্ধ হয় বলিয়া, উভয়রূপেই ভাসমান থাকে। ঐ বুদ্ধি পুরুষ বা আত্মার দৃশ্য হইয়াও অর্থাৎ বুদ্ধি বিষয়াত্মক হইয়াও অবিষয়াত্মক রূপে, স্বয়ং দ্রষ্টা বা ভোক্তা ভাবে, অচেতন হইয়াও সচেতনের ন্যায় প্রতিভাত হয়, প্রতিবিম্বগ্রাহী স্ফটিকের ন্যায় সর্ব্বপদার্থের অবভাসক বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। বুদ্ধি আত্মার সমান আকার ধারণ করে বলিয়া অনেকে বুদ্ধিকে আত্মা বলিয়া থাকেন। বুদ্ধির সংসর্গেই বুদ্ধিগত সুখদুঃখাদি পুরুষে প্রতিবিম্বিত হয়; ঐ প্রতিবিম্বই পুরুষের সংসার।

সৎ, চিৎ, আনন্দ,—এই তিনে প্রভেদ নাই। শব্দভেদ আছে সত্য, কিন্তু অর্থভেদ নাই। সেইরূপ ব্রহ্মই প্রতিবিম্বভাবে বুদ্ধিরূপ উপাধিতে, তপ্তলৌহপ্রবিষ্ট বহ্নির ন্যায়, অনুপ্রবিষ্ট হইয়া অন্তঃকরণের জড়তা খর্ব্ব

করত সেই বুদ্ধিকে চেতনপ্রায় করেন। সেই বুদ্ধিই চৈতন্যাকার ধারণ করায় জ্ঞাতা ও ভোক্তা স্ফুলিঙ্গের ন্যায় সমুত্থিত অন্তঃকরণবৃত্তি উজ্জ্বলিত করায় জ্ঞান; প্রতিবিম্ব দ্বারা পদার্থাকার মনোবৃত্তির আকার ধারণ করায় জ্ঞেয় বা ভোগ্য। তিনিই জ্ঞানেন্দ্রিয় গ্রহণ করিয়া দ্রষ্টা, জ্ঞানেন্দ্রিয়জনিত মনোবৃত্তির ব্যাপ্ত হইয়া দর্শন, মনোবৃত্তির বিষয় ব্যাপ্তি দ্বারা সেই রূপ লাভ করায় দৃশ্য। কর্ম্মেন্দ্রিয় গ্রহণ করায় কর্ত্তা, ক্রিয়ানুযায়ী হওয়ায় ক্রিয়া। তিনিই এই প্রকারে সর্ব্বাত্মক।

পুরুষ, প্রকৃতির মিলনে অহংবুদ্ধি ধারণ করেন। একখণ্ড লৌহ যেমন অগ্নির সহিত গাঢ় সহবাস করিয়া অগ্নিতুল্য হয়, সেইরূপ পুরুষ, বুদ্ধির সহিত গাঢ় সহবাসে, বুদ্ধি ও পুরুষের মিলনে, অহংচৈতন্যাকার ধারণ করিয়া রাগ বা অনুরাগ নামক ক্লেশের উৎপত্তি করেন। চিৎস্বরূপ আত্মা, বুদ্ধিবৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত হন বলিয়া এইরূপ হয়।

সুখ, দুঃখ, মোহ, এই সমস্তই বুদ্ধির বিকার। অন্তঃকরণ ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়াকারে ও সুখ-দুঃখাদি আকারে পরিণত হইবামাত্র চিৎশক্তি দ্বারা প্রজ্বলিত হয়। এখানে প্রকৃতির মিলনে পুরুষ সুখ দুঃখভোক্তা বলিয়া পরিচিত হয়, ইহাই সংসারী জীবের দুঃখসমূহের মূল অর্থাৎ বুদ্ধির উপর পুরুষের বা আত্মার অভেদ ভ্রান্তি বা আত্মসম্পর্ক কল্পিত হইতেছে বলিয়াই পুরুষ সুখ-দুঃখাদি বিকারে বিকৃত হইতেছেন। সুতরাং বুদ্ধির সহিত পুরুষের তাদৃশ মিথ্যা সম্বন্ধ ঘটনা থাকাতেই পুরুষের ক্লেশময় ভোগ উপচারক্রমে উৎপন্ন হইতেছে। বুদ্ধিসত্বই বিবিধ আকারে বা সুখ দুঃখাদি আকারে পরিণত হইতেছে, আর পুরুষ তাহাতে প্রতিবিম্বিত হইতেছেন। চন্দ্র প্রতিবিম্বিত স্বচ্ছ জল যেমন চন্দ্রতুল্য বা চন্দ্রাকার প্রাপ্ত হয়, চৈতন্যপ্রতিবিম্বিত বুদ্ধিবৃত্তিও তেমনি চৈতন্যতুল্য বা চৈতন্যাকার প্রাপ্ত হয়। এতাদৃশ তুল্যাকার প্রাপ্ত হওয়ার নাম ভোগ।

রক্তবর্ণ জবা আর স্বচ্ছ স্ফটিক একত্র থাকিলে জবার রক্তবর্ণ স্ফটিকে আসিয়া লালবর্ণ দেখায়, কিন্তু স্ফটিক রক্তবর্ণ নহে; সেইরূপ আত্মচৈতন্য নিকটে থাকাতে চৈতন্য ছায়া বুদ্ধিতে পড়িল, বুদ্ধিও চৈতন্যাকার ধারণ করিল। বুদ্ধি চৈতন্যাকার ধারণ করিয়া, কর্ত্তা ভোক্তা হইয়া দাঁড়াইল সুখ-দুঃখ ভোগ করিতে লাগিল। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, আত্মা কর্ত্তা ভোক্তা কিছুই নহেন, তিনি সচ্চিদানন্দ পদার্থ। হিংসা দ্বেষাদি দ্বারা বুদ্ধিই মলিন হয়, আত্মা নির্লিপ্ত, নির্ম্মল, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্তস্বভাব। নির্ম্মল দর্পণ যেমন সকল বস্তুর প্রতিবিম্ব গ্রহণ করে, বুদ্ধিও সেইরূপ রজঃ ও তমঃ গুণের উপদ্রবশূন্য হইলে সমস্ত বস্তুই প্রকাশ করিতে পারে। উপদ্রবশূন্য অচঞ্চল দীপ যেমন ঠিক সমানাকারে প্রজ্বলিত হয়, রজঃ ও তমঃ গুণের উপদ্রবশূন্য নির্ম্মল চিত্তও তেমনি আত্মচৈতন্যের সন্নিধানে ঠিক সমানাকারে পরিণত হয়। নিত্যচৈতন্যস্বরূপ আত্মা, স্বচ্ছ স্বভাব চিত্তে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রতিবিম্বিত হন বলিয়াই অজ্ঞ লোকেরা অবিবেক বশতঃ চিত্তকে আত্মা বলিয়া প্রতিপন্ন করে। নিত্যচৈতন্য নামক পরমাত্মা চিত্তসত্বে প্রতিবিম্বিত হন, ইহাতে একটি সদর্থ লাভ হইতেছে। কোনও বস্তু কোনও স্বচ্ছ বস্তুতে তদাকারে দৃষ্ট হইলে সেই দৃশ্যটিকে লোকে প্রতিবিম্ব বলে; কেননা সেই দৃশ্যটি বিম্বের সদৃশ প্রতিচ্ছায়া, সুতরাং স্বতন্ত্র বস্তু নহে। নিত্যচৈতন্য আত্মা যে বুদ্ধিসত্বে প্রতিবিম্বিত হইতেছেন, সেই ছায়াটি ঠিক সেই নিত্য চৈতন্যের সদৃশ বা অনুরূপ। অতি ক্ষুদ্রতম আধারে অতিশয় নির্ম্মল এবং অত্যন্ত ব্যাপক পদার্থের প্রতিবিম্ব বা ছায়া জন্মিতে দেখা যায়। ইহার অধিক দৃষ্টান্ত দেখাইতে হইবে না; কারণ সকল ব্যক্তিই অপেক্ষাকৃত নির্ম্মল জলে বৃহত্তম সূর্য্য প্রতিবিম্ব দেখিয়াছেন এবং সেই সঙ্গেই নির্ম্মল সর্ব্বব্যাপক আকাশের প্রতিবিম্বও প্রত্যক্ষ করিয়াছেন; সূর্য্য প্রতিবিম্বিত জলাংশ যেমন অবিবেকীর দৃষ্টিতে সূর্য্যাকারে দৃষ্ট হয়, গণ্য হয় বা সূর্য্যপরিমিত বলিয়া বোধ হয়, আত্মা-প্রতিবিম্বিত বুদ্ধিসত্বও তেমনি অবিবেক-দশায় চেতন বলিয়া গ্রাহ্য হয়।

চিত্ত

শক্তি কার? শক্তিমানের। শক্তিমান কে? চিৎ। বিশ্বের সমস্ত পদার্থ যখন জড় দেখা যাইতেছে, তখন শক্তিও জড়। জগতে দুইটি পদার্থ অনুভূত হয়—এক চিৎ আর জড়। হয় জড় চৈতন্যাশ্রিত, না হয় চৈতন্য জড়াশ্রিত, হয় চিৎ জড়ের উৎস, না হয় জড় চিতের উৎস, একটা বলিতেই হইবে। যাহা জড় বলিয়া অনুমান করি, তাহা স্থূলরূপে দৃশ্য জড়, সূক্ষ্মরূপে অবশ্যই শক্তিস্বরূপ।

এই জগৎ চিৎ ও শক্তির বিকাশ। উভয়েরই বিভু, ওতপ্রোত ভাবে গ্রথিত রহিয়াছে। চিৎ-বক্ষে চিন্ময়ীর ক্রিয়াই এই বিশ্ব। চিৎ শক্তি ছাড়া নাই, শক্তিও চিৎ ছাড়া নাই, যেখানে শক্তি সেইখানেই চিৎ, যেখানে চিৎ সেইখানেই শক্তি, কেহ কাহাকে ছাড়িতে পারে না, যেমন অগ্নির দাহিকা শক্তি; অগ্নি আছে দাহিকা নাই বা দাহিকা আছে অগ্নি নাই, এরূপ হয় না। আবার অগ্নির দাহিকা শক্তি অগ্নি হইতে পৃথক কোনও তত্ব নহে, অথচ স্বয়ং অগ্নিও নহে; সেইরূপ চিতের শক্তি, চিৎ হইতে পৃথক কোন তত্ব নহে; অথচ স্বয়ং চিৎও নহে; ইহারই নাম অচিন্ত্য ভেদাভেদ। চিৎ ও শক্তি পরস্পর একাত্মা, একমন, একপ্রাণ। কোন কোন পদার্থের চৈতন্যের প্রকাশ বেশী, কোন কোন পদার্থের শক্তির প্রকাশ বেশী; সেখানে শক্তি বলিয়া উল্লেখ করা হয়, সেখানেও চৈতন্যের যোগ আছে, যেখানে চৈতন্য বলিয়া উল্লেখ করা হয়, সেখানেও শক্তির যোগ আছে বলিয়া মনে করিতে হইবে। যখন চিৎ হইতে শক্তিকে পৃথক বলিয়া মনে করি, তখন চিৎ জ্ঞাতা, চিন্ময়ী জ্ঞেয়, চিৎ ভোক্তা, চিন্ময়ী ভোগ্যা; অর্থাৎ শিব শক্তি, রাধা কৃষ্ণ, লক্ষ্মী জনার্দ্দন ইত্যাদি। চিৎ স্বানুভবপ্রসিদ্ধ।

চিৎ আছে কি না, তাহার প্রমাণ বেশ আছে। তাহার প্রমাণ আমি; আমি ছাড়া জীব নাই, যাহার আমি আছে তাহারই চেতন আছে, যাহার চেতন আছে তাহারই আমি আছে—সেই আমিই চিৎ। আমাদের স্ব স্ব আত্মা আছে, ইহা পরম সত্য। সেই জন্য আমি আছি, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। যদি কোন ব্যক্তি বলে আমি নাই, সে যদি বাস্তবিকই না থাকে,. তবে আমি নাই, এ কথা বলিতেছে কে? সুতরাং চিৎ আছে। আমি চিন্তা করি, এই হেতু আমি আছি। চিন্তা আত্মার স্বীয় গুণ, এই হেতু চিন্তা দ্বারা আত্মার বা চিতের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়।

বিশ্বের এমন একটা অবস্থা আসিবে, যখন ইহার কিছুই থাকিবে না, কেবলমাত্র জ্ঞান ও চিৎ বিরাজমান থাকিবে। আমরা বিশ্বে যাহা কিছু পদার্থ অনুভব করি, সকলেরই মূল এই তিনের একাধার অর্থাৎ তাহাই বিশ্বমূল বা বিশ্ববীজ। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের পার্থক্য-অনুভব পদার্থই জ্ঞান। যে শক্তি দ্বারা জ্ঞাতার সহিত জ্ঞেয় বস্তুর সংযোগ হয়, তাহার নাম জ্ঞানশক্তি।

জ্ঞান স্বপ্রকাশ। জ্ঞান প্রকাশ-স্বভাব হেতু বিবিধ বাহ্য বস্তুর গ্রাহক বা প্রকাশক; সেই জন্যই বস্তু সকল জ্ঞানের দ্বারা প্রকাশিত হয়। জ্ঞান ভিন্ন অন্য কোনও বস্তু প্রকাশ-স্বভাব নহে। একই জ্ঞান বুদ্ধিরূপ উপাধি দ্বারা ভ্রান্ত ও নানা প্রকার কল্পিত হইয়া থাকে। একই জল নানা বস্তুতে প্রতিবিম্বিত হইয়া নানা প্রকার প্রতিবিম্ব উৎপাদন করিলেও, জল যেমন নানা প্রকার হয় না, জল সেই একই জল থাকে, সেই প্রকার একই জ্ঞান নানা বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া, নানারূপে প্রতিভাত হইলেও জ্ঞানরূপে একই ভাবে থাকে।

বুদ্ধি কাল বা আধার-জ্ঞানের জননী নহে। কিন্তু আধার ও কালের ভাব-বোধ আমাদিগের আত্মগত বিজ্ঞানশক্তির সামর্থ্যে বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া স্বতঃসিদ্ধভাবে জ্ঞানরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। জ্ঞানমাত্রেরই মূলে 'বিবেক' নামক পদার্থ আছে। বিবেক অর্থাৎ ভেদজ্ঞান। সকল জ্ঞানেরই মূলে এই ভেদজ্ঞান দেখিতে পাওয়া যায়; ভেদজ্ঞান না থাকিলে জ্ঞানের সম্যক উপলব্ধি হইত না। এক বস্তু হইতে অন্য বস্তুর পার্থক্য-অনুভবই জ্ঞান। জগতে যদি এক প্রকার পদার্থই থাকিত, তাহা হইলে জ্ঞানের আবশ্যক হইত না। এক পদার্থকে অন্য পদার্থ হইতে, বৃক্ষ হইতে পশুকে ভিন্ন বলিয়া অনুভব করাই জ্ঞানের কার্য্য।

যদি একপ্রকার পদার্থ হইত, বৃক্ষাদি না পাইয়া পশুই যদি জগৎময় হইত, তাহা হইলে চিন্তাশক্তির বিভিন্নতার আবশ্যক হইত না। বিনা চিন্তায় জ্ঞানের উৎকর্ষ হইত না। জ্ঞানের বিভিন্নতাই জগৎকে এত উন্নতিশীল করিয়াছে। নিত্য নূতন চিন্তা, নিত্য নূতন জ্ঞান আবিষ্কৃত হইতেছে। যদি সংসারে এক ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু না থাকিত, তাহা হইলে জ্ঞানই অসম্ভব হইত।

অগ্নি ও দাহিকা শক্তিতে যেমন অভেদ, চৈতন্য ও জ্ঞানে সেই প্রকার অভেদ; সুতরাং চিৎও যাহা, জ্ঞানও তাহা, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। জগতে যেখানে যাহা আবশ্যক, অন্তর্নিহিত জ্ঞানের দ্বারা তাহাই সমুৎপন্ন হইতেছে। সমস্ত বিশ্বে আকর্ষণ-বিকর্ষণ কার্য্য চলিতেছে। কি চেতন, কি অচেতন, সকলেতেই আকর্ষণ বিকর্ষণ ক্রিয়া নির্ব্বাহ হইতেছে। চেতন পদার্থ ভালবাসা ও স্নেহ-মমতা দ্বারা অন্য চেতন পদার্থকে আকর্ষণ করিতেছে; হিংসা ঘৃণা দ্বারা বিকর্ষণ করিতেছে। জড়েতেও তাহাই জড়ও এক পদার্থকে আকর্ষণ করিতেছে, অন্য পদার্থকে ত্যাগ করিতেছে; পৃথিবী পার্থিব পরমাণুকে আকর্ষণ করে, জলজলীয় পরমাণুকে আকর্ষণ করে, কিন্তু তৈজস পরমাণুকে ত্যাগ করে। পৃথিবী গাছ হইতে আমকে আকর্ষণ করিতেছে, সেইজন্য তাহার অধোগতি সূর্য্য অগ্নিকে আকর্ষণ করিতেছে, সেইজন্য তাহার উর্দ্ধগতি। ত্যাগ, গ্রহণ, আকর্ষণ, বিকর্ষণ—ক্রিয়ার রূপ। কি ত্যাজ্য, কি গ্রাহ্য, তাহা না জানিলে, কাহাকে আকর্ষণ, কাহাকে বিকর্ষণ করিতে হইবে, তাহা নিশ্চিত না হইলে, ত্যাগ গ্রহণ বা আকর্ষণ-বিকর্ষণমূলক কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। ভৌতিক পদার্থ সমূহ যখন আকর্ষণ-বিকর্ষণ করে, তখন ইহাদের রাগ ও দ্বেষ আছে বলিতে হইবে। রাগ দ্বেষের অনুভব জড়ের ধর্ম্ম নয়, বাস্তবিক তাহা জ্ঞানেরই ধর্ম্ম; সুতরাং বলিতে হইবে জড়েরও জ্ঞান আছে। অতএব বুঝিতে পারা যাইতেছে, প্রকৃতি অজ্ঞানা নয়, বস্তুতঃ সজ্ঞানা, জড়া নয়, চেতনা; সুতরাং বিশ্ব জ্ঞানময়; যে কারণে জ্ঞানময়, সেই কারণে চিন্ময়।

একমাত্র যে জ্ঞান, তিনিই আত্মা এবং পরম প্রীতির আস্পদ হেতু তিনিই পরমানন্দ। জ্ঞান ও চৈতন্যের সত্তা বশতঃ জ্ঞ নামক চেতন পদার্থের অনুমান সিদ্ধ হয়; তাহা যে কেবল অনুমান সাপেক্ষ তাহা নহে, প্রত্যেক জ্ঞানের ক্রিয়াতে জ্ঞ নামক পদার্থকে সাক্ষাৎকার করিতেছি। বৈদান্তিকেরা তাহাকে আত্মা বলেন, সাংখ্যেরা তাহাকে জ্ঞ বা পুরুষ বলেন। আত্মা চর্ম্মচক্ষুর অগোচর, মনের অগম্য।

যখন 'আমি' ব্যবহারের স্থিরতা নাই, তখন স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে মানুষ আপনাকে চিনে না, চিনিলে ওইরূপ হইত না। অজ্ঞানই উহার কারণ। অজ্ঞানের মোহে, বুদ্ধির প্রলোভনে, প্রকৃতির আলিঙ্গনে মুগ্ধ হইয়া সর্ব্বজ্ঞ অজ্ঞ হন, ছিদ্রহীন হইয়া ছিদ্রবানের ন্যায়, দেহশূন্য হইয়া দেহবানের ন্যায়, অমর হইয়া মৃত্যুগ্রস্তের ন্যায়, নির্ব্বিকার হইয়া বিকারীর ন্যায়, পূর্ণ হইয়া অংশীর ন্যায়, অচল হইয়া সচলের ন্যায়, জন্মহীন হইয়া জন্মবানের ন্যায়, অমৃত হইয়া মৃতের ন্যায়, নির্ভীক হইয়া ভীতের ন্যায়, অক্ষর হইয়া ক্ষরের ন্যায়, কালাধীন না হইয়াও কালাধীনের ন্যায়, শুদ্ধ হইয়া অশুদ্ধের ন্যায়, নির্গুণ হইয়া সগুণের ন্যায়, শিব হইয়া জীবের ন্যায় সংসারে বিচরণ করেন।

জীবাত্মা ও পরমাত্মার বিভিন্নতা। পরমাত্মাতে সকল ভাবাত্মক লক্ষণই বিদ্যমান আছে, সুতরাং জ্ঞাতৃত্ব ও জ্ঞেয়ত্ব যাহা আত্মাতে আছে, তাহা পরমাত্মাতেও আছে, পরমাত্মাতে মঙ্গল ভাবের একটুও অভাব নাই, কিন্তু অমঙ্গল ভাবের সম্পূর্ণ অভাব আছে, জ্ঞানের একটুও অভাব নাই, অজ্ঞানের সম্পূর্ণ অভাব আছে; স্বাধীনতার একটুও অভাব নাই, পরাধীনতার সম্পূর্ণ অভাব আছে; ন্যায়ের একটুও অভাব নাই, অন্যায়ের সম্পূর্ণ অভাব আছে; সর্ব্বশক্তির একটুও অভাব নাই, অশক্তির সম্পূর্ণ অভাব আছে, এইরূপ পরমাত্মাতে ভাবের অভাব নাই, বরঞ্চ অভাবেরই অভাব আছে।

চিৎশক্তি ও প্রকৃতির একভাব। চিতের সহিত শক্তির বিভিন্নতা নাই, যেমন চিনির সহিত মিষ্টতার বিভিন্নতা নাই, চিনিময় মিষ্টতা, মিষ্টতাময় চিনি; সেইরূপ চিৎময় শক্তি, শক্তিময় চিৎ, আবার শক্তিময় প্রকৃতি, প্রকৃতিময় শক্তি। যে কোনও পদার্থ হউক বিনা আশ্রয়ে থাকে না; শক্তিও কোনও পদার্থ, সুতরাং তাহারও কোনও আশ্রয় আছে; তাহার যাহা আশ্রয়, তাহাই চিৎ। যেমন অগ্নির দাহিকা শক্তি, অগ্নিবক্ষেই আপন

আসন নির্দ্দেশ করে, সেইরূপ চিন্ময়ী শক্তিও চিৎবক্ষে আপন আসন নির্দ্দেশ করে। আশ্রয়ী হইতে আশ্রয় সূক্ষ্ম, যেমন সূক্ষ্ম বটবীজ, স্থূল বটবৃক্ষের আশ্রয়। চিৎ আশ্রয়, শক্তি আশ্রয়ী, আবার শক্তি আশ্রয়ী, প্রকৃতি আশ্রয়ী। মনে করো দুগ্ধ, নবনীত ও ঘৃত। দুগ্ধময় ননী, ননীময় ঘৃত, ঘৃতময় ননী, ননীময় দুগ্ধ। দুগ্ধের সূক্ষ্মাবস্থা ননী, ননীর সূক্ষ্মাবস্থা ঘৃত; ঘৃতের স্থূলাবস্থা ননী, ননীর স্থূলাবস্থা দুগ্ধ। দুগ্ধকে মথিত করিলে তাহার সূক্ষ্মাবস্থা ননী বাহির হয়, ননী মথিত করিলে তাহার সূক্ষ্মাবস্থা ঘৃত বাহির হয়। কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। এক্ষণে চিৎ, শক্তি ও প্রকৃতিকে ঘৃত, ননী ও দুগ্ধস্থানীয় মনে কর। যাহা স্থূল তাহা প্রকৃতি, প্রকৃতির সূক্ষ্মাবস্থা শক্তি, শক্তির সূক্ষ্মাবস্থা চিৎ; অথবা চিতের স্থূলাবস্থা শক্তি, শক্তির স্থূল বিকাশ প্রকৃতি। ক্ষিতি একটি প্রকৃতি, গন্ধ তাহার শক্তি, ক্ষিতিময় গন্ধ, গন্ধময় ক্ষিতি। ক্ষিতিতে এমন একটুও অংশ পাইবে না যাহাতে গন্ধ নাই, কারণ সূক্ষ্ম গন্ধসমষ্টির স্থূল বিকাশই ক্ষিতি। চিৎ ও শক্তি প্রত্যক্ষসাধ্য নয়, তাহা অনুভবগম্য। ক্ষিতি হইতে গন্ধ উঠাইয়া লইলে, ক্ষিতির অস্তিত্ব থাকে না; এই প্রকার অপ-তেজাদি অনুমান করিবে।

চিন্ময় বিশ্ব। নাভিস্থান তাহার কেন্দ্র। কেন্দ্রই সকল পদার্থের মূল, শক্তি বা বীজ। যাহা কেন্দ্রে নাই, তাহা বিস্তারেও নাই। পদার্থ মাত্রেরই শক্তি আছে। প্রকৃতির যাহা কেন্দ্র তাহাই তাহার শক্তি বা তাহাই তাহার বীজ অর্থাৎ চিৎ।

প্রকৃতিকে যত সূক্ষ্মাংশে বিভাগ কর, প্রত্যেক বিভাগেই কেন্দ্র থাকিবে এবং প্রত্যেক কেন্দ্রেই চিৎ ও শক্তি যুগলরূপে বিরাজিত; চিন্ময় বিশ্বে চিৎ ছাড়া কিছুই নাই। চিৎকে সকল ভূতের সনাতন বীজ বলিয়া জানিবে। বৃক্ষের বীজ অঙ্কুর উৎপন্ন করিয়া নষ্ট হয়, কিন্তু চিৎ-বীজ বিশ্বাঙ্কুর উৎপাদন করিয়া নষ্ট হয় না বলিয়া সনাতন বীজ। এই বীজ হইতে স্ফুরিত ব্রহ্মাণ্ড-বৃক্ষই কালে বিনষ্ট হয়, কিন্তু বীজ-ভূত ভগবান স্বরূপ অবস্থাতেই থাকেন; তাহাতেই বেশ বুঝা যায় যে, চিৎ সনাতন বীজ, ইনিই সর্ব্বমূল, সর্ব্বব্যাপী, ইঁহা ছাড়া কিছুই নাই।

তত্বসার

বিক্ষেপ কার? পূর্ণতা নাই যার। যেমন অপূর্ণ কলসীর জল নড়ে, কিন্তু কলসী পূর্ণ থাকিলে নড়ে না অর্থাৎ বিক্ষিপ্ত হয় না। যাঁহার জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ, যিনি পূর্ণ-প্রাজ্ঞ, তাঁহার চঞ্চলতা হইবে কেন? শক্তির রজোগুণ হইতে বিক্ষেপ উপস্থিত হয়; শক্তি যাহার বশ, রজোগুণ যাহার কাছে দমিত, সুতরাং সে শমিত, সেই জন্য বিক্ষেপরহিত, পূর্ণজ্ঞানী, পূর্ণপ্রাজ্ঞ।

জ্ঞান হইতে শ্রেষ্ঠ জগৎ-কারণ আর কেহই নাই। জ্ঞান হইতে কোনও পদার্থই পরমার্থতঃ সত্য বা স্বতন্ত্র নহে। মণিসমূহ যেমন সূত্রে গ্রথিত থাকে, সেইরূপ নিখিল বিশ্ব সংসার জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। এক চিৎই প্রকৃতিযোগে জগদুৎপত্তি ও বিনাশের হেতুভূত হইয়া, তিনিই মায়িক জগতে মায়া-লীলা করিয়া থাকেন। যাহা কিছু দৃষ্ট হইতেছে, সমস্তই তিনি ভিন্ন আর কিছু নহে। যেখানে দেখ সেইখানেই, ও যাহা দেখ তাহাই ভগবৎসত্তা ভিন্ন আর কিছুই নাই। রসই জলের মূলতত্ব, রসই জলের সার, ভগবান বলেন উহা আমিই। চন্দ্র-সূর্য্যের প্রভা, বেদের প্রণব, আকাশের শব্দ, পৃথিবীর পুণ্য গন্ধ, অগ্নির তেজ প্রভৃতি সমস্তই ভগবানের সত্তা।

প্রকৃতি ও পুরুষকে আমরা একটি আশ্চর্য্য সম্বন্ধসূত্রে জড়িত দেখিতে পাই, তাহারই ফল ব্যক্ত সংসার। পুরুষের যে জ্ঞান, তাহা প্রায় সম্পূর্ণ প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধজনিত। এই জ্ঞানের ফলে সুখ ও দুঃখের উৎপত্তি, ওই সম্বন্ধের ফলে আত্মায় ইচ্ছাশক্তির বিকাশ। ইচ্ছার বিকাশে কার্য্যে প্রবৃত্তি, ওই কার্য্য প্রবৃত্তি দ্বারা প্রকৃতিকে চালিত হইতে দেখা যায়। উভয়েরই উভয়ের উপর ক্রিয়া উৎপাদন করিতেছে। জ্ঞান পদার্থ কখনও নিষ্ক্রিয় থাকিতে পারে না; জ্ঞান কোন না কোন চিন্তা, কোন না কোন অনুভূতি-কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিবেই।

প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ ও অসংযোগে যে কিছু পার্থক্য আছে, তাহা বোধ হয় অল্প অনুমানেই বুঝা যায়। একটা পদার্থের সহিত অন্য একটা পদার্থের যোগ হইলে, অযোগ-অবস্থার সহিত কিছু না কিছু, কোনও না কোনও বিষয়ে, কোনও না কোনও গুণে পার্থক্য হইবেই। আত্মা যখন একা ছিলেন, প্রকৃতি-মুক্ত ছিলেন, তখন তাঁহার বিশুদ্ধ জ্ঞান, তখন তাঁহার বিশুদ্ধ চৈতন্যে, তখনকার অবস্থা পূর্ণ জ্ঞান। যখন অজ্ঞান প্রকৃতির সংযোগ হইল, অবশ্যই তখন তাঁহার বিশুদ্ধ জ্ঞান কিছু মলিন হইল, কিছু বিকৃত হইল; যখন অচৈতন্য প্রকৃতির যোগ হইল; অবশ্যই শুদ্ধ চৈতন্য কিছু অশুদ্ধ হইল; সেই যে আদি বিকৃত অশুদ্ধ জ্ঞান, তাহা একখানি দর্পণের স্বরূপ। দর্পণে যেমন বস্তু প্রতিবিম্বিত হয়, সেইরূপ জ্ঞানেও বিশ্ব প্রতিবিম্বিত হয়।

যে জ্ঞানে আবরণ-বিক্ষেপাদি রহিয়াছে, তাহা অপূর্ণ জ্ঞান। আর যে জ্ঞানে আবরণ-বিক্ষেপাদি নাই, তাহাই পূর্ণ জ্ঞান। সেই পূর্ণ জ্ঞান যাহাতে আছে, তিনি মহাপ্রাজ্ঞ। জ্ঞান আবৃত হয় কিসের দ্বারা? মোহের দ্বারা। কেন মোহের আক্রমণ? শক্তিচ্যুত বলিয়া। কেন শক্তিচ্যুত? বীর্য্যচ্যুত বলিয়া। এই কারণে সে হীনশক্তি হইয়াছে, সুতরাং মোহশক্তি তাহাকে আবরণ করিয়া ফেলিয়াছে, অভিভূত করিয়াছে। আর যিনি বীর্য্যচ্যুত হন নাই, তিনি শক্তিহীনও হন নাই, পূর্ণ শক্তিমানই রহিয়াছেন; সুতরাং সেই শক্তি তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারে নাই, পূর্ণ প্রাজ্ঞই রহিয়াছেন।

ঐশ্বর্য্য—অণিমা, লঘিমা, মহিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, ঈশিত্ব, বশিত্ব, কামাবসায়িতা, এই অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য বা শক্তি। যাহা ঐশ্বর্য্য তাহাই শক্তি, যাহা শক্তি তাহাই ঐশ্বর্য্য। ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী শক্তি। শক্তি আয়ত্ত যার, ঐশ্বর্য্য আয়ত্ত তার। যে যেরূপ শক্তিশালী, সে সেইরূপ ঐশ্বর্য্যবান। যাতে শক্তি পূর্ণ, তাতে ঐশ্বর্য্য পূর্ণ, যাতে শক্তি অপূর্ণ, তাতে ঐশ্বর্য্যও অপূর্ণ।

বিশ্ব একটি যুদ্ধক্ষেত্র। ইহার যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই দেখি যুদ্ধ। আব্রহ্ম পিপীলিকা সকলেই যোদ্ধা—পরস্পর সকলেই যুদ্ধে ব্যাপৃত। রাজায় রাজায় যুদ্ধ, প্রজায় প্রজায় যুদ্ধ, রাজা প্রজায় যুদ্ধ, দেব

দৈত্যে যুদ্ধ, পশুতে পশুতে যুদ্ধ, নর বানরে যুদ্ধ, নরে পশুতে যুদ্ধ, পক্ষীতে পক্ষীতে যুদ্ধ, সকলেই যুদ্ধ লইয়া ব্যস্ত। মাতৃগর্ভে প্রবেশ হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত কোনও প্রাণীরই এক মুহূর্ত্তের জন্যও যুদ্ধে বিরাম বিশ্রাম নাই। মাতৃগর্ভে যেই প্রবেশ করিল, অমনি কৃমিকীটে আসিয়া দংশন করিতে লাগিল। সেই কামড় তোমাকে সহ্য করিতে হইল, অথবা হাত-পা ছুঁড়িয়া তাহা তাড়াইলে; এই প্রকার অনবরত যুদ্ধে গর্ভবাস কাটাইলে। তাহার পর ভূমিষ্ঠ হইলে। ভূমিষ্ঠ হইয়াও যুদ্ধ আরম্ভ হইল। যেই ভূমিষ্ঠ হইলে, অমনি প্রাকৃতিক শক্তি ক্ষুধা-তৃষ্ণা আসিয়া আক্রমণ করিল, ক্ষুধা-তৃষ্ণার তাড়নে তুমি কাঁদিয়া আকুল, যুদ্ধে পারিলে না—হারিয়া গেলে, মায়ের শরণ নিলে। কখনও কখনও মশা, মাছি, পিপীলিকা আক্রমণ করিয়া কত যাতনা দিয়া থাকে, সকলই সহ্য করিতে হয়। এই প্রকারে বাল্য গেল, যৌবন আসিল; এই কালে কাম, ক্রোধ, অভিমানাদির আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হইতে লাগিলে, জীবন সংগ্রাম দুর্ব্বিষহ হইয়া উঠিল, হংসপুচ্ছ সহিত মসীযুদ্ধ আরম্ভ হইল, অর্থাৎ লেখাপড়া শিখিতে আরম্ভ করিলে। অনেক কষ্ট স্বীকার করিয়া অদৃষ্ট-অনুযায়ী বিদ্যা শিক্ষা হইল। তাহার পর অর্থলালসা বড়ই প্রবল হইয়া উঠিল, নানা উপায়ে অর্থ উপার্জ্জন করিতে কতই যুদ্ধ করিতে হইল। কাহাকেও বা কোনও অজ্ঞাত প্রদেশে যাইয়া বর্ম্ম ধারণ করিয়া যুদ্ধার্থ ধাবিত হইতে হইল; এই ভাবে যৌবন কাটিল। আসিল বার্দ্ধক্য; বৃদ্ধাবস্থায় শক্তির হ্রাস হেতু ব্যাধি জরা আক্রমণ করিল, সেই আক্রমণ নিবারণ করিতে পারিলে না—যুদ্ধে হারিলে, অমনি মৃত্যু আসিয়া হাত ধরিল; তুমি যাইবে না, সে-ও ছাড়িবে না, অবশেষে তোমাকে হার মানিয়া তাহার সহিত যাইতে হইল; এখন বল দেখি, কোন মুহূর্ত্তে তোমার যুদ্ধের বিরাম ছিল? শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, বাত, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কাম, ক্রোধ প্রভৃতির সহিত অনবরত যুদ্ধ চলিতেছে। কখনও তুমি হারিতেছ, সে জিতিতেছে; কখনও সে হারিতেছে, তুমি জিতিতেছ। জীবনসংগ্রামে কত জনকে পরাজয় করিয়াছ, কত জনের কাছে পরাজিত হইয়াছ, তাহার ইয়ত্তা নাই। আব্রহ্ম কীট সকলেরই এই দশা। বিশ্ব-রণভূমে প্রাণী মাত্রেই যোদ্ধা।

জগৎ দুই ভাগে বিভক্ত;—এক অন্তর্জগৎ, আর এক বহির্জগৎ। যোদ্ধাও দুই ভাগে বিভক্ত;—এক অন্তর্যোদ্ধা, আর এক বহির্যোদ্ধা। অন্তর্জগতের যোদ্ধা শুক, নারদ, সনক, গৌতম, বশিষ্ঠদেব প্রভৃতি। ইঁহারা কাম-ক্রোধাদির সহিত সর্ব্বদাই যুদ্ধ করিয়াছেন, কখনও জয়ী হইয়াছেন, কখনও বিজয়ী হইয়াছেন। বহির্যোদ্ধা দেব দৈত্য প্রভৃতি। ইঁহারাও কখনও জয়ী, কখনও বিজয়ী হইয়াছেন। হরি হর বিরিঞ্চি প্রভৃতি যাঁহারা আদি শক্তিমান, যাঁহাদিগকে আমরা অজেয় মনে করি, তাঁহারাও দৈত্যযুদ্ধে কতবার হারিয়া পলায়ন করিয়াছেন, তাহার ঠিক নাই। ইহাতে বেশ জানা যায় যে, সংসার-রণভূমে কেহই অজেয় নাই, শক্তি কর্ত্তৃক সকলেই পরাভূত। তবে কি শক্তি কর্ত্তৃক অজেয় কোনও শক্তি নাই? বিশ্বে কি এমন কোনও শক্তি নাই, যে শক্তি শক্তিকে জয় করিয়াছে?

শ্রমাদি-গ্লানিযুক্ত যিনি, তিনিই পরাভবনীয়। দুই শক্তির মধ্যে যে পক্ষ শ্রমে কাতর হইবে, সে পক্ষই ক্লান্তিরহিতের সহিত পরাজিত হইবে। গ্লানিরহিত যিনি, তিনি অনবরত অনন্তকাল শক্তি প্রয়োগ করিতে পারিবেন। যিনি খেদান্বিত, তিনি অনবরত শক্তি চালনা করিতে পারিবেন না এবং সেই শক্তি ধারণেও সমর্থ হইবেন না। শ্রমহীনের নিকট শ্রমান্বিতকে পরাজয় স্বীকার করিতেই হইবে। শ্রমরহিত যিনি, তিনিই বিজয়ী; শ্রমান্বিত যিনি তিনিই জয়ী। যিনি বিচলিত হন না, তিনিই জয়ী। ক্ষুধা, তৃষ্ণা থাকিলেই শক্তির হ্রাস অনুমেয়। কার্য্যে শ্রম হেতু, শক্তিহ্রাস-কালে, ক্ষুধা, তৃষ্ণায় বিচলিত করে। কার্য্যে শ্রমরহিতের শক্তিহ্রাসরূপ কারণ নাই, ক্ষুধারূপ কার্য্য নাই, সুতরাং অবিচলিত, সেইজন্য জয়ী।

যিনি দেহভেদ-দাহাক্রান্ত, তিনি বিজয়ী। অস্ত্রে-শস্ত্রে যাঁহার দেহভেদ করে, যাঁহাকে অগ্নিতে দাহ করে, বায়ুতে শোষণ করে, তিনি জয়ী হইতে পারেন না, তাঁহাকে অবশ্যই পরাজয় স্বীকার করিতে হইবে। যিনি দেহভেদ-দাহের অতীত, অস্ত্র-শস্ত্রের অনধীন, তাঁহাকে পরাজয় স্বীকার করিতে হয় না, সেইজন্য তিনি জয়ী।

ক্ষুধাতৃষ্ণা কার? শক্তি হ্রাস যার। কোন পদার্থের নাম ক্ষুধাতৃষ্ণা? শক্তি মাপক যন্ত্রের নাম ক্ষুধাতৃষ্ণা। শক্তির হ্রাস-বৃদ্ধি অপচয় যাহা দ্বারা ওজন হয়, তাহারই নাম ক্ষুধা, এবং তৃষ্ণাও সেইরূপ শক্তির রস-শক্তির

হ্রাস বৃদ্ধি-অপক্ষয় পরিমাপক যন্ত্র। ক্ষুধা দ্বারা কি বুঝা যায়? ক্ষুধা পাইলে বুঝা যায় শক্তির হ্রাস হইয়াছে। অত্যন্ত ক্ষুধা পাইলে শরীর দুর্ব্বল বোধ হয়, শরীর কাঁপিতে থাকে। ক্ষুধা জানাইতেছে যে, তোমার শক্তির হ্রাস হইয়াছে, তাহা পূরণ কর; অমনি বাহ্য পদার্থ হইতে শক্তি সংগ্রহ করিবার জন্য তাহাকে পাকযন্ত্রে পরিপাক করাইয়া তাহা হইতে শক্তি আহরণ করিতে হয়। যাহার শক্তির হ্রাস হইয়াছে, তাহারই ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছে। যাহার ক্ষুধার ইচ্ছা হইয়াছে, তাহারই শক্তিহ্রাস হইয়াছে, ইহা নিশ্চয়। বিশ্বে এমন কে আছে, যে ক্ষুধাতৃষ্ণাবর্জ্জিত? কেহই নাই অর্থাৎ কোনও জীব বা কোনও পদার্থই নাই। আব্রহ্ম কীট সকলেই ক্ষুৎ-পিপাসা-যুক্ত। দেবতারা সকলেই যজ্ঞভুক। কেহ দীর্ঘকাল পরে প্রচুর আহার করেন, কেহ অল্প আহারে সন্তুষ্ট, এই মাত্র প্রভেদ। ক্ষুধাতৃষ্ণা জীবব্যাপী। ক্ষুধাতৃষ্ণা জয় করিয়াছে, এমন কোনও প্রাণী নাই। সমস্ত জীব এবং উদ্ভিদ প্রভৃতি ক্ষুধাতৃষ্ণার অধীন।

ক্ষুধাতৃষ্ণাকে যিনি জয় করিয়াছেন, তিনি সর্ব্বজয়ী এবং পূর্ণশক্তিমান। পূর্ণশক্তিমানের শক্তির হ্রাসবৃদ্ধি নাই, সুতরাং ক্ষুধাতৃষ্ণা নাই। পূর্ণশক্তির ক্ষুধা কোথায়? পূর্ণরসের তৃষ্ণা কোথায়? তবে কি যাঁহারা পূর্ণ, তাঁহারা কিছু আহার করেন না? হাঁ, তাঁহারা আহার করেন লৌকিক ব্যবহারের জন্য, ইচ্ছা করিলে তাঁহারা না খাইয়া থাকিতে পারেন। তাঁহারা পূর্ণতৃপ্ত। পূর্ণতৃপ্তের ক্ষুধাতৃষ্ণা থাকে না। ক্ষুধাতৃষ্ণা বর্জ্জিত পূর্ণ শক্তিশালী অচ্যুত ভগবানের ভক্তেচ্ছায় ক্ষুধা জন্মে; ভক্ত যত দিতে পারেন, তিনিও ততই খাইতে পারেন, না দিলে না খাইয়া থাকিতে পারেন। সেইরূপ পূর্ণশক্তিশালী যাঁহারা, ক্ষুৎশক্তি যত ইচ্ছা বাড়াইতে পারেন, আবার যত ইচ্ছা কমাইতে পারেন। ক্ষুৎশক্তি এত বাড়াইতে পারেন যে, অনন্তকাল বসিয়া অনন্ত বিশ্ব খাইতে থাকিলেও ক্ষুধার নিবৃত্তি হইবে না; আবার এত কমাইতে পারেন যে, অনন্তকাল না খাইলেও ক্ষুধার উদ্রেক হইবে না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কুমার দেবব্রত

গমধাতু-নিষ্পন্ন হইয়া গঙ্গা হইয়াছে; যাহা গমন করে তাহাই গঙ্গা। যে শক্তি গাঙ্গেয়কে গর্ভে ধারণ করিয়াছে, তাহারই নাম গঙ্গা অথবা গাঙ্গেয়কে শক্তি প্রদান করিবার জন্য ভারতে গমন হেতু গঙ্গা নাম হইয়াছে। কথিত আছে, গোলোকে রাধাকৃষ্ণ হরগৌরীর গানে দ্রবীভূত হওয়াতে গঙ্গার উৎপত্তি হইয়াছে।

রাধাকৃষ্ণ চিৎশক্তি-সমন্বিত ব্রহ্মপদার্থ, হরগৌরীর গান অর্থে শব্দব্রহ্ম; ইহাতে বুঝা যাইতেছে, শব্দব্রহ্ম কর্ত্তৃক মথিত হইয়া ব্রহ্মের দ্রবীভাব অবস্থাই গঙ্গা, সুতরাং গঙ্গা চিৎশক্তিসমন্বিত ব্রহ্ম পদার্থ। শক্তিগর্ভে যেমন শক্তিমান বিরাজিত রহিয়াছেন, সেইরূপ আদ্যাশক্তি পতিতপাবনী গঙ্গার গর্ভেও পূর্ণ শক্তিমান পতিতপাবন বিরাজিত রহিয়াছেন, তাঁহারই নাম গাঙ্গেয়। যেমন দুগ্ধগর্ভে নবনীত রহিয়াছে, মথিত না হইলে তাহার বিকাশ হয় না, সেইরূপ গঙ্গা মথিত না হওয়া পর্য্যন্ত গঙ্গাগর্ভস্থিত গাঙ্গেয়শক্তিরও বিকাশ হইতেছে না। এই শক্তি মথনের পাত্র কে? সুরধুনী দেখিলেন, পরাধীন বদ্ধসৃষ্টি সুর লোকে তাঁহার উপযুক্ত পাত্র নাই, সুতরাং স্বাধীন মুক্তসৃষ্টি আর্য্যগলায় বরমাল্য অর্পণ করিলেন।

প্রকৃতি কোন পুরুষকে আলিঙ্গন করিলেন? শান্তনুকে। কোন পদার্থের নাম শান্তনু? সর্ব্বপ্রকার অহঙ্কারবর্জ্জিত যে ব্রহ্মভাব, তাহাই শান্তভাব। যাহা সুখ, দুঃখ, চিন্তা, দ্বেষ, রাগ, কামাদি, ইচ্ছাবর্জ্জিত, সর্ব্বত্র সমভাবে অবস্থিত, এবং যে ভাব সামান্য মাত্র স্পর্শ হইলেও নিরানন্দকে সদানন্দ, বৃদ্ধকে তরুণ করে, এবং যাহা অশান্তিভাবকে শান্তি দেয়, তাহাই শান্তভাব। এই শান্তভাব যে তনুকে আশ্রয় করিয়া আছে, তাহাই শান্তনু; ইহা দ্বারা শান্তনু শব্দে ব্রহ্মই বুঝা যাইতেছে। সমস্তই ব্রহ্ম; স্থাবর বল, জঙ্গম বল, প্রকৃতি বল, পুরুষ বল, সমস্তই ব্রহ্ম পদার্থ। এক ব্রহ্মই দ্বিধাবিভক্ত হইয়া প্রকৃতি ও পুরুষরূপ ধারণ করিলেন; সুতরাং প্রকৃতিও ব্রহ্ম, পুরুষ ও ব্রহ্ম। প্রকৃতি-পুরুষ-সংযোগে বিশ্বের উৎপত্তি, সুতরাং তাহাও ব্রহ্ম। কাজে কাজেই বলিতে হয়, ব্রহ্মই ব্রহ্ম কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া ব্রহ্মই প্রসব করিতেছেন।

পূর্ণই পূর্ণ স্বরূপকে যথাক্রমে উদ্ধার, নির্ম্মাণ ও সংহার করেন, সুতরাং পরিণামে পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে। সেইজন্য বলা যাইতে পারে, গঙ্গা ব্রহ্ম, তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়াছে। যে শান্তভাব তনু, তাহাও ব্রহ্ম, সেইজন্য প্রসূত পদার্থও ব্রহ্ম; সুতরাং বলা যাইতে পারে, গঙ্গা ব্রহ্ম কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া ব্রহ্মকে প্রসব করিলেন, তাহারই নাম গাঙ্গেয়। ব্রহ্মের প্রাণস্বরূপ এক দেহ এক আত্মার ন্যায় দ্বিতীয় ব্রহ্ম হৃদয়ে লীন ছিল, তাহা শব্দব্রহ্ম কর্ত্তৃক মথিত হইয়া গঙ্গাগর্ভে অবস্থিতি করিতেছিল, তাহা শান্তনু কর্ত্তৃক মথিত হইয়া বিশ্বকেন্দ্র ভারতে, শক্তিকেন্দ্র আর্য্যতে অবতীর্ণ হইলেন; সুতরাং বলা যাইতে পারে, ব্রহ্ম পদার্থই ব্রহ্ম কর্ত্তৃক মথিত হইয়া, ব্রহ্ম কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া, ব্রহ্মগর্ভ ভেদ করিয়া প্রকাশিত হইলেন। পৌরাণিক ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, শান্তনুর ঔরসে গঙ্গার গর্ভে 'কুমার দেবব্রত গাঙ্গেয়' জন্মগ্রহণ করিলেন।

সিদ্ধাশ্রম

ব্রহ্মবিদ্যা-অভ্যাস-জনিত তেজঃ প্রভাবে আশ্রম মণ্ডল মাত্রেই এমনই সমুজ্জল হইয়াছে যে, গগনতলস্থিত প্রদীপ্ত সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় উহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করাও নিতান্ত দুঃসাধ্য। সমস্ত আশ্রম এতাদৃশ সুশ্রী ও অতি সমৃদ্ধি সম্পন্ন যে, সকল প্রাণীই তথায় সুখে বাস করিতে পারে। ইহার রমণীয়তা দর্পণে অপ্সরাগণ ইহার সন্নিহিত প্রদেশে নৃত্যাদি করিয়া থাকে এবং তাহারা সময়ে সময়ে আশ্রমস্থিত ঋষিগণের সেবা-শুশ্রুষা করিয়া থাকে। বিস্তৃত অগ্নিহোত্রগৃহ, অতি সুদৃশ্য পবিত্র মনোমোহকারী বিবিধ ফলমূল সকল এই আশ্রমমণ্ডলের সর্ব্বত্রই শোভা সম্পাদন করিতেছে। যে সকল বৃক্ষে নানা প্রকার পবিত্র সুস্বাদু ফল উৎপন্ন হয়, তাদৃশ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আরণ্য বৃক্ষে ইহার চতুর্দ্দিক সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে। অভ্যন্তর ভাগে বিচিত্র পুষ্পপাদপসমূহও অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে। স্থানে স্থানে প্রফুল্ল-পঙ্কজ-পরিশোভিত সরসী সকল, সকলেরই নয়ন মন হরণ করিতেছে। ইহার চতুর্দ্দিক পবিত্র বেদধ্বনি দ্বারা অনুনাদিত। ব্রহ্মভূত মহাভাগ ব্রাহ্মণগণ ও মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক পরিশোভিত এই আশ্রমমণ্ডল ব্রহ্মলোকের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। ইহার চতুর্দ্দিকেই নানাবিধ মৃগগণ ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে এবং সর্ব্বত্রই বিবিধ বিহঙ্গগণ মনোহর সুমধুর রব করিতেছে।

পূর্ব্বকালে কোন সময়ে কুমার দেবব্রতকে লইয়া গঙ্গাদেবী বশিষ্ঠাশ্রমের চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন যে, মহাতপা ধর্ম্মনিরত শান্তশীল ঋষিগণের অধিষ্ঠানবশতঃ ঐ আশ্রমপদ সর্ব্বদা সর্ব্বসমৃদ্ধির নিদান, সর্ব্বপুণ্যের অধিষ্ঠান, সর্ব্বকল্যাণের আধার, সর্ব্বমঙ্গলের আস্পদ ও সর্ব্বতীর্থের একত্র সন্নিধানস্বরূপ, সর্ব্বলোকসুখাবহ এবং সর্ব্বকাল রমণীয়তা পরিগ্রহ করিয়াছে। সকল ঋতু-সুলভ ফল ও কুসুম সকল সর্ব্বদা ফলিত ও বিকশিত হওয়াতে সকল লোক প্রার্থনীয়, সুষমালক্ষ্মীর নিত্য সান্নিধ্যবশতঃ ধরাতলে উহার কুত্রাপি উপমা লক্ষিত হয় না। পথশ্রান্ত দিকভ্রান্ত পথিক যেরূপ ক্রমাগত গমন করিতে করিতে একান্ত অবসন্ন হইয়া কোন নিরাপদ আশ্রয় প্রাপ্ত হইলে সহসা তাহা পরিত্যাগ করিতে অভিলাষী হয় না, সেইরূপ আশ্রমে প্রবেশ করিলে স্বর্গপ্রবিষ্টের ন্যায় পুনরায় বহির্গমন-বাসনা দূরীভূত হয়। কোথা হইতে কিরূপে তপোবনের ঈদৃশ সর্ব্বলোকমোহিনী অসীম শক্তি সমুদ্ভূত হইল? মানুষ সুখস্বচ্ছন্দে বাস করিব বলিয়া স্বকীয় অভিনব কল্পনাবলে সাধ্যাতীত যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে প্রাণান্ত ও সর্ব্বস্বান্ত স্বীকার করিয়াও সুখ ও শান্তি সাধন জন্য কতই অভিনব বস্তুর উদ্ভাবন ও নির্ম্মাণ করে; প্রাসাদ, অট্টালিকা, উপবন, উদ্যান সৃষ্টি করিয়াও শ্রান্ত বা নিবৃত্ত হয় না। কিন্তু তাহাদের সেই অভিলষিত সুখ ও শান্তি কোথায়? সুখ ও শান্তি কদাচ লোকালয়ের ঈর্ষাদ্বেষে পরিপূর্ণ, অহঙ্কার-অভিমানে আকুলিত ও অনর্থক কল্পনায় বিষবৎ বিষমায়িত অতি দারুণ কোলাহলমধ্যে বাস করিতে পারে না।

মানুষ আকুল ও ব্যাকুল হইয়া মনের দুরন্ত আবেগে ইতস্ততঃ অভিমানপূর্ব্বক যতই অন্বেষণ করুক, কুত্রাপি তাহাদের সন্ধান পাইবে না। যেখানে তপস্যা, সাধুতা, অমৃত ও সাক্ষাৎ পরমার্থ অবস্থিতি করে, সুখ ও শান্তি সেই স্থানের নিবাসী হইয়া থাকে। বিষয়মধ্যে, বিভবমধ্যে, বিবাদ ও বিগ্রহমধ্যে, ঈর্ষা ও অসূয়ার মধ্যে, অপবাদ ও নিন্দার মধ্যে, স্বার্থপরতা ও স্বকীয় পরিবারমাত্রের ভরণপোষণের মধ্যে অথবা তৎসদৃশ অন্যস্থানে সন্ধান করিলে, সেই সুখ ও শান্তির সাক্ষাৎকার কখনওই সম্ভব না। বলিতে কি, মানুষ যেরূপ সুখের অন্বেষণ করে, তাহাকে মত্ততা, ভ্রষ্টতা, অথবা তাহাকে দুঃখের অন্বেষণ ভিন্ন আর কিছু বলা যায় না।

আমাদের কবিশ্রেষ্ঠ কলিদাস এই সম্বন্ধে রাজপ্রাসাদে ও তপোবনে কি বিভিন্নতা, তাহা দেখাইয়াছেন।—এই মহারাজ অত্যন্ত ভাগ্যবান, ইঁহার লোকমর্য্যাদারও শেষ নাই, ইঁহার রাজ্যে চতুর্বর্ণের মধ্যে নিকৃষ্ট

হইলেও কোন ব্যক্তি অসদাচরণ করে না, তথাপি আমার মন আজীবন নির্জ্জন বন সেবা করিয়াছে বলিয়া জনপূর্ণ রাজপ্রাসাদ অগ্নি-আক্রান্ত গৃহের মত বোধ হইতেছে।

তপোবন কেমন শান্তি-শীতলতা-পূর্ণ, আর রাজধানীতে রাজপ্রাসাদে কত অশান্তি। রাজপ্রাসাদবাসী ও তপোরণ্যবাসী কত বিভিন্ন, তাহা একটু বিবেচনার চক্ষে দেখিলেই, শান্তি ও অশান্তি এই দুই পদার্থের পার্থক্য বেশ বুঝা যায়। তৈল মাখিয়াছে যে ব্যক্তি তাহাকে দেখিলে, শুচি ব্যক্তি অশুচিকে দেখিলে, জাগরিত ব্যক্তি সুপ্তকে দেখিলে এবং স্বাধীন ব্যক্তি বদ্ধকে দেখিলে যেরূপ মনে করে, সংসার সুখে মগ্ন ব্যক্তিকেও তপোবনবাসীরা সেইরূপ মনে করেন। রামচন্দ্র কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভরতকে বলিয়াছিলেন,—হে ভরত! পিতা আমাকে বড়ই ভাল বাসিতেন, সেইজন্য সুখময় যে অরণ্য, তাহাই আমার বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কারণ নিশ্চিন্ত মনে শান্তি জীবনে আমি এখানে ভগবানকে স্মরণ করিতে পারিব; আর সভয়, সচিন্ত, অশান্তিময় রাজকার্য্যে তোমাকে নিযুক্ত করিয়াছেন; এক্ষণে পিতার আজ্ঞা তোমার ও আমার পালন করা উচিত। আমি সুখবাস অরণ্য ত্যাগ করিয়া দুঃখবাস রাজপ্রাসাদে যাইব না।

আশ্রমের পাদপ সকল সুস্বাদু ফলভরে অবনত হইয়া, অতি বিনীত সাধুজনের অনুকরণ করিতেছে; বিকশিত কুসুমমানত লতা সকল লজ্জাভরে বিনীত কুলবালার প্রতিযোগিতা করিতেছে; কলকণ্ঠ বিহঙ্গম সকল সুমধুর কলরব করিয়া, সৎকথার ন্যায় সকলেরই মন হরণ করিতেছে; অতি স্বচ্ছ সলিলগর্ভ জলাশয় সকল সাধু হৃদয়—সদৃশ সুনির্ম্মল প্রতিভা বিস্তার করিতেছে; সিংহব্যাঘ্রাদি শ্বাপদ সকল চিরপরিচিত হিংস্র স্বভাব বিসর্জ্জনপূর্ব্বক পরস্পর ভ্রাতৃভাবে বিচরণ করিতেছে, চন্দ্র উহাতে নিত্য সুনির্ম্মল স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না বিকিরণ করিতেছে; জলাশয় সকল নিত্য কমলাদি সুগন্ধি কুসুম প্রসব করিতেছে; পাদপ সকল নিত্য সুমধুর ফল প্রদান করিতেছে, অতি সুরভি মলয়ানিল নিত্য প্রবাহিত হইতেছে; দিবাকর নিত্য অতিমাত্র সুখসেব্য কিরণ বিতরণ করিয়া সকলের চিত্ত বিনোদন সাধন করিতেছে; তথায় রোগ নাই, শোক নাই, জরা নাই, মৃত্যু নাই, আধি নাই, ব্যাধি নাই, শ্রান্তি নাই, ক্লান্তি নাই, চিন্তা নাই, বিষাদ নাই; সর্ব্বত্রই প্রীতি, আনন্দ, হর্ষ, বিকাশ, শান্তি, মাধুর্য্য ইত্যাদি সাক্ষাৎ বিগ্রহ পরিগ্রহপূর্ব্বক বিচরণ করিতেছে; এবং ধর্ম্ম, সত্য, ন্যায়, ক্ষমা, দয়া প্রভৃতি যেন মূর্ত্তিমান হইয়া তাহাদের পোষণ ও বর্দ্ধন করিতেছে। সংসারের কোথায় এরূপ প্রদেশ আছে যে, এই তপোবনের সহিত তাহার তুলনা হইতে পারে?

কারণ ব্যতিরেকে কার্য্যের উৎপত্তি হয় না এবং আধার ব্যতিরেকে আধেয় থাকিতে পারে না, ইহা নিত্য সিদ্ধ সনাতন নিয়ম। এই নিয়মের ব্যভিচার-ঘটনা কদাচ সম্ভব নহে; কিন্তু ঋষিগণের অসামান্য তপঃশক্তি তাহারও অন্যথা সাধন করে। আশ্চর্য্য দেখা যায়, তপোবনে নন্দন কানন নাই, কিন্তু আপনা হইতে পারিজাত প্রাদুর্ভূত ও বিকশিত হইতেছে; কুবের-সরোবর নাই, আপনা হইতেই স্বর্ণপদ্ম প্রস্ফুটিত হইতেছে; ক্ষীরোদ সাগর নাই, আপনা হইতেই অমৃত উদ্ভূত হইতেছে; বৈকুণ্ঠ বা গোলোক নাই, আপনা হইতেই কমলাদেবী বিরাজমানা হইতেছেন; মনুষ্য সূলভ দিবারাত্রি পরিশ্রম ও যত্নের সম্পর্ক নাই, আপনা হইতেই সিদ্ধি সমাগত হইতেছে; তথায় বাসনা বা কমনার নামমাত্র নাই, কিন্তু আপনা হইতেই পরম কাম্যফল পরিণত হইতেছে। যে কারণের যে কার্য্য, ঋষিগণের তপঃশক্তি তাহারও ব্যভিচার বিধান করে। তপোবলে বয়সের পরিণামেও লোকের পলিত বা গলিত দশা আপতিত হয় না, যৌবনের সমাগমেও কাম রাগ প্রাদুর্ভূত হয় না। বিষয়-বিভরের অভাব হইলেও সম্পন্নতার অভাব হয় না, এক পিতা হইতে জন্ম না হইলেও ভ্রাতৃভাবের অসদ্ভাব হয় না। সজাতীয় বা সবংশীয় না হইলেও বন্ধুতার হানি হয় না, এবং এক দেহ না হইলেও একপ্রাণতার অভাব হয় না।

এই তপোবনে সর্ব্বলোক নিঃস্বার্থ হিতশিক্ষার সাক্ষাৎ আদর্শ। তথাকার তরুগণ অযাচিত ও অসেবিত হইয়াও ফল ফুল বল্কলাদি প্রদানপূর্ব্বক সর্ব্বদা অভিলষিত গ্রাসাচ্ছাদন বিধান করে; নির্ঝর সকল সুশীতল সলিল প্রদানপূর্ব্বক পিপাসার শান্তি করে, এবং শাদ্বল সকল অর্থাৎ নবতৃণবহুল দেশ সকল বসিবার নিমিত্ত বিচিত্র আসন বিচরণ করে। অধিকন্তু পৃথিবী শয়নের জন্য সর্ব্বদা স্বকীয় ক্রোড় বিস্তার করিয়া অবস্থিতি করে;

অতি মনোজ্ঞ নিকুঞ্জ সকল সুরম্য হর্ম্ম্য অপেক্ষাও সুখবাস বিধান করে; মৃদুমন্দ সুগন্ধ সমীরণ মনোহর ব্যজনপদ পরিগ্রহ করে; এবং তারকা-স্তবক-শবলিত অতি মোহন গগনবিভাগ দিব্য বিচিত্র বিতানরূপে অর্থাৎ চাঁদোয়ার মত অনন্ত সুষমা অর্থাৎ পরম শোভা বিস্তার করে। ইচ্ছা মাত্রেই এই সকল অক্ষয়, অকৃত্রিম ও দিব্য বিভব সকল কালে সকল ব্যক্তির অধিগত অর্থাৎ আজ্ঞাধীন হইয়া থাকে। কপট ক্রূর মানুষ স্বপ্নেও ঈদৃশ অতি দিব্য বিশুদ্ধ সুখের বার্ত্তামাত্র অবগত নহে। সে সকল লোক আত্মবঞ্চনাপূর্ব্বক অর্থ অর্জ্জন করে, বর্দ্ধন করে, রক্ষণ করে ও সঞ্চয় করে,—স্বার্থের দাস, ইন্দ্রিয়ের দাস, রিপুর দাস ও পরিবারের দাস হইয়া আজীবন বিদ্ধনাসিক বলীবর্দ্দের অর্থাৎ বলদের ন্যায় ভারমাত্র বহন করে,—হিংসা, দ্বেষ, ঈর্ষা, অসূয়া, গ্লানি, নিন্দা ও পরপীড়ন প্রভৃতি মহাপাপ সকল বন্ধুবৎ, আত্মবৎ ও দেববৎ পরম প্রীতি স্থাপনপূর্ব্বক তাহারই অনুসরণ করে, সেই মানুষ—হত বিড়ম্বিত দগ্ধ মানুষ—কিরূপে তপস্বিসেব্য, দেবসেব্য, তাদৃশ তপোরণ্যের ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইবে? মানুষ কি হতভাগ্য, সে রাশি রাশি অর্থ ব্যয় এবং শতধা ও সহস্রধা শরীর প্রাণ ও মন ক্ষয় করিয়া শান্তি লাভের অভিলাষে যে বিচিত্র প্রমোদ-বাপী, কূপ, তড়াগ, উদ্যান ও গৃহ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করে, কোষকার কৃমির ন্যায় তাহাতেই বদ্ধ হইয়া অনন্ত যাতনা সহ্য করে। সে কুমুদ ও কমলাদির ন্যায় স্বচ্ছ কোমল বিচিত্র শয্যা নির্ম্মাণ করে, বিধাতা তাহার অন্তরে অন্তরে কুটিল কণ্টক নিহিত করেন। সেইজন্য সে শয্যা কণ্টক রোগীর ন্যায়, পার্শ্ব পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক সমস্ত রজনী জাগরণ করিয়া অতি ক্লেশে যাপন করে; অথবা সে অতিমাত্র আয়াস-চিন্তা-সহকারে সুবর্ণ ও রজতাদি-বিনির্ম্মিত দিব্য পাত্রে সে সঘৃত পলান্ন সঞ্চয় করে, বিধাতা তাহারও অন্তরে অন্তরে নিদারুণ রোগবীজ বপন করেন। সেইজন্য সে তাদৃশ বহুমূল্য, বহুপ্রিয় ও বহুযত্নবিশুদ্ধ অন্ন সেবন করিয়াও রোগের হস্ত অতিক্রম ও অরুচির যন্ত্রণা পরিহার করিতে সমর্থ হয় না। সে বিপুল-যত্নাতিশয়-সহকারে যে প্রীতিময় ও সুখময় বিচিত্র বিষয় সংগ্রহ করে, বিধাতা তাহারও অন্তরে অন্তরে রাশি রাশি দুঃখ-বিষাদ সঞ্চিত করেন। সেইজন্য সে অতুল বিষয়লক্ষ্মীর অধিকার মধ্যে দিবানিশি বাস করিয়াও, অকিঞ্চন দরিদ্রের ন্যায়, ক্ষুণ্ণ, বিষণ্ণ, অবসন্ন দশা সম্ভোগ করে; ইহার নাম অতর্ক্যহেতু দৈবী যাতনা। মনুষ্যগণ ইহাকেই আহার্য্য শোভার বিষম পরিণাম কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

যাঁহারা কায়মনে প্রকৃতি দেবীর পরিচর্য্যা করেন, সেই ঋষিগণের সহিত ঈদৃশী দৈবী যাতনার কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই। ঈশ্বরচিন্তা ও পরমার্থচিন্তার নিত্য সংযোগ জন্য তাঁহাদের দিবা রাত্রি সমান সুখ বিতরণ করে, অথবা সমস্ত সংসার তাঁহাদের সুখের উপায় কল্পনা করিয়া থাকে। সংসারে যত প্রকার শোভা ও সমৃদ্ধি আছে, সৌকুমার্য্য ও সৌন্দর্য্য আছে, গুণ ও ধর্ম্ম আছে, এবং সুখ ও সৌভাগ্য আছে, তপোবনে সেই সমস্তই তথায় একত্র সমবেত হইয়াছে। বিধাতা যেন আপনার শান্তি শোভাময়ী মনোহারিণী সৃষ্টি একত্র দর্শন করিবার অভিলাষে এই শান্তর সাস্পদ আশ্রমপদের নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং স্বয়ং স্বীয়লোক পরিহারপূর্ব্বক সাক্ষাৎ তপঃস্বরূপে প্রতিনিয়ত তথায় অবস্থিতি করিতেছেন। এই জন্য বিরোধী গুণ সকলও পরস্পর সমভাব অবলম্বনপূর্ব্বক অবিরোধে তাহাতে অধিষ্ঠিত রহিয়াছে। ব্যাঘ্র সকল হরিণের গাত্র লেহন করিতেছে। বসন্ত-সময়-সমুদ্ভূত সুগন্ধ মলয়ানিল তথায় সকল কালই প্রবাহিত হইতেছে; অথচ কাহারও তাহাতে অণুমাত্র চিত্তবিকার উপস্থিত হয় না। অন্যের কথা দূরে থাকুক, ইন্দ্রিয়ের চিরদাস, কামমাত্র পরায়ণ অতি বিষয়ী ব্যক্তিও তথায় গমনপূর্ব্বক তাহার সেবা করিলে অণুমাত্র বিকার অনুভব করে না। তথায় প্রবেশ করিলে অতি দুরাচার-পাষণ্ড-হৃদয়েও দুষ্প্রবৃত্তির দারুণ স্রোত তৎক্ষণাৎ বলপূর্ব্বক রুদ্ধ এবং অকৃত্রিম ধর্ম্মানুরাগ অজ্ঞাতসারে সমুদ্ভূত ও উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। অধিকন্তু তদীয় সঙ্গ মাত্রেই পুত্রবিয়োগবিধুরা জননীরও দুরপনেয় শোকভার সদ্যঃ শিথিলিত হয়, কামীরও অতি বদ্ধ কামরাগ তাহাকে ত্যাগ করিয়া দূরে পলায়ন করে। স্বাভাবিক ও কৃত্রিম এই উভয়ের যে পার্থক্য, তপোবন ও উপবন এই উভয়ের তদনুরূপ বৈসাদৃশ্য লক্ষিত হয়। যাহা কৃত্রিম, তাহা আপাততঃ রমণীয় ও পরিণামে অতিমাত্র বিরস হইয়া থাকে। যাহা অকৃত্রিম, তাহা সকল কালেই মন হরণ করে। ফলতঃ তপোবন ধর্ম্ম ও তপস্যার পরিচর্য্যার নিমিত্ত, উপবন কাম ও ইন্দ্রিয়াদির সেবার নিমিত্ত; তপোবন বিরতি-বনিতার ক্রীড়াভূমি, উপবন আসক্তি-ললনার আবাসভূমি।

তপোবনের কুসুমগন্ধ অমৃতময়, উপবনের পুষ্পসৌরভ প্রাণান্তিক বিষ। তপোবনের মৃদুমন্দ শীতল বায়ু স্বর্গের শান্তি বহন করে, উপবনের সুগন্ধ গন্ধবহ নরকের অবসাদ উদগার করিয়া থাকে। তপোবনে আত্মশক্তি সঞ্চিত হয়, উপবনে বিষয়শক্তি ক্ষয়িত হয়। তপোবনে আত্মভাববৃত্তির দৃঢ়তা হয়, উপবনে অনাত্মজ্ঞান প্রাদুর্ভূত হয়। তপোবনে পরম পুরুষার্থের সেবা হয়, উপবনে অধম ইন্দ্রিয়ার্থের পরিচর্য্যা হয়। তপোবনে নিত্য তেজ ও নিত্য গৌরব, উপবনে নিত্য ক্ষীণতা ও নিত্য লাঘব। তপোবনে নিত্য অভয় ও নিত্য ক্ষেম, উপবনে নিত্য ভয় ও নিত্য হানি।

জাহ্নবী দেখিলেন, বশিষ্ঠাদি মহর্ষিগণ নানা শাস্ত্রালাপে ধর্ম্ম প্রসঙ্গে সুখময় কাল যাপন করিতেছেন। মহর্ষিবৃন্দ শান্তির পরিবারের ন্যায়, ধর্ম্মের সন্ততির ন্যায়, সত্যের পোষ্যবর্গের ন্যায়, ক্ষমার আত্মীয়গণের ন্যায়, এবং ন্যায়ের সহচর ও অনুচর সমূহের ন্যায়, বিচিত্র অদ্ভুত নিরুপম শোভা বিস্তার করিতেছেন। তাঁহারা সকলেই অসামান্য তপঃপ্রভাসম্পন্ন, সকলেই সত্যধর্ম্ম ও শান্তি-নিরত, সকলেই দিব্য বিচিত্র অমানুষী ব্রহ্মশ্রীতে পরিপূর্ণ, এবং সকলেই প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায়, সমুদিত ভাস্করের ন্যায়, অথবা মূর্ত্তিমান তেজোরাশির ন্যায়, একান্ত দুর্দ্ধর্ষ ও দুরপানের প্রতাপ-বিশিষ্ট। আশ্চর্য্যের বিষয়, তাঁহারা ঈদৃশ তেজঃপুঞ্জ হইলেও, পৌর্ণমাসী-শশাঙ্কের ন্যায় ব্যক্তি মাত্রেরই নিতান্ত দর্শনীয়; শোকে সান্ত্বনার ন্যায় ব্যক্তিমাত্রেরই একান্ত স্পৃহণীয়; এবং সন্তাপে শৈত্য-ক্রিয়ার ন্যায় ব্যক্তিমাত্রেরই সেবনীয়। তাঁহাদের শান্তি-বিকশিত ছবির অন্তরালে যে বিশ্বজননী বিরাজ করিতেছেন, তাহা শত্রু-মিত্র সকলেরই সমান বশীকরণ; এবং সরলতা ও শান্তিরূপ যে মহামূল্য বিচিত্র রত্ন তাঁহাদের প্রশস্ত হৃদয়ভাণ্ডার অলঙ্কৃত করিতেছে, কুটিল-হৃদয় কপট মানুষের বসবাস পাপময় সংসারে কখনও এই রত্নের জন্ম সম্ভব হয় না। কেহ বলে ঐ রত্ন দেবলোকের সম্পত্তি, কেহ বলে উহা শান্তির প্রসূতি, কেহ বলে উহা তপোলক্ষ্মীর সাক্ষাৎ বিশুদ্ধ প্রাসাদ, এবং কেহ বলে ওই রত্ন ঈশ্বরসেবার মূর্ত্তিমান ফল। সেই সরলতারূপ অমূল্য রত্নের সুনির্ম্মল প্রতিভারাশি ক্ষণে ক্ষণে উচ্ছলিত হইয়া ঋষিগণের স্বভাবসুন্দর লোচন এবং সর্ব্বক্ষণ সুখদৃশ্য মুগ্ধমোহন বদনমণ্ডলে প্রতিনিয়ত সুন্দর বেশে নৃত্য করিতেছে। সংসারে ঐ লীলা ও সৌকুমার্য্যের উপমা নাই। ঈশ্বরের যে জ্যোতির্ম্ময় স্বরূপ উল্লিখিত হয়, এই প্রতিভা তাহারই অংশ। যাঁহারা সর্ব্বান্তঃকরণে সেই সত্য পুরুষ পরমাত্মার পরিচর্য্যায় প্রগাঢ় প্রণয় প্রদর্শন করেন, তাদৃশ পরমাত্মদর্শী, আত্মরসজ্ঞ, বিদ্বান, পুরুষগণই ঈদৃশ প্রতিভা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আহা! ঐ প্রতিভার কি মোহিনী শক্তি। দর্শনমাত্র অতি মলিন সন্তপ্ত চিত্তেও সুশীতল-সলিল-সেকের ন্যায়, অনির্ব্বচনীয় শান্তিরস সঞ্চারিত হয় এবং অন্তরে অন্তরে, পঞ্জরে পঞ্জরে, শিরায় শিরায় ও অস্থিতে অস্থিতে অমৃতের দিব্য লহরী-লীলা করিয়া থাকে। অধিকন্তু মন ও প্রাণ আপনা হইতে উদ্যত হইয়া, একান্ত অনুগত ও নিতান্ত বশংবদ হইতে অভিলাষী হয়। ঋষিগণ উক্ত প্রতিভা-বলে বলপূর্ব্বক মায়া বা দৈবী শক্তির ন্যায় সকলেরই মন হরণ করেন, পরম আত্মীয় ও পরিচিতের ন্যায় সকলেরই প্রণয় ও অনুরাগ আকর্ষণ করেন, সাক্ষাৎ ঈশ্বরের ন্যায় সকলেরই মনেরও প্রভু হইয়া থাকেন। ভক্তিভাজন জনক-জননীর ন্যায় সকলেরই প্রীতি-শ্রদ্ধা বহন করেন, অভীষ্ট দেবদেবীর ন্যায় সকলেরই পূজাপ্রাপ্ত হন, অভিমত অর্থ সমৃদ্ধির ন্যায় সকলেরই স্পৃহণীয়তা সংগ্রহ করেন, মূর্ত্তিমতী ক্ষমা ও দয়ার ন্যায় সকলেরই অন্তরে আলিঙ্গন লাভ করেন, সাক্ষাৎ ধর্ম্মের ন্যায়, সত্যের ন্যায়, সকলেরই নিকট প্রীতিভাজন হইয়া বিনা ব্যাঘাতে সর্ব্বত্র বিচরণ করেন।

তাঁহাদের তপঃপ্রভাব কি অসামান্য! তাঁহাদের সেনা নাই, প্রহরী নাই, রক্ষী নাই, বিষয় নাই, বিভব নাই, তথাপি তাঁহারা মনুষ্য অপেক্ষা সুরক্ষিত, সুসমৃদ্ধ, সুসম্পন্ন ও সুদৃঢ় স্থিতি সম্পন্ন। ঋষিগণ চিরকালই বলীয়ান, তেজীয়ান মহীয়ান ও গরীয়ান। মনুষ্যগণ বিজ্ঞানবলে, বুদ্ধিবলে ও কৌশলে যাহার আবিষ্কার ও রক্ষা করিতে না পারে, ঋষিগণ সঙ্কল্প মাত্র অনায়াসেই তাহার সংগ্রহ ও ভোগ করিয়া থাকেন। মনুষ্যের যত সঞ্চয় ও বর্দ্ধন হয়, ততই তাহার নব নব অভাব প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে, সুতরাং সে কোনও কালেই আপ্তকাম ও সুখী হইতে পারে না; কিন্তু ঋষিগণের সঞ্চয় বা বর্দ্ধন নাই, অথচ কোনও কালেই কোনও বিষয়ের অভাব নাই, নিত্য সুখ ও নিত্য সন্তোষ তাঁহাদের দাসবৎ সেবা করে। ফলতঃ বিষয়ী অন্ধকারে, ঋষিগণ আলোকে মানব

ছায়ায়, ঋষিগণ সত্তায়; মানব কল্পনায়, ঋষিগণ বস্তুতে; মনুষ্য দাসত্বে, ঋষিগণ প্রভুত্বে; মনুষ্য ফাঁকিতে, ঋষিগণ আত্মাতে; মনুষ্য দৈবে, ঋষিগণ পুরুষকারে; মনুষ্য দোষসমূহে। ঋষিগণ গুণসমূহে অবস্থিতি করেন। ইহাই মনুষ্যত্বের ও ঋষিত্বের বৈশিষ্ট অর্থাৎ প্রভেদ। আত্মসেবা পরিহারপূর্ব্বক পরমাত্মাসেবায় প্রবৃত্ত হইলে এই প্রকার ঋষিগণ অধিগত অর্থাৎ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অনবরত বিষয়ের সেবা করিলে মনের জড়তা এবং অবসাদ বিশেষ উপস্থিত হয় এবং কার্য্য শক্তি ও আত্মশক্তি প্রচ্ছন্ন হইয়া যায়। কিন্তু তপস্বিগণের স্বভাব সেরূপ নহে; তাঁহারা একবারেই বিষয়ের দাসত্ব পরিহার করেন এবং অনাসক্ত হইয়া তাহাকে আয়ত্ত করিয়া থাকেন। সেইজন্য সুখ, সন্তোষ, প্রফুল্লতা তাঁহাদের নিত্য ভোগ্য হইয়া থাকে। ত্রিভুবন ইঁহাদের গৃহ ও পরিজন; প্রকৃতি ইঁহাদের সখা ও সখী; ঈশ্বর ইঁহাদের গুরু ও উপদেষ্টা; ধর্ম্ম ইঁহাদের ধন ও সমৃদ্ধি; সত্য ইঁহাদের সাধ্য ও সাধন; শান্তি ইঁহাদের পরিচ্ছন ও ভূষণ; সদাচার ইঁহাদের আশ্রয় ও অবলম্বন; সৎ প্রসঙ্গ ইঁহাদের আমোদ প্রমোদ; লোকের অকৃত্রিম হিত কামনা ইঁহাদের স্বার্থ ও প্রয়োজন; পরমার্থই ইঁহাদের অভীষ্ট উদ্দেশ্য। ইঁহারা যুগপৎ নম্র ও উন্নত, তেজস্বী ও শান্তশীল, সরল ও বিনয়ী, ভয় ও অভয়স্বরূপ—দুর্জ্জনের ভয়, শিষ্টজনের অভয়, দীপ্ত ও সুস্নিগ্ধ, বৃদ্ধ ও অতি ক্ষুদ্র, অকিঞ্চন ও সর্ব্বসম্পন্ন, অগ্নি ও জল স্বভাব। শান্তচিত্ত ঋষিগণের সহিত, অশান্ত ও অসংযতচিত্ত মনুষ্যের কি প্রকারে তুলনা হইতে পারে? সেইজন্য মনুষ্য সর্ব্বদাই দগ্ধ, বিদ্ধ, রোগ-শোক-জর্জ্জরিত, দীনহীন দুঃখীর ন্যায় জীবন যাপন করে। অথবা মনুষ্যের চক্ষু আছে, দৃষ্টি নাই; শক্তি আছে, সাধন নাই; হস্ত আছে, কার্য্য নাই; পদ আছে, গতি নাই; কর্ণ আছে, শ্রুতি নাই। তপোবনে স্থানে স্থানে হোমাগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, স্থানে স্থানে হোম-বহ্নি হইতে ধূম নির্গত হইতেছে, স্থানেস্থানে হোমাগ্নিনির্গত ধুম নীল চন্দ্রাতপের শোভা ধারণ করিতেছে; এই ধূম কতই পবিত্র ও কতই মঙ্গলকারী।

অন্ন হইতে ভূত সকল উপন্ন হয়। বৃষ্টি হইতে অন্ন উৎপন্ন হয়। ঐ বৃষ্টি যজ্ঞরূপ কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হয়। কর্ম্ম ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদ হইতে উদ্ভূত। বেদ অক্ষর অচ্যুত হইতে উৎপন্ন, অতএব তাদৃশ যজ্ঞেতেই সর্ব্বগত অবিনাশী ব্রহ্ম নিত্য প্রতিষ্ঠিত। ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে, যজ্ঞাগ্নি-ধূম হইতে যে মেঘ জন্মে, তাহা হইতে যে বর্ষণ হয়, সেই বর্ষণই জীবের মঙ্গলকারী; তাহা হইতে যে অন্ন উৎপন্ন হয়, তাহাই জীবের শরীর, মন ও বুদ্ধির পবিত্রতা সম্পাদন করে। সেই ধীসম্পন্ন বুদ্ধি হইতে জ্ঞান, বিজ্ঞান, আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গন্ধর্ব্ববেদ, প্রভৃতি আবিষ্কৃত হইয়াছিল, শরীর আধিব্যাধিহীন ছিল, সবল, সুস্থ, সহর্ষ বিদ্যমান ছিল, তাহা আজ কবির কল্পনা বলিয়া মনে হইতেছে। কেন এমন হইল? আর্য্যগৃহে ত্রিদিবপবিত্রতাকারী সেই হোমাগ্নি, হোমধূম আর দৃষ্ট হয় না; তৎপরিবর্ত্তে কলুষিত শরীর মনের অপবিত্রতাকারী, আধি-ব্যাধির হেতুভূত, পূতিগন্ধি, মৃদ-ধূমাগ্নি নির্গত হইতেছে। আর্য্য তপোরণ্যের সে শোভা আর নাই, সে যজ্ঞ নাই, সে বেদধ্বনি নাই, সে শ্রী সম্পদ নাই, প্রকৃতি যেন চোরের ভয়ে, কোন দস্যুর ভয়ে, সেই শ্রী সম্পদ শোভা লুকাইয়া রাখিয়াছেন; বেদধ্বনির পরিবর্ত্তে হিল হিল, কিল কিল রব উত্থিত হইতেছে। আর কি দেবতারা আর্য্যদের নিকট হোমান্ন যাচ্ঞা করেন, কোথা হইতে দিবে? আজকাল আর্য্যেরাই অন্নের ভিখারি, দুর্ভিক্ষ প্রতিবৎসর লাগিয়াই আছে। আর কিছুদিন এই ভাব থাকিলে, বস্ত্র-অভাবে উন্মাদ হইয়া এবং অন্নাভাবে পেটের জ্বালায় ক্ষুধাতুর হইয়া চারিদিক অন্ধকার দেখিয়া এ দেশ সে দেশ করিয়া ছুটিয়া বেড়াইতে হইবে।

আর্য্যতপোবনে সেই শ্রবণমনোহারী সামগান আর শ্রুত হইতেছে না, তৎপরিবর্তে শৃগাল-কুক্কুরের বিকট ধ্বনি শ্রুত হইতেছে। আর সেই ত্রিদিববাসীরা মহানন্দে তপোবনে বিচরণ করেন না, আজ সেই তপোবনে ভূত-প্রেতের তাণ্ডব-নৃত্য চলিতেছে। যে তপোবনে পবিত্র দেববালারা বিচরণ করিত, তাহারা আর সেই তপোবনে বিচরণ করেন না। যে তপোবনে সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি জন্তু সকল হিংসা ভুলিয়া, করি-শিশুর সহিত খেলা করিয়াছে, আজ সেই তপোবন হিংস্রভূমে পরিণত হইয়া চতুর্দ্দিকে হিংসাব্যাপ্ত হইয়াছে। কেহ কি বলিয়া দিতে পারেন,—কোন মহাপাপে এমন মহাসুখের মহাপবিত্র তপোবন হিংসাগার হইয়াছে? যে তপোবনে তাপস-বালকেরা কোমলপদে বিচরণ করিত, জানি না কোন মহাপাপে আজ সেই স্থানে শৃগাল,

কুকুর, মেষ, মহিষ, গণ্ডার, বরাহ, খরপদে দম্ভভরে বিচরণ করিতেছে। যাহা হউক, এ হেন তপোবনে, বশিষ্ঠদেব, পরাশর, বাল্মীকি, শুক, নারদ প্রভৃতি মহাত্মগণ যোগসাধনা করিয়া ভারতে মহাগৌরব রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। তাই বলি, আজ একটু সময় মন্দ হইয়াছে বা সেই বায়ুর পরিবর্তন হইয়াছে, অথবা মহর্ষি দেবর্ষিগণ পাপীর সংখ্যা বৃদ্ধি দেখিয়া গা ঢাকা দিয়াছেন বলিয়া কেহ হতাশ হইবেন না; আর্য্যগণ সদাচারী হউন, অকপটে স্বধর্ম্ম সেবা করুক, দেবব্রত ও সত্যব্রত হউন, ব্রহ্মচর্য্য পালন করুন, আবার সেই দিন আসিবে, আবার সেই তপোবনে সেই মহর্ষিগণ আসিয়া ভারতবাসীকে হৃদয়ে ধরিয়া মহাসুখ ও মহাশান্তি প্রদান করিবেন। দুঃখের পর সুখের দিন নিশ্চয়ই আসিবে।

ব্রহ্মচর্য্য

ব্রহ্মও যাহা, ব্রহ্মচর্য্যও তাহা। যাহা ব্রহ্মহৃদয় বা ব্রহ্মপ্রাণ, তাহাই ব্রহ্মচর্য্য; যে আচারে ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব, তাহাই ব্রহ্মচর্য্য। যে আচার ব্রহ্মতেই নিরন্তর প্রতিষ্ঠিত, যে আচারে ও ব্রহ্মে অভেদ, তাহাই ব্রহ্মচর্য্য। সমস্ত সদগুণের বৃহত্ব আছে যে, আচারে, তাহাই ব্রহ্মচর্য্য। যে আচারের দ্বারা বিচার নিরপেক্ষ নিশ্চয় ও পূর্ণরূপে ব্রহ্মকে বা সমস্ত সদগুণকে লাভ করা যায়, তাহার নাম ব্রহ্মচর্য্য।

যাহা লাভ করিলে কিছুই অপ্রাপ্ত থাকে না,—সমগ্র ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য, শক্তি, ও জ্ঞান লাভ হয়, যাহার প্রতিষ্ঠায় সর্ব্বশক্তির প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়, যাহার স্থিতিতে সর্ব্বশক্তির স্থিতি, সর্ব্বজ্ঞানের স্থিতি, সর্ব্ব ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের অবস্থান, যাহার পোষণে সর্ব্ব শক্তি ও জ্ঞানের বৃদ্ধি, সর্ব্ব ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের বৃদ্ধি, যাহার পূর্ণসত্তায় সত্তাবান হইলে পূর্ণসত্তায় অবস্থিতি করা যায়, সেই নিত্য সত্য শুক্রব্রহ্মকে ধ্যান করিয়া মহাদেবের মহাব্রত, মহৎ ব্রহ্মের মহৎ আচার, ব্রহ্মচারীর ব্রহ্মচর্য্য যে কি, তাহা সকলের জ্ঞাত হওয়া উচিত। দৃষ্ট, শ্রুত, অনুভূত, প্রপঞ্চ হইতে যাহা কিছু বিশেষ, তাহার নাম ব্রহ্ম, এই প্রকার পদার্থ যাহাতে বিচরণ করে, তাহাই ব্রহ্মচর্য্য।

বীর্য্য বা শুক্র ধারণকে ব্রহ্মচর্য্য বলে। স্থূল কথা, শুক্রধারণই ব্রহ্মচর্য্য। শুক্রধারণ, ব্রহ্মচর্য্য, অষ্টাঙ্গ-মৈথুনত্যাগ বা ঊর্দ্ধরেতঃ একই কথা। শুক্রধারণে অষ্টাঙ্গ-মৈথুনত্যাগ সিদ্ধ হয়, অষ্টাঙ্গ-মৈথুনত্যাগে শুক্রধারণ সিদ্ধ হয়। এখন দেখা যাউক, শুক্র কি, কোন পদার্থের নাম শুক্র।

শুক্র অর্থে ব্রহ্ম, শক্তি, বীজ, বীর্য্য, চৈতন্য, তেজ, বল, আনন্দ ইত্যাদি। সব্রহ্ম বিশ্ব প্রপঞ্চের যাহাতে উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় হয়, তাহারই নাম শুক্র। শুক্র হইতে সকল পদার্থ উৎপন্ন, শুক্রের দ্বারা বর্দ্ধিত ও শুক্রেই প্রতিষ্ঠিত, যাহা আসিলে সকল আসে, যাহা থাকিলে সকল থাকে, যাহা যাইলে সকল যায়, এমন যে পদার্থ, তাহাই শুক্র। যাহা জ্ঞানের আধার, প্রজ্ঞার আধার, শক্তির আধার, আনন্দের আধার, তাহাই শুক্র।

শুক্র দ্বারা পুষ্ট হইয়া ইন্দ্রিয়গণ চেষ্টাশীল হয়, নচেৎ ইন্দ্রিয় সকল নিস্তেজ হয়, এই জন্যে শুক্রই সর্ব্বচেষ্টা-প্রবর্তক। শুক্রই মাতৃগর্ভে প্রবেশ করিয়া চৈতন্যরূপ ধারণ করে। শুক্রই প্রাণাদি-সংযোগে জীবত্ব প্রাপ্ত হয়। শুক্র প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু। শুক্র আশ্রয়, চৈতন্য আশ্রয়ী। যে তনু শুক্রময়, তাহাই চিন্ময়। এই শুক্র ব্রহ্মবীজেরও বীজ, বিশ্ব-উৎপত্তির মূল কারণ। এই শুক্রই বিশ্ববীজ। যাহার যাহা বীজ, তাহাই তাহার শুক্র। সকল পদার্থের মূল বীজ; সার পদার্থ যখন ব্রহ্ম, শুক্রও সকল পদার্থের সার মূলবীজ। অতএব শুক্রও যাহা, ব্রহ্মও তাহা; শুক্ররূপী ব্রহ্মই সর্ব্বভূতের সনাতন মূল বীজ।

শুক্রই ঘনীভূত ব্রহ্মস্বরূপ, অমৃত ও অব্যয়স্বরূপ শুদ্ধসত্বাত্মক। অখণ্ডিত সুখপ্রতিমা সর্ব্বত্র একস্বরূপ, সকল প্রাণীর আত্মার স্বরূপ, সর্ব্বশরীরের স্থিতিস্বরূপ। শুক্রআশ্রয়, ব্রহ্ম আশ্রয়ী। ব্রহ্মতনু শুক্রময়। যে তনু শুক্রময়, তাহাই ব্রহ্মতনু। শুক্রই সর্ব্বপ্রকাশক জ্ঞান। শুক্রহ্রাসে জ্ঞানের নাশ স্বতঃসিদ্ধ। শুক্র ধৃত রহিলে জ্ঞান বর্দ্ধিত হয়, সুতরাং শুক্রই জ্ঞান। শুক্র দ্বারা পুষ্ট হইয়া জ্ঞান প্রকাশ সামর্থ্য ধারণ করে, সর্ব্ব প্রকাশক ক্ষমতা প্রকাশ করে। শুক্র আশ্রয়, জ্ঞান আশ্রয়ী। যে তনু শুক্রময়, তাহাই জ্ঞনময়। শুক্রই আনন্দস্বরূপ; শুক্রের হ্রাসে আনন্দের হ্রাস, শুক্রের বর্দ্ধনে আনন্দর বর্দ্ধন হয়। এই সমস্ত ভূত আনন্দ হইতে উৎপন্ন, আনন্দের দ্বারা জীবিত এবং পুনরায় আনন্দেই প্রবেশ করে। শুক্র আশ্রয়, আনন্দ আশ্রয়ী। যে তনু শুক্রময়, তাহাই আনন্দময়।

সূর্য্যাদিরূপে প্রকাশমান, জ্যোতির্ম্মাত্র, দীপ্তিশীল মহাযশঃ নামক শুক্রকে দেবতারাও উপাসনা করিয়া থাকেন। ব্রহ্মের ব্রহ্মতেজ শুক্র হইতে উদ্ভূত এবং তাহা দ্বারাই পরিবর্দ্ধিত হন, অন্য দ্বারা অপ্রকাশিত সেই স্বয়ংজ্যোতিঃ শুক্র সূর্য্যাদি জ্যোতিঃপদার্থ সকলের মধ্যে থাকিয়া সমুদয় প্রকাশিত করিতেছেন। সর্ব্বাবভাসক সূর্য্যচন্দ্রাগ্নিজ্যোতিঃ—যাহা পাইলে মুমুক্ষুরা সংসার-অভিমুখে পুনঃ আবর্ত্তন করে না, সেই সনাতন জ্যোতিঃ

শুক্রব্রহ্মকে যোগীরা ভজনা করেন। মার্ত্তণ্ডের তীক্ষ্ণ তেজ, চন্দ্রের শীতল রশ্মি, ব্রহ্মচারীর ব্রহ্মতেজ, সমস্ত শুক্রব্রহ্মেরই তেজ। কি আধ্যাত্মিক, কি আধিভৌতিক, কি আধিদৈবিক, সমস্ত তেজের মূলই শুক্র। শুক্রই যখন ব্রহ্ম, জগৎ যখন ব্রহ্মতেজেই জ্যোতির্ম্ময়, তখন তাহা শুক্র ব্রহ্মেরই জ্যোতিঃ। যার যত শুক্র তার তত তেজ।

যিনি অশরীরী হইয়াও শরীরী, ইন্দ্রিয়বর্জ্জিত হইয়াও সর্ব্ব-ইন্দ্রিয়ে ভাসমান, ইন্দ্রিয়াতীত হইয়াও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, অদৃষ্ট হইয়াও দ্রষ্টব্যের ন্যায়, সাক্ষাৎ না হইলেও সর্ব্ব সাক্ষীর ন্যায় সকলকে দেখিতেছেন, এই প্রকার শুক্ররূপ তেজোব্রহ্মকে নমস্কার। এই প্রকার শুক্রব্রহ্মের যিনি শরণ লইয়া থাকেন, সমস্ত তেজই তাঁহাতেই উদ্ভাসিত হয়। শুক্র আশ্রয়, তেজ আশ্রয়ী, যে তনু শুক্রময়, তাহাই তেজোময়। শুক্রই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে ধারণ করিতেছে। জগৎকে ধারণ করিতেছে কে? সত্য। এই বিশ্ব সত্য হইতে উৎপন্ন, সত্যেই প্রতিষ্ঠিত এবং সত্যেই ইহার লয়, সত্য কি? যাহার যাহা সার, তাহাই তাহার সত্য। পৃথিবীর সার গন্ধ, জলের রস, চিনির মিষ্টতা, অগ্নির তেজ ইত্যাদি। ইহারাই ইহাদিগের সার, ইহারাই ইহাদিগের সত্য। বিশ্ব-সার শুক্র, সুতরাং শুক্রই সত্য। পৃথিবীর যাহা অতিশয় সার, তাহাই শুক্র; সুতরাং শুক্রই সার এবং শুক্রই সত্য।

জগতে সত্য কি? যাহার ধ্বংস হয় না, তাহাই সত্য। পৃথিবীর কার্য্যকে কারণে লীন করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই সত্য; সুতরাং যাহার যাহা কারণ,—যে কারণের লয় ক্ষয় নাই, তাহাই সত্য। পৃথিবীকে কারণে লীন করিলে শক্তিই অবশিষ্ট থাকে। সুতরাং শক্তিই সত্য; আবার সেই শক্তি চৈতন্যাশ্রিত, সুতরাং চৈতন্যও সত্য। চেতন নিত্য সৎ, শক্তি নিত্যা সতী। আবার এই চিৎ শক্তি উভয়ই শুক্র; সুতরাং শুক্রই নিত্য সত্য। যে তনু শুক্রময়, তাহাই সত্যময়। যার শরীরে শুক্র যত ধৃত থাকে, তার শক্তি তত বর্দ্ধিত হয়; শুক্র যার যত ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তার শক্তিও তত হ্রাস হয়, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। পঞ্চভূতের অতিশয় সাররূপ যাহা, তাহা শক্তি; অতএব শুক্র শক্তিপদবাচ্য। শুক্র আশ্রয়, শক্তি আশ্রয়ী। যে তনু শুক্রময়, তাহাই শক্তিময়।

বিন্দুর রক্ষণে জীবন, পতনে মরণ, যাহার প্রসাদে ঈশত্ব লাভ হয়, তাহাকে অতি যত্নপূর্ব্বক ধারণ করা উচিত। শুক্রস্খলনেই জরা মরণ সংঘটিত হয়। জরামরণশীল বিমূঢ় সংসারকে বিন্দুই সুখদুঃখে সংস্থিত করে। বিন্দুর মধ্যে সিন্ধু আছে। যে সিন্ধু চায়, তাহার বিন্দু রাখিবার যত্ন, বিন্দু ধরিবার চেষ্টা পূর্বেই করা উচিত। বিন্দু ধারণেই সিন্ধুর লাভ ঘটিবে। সিন্ধুর এক নাম রত্নাকর। রত্নাকর-গর্ভে সকল রত্নই নিহিত আছে। রত্ন যে সিন্ধুগর্ভে রহিয়াছে, সেই সিন্ধু যাহার গর্ভে নিহিত, সেই গর্ভে যে কত রত্ন আছে, তাহার সংখ্যা করিবার সাধ্য বা ক্ষমতা কাহারও নাই।

যাহা লাভ করিলে গতাগতি শেষ হয়, তাহাই গতি। যাতায়াত কেন? ভোগের জন্য। যাতায়াত শেষ হইবে কবে? ভোগ শেষ হইবে যবে। ভোগ শেষ হইবে করে? পূর্ণ হইবে যবে। পূরর্ণ ভোগের জন্যই দৌড়াদৌড়ি ও যাতায়াত। জীব যেখানে পূর্ণ ভোগ পাইবে, গতি শেষ সেইখানেই হইবে। পূর্ণ ভোগ যেখানে, যাতায়াত সেখানে। পূর্ণ ভোগ কোথায়? পূর্ণ শুক্রেই পূর্ণ ভোগ। অগতির যদি কেহ গতিদাতা থাকে, তবে একমাত্র শুক্রই সমস্ত রক্ষা করিতে পারে।

বিশ্বের পোষণকর্ত্তা ইহার তুল্য আর কিছু বা কেহ নাই। শুক্র যাহাকে পোষণ না করে, তাহাকে কেহ রক্ষা করিতে পারে না। ইহা পোষক নহে যার, কেহ ধারক নাহি তার। ইহার ন্যায় সুখদাতা আর কেহ নাই, শুক্রধারণই সর্ব্ব সুখের আগার। শুক্রই আশ্রয় ও ভোগের স্থান অর্থাৎ নিবাস। এমন নিরুপদ্রব শান্তিসুখস্থান, এমন পূর্ণ নির্ম্মল আনন্দ ভোগের স্থান আর নাই। ইহাকে যিনি আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহার পরবাস ঘুচিয়াছে, তিনি স্ববাসে নিবাস স্থাপন করিয়াছেন।

শুক্র দুঃখ হইতে রক্ষা করে। ইহার যিনি শরণ লইতে পারেন, তাঁহার সকল দুঃখের অবসান হয়। সর্ব্বসুখদাতা ইহার ন্যায় আর কেহ নাই। শুক্র যাঁহার রক্ষক, কাল তাঁহার নিকট ভিক্ষুক। শুক্র যাহাকে রক্ষা করে, ইন্দ্রের বজ্র, বরুণের পাশ, যমের মৃত্যুদণ্ড, ব্রহ্মার ব্রহ্মাস্ত্র, শিবের পাশুপত, বিষ্ণুর বৈষ্ণববাস্ত্র তাহার

কিছুই করিতে পারে না। এমন মহাশরণ আর কেহ নাই। ইহার সঙ্গে যিনি বন্ধুত্ব করেন, তাঁহার কল্যাণের পরিসীমা থাকে না। এমন কল্যাণকারী বিশ্বে আর কেহ নাই।

শুক্রই বিশ্বের উৎপত্তির মূল কারণ। শুক্রই বীজের বীজ মহাবীজ, অবিনাশী বিশ্ববীজ। এই বীজের ধ্বংস নাই, সুতরাং এই বীজ নিত্য ও অব্যয়। সর্ব্বযশ যাহাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, যাহা থাকিলে সকল যশ আয়ত্ত হয়, সর্ব্বোপরি যশস্বী হওয়া যায়, তাহাই মহাবীজ।

শুক্রই দার্শনিকের দর্শন, কবির কল্পবৃক্ষ, জ্ঞানীর জ্ঞানভাণ্ডার, বলীর বলাধার, অন্ধের বিমল দিব্যচক্ষু, বধিরের দিব্যকর্ণ, গৃহীর পরম ধন, ভিক্ষুকের শরণ, কাঙ্গালের নিধি, দীনের দীনবন্ধু দীননাথ, সন্ন্যাসীর অবলম্বন, ভক্তের হৃদয়ধন। তাহাই শুক্র, যাহা মূককে বাচালতা-শক্তি প্রদান করে, পঙ্গুর গিরিলঘন সামর্থ্য জন্মায়। তাহাই শুক্র, যাহা দুর্ব্বলকে বলবান, ভীরুকে সাহসী, নিস্তেজকে তেজীয়ান, নিদ্রিতকে জাগরিত, এবং মৃতকে পুনর্জ্জীবিত করে। তাহাই শুক্র, যাহা ভবসাগরের অটল পোত, যাহাতে আরোহণ করিলে ভবসাগর অনায়াসে পার হওয়া যায়। শুক্রই অখণ্ড অবস্থায় ব্রহ্ম, আর খণ্ডাবস্থায় বিশ্ব।

শুক্র যেমন চ্যুত হইল অমনি মায়াও আচ্ছন্ন করিল, মোহও জন্মিল। শুক্র যেরূপ যে পরিমাণে চ্যুত হইবে, ত্রিগুণা প্রকৃতিও সেইরূপ সেই পরিমাণে বিকৃতা হইবে।

ত্রিগুণ যে পরিমাণে বিকৃত হইবে, বুদ্ধি, জ্ঞান, শম, দম, শৌর্য্য, ধৈর্য্য, সুখ, দুঃখ, যশ, অযশ, ভাব, অভাব, বল, বীর্য্য ইত্যাদি সকল বিষয়ই সেইরূপ লাভালাভ হইবে। শুক্রের খণ্ডাবস্থায়ই বিকার, অখণ্ডাবস্থায়ই নির্ব্বিকার। বীর্য্যের অচ্যুতাবস্থায়ই স্বাধীন, আর চ্যুতাবস্থায়ই পরাধীন। শুক্র যাহার খণ্ডিত হইয়াছে, সে বিকৃত হইয়াছে, সুতরাং কালেরও অধীনতা প্রাপ্ত হইয়াছে, সেইজন্য মৃত্যুরও বশ হইয়াছে। বীর্য্য যাহার চ্যুত হয় নাই, সে বিকারও প্রাপ্ত হয় নাই, কালেরও বশ হয় নাই, মৃত্যুরও অধীন হয় নাই, সুতরাং তিনিই অমৃত, স্বাধীন, ও মহামৃত্যুঞ্জয়। শুক্র যেমন খণ্ডিত হইল, অমনি কাল, মৃত্যু, রোগ, শোক, শীত, গ্রীষ্ম, তাহাকে জয় করিল। শুক্র যেমন খণ্ডিত হইল, শারীরিক ও মানসিক শক্তি সেই সঙ্গে হ্রাস পাইল। শুক্র যেমন খণ্ডিত হইল, অমনি বিকারও আশ্রয় করিল, ব্যাধিও জন্মিল। শুক্রের খণ্ডাবস্থাই নিদ্রা, অখণ্ডাবস্থাই জাগ্রত। শুক্রের খণ্ডাবস্থাই জরা মৃত্যু, অখণ্ডাবস্থাই অজরা অমৃত্যু। শুক্রের খণ্ডাবস্থাই দুঃখ, অখণ্ডাবস্থাই সুখ।

শুক্র, মনুষ্য শরীরে কিরূপে অবস্থিতি করে এবং কিরূপে ক্ষরিত হয়, তাহা জ্ঞাত থাকা উচিত। শরীরের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ শুক্র। শরীর পঞ্চভূতাত্মক। পঞ্চভূতের অতিশয় সারভাগ শুক্র। রসের সারভাগ রক্ত, রক্তের সারভাগ মাংস, মাংসের সারভাগ মেদ, মেদের সারভাগ অস্থি, অস্থির সারভাগ মজ্জা, মজ্জার মথিত সারভাগ শুক্র। চৈতন্য যেরূপ জীব শরীরে সর্ব্বব্যাপী, শুক্রও জীব শরীরে সেইরূপ সর্ব্বব্যাপী।

যেমন দুগ্ধে ঘৃত, ইক্ষুতে চিনি, কাষ্ঠে অগ্নি গূঢ়ভাবে নিহিত থাকে, শুক্রও সেইরূপ সর্ব্বদেহের শক্ত্যাধার হইয়া অবস্থিতি করে। ঘৃত যেমন দুগ্ধে অলক্ষিত ভাবে সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া রহিয়াছে, অথচ দেখা যায় না, সেইরূপ শুক্রও রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা সমস্ত ব্যাপিয়া রহিয়াছে, অথচ দেখা যায় না। যেমন দুগ্ধ মথিত হইলে ঘৃত বাহির হয়, কিন্তু মথনের পূর্বে, দুগ্ধে যে ঘৃত আছে তাহা অনুভব হয় না, সেইরূপ শরীর মথিত হইলে শুক্র বাহির হয়, মথনের পূর্বে শুক্রের অস্তিত্বের অনুভব হয় না। যাহার শরীরে শুক্র বেশি, তাহার অল্প মথনে শুক্র বহির্গত হয়; যাহার শরীরে শুক্র অল্প, তাহার শরীর সেই পরিমাণে শুষ্ক এবং বেশি মথনে শুক্র বহির্গত হয়। দুগ্ধ মথিত করিবার জন্য যেমন মন্থনদণ্ড রহিয়াছে, শরীর মথিত করিবার জন্যও মন্থনদণ্ড রহিয়াছে। সেই মন্থনদণ্ডই মনুষ্যের মন। যেমন মন্থনদণ্ড দ্বারা দুগ্ধ মথিত হইয়া ঘৃত নির্গত হয়, সেইরূপ মন দ্বারা শরীর মথিত হইয়া শুক্র নির্গত হয়। যেমন দুগ্ধ মথিবার মন্থনদণ্ডে তির্যক ভাবে আটটা কাঠি সংলগ্ন রহিয়াছে, সেইরূপ শরীর মথিবার মন্থনদণ্ড মনেও আটটা অঙ্গ সংলগ্ন রহিয়াছে। এই অষ্টাঙ্গযুক্ত মনের দ্বারা শরীর মথিত হয় বলিয়াই ইহার অষ্টাঙ্গ-মৈথুন নাম হইয়াছে। এই অষ্ট অঙ্গের দ্বারা মন শরীরকে মথিত করিয়া শুক্র নির্গত করে। হৃদয়ের মধ্যভাগে এক মনোবহা নাড়ী আছে, সেই শিরা মানবগণের

সর্ব্বগাত্র হইতে সঙ্কল্প জন্য শুক্রকে সঞ্চরণ করত উপস্থাভিমুখে আনয়ন করে। সর্ব্বগাত্রসন্তাপিনী শিরা সকল সেই মনোবহা নাড়ীর অনুগত তৈজস গুণ বহন করত, নয়নদ্বয়ের সন্নিহিত থাকে। দুগ্ধমধ্যে অন্তর্হিত নবনীত যেমন মন্থনদণ্ড দ্বারা মথিত হয়, সেই প্রকার দেহস্থ সঙ্কল্প এবং ইন্দ্রিয়জন্য রমণীয় দর্শন ও স্পর্শনাদি দ্বারা শুক্র মথিত হইয়া থাকে। স্বল্প সময়ে মন যখন রমণী বিষয়ক সঙ্কল্প জন্য অনুরাগ লাভ করে, তখন মনোবহা নাড়ী দেহ হইতে সকল্প জন্য শুক্র ক্ষরণ করে। অন্নরস, মনোবহা নাড়ী ও সঙ্কল্প এই তিনটি শুক্রের বীজ, এই জন্য উপবাসে শরীর বলহীন থাকা হেতু কামোদ্রেক থাকে না। এই অষ্টাঙ্গ-মৈথুন যিনি বর্জ্জন করিতে পারেন, তিনি ঊর্দ্ধরেতা হইতে পারেন। তাঁহারই ব্রহ্মচর্য্য সিদ্ধ হয়, তিনিই সর্ব্বজয়ী কন্দর্পকে জয় করিয়া বিশ্ব বিজয়ী হইতে পারেন। শ্রবণ, কীর্ত্তণ, কেলি, প্রেক্ষণ, গুহ্যভাষণ, সঙ্কল্প, অধ্যবসায়, ক্রিয়ানিষ্পত্তি, ইহাকে অষ্টাঙ্গ-মৈথুন বলে।

অষ্টাঙ্গ মৈথুন যথা—প্রথম, রসপূর্ব্বক রমণী সংক্রান্ত কথা শ্রবণকে শ্রবণ বলে। দ্বিতীয়, আগ্রহপূর্ব্বক স্ত্রীলোক সংক্রান্ত কথাবার্ত্তাকে কীর্ত্তন বলে। তৃতীয়, স্ত্রীলোকের সহিত সরস ক্রিয়াকে কেলি বলে। চতুর্থ, রসপূর্ব্বক রমণী-অঙ্গ দর্শনকে প্রেক্ষণ বলে। পঞ্চম, রসপূর্ব্বক রমণী সংক্রান্ত নানা গুহ্য রহস্য কীর্ত্তনকে গুহ্য ভাষণ বলে। ষষ্ঠ, পূর্ব্বোক্ত পঞ্চভাব স্মরণ করিয়া তাহা করিব কি না ইত্যাদি মনে করাকে সঙ্কল্প বলে। সপ্তম, পূর্ব্বোক্ত সঙ্কল্প ভাবের পর স্ত্রী-সংসর্গ করিব ইত্যাকার যে নিশ্চয় বুদ্ধি, তাহাকে অধ্যবসায় বলে। অষ্টম, মৈথুনান্ত, শুক্র ত্যাগকে ক্রিয়ানিষ্পত্তি বলে।

মন এই অষ্ট অঙ্গের যে কোনও অঙ্গের দ্বারা শরীরকে মথিত করিয়া শুক্র নির্গত করিয়া আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক তেজ নষ্ট করিয়া দেয়। এই অষ্ট অঙ্গের পরিবর্জ্জনকে ব্রহ্মচর্য্য বলে, অথবা এই অষ্ট অঙ্গের বিপরীত যাহা তাহাই ব্রহ্মচর্য্য।

ভক্ত সাধকেরা বলেন, মনকে এই অষ্ট অঙ্গ, প্রাণসখা ভগবানই দিয়াছেন, ভগবৎদত্ত অঙ্গ কেন ধ্বংস করিব বা করিতে যাই। এই অষ্ট অঙ্গকে সৎব্যবহারে প্রয়োগ করিলেই হয়। এই অষ্ট অঙ্গকে ভগবৎ-অঙ্গে নিযুক্ত করিলে ইহার সৃষ্টির সার্থকতাও থাকে, ব্রহ্মচর্য্যও সিদ্ধ হয়, এবং অচিরাৎ ব্রহ্মপ্রাপ্তিও ঘটে। ভগবৎদত্ত পদার্থকে গ্রহণ না করিয়া কেন ত্যাগ করিতে যাই? যাহাতে বদ্ধাবস্থায়ও ব্রহ্মানন্দ ভোগ হয়, তাহাকে ত্যাগ না করিয়া গ্রহণ করাই বুদ্ধিমানের কাজ। অতএব গ্রহণ করাই ভাল। ইহাদের ব্যবহার জানিলে ত্রিতাপ যন্ত্রণা দূর হয়, ব্রহ্মানন্দ ভোগ হয়, এবং ব্রহ্মচর্য্য সিদ্ধ হয়। ভক্ত-সাধকেরা ইহাকে কিরূপে ব্যবহার করেন, তাহা প্রকাশ করা যাইতেছে।

প্রথম শ্রবণ—ভগবৎতত্বকথা বা ভগবদগুণানুবাদ শ্রবণকে শ্রবণ বলে। দ্বিতীয় কীর্ত্তন—ভগবদ নামগুণ কীর্ত্তনকে কীর্ত্তন বলে। তৃতীয় কেলি—ভগবৎ ক্রিয়া স্মরণ বা মনন ও ভগবানের অঙ্গ স্পর্শনাদিকে কেলি কহে। চতুর্থ প্রেক্ষণ—ভগবৎপ্রতিমা দর্শন, ভগবদরূপ স্মরণ করাকে প্রেক্ষণ বলে। পঞ্চম গুহ্যভাষণ—ভগবৎ সম্বন্ধে নানা প্রকার গুহ্য কথাকে গুহ্যভাষণ বলে। ষষ্ঠ সঙ্কল্প—সংশয়াত্মক মনোভাব, ভগবৎসংসর্গ করিব কি না ইহাকে সঙ্কল্প বলে। সপ্তম অধ্যবসায়—সংশয়ের পর ভগবানে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিকে অধ্যবসায় বলে। অষ্টম ক্রিয়ানিষ্পত্তি—পূর্ব্বোক্ত সমস্ত ভাব তাঁহাতে সমর্পণ বা সমাধিকে ক্রিয়ানিষ্পত্তি বলে।

উপরিউক্ত অষ্টভাব যদি ভগবানে অর্পণ করা যায়, তাহা হইলে জগৎ প্রপঞ্চ ভুলিয়া যাইতে হয়, কাম ধ্বংস হয়, ব্রহ্মচর্য্য আপনা হইতেই প্রতিষ্ঠিত হয়। যে ব্যক্তি স্ত্রীর চিন্তনাদি পরিবর্জ্জন করিয়া থাকেন, তিনিই ব্রহ্মচারী, যতকাল পর্য্যন্ত শুক্র ধৃত রহিবে, ব্রহ্মচর্য্য সেই পরিমাণে সফলতা ধারণ করিবে; ব্রহ্মচর্য্য যে পরিমাণে সফলতা লাভ করিবে, সর্ব্বশক্তিসত্তাও সেই পরিমাণে আয়ত্ত হইবে।

বীর্য্যের বা চরম ধাতুর কণামাত্রও যদি বিকৃত না হয়, ভ্রমক্রমেও যদি তোমার মনে কামোদয় না হয়, স্বপ্নেও যদি তোমার কামচাঞ্চল্য না জন্মে, তাহা হইলে তোমার চিত্তে এমন এক অদ্ভুত সামর্থ্য জন্মিবে যে, তাহার বলে তোমার চিত্ত সর্ব্বত্র অব্যাহত বা নিবিষ্ট থাকিবার যোগ্য হইবে। সর্ব্ব প্রকাশ শক্তি আবির্ভূত হইবে। শরীরে যদি শুক্রধাতু প্রতিষ্ঠিত থাকে, বিকৃত না হয়, বিচ্যুত বা বিচলিত না হয়, কণামাত্রও যদি

স্থানভ্রষ্ট বা স্খলিত না হয়, অচল, অটল এবং স্থির থাকে, ধৃত থাকে, তাহা হইলে বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়ের শক্তি বৃদ্ধি হয়, চিত্তের প্রকাশ শক্তি বাড়িয়া যায়, রাগ, দ্বেষ অন্তর্হিত হয়, কাম ক্রোধাদি হ্রাস হইয়া পড়ে। অতএব শরীরস্থ শুক্রধাতুকে অবিকৃত, অস্খলিত, অবিচলিত রাখিবার জন্য তুমি রসপূর্ব্বক বা কামভাবে স্ত্রীলোকের অঙ্গ প্রত্যক্ষ দর্শন ও স্পর্শনাদি পরিত্যাগ করিবে। ক্রীড়া, হাস্য, পরিহাস বর্জ্জন করিবে। তাহাদের রূপ লাবণ্য মনেও করিবে না। কিছুদিন এইরূপ করিলে তোমার ব্রহ্মচর্য্য সিদ্ধ হইবে এবং সুদৃঢ় হইবে। অনন্তর তাহা হইতে তোমার আত্মার এক প্রকার আশ্চর্য্য শক্তি—যাহার নাম ব্রহ্মতেজ, তাহার প্রাদুর্ভাব হইবে এবং তাহা হইতে তোমার মুখশ্রী ফিরিয়া দাঁড়াইবে। মানসিক সৌন্দর্য্য ও সদগুণ সকল অপ্রতিহত হইয়া থাকিবে। স্ত্রী সঙ্গ রাহিত্যে আয়ু, বর্ণ, বল, স্থির থাকিবে, রোগ জন্মিবে না; ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শোক, মোহ, জরা, মৃত্যু দ্বারা অভিভূত হইবে না, শরীরে জরা প্রবেশ করিবে না অর্থাৎ অজর ও অমর হইবে অর্থাৎ তুমি মৃত্যুর অধীনে না থাকিয়া, মৃত্যু তোমার অধীন হইবে। এই অনিত্য শরীরে নিত্যতা লাভের সাহায্যকারী যদি কোনও পদার্থ থাকে, তবে তাহা শুক্র; যাহার ধারণে মোহ, তন্দ্রা, ভ্রম, রুক্ষ, রস, উল্বণ কাম, লোলতা, মন, মাৎসর্য্য, হিংসা, খেদ, পরিশ্রম, অসত্য, ক্রোধ, আকাঙ্ক্ষা, আশংক্ষা, বিশ্ব বিভ্রম, বিষমত্ব, পরাপেক্ষা—এই অষ্টাদশ মহাদোষ-বর্জ্জিত হওয়া যায়।

শুক্রই দেহভাণ্ডারের পরম ধন। মানবের জীবন স্বরূপ এই পদার্থ পুনঃ পুনঃ রক্তমধ্যে পরিগৃহীত ও পরিচালিত হইয়া সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপী হয় এবং মানবকে প্রকৃত মনুষ্যত্ব সম্পন্ন, শূর, ধীর, গম্ভীর, একাগ্র, সুদৃঢ়াঙ্গ, সাহসী, কার্য্যশক্তিমান, বীর ও বীর্য্যবান করে। আর এই পদার্থের অপচয়ে মানুষকে ক্ষীণ, বলবীর্য্যহীন ও নিতান্ত চপলচিত্ততায় দীনভাবাপন্ন করিয়া ফেলে এবং তাহার শারীরিক ও মানসিক প্রতিভা শক্তি সমস্তই হ্রাস হয়; তাহার আভ্যন্তরিক শরীর-যন্ত্রের ক্রিয়া-বিশৃঙ্খলা ঘটে, কর্ম্মেন্দ্রিয়-জ্ঞানেন্দ্রিয়-বৃত্তি বিকৃত হয়, পেশী সমূহের কার্য্য বিশৃঙ্খল হয়, স্নায়ুবিধান নিতান্ত হীনতা প্রাপ্ত হয় এবং অবশেষে মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটে। শুক্র দ্বারা বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তির উৎকর্ষ সাধিত হয়। কামজিত মানব কামজয়ী হইতে পারিলে দিব্য দেহ ও দেবত্ব লাভে সমর্থ হয়। আমরা ভগবানকে হৃদয়ে স্থাপিত করিতে ইচ্ছা করি, পারি না কেন? ব্রহ্মচর্য্যের অভাবই তাহার কারণ।

ব্রহ্মচর্য্য সাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপ বলিয়া স্মৃত হইয়াছে, সেইজন্য সমস্ত ধর্ম্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যেহেতু মনুষ্য তাহা দ্বারা পরমগতি প্রাপ্ত হয়। যিনি পঞ্চ প্রাণ, মন, বুদ্ধি ও দশ ইন্দ্রিয়, এই সপ্তদশ-অবয়ববিশিষ্ট লিঙ্গ শরীর সংযোগ বিহীন, যিনি শব্দ-স্পর্শ বর্জ্জিত, শ্রোত্র দ্বারা যাঁহাকে শ্রবণ এবং চক্ষু দ্বারা যাঁহাকে দর্শন করিতে পারা যায় না, আর বাকশক্তি যাঁহাকে ব্যক্ত করিতে সমর্থ নয়, যিনি বিষযেন্দ্রিয় বর্জ্জিত হইয়া কেবল মনোমাত্রে অবস্থান করেন, সেই পাপস্পর্শ-বিরহিত ব্রহ্মচর্য্যকে জানিতে, যে সুধী, সে আপনি যত্নশীল হইবে। যিনি সম্যক রূপে ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করিতে পারেন, তিনি সর্ব্বশক্তিমান ও মোক্ষবান হইতে পারেন; মধ্যমভাবে ব্রহ্মচারী মানব সত্য লোকে গমন করেন; যিনি কনীয়সী অর্থাৎ নীচ বৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকেন, সেই দ্বিজ বর বিদ্বান হন। যে ব্যক্তি ইহলোকে জন্মাবধি মরণ পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করেন, ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহার কিছুই অপ্রাপ্য নাই। ঋষিগণের সেই ব্রহ্মচর্য্যের ফল ইহলোকেই দৃষ্ট হইয়া থাকে।

মহর্ষিগণ স্বীয় স্বীয় বিজ্ঞানবলে নানা প্রকার ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে ইন্দ্রিয় সংযমই তাঁহাদের মতে সর্ব্বপ্রধান। তত্বদর্শী পণ্ডিতেরা দমগুণকে মুক্তি লাভের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। দমগুণ সকল লোকেরই, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের সনাতন ধর্ম্ম। দমগুণ-প্রভাবেই ব্রাহ্মণের সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধ হইয়া থাকে। দমগুণ—দান, যজ্ঞ ও শাস্ত্র জ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; উহা দ্বারা তেজ পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। দমগুণের তুল্য পবিত্র আর কিছুই নাই। লোকে দমগুণ প্রভাবেই পাপবিহীন তেজস্বী হইয়া ব্রহ্মপদ লাভ করিয়া থাকে।

দমগুণ অতি উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। দমগুণ হইতে ইহলোকে সিদ্ধি ও পরলোকে সুখ লাভ করিতে পারা যায়। দমগুণ-সম্পন্ন ব্যক্তি অনায়াসে উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম লাভে সমর্থ হয় এবং নির্ভয়ে নিদ্রাসুখ অনুভব, নির্ভয়ে জাগরণ ও নির্ভয়ে জনসমাজে বিচরণ করিতে পারে। তাহার অন্তঃকরণ সততই প্রসন্ন থাকে। যে ব্যক্তি দমগুণবিহীন,

তাহাকে নিরন্তর ক্লেশ ভোগ করিতে হয় এবং সে আপনার দোষে বহু অনর্থ উৎপাদন করে। চারি আশ্রমেই দমগুণ উৎকৃষ্ট ব্রত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। দমগুণই ক্ষমা, ধৃতি, অহিংসা, সমদর্শিতা সত্য, সরলতা, ইন্দ্রিয় পরাজয়, দক্ষতা, মৃদুতা, লজ্জা, স্থিরতা, অদীনতা, অক্রোধ, সন্তোষ, প্রিয়বাদিতা, অনসূয়, গুরুপূজা প্রভৃতি, ও দয়ার উৎপত্তিকর কারণ। দমগুণান্বিত মহাত্মারা কদাচ ক্রূর ব্যবহার, মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ এবং অন্যের অপমান, উপাসনা বা নিন্দা করেন না। কাম, ক্রোধ, লোভ, দর্প, আত্মশ্লাঘা, ঈর্ষা ও বিষয়ানুরাগ এককালে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন; অনিত্য সুখ লাভে তাঁহাদিগের কখনওই তৃপ্তি হয় না। দমগুণ-প্রভাবেই হৃৎপদ্মনিহিত অবিরোধী সনাতন ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পিতামহের তপোরাশিসমুদ্ভব, গুহামধ্যে আবৃত যে নিত্যলোক আছে, তাহা ইন্দ্রিয়বিজয় দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়। দমগুণ সম্পন্ন ব্যক্তির অরণ্য-গমনের প্রয়োজন নাই। তিনি যে স্থানে বাস করেন, সেই স্থানেই অরণ্য ও পুণ্যাশ্রম।

যিনি ইন্দ্রিয়সমুদয়কে দমন এবং মনকে বশীভূত করেন, ইন্দ্রিয়গণ তাঁহার নিকট প্রকাশিত হয়। প্রকাশ হইবার পর প্রফুল্ল হইয়া পরমানন্দে সেই যোগীশ্বরে প্রবেশ করে। যেমন ইন্ধন দ্বারা হুতাশন বৃদ্ধি পায়, সেইরূপ ইন্দ্রিয়গণ সংযত হইলে বুদ্ধি পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠে। এই সমুদয় ইন্দ্রিয়গণের সহিত যাঁহার মন সংযুক্ত হইয়াছে, তাঁহার সকাশে সেই পরব্রহ্ম প্রকাশিত হন। এই সমস্ত ইন্দ্রিয় অপগত হইলে সত্বমাত্রে অবস্থিত আত্মা ব্রহ্মরূপে কল্পিত হইয়া থাকেন।

দান্ত পুরুষেরা সর্ব্বত্র সুখ সম্ভোগ করেন এবং সকল স্থানেই নির্বৃত হইয়া থাকেন। তাঁহারা যে স্থানে ইচ্ছা করেন, তথায় গমন করিতে পারেন; তাঁহাদের কুত্রাপি গমনের প্রতিরোধ নাই, অর্থাৎ তিনি অব্যাহতিগতি হন এবং সমস্ত শত্রুগণকে মিথুন করেন। দান্ত পুরুষগণ যাহাই প্রার্থনা করেন, তাহাই প্রাপ্ত হন, তাহাতে কোনও সংশয় নাই। দান্ত পুরুষেরা সর্ব্বকামমুক্ত হইয়া থাকেন। দান অপেক্ষা দম বিশিষ্ট, যেহেতু দাতা কুপিত হইতে পারেন, কিন্তু দান্ত কুপিত হইতে পারেন না।

ব্রহ্মচর্য্য যাহা, ব্রহ্মও তাহা। ইহার লয় নাই, ক্ষয় নাই, ছেদ নাই, ভেদ নাই, দাহ নাই, মহাপ্রলয় নাই। ইহা ভূলোক, দ্যুলোক, দেবলোকের ধ্বংসকালেও দেদীপ্যমান। ইহা সর্ব্বকালের অতীত; কালের ধ্বংসে, স্থূল, সূক্ষ্ম, উভয়েরই সংহারে ইহার সত্তা সমভাবে বিদ্যমান থাকে।

কোন পদার্থের নাম অমৃত? যাহা পান করিলে মৃত হয় না, তাহাই অমৃত। যাহা পান করিলে মৃত্যু হয় না, ক্ষণস্থায়ী মৃত্যুময় সংসারে চিরস্থায়ী অমৃতময় হওয়া যায়, এমন মহান পদার্থ কি আছে? তাহার নাম কি? তাহার নাম অমৃত, তাহার নাম শুক্র; শুক্রই অমৃত, অমৃতই শুক্র। উহা যে পান করে, সেই অমৃত হয়; উহা আত্মার আহার্য্য। আমরা যেমন আহার করিলে পুষ্ট হই, আহার না করিলে ক্ষীণ হই, সেইরূপ আত্মাও আহার করিলে পুষ্ট হন, আহার না করিলে ক্ষীণ হন। আত্মার আহার কিরূপ? শুক্রধারণরূপ ব্রহ্মচর্য্য আত্মার আহার, তদ্দ্বারা আত্মার আহার সিদ্ধ হয়। আত্মা পুষ্ট হন, তুষ্ট হন, হৃষ্ট হন ও অমৃতময় হন। এইরূপে আত্মাকে অমৃত পান করাইয়া তাঁহার উদ্ধার করিতে হয়।

আমরা যেমন আহারের দ্বারা পুষ্ট করিয়া শরীরকে নিকট মরণ হইতে উদ্ধার করি, আত্মাও সেইরূপ অমৃত পান করিয়া অমর হন। যে আত্মা নিজ আত্মাকে ব্রহ্মচর্য্যরূপ অমৃত পান করাইয়া মৃত্যু হইতে উদ্ধার করেন, যে আত্মা ব্রহ্মচর্য্যপুরঃসর জিতেন্দ্রিয় হইয়া আত্মজিত হইয়াছেন, যে আত্মা অমৃতবর্ষী ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠানে আপনাকে জন্ম-জরা-মরণাদি শোক সাগর হইতে উদ্ধার করিয়া সত্যময়, সত্যকাম, সত্যসঙ্কল্প, বিশোক, বিজর, বিমৃত্যু অর্থাৎ অমৃতময় করিয়াছেন, সেই আত্মাই আত্মার বন্ধু; আর যে করে নাই, সেই আত্মাই আত্মার শত্রু।

এই মৃত্যুময় সংসার সাগরে বহিস্থ শত্রু আমাদিগের যে অনিষ্ট সাধন করে, তাহা অকিঞ্চিৎকর, মিথ্যা ও ক্ষণধ্বংসী। বহিস্থ মিত্র আমাদের যে প্রীতি বর্দ্ধন করে, তাহা ক্ষণিক, কল্পিত ও যৎসামান্য মাত্র। আমিই আমার যে অনিষ্ট এবং ইষ্ট সংসাধন করি, তাহা অব্যর্থ, স্থায়ী ও বিশেষ ফলপ্রদ। তুমি জড় বিজ্ঞানের সাহায্যে মারিবার ফল, বাঁচাইবার কল, যাহাই কেন আবিষ্কার কর না, ব্রহ্মচর্য্য-মহাবিজ্ঞানের আবিষ্কারের

নিম্নে থাকিতেই হইবে। ব্রহ্মচর্য্য-উত্থিত যাহা, তাহাই বিজ্ঞান, ব্রহ্মচর্য্য-অনুত্থিত যাহা, তাহাই অজ্ঞান। ব্রহ্মচর্য্য ব্যতীত যে উৎপত্তি, তাহা উৎপত্তি নয়, প্রলয়; উত্থান নয়, পতন; জীব কেন এত হীন? যেহেতু অমৃত পানে দীন। এত হীন থাকিবে কত দিন? অমৃত পান না করিবে যত দিন। অমৃত পানে আত্মা পুষ্ট হইলে কি উপকার সাধিত হয়, কি লাভ হয়? শক্তিই আয়ত্ত হয়, এ বৃক্ষে সকল ফলই ফলে, সকল শক্তিই ধরে, কোনও শক্তিরই অভাব হয় না। এ বৃক্ষ হইতে যে শক্তি বাহির হইবে, তাহাও অমৃতময় হইবে অর্থাৎ সে শক্তিকে কোনও শক্তি পরাভাব করিতে পারে না, সুতরাং অমৃতময়। এ বৃক্ষ হইতে যাহা বাহির হইবে, তাহা ধীর, স্থির, নির্ভীক ও বহুপ্রসারিণী শক্তির আধারভূত হইবে।

যে কল্পবৃক্ষের ছায়াতে ত্রিতাপী আর্য্য শীতল হইত, যাহা অতি স্বাদু, অমৃতবর্ষী, অতি আয়াসে সেই অমৃতময় ব্রহ্মচর্য্য-কল্পবৃক্ষ সাধারণের নিকট ধরিলাম। হে বিষাদ দগ্ধ বিষয়বিষরত আর্য্যগণ, ভক্তিভাবে ইহার আশ্রয় লও, তাপিত প্রাণ শীতল কর, অমৃতময় ফল ভোগ করিয়া অমর হও। পুনঃ মধুর হাসি হাস, প্রেমানন্দে নাচ। এই অসীমের গুণ বর্ণনা করিতে হতবুদ্ধি হইতে হয়। যদি সুখে সংসারে বাস করিতে চাও, তবে ব্রহ্মচর্য্য-কল্পবৃক্ষের আশ্রয় ব্যতীত অন্য কোনও উপায় নাই।

সন্ন্যাস ও আনন্দ

যিনি কোনও পদার্থের দ্বেষ করেন না এবং কোনও পদার্থের আকাঙ্ক্ষাও রাখেন না, তিনিই নিত্য-সন্ন্যাসী। নিত্যতৃপ্তের আকাঙ্ক্ষা কোথায়? নিত্যানন্দের দ্বেষ কোথায়? সংসার ত্যাগ করিলেই যে প্রকৃত সন্ন্যাসী হওয়া যায়, তাহা নয়, অহংত্যাগী যিনি, প্রকৃত সন্ন্যাসী তিনি। যিনি মদবর্জ্জিত, তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী। যিনি অহংত্যাগী, তিনিই মদবর্জ্জিত। জীব অহঙ্কারের অধীন, জীবের কার্য্য অহংমূলক স্বার্থপর। যিনি পরার্থপর, তিনিই সন্ন্যাসী। জীবের অহংতত্ব স্বার্থ দ্বারা সংকীর্ণ, আর প্রকৃত সন্ন্যাসী নিঃস্বার্থ-পরার্থ দ্বারা প্রশস্ত। সন্ন্যাসী জীবনে যত কিছু কার্য্য, সমস্তই পরার্থ। যিনি নিজ রাজ-ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া ভোগবিরত হইয়া, অহংমমেতি আবরণ দূর করিয়াছেন, তিনিই পূর্ণ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন। সংসারে যদি প্রকৃত সন্ন্যাসী কেহ থাকেন, তবে তিনি অহংমমেতি ন্যাস করিয়া পূর্ণ ত্যাগী, ও বাসনা ক্ষয় করিয়া পূর্ণ সন্ন্যাসী হইয়াছেন, এবং তিনিই সন্ন্যাসীশ্রেষ্ঠ যোগিরাজ। কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগই সন্ন্যাসীর প্রধান লক্ষণ।

দার-পরিত্যাগ হেতু কামিনীত্যাগ, সংসার বা রাজ্যত্যাগ হেতু কাঞ্চনত্যাগ সিদ্ধ হয়।

ব্রহ্মার ব্রহ্মত্ব, বিষ্ণুর বিষ্ণুত্ব, শিবের শিবত্ব, কৃষ্ণের ভোগ, ইন্দ্রচন্দ্রাদির ভোগ, সমস্ত ভোগই পূর্ণ-সন্ন্যাসী ভোগের অন্তর্গত। তদতিরিক্ত পূর্ণভোগ যোগিরাজেতেই পূর্ণমাত্রায় প্রতিষ্ঠিত, অথচ তিনি পূর্ণ উদাসীন, পূর্ণ ত্যাগী, পূর্ণ বিরাগী, সুতরাং পূর্ণ সন্ন্যাসী। কেহ কেহ এমন সন্ন্যাসীশ্রেষ্ঠ আছেন যে, তিনি পূর্ণ গৃহী, পূর্ণ কামিনী-কাঞ্চন-অধিপতি। কাঞ্চন-ত্যাগী বটে, অথচ পূর্ণ ঐশ্বর্য্যশালী, সুবর্ণ-কোদণ্ডধারী। নির্লিপ্ততা হেতু সন্ন্যাসী কামিনীত্যাগী বটে, কিন্তু সর্ব্বশক্তিপতি। ভগবান ব্রহ্মা গায়ত্রী ও সাবিত্রীপতি, বিষ্ণু লক্ষ্মী ও সরস্বতীপতি, শিব দশমহাবিদ্যাপতি, শ্রীকৃষ্ণ ষোড়শসহস্র-গোপীপতি, কিন্তু যিনি পূর্ণ সন্ন্যাসী তিনি সর্ব্বশক্তিপতি, সর্ব্বশক্তিভোগী, সুতরাং পূর্ণ গৃহী হইয়াও পূর্ণ সন্ন্যাসী।

প্রকৃত সন্ন্যাসী কি পদার্থ? যে পুরুষ সন্ন্যাস পুরঃসর তত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তিনি ব্রহ্মবিদ হইয়াছেন, এবং সর্ব্বাত্মক হইয়াছেন। শব্দস্পর্শাদি গুণপঞ্চক, পৃথিব্যাদি ভূতপঞ্চক, চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চক, প্রাণাদি বায়ুপঞ্চক, সন্ন্যাসপ্রাপ্ত তত্বজ্ঞানী মহাপুরুষ এই সকল বস্তুর স্বরূপভূত হইয়া থাকেন, এক কথায় সর্ব্ব জগৎস্বরূপ হন। তত্ববিদ পুরুষ ব্রহ্মার স্বরূপ বলিয়া সত্যময়। তিনি তেজোময় স্বয়ংপ্রকাশশীল, তিনি মায়াময় সংসারের ঊর্দ্ধে বাস করেন। অতএব দোষ-গুণ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, তিনি দোষ-গুণ বর্জ্জিত হন। আত্মদান অপেক্ষা দুষ্কর কর্ম্ম জগতে আর কিছুই নাই; জননীকে অতিক্রম করিয়া আশ্রমান্তর গমনে ধর্ম্ম নাই; বেদজ্ঞ হইতে শ্রেষ্ঠতর আর কেহই হইতে পারে না; এবং সন্ন্যাস অপেক্ষা উৎকৃষ্ট তপস্যা আর কিছুই নাই। দুর্ব্বলচিতি সংসার ত্যাগী—ত্যাগী সন্ন্যাসী, আর সরলচিতি সংসার ভোগী—ভোগী সন্ন্যাসী।

জ্ঞান ও আনন্দের যে প্রভেদ, সুখ ও আনন্দে সেই প্রভেদ। যে সুখের বিচ্ছেদ নাই, তাহার নাম আনন্দ; সুখের আশ্রয় বিষয়, আনন্দের আশ্রয় আত্মা। সুখ বিষয়কে অবলম্বন করিয়া উৎপন্ন হয়, সুখের আবির্ভাব তিরোভাব আছে; আনন্দ চৈতন্যের সহচর, তাহা নিত্য, তাহার আবির্ভাব-তিরোভাব নাই। প্রকৃতি সংযোগ-জন্য রূপরসাদির অনুভবে সুখের উৎপত্তি হয়। আত্মাতে যে আনন্দ, তাহা অবিচ্ছিন্ন, নিত্য ও চিরাভ্যস্ত বলিয়া বিশেষ প্রণিধান ব্যতিরেকে অনুভব হয় না। আবরণের তারতম্য-অনুযায়ী আনন্দের ইতর বিশেষ হয়। প্রাণী মাত্রেরই কিছু না কিছু আনন্দ আছে; আত্মা মাত্রেই আনন্দ-অনুভব আছে। আত্মা যেমন স্বীয় অস্তিত্ব ও অবস্থা সর্ব্বদা অনুভব করে, তেমন সেই অনুভবের সঙ্গে সঙ্গে একটি অনির্ব্বচনীয় প্রীতি বা মধুর ভাবেরও অনুভব করে। আত্মার মধুরভাবের অনুভবের প্রমাণ কি? তাহার প্রমাণ এই যে, আত্মার স্বীয় অস্তিত্বানুভব সর্ব্বদাই মধুরভাবময়; সেই মধুরভাবের নামই আনন্দ। যখন মৃত্যুর বা আত্মার সম্ভাবিত বিনাশের আশঙ্কা উপস্থিত হয়, তখন সেই মধুরভাব বিশেষ পরিস্ফুট হইয়া উঠে। অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যেও মনুষ্য মরিতে চাহে

না, কেননা তৎকালেও স্বীয় সত্তানুভবের সঙ্গে সঙ্গে একটি আনন্দপ্রবাহ বিদ্যমান রহিয়াছে; মরিলে পাছে সেই অস্তিত্ব একেবারে দীপ শিখার ন্যায় নির্ব্বাপিত হইয়া যায় এবং তৎসহকৃত আনন্দের বিলোপ হয়, তজ্জন্যই মরণের এত ভয়। মরিলেও আত্মার অস্তিত্ব থাকিবে, এইরূপ বিশ্বাস জন্মিলে মরণের ভয় আর হইতে পারে না। যখন সুখ অনুভব হয়, তখন তাহার সঙ্গে যেন কিছু আনন্দ আছে বলিয়া বোধ হয়; তাহার কারণ এই, দুঃখকে সকলেই দূর করিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু সুখকে কেহ ছাড়িতে ইচ্ছা করে না। ইহার কারণ কি? ইহার কারণ এই যে, দুঃখ জীবের অত্যল্প আনন্দকে দূর করিতে চায়, অর্থাৎ দুঃখ আনন্দকে আবরণ করে, সেইজন্য লোকে দুঃখের আবরণ উন্মোচন করিবার চেষ্টা করে। পক্ষান্তরে সুখ আনন্দের সাহায্যকারী, সেই হেতু সুখ পাইবার জন্য লোকের আগ্রহ; তাহার কারণ দেখা যায় যে, লোকে সৎকার্য্য করিয়া সুখ এবং আনন্দ দুই পায়, সেইজন্য সুখ আনন্দের আবরণকারী না হইয়া প্রত্যুত সাহায্যকারী হয়।

বিশ্ব আনন্দ হইতে উৎপন্ন হইয়া আনন্দ দ্বারা জীবিত থাকে এবং অন্তকালে আনন্দেতে বিলীন হয়, অতএব আনন্দ হইতে জগৎ কি প্রকারে পৃথক হইবে? কোন পদার্থের নাম আনন্দ? শুক্রই আনন্দ, আনন্দই শুক্র। শুক্রমূলী যে কাম, তাহার স্মরণে আনন্দ, ব্যবহারে আনন্দ, ত্যাগে আনন্দ। যে পদার্থ শরীর হইতে নির্গত হইবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আনন্দ দিতে বিরত হয় না, যাহার স্মরণ হইতে ত্যাগ পর্য্যন্ত আনন্দ জন্মে, তাহা আনন্দময়। সেই আনন্দময় পদার্থ যদি শরীরে ধৃত থাকে, তাহা হইলে শরীর কত নীরোগ, মন কত পুলকিত থাকে, তাহা সহজেই বুঝা যায়। আনন্দ দুই ভাগে বিভক্ত—পূর্ণানন্দ ও খণ্ডানন্দ। খণ্ড শুক্রে খণ্ডানন্দ; অখণ্ড শুক্রে পূর্ণানন্দ বা অখণ্ডানন্দ। বীর্য্যানুযায়ী আনন্দের তারতম্য কল্পিত হয়। যার যত বীর্য্য, তার তত আনন্দ। মনুষ্যের স্বাভাবিক আনন্দ এক, মনুষ্য হইতে মনুষ্য গায়কের একশত গুণ আনন্দ, মনুষ্য গায়ক হইতে একশতগুণ গন্ধর্ব্বানন্দ, গন্ধর্ব্বানন্দ হইতে শতগুণ পিতৃলোকের, পিতৃলোক হইতে শতগুণ অজানজ দেবতাদের, অজানজ দেবতা হইতে শতগুণ দেবতাদের, দেবতাদের হইতে শতগুণ কর্ম্মদেবের, কর্ম্মদেব হইতে শতগুণ ইন্দ্রানন্দ, ইন্দ্রানন্দ হইতে শতগুণ বৃহস্পতির, বৃহস্পতি হইতে শতগুণ ব্রহ্মার বা ব্রহ্মলোকবাসীর। এই সমস্তই খণ্ডানন্দ। এতদূর্দ্ধ বাক্য মনের অগোচর যে আনন্দ, তাহাই অখণ্ড পূর্ণানন্দ।

গ্লানি হইলেই আনন্দের হ্রাস, আনন্দ হইতেই গ্লানির নাশ অবশ্যম্ভাবী। সদানন্দ পদার্থের গ্লানি নাই, বিষাদ নাই, দৈন্য নাই। সদানন্দ পদার্থের ব্যাধি কোথায়, জরা কোথায়, দুঃখ কোথায়, বিষাদ কোথায়? নাহি রোগ, নাহি শোক, নাহি দুঃখ, নাহি ভোগ, নাহি খেদ, নাহি শ্রান্তি, নাহি কাম, নাহি ভ্রান্তি, নাহি তৃষ্ণা, নাহি ক্লান্তি, নাহি ক্ষুধা, নাহি ক্ষোভ, নাহি ক্রোধ, নাহি লোভ। পূর্ণানন্দ পদার্থের যখন শ্রান্তি নাই, ক্লান্তি নাই, দুঃখ নাই, চিন্তা নাই, ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণা নাই, ছেদ নাই, ভেদ নাই, শোষণ নাই, দাহ নাই, সুতরাং যিনি পূর্ণানন্দ, তাঁহাতে এবং ঈশ্বরে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই।

স্বাধীন ও পরাধীন

এই বিশ্ব শক্তিরই খেলা। বিশ্বের যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, সেই দিকেই দেখি কোনও এক মহাশক্তি স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল, দ্যুলোক, ভূলোক, গোলোক, ব্রহ্মলোক ব্যাপিয়া আব্রহ্ম কীট সকলেরই উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। যে দিকে যে ভাবে ইচ্ছা, সেই দিকে সেই ভাবে চালাইতেছে। শক্তিচক্রে কলুর বলদের ন্যায় সমস্ত ঘুরিতেছে, যেন কাহারও স্বাধীনতা নাই, সকলেই শক্তির বশ, সকলেই শক্তির অধীন। বিশ্ব যেন শক্তিবশে চলিতেছে, শক্তিবশেই কার্য্য করিতেছে। সংসারে সকলেই স্বাধীনতা লাভ করিবার জন্য লালায়িত কেবল আপন বশে থাকিতে অর্থাৎ স্বাধীন ভাবে থাকিতে চায়। সংসারে স্বতন্ত্র হইতে ইচ্ছুক সকলেই; কয়জনে সেই ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিতে পারে, এবং কয়জনে স্বাধীন হইতে পারে? সংসারে কামের অধীন থাকিয়া কে কবে স্বাধীন হইতে পারিয়াছে? কামনাধীনই পরাধীন। কামনার অধীন থাকিয়া কেহ স্বাধীন হইতে পারে নাই, পারিবেও না। কামনা-মুক্ত যে দিন, স্বাধীন হবে সেই দিন। সংসারে কামনাহীন কে আছে? দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, রাজর্ষি, তাঁহারাও কোন না কোন রিপুর, কোন না কোন ভাবের অধীন আছেনই। কেহ লোভের অধীন, কেহ ক্রোধের অধীন, কেহ অভাবের অধীন, কেহ স্বভাবের অধীন, কেহ ভোগের অধীন, কেহ যোগের অধীন, কেহ শোকের অধীন, কেহ মোহের অধীন, ইত্যাদি। অধীনতা-শৃঙ্খলে বিশ্ব শৃঙ্খলিত। কাহার সোনার বেড়ি, কাহার রূপার বেড়ি, কাহার লোহার বেড়ি, এই মাত্র প্রভেদ। তবে কেমন করিয়া বলিব বিশ্ব স্বাধীন? কেমন করিয়া বলিব তুমি বিশ্ব ছাড়া স্বতন্ত্র? তুমি যে নিজেকে স্বাধীন বলিয়া মনে করিতেছ, বল দেখি তোমার জীবনে কোনও দিন স্বাধীনতা ভোগ করিয়াছ? আজীবনই দেখিতেছি তুমি পরাধীন।

মাতৃ-কুক্ষিতে আভির্ভূত হইতে পুনঃ মাতৃগর্ভে প্রবেশ পর্য্যন্ত তোমার ধারাবাহিক জীবনই পরাধীন। কে স্ব-ইচ্ছায় মাতৃগর্ভে প্রবেশ করিতে চায়? বাল্যকাল বল, যৌবন বল আর বার্দ্ধক্যই বল, কোনও কালেই সুখ নাই। পীড়ার যন্ত্রণায় চিরকালই কষ্টভোগ করিতে হয়, অবশেষে জীর্ণ-শীর্ণ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয়। যখন মৃত্যুকাল আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন মৃত্যুযন্ত্রণায় ও ভয়ে ছটফট করিতে থাকে, তথাপি মরিতে চাহে না, তবু যেন কোনও অজ্ঞাত শক্তি আসিয়া ঘাড় ধরিয়া লইয়া যায়; ইহাকেই কি বলিবে স্বাধীনতা? অবোধ আর কারে বলে? সুদীর্ঘ জীবন শক্তিবশে দীনহীনের ন্যায় পরাধীন ভাবে কাটাইলে, বল দেখি কোন সময় তুমি স্বাধীন ও সুখী হইয়া কাটাইয়াছ? কেমন করিয়া বলিব তুমি স্বাধীন? মাতৃগর্ভ হইতে পরতন্ত্র হইয়া বাহির হইয়াছ, পুনঃ পরতন্ত্র হইয়া মাতৃগর্ভে প্রবেশ করিবে, বল দেখি তুমি স্বতন্ত্র ছিলে?

আশা-তৃষ্ণার জোরে, কাম-যন্ত্রণার ঘোরে বিশ্বে সকলেই মোহাভিভূত। এই যে আব্রহ্ম কীট ক্ষুধাতৃষ্ণার জোরে, বাত-শ্লেষ্মার বিকারে, রোগ-শোকের তাড়নে, শীত-গ্রীষ্মের পীড়নে ছটফট করিতেছে, তাহা স্ববশে কি অবশে? ইচ্ছায় কি অনিচ্ছায়? অবশ্য বলিতে হইবে অবশে ও অনিচ্ছায়। যদি অবশে ও অনিচ্ছায় সকলকেই যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইল, তাহা হইলে তাহাদিগকে স্বাধীন বলিব কিরূপে? সেইজন্য বলিতে বাধ্য বিশ্বশক্তি পরাধীন। তবে কি জগতে স্বাধীন শক্তি নাই? বিশ্বে কি পূর্ণ শক্তির অভাব? পূর্ণশক্তির অভাব হইলে পূর্ণের আদর্শ কোথায় পাইবে? কোন আদর্শে আমরা পূর্ণাভিমুখে ধাবিত হইব? কোন আদর্শে আমরা স্বাধীনতা লাভ করিব? অতএব জগতে যখন অধীন শক্তি আছে, তখন স্বাধীন শক্তিও আছে। অপূর্ণ থাকিলেই পূর্ণ আছে।

সর্ব্ব শক্তির উপর আধিপত্যকারী স্বাধীন শক্তি কোথায় আছে? শিবলোক, ব্রহ্মলোক, ভূলোক, গোলোক খুঁজিলাম, কোথায়ও স্বাধীন শক্তির সমাবেশ দেখিতে পাইলাম না; তবে কি স্বাধীন শক্তি বিশ্বে নাই? হ্যাঁ আছে। সর্ব্বাধিপত্য স্বাধীন পূর্ণ শক্তি গোলোক, শিবলোক, ব্রহ্মলোকে নাই, আছে তাহা মর্ত্তে; বিশ্বে নাই,

আছে তাহা বিশ্ব কেন্দ্রে, দেব, যক্ষ, নরে নাই; আছে তাহা আর্য্যে। বিশ্বকেন্দ্র ভারতে, শক্তিকেন্দ্র আর্য্যতে একমাত্র এই স্বাধীন শক্তির সমাবেশ। এই শক্তির নাম 'ভীষ্মশক্তি' ও 'হনুমাৎশক্তি'। ইহাদিগের শুক্র অচ্যুত, সেই জন্য পূর্ণ স্বাধীন।

যাঁহার শক্তি খণ্ডিত হয় নাই, তিনিই অখণ্ডশক্তিমান। অখণ্ডশক্তিমান, পূর্ণশক্তিমান, সর্ব্বশক্তিমান—একই কথা। যিনি সর্ব্বশক্তিমান, তাঁহাতে শক্তিবশ ও শক্তি বিরজমান; সুতরাং তিনি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন। জীব মাত্রেই অষ্টাদশ মহাদোষ সংযুক্ত, সেইজন্য অধীন বা পরাধীন। অষ্টাদশ মহাদোষ কি? মোহ, তন্দ্রা, ভ্রম, রুক্ষ, রস, উল্বণ কাম, লোলতা, মদ, মাৎসর্য্য, হিংসা, খেদ, পরিশ্রম, অসত্য, ক্রোধ, আকাঙ্ক্ষা, আশঙ্কা, বিশ্ববিভ্রম, বিষমত্ব ও পরাপেক্ষা—এই অষ্টাদশ মহাদোষ।

মোহ—দেহাদিতে আত্ম বুদ্ধির নাম মোহ। কোনও বস্তুতে আত্ম সম্বন্ধ স্থাপন করার নাম মোহ। মুগ্ধত্বই সকল দুঃখের মূল। প্রকৃতি নানা সাজে হাবভাবে পুরুষকে মোহিত করিতেছে, পুরুষ তাহাতেই মুগ্ধ হইতেছে, ইহারই নাম মোহ, অজ্ঞান, অবিদ্যা ইত্যাদি। ইহাই সমস্ত দুঃখেরর মূল। হর্ষ, বিচ্ছেদ, দুঃখ, ভয়, বিষাদাদি হইতে মনের যে মূঢ়তা, দৈন্যাদি হইতে কাতরতা, তাহারই নাম মোহ। প্রকৃতি কাহাকে মুগ্ধ করে? লোভীকেই মুগ্ধ করে, লোভীরই মোহ, মোহগ্রস্তেরই পতন।

মোহ একটি বৃক্ষ, পাপ রূপী লোভ ইহার বীজ, মিথ্যা তাহার সুবিস্তীর্ণ শাখা, দম্ভ ও কুটিলতা তাহার পত্র, কুকার্য্যরূপ পুষ্প দ্বারা সদাই পুষ্পিত, পরনিন্দা-গন্ধের দ্বারা সুরভিত, অজ্ঞানরূপ ফলের দ্বারা ফলিত। মোহরূপ বৃক্ষে মায়ারূপ শাখাকে ছদ্ম, পাষণ্ড, চৌর, কূট, ক্রূর, পাপী সকল আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে; সেই অজ্ঞানরূপ ফল হইতে অধর্ম্মরূপ মধু নির্গত হইতেছে। যে সকল লোক এই বৃক্ষের ছায়া আশ্রয় করিয়া তাহার ফল খাইয়া দিন দিন পুষ্ট হইতেছে, মৃত্যুরূপ পতনে তাহারা রসাতলগামী হয়।

মোহ কার? লোভ যার। লোভ কার? অভাব যার। অভাব কার? অপূর্ণ যার। অপূর্ণ কার? ভাগ হয় যায়। মোহ নাই কার? লোভ নাই যার। লোভ নাই কার? অভাব নাহি যার। অভাব নাহি কার? অপূর্ণ নাহি যার। অপূর্ণ নাই কার? ভাগ হয় নাই যার। যাহার অভাব হইয়াছে, তাহার অভাব পূরণের জন্য লোভ হইয়াছে; সুতরাং মোহ জন্মিয়াছে।

তন্দ্রা—কার্য্যহেতু ইন্দ্রিয়ের ক্লান্তি উপস্থিত হইলে আলস্য, জৃম্ভণ অর্থাৎ হাই আগমন করে, তাহার পরেই নিদ্রা আবির্ভূত হয়। কোন বৃত্তির নাম নিদ্রা? যাহাতে সমুদয় মনোবৃত্তি লীন হয়, সেই অজ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া যখন মনোবৃত্তি উদিত থাকে, তখন তাহা নিদ্রা বা সুষুপ্তি নামে অভিহিত হয়। প্রকাশস্বভাব সত্বগুণের আচ্ছাদক তমোগুণের উদ্রেক অবস্থাকেই আমরা নিদ্রা বলি। তমঃ বা অজ্ঞান পদার্থই নিদ্রাবৃত্তির অবলম্বন। যখন তমোময় অজ্ঞানাত্মক নিদ্রাবৃত্তির উদয় হয়, তখন সর্ব্বপ্রকাশক সত্বগুণটি অভিভূত থাকে। তৎকালে কোনও প্রকার প্রকাশ্য বস্তুর প্রকাশ থাকে না। সেইজন্য লোকে বলে আমি নিদ্রিত ছিলাম, আমার জ্ঞান ছিল না। বস্তুতঃ তখন তাহার কোনও জ্ঞান ছিল না এরূপ নহে, অজ্ঞানবিষয়ক জ্ঞান ছিল। সেই জন্যই সে নিদ্রাভঙ্গের পর তৎকালের অজ্ঞানবৃত্তিকে স্মরণ করিয়া থাকে। নিদ্রাকালে অজ্ঞানময় বা তমোময় বৃত্তি অনুভূত হইয়াছিল বলিয়াই নিদ্রাভঙ্গের পর তাহা তাহার স্মরণ হয়, এবং সেই স্মরণের দ্বারাই নিদ্রার বৃত্তি নির্ণয় হয়। বিশ্বে এমন কোনও প্রাণী নাই, যে নিদ্রার অধীন নহে; কেহ অল্পকাল নিদ্রা যায়, কেহ দীর্ঘ সময় নিদ্রা যায়। দিবা-রাত্রি সকলেরই আছে; জাগ্রত-সময় দিন, নিদ্রার সময় রাত্রি।

যাহাদের হ্রস্ব রাত্রি, তাহাদের হ্রস্ব নিদ্রা; যাহাদের দীর্ঘ রাত্রি, তাহাদের দীর্ঘ নিদ্রা। মনুষ্যের নিদ্রার সময় চারি প্রহর, পিতৃলোকের পনেরো দিন, দেবলোকের ছয় মাস, ব্রহ্মা প্রভৃতির চতুর্যুগসহস্র পরিমাণ নিদ্রার সময়। প্রাণী মাত্রেই নিদ্রায় সমাচ্ছন্ন। নিদ্রার ক্ষমতা অসীম; রাজা, প্রজা, দীন, ভিখারী, চন্দ্র, হরিহর, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, কাহাকেও ছাড়িয়া কথা কয় না, সকলেই ইহার বশ। বিশ্ব নিদ্রার বশ, নিদ্রার অধীন। নিদ্রা মায়াবিনী

কুহকিনী; এই মায়ার কুহকে সকলেই বশীভূত। নিদ্রাজয়ী কোনও লোক নাই। বিশ্ব-মহানিশায় মোহনিদ্রায় সকলেই নিদ্রিত। এ নিশায় জাগ্রৎ কে? মোহহীন যে। মোহহীন কে? সংযমী যে। সংযমী কে? জিতেন্দ্রিয় যে, সংযমী সে। সংযমী যে, জাগ্রৎ সে।

ভ্রম—ভ্রম শব্দে ভ্রান্তি, মিথ্যাজ্ঞান, বুদ্ধি বিপর্য্যয়। যে জ্ঞান মিথ্যা, যাহা সেইরূপে স্থায়ী হয় না, যাহা বিষয় দর্শনের পর অন্যথা হইয়া যায়, সেই জ্ঞানের নাম ভ্রান্তিজ্ঞান। ভ্রম দুই প্রকার—এক সংবাদী ভ্রম, আর এক বিসংবাদী ভ্রম। সংবাদী ভ্রম যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম, মরীচিকায় জলাশয়ভ্রম, শুক্তিকাতে রজতভ্রম ইত্যাদি। আর বিসংবাদী ভ্রম, ইহাকে সংশয়ভ্রম বলে; যেমন—এইটা মনুষ্য কি মুড়া গাছ, ইহা গ্রাম কি বন, এই কথা বলিয়াছে হয় রাম না হয় রমেশ, ইত্যাদি যত কিছু অনর্থের মূলই ভ্রম। ভ্রমের মূল শক্তিবিপর্য্যয়। দেখায় ভুল, শোনায় ভুল, বুদ্ধির ভুল,—সমস্ত শক্তিবিপর্য্যয়। দেখায় ভুল দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, শোনায় ভুল শ্রবণশক্তির হ্রাস, বুদ্ধির ভুল ধারণাশক্তির হ্রাস, ইত্যাদি। মূলে শক্তির হ্রাসই ভ্রমের কারণ। বুদ্ধিতে যাহার পূর্ণশক্তি নাই, ইন্দ্রিয়ে যাহার পূর্ণশক্তির অভাব, মনে করিতে হইবে তাহারই শক্তিবিপর্য্যয় এবং সেই ভ্রমের অধীন। যাহার বুদ্ধি শক্তিপূর্ণ, ইন্দ্রিয় শক্তিপূর্ণ, তিনিই ভ্রমরহিত, তিনিই স্বাধীন।

কর্কশ—যাহার বাক্য কঠোর কর্কশ, তাহাই রুক্ষরসাশ্রিত। ঈর্ষা, দ্বেষ, ক্রোধ,—রুক্ষ বাক্যের কারণ। বিকারী জগতে ক্রোধ নাই কার? ক্রোধের কারণ ইচ্ছার ব্যাঘাত, ইচ্ছা-ব্যাঘাতের কারণ ইচ্ছাপূরণের শক্তির অভাব। অপূর্ণ শক্তিমানের ইচ্ছাপূরণের শক্তির অভাব। ইচ্ছাপূরণ-শক্তির অভাবে ক্রোধের উদয় হয়, ক্রোধের উদয়ে যে বাক্য বলা হয়, তাহাই কর্কশ বাণী। ক্রোধের সময় শান্ত বাক্য আসিতে পারে না। ইচ্ছার ব্যাঘাত আছে, সেইজন্য ক্রোধ আছে, সুতরাং বাক্যে রুক্ষরস আছে। যাহার শরীরে ক্রোধ নাই, তাহার বাক্য কখনই কর্কশ হইতে পারে না।

কাম—কাম আদি রিপু, ইহা ষড় রিপুর অগ্রগণ্য। কাম অর্থে সাধারণতঃ কামনা, বাসনা, জীবের বিষয়ভোগের ইচ্ছা। আবার কামনা অর্থে স্ত্রী পুরুষ পরস্পরের যৌবনসংযোগ ইচ্ছাও বুঝায়। কাম হইতে প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে, ও কোনও স্থলে সকল কর্ম্মই কামজন্য হইয়া থাকে। এই জগতে যত কিছু কর্ম্ম, তাহার মূল কারণ কাম বা কর্ম্মেচ্ছা। স্নান, সন্ধ্যা, যোগাদি কার্য্যকলাপ ও আত্মতত্ব সাক্ষাৎকাররূপ ফলকামনায় অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই জগতে কামনা ছাড়া কোনও কার্য্যই নাই।

কামনা সঙ্কল্পস্বরূপ, ইহা না থাকিলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ভাস্কর, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন না। কাম কাহারও অধীন নহে; কামছাড়া জগতে আদরের জিনিস আর কিছু নাই। আমরা যাহাকে পিতা, মাতা, ভ্রাতা, বন্ধু, গুরু, অর্থদাতা, রক্ষক ও নন্দনকানন বলিয়া বোধ করিয়া থাকি, সে সকল কামনা ভিন্ন আর কিছুই নহে; কামনাই সকল বিকৃতস্বরূপ ও স্বকীয় কল্পনাবলে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার স্বরূপ বর্ণনা করা কাহারও সাধ্য নহে; কেবল বুদ্ধির দ্বারা ইহার প্রতীতি হইয়া থাকে, আর কামনাই সকলপ্রকার আনন্দের পরাকাষ্ঠা রূপে অবস্থিতি করিতেছে; ইহা ভিন্ন যাহা, তাহা অনশ্বর জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ, তাহাকেই তত্ববেত্তারা ব্রহ্ম বা ব্রহ্মানন্দ বলিয়া থাকেন। সেই ব্রহ্ম হইতেই ইচ্ছা, জ্ঞান ও কৃতিস্বরূপ কামনা উৎপন্ন হইয়াছে। এই কাম অতি সূক্ষ্ম, সেইজন্য অতীন্দ্রিয়। দেহরাজ্যে কামই রাজা, ক্রোধ তাহার সেনাপতি, লোভ তাহার মন্ত্রী, মোহ তাহার মহিষী, মদ তাহার পুত্র, মাৎসর্য্য তাহার কন্যা।

ক্রোধ—ক্রোধ শব্দে চঞ্চলতা, বা রাগদ্বেষাদি নিমিত্ত চিত্তের যে লঘুতা, তাহাই ক্রোধ। বিকারী জগতে রাগহীন প্রাণী নাই, সুতরাং চাঞ্চল্যবর্জ্জিত জীব নাই। রাগদ্বেষাদি লইয়াই সংসার। যতক্ষণ সংসার, ততক্ষণ রাগদ্বেষ; যতক্ষণ রাগদ্বেষ, ততক্ষণ সংসার। রাগ কার? অতৃপ্ত মানবের। অতৃপ্ত কে? অপূর্ণ যে। যিনি

অপূর্ণ, যাঁহার অভাব, তিনিই অতৃপ্ত; যেহেতু অতৃপ্ত, সেই হেতু রাগান্বিত; যেহেতু রাগান্বিত, সেই হেতু চিত্ত চঞ্চল। কলসী যদি বারিপূর্ণ থাকে, তবে নড়ে-চড়ে না; কিঞ্চিৎ বারিতেও যদি অপূর্ণ থাকে, তবেই নড়ে-চড়ে। চিৎ-কলসীতে শক্তি বারি অপূর্ণ, সেইজন্য চাঞ্চল্যযুক্ত ও অধীন।

কামের প্রতিবন্ধকই ক্রোধ অর্থাৎ বাঞ্ছিত পদার্থ লাভের প্রতিবন্ধক বা ইচ্ছার প্রতিঘাতে যে আক্রোশ, তাহারই নাম ক্রোধ। যাহার কামনা আছে, তাহারই ক্রোধ আছে; কামনা থাকিলেই তাহার প্রতিবন্ধক আছে, সেইজন্য ক্রোধও আছে। জীব মাত্রেই বিকারী, কামদাস ও ক্রোধান্বিত, সেইজন্য জগৎ ক্রোধের অধীন। ক্রোধহীন কে? নিষ্কাম যে। নিষ্কাম সেই জন্য ক্রোধরহিত।

লোভ—লোভ শব্দে আকাঙ্ক্ষা, আশা, পরদ্রব্যপ্রাপ্তির অভিলাষ ইত্যাদি। ক্ষুধা ও তৃষ্ণাদি দ্বারা লোকে কামের অন্ত পাইতে পারে; ক্রোধের ফল যে হিংসা, তাহার নিষ্পত্তি করিয়া, ক্রোধেরও অন্ত পাইতে পারে; কিন্তু সমস্ত জয় করিয়া এবং সমুদয় পৃথিবী ভোগ করিয়াও লোভের অন্ত, আশার পার বা আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি পাইতে পারে না। কাম, ক্রোধ ও লোভ—এই তিনই আত্মজ্ঞানাপহারক, নরকের দ্বারস্বরূপ। জ্ঞানীগণ এই তিনকেই ত্যাগ করিয়া থাকেন। কখনও অসন্তোষ হইবে না। অসন্তোষই অধঃপতনের মূল কারণ। আকাঙ্ক্ষা হইতে চিত্তবিক্ষেপ হয়, সত্বগুণ হ্রাস হয়, অন্য গুণ বিষমতা ধারণ করে, এবং নানা ক্রিয়া উৎপন্ন হইয়া জীবকে স্বরূপ হইতে পতিত করে।

বিশ্বে সকলেই দীন, কেননা, পূর্ণশক্তি নাই; পূর্ণশক্তির অভাব, সেইজন্য দীন। অপূর্ণ যে, দীন সে দীন যে, আকাক্ষা সে; আকাক্ষা যে, অধীন সে। জীব মাত্রেই অপূর্ণ, অভাবী, দীন, সুতরাং অধীন। আকাঙ্ক্ষা নাই কার? অপূর্ণ নাই যার। যিনি পূর্ণ, তিনিই ধন্য; তিনিই পূর্ণানন্দে আনন্দিত, তাঁহাকে সংসারের কোন বিকারী পদার্থ আনন্দ জন্মাইতে বাধা দিতে পারে না। সর্ব্বসিদ্ধির অন্তর্গত প্রাকাম্য-সিদ্ধি যাঁহাকে দাসীর ন্যায় পরিচর্য্যা করে, তাঁহার কোন পদার্থের অভাব থাকে না।

মোহ—হৃদয়ক্ষেত্রে মোহমূলক এক বিচিত্র কামতরু বিরাজিত রহিয়াছে; ক্রোধ ও মান তাহার স্কন্ধ, কর্তব্য-অভিলাষ উহার আলবাল অর্থাৎ বাঁধ, অজ্ঞান তাহার আধার, প্রমাদ উহার সেচন-সলিল, অসূয়া বা নিন্দা তাহার পত্র, পূর্ব্বজন্ম-উপার্জ্জিত পাপ উহার সার, চিন্তা উহার পল্লব, শোক তাহার শাখা, ভয় তাহার অঙ্কুর; সেই বৃক্ষ মোহিনীপিপাসারূপ লতাজাল দ্বারা নিয়ত বেষ্টিত রহিয়াছে। নিতান্ত লুব্ধ মানবগণ লৌহময় পাশ দ্বারা সংযত হইয়া, সেই ফলদ মহাবৃক্ষের ফল লাভে অভিলাষ করত তাহাকে পরিবেষ্টন করিয়া সেবা করিতেছে। যিনি সেই সমুদয় পাশকে বশীভূত করিয়া উক্ত বৃক্ষকে ছেদন করেন, তিনি বৈষয়িক সুখ-দুঃখ ত্যাগ করিতে বাসনা করিলে, অনায়াসে সুখ-দুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হন। যে অকৃতজ্ঞ অজ্ঞ পুরুষ সেই কামতরুকে সতত বর্দ্ধিত করে, সেই বিষয়ই—বিষ যেমন আতুরকে বিনষ্ট করে সেইরূপ—তাহাকে বিনষ্ট করিয়া থাকে। কৃতিব্যক্তি সেই বদ্ধমূল বৃক্ষের অজ্ঞানরূপ মূলকে যোগপ্রসাদে সমাধিরূপ অসি দ্বারা বলপূর্ব্বক ছেদন করেন। তাঁহাকে আর মোহ দ্বারা আচ্ছন্ন হইতে হয় না। তিনি বন্ধন বিমোচনপূর্ব্বক সমস্ত দুঃখ অতিক্রম করেন।

দেহীর হৃদয়ে মোহ উৎপাদনের মূল কারণ স্বরূপ কামবৃত্তি প্রকৃতিদত্ত মূল উপাদান। অতএব ভগবৎ-ইচ্ছায়, যাহা সৃষ্টিরক্ষার হেতুভূত হওয়ায় ঈশ্বরের অভিপ্রেত, প্রকৃতি প্রণোদিত, সুতরাং শাস্ত্রসম্মত বৈধ, তাহা অবশ্য কামরিপু নামে গণ্য নহে; পরন্তু তাহারই শাস্ত্রবিরুদ্ধ অত্যাচার, ব্যভিচার ও অপব্যবহারই উহার রিপুত্ব-পরিণতির হেতু। মানবসমাজ স্থানবিশেষে জাতিবিশেষে মূলতঃ ইহারই অত্যাচারে উৎসন্ন গিয়াছে।

কাম বালকে অবিকশিত, যুবকে সুবিকশিত, প্রৌঢ়ে অবসাদিত, বৃদ্ধে নিদ্রিত, আর সাধকে শমিত, সংযত, সংহত; ফলে রিপুত্ব-পরিহারে মিত্রত্বে পরিণত। শত্রু মিত্ররূপে পরিণত হইলে আর তাহার বধের

আয়োজনের প্রয়োজন কি? কাম শরীরের উৎপাদকও বটে, উচ্ছেদকও বটে। কিন্তু হায়! কামের কি মোহ-উন্মাদিনী কুহকিনী শক্তি! লোকে জানিয়া-শুনিয়া প্রবৃত্তি পিশাচীর পূজায় এই করাল কাম-খড়েগর আত্ম-সর্ব্বস্ব উৎফুল্লচিত্তে বলিদান করে।

কাম ত্রিভুবনবিজয়ী। ইহা অঙ্গরহিত, অশরীরী। জর জর হল অঙ্গ অশরীরীর প্রহারে, অনঙ্গ হইল অঙ্গ অনঙ্গ-প্রহারে। ইহার গর্ব্ব ও দর্প এত হইবারই কথা; কারণ কাম সর্ব্বজয়ী, ইহা কাহাকেও ছাড়িয়া দেয় না, সকলেই ইহার অধীন, সকলেই ইহার নিকট বিজিত। জগতে কেবলমাত্র ছয় জন কাম জয় করিয়াছেন—সনক, সনন্দ, সনৎকুমার, সনাতন, হনুমান ও ভীষ্মদেব। প্রথম চারিজন—সনক, সনন্দ, সনৎকুমার ও সনাতনকে কামদেব আক্রমণ করিলেন; ইঁহারা দেখিলেন কামের আক্রমণ প্রতিহত করা কাহারও সাধ্য নহে; সুতরাং সকলেই দুর্গ আশ্রয় করিলেন। যেমন কোন পক্ষ অন্যপক্ষ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে, তাহা যদি প্রতিরোধ করিতে না পারে, তবে দৃঢ় দুর্গ আশ্রয় করিয়া থাকে, তাহা হইলে বিপক্ষ আক্রমণ করিলেও কিছু করিতে পারিবে না, এই বিশ্বাসে; এবং যে পক্ষ দুর্ব্বল, সেই পক্ষই দুর্গ আশ্রয় করে, সবল হইলে কেহ কখনও দুর্গ আশ্রয় করে না, বরং আক্রমণই করিয়া থাকে। সেইরূপ ইঁহারাও দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত দুর্গ আশ্রয় করিয়াছেন। ইঁহাদিগের কাম পরাহত দুর্গ কি? পঞ্চমবর্ষীয় কুমার-বয়সই ইঁহাদিগের কাম পরাহত দুর্গ অর্থাৎ পঞ্চমবর্ষীয় বালকের যেরূপ আকৃতি, আজীবন তদাকৃতি হইয়াই রহিলেন। বালকে কাম অবিকশিত, সুতরাং কাম এখানে পরাহত হইলেন, কিন্তু পরাস্ত হইলেন না; সুতরাং গর্ব্বও খর্ব্ব হইল না, দর্পও চূর্ণ হইল না।

দ্বিতীয়তঃ কন্দর্প হনুমানকে আক্রমণ করিলেন, হনুমান নিজে তাঁহাকে পরাস্ত করিতে না পারিয়া এবং উপযুক্ত দুর্গ আশ্রয় না পাইয়া প্রবলের শরণাপন্ন হইলেন। শরণাপন্ন হওয়াই দুর্ব্বলতার লক্ষণ। তিনি সর্ব্বশরণ ভগবানের আশ্রয় লইলেন। যেমন কোনও পক্ষ অন্য পক্ষকে আঁটিতে না পারিলে, কোনও প্রবল পক্ষের শরণ লয়, সেইরূপ ইনিও ভগবানের শরণ লইলেন। তাঁহারও কাম পরাহত হইল, কিন্তু পরাস্ত হইল না; সুতরাং গর্ব্বও খর্ব্ব হইল না, দর্পও চূর্ণ হইল না।

তৃতীয়তঃ মনসিজ ভীষ্মদেবকে আক্রমণ করিলেন, ভীষ্মদেব সমর্থতা প্রযুক্ত কোনও দুর্গ আশ্রয় করিলেন না এবং কাহারও শরণ গ্রহণও করিলেন না, নিজ শক্তিতেই কামকে পরাস্ত করিলেন; সুতরাং এখানে কাম পরাস্ত হইল, এবং তাহার গর্ব্বও খর্ব্ব হইল, দর্পও চূর্ণ হইল। ধন্য বীর, যিনি ত্রিভুবনবিজয়ীকে জয় করিলেন। ধন্য বীর, যিনি ত্রিভুবনবাসীকে বশ করিয়া স্বাধীন হইয়াছেন। ভীষ্মদেব নিষ্কাম অথচ পূর্ণকাম, সকল কামনাই তাঁহাতে পূর্ণ অর্থাৎ পূর্ণতৃপ্ত। এই অনঙ্গ প্রতাপে কৃষ্ণ বিষ্ণু অন্ধ, শিব উন্মত্ত, ব্রহ্মা মোহিত, মুনি ভ্রান্ত, পশ-পক্ষী ক্ষিপ্ত, মনুষ্য মুগ্ধ; অতএব তাঁহার তুল্য প্রতাপী আর কে আছে? এ হেন প্রতাপীর প্রতাপ যৎসকাশে প্রতিহত, গর্ব্ব খর্ব্বিত, দর্প চূর্ণিত, তাঁহার তুল্য বীর জগতে কে আছে? তিনি স্বাধীন, অন্য সমস্তই কামকিঙ্কর ও পরাধীন।

মদ—মদ শব্দে মত্ততা, গর্ব্ব। অহংকার হইতে মদের উৎপত্তি, অহংকার অজ্ঞান প্রসূত। জ্ঞাননাশক আহ্লাদের নাম মদ। যেমন মদ খাইয়া মত্ততা, তাহাতে জ্ঞানের নাশ অথচ আহ্লাদ আছে। আব্রহ্ম কীট, হরি-হর-বিরিঞ্চ্যাদি অণিমাদি ঐশ্বর্য্যে মত্ত, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের আধিপত্যে গর্ব্বিত অথচ ঐশ্বর্য্য প্রাকৃতিক, সুতরাং বিকারী, আধিপত্যও ক্ষণিক অথচ ইহা নিত্য অপ্রাকৃতিক। ব্রহ্ম-ঐশ্বর্য্য, ব্রহ্মানন্দ জ্ঞাননাশক; আমরা যেমন বিকারী ক্ষণস্থায়ী পঞ্চভূত-ঐশ্বর্য্যমত্ত, দুই-এক জন পুরুষের উপর কর্ত্তৃত্ব করিয়া গর্ব্বিত, অহংকারে স্ফীত; উঁহাদিগের না হয় দুই চারি দশ হাজারের উপর কর্ত্তৃত্ব; সমস্ত শক্তির উপর কর্ত্তৃত্ব নাই অথচ ইহাতেই মত্ত, ইহাতেই গর্ব্বিত, ভুলেও ব্রহ্মৈশ্বর্য্যে ব্রহ্মানন্দের দিকে মন দেন না; ইহা হইতে জ্ঞাননাশক আহ্লাদ আর কারে বলি? যাহার অহংকার আছে, তাহারই মদ আছে। সেইজন্য সকলেই অহংকারী ও মত্ত, সেই জন্য মদাধীন।

মাৎসর্য্য—মাৎসর্য্য অর্থে মৎসরতা অর্থাৎ পরশ্রী-কাতরতা। বিকারী জগতে কে মৎসরতা-হীন? যাহারা খণ্ডশ্রী, তাহারা পূর্ণশ্রী দেখিলে কাতর হইয়াই থাকে এবং পূর্ণশ্রী লাভে ঈর্ষান্বিত হয়। সকলেরই শ্রী খণ্ডিত, সেইজন্য সকলেই ঈর্ষান্বিত এবং মাৎসর্য্যযুক্ত, সুতরাং পরাধীন। লোকের ঈর্ষা জন্মে সমকক্ষের উপর আর ঊর্দ্ধতমের উপর; নিম্নশ্রেণীর উপর কাহারও ঈর্ষা জন্মে না, কারণ সকলেরই ইচ্ছা বড়লোক হই। সমস্ত জীবনে আশা ত পূর্ণ হয় না। স্বাধীন হইবার সম্পূর্ণ ইচ্ছা থাকিলেও মনের দুঃখে পরাধীন হইয়া কাল যাপন করিয়া থাকে।

হিংসা—হিংসা অর্থাৎ পরপীড়ন। পরপীড়নের উদ্দেশ্য কি? কোন একটা ঈপ্সিত বিষয়ে কেহ যদি প্রতিবন্ধক হয়, তবে সেই প্রতিবন্ধক দূরীভূত করিবার জন্য পরপীড়ন আবশ্যক হয়। হিংসার মূল স্বার্থ, আবার স্বার্থের মূল কাম। সমস্ত লোকই বিকারী, সকাম, স্বার্থপর ও হিংস্রক; সুতরাং হিংসার অধীন। তবে অহিংস্রক কে? যিনি কামিনী-কাঞ্চন-বর্জ্জিত, যাঁহার স্বার্থ পরার্থে ন্যস্ত, তিনি লোভহীন, নিষ্কাম, নিস্পৃহ, নির্ব্বিকারী, মুক্ত, সুতরাং স্বাধীন।

খেদ—খেদ শব্দে ক্লেশ, শোক, দুঃখ, বিষাদ। ক্লেশ অর্থাৎ অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ, এই পাঁচপ্রকার অজ্ঞান—যাহা আত্মা চিত্তের সহিত একীভূত হইয়া ভোগ করিতেছেন। জগৎ বিকারী, সুতরাং পাঁচপ্রকার ক্লেশে ক্লেশিত। জগতে যত কিছু ক্লেশ আছে, এ পাঁচেরই অন্তর্গত। যার অবিদ্যা, তাহারই অস্মিতা, যার অস্মিতা, তাহারই রাগ; যার রাগ, তাহারই দ্বেষ; যার দ্বেষ, তাহারই অভিনিবেশ। ইহারা কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া নাই,—পরস্পর জড়িত; এই পাঁচের একের অভাব হইলে সকলের অভাব; প্রাণী মাত্রেই ইহার অধীনে।

অবিদ্যা—অবিদ্যা হেতু ক্লেশ, বিষয়ভোগ। বিষয়ভোগ বাস্তবিক দুঃখ, পরন্তু তাহাকে আমরা যারপরনাই সুখ মনে করিয়া তাহা পাইবার জন্য ব্যাকুল হই। যাহার মান আছে, তাহার মান নাশে বিষাদও আছে। সকলেরই অহঙ্কার আছে, সুতরাং বেদনাও আছে।

রাগ—রাগ হেতু ক্লেশ হয়। দ্বেষ হেতু ক্লেশ, ক্রোধ, হিংসা, বিপ্রলিপ্সা। অভিনিবেশ হেতু ক্লেশ, ত্রাস, ভয়, মরণ-যন্ত্রণা; কষ্ট ভিন্ন সুখ কিছুতেই নাই; সুতরাং পরাধীন।

পরিশ্রম—কার্য্যান্তে ইন্দ্রিয়ের অক্ষমতারূপ যে গ্লানি, তাহাই পরিশ্রম। বিন্দু বিন্দু শক্তির হ্রাস, ক্রমে অত্যধিক হইলেই অনুভবযোগ্য হয়। কার্য্যের মূল শক্তি; শক্তির হ্রাস অবস্থাই পরিশ্রম। শক্তির মূল শুক্র; যার শুক্র যত ধৃত, তার শক্তিও সেই পরিমাণে রক্ষিত; পরিশ্রমেও সেই পরিমাণে শক্ত। জগতে অনবরত কার্য্যক্ষম কেহই নাই। ব্রহ্মা সৃষ্টি করিয়াও ক্লান্ত হইয়াছিলেন। শক্তি অনুসারে কেহ অল্পেই কষ্ট বোধ করে, কেহ দীর্ঘ সময়ে ক্লেশ বোধ করে—এই মাত্র প্রভেদ। বিশ্বশক্তি ক্লমশীল অর্থাৎ শ্রমশীল, সুতরাং পরাধীন।

খণ্ড—ব্রহ্মচর্য্যধারীরাই অণিমা-মহিমাদি-ঐশ্বর্য্যশালী হয়, তাহাতে অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্যধারীর ঐশ্বর্য্য ও ক্ষমতার তুলনাই নাই। হনুমান ইচ্ছা করিলে, কোটি সূর্য্য থাকিতে পারে এমন শরীর ধারণ করিতে পারেন, আবার সত্যসঙ্কল্পপ্রভাবে ইহাও পারেন যে, সূর্য্যসহিত পৃথিবীকে ক্ষুদ্রাকারে পরিণত করিয়া একটি বালুকার মধ্যে প্রবেশ করাইতে। একটি সূর্য্যকে বগলে পোরা আশ্চর্য্য কিছুই নহে।

ব্রহ্মচর্য্যধারীরা মনোজব অর্থাৎ মনের ন্যায় অত্যধিক-গতি বিশিষ্ট; আমরা যেমন মনকে সঙ্কল্পপ্রভাবে এক মুহূর্ত্তের মধ্যে হিমালয়ের উত্তরে লইতে পারি, কিন্তু শরীর সেরূপ লইতে পারি না। যাহারা মনোজব,

তাহাদের মন যে মুহূর্ত্তে যে স্থানে কল্পনা করিবে, তাহাদের শরীর সেই মুহূর্ত্তে সেই স্থানে উপস্থিত হইবে।

হনুমানেতে এত তেজ নিহিত আছে যে, হনুমান ইচ্ছা করিলে কোটি কোটি সূর্য্যকে দগ্ধ করিয়া ফেলিতে পারেন। এমন সময় অর্জ্জুন হনুমানকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, তোমার শক্তি কত? হনুমান হাসিয়া উত্তর করেন,—আমার শক্তি কত, তাহা আমি বলিতে পারি না; তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে, এইরূপ অগণিত বিশ্ব অনন্তকাল-জন্য শরীরের একটি লোমেতে ধারণ করিয়া রাখিব, তাহাতে আমি জানিতে পারিব না যে, কোন একটা ভার আমার শরীরে আছে; যেমন কাশ্মীরী জামার উপর একটি পিঁপড়া বা মাছি বসিলে, জামা-ধারক যেমন জানিতে পারে না, তাহার উপর কোনও ভার আছে। ইহা অত্যুক্তি নহে, অখণ্ডব্রহ্মচর্য্যশক্তি ব্রহ্মশক্তির তুল্য। এই দুই বীরের শক্তির ইয়ত্তা নাই। অসীম শক্তির কার্য্য দেখাইবার স্থান, অসীম জগতে নাই; সুতরাং শক্তিমানেরা অসীম শক্তি দেখান নাই। ভীষ্মদেব ও হনুমান পূর্ণ শক্তিমান, সুতরাং স্বাধীন।

বৈষম্য—জগতে যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায়, সেই দিকেই বৈষম্য দৃষ্টিগোচর হয়। কাহারও সহিত কাহারও সমতা নাই, সর্ব্ববস্তুই বিষমতাপূর্ণ। যেন বিষমতাই জগতের ধর্ম্ম। সম বিষম গতিতে, সম বিষম ভাবে জগৎচক্র চলিতেছে, বিশ্বকার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে। মনুষ্যে মনুষ্যে বিষমতা, পশুতে পশুতে বিষমতা, স্থাবরে স্থাবরে বিষমতা। একজন মনুষ্যের সহিত আর একজন মনুষ্যের কোন না কোন বিষয়ে বৈষম্য আছে। সমতা কিছুতেই হইতে পারে না; কারণ সমস্ত পদার্থই ত্রিগুণের বিষমতাতে সৃষ্ট। ত্রিগুণের সমতা হইলে জগৎ প্রলয়দশাগ্রস্ত হয়। সেই জন্য প্রকৃতির সৃষ্টির নিয়মই বিষমতা। বৈষম্যের আর এক হেতু স্বার্থপরতা; সেই কারণে যেখানে স্বার্থপরতা, সেইখানেই বিষমতা। বৈষম্য কার? স্বার্থ আছে যার, স্বার্থ আছে কার? কাম আছে যার। কাম হইতে স্বার্থ, স্বার্থ হইতে বৈষম্য। সকলেই স্বার্থপর, সেইজন্যই বিষয়; সুতরাং পরাধীন।

পরাপেক্ষা—পরাপেক্ষা অর্থাৎ পরকে অপেক্ষা করে যাহাতে বা যে কোন কার্য্যে। যাহাতে বা যে কোন কার্য্যে পরের সাহায্যপ্রার্থী হইলেই তাহাকে ভিখারী বলিতে হইবে। অতএব পরাপেক্ষীও যে, ভিখারীও সে। আমরা সংসারে যত কিছু কার্য্য করি, তাহাদের কোনটাই একা নিজের সাহায্যে হয় না, অন্যের সহায়তার প্রয়োজন, খাইতে, শুইতে, উঠিতে, বসিতে, সকল কার্য্যেই অপরের সাহায্য আবশ্যক হয়। যে দিন তুমি মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইলে, ম্লানমুখে মাতৃ-মুখ তাকাতেই লাগিলে, তোমার দর-বিগলিত-ধারা দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, যেন তোমার নিজের কোন শক্তি নাই, কাহারও যেন অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেছ, কাহারও সাহায্য না পাইলে প্রাণ যায়, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় অস্থির হইয়াছ, কাতরে কাঁদিয়া বলিলে—মাগো! কিছু খেতে দাও; মাতা অনুগ্রহ করিলেন, এবং স্তন মুখে দিলেন, ভিক্ষা পাইয়া কৃতার্থ হইলে, এই তোমার জীবনের প্রথম ভিক্ষা, প্রথম পরাপেক্ষা আরম্ভ হইল। এই প্রকারে বাল্যকালে—কেহ উঠাইলে উঠিতে পার, শুয়াইলে শুইতে পার, বসাইলে বসিতে পার, খাওয়াইলে খাইতে পার, নচেৎ নয়। এই প্রকারে বাল্যকালে ভিখারীর বেশে পরাপেক্ষায় কাটাইলে। আসিল যৌবন কাল; এই সময় তোমার সমস্ত ইন্দ্রিয় পটু, সকল প্রকার কার্য্যক্ষম, তবু পরাপেক্ষী। কি যেন তোমার অভাব, কাহার সাহায্য না পাইলে তোমার চলে না, সংসার শ্মশানবৎ প্রতীয়মান হয়, সংসারে সুখ নাই, শান্তি নাই; সুখ পাইবার লালসায়, শান্তিতে থাকিবার আশায়, ভিখারীর বেশে পরাপেক্ষী হইয়া পরের দণ্ডায়মান; শৈশবকালে নেঙ্গটা হইয়া ভিক্ষা চাহিয়াছিলে, এক্ষণে গায়ে জামাজোড়া মাথায় মুকুট পরিয়া বর-বেশে ভিক্ষা চাহিতেছ—মাগো! দুটি ভিক্ষা পাই, আমাকে সংসারী করিয়া দাও। পান্থশালায় অতিথি ফিরে না; মাতা-পিতার যত্নে ও চেষ্টায় শাশুড়ী তাঁহার কন্যাটিকে তোমায় ভিক্ষা দিলেন, তুমি কৃতার্থ হইলে, যেন সকল কষ্ট দূর হইল; দিন কয়েক মনে একটু সুখ বোধ হইল। দুই-একটি সন্তান হইলে পর, পয়সার অভাব বোধ হইল, ক্রমে সংসারের ভার মাথায় পড়িল, তখন কষ্টকর বোধ হইতে লাগিল; এই প্রকারে সুখ-দুঃখ মিশাইয়া অর্থচিন্তায় পরাধীন হইয়া দিনযাপন করিতে লাগিলে। তারপর যৌবনে ভাঁটা পড়িল, আর যৌবনে জোয়ার নাই, সঙ্গেই সঙ্গেই বার্দ্ধক্য আসিল, শক্তি হ্রাস হইল,

রোগ আক্রমণ করিল, উত্থানশক্তি রহিত হইয়া আসিল, এত আদরের এত যত্নের সংসার ছাড়িতে হইবে ভাবিয়া প্রাণ আকুল হইল। সেই সময় বড় লোভ হয়—নানা প্রকার দ্রব্যাদি খাইতে ইচ্ছা হয়, কেহ খাইতে দিলে খাও, নচেৎ নয়; তৃষ্ণায় জল কেহ দিলে পাও, না দিলে নয়। যাহাগিদকে কত ভালবাসিতে, এখন কিন্তু তাহারা প্রকাশ্যে না পারিলেও মনে মনে তাচ্ছল্যভাবে তোমার সেবা করে। এক্ষণে তোমার প্রত্যেক কাজেই, প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই পরের সাহায্য আবশ্যক হয়। আজীবন ভিক্ষুকবেশে দীনহীনের ন্যায় পরাপেক্ষাতে সুদীর্ঘ জীবন কাটালে, কবে তুমি স্বাপেক্ষ হইয়াছিলে? কবেই বা তুমি স্বাধীনতা ভোগ করিয়াছিলে? কবেই বা তুমি ভিখারীত্ব ঘুচাইয়া সার্ব্বভৌমত্ব লাভ করিয়াছিলে?

সত্য

তত্ত্ব নিয়ত স্থির, যাহা ধ্বংস নাই, যাহা নষ্ট হয় না, তাহা সৎ, যাহা সৎ, যাহা অব্যভিচারি, তাহাই সত্য। যে রূপে যাহা নিশ্চিত হয়, বুদ্ধির বিষয়ীভূত হয়, যদি তাহা কদাচ সে রূপ ত্যাগ না করে, সে রূপের যদি কখনও অন্যথা না হয়, ব্যভিচার না ঘটে, তবে তাহাই সত্য। যে পথ অবলম্বন করিয়া চলিলে, মরণধর্ম্মী জীব সত্যত্ব, অমরত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে, দুঃখ-সঙ্কুল ভবধাম অতিক্রম করিয়া নিত্যানন্দ অমৃতধামে উপনীত হয়, সেই সত্যপথ সত্য দ্বারা ধৃত, সত্য দ্বারা বিস্তীর্ণ, সত্যই তৎপথের প্রতিষ্ঠাতা; যিনি সত্যাশ্রয়ী সত্যবান, জয়লাভ বা কর্ম্মসিদ্ধি তাঁহারই হইয়া থাকে; মিথ্যাবাদীর কখনও জয় হয় না, মিথ্যাবাদী সে সর্ব্বত্রই সত্যবাদীর দ্বারা অভিভূত হইয়া থাকে, তাহা লোকপ্রসিদ্ধ নিয়ম; এ নিয়মের কখনও বিপর্যয় ঘটে না। সত্যই বাক্যের প্রতিষ্ঠা, স্থিরাবস্থান। সত্য বচনই স্থিরভাবে সর্ব্বত্র আদৃত হইয়া থাকে। মিথ্যার প্রতিষ্ঠা বা স্থিরাবস্থান নাই। মিথ্যা ব্যাভিচারী, মিথ্যার জয় কদাচ হয় না। জগৎ সত্যেই বিধৃত। মূলে যাহার সত্য নাই, তাহা মিথ্যা, তাহার স্থায়িত্ব নাই। ঈশ্বর যে উদ্দেশ্যে মনুষ্যকে যে শক্তি প্রদান করিয়াছেন, সে শক্তিকে ঠিক তদুদ্দেশে ব্যবহার করাই যথার্থ ধর্ম্ম। ঈশ্বর সকল প্রাণী হইতে মনুষ্যকে নিজ ও পরোপকার প্রয়োজনার্থ বিশেষ বাকশক্তি প্রদান করিয়াছেন, অসত্যকথন দ্বারা তাহার ব্যভিচার মূঢ় ছাড়া আর কে করিবে? যে বাক্য পরপ্রতারণার্থ প্রযুক্ত হয়, যাহা ভ্রান্তিময়; যে বাক্যের অর্থ পরিগ্রহ হয় না—অবোধ্য, যাহা সর্ব্বভূতের উপকারার্থ উচ্চারিত না হয়, তাহা মিথ্যা বাক্য। তুমি বন্ধুর অনুরোধে, কার্য্যের অনুরোধে বা অন্য কোন স্বার্থ সাধনার্থ সত্যকথা বলিলে বটে; কিন্তু তোমার মনোমধ্যে মিথ্যা বা দুরভিসন্ধি থাকিয়া গেল; এরূপে বা সেরূপে তোমার সত্যানুষ্ঠান সিদ্ধ হইবে না। রাজসভায়, ধর্ম্মসভায় অথবা সামাজিক সভায় বসিয়া এরূপ পদবিন্যাস করিয়া বাক্য প্রয়োগ করিলে, যাহাতে তোমাকে মিথ্যাবাদী বলা যাইতে পারে না অথচ যাহার ফল, মিথ্যা বলার ফলের সঙ্গে সমান, এইরূপ কুটিল সত্যর দ্বারাও তোমার কোন উপকার সাধিত হইবে না, সত্য সিদ্ধ হইবে না। পরের সর্ব্বনাশ লক্ষ্য করিয়া যদি সত্য উচ্চারণ কর, তবে সে সত্যেও কোন উপকার হইবে না। পরের অকপট হিত জন্য, সরল হইয়া, ছল পরিত্যাগ করিয়া, দুরভিসন্ধি বর্জ্জন করিয়া যদি সত্য উচ্চারণ কর, তবে তাহা দ্বারা সত্য সফলতা লাভ করিবে।

সত্যব্রত পালন দ্বারা সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়াফল লাভ হয়। যজ্ঞাদি, তপস্যাদি, দানাদি ক্রিয়া দ্বারা যে ফল, যে স্বর্গ লাভ হয়, যাগ ও তপস্যাদি না করিলেও কেবলমাত্র সত্য দ্বারা সেই ফল, সেই স্বর্গ প্রাপ্তি হয়। যিনি সত্যপরায়ন, যিনি সত্যব্রত পালন করেন, তিনি সত্য সঙ্কল্প, তাঁহার বাক্য অমোঘ, অব্যর্থ ও সত্যফলপ্রদ হয়। তাঁহার কার্য্যের ফল তাঁহার অধীন থাকিবে, অর্থাৎ যে কোনও কার্য্য করুন তাহারই সমফল পাইবেন, বাকসিদ্ধি হইবে। তাঁহার অব্যর্থ বাকশক্তি; যাহাতে যাহা বলিবেন, তাহাই সিদ্ধ হইবে। মিথ্যাবাদী কপট, শঠ বা অতি পাপাচারীকেও তিনি যদি বলেন—ধার্ম্মিক হও, তাহা হইলে ধার্ম্মিক হইবে; যদি বলেন—স্বর্গে যাও, পুণ্য না থাকিলেও সে স্বর্গে যাইবে।

পৃথিবীর যাহা সার ভাগ বা সত্য, তাহাই গন্ধ,—পৃথিবী যদি তাহার গন্ধ ত্যাগ করে, জলের যাহা সার ভাগ বা সত্য, তাহাই মধুর রস,—জল যদি সেই সত্য ত্যাগ করে, শশী, সূর্য্য যদি প্রভা পরিত্যাগ করে, জ্যোতি যদি রূপ পরিত্যাগ করে, বায়ু যদি স্পর্শ ত্যাগ করে, অগ্নি যদি উষ্ণতা ত্যাগ করে, আকাশ যদি শব্দগুণ পরিত্যাগ করে, শীতাংশু যদি শীতরশ্মিতা পরিত্যাগ করে, দেবরাজ যদি বিক্রম পরিত্যাগ করেন, ধর্ম্মরাজ যদি ধর্ম্ম ত্যাগ করেন, তথাপি যিনি সত্যপরায়ণ, তিনি কখনও কোন মতে সত্যকে পরিত্যাগ করিতে পারেন না। যিনি সত্যধর্ম্ম আশ্রয় না করেন, তিনি মনুষ্য পদবাচ্য হইবার উপযুক্ত নহেন।

যিনি সত্যসঙ্কল্প, সত্য প্রিয়, উৎপত্তি স্থিতি ও লয় পর্য্যন্ত সত্য যাঁতে অবিচলিত নিত্য বর্ত্তমান, বা জ্ঞান বল ও ক্রিয়া যাঁহার সত্যাশ্রয়ী, যিনি সমদর্শী, যিনি সত্যে নিহিত ও স্থিত, যিনি সত্যের প্রকাশক ও প্রবর্ত্তক, যাঁহার সমস্তই সত্যময় অর্থাৎ যাঁহার শরীর সত্যময়, বাক্য সত্যময়, ইন্দ্রিয় সকল সত্যময়, এই প্রকারে যিনি সত্যাত্মক, সকলেরই সেই সত্যস্বরূপের শরণাপন্ন হওয়া উচিত।

যাহা দুষ্কর, যাহা দুর্লভ, যাহা দূরবর্ত্তী, যাহা দুরতিক্রম, সে সকলই তপঃসাধ্য; তপস্যা দুর্লঙ্ঘনীয়। দেব-মানুষ-পূর্ণ এই জগৎ তপোমূলক। তপস্যাই ইহার আদি, মধ্য ও অন্ত। ইহা তপস্যা দ্বারাই আবৃত। তপস্যা দ্বারা যে যাহা প্রার্থনা করে, সে তাহাই পায়,—বিদ্যার্থী বিদ্বান হয়, আয়ুঃপ্রার্থী আয়ু পায় এবং শ্রীপ্রার্থী মহতী শ্রীপ্রাপ্ত হয়।

চৌর্য্য

মনের দ্বারা, বাক্য দ্বারা, কার্য্য দ্বারা, পরদ্রব্যে নিস্পৃহার নাম অচৌর্য্য। চোর কারে বলি? চোর দুই প্রকার,—এক আত্মচোর, আর এক পরদ্রব্য-চোর। আত্মতত্ব অজানাকে আত্মচোর বলে—অর্থাৎ যে ব্যক্তি এক প্রকার আত্মাকে অর্থাৎ আপনাকে অন্য প্রকার জানে, দেহাদির অতীত আপন আত্মাকে দেহাদিবিশিষ্ট বলিয়া জানে, সেই ব্যক্তি আত্মচোর। এই আত্মচোর মানব কি পাপ না করিতেছে? আত্মচোর হইতেই যত কিছু পাপের উৎপত্তি। আত্ম নিত্যতৃপ্ত, তাঁহাকে অতৃপ্তের ন্যায় বোধ করিয়া দীন ও অভাবগ্রস্তের ন্যায় অনুভব করে। আত্মচোর সকলেই। অভাব বোধ হইতেই আকাঙ্ক্ষা, আকাঙ্ক্ষা হইতে লোভ, লোভ হইতে চৌর্য্যবৃত্তি উৎপন্ন হয়। লোকে কথায় বলিয়া থাকে—অভাবে স্বভাব নষ্ট। চৌর্য্যবৃত্তি কার? স্বভাব নষ্ট যার। স্বভাব নষ্ট কার? আকাঙ্ক্ষা যার। আকাঙ্ক্ষা কার? লোভ যার। লোভ কার? অভাব যার। অভাব কার? অপূর্ণ যার। প্রাণীমাত্রেই সকর্ম্মক; কর্ম্মের মূল অভাব, অপূর্ণই পূর্ণ হইবার চেষ্টা করে, কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। বিশ্ব অভাবগ্রস্ত, অসন্তুষ্ট, মন কষ্ট, স্বভাব নষ্ট, সুতরাং চোর। মনে কর, তোমার কোন একটা পদার্থের অভাব আছে, তাহা পাইবার সততই ইচ্ছা আছে, অথচ কোন সহজ উপায়ে তাহা পাইতেছ না; সুতরাং তোমার চুরি করিবার ইচ্ছা হয়। ইচ্ছা মনের ধর্ম্ম। একই উপাদানে সকলেরই মন গঠিত। চোরের মন যে উপাদানে গঠিত, সাধুর মনও সেই উপাদানে গঠিত। আব্রহ্ম কীট সকলেরই মন সেই উপাদানে গঠিত, সকলের মনেই চৌর্য্য উপাদান আছে, অচৌর্য্য উপাদানও আছে; যখন চৌর্য্য-উপাদানে গুণক্ষোভ হয়, তখনই লোকে চুরি করিয়া থাকে। দিলীপ রাজা অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবেন, অশ্ব রক্ষার্থ রঘুকে নিযুক্ত করিলেন। ইন্দ্রের হিংসা জন্মিল; যজ্ঞ যাহাতে নষ্ট হয়, তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মহাদেবের সহিত পরামর্শ করিয়া ইন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া চুরি করিতে গমন করিলেন। দিবা দ্বিতীয় প্রহরের সময় অন্ধকার করিয়া রাত্রি উপস্থিত করিলেন। তাহার পর সেই যজ্ঞের অশ্ব হরণ করিয়া লইয়া গেলেন। বলিহারি ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব, ব্রহ্মার ব্রহ্মত্ব!

জ্ঞানে, ধ্যানে যখন তোমার অভাব বোধ থাকিবে না, পূর্ণ গুপ্তি অনুভব করিবে, তখনই পূর্ণতা লাভ করিবে। অভাব নষ্ট হইবে, সন্তোষ লাভ করিবে, মনোকষ্ট দূর হইবে, স্বভাব রক্ষিত হইবে, সুতরাং চৌর্য্যবৃত্তি ধ্বংস হইবে। যখন অচৌর্য্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে, তখন সর্ব্বরত্ন আপনা হইতে উপস্থিত হইবে, সর্ব্বরত্ন লাভের তৃপ্তি জন্মিবে। যেখানে-সেখানে ভূগর্ভে যখন রত্ননিহিত দেখিতে পাইবে, তখনই মনে করিবে—তোমার চৌর্য্যবৃত্তি ধ্বংস হইয়াছে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহা না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তুমি চোর।

তুমি একজন লক্ষপতি। কাহার সাধ্য তোমাকে চোর বলে। তুমি দুই চারি হাজার চুরি না করিতে পার, কিন্তু লক্ষ স্থানে বিশ লক্ষ পাইলে নিশ্চয়ই চুরি করিবে। যদি বল, মনের অগোচর পাপ নাই, আমি মনেতে লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম যে, মনেতে চুরি করিবার ইচ্ছা হইতেছে না, অতএব আমি চোর নই। তাহা নহে; মনের চৌর্য্যবৃত্তি এখন সুপ্ত। তুমি সুপ্ত থাকিলে তোমার যেমন কার্য্য বন্ধ থাকে, সেইরূপ মনের চৌর্য্যবৃত্তি সুপ্ত বলিয়া এখন চৌর্য্যবৃত্তি নাই; যদি সুপ্ত না হইয়া ধ্বংস হইত, তবে সর্ব্বরত্ন লাভ হইত। চৌর্য্যবৃত্তি যে সুপ্ত, তাহা তুমি দেখিতে পাইবে না, তাহা একমাত্র প্রকৃতি দেখিতেছে, তুমি যেমন চোরের ভয়ে সিন্দুকে রত্ন প্রভৃতি লুকাইয়া রাখ, প্রকৃতিও সেইরূপ তোমার-আমার দৃষ্টির অন্তরালে অদৃশ্য সিন্দুকে রত্ন লুকাইয়া রাখিয়াছে; যখন চৌর্য্যবৃত্তি ধ্বংস হইবে, তখন প্রকৃতিও ভাণ্ডার খুলিয়া দিবে। যেখানে-সেখানে ভূগর্ভে রত্ন নিহিত রহিয়াছে দেখিতে পাইবে।

হরিদাস সাধুকে একজন একখানা স্পর্শমণি দিয়াছিলেন, তিনি তাহা যমুনায় ফেলিয়া দেন। যিনি দিয়াছিলেন, তিনি দুঃখ অনুভব করিলেন, অন্তর্যামী হরিদাস তাহা বুঝিতে পারিলেন। তিনি দাতাকে সঙ্গে

করিয়া একটি অরণ্যে প্রবেশ করিলেন; বনের মধ্যে একটি স্থান দেখাইয়া বলিলেন, তুমি যে মণি হারাইয়াছ, তাহার অতিরিক্ত মণিও ইচ্ছা করিলে ঐ স্থান হইতে লইতে পার। তিনি দেখিয়া অবাক। তিনি ভাবিলেন— ফণীর মণি আমাদের কাছে এই,—না জানি ফণীর মণির মণি কিরূপ! তাহার পর তিনি হরিদাসের শিষ্য হইলেন। কেন এইরূপ হইল? হরিদাসের অস্তেয় প্রতিষ্ঠা হইয়াছে বলিয়াই এইরূপ হইল। ইহা দ্বারা বেশ বুঝিতে পারা যায়, জীব মাত্রেই চোর। তবে বিশ্বে চোর নয় কে? অস্তেয় হইয়াছে যে। তিনি সদানন্দ নিত্য তৃপ্ত। যিনি পূর্ণ, তাঁহার কিসের অভাব, কিসের লোভ, কিসের আকাঙ্ক্ষা, কিসের চৌর্য্য? তিনি নির্লোভ, নিরাকাঙ্ক্ষা, নিস্পৃহ, সুতরাং অস্তেয়স্বরূপ।

শরীর

শরীর শব্দের অর্থ তনু। সেই শরীর তিন প্রকার। স্থূল শরীর, সূক্ষ্ম শরীর, ও কারণ শরীর। সূক্ষ্ম শরীরের আর এক নাম লিঙ্গ শরীর। লয়ের দ্বারা লীন হয় বলিয়া লিঙ্গ শরীর নাম হইয়াছে। স্থূল শরীর মৃত্যুতে ধ্বংস হয়, সূক্ষ্ম শরীর বা লিঙ্গ শরীর মহা প্রলয়ে ধ্বংস হয়, কারণ শরীর মুক্তিতে ধ্বংস হয়। স্থূল শরীর স্থূল পাঞ্চভৌতিক, সূক্ষ্ম শরীর সূক্ষ্ম পাঞ্চভৌতিক, কারণ শরীর কারণ পাঞ্চভৌতিক। সকলেরই কারণ শরীর অব্যক্ত অনাদ্যা মূল প্রকৃতি এবং সকলেরই সূক্ষ্ম শরীর সপ্তদশ-অবয়ব-বিশিষ্ট অর্থাৎ পঞ্চ সূক্ষ্ম ভূত, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিবিশিষ্ট। সূক্ষ্ম শরীর আছে তাহার প্রমাণ কি? তাহার প্রমাণ এই—প্রাণী মাত্রেরই বুদ্ধি আছে, বুদ্ধি নিরাশ্রয়ে থাকিবার নহে। অবশ্য তাহার আশ্রয় আছে। অভিনিবেশপূর্ব্বক চিন্তা করিলে প্রতীতি হইবে, বুদ্ধি মাংসলিপ্ত অস্থি-পঞ্জরে অবস্থিত নহে, নিরুপাধিক আত্মাতেও অবস্থিত নহে; সুতরাং বুদ্ধির পৃথক আশ্রয় অনুমেয়। যাহা বুদ্ধির আশ্রয়, তাহাই সূক্ষ্ম শরীর। সূক্ষ্ম শরীর অতিশয় সূক্ষ্ম, অতিশয় সূক্ষ্মতা হেতু শিলামধ্যে প্রবেশ করিতে পারে, সর্ব্বত্র অব্যাহতগতি, সেইহেতু ইহা চর্মচক্ষুর অগোচর, অচ্ছেদ্য অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোচ্য। তাহার মূর্ত্তি নাই, অবয়ব নাই, কেবল জ্ঞানময় পদার্থ। কেহ তাহাকে দেখিতে পায় না, কেহ তাহাকে ছেদ করিতে পারে না, কেহ তাহাকে ভেদ করিতে পারে না, কেহ তাহাকে দাহ করিতে পারে না। জীব সকল শরীরের দ্বারা, মনের দ্বারা ও বাক্যের দ্বারা যে কোন প্রকার কর্মানুষ্ঠান বা যে কোন প্রকার জ্ঞান অনুষ্ঠান করিয়াছে, করিতেছে ও করিবে, সেই সমস্তই তাহাদের চিত্তক্ষেত্রে বা অন্তঃকরণময় সূক্ষ্ম শরীরে অতি সূক্ষ্মভাবে, বীজে অঙ্কুরশক্তির ন্যায়, থাকিয়া যাইতেছে। সেই থাকার নাম বাসনা বা সংস্কার। সেই সকল সংস্কার বা বাসনা তাহাদের বর্ত্তমান জীবনের পরিবর্ত্তক ও ভবিষ্যৎ জীবনের বীজ। জীবের সমস্ত ক্রিয়াই সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত হইয়া সূক্ষ্ম শরীরে তাদৃশ রূপে অঙ্কিত থাকে, ছাপ বা দাগ লাগার ন্যায় হইয়া থাকে। কালক্রমে সেই সকল দাগ বা সংস্কার প্রবল হইয়া স্বীয় আত্মাকে অর্থাৎ জীবকে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় পতিত করে। সেই সকল দাগের বা সংস্কারের নাম কর্ম্ম, অদৃষ্ট, ধর্মাধর্ম্ম, পাপ ও পুণ্য ইত্যাদি। মধ্যে পশু, মানব, দেবতাদি জাতি, স্বর্গাদি দেশ, যুগাদিকাল ও শত শত নিদ্রাদি পরিবর্ত্তন হইয়া গেলেও সে কর্ম্ম, সে পাপ-পুণ্য, সে সংস্কার লুপ্ত হয় না,—কালান্তরে, দেশান্তরেও অবস্থান্তরে গিয়া প্রকাশিত হয়, স্মৃতি বা স্মরণ জন্মায়, মধ্যে ব্যবধান আছে বলিয়া লুপ্ত হয় না। মনে কর, তুমি মনুষ্যজীবনে অনেক পাপ-পুণ্য করিয়াছ, তোমার মৃত্যু হইল, তুমি দেব কি পশু শরীর ধারণ করিলে, তোমার মনুষ্যজীবনের বাসনা এখন লীন থাকিল; আবার যখন মনুষ্যশরীর ধারণ করিবে, তখন তোমার সেই বাসনা মনুষ্যোচিত কর্ম্মে প্রবুদ্ধ হইবে। সেই কর্ম্মবীজ হইতেই আবার সেই সেই পূর্ব্বানুভূত কর্ম্মের অনুরূপ অঙ্কুর জন্মে এবং সেই সেই অঙ্কুর আবার শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত হইয়া পুনর্ব্বার তৎসদৃশ অন্যান্য কর্ম্মবীজ উৎপাদন করে; জীব এইরূপ নিয়মের অধীন হইয়া সংসার-চক্রে ঘূর্ণমান হইতেছে। সূক্ষ্ম শরীরে ভোগ নাই। সূক্ষ্ম শরীরের উপর ভোগায়তন কৌশিক শরীর ধারণ করিয়া জীবের ভোগ নিষ্পন্ন হয়। সূক্ষ্ম শরীরই যাতায়াত করে; যাবৎ না প্রাকৃতিক প্রলয় উপস্থিত হয়, তাবৎকাল ইহপরলোক গমনাগমন করে। ইহারই নাম জন্ম-মৃত্যু। সকল জীবেরই ভিতরে সূক্ষ্ম দেহ, উপরে স্থূল দেহ। স্থূলদেহ ফেলিয়া সূক্ষ্মদেহ দেহান্ত গ্রহণ করে।

মনুষ্য যেমন জীর্ণবেশ ছাড়িয়া অন্য অভিনব নূতন বেশ গ্রহণ করে, সূক্ষ্মদেহের দেহান্তর গ্রহণও সেইরূপ। রঙ্গালয়ের অভিনেতা, রাজা প্রজা কত সাজে সাজিয়া, রঙ্গমঞ্চে ভিন্ন ভিন্ন রূপে নানা প্রকার তামাসা দেখায়, সেইরূপ সূক্ষ্ম দেহও নানা সাজে নানা আকারে সংসারে দেখা দিয়া থাকে। এমন বিভিন্ন সাজসজ্জা প্রকৃতির প্রভাবেই মিলিয়া থাকে। বিনা ভোগে কর্ম্ম ক্ষয় হয় না। কর্ম্ম ভোগের জন্যই শরীর ধারণ এবং জন্মগ্রহণ।

জীবের যখন কর্ম্মভোগ শেষ হয় নাই, তখন কর্ম্ম ধ্বংসও হয় নাই; প্রলয় হউক বা মহাপ্রলয় হউক, তাহাকে জন্মগ্রহণ করিতেই হইবে, শরীর ধারণ করিবেই করিবে, তাহা অনিবার্য্য। তবে কি না, মহাপ্রলয়ের সূক্ষ্ম শরীর ধ্বংস হইলেও কারণ শরীর বর্ত্তমান থাকে; সূক্ষ্ম শরীরের সংস্কার, কর্ম্ম বাসনা কারণ শরীরে লীন থাকে, পুনঃ সৃষ্টিকালে জীব কারণ শরীর হইতে কর্ম্মকূট সংগ্রহ করিয়া সূক্ষ্ম শরীর ও স্থূল শরীর ধারণ করিয়া কর্ম্মক্ষেত্র সংসারে আবির্ভূত হই। ইহারই নাম জন্ম বা সৃষ্টি।

জীবের কারণ শরীর ও সূক্ষ্ম শরীর সম্বন্ধে কোন পার্থক্য নাই; কেবলমাত্র ভোগায়তন স্থূল শরীরেই পার্থক্য আছে। স্থূল শরীর চারি প্রকার,—পার্থিব, জলীয়, আগ্নেয় ও বায়বীয়। মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, স্থাবর, জঙ্গমাদির শরীর পার্থিব পরমাণু হইতে। বরুণলোকবাসীদের শরীর জলীয় পরমাণু হইতে। ইন্দ্রাদির শরীর তৈজস পরমাণু হইতে। পিশাচাদির শরীর বায়বীয় পরমাণু হইতে। এই সমস্ত শরীরই বিকারী, ছেদ্য, ভেদ্য, দাহ্য, শ্রান্তি-ক্লান্তিযুক্ত, ক্ষুধায়-তৃষ্ণায় অভিভূত, ব্যাধির দ্বারায় ক্লেশিত, জরা দ্বারা জর্জ্জরিত, মৃত্যু কর্ত্তৃক গ্রাসিত। এই সমস্ত শরীর হইতে শ্রেষ্ঠ-শক্তিসম্পন্ন নির্ব্বিকার আনন্দময় তনু আছে, তাহার নাম ব্রহ্মচর্য্যতনু। এই শরীর ধারণ সকলের ভাগ্যে ঘটে না। সৃষ্টিতে কেবলমাত্র দুই জন এই শরীর ধারণ করিয়াছিলেন, এক হনুমান আর এক ভীষ্মদেব।

ব্রহ্মশরীর শুক্রময়। যে শরীর শুক্রময়, তাহাই অবিকারী, সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মতনু। যে তনু হইতে এক বিন্দুও শুক্র চ্যুত হয় নাই, বিকৃতও হয় নাই, তাহাই নির্ব্বিকার শুক্রময় তনু। যে তনু হইতে এক বিন্দুও শুক্র ক্ষরিত হইয়াছে, তাহাই বিকারী তনু। আব্রহ্ম কীট সকলেরই তনু হইতে শুক্র চ্যুত হইয়াছে, সার পদার্থ নির্গত হইয়া গিয়াছে, সুতরাং সে সমস্ত তনুই অসার বিকারী তনু।

পঞ্চভূতের অতিশয় সাররূপ যে পদার্থ, তাহাই শুক্র। আমরা আহারের দ্বারা পঞ্চভূত হইতে সার পদার্থ আকর্ষণ করিয়া লইয়া শরীর পোষণ করি। সেই সার পদার্থ পুনঃ পুনঃ রক্তমধ্যে পরিগৃহীত ও পরিচালিত হইয়া সর্ব্বাঙ্গব্যাপী হয়; যাহার সেই সার পদার্থ চ্যুত না হয়, তাহার সর্ব্বাঙ্গই সারের দ্বারা গঠিত হয়; সুতরাং তাহার সর্ব্বাঙ্গই শুক্রময় বা সারময়, সেই জন্য সারাৎসার। ঈশতনু সারাৎসার। ঈশে ও বিশ্বে ভেদ। কেন ভেদ? আব্রহ্ম কীট সকলেরই ব্রহ্মচর্য্যধারা খণ্ডিত হইয়াছে, সুতরাং অবিচ্ছিন্ন ধারা বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, সেইজন্য ভেদ প্রাপ্ত হইয়াছে। ঈশে বিশ্বে ভেদ বুঝা যায় কিসে? দেখা যাইতেছে, সমস্ত জীবের আত্মশক্তি পরশক্তিবশ, সকলেই জরা-মৃত্যু-গ্রস্ত, কাম-ক্রোধের বশীভূত। আত্মশক্তি পরশক্তির অধীন বুঝা যাইতেছে কি প্রকারে? মনে কর, তোমার ক্রোধ উপস্থিত হইয়াছে, তুমি জান ক্রোধ মহাদোষ; তোমার আত্মশক্তি বলিতেছে—ক্রোধ যখন দোষ, তখন আমি উহা করিব না, তবু তুমি সময়ে সময়ে রাগ না করিয়া থাকিতে পার না। তোমার আত্মশক্তি বেশ জানে যে, পরস্ত্রী স্পর্শ করা মহাদোষ, বুঝিয়াও কেন জ্ঞানী অজ্ঞানী মহারথী সকলেই এই কার্য্য করিয়া থাকেন? এখানে দেখা যাইতেছে—আত্মশক্তি কোন পরম শক্তিবলে এইরূপ করিতেছে। এখানে দুই শক্তির স্ফুরণ হইতেছে—এক আত্মশক্তি আর এক পরশক্তি; অর্থাৎ ঈশশক্তি। ঈশশক্তি পূর্ণ, আত্মশক্তি অপূর্ণ, যেহেতু অপূর্ণ, সেই হেতু পূর্ণের অধীন, পূর্ণের বশ; একজন স্ববশ, একজন অবশ, সেইজন্য এই ভেদাভেদ। ঈশ্বর কারে বলি? যিনি পূর্ণ শক্তিকে পূর্ণ বশে রাখিয়া কার্য্য করিতেছেন অর্থাৎ যিনি শক্তির অনধীন, প্রত্যুত শক্তি অর্থাৎ বিপরীত শক্তি যাঁহার অধীন, তিনিই ঈশ্বর।

যিনি পূর্ণ শক্তিকে পূর্ণ বশে রাখিয়া স্বেচ্ছায় কার্য্য করিতেছেন, যাঁহাকে কাম-ক্রোধাদি পরশক্তি বশে আনিতে পারে নাই, যাঁহার আত্মশক্তি পরশক্তির অধীন নহে, পরশক্তিকে আত্মশক্তির বশে আনিয়া, ঈশ্বাত্মশক্তিকে স্ববশে স্বেচ্ছায় পরিণামিত করিতেছেন, তিনিই মহাপুরুষ। এক্ষণে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, ঐশ্বরিক শক্তি ঈশ্বরের অধীন এবং মহাপুরুষেরও অধীন; সুতরাং মহাপুরুষেরা পূর্ণ শক্তিমান, ঈশ্বরও পূর্ণ শক্তিমান, সুতরাং অভেদ। মলমূত্রে গ্রথিত, সমধারায় প্রবাহিত, পূর্ণাবেশে আবেশিত, পূর্ণ শোভায় শোভিত, পূর্ণানন্দে আনন্দিত, পূর্ণতেজে দীপ্ত, পূর্ণ জ্ঞানে জ্ঞানবান, পূর্ণভোগে ভোগবান, পূর্ণ সত্যে সত্যবান, পূর্ণ

রূপে রূপবান, পূর্ণরসে রসবান, এক কথায় ঈশে আর মহাপুরুষে অভেদ হেতু ঈশ পূর্ণাত্মগুণ মহাপুরুষে অবস্থান করে।

মহাপুরুষের তনু নিত্য নূতন। মাতাপিতার নিকট মাধুর্য্যময়, পিত্রাদির নিকট প্রিয়দর্শন, স্ত্রীলোকের নিকট মনোমোহন, জ্ঞানীর নিকট শান্তিপ্রদ, দুষ্টের নিকট ভীতিপ্রদ, শিষ্টের নিকট আশাপ্রদ, অসৎ লোকের নিকট শাস্তা, যোদ্ধার নিকট মহাবীর, লোকের নিকট নরশ্রেষ্ঠ, শ্রান্তি-ক্লান্তিরহিত, ছেদ্য ভেদ্য দাহ্যাদির অতীত, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় অক্ষোভিত, রোগবর্জ্জিত, জরাহীন, মৃত্যুরহিত, আনন্দময়, তেজোময়, শক্তিময়, জ্ঞানময়, কল্পময়, চিন্ময়, সত্যময়।

ব্যাধি

শরীরের শক্তির হ্রাস ও বিকৃতি অবস্থাই ব্যাধি, জরা ও মৃত্যু। এই তিন পরস্পর সহচরও সাহায্যকারী; ব্যাধি জরাদূত, জরা মৃত্যু-দূত। ব্যাধি কার? বিকারী শরীর যার। শরীর ব্যাধির আগার। শরীর থাকিলেই ব্যাধি থাকিবে, অল্প আর বেশি এইমাত্র প্রভেদ। যাহার যেরূপ শরীর, তাহার সেইরূপ ব্যাধি। স্থূল শরীরে স্থূল ব্যাধি, যেমন—জ্বর, কাসি, অম্ল, বিস্ফোটক ইত্যাদি। সূক্ষ্ম শরীরে সূক্ষ্ম ব্যাধি, যেমন—কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি; ইহাতেও শরীরের মহৎ অনিষ্ট করিয়া থাকে।

ব্যাধি দুইপ্রকার,—শারীরিক ও মানসিক; এই উভয়বিধ ব্যাধি পরস্পরের সাহায্যে পরস্পর সমুপৎন্ন হয়। একের সাহায্য না থাকিলে অন্যের উৎপত্তি হয় না। শরীর অসুস্থ হইলেই মনের অসুখ ও মন অসুস্থ হইলে শরীরের অসুখ হয়। বায়ু, পিত্ত, কফ, ও শোণিতের বৈষম্য প্রযুক্ত শরীর ব্যাধিগ্রস্ত হয়। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, জরা, মৃত্যু, এই সকল শরীরের স্বাভাবিক ব্যাধি; আর মনের বৈষম্য প্রযুক্ত কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মাৎসর্য্য, শোক, ভয়, বিষাদ, দৈন্য, ঈর্ষা, ইচ্ছা ইত্যাদি মনের শান্তিনাশক বলিয়া মানস ব্যাধি। দুঃখ পাপের ফল। পাপ করিলে রোগযন্ত্রণা ভোগ করিতেই হইবে। এমন কোন প্রাণী নাই যে, তাহার পাপ নাই; যেহেতু পাপ আছে, সেই হেতু রোগ আছে; পাপবর্জ্জিত জীব নাই, সেইজন্য রোগবর্জ্জিত দেহ নাই।

জ্ঞান, তপস্যা ও যোগ, এই তিনের একেতেও যাহার মতি আছে, রোগে তাহাকে কোনও মতেই কষ্ট দিতে পারে না। দীর্ঘকাল পরে অতি সামান্য কোন রোগ হইতেও পারে, এইমাত্র বিশেষ। সমস্ত জীবই বিকারযুক্ত-শরীর, সুতরাং ব্যাধিযুক্ত। হরিহর-ব্রহ্মাদি সকলেরই ব্যাধি দৃষ্ট হয়; বিষ্ণুর বৈষ্ণব জ্বর, শিবের শৈব জ্বর, ব্রহ্মার ব্রহ্মজ্বর, ইন্দ্রের ভগন্দর, চন্দ্রের যক্ষ্মা ইত্যাদি। স্বর্গীয় কবিরাজ ধন্বন্তরি প্রভৃতির নাম শুনা যায়; স্বর্গে যদি ব্যাধি না থাকিবে, তবে কবিরাজের প্রয়োজন কি? ব্যাধিবর্জ্জিত প্রাণী নাই, সুতরাং মৃত্যুবর্জ্জিত জীব নাই!

পরাভব নাই কার? ব্যাধি নাই যার। ব্যাধি নাই কার? বিকারী শরীর নয় যার। যে শরীরে ব্যাধি নাই, যে শরীর সার পদার্থের দ্বারা গঠিত, সে শরীর ব্যাধিরূপ ঘুণে ধরে না; শক্তিহ্রাস নাই, সেই জন্য অজেয়। বিশ্ব ব্যাধি কর্ত্তৃক জেয়; সেই ব্যাধি যাঁহার দ্বারা জেয়, তিনি অজেয়। মহাত্মাদিগের শরীরে স্বাভাবিক ব্যাধি, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, জরা, মৃত্যু নাই; বায়ু, পিত্ত, কফ ও শোণিতের বৈষম্য প্রযুক্ত বিস্ফোটক, শূল, জ্বরাদি এই সকল ব্যাধিও নাই; আর মনের বৈষম্য প্রযুক্ত কাম ক্রোধ মদ মাৎসর্য্য শোক ভয় বিষাদ ইত্যাদি মনের শান্তি-নাশক মানসিক ব্যাধি নাই। মহাপুরুষেরা সর্ব্বব্যাধিবর্জ্জিত; সেই জন্য সকলেই তাঁহাদিগের নিকট পরাভূত। জীব মাত্রেই বিকারী, সেইজন্য ব্যাধি জরা মৃত্যু অনিবার্য্য।

জরা

জীব মাত্রেই রোগী, কেননা সকলেই জরা কর্ত্তৃক জরিত। জরা মৃত্যু-দূত। দূত দ্বারা যেমন সংবাদ প্রেরণ করা হয়, মৃত্যুও সেইরূপ জরা দ্বারা সংবাদ প্রদান করে যে, তোমার শক্তির হ্রাস হইয়াছে, তুমি অচল হইয়াছ, সচল হইবার জন্য শক্তির প্রয়োজন, সুতরাং নূতন শরীর আবশ্যক, অতএব আমি যাইতেছি, যাইয়া নূতন শরীর প্রদান করিব; ইহাই জরার খরব। বাল্যকালের সুখভোগ সম্পূর্ণ হইতে না হইতেই যৌবন সহসা উহাকে গ্রাস করে। তার পর যৌবন ভয়ংকর জরা-কবলে সহসা নিপতিত হইয়া থাকে। হিম যেমন পদ্মের, নদী যেমন তীরজাত তরুর, জরা তেমনি দেহের শক্তি ধ্বংস করে। জরাপ্রভাবে তাড়িত হইয়া প্রজ্ঞা দেহ ত্যাগ করে। অন্ধকারের আভির্ভাবে পেচকের ন্যায়, জরার আভির্ভাবে মৃত্যু উপস্থিত হইয়া থাকে। জরা যৌবনকে ভক্ষণ করিয়া উল্লাসিত হয়। বর্ষা যেমন জলাশয় কলুষিত করে, জরা তেমনি মন মলিন করে। অন্ধকার যেমন দৃষ্টি হরণ করে, জরা তেমনি জ্ঞান বিনাশ করে। এই জরার হাতে কাহারও রক্ষা নাই, জন্মিলেই জরা ধরিবে, সকলকেই ইহার নিকট পরাজিত ও উপহসিত হইয়া থাকিতে হইবে।

যাহা শরীরের শক্তিকে জীর্ণ করে, তাহাই জরা। বিকারী পদার্থ মাত্রেই পরিবর্ত্তনশীল, পরিবর্ত্তন মাত্রেই জরাগ্রস্ত। বাল্যে তিল তিল করিয়া শক্তি বর্দ্ধন হইয়া যৌবনাবস্থাপ্রাপ্ত হয়, আবার যৌবনের শক্তি তিল তিল হ্রাস হইয়া জরা প্রাপ্ত হয়। পরিবর্তন দুই প্রকার, —তীব্র ও মৃদু। তীব্র পরিণাম আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি, মৃদু পরিণাম সহজে অনুমান করা যায় না। মনুষ্য, পশু-পক্ষী প্রভৃতি তীব্র পরিণামী, আর সূর্য্য, চন্দ্র, হরি-হর-বিরিঞ্চ্যাদি মৃদু পরিণামী; তাঁহাদের পরিবর্ত্তন আমরা সহজে অনুমান করিতে পারি না, সেইজন্য তাঁহাদিগকে আমরা অজরামর মনে করি, প্রত্যুত, শরীর ধারণ করিয়া কেহই অজর হইতে পারে না। খণ্ড শক্তিরই জরা, এবং জরা শক্তিমানেরই পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। নির্ব্বিকার কে? অজর যে। অজর কে? আনন্দময় নির্ব্বিকার যে। আনন্দময় নির্ব্বিকার কে? মহাপুরুষ, দেবর্ষি, মহর্ষি, মহাভক্ত যোগিগণ। তাঁহাদিগের শরীর পূর্ণ শক্তির আধার সেই শরীরে শক্তির হ্রাস নাই, সেইজন্য জরাও নাই। যেহেতু শক্তির হ্রাস নাই, সেই হেতু নির্ব্বিকার।

মৃত্যু

সকলেই কালভয়ে ভীত এবং মৃত্যুভয়ে ত্রাসিত। যিনি ভীত, তিনিই মৃত। ব্যাধি যার, জরা তার; জরা যার, মৃত্যু তার। ব্যাধি জরা ও মৃত্যু, সমস্তই শক্তির হ্রাস অবস্থায় হইয়া থাকে। এই যে মৃত্যু কথাটি, ইহা বিশ্বত্রাসক নাম। প্রাণী মাত্রেই যার নামে কম্পিত, স্বয়ং মৃত্যুপতি আতঙ্কিত, যাহার স্মরণে দেব, দানব, মানব, পশু, পক্ষী, কীট, তরু, লতা, যাহার ভয়ে ভীত; পৃথিবী নিজে, স্বয়ং সৌর জগৎ পর্য্যন্ত মহাভীত। জন্ম ও মৃত্যু পরস্পর আপেক্ষিক, জাত হইলেই মরিতে হইবে।

মৃত্যু দেহের সহিত জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে; আজ হউক, কাল হউক, শতাব্দী বাদে হউক, একদিন না একদিন মৃত্যুর কবলে পড়িতেই হইবে। জন্ম ও মৃত্যু—এক বস্তুরই দুই পিঠ, সেইজন্য জগৎ মৃত্যুর অধীন। মরণ নিশ্চয়, নাহিক সংশয়। জগতের সমস্ত অনিশ্চয়তার মধ্যে মৃত্যু একটি ধ্রুব নিশ্চয় এবং মহাসত্য। আমরা যখন জগতে আসিয়াছি, তখন নিশ্চয়ই এক দিন ইহা ছাড়িয়া যাইতে হইবে। জানি না কোন বয়সে কোন মুহূর্ত্তে মৃত্যু ঘটিবে। কিন্তু ইহা নিঃসন্দেহ ঠিক যে, একদিন মৃত্যু আসিবেই আসিবে। একদিন মরিতে হইবে, মানুষ মাত্রেই তাহা জানে, সর্ব্বদা মনে না হইলেও একদিন যে মৃত্যুর কঠোর করাল কবলে অবশভাবে কবলিত হইতে হইবে, নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত প্রিয়তম ধনজনাদির মমতাপাশ ছেদন করিতে হইবে, তাহা নিশ্চয়; সেইজন্য মৃত্যুর নামে এত আতঙ্ক, স্মরণে রোমাঞ্চ, চিন্তা করিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। যাহাদিগকে আমি এত ভালবাসি, এবং আমাকে যাহারা এত ভালবাসে, যাহাদিগের সঙ্গ ছাড়িতে হইবে ভাবিলে প্রাণ আকুল হয়, হৃদয় শোকে অভিভূত হয়, আমাকে এই সমস্ত ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে ভাবিলে যাহাদের প্রাণ আকুল হয়, মৃত্যুর পর তাহারাই বা কোথায় যাইবে, আমিই বা কোথায় থাকিব? এ হেন সোনার সংসার, স্ত্রী, পুত্র, ভোগ, ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া না জানি কী অদ্ভুত জায়গায় যাইয়া পড়িতে হইবে, তাহার ঠিক নাই। সুখে থাকি বা দুঃখে থাকি, এ জগতের সঙ্গে এক প্রকার আপোষ নিষ্পত্তি করিয়া যাইতে হইবে। এখানে যে সকল আত্মীয়স্বজনের প্রেমশৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া সুখে দিন কাটাইতেছি, মরণের পর, তাহাদিগের সহিত এই ভাবে আর কি মিলিতে পারিব, তাহারাই কি আমার সহিত মিলিতে পারিবে? মৃত্যুর পর কি তাহাদের সহিত আর দেখা হইবে? এই প্রকার চিন্তায় মানুষকে মরণের নামে ব্যাকুল করিয়া ফেলে। বাস্তবিক পারলৌকিক রহস্য, জীবন-যবনিকার চির অন্তরালে রহিয়াছে ও রহিবে।

কোন পদার্থের নাম মৃত্যু? মমতা বা ভয়ই মৃত্যু; ইহা ছাড়া দ্বিতীয় কোনরূপ মৃত্যু জগতে নাই। মমতা এবং ভয় অজ্ঞানপ্রসূত। যাহার অহংজ্ঞান জন্মিয়াছে, তাহারই মমতা জন্মিয়াছে। অহংজ্ঞানই মমতা। যাহার শরীরে বা আত্মীয়স্বজনের উপর মমতা জন্মিয়াছে, তাহার আগে দুঃখও জন্মিয়াছে, দুঃখ হইবে বলিয়া ভয়ও জন্মিয়াছে, সুতরাং মমতা বা ভয়ই মৃত্যু। মৃত্যু কেবল একটি পরিবর্ত্তন মাত্র। কার পরিবর্ত্তন? শক্তির কালিক পরিবর্ত্তন। বাল্যশক্তি যে কালে বর্দ্ধিত হয়, তাহা যৌবনকাল; যৌবনশক্তি যে কালে হ্রাস প্রাপ্ত হয়, তৎকাল জরা; তাহার পর মৃত্যুকাল। মৃত্যুর আর এক নাম কাল। বাল্যের পরিবর্ত্তন যৌবন, যৌবনের পরিবর্ত্তন বার্দ্ধক্য, বার্দ্ধক্যের পরিবর্ত্তন জরা, জরার পরিবর্ত্তন মৃত্যু। সব্রহ্মা সৌরজগৎ মুহুর্মুহু : পরিবর্ত্তন হইতেছে, তাহা কেবল মৃত্যুরই রূপান্তর মাত্র।

স্থূল শরীরের ভোগশক্তি ও কার্য্যশক্তি ধ্বংস হইলে যে কাল শক্তি আসিয়া পুনঃ নব শক্তিতে শক্তিমান করে, তাহাই মৃত্যু। সর্প দংশনে হউক, বজ্রপাতে হউক, ব্যাধিতে হউক, যে কোন প্রকার মৃত্যুর কারণই স্থূল শরীরের ভোগ ও কার্য্যে অক্ষমতা। মৃত্যু হয় কেন? স্থূল শরীর যখন ভোগ ও কার্য্য করিতে অক্ষম হয়, তখন লিঙ্গ শরীর বা সূক্ষ্ম শরীর, স্থূল শরীরকে ত্যাগ করিয়া, অভিনব নূতন শরীর ধারণ করে। জন্ম ও মৃত্যু উভয়ই আত্মার উন্নতির জন্য। আত্মাতে জ্ঞানোৎপাদনের জন্যই শরীর। এই শরীর যখন জ্ঞানোৎপাদনে

অসমর্থ হয়, তখন আত্মার জ্ঞানোৎপাদনার্থ নূতন শরীর হইয়া থাকে, ইহাই জন্মমৃত্যুর রহস্য। মৃত্যু একজন মহা উপকারী বন্ধু, পরম দয়াবান ও মহাদাতা। মৃত্যু আত্মার জ্ঞানোৎপাদনের জন্য স্থূল শরীর হইতে সূক্ষ্ম শরীরকে পৃথক করে, এইজন্য মৃত্যু উপকারী মিত্র। বার্দ্ধক্যে জীব বড় কষ্ট পায়, সেই কষ্টকে মৃত্যুই দূর করিয়া থাকে, এইজন্য মৃত্যু পরম দয়াল। মৃত্যু প্রাণী মাত্রেরই পুরাতন শরীর গ্রহণ করিয়া নূতন শরীর দান করিয়া থাকে, এই জন্য মৃত্যু মহাদাতা।

জীর্ণবাস ত্যাগে নববস্ত্র পরিধানে লোকে আনন্দই বোধ করিয়া থাকে। কিন্তু মৃত্যুর বেলায় পুরাতন শরীর ত্যাগে নব শরীর ধারণে আনন্দ বোধ করে না কেন? মনে করো তুমি বৃদ্ধ হইয়াছ, তোমার শরীর অপটু হইয়াছে, অপটু শরীর লইয়া কেবল যন্ত্রণা ভোগ করিতেছ, সেই সময় যদি কেহ আসিয়া বলে যে, তোমার শরীর নূতন করিয়া দিব, তাহা হইলে তুমি কি আনন্দিত হও না? অবশ্যই হও; কেননা তুমি নূতন শরীর পাইলে নিত্য নূতন ভোগ করিতে পারিবে। মৃত্যুও তোমাকে নূতন শরীর দিবে, তবে কেন মরণের নামে এত ভয় পাও? ইহার কারণ এই যে, দেহের উপর, আত্মীয়স্বজনের উপর তোমার অতিশয় মমতা জন্মিয়াছে, সুতরাং তাহাদের ত্যাগে দুঃখও জন্মিয়াছে, দুঃখ পাইবে বলিয়া ভয়ও জন্মিয়াছে। বস্ত্রের উপর তোমার মমতা জন্মে নাই, সেইজন্য বস্ত্র ত্যাগে দুঃখও জন্মে নাই, সুতরাং ভয়ও উৎপন্ন হয় নাই, বরং আনন্দই জন্মিয়াছে। সেইরূপ বিবেকবলে দেহের প্রতি যদি মমতা না জন্মে, তবে তাহা ত্যাগে দুঃখেরও কারণ থাকে না; দুঃখাভাবে ভয়ও উৎপন্ন হয় না, বরং অকর্ম্মণ্য পুরাণ শরীর ত্যাগে আনন্দই জন্মিতে পারে; সুতরাং ভয়ই মৃত্যু, মৃত্যুই ভয়। অন্য কোন প্রকার মৃত্যু জগতে নাই।

কাল জগৎ-নাশক। বিশ্ব মহা প্রলয়ে কাল কুক্ষিগত হইবে, ব্যক্ত জগৎ অব্যক্তে লীন হইবে, ইহার কিছুই থাকিবে না। বিশ্ববাল্য অতীতে লীন হইয়াছে, যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে, যৌবনান্তে বার্দ্ধক্যে কাল কুক্ষিগত হইবে। জাগতিক শক্তি যখন হ্রাস প্রাপ্ত হইবে, তখনই মহাপ্রলয় উপস্থিত হইবে।

জগৎ শব্দের অর্থ—যাহা গতিশীল, অনন্ত কালাভিমুখে যাহার গতি অথবা যাহা গত হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে, অর্থাৎ যাহা থাকিবার নহে, তাহাই জগৎ। মরণই নিয়তি, নিয়তিই প্রকৃতির গতি, এই গতিতে জগৎ চক্র নিয়ত কালের পথে চলিয়াছে। অনিত্য সর্ব্বভূত নিত্যকালের ক্রীড়ার সামগ্রী মাত্র। বাজীকর যেমন বিবিধ খেলনা বস্তুর দ্বারা বাজী দেখাইয়া, আবার সেইগুলিকে থলিয়ার মধ্যে পূরিয়া রাখেঃ বিশ্ব বাজীকর কালও নিয়ত বিধি বিচিত্র ভৌতিক বাজী দেখাইতেছে ও এক-একটা খেলনা অতীতের থলিয়াতে পূরিতেছে। কালেই সমস্ত লয় হইবে, এইজন্য মরণের আর এক নাম কাল। কালপ্রাপ্তিই জগতের ব্যাপার, ইহাই একমাত্র সমাচার।

কালে সমস্তই গ্রাস করিবে, কিছুই থাকিবে না, ইহাই জগতের একমাত্র মূল খবর, ইহাই একমাত্র জ্ঞাতব্য, জগতের অনিত্যতাই বিষয়। এই সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য ব্যাপারটি মায়াজাত মহামোহেরই মোহিনী শক্তির ফল। জগতে যিনি যত বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, মান, রূপ, গুণ, যশ, সৌরভ, পদ, গৌরবাদিতে বিভূষিত হউন না কেন, মরণ হরণের উপায় করিতে পা পারিলে সকলই বৃথা, সমস্তই বিড়ম্বনা। এই সংসারখানা এবং কসাইখানা দুই-ই সমান, কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। একবার মনোযোগের সহিত বিবেচনা করিয়া দেখো; আমরা নিতান্ত দীন হীন ছাগমেষাদির ন্যায় কর্ম্ম-ডোরে বদ্ধ হইয়া মহাকালের কসাইখানায় নীত হইতেছি। সময় কালে একটু ছটফটানি ভিন্ন আর কোনও ক্ষমতাই নাই, কোনও শক্তিই নাই; কি ভয়ানক শোচনীয় অবস্থা!

এই সংসারে বুদ্ধিমত্তার বিশেষ খ্যাতি আছে বটে, কিন্তু কালের কাল আসিলে, সকলেরই বুদ্ধি ফুরাইয়া যায়, তখন আর কাহারও বুদ্ধি বাহির হয় না। যাহার বুদ্ধি তাহার প্রতিকারে সমর্থ, সেই যথার্থ বুদ্ধিমান, নচেৎ নেঙ্গুড় নাড়াই সার। মহাপ্রলয়ে দেহলয় অবশ্যম্ভাবী, কালে ভূতের উপর কালের অধিকার নিশ্চয়ই× হইবে। পুরুষকার প্রয়োগ দ্বারা যত ইচ্ছা তত কাল বাঁচিতে পারো, অসাধারণ শক্তিবলে আসন্ন মৃত্যুর আক্রমণ অতিক্রম করিলেও একদিন দেহের উপর কালের অধিকার আসিবেই আসিবে।

কি ঊর্দ্ধ লোকের জীব, কি অধোলোকগত জীব, জরা মরণাদিজনিত দুঃখ, ক্লেশ সকলেরই সমান। অশ্বত্থামাদি সাতজন চিরজীবী, দেবতারা অমৃত পানে অমর, এক-একটি মন্বন্তরে এক-একটি ইন্দ্রের পতনে লোমশমুনির এক এক গাছি লোম খসে, সমস্ত লোম খসিলে তাঁহার মৃত্যু। চিরজীবিত্ব, অমরত্ব বিরাট কালের এক ক্ষুদ্র অংশব্যাপী মাত্র। মৃত্যুর শক্তি সর্ব্বনাশী, কালের করাল কবল বিশ্বগ্রাসী, তাহাতে আর সংশয় নাই। প্রলয়-অন্তে ব্রহ্মা জাগরিত হইয়া যখন কিছুই দেখিতে পাইলেন না, কেবল চতুর্দ্দিকে ধূ ধূ শূন্যময়, তখন তিনি ভীত হইলেন; যেহেতু ভীত, সেই হেতু মৃত। সেই অবধি লোকে একাকী থাকিতে ভয় পায়।

ভয় কার? মমতা যার। মমতা কার? মোহ যার। মোহ কার? জ্ঞান অপূর্ণ যার। জ্ঞান অপূর্ণ কার? বীর্য্যচ্যুত যার। জীব মাত্রেই বিকারী, সেই জন্য পরিবর্ত্তনশীল, সুতরাং ব্যাধি, জরা ও মৃত্যুগ্রস্ত। যার ব্যাধি জরা মৃত্যু আছে, তাহারই শক্তিহ্রাস অনুমেয়; যাহার শক্তিহ্রাস আছে, তাহার ব্যাধি জরা ও মৃত্যু অনুমেয়।

পূর্ণজ্ঞানে অজ্ঞান কোথায়? পূর্ণ শক্তিতে ভয় কোথায়? অভয় বলিয়া অমৃত। অমৃত কে? মমতাশূন্য যে। যাহার শরীরে মমতা নাই, তাহা ত্যাগে দুঃখও নাই, সেইজন্য দুঃখ প্রাপ্তির ভয়ও নাই, প্রকৃত পক্ষে তিনিই নির্ভীক। যিনি নির্ভীক, তিনিই হাসিতে হাসিতে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে পারেন। যিনি হাসিতে হাসিতে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে পারেন, তিনিই কালকে জয় করিয়াছেন। তিনিই অমৃত, ইহা ছাড়া কালনাশক বিশ্বে দ্বিতীয় আর কিছু নাই। যিনি মৃত্যুসময়ে সহাস্য বদনে আত্মীয়স্বজনের নিকট হইতে বিদায় লইতে পারেন, মনে করিতে হইবে মর্ত্তে তিনিই মহাপুণ্যবান। যিনি বহু কষ্ট ভোগ, নানা প্রকার যন্ত্রণা ভোগ করিয়া হাত-পা অবশ, মায়ায় মুগ্ধ হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মৃত্যুভয়ে ব্যাকুল হন, তাঁহার মৃত্যু অপমৃত্যুরই সমান; তাঁহার মতো দুর্ভাগ্য ও শোচনীয় অবস্থা আর কাহারও নাই; মনে করিতে হইবে তাহার মহাপাপের জীবন।

মনুষ্য যদি সংসারে আসিয়া হাসিয়া মরিতে না পারিল, তবে মনুষ্য জীবন ধারণ করিল কেন? মরিবার সময় পশুরাও অতিশয় যন্ত্রণা ভোগ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মরিয়া থাকে, মনুষ্য ও পশুতে প্রভেদ কি? যিনি হাসিতে হাসিতে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়া, কালের মুখে কালি দিয়া, কালকে জয় করিয়া মরিতে পারেন, তিনিই মহাপুরুষ এবং তাঁহার মহাপুণ্যের জীবন মনে করিতে হইবে। যাঁহার মৃত্যুভয় নাই, এই সংসারে তাঁহার কোনও ভয় নাই। মৃত্যুকে জয় করিতে পারিলে সমস্ত বিশ্ব জয় করা হয়।

শ্মশান

বিশ্ব-নাট্যের বিরাম স্থান শ্মশান। অভিমান, গর্ব্ব, দুঃখ, শোক, তাপ, আধি, ব্যাধি, জ্বালা, যন্ত্রণার, অবসান-নিকেতন। ধনী, নির্ধন, দুঃখী, সুখী, রাজা, প্রজা, দীন, ভিখারী যেখানে সমভাব, তাহারই নাম শ্মশান। বিশ্ব একটি মহাশ্মশান কেননা জগতে অদাহ স্থান নাই, তবে কেন শ্মশানের নামে এত ভয়? পৃথিবীতে যদি কোন পবিত্র স্থান থাকে, তাহা এই শ্মশান। যে পূতধামে পূতমনা সদানন্দে বিরাজিত, সেই স্থানের নাম শ্মশান।

একদিন মহেশ্বর কহিলেন, দেবি! আমি পবিত্র স্থান অন্বেষণ করিয়া অদ্যাপি সমুদয় পৃথিবী পর্য্যটন করিয়া থাকি কিন্তু শ্মশান অপেক্ষা কোন স্থানই পবিত্র বলিয়া জ্ঞান হয় না। তাই শ্মশানবাস করিতে আমি নিতান্ত অভিলাষী হইয়াছি । পবিত্র স্থান লাভাকাঙ্ক্ষী মহাত্মারা এই পরম পবিত্র শ্মশানেই সর্ব্বদা বাস করিয়া থাকেন। যাঁহারা পবিত্রমনা, পবিত্রধাম শ্মশানেই তাঁহারা আনন্দ অনুভব করেন। এখানে ক্রোধ নাই, মাৎসর্য্য নাই, কাম নাই, ভয় নাই, লোভ নাই, ক্ষয় নাই, হিংসা নাই, কুটিলতা নাই; নাই অসূয়া, নাই অশুচি; সে জন্য এই শ্মশানে মহাপুরুষেরা মহানন্দে অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন।

জীবের মহাবিশ্রম স্থান, চির শান্তিধাম এই সেই মহাশ্মশান। এই মহাশ্মশানে, মহাশয্যায়, মহাশয়নে, মহাশয়েরা তিনজনে, নির্জ্জনে, এই ঘোর নিশিতে এখানে কিসের যুক্তি করিতেছেন? এক মহাপুরুষের পাশে একটি বালক দণ্ডায়মান, বালকটি বলিতেছে—পিতঃ! এস; ক্রোড়ে একটী বালিকা শায়িত ও নিদ্রিত, মাঝে মাঝে চমকিয়া উঠিতেছে আর বলিতেছে—বাবা! চল, আর যন্ত্রণা সয় না। মহাপুরুষ বলিতেছেন—বৎস! এখনও নিশা অবসান হয় নাই, চতুর্দ্দিক গাঢ় নিস্তব্ধ, ঘোর অন্ধকার, আমি এ নিশায় তোকে লইয়া কোথায় যাইব? আমি কি তোদের ছেলেমানুষের কথায় যাইব? যখন আমার ইচ্ছা হইবে, যাইবার উপযুক্ত সময় বোধ করিব, তখনই তোকে লইয়া যাইব, তোর যদি যন্ত্রণা হইয়া থাকে, আয়, তোর গায়ে হাত বুলাইয়া দিই। মহাপুরুষ বালিকার গায়ে হাত বুলাইয়া দিলেন, বালিকা পুনঃ নিদ্রিত হইল। বালিকা কিয়ৎক্ষণ পরে আবার চমকিয়া উঠিয়া বলিল—পিতঃ! আর যন্ত্রণা সয় না, এইবার চল, এ শয্যা আমার পক্ষে বড়ই যন্ত্রণাদায়ক, বাবা! তুমি প্রফুল্ল মনে কেমন করিয়া শুইয়া রহিয়াছ? যদি তুমি না যাও, তবে আমি তোমাকে ফেলিয়া চলিয়া যাইব, আমার আর এ যন্ত্রণা সয় না, তুমি কেমন করিয়া সহ্য করিতেছ? বাবা! তুমি কি আমার কথা শুনিতে পাইতেছ না, তুমি কি ভাবছ? বালিকা যথার্থই বলিয়াছে, মহাপুরুষ কি ভাবিতেছেন, মহাপুরুষকে দেখিলে বোধ হয়, যেন কী এক মহাচিন্তায় নিমগ্ন, যেন কন্যাদায়গ্রস্ত; 'মাগ নাই তার পুতের দিব্বি করা'র ন্যায়, এই মহাপুরুষও কন্যাদায়গ্রস্ত। মহাপুরুষ এবার হাসিয়া বলিলেন—তোর বিবাহের কথা ভাবিতেছি, কার সঙ্গে তোর বিয়ে দিই। তোকে বিবাহ করিতে কেহ রাজি হয় না, তুই যে বড় দুরন্ত মেয়ে। তোর নামে বিশ্বত্রাসিত, জীব মাত্রেই ভাবিত, সুরাসুরনাগলোক কম্পিত, তাই ভাবিতেছি, তোকে বিয়ে করবে কে? তোর বিয়ের জন্য আমি বড় বিপদে পড়িয়াছি, তোর কাছে কেহ স্বেচ্ছায় ঘেঁষে না, তোর রাক্ষসগণ, সেইজন্য পাত্র জুটে না, যাহার সঙ্গে বিবাহ দিব, তাহাকেই খাইয়া ফেলিবি, সুতরাং বিবাহ দেওয়া আর না দেওয়া সমান ও বৃথা; যেখানে বিবাহ দিলে নিশ্চয়ই বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে, জানিয়া-শুনিয়া কি প্রকারে সেখানে বিবাহ দিই! বালিকার জন্য মহাপুরুষ ত্রিভুবন খুঁজিলেন, কোথাও পাত্র মিলিল না। অগত্যা পাশের সেই বালকটির সহিত বিবাহ দিলেন। উপযুক্ত পাত্রে উপযুক্ত পাত্রী সম্প্রদান করা হইল। বালক স্থিরযৌবন, মৃত্যুরহিত, সুতরাং বালিকাকে আর বৈধব্যযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না। মহাপুরুষ এই ত্রিভুবন নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। মহা ঘটা করিয়া এই বিবাহ দিবেন স্থির করিয়াছিলেন, দুঃখের বিষয়, নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে কেহই আসেন নাই। মনুষ্য দেবাসুর যক্ষ রক্ষ, স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল হইতে কেহই বরযাত্রা বা কন্যাযাত্র হইয়া

আসেন নাই। হরিহর বিরিঞ্চি নামে ত্রাসিত, বাজনা বাজায় কে? লক্ষ্মী সারস্বতী সাবিত্রী দুর্গা ভয়ে কম্পিত, তবে হুলু বা উলু দিবে কে? দেবকন্যা কেহ ভয়ে বাহির হইলেন না, শাঁখ বাজাবে কে? পাঠক! এ বিবাহে কেহই আসিলেন না, তোমরা কেহ বরযাত্র যাইতে রাজী আছ কি? দেখো সাবধান, কন্যা দেখিলে সকলেরই চক্ষু স্থির হইবে, কেহই কিন্তু ঘরে ফিরিয়া আসিতে পারিবেন না, শেষে যেন আমি গালাগালি না খাই। সরস্বতী সাবিত্রী প্রভৃতি দেবীরা এ বাসরে বাসরে জাগিতে কেহ আসিলেন না। মা বঙ্গললক্ষ্মীগণ! এ বাসরে বাসর জাগিতে কেহ রাজি আছ কি মা? মনে রাখিও, এখন আসিলে না বটে, কিন্তু একদিন এই বাসরে আলিয়া বাসর জাগিতেই হবে। মাগো! কেহই আটক করিয়া রাখিতে পারিবে না। যাহাদিগকে কত ভয় কর, কত মান্য কর, কত কায়দায় মধ্যে থাক, কত আধিপত্য, কত রকমের বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া সুখে দিন কাটাও, একদিন, তোমার সাধের যাহা কিছু আছে, সমস্ত ত্যাগ করিয়া, দীনহীন বেশে এই বাসর জাগিতে আসিতেই হইবে।

পাঠক মহাশয়! এই মহাপুরুষ কে, যিনি এই মহাশ্মশানে প্রফুল্ল মনে বিবাহকার্য্য সমাধা করিতেছেন? আর ঐ বালক বালিকাই বা কে, ইঁহাদিগকে চিনিতে পারিলেন কি? এই মহাপুরুষ আত্মা, সম্মুখে দণ্ডায়মান বালকটি কাল, ক্রোড়ে শায়িত বালিকাটি মৃত্যু। নিত্য বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্য ভোগ করিতেছে যে পদার্থ, তাহাই কাল ও মৃত্যু; সুতরাং বালক-বালিকা বলা যায়। পুত্র-কন্যা যেমন পিতা-মাতার আজ্ঞাধীন ও বশীভূত, এই বালক-বলিকা বা কাল ও মৃত্যু আত্মার আজ্ঞাধীন ও বশীভূত। বিশ্বে এমন কোনও প্রাণী নাই, যাহার মহাকাল ও মহামৃত্যু বশীভূত। যে কাল এবং মৃত্যু সকলকেই কেশে আকর্ষণ করিয়া বলপূর্ব্বক লইয়া যায়, তাহারা আজ আত্মার আজ্ঞাবহ। কাল ও মৃত্যু বলিতেছে—চল, আত্মা বলিতেছেন এখন যাইব না, আমার যখন ইচ্ছা হইবে তখন যাইব। আব্রহ্ম কীট মৃত্যুকে কে বলিতে পারিয়াছে—আজ আমি যাইব না কাল যাইব, বা যখন ইচ্ছা তখন যাইব, এবং মৃত্যুই বা কাহার কথায় প্রতীক্ষা করিয়াছে? সেই মৃত্যু বিষদাঁত-ভাঙ্গা সর্পের ন্যায় শান্ত মূর্তিতে আত্মার বা পরমাত্মার আজ্ঞা প্রতীক্ষা করিয়া থাকে, তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া থাকে, আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া থাকে।

কাল এবং মৃত্যু করজোড়ে ভীষ্মদেবের প্রতীক্ষা করিয়াছে। মৃত্যু যে শয্যায় মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিয়াছে, সেই শরশয্যায় ভীষ্মদেব মৃত্যুকে ক্রোড়ে করিয়া মহানন্দে মহাশয়নে উত্তরায়ণ দিবা অপেক্ষা করিয়াছেন। সেই মহাপুরুষ বীর-ই ধন্য। মৃত্যুই যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছে, তিনিই কিন্তু প্রফুল্ল মনে মহানন্দে ছিলেন। মৃত্যু বলিতেছে—পিতঃ! যদি তুমি আমার সঙ্গে না যাও, তবে আমি যাই। এমন মহাপুরুষ কে আছেন যাঁহাকে মৃত্য দায়ে ঠেকিয়া ত্যাগ করিয়া যাইতে চাহিতেছেন? পক্ষান্তরে যিনি করুণাবশ হইয়া মৃত্যুকে ছাড়িতে চাহিতেছেন না, প্রত্যুত তাঁহার আবদার রক্ষার্থে ইচ্ছুক হইয়াছেন, সেই মহাপুরুষ মুত্যুর গায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছেন আর বলিতেছেন বৎসে, এখন দক্ষিণায়ন-নিশা অবসান হয় নাই। নিশা অবসান হইলে, উত্তরায়ণ-দিবা আগমন করিলেই আমি তোরে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইব। অমনি মৃত্যু-কন্যা নতশির, তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আর কিছু করিতে পারিল না, করিবার সাধ্যও নাই। এইজন্য মহাপুরুষ ও আত্মার প্রভেদ নাই; তাঁহাদিগের ইচ্ছা মৃত্যু কালজয়ী, সুতরাং কাল বশীভূত আজ্ঞাধীন, সুতরাং পুত্রস্থানীয়। পুত্র যাঁর কাল, কন্যা যাঁর মৃত্যু, তিনিই কালজয়ী মহাপুরুষ।

জগতে সেই যোগিবরই ধন্য, যিনি এই সংসারের ছায়াবাজী ভুলিয়া চিরকাল শ্মশানে বাস করেন এবং এই স্থানে বসিয়া একমনে যোগ অভ্যাস করত নিশ্চয়ই ভগবানকে পাইয়া থাকেন। এই সেই শ্মশান, যেখানে যোগীর প্রধান মহাদেব বসিয়া যোগ করিতেন। প্রকৃতির লীলাভূমি রজত-কৈলাস যাঁহার সুখের নিবাস, তিনি এই শ্মশানকে প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তম জ্ঞান করিতেন। প্রাণ খুলে এই বিশ্ব সংসার ভুলিয়া তিনি যাহা ভাবিতেন, যদি আমরা সেই ভাবনা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমরাও এ হেন শ্মশান ছাড়িয়া কখনও এই অনিত্য সংসারে মজিয়া থাকিতে পারিতাম না। এখানে সাম্য-বৈষম্যের ভারতম্য নাই; এখানে ছোট-বড় বিচার নাই, এখানে স্বার্থপরতা নাই, এখানে পরনিন্দা নাই, এখানে বিদ্বান ও নির্ব্বোধ অভিন্ন

হৃদয়; যেমন নানা দিক হইতে নদী সকল প্রবাহিত হইয়া শেষে সমুদ্রে মিশিয়া এক হইয়া যায়, সেইরূপ নানা দেশের নানা লোক, নানা জাতি আসিয়া এই পুণ্যভূমি শ্মশানে সমবেত হয়।

শ্মশান পরম পবিত্র ও পরম যোগের স্থান; এখানে পাপী বা পুণ্যবান, মূর্খ বা বিদ্বান, সকলকে সমভাবে সরল হৃদয়ে একত্রে শয়ন করিতে হয়। এখানে অন্ধ, খঞ্জ, বধির, গলিত কুষ্ঠধারী, রূপের কন্দর্প, রাজা, প্রজা, ভিখারী, সকলকেই এক শয্যায় শয়ন করিতে হয়, এইস্থানে জাতিভেদ কোনও কালেই নাই। ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালে, সবল এবং দুর্ব্বলে, দাতা আর কৃপণে মনের সুখে এক শয্যায় শয়ন করিয়া থাকে। রাজা মহারাজ অথবা জমিদার, কোমল পুষ্পশয্যা বা দুগ্ধফেননিভ শয্যা পরিত্যাগ করিয়া, এখানে সেই এত্র শয্যায় শয়ন করিয়া মহাসুখে চিরকালের জন্য নিদ্রা গিয়া থাকেন। এই স্থানে সতী নাই, অসতী নাই, বন্ধ্যা নাই, পুত্রবতী নাই, অবীরা নাই, সকলেরই তুল্য গতি। এখানে ঘুমাইলে জন্মের মতো রোগ-শোক ঘুচিয়া যায়, চির দুঃখের অবসান হইয়া চিরসুখ ভোগ হয়।

এখানে আসিলে প্রাণায়াম সিদ্ধ হয়, এখানে আসিলে বিনা বায়ুরোধে কুম্ভকের উদয় হয়, এখানে আসিলে শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়া একেবারে লয় হইয়া সকলের প্রাণ চিরসমাধির সুখ অনুভব করত চিরকালের জন্য সমস্ত জ্বালাযন্ত্রণা ভুলিয়া চিরদিনের জন্য সুখ ও শান্তি উপভোগ করে।

শান্তি! শান্তি! শান্তি!

সমাপ্ত

শ্রীউমাচরণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সংগৃহীত পুস্তকাবলী

(১) মহাত্মা তৈলঙ্গ স্বামীর জীবন চরিত ও তত্ত্বোপদেশ,—'ভালো কাগজ, সুন্দর ছাপা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই ৩০০ পাতার পূর্ণ, মূল্য ১।।০ কি কি বিষয় ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে তাহা একবার দেখুন।

১. ঈশ্বর ২। সৃষ্টি ৩। সংসার ৪। গুরু ও শিষ্য ৫। চিত্তশুদ্ধি ৬। ধর্ম্ম ৭। উপাসনা ৮। পূর্ব্বজন্ম ও পরজন্ম ৯। আত্মবোধ ১০। তন্ময়ত্ব ১১। কয়েকটি সার কথা ১২। তত্বজ্ঞান। এতদ্ব্যতীত জীবন্মুকক্ত মহাত্মা তৈলঙ্গ স্বামীর বিস্তত জীবনী।

(২) মহাত্মা তৈলঙ্গ স্বামী বিরচিত 'মহাবাক্য রত্নাবলী' ও তাহার সরল বঙ্গানুবাদ,—ভালো কাগজ, সুন্দর ছাপা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই, ১০০০ শ্লোক, ২০০ পাতার পুর্ণ, মূল্য ১।।০ যে সকল বিষয় ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে তাহা দেখুন।

১। সার্ধান্তিক বিধিবাক্য ২। বন্ধ-মোক্ষ বাক্য ৩। অবিদ্বন্নিন্নাবাক্য ৪। জগন্মিথ্যা বাক্য ৫। উপদেশ বাক্য ৬। জীবব্রহ্ম বাক্য ৭। মনন বাক্য ৮। জীবন্মুক্তি বাক্য। ৯। সানুভূতি বাক্য ১০। সমাধি বাক্য ১১। নানা লিঙ্গ স্বরূপ বাক্য ১২। পুংলিঙ্গ স্বরূপ বাক্য ১৩। স্ত্রী লিঙ্গ স্বরূপ বাক্য ১৪। নপুংসক লিঙ্গ স্বরূপ বাক্য ১৫। আত্মস্বরূপ বাক্য ১৬। সর্ব্বস্বরূপ বাক্য ১৭। ব্রহ্মাস্বরূপ বাক্য ১৮। অবশিষ্ট বাক্য ১৯। ক্ষণ বাক্য ২০। বিদেহ মুক্তি বাক্য।

(৩) 'তত্ববোধ'—কয়েকজন মহাপুরুষের উপদেশ, ভালো কাগজ, সুন্দর ছাপা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই, ২৭১ পাতায় পূর্ণ মূল্য ১।।০ যে সকল বিষয় ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে তাহা দেখুন—

১। বিশ্ব বা জগৎ ২। আর্য্যভূমি ভারতবর্ষ ৩। অহংতত্ব ৪। দর্শন ৫। ত্রিবেণী ৬। কাল ১৭। ব্যোম বা আকাশ ৮। শব্দ ও নাদ ৯। বাক্য ১০। প্রকৃতি ১১। শক্তি ১২। মায়া ১৩। প্রাণ ১৪। মন ১৫। বুদ্ধি ১৬। চিত্ত ১৭। সারতত্ব ১৮। কুমার দেবব্রত ১৯। সিদ্ধাশ্রম ২০। ব্রহ্মচর্য্য ২১। সন্ন্যাস ও আনন্দ ২২। স্বাধীন ও পরাধীন ২৩। সত্য ২৪। চৌর্য্য ২৫। শরীর ২৬। ব্যাধি ২৭। জরা ২৮। মৃত্যু ২৯। শ্মশান।